আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা

জগদীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

প্রকাশক
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি.
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট্, কলিকাতা-৭৩

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ

সংশোধিত ৫০তম সংস্করণ

মূল্য ৩৫·০০

মুদ্রক
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার দে
গীতা প্রেস
৪১-বি গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-২৯

নিবেদন

'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা' এবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের নূতন পাঠ্যবিধি যথাযথ অনুসরণে আদ্যন্ত সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া নূতন সংযোজন-সহ ১১শ-১২শ শ্রেণীর জন্য প্রকাশিত করিলাম। এই সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত গ্রন্থখানি সুদীর্ঘকাল উচ্চতর শ্রেণীসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষা শিক্ষায় সহায়তা করিয়া আসিতেছে।

ইহার ব্যাকরণ অংশের বৈশিষ্ট্য সুপরিজ্ঞাত। ব্যাকরণ সম্বন্ধে পাঠ্যক্রমের নির্দেশ ১১শ-১২শ শ্রেণীদ্বয়ে ব্যাকরণের জ্ঞান মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধিগত জ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর মানের হইবে এবং উহা পাঠ্যগ্রন্থভিত্তিক হইবে। সুতরাং এই শ্রেণীদ্বয়ে ব্যাকরণ শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাহাতে শিক্ষার্থিগণ নিজেরাই পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সমর্থ হয়। ব্যাকরণ অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র কয়েক পাতা 'পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণ' মুখস্থ করিলে আসলে জ্ঞানলাভ সামান্যই হইবে সিলেবাসের মূল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবে। বিশেষতঃ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা পরে আর থাকে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কৃতী হইবার ব্যাকরণগত ভিত্তি এই শ্রেণীদ্বয়েই দৃঢ় করা প্রয়োজন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা ব্যাকরণে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুগুলির সম্যক্ আলোচনা করিয়াছি।

রচনাংশের নূতন সংযোজনের বিশেষত্ব আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য। রচনাংশের প্রবন্ধ, কাল্পনিক কথোপকথন, পত্র রচনা, গল্প লেখা, বক্তৃতা বা ভাষণ, ভাবার্থ, সার-সংক্ষেপ, সারাংশ ও ভাব-সম্প্রসারণ—প্রত্যেকটি বিষয় নূতন পাঠ্যবিধি যথাযথ অনুসরণ করিয়া নব নব তথ্যসহ লিখিত হইয়াছে। সহজ সরস প্রাণবন্ত ভাষায় উপযোগী বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু সুচয়িত এবং ভাষা সরল ও বলিষ্ঠ। ইহা ছাত্র-ছাত্রীদের রচনা শিক্ষায় যেরূপ সহায়ক হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবন গড়ায়ও প্রেরণা দিবে। সাময়িক বিষয়বস্তুর প্রবন্ধে এই অংশ ভারাক্রান্ত নয়। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন রচনাভঙ্গির নির্দেশক।

কাল্পনিক কথোপকথনে কয়েকটি বিখ্যাত রচনা সংকলিত হইয়াছে। কাল্পনিক কথোপকথন, পত্র রচনা ও গল্প লেখায় কতকগুলি বিখ্যাত সংকলন ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সহায়ক ও উৎসাহোদ্দীপক হইবে। 'বক্তৃতা' বা ভাষণ লেখা ও বলা বিষয়টি খানকয়েক বিশিষ্ট ইংরেজী গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত। ইহাতে সংকলিত বিশিষ্ট কয়েকটি ভাষণও আকর্ষণীয়।

রচনাংশ—অন্যান্য বিষয়

বাংলা "ক" ভাষা পাঠক্রম

পূর্ণ সংখ্যা—২০০

প্রথম পত্র	দ্বিতীয় পত্র
বর্হিমূল্যায়ন—৯০	বর্হিমূল্যায়ন—৯০
আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন—১০	আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন—১০

প্রথম পত্র		দ্বিতীয় পত্র	
গদ্য—	৩৬	প্রবন্ধ রচনা—	১৫ [শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে অনধিক ৬০০]
কবিতা—	৩৬	ব্যাকরণ—	২০
নাটক—	১৮	ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সংক্ষিপ্ত সার, গল্পলেখা, পত্র রচনা, সংলাপ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (যে কোন ১টি)—	১২
	৯০	সাহিত্যের ইতিহাস—	২৫
		সহায়ক পাঠ—	১৮
			৯০

বাংলা 'ক' ভাষা

দ্বিতীয় পত্র

সহায়ক পাঠ—ছোট গল্প

১। শাস্তি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। মহেশ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩। বিরিঞ্চি বাবা—রাজশেখর বসু (পরশুরাম)। ৪। পাশফেল—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের ইতিহাস

আদি ও মধ্য যুগ

আদি যুগ—১। বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব; বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন এবং যুগ বিভাগ। ২। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ—চর্যাপদ: সমাজ চিত্র ও সাহিত্য সম্পদ

মধ্য যুগ—১। তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি—সামাজিক অবস্থা। ২। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী। বিঃ দ্রঃ—চণ্ডীদাস সমস্যার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। ৩। (ক) কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ। (খ) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (সংক্ষিপ্ত পরিচয়)। ৪। মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজ জীবন। ৫। মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা (বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ)। ৬। সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে চৈতন্যদেব। ৭। চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা (দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরাম)। ৮। চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয় (চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। ৯। বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাসের পদাবলী। ১০। ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা—রূপরাম চক্রবর্তী (সংক্ষিপ্ত পরিচয়), প্রধানতঃ ঘনরাম চক্রবর্তী। ১১। কাশীরাম দাসের মহাভারত, সংক্ষেপে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর পরিচয়। ১২। আরাকান রাজসভার প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা: দৌলতকাজী ও সৈয়দ আলাওল। ১৩। ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল। ১৪। সামাজিক পটভূমিতে শাক্তপদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত) এবং বাউল (লালন ফকির)।

ব্যাকরণ

১। সাধু ও চলিত রীতি।

২। শব্দের অর্থ পরিবর্তন [অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ, অর্থের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, অর্থের রূপান্তর]।

৩। ধ্বনিতত্ত্ব [সমীভবন, স্বরসঙ্গতি, স্বরভক্তি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি]।

৪। বাক্য পরিবর্তন—[বাক্য সংকোচন, বাক্য সম্প্রসারণ, সরল-জটিল-যৌগিক বাক্য—একটি থেকে অন্যটিতে পরিবর্তন। বাক্যের অন্তর্গত প্রকারভেদ এবং একটি থেকে অন্যটিতে পরিবর্তন (অস্ত্যর্থক, নঞর্থক, প্রশ্নাত্মক, অনুজ্ঞাবাচক, প্রার্থনাসূচক, কার্যকারণাত্মক সন্দেহদ্যোতক) প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ উক্তির পরিবর্তন]।

৫। বাচ্য-পরিবর্তন [কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য—একটি অন্যটিতে পরিবর্তন]।

৬। ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহার।

৭। প্রবাদ প্রবচন (৫০টি)।



১৯৭৫ সালে প্রথম বঙ্কিম-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বিদগ্ধ অধ্যাপক, খ্যাতনামা ছান্দসিক, সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া লিখিয়াছেন—

"আমি একজন ভাষাপ্রেমিক তথা ব্যাকরণ-প্রেমিক ব্যক্তি। প্রায় সমস্ত বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আপনাদের 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ' এক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়। এমন সুন্দর, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ ইতিপূর্বে আর হয়নি। একান্ত ভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এটির অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এটি বাংলার জাতীয় ব্যাকরণ বলে গণ্য হবার যোগ্য। নেহাত পাঠ্যপুস্তক বলে মনে করলে এটিকে ছোট করে দেখা হয়। তাতে শুধু যে এটির মর্যাদাহানি হয় তা নয়, তাতে বাঙালির গৌরবহানিও হয়। বস্তুতঃ বাঙালির ভাষাচর্চার ইতিহাসে এটি স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। এজন্য আমি প্রথমাবধি এটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এটির ছন্দ অধ্যায়টি পরিমার্জনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলাম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে।"

শান্তিনিকেতন — শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ

উপক্রমণিকা

বাংলা ভাষা। বাংলা আমাদের মাতৃ-ভাষা। কেবল উভয় বাংলায় নয়, উহার বাহিরেও বাংলা ভাষা প্রচলিত। পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসামের কাছার জেলার ভাষা বাংলা। ইহা ছাড়া আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলাগুলিতে এবং বিহার ছোট-নাগপুরের সাঁওতাল পরগণা, ধানবাদ, সিংভূম জেলার অংশ-বিশেষে ও পূর্ব পূর্ণিয়ায়ও বাংলা ভাষা প্রচলিত। সুতরাং অগণিত লোকের মাতৃ-ভাষা এই বাংলা ভাষা।

লোকসংখ্যা ধরিলে মাতৃ-ভাষা হিসাবে বাংলা পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে। উত্তর চৈনিক, ইংরেজী, রুশীয়, স্পেনীয়, জর্মন ও জাপানী ভাষার পরেই বাংলা ভাষার স্থান। ভারত ও বাংলাদেশে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের মাতৃ-ভাষা। বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা, ত্রিপুরা রাজ্যের ও আসামের কাছার জেলার সরকারি ভাষা। ভারতবর্ষে মোট ২২৫টি ভাষা প্রচলিত, তন্মধ্যে হিন্দুস্থানীর প্রসার সব চেয়ে বেশী, কিন্তু যাহাদের মাতৃ-ভাষা হিন্দুস্থানী এরূপ লোকের সংখ্যা বাঙালীর চেয়ে কম।

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে সকল সাংকেতিক ধ্বনি উচ্চারণ করি তাহাকে **ভাষা** বলে।

আমরা বাঙালী জাতি যে বিশেষ কৌশলের ভিতর দিয়া ধ্বনিময় সংকেতের দ্বারা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি, তাহাই **বাংলা ভাষা**।

বঙ্গলিপি। ভারতবর্ষে অন্ততঃ কুড়িটি লিপিমালা ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে নাগরী লিপি অধিক লোকে ব্যবহার করে। তাহার পরই বাংলা, তামিল, তেলেগু লিপির স্থান। বাংলা ভাষা ব্যতীত আসামী ও মণিপুরী ভাষায়ও বঙ্গলিপি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বঙ্গভাষার চেয়ে বঙ্গলিপির পরিসরক্ষেত্র প্রশস্ততর।

বাংলা ভাষার রীতিভেদ—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কথাবার্তার ভাষার নাম 'মৌখিক বা কথ্য ভাষা', সাহিত্যে প্রচলিত ভাষার নাম 'লৈখিক ভাষা'। বাংলা লৈখিক ভাষার দুই রূপ—**সাধু ও চলিত**।

বাংলা মৌখিক ভাষা বা উপভাষা অঞ্চল-ভেদে বহুবিধ এবং একটির সঙ্গে অপরটির পার্থক্যও যথেষ্ট। এই পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সর্বজনবোধ্য বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা বঙ্গভাষী সকল অঞ্চলের লোকই বুঝিতে পারে এবং লিখিতে পারে। ইহাই বাংলা **সাধুভাষা** (বা Standard Literary Language)। দীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে সাধুভাষাই লেখার একমাত্র বাহন ছিল। এই ভাষায় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বহু গ্রন্থ পদ্যে রচিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এই ভাষায় সকল প্রকার গদ্য-সাহিত্যও রচিত হইতে থাকে এবং এক শত বৎসরের মধ্যে

এক বিশাল ও সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য এই ভাষায় সৃষ্ট হইয়াছে। কেবল গ্রন্থ রচনা নয়, তখন হইতে সংবাদপত্র, চিঠিপত্র, দলিলপত্র প্রভৃতি সমস্তই উভয় বঙ্গে সাধু ভাষায় লিখিত হইয়া আসিতেছে। ইহা সমগ্র বাঙালীর জাতীয় সম্পদ্। বর্তমানে সাধুভাষা কোন বাংলাভাষী অঞ্চলের কথ্য ভাষা নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সাধুভাষার পাশাপাশি চলিত ভাষায় বই লেখা শুরু হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতেই ইহার প্রসার ও প্রভাব দ্রুত বাড়িয়াছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের এবং রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র হওয়ায় কলিকাতা ও ভাগীরথী অঞ্চলের মৌখিক ভাষার ওপর ভিত্তি করিয়া সাহিত্যিক ভাষারূপে **চলিত ভাষা** গড়িয়া ওঠে। কলিকাতা বাঙালী জাতির সর্ববিধ কর্মকেন্দ্র ও ভাবকেন্দ্র হওয়ায় সকল অঞ্চলের বাঙালীদের এখানে আগমন ও অবস্থিতি ঘটে। সমগ্র বাঙালীজাতির মিলিত স্পর্শে চলিত ভাষা প্রাণবন্ত হইয়া সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় চলিত ভাষা 'বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা।' ইহাই বাংলা ভাষার Standard Colloquial Language। তবে বাংলা সাধু ও চলিত ভাষার অধিকাংশ বিখ্যাত লেখক এই অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া এই অঞ্চলের প্রভাব এই দুই ভাষা-রীতিতেই পড়িয়াছে।

সাধুভাষার পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে সর্বালংকার-ভূষিতা শক্তিশালিনী করিয়া তোলেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে ইহা সৌন্দর্যে সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠে। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাধুভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক। ইঁহাদের প্রত্যেকেই সাধুভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে এক-একটি আলোকস্তম্ভ। প্রত্যেকের ভাষারই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সাধুভাষার রীতিতে লিখিত হইলেও উহাকে চলিত ভাষার নিকটতর বলা চলে।

সাধুভাষার অন্যান্য শক্তিশালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের নাম স্মরণীয়।

চলিত ভাষায় গত শতাব্দীতে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিছু সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলিত ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করায় ইহার অতি দ্রুত প্রসার ঘটে। চলিত ভাষার প্রসারে প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের দান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ প্রায় সকলেই চলিত ভাষাতে লিখিয়া থাকেন।

সাধু ভাষায় সর্বজনবোধ্য সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের প্রয়োগ বেশি। ইহাতে ক্রিয়াপদ, সর্বনাম প্রভৃতির রূপগুলি মৌখিক ভাষার রূপ অপেক্ষা পূর্ণতর এবং ইহাদের মূলস্থানীয়। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদে সাধু ও চলিত রূপের পার্থক্য স্পষ্ট। যেমন—(সাধু) করিয়াছি > (চলিত) করেছি, করিলাম > করলাম, করলেম, করিত > করত, করিব > করব, হইল > হল, হইতেছিল > হচ্ছিল, হইতে থাকিবেন > হতে থাকবেন, খাইতেছিলাম > খাচ্ছিলাম, করিবার > করবার, খাইয়া > খেয়ে, বলিতে > বলতে ইত্যাদি। **সর্বনাম পদেও পার্থক্য আছে—তাহারা > তারা, যাহার >**

যায়, তাহাকে>তাকে, উহাকে>ওকে, কাহাকে>কাকে ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, চলিত ভাষা সর্বদাই নূতন নূতন ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মকে মানিয়া চলে ; ফলে সাধু ভাষা অপেক্ষা চলিত ভাষায় শব্দের রূপান্তর অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। চলিত ভাষার উপর স্বর-সঙ্গতি, অভিশ্রুতি প্রভৃতি নিয়মের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যথা—সূতা>সুতো, উনান>উনন, উনুন, কূয়া>কূয়ো, সঁপিয়া>সঁপে, গাছুয়া> গেছো, পানিহাটী>পেনেটী, নাই>নেই, বিলাতী>বিলিতি, করিয়া>করে, আসিও>এসো ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া, সাধু ভাষায় বাক্য-গঠন-রীতি বা পদবিন্যাস নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। আবার চলিত ভাষারও এ বিষয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা সুষ্ঠু আয়ত্ত না হইলে লেখায় ত্রুটি ঘটে। সাধুভাষায় বিশেষভাবে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদগুলি প্রাচীন বাংলার রূপ, উহা এখন মৌখিক ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না বলিলেই চলে। সাধুভাষা গম্ভীর, চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত গতিশীল। সাধুভাষার একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য ও সৌন্দর্য আছে। আবার চলিত ভাষার সাবলীল গতি-স্বাচ্ছন্দ্য সাধু ভাষায় সুলভ নয়। সাধু ভাষায় সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের প্রয়োগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে চলিত ভাষায় উহা বাড়িয়াছে। বর্তমানে চলিত ভাষার প্রসার ক্রমবর্ধমান।

রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ বর্জনীয়।

নিম্নে আমরা সাধু ও চলিত ভাষার কয়েকটি নমুনা দিতেছি।

সাধু ভাষা—রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস, ইহাদিগকে সহস্র স্বর্ণ পুরস্কার দাও। তাহারা শ্রবণমাত্র বিনয়নম্র বচনে কহিল, মহারাজ! আমরা বনবাসী, বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি, যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলমাত্র আহার ও বল্কলমাত্র পরিধান করিয়া কাল যাপন করি, আমাদের স্বর্ণে প্রয়োজন কি? —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দ অনুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দর ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা-রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য-মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রমণীটি কলসীতে জল ভরিতেছিলেন, হঠাৎ কেমন করিয়া সে জলের ছিটা রাণীর গায়ে লাগিল ; অমনি পরিচারিকা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়? যাহার একগাছা শাঁখাও জোটে না, হাতে একটা সূতা বাঁধা, সে কিনা রাণীর গায়ে জল ছিটাইয়া দেয়?' তখন সেই ব্রাহ্মণ-গৃহিণী, কলসী তুলিতে তুলিতে অতিশয় ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হাঁ, একটা লাল সূতাই বটে, কিন্তু ঐ সূতা যখন এই হাতে আর থাকিবে না, তখন নবদ্বীপ অন্ধকার হইয়া যাইবে।'

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

চলিত ভাষা—এই তো পায়ে চলার পথ। এই পথে কত মানুষ, কেউ বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ বা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কারো বা ঘোমটা আছে, কারো বা নেই; কেউ বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"রমেশ, চুলোয় যাক গে তোদের জাত-বিচারের, ভালমন্দ ঝগড়া-ঝাটি, বাবা; শুধু আলো জেলে দে রে, শুধু আলো জেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায় করে দে বাবা।"
—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাষা-রীতি পরিবর্তন। সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় এবং চলিত ভাষাকে সাধুভাষায় পরিবর্তিত করিতে হইলে প্রধানতঃ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলির এবং কিছু কিছু শব্দেরও পরিবর্তন করিতে হয়। সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় পরিবর্তিত করিতে হইলে উক্ত পরিবর্তন ছাড়া প্রয়োজনমত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদগুলি ভাঙ্গিয়া কঠিন শব্দগুলি সহজ করা ভাল।

দৃষ্টান্ত : চলিত। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন, বাছা, এদেরকে হাজার স্বর্ণ পুরস্কার দাও। তারা শোনামাত্র বিনীত ভাষায় বল্‌ল, মহারাজ, আমরা বনবাসী, বিলাসী বা ভোগী নই; সহজে যে ফলমূল পাই তাই খাই, বাকল পরে দিন কাটাই, আমাদের স্বর্ণে কাজ কি?
(সাধু ভাষার রচনা ৩ পৃষ্ঠায়)

সাধু। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন?" ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি সাদর ও সস্নেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইতেছিলেন, তাহা দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই?"
—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

চলিত। তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঐ মেয়েছেলেটি জিজ্ঞেস করলেন, "বাবাঠাকুর, দাঁড়িয়ে আছ কেন?" ঠাকুরদাস তেষ্টার কথা বলে জল চাইলেন। তিনি আদর করে স্নেহের স্বরে ঠাকুরদাসকে বসতে বল্‌লেন এবং কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হয়ে মুড়কিগুলো খাচ্ছিলেন, তা দেখে ঐ মেয়েছেলেটি জিজ্ঞেস করলেন, "বাবাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নি?"

সাধু। রোগ সময় পাইল। জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত, বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহার চিকিৎসা করে না। কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ তোলে না; অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনি আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়ন করে।
—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চলিত। রোগ সময় পেল। জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত, বিশেষ করে বসন্তের বড় বাড়বাড়ন্ত হল। ঘরে ঘরে বসন্তে মরতে লাগল। কে কাকে ল দেয়, কে কাকে

ছোঁয়? কেউ কারো চিকিৎসা করে না। কেউ কাকেও দেখে না। মরলে কেউ তোলে না। অতি সুন্দর শরীর অট্টালিকা মধ্যে আপনি আপনি পচে। যে ঘরে একবার বসন্ত ঢুকে, সে ঘরের লোকেরা রোগী ফেলে ভয়ে পালায়।

সাধু। উচ্চৈঃস্বরে অনন্তদেব বলিলেন, "বিশ্বামিত্র এত তপস্যা কর নাই যে পৃথিবী ধারণ করিবে। কখনও কি সাধুসঙ্গ করিয়াছ? তাহার ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এক মুহূর্ত বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছি।" অনন্তদেব বলিলেন, "তবে সেই ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমি সেই ফল অর্পণ করিতেছি।" ধীরে ধীরে পৃথিবী স্থির হইল। —শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

চলিত। উচ্চ স্বরে অনন্তদেব বললেন, "বিশ্বামিত্র, এত তপস্যা কর নি যে পৃথিবী ধারণ করবে। কখনও কি সাধুসঙ্গ করেছ? তার ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বললেন, "এক মুহূর্ত বশিষ্ঠের সঙ্গ করেছি।" অনন্তদেব বললেন, "তবে সেই ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বললেন, "আমি সেই ফল অর্পণ করছি।" ধীরে ধীরে পৃথিবী স্থির হল।

চলিত। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না। এক ঝাঁপটায় জয়মলকে দশ হাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি ছুরির ঘায়ে তাঁর সব আস্পর্ধা শেষ করে দিলেন। —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধু। তারাবাই সামান্য রমণী ছিলেন না। তিনি এক ঝাঁপটায় জয়মলকে দশ হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া একেবারে বাঘিনীর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একটি ছুরির আঘাতে তাঁহার সকল আস্পর্ধা শেষ করিয়া দিলেন।

চলিত। বিদ্যাসাগর হাসলেন। বল্লেন, 'আমি সিদ্ধ? কই আমি তো সাধন ভজন করি না কিছু?' 'নাই বা করলে? আলু পটল সিদ্ধ হলে কি হয়?' গভীর চোখে তাকালেন ঠাকুর, 'নরম হয়।' 'তুমিও তেমনি নরম হয়েছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে।' —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাধু। বিদ্যাসাগর হাসিলেন। বলিলেন, 'আমি সিদ্ধ? কোথায়, আমি তো সাধন ভজন কিছু করি না?' 'নাই বা করিলে? আলু পটল সিদ্ধ হইলে কি হয়?' গভীর চোখে তাকাইলেন ঠাকুর, 'নরম হয়।' 'তুমিও তেমনি নরম হইয়াছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে।'

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম মুদ্রিত ব্যাকরণ। পোর্তুগীজ পাদ্রী **মনো-এল দা-আসসুম্পসাম্**-রচিত বাংলা ব্যাকরণই বাংলা ভাষার **প্রথম ব্যাকরণ**। ইহা ১৭৩৪ সালে রচিত হইয়া ১৭৪৩ সালে পোর্তুগাল দেশের রাজধানী লিস্‌বন নগরে রোমান অক্ষরে ছাপা হয়। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ **নাথানিএল ব্র্যাসি হালহেড** সাহেবের। ইহা ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কেরি সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ সালে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ব্যাকরণ ১৮১৬ সালে, কীথ সাহেবের ব্যাকরণ ১৮২০ সালে রচিত হয়। ১৮২৬ সালে **রাজা রামমোহন রায়** কর্তৃক প্রণীত এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায়ের **গৌড়ীয় ব্যাকরণ** বাংলা ভাষায় কলিকাতা 'স্কুল বুক সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষার বয়স ও বাংলা সাহিত্য। বাংলা ভাষার বয়স প্রায় হাজার বছর হইবে। ইহার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ 'চর্যাপদ'গুলিতে। ইহারা খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা। বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে ষোড়শ শতকে। তখন উহা পদ্য-সাহিত্য। উনবিংশ শতকেই বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের পদ্য ও গদ্য উভয় শাখারই জয়যাত্রা শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গ-সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে।

অনুশীলন

১। সাধুভাষা ও চলিত ভাষা কাহাকে বলে? কয়েকটি বাক্যের দৃষ্টান্ত সহযোগে উহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। স্কু. ফা. কম্পার্ট, '৬১।

২। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্দেশ কর। স্কু. ফা, '৬৫

৩। চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর—শিখিয়াছিলাম, করিতে পারিব, কাঁদিতে কাঁদিতে, হাটিতে হাটিতে, যাইতেছিল, পড়িয়া গেল, সহ্য হয় না, তাহাদের দেখাইতে লাগিলেন।

৪। সাধু ভাষায় রূপান্তরিত কর—

(ক) ছুটাপুটি করে কেন বেড়াও? যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়। যত ইচ্ছে নিচু খাও।

(খ) দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলি বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করলে…জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয়…পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না, তার পাথেয় কম পড়ে গেল। —রবীন্দ্রনাথ

(গ) ভায়া, সব যায়, এই পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হামবড়া, আর কেউ বড় হবে না।…যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের 'ছুৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না'।…যে দেশের মাথাগুলো আজ দু'হাজার বৎসর খালি বিচার করছে, ডান হাতে খাব কি বাঁ হাতে, ডান দিক থেকে জল নেব কি বাঁ দিক থেকে, তাদের অধোগতি হবে না ত কার হবে? —স্বামী বিবেকানন্দ

(ঘ) যাও বীর, তোমায় বন্দী করব না। আমি পরীক্ষা কচ্ছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার করবে। তুমি দুর্জয় দিগ্বিজয়ী হবে। —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৫। চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া লিখ :—

(ক) ওগো, কে হতভাগ্য, সমস্ত রাত্রি সখার ভবনের বাহিরে কাটাইয়াছ? ওগো, কে তুমি সেই রুদ্ধদ্বারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ? তোমার নয়নে কেন জল নাই? ওরে দুঃখী, তোর হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, তবু তোর নয়নে জল রহিল না?…ওরে তৃষিত, একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া দেখিবি, কত শান্তি? দুঃখী হইতে দুঃখী তুই, একদিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিলি না? আজ তোকে কাঁদাইব। —রাবেয়ার প্রার্থনা

(খ) রাম এতক্ষণ বিষম সংশয়ে কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সীতা পরিগ্রহ বিষয়ে সর্বসাধারণের সম্মতি নাই। এজন্য তিনি, নিতান্ত ম্লানবদন ও ম্রিয়মাণ প্রায় হইয়া, হতবুদ্ধির ন্যায় স্থির নয়নে বাল্মীকির মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি, অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া, উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৬। ঠিক ভাষায় রূপান্তরিত কর :—প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করিলেন, 'আপনি কে? কেন আমাকে ত্যাগ করিয়া যাচ্ছেন।' দেবী বললেন, 'প্রহ্লাদ, আমি শ্রী (লক্ষ্মী)। আমি এতদিন পরম সুখে তোমার কাছে বাস করিতেছিলাম, আর থাকিতে পারলাম না। ঐ যে ব্রাহ্মণ শিষ্যরূপে এখানে এসেছিলেন, উনি ইন্দ্র। তুমি চরিত্রবলে ইন্দ্রিয় জয় করেছ জেনে, ইন্দ্র কৌশল করে তোমার চরিত্র অপহরণ করিয়াছেন। চরিত্র দান করে তুমি সকলই হারাইলে।'

শব্দের অর্থ পরিবর্তন

ভাষা যেন বহতা নদী—নদীর দিক্ পরিবর্তন ও গতি পরিবর্তনের মত ভাষারও নানা পরিবর্তন ঘটে। বহু ব্যবহারের ফলে একই ভাষার মধ্যে ঘটে নানা রূপান্তর। এই রূপান্তর যেমন ঘটে ধ্বনির ক্ষেত্রে, তেমনি ঘটে অর্থের ক্ষেত্রেও। বাংলাভাষা তার অবারিত বক্ষপটে স্থান দিয়েছে দেশী-বিদেশীর বহু শব্দকে। এই বিচিত্র শব্দমালায় পরবর্তীকালে বহু পরিবর্তন ঘটেছে অর্থের দিক দিয়ে—নদীস্রোতের মতই শব্দার্থের প্রসারণ বা সঙ্কোচন হয়েছে। শব্দার্থের এই পরিবর্তনকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়।

১। শব্দের অর্থবিস্তার, ২। শব্দের অর্থসঙ্কোচ, ৩। শব্দের উৎকর্ষ, ৪। শব্দের অপকর্ষ, ৫। শব্দার্থের রূপান্তর।

১। শব্দের অর্থবিস্তার :

শব্দার্থ অনেক সময় মূল সঙ্কুচিত অর্থ পরিত্যাগ করে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন গাঙ অর্থ গঙ্গা, এখন যে কোন নদীকেই গাঙ বলা হয়।

দৃষ্টান্ত :

শব্দ	মূল অর্থ	শব্দের অর্থবিস্তার
তেল	তিল থেকে জাত	তিল, সরষে, বাদাম, নারকেল প্রভৃতির নির্যাস
ফলার	ফল মিশ্রিত আহার	যে কোন ভোজ
কালি	কালো রঙ	লেখার জন্য যে কোন রঙের তরল পদার্থ
মৌন	মুনির ভাব	নীরবতা
সাগর	সগর বংশীয়	সমুদ্র
নগর	শৈলশিখরের জনপদ	শহর

২। শব্দের অর্থসঙ্কোচ :

শব্দার্থ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থ পরিত্যাগ করে সঙ্কুচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—পঙ্কজ অর্থ পঙ্কে যা জন্মে, কিন্তু কেবল পদ্মকেই পঙ্কজ বলা হয়।

দৃষ্টান্ত :

শব্দ	আদি অর্থ	প্রচলিত সঙ্কুচিত অর্থ
শুশ্রূষা	শোনার ইচ্ছা	সেবা
পাণিগ্রহণ	হস্তধারণ	বিবাহ
করী	কর আছে যার	হাতী
অন্ন	যে কোন খাদ্য	ভাত
সন্দেশ	সংবাদ	একপ্রকার মিষ্টি

শব্দ	আদি অর্থ	প্রচলিত সঙ্কুচিত অর্থ
সরোজ	যা সরোবরে জন্মে	পদ্ম
শ্বশুর	যিনি শীঘ্র খান	স্বামী বা স্ত্রীর পিতা
জলদ	জল দান করে যে	মেঘ
মৃগ	পশু	হরিণ
সন্তান	বিস্তারকারী	পুত্র বা কন্যা
ঘাস	খাদ্য	তৃণ
সম্বন্ধী	যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে	স্ত্রীর বড় ভাই
তপন	তপ্তকারী	সূর্য
সন্ধ্যা	দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ	সায়ংকাল
গবাক্ষ	গরুর চোখের মত ক্ষুদ্র বায়ুপথ	জানালা
রক্ত	রঞ্জিত	শোণিত
অদৃষ্ট	অদেখা	ভাগ্য
ভুজঙ্গ	হাতে ভর দিয়ে ভ্রমণকারী	সাপ
গোধূলি	গরুর ক্ষুরে উৎক্ষেপিত ধূলি	সন্ধ্যা
অমৃত	যা মৃত নয়	স্বর্গীয় পানীয়

৩। শব্দার্থের উৎকর্ষ ঃ

বাংলাভাষার বহু শব্দ মূল অর্থ বর্জন করে উন্নত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন দুহিতা অর্থ দোহনকারিণী, বর্তমানে দুহিতা অর্থ কন্যা, অথবা অর্থ সম্পূর্ণ ভুল—সম্যক্রূপে ভ্রান্ত—কিন্তু বর্তমান প্রচলিত অর্থ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি।

দৃষ্টান্ত ঃ

শব্দ	আদি অর্থ	প্রচলিত অর্থ
গবেষণা	গরুর অন্বেষণ	কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান
মন্দির	গৃহ	দেবালয়
দ্বিজ	দুবার জাত	ব্রাহ্মণ
মার্জনা	মাজা	ক্ষমা
সৌধ	চুনকাম করা গৃহ	অট্টালিকা, প্রাসাদ
ধর্ম	যা ধারণ করে	ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ব
ধ্যান	চিন্তা	ঈশ্বর চিন্তা
সাহস	হঠকারিতা	ভয়শূন্যতা

৪। শব্দার্থের অপকর্ষ ঃ

অনেক শব্দ মূল উন্নততর অর্থ পরিত্যাগ করে নিম্নতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন মহাজন অর্থ মহৎ ব্যক্তি কিন্তু বর্তমানে সুদখোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্বাচীন অর্থ নবীন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিকে সাধারণত ইতর বলা হয়।

দৃষ্টান্ত :

শব্দ	আদি অর্থ	প্রচলিত অর্থ
ঝি	মেয়ে	দাসী
নাগর	নগরবাসী	অবৈধ প্রণয়ী
রাগ	ভালোবাসা	ক্রোধ
ভূত	অতীত	প্রেত
বাড়ন্ত	যা বাড়ছে	নিঃশেষিত
কেচ্ছা (আরবী কিস্‌সা)	কাহিনী	কুৎসা
ঠাকুর	দেবতা, সম্মানিত ব্যক্তি	পাচক
চামার	চর্ম ব্যবসায়ী	নীচ ব্যক্তি

৫। শব্দার্থের রূপান্তর ঃ

শব্দের অর্থ অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন গৌরচন্দ্রিকা অর্থ গৌরাঙ্গ বিষয়ক, কিন্তু বর্তমান অর্থ ভূমিকা, অভাব অর্থ ভাবহীনতা কিন্তু বর্তমান অর্থ অনটন।

দৃষ্টান্ত ঃ

শব্দ	আদি অর্থ	রূপান্তরিত অর্থ
ঘর্ম	গরম	স্বেদ
বিষম	অসম	কঠিন
কৃপণ	কৃপার পাত্র	ব্যয়কুণ্ঠ
পাষণ্ড	ধর্ম সম্প্রদায়	নিষ্ঠুর ব্যক্তি
সচরাচর	চরাচর সহ	সাধারণতঃ
সহসা	সবলে	হঠাৎ
গ্রাম	সমূহ	পল্লী
হরিণ	যে হরণ করে	মৃগ
শ্রাদ্ধ	শ্রদ্ধা জানান	পারলৌকিক
মন্বন্তর	মনুর অন্তর	দুর্ভিক্ষ
সমাচার	উপযুক্ত আচরণ	সংবাদ
দরিয়া	নদী	সমুদ্র

অনুশীলনী

১। শব্দার্থের পরিবর্তন কতভাবে হয় উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও।

২। নিচের দৃষ্টান্তগুলিতে কোন রীতিতে শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়েছে নির্দেশ কর (আদি ও রূপান্তরিত অর্থ সহ)।

সন্দেশ, দরিয়া, অবজ্ঞা; গ্রাম, তৈল, মহাজন, মন্দির, দন্ত, গবাক্ষ, আহ্নিক, মৃগ, সচরাচর, শ্বশুর, দুহিতা, তপন, ভুজঙ্গ, ঘাস, ঘর্ম, কেচ্ছা, ঠাকুর, সহসা, হরিণ, মন্বন্তর, চামার, শ্রাদ্ধ, সমাচার, কুঠার, মৌন, সাগর, নগর, জলদ, রক্ত, ফলার, সন্তান, খাজনা, সৌধ, ধ্যান, ঝি, নাগর, সম্বন্ধী, সরোজ, পঙ্কজ, গবেষণা।

যে শাস্ত্র কোন ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেই ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে শিখায়, তাহা সেই ভাষার **ব্যাকরণ**।

যে শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিলে বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে পড়িতে, লিখিতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম **বাংলা ব্যাকরণ**।

উহা চারি ভাগে বিভক্ত—(১) বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ, (২) পদ ও শব্দ-প্রকরণ, (৩) বাক্য-প্রকরণ, (৪) ছন্দ ও অলঙ্কার-প্রকরণ।

বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ

১। **বর্ণ**। আমরা কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি, আবার লিখিয়াও পারি। মনের ভাব লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল চিহ্ন বা সংকেত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে **বর্ণ** বলে। ভাষায় ব্যবহৃত ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-প্রকাশক চিহ্নের নামই **বর্ণ**। বাংলা ভাষায় সাতচল্লিশটি বর্ণ আছে। ইহাদিগের সমষ্টিকে **বর্ণমালা** (the Alphabet) বলে। বর্ণের আর এক নাম অক্ষর।

বর্ণ-বিভাগ

২। **স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ**। বর্ণসমূহ দ্বিবিধ—**স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ**।

যে সকল ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং পূর্ণরূপে স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে **স্বরধ্বনি** বলে। স্বরধ্বনি-প্রকাশক চিহ্ন বা বর্ণকে **স্বরবর্ণ** বলে। স্বরবর্ণ এগারটি—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। সংস্কৃতের দীর্ঘ ৠ ও ঌ (লি) বাংলায় চলে না।

স্বর দ্বিবিধ—**হ্রস্ব ও দীর্ঘ**। অ, ই, উ, ঋ—এই চারিটি হ্রস্ব স্বর ;
আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই সাতটি দীর্ঘ স্বর।

বাংলা উচ্চারণে স্বরধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘের অভেদই চলিত রীতি(অনু.৭,পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য)।

৩। **ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ**। যে সকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদের নাম **ব্যঞ্জনধ্বনি**। ব্যঞ্জনধ্বনি-প্রকাশক চিহ্ন বা বর্ণকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ ছত্রিশটি—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্, ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্, প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্, য্ র্ ল্ ব্, শ্ ষ্ স্ হ্, ং ঃ ঁ। ড়, ঢ়, য়, যথাক্রমে ড, ঢ, য-এর রূপান্তর হইলেও ইহাদিগকে বাংলায় স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

৪। **ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণী-বিভাগ**—ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** বলে। জিহ্বার অগ্র, মধ্য বা মূলদ্বারা কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া

উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা স্পর্শবর্ণ (stop)। স্পর্শবর্ণগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্—**কবর্গ** বা **কণ্ঠ্য বর্ণ**।
চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্—**চবর্গ** বা **তালব্য বর্ণ**।
ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্—**টবর্গ** বা **মূর্ধন্য বর্ণ**।
ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্—**তবর্গ** বা **দন্ত্য বর্ণ**।
প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্—**পবর্গ** বা **ওষ্ঠ্য বর্ণ**।

এই এক-একটি ভাগকে এক-একটি **বর্গ** বলা হয় এবং এই পঁচিশটি বর্ণকে **বর্গীয় বর্ণ** Classified বলে। ইহা ছাড়া, অন্যান্য বর্ণ অ-বর্গীয় (Unclassified)।

ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্—উচ্চারণকালে মুখের বায়ু মুখ ও নাসিকা উভয়ের মধ্য দিয়া বাহির হয় বলিয়া এই পাঁচটিকে **নাসিক্য বর্ণ** বা **অনুনাসিক বর্ণ** (Nasal) বলা হয়।

য্ র্ ল্ ব্—ইহাদের উচ্চারণ স্বরবর্ণ ও স্পর্শবর্ণের মধ্যবর্তী বলিয়া এই চারিটির নাম **অন্তঃস্থ বর্ণ**। ইহাদের ভিতর য্ ব্-কে **অর্ধস্বর** (Semi-vowel) এবং র্ ল্-কে **তরল স্বর** (Liquids) বলে।

শ ষ্ স্ হ্—উচ্চারণে বায়ুর প্রাধান্য আছে বলিয়া এই চারিটিকে **উষ্মবর্ণ** (Breathed বা Spirant) বলে। শিশ্ দেওয়ার ধ্বনির সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্ ষ্ স্-কে **শিশ্ ধ্বনি** (Sibilant) বলে।

ং ঃ—অনুস্বার ও বিসর্গকে **অযোগবাহ বর্ণ** বলে।

ব্যাকরণে বর্গ গণনার মধ্যে ইহাদিগের যোগ বা উল্লেখ নাই বলিয়া ইহারা অযোগ এবং ষত্ব ণত্ব প্রভৃতি কার্য নির্বাহ করে বলিয়া বাহ; এই কারণে অযোগবাহ নাম হইয়াছে। ঁ (চন্দ্রবিন্দু) অনুনাসিক ধ্বনির চিহ্ন।

বর্ণসমূহের অপরবিধ বিভাগও প্রচলিত আছে।—

(ক) ঘোষবর্ণ বা **নাদবর্ণ** ও **অঘোষবর্ণ** বা **শ্বাসবর্ণ**। উচ্চারণে কণ্ঠস্বর মৃদু ও গাম্ভীর্যহীন বলিয়া বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং স—**অঘোষবর্ণ** (Voiceless বা Unvoiced) বা **শ্বাসবর্ণ** (Breathed Sounds বা Hard Sounds)। যথা—ক্ খ্ চ্ ছ্ ট্ ঠ্ ত্ থ্ প্ ফ্ এবং স্। কিন্তু বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্ হ্—এইগুলির উচ্চারণে কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর বলিয়া ইহাদিগকে **ঘোষবর্ণ** (Voiced Sounds) বা **নাদবর্ণ** (Soft Sounds) বলে। যথা—গ্ ঘ্ ঙ্, জ্ ঝ্ ঞ্, ড্ ঢ্ ণ্, দ্ ধ্ ন্, ব্ ভ্ ম্, য্ র্ ল্ ব্ হ্।

(খ) মহাপ্রাণ বর্ণ ও **অল্পপ্রাণ বর্ণ**। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের সহিত প্রাণ অর্থাৎ নিঃশ্বাস (হ্ জাতীয় ধ্বনি) যুক্ত হইয়া যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ উচ্চারিত হয় (যথা—ক্+হ্=খ, গ্+হ্=ঘ)। এইজন্য বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে **মহাপ্রাণ** (Aspirate) **বর্ণ** বলে। যথা—খ্ ঘ্ ছ্ ঝ্ ঠ্ ঢ্ থ্ ধ্ ফ্ ভ্। আর এই প্রাণ নাই বলিয়া বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণকে **অল্পপ্রাণ** (Unaspirated) **বর্ণ** বলা হয়। যথা—ক্, গ্, চ্ জ্, ট্ ড্, ত্ দ্, প্ ব্।

৫। বর্ণসংযোগ (১) বানান। ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে যোগ করাকে বানান বলে। ক্+অ=ক, ক্+আ=কা, ক্+ই=কি, ক্+ঈ=কী।

অ-কার যুক্ত হইলে বর্ণের আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না, কেবল অ-কার সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের হলন্ত চিহ্নটি উঠিয়া যায়।

স্বরবর্ণহীন ব্যঞ্জনবর্ণকে সাংকেতিক ভাষায় বলা হয় **হল্** বা **হস্** বর্ণ। সেইজন্য ব্যঞ্জনান্ত শব্দকে **হলন্ত** বা **হসন্ত** শব্দও বলা হয়। এইসব শব্দের অন্ত্য বর্ণের নীচে (্) এইরূপ একটি চিহ্ন দিতে হয়। যেমন—ঋক্, ধিক্, বণিক্, সম্রাট্, বিপদ্, মহৎ (ৎ=ত্)। অনেক সময় ভ্রান্তিবশতঃ এই চিহ্নটাকে 'হসন্ত' বলা হয়। কিন্তু এইরূপ বলা ঠিক নয়। কারণ দিক্, বণিক্ প্রভৃতি শব্দই হসন্ত, চিহ্নটা নয়। কোনো কোনো শব্দের মধ্যেও হস্‌বর্ণ থাকে। যেমন—রুগ্‌ণ, প্রগল্‌ভ, দিক্‌পাল, চিৎকার, চুট্‌কি। এইসব শব্দকে বলিতে হয় হস্‌মধ্য শব্দ, হসন্ত নয়।

(২) সংযুক্ত বর্ণ। দুই বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র মিলিত হইলে তাহাদিগকে **সংযুক্ত বর্ণ** বলে। যথা—ক্ক, ক্ত, ক্ষ, ঙ্গ, দ্ধ।

ক্ষ (ক্+ষ) ও হ্ম (হ্+ম), ক্র (ক্+র) ও ত্রু (ত্+র্+উ), স্ক (স্+ক) ও ক্স (ক্+স), গ্ম (গ্+ম) ও জ্ঞ (জ্+ঞ), হ্ণ (হ্+ণ) ও হ্ন (হ্+ন্)—এই যুক্তবর্ণগুলির ব্যবহারে সতর্ক হইবে।

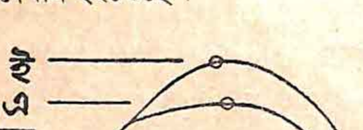
(৩) ফলা। ন, ম, য, র, ল, ব—এই ছয়টি অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হইলে ইহাদিগকে **ফলা** বলে। র ব্যঞ্জনবর্ণের আদিতে থাকিলেও ফলা হয়। তখন ইহাকে **রেফ্** (´) বলে।

৫ক। বর্ণ-বিন্যাস। সংযুক্ত বর্ণগুলি যথাক্রমে পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করার নাম বর্ণ-বিন্যাস। যথা—গঙ্গা=গ্+অ+ঙ্+গ+আ। স্কুল=স্+ক্+উ+ল্।

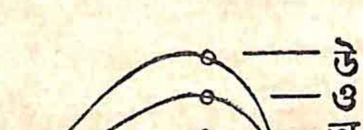
ব্রাহ্মণ=ব+র্+আ+হ্+ম্+অ+ণ+অ।

বর্ণের উচ্চারণ-বিধি

৬। সাধু বাংলা ও চলিত বাংলায় আজকাল সাতটি স্বরধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। যথা—অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। প্রাদেশিক বাংলায় আর একটি বিকৃত 'আ' ধ্বনি দেখা যায়। এই আটটি **স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান** লক্ষ্য করিয়া ইহাদের দুই রকমের অবস্থান দেখান হইতেছে।



জিহ্বা সম্মুখের দিকে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি



জিহ্বা পশ্চাতে আকর্ষণ করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি

এই চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ই (ঈ), এ, অ্যা এবং আ জিহ্বাকে দন্তের দিকে সম্মুখে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি; সুতরাং এগুলিকে **সম্মুখস্থ**

স্বরধ্বনি বলা যাইতে পারে। উ (ঊ), ও, অ, আ জিহ্বাকে পশ্চাতে কণ্ঠের দিকে আকর্ষণ করিয়া উচ্চারিত স্বরধ্বনি; এগুলিকে **পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনি** বলা হয়। সম্মুখস্থ স্বরধ্বনির ভিতরে আবার ই উচ্চস্বর, এ এবং অ্যা মধ্যস্বর এবং আ নিম্নস্বর। তেমনি পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনির মধ্যে উ উচ্চস্বর, ও এবং অ মধ্যস্বর, আ নিম্নস্বর।

৭। **স্বরের দ্বিবিধ উচ্চারণ—লঘু-গুরু, হ্রস্ব-দীর্ঘ।** উচ্চারণ-ভেদে স্বরবর্ণ দ্বিবিধ—লঘু ও গুরু। লঘু-স্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে, গুরু স্বরের উচ্চারণে তাহা অপেক্ষা বেশী সময় লাগে। দূরাহ্বান, গান ও রোদন কালে স্বর দীর্ঘতর হইলে তাহাকে **প্লুতস্বর** বলে।

(১) কোন কোন হ্রস্বস্বর লঘু এবং দীর্ঘস্বর গুরু বলিয়া গণ্য হয়। যথা—

| | | | | | | |
কত কাল পরে বল ভারত রে দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে ?

| চিহ্নিত বর্ণগুলির উচ্চারণ দীর্ঘ। এরূপ উচ্চারণ স্বাভাবিক নয়।

(২) অনেক কবিতায় সংযুক্ত বর্ণ, হল্ বর্ণ এবং অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বরও গুরু। অনেক সময় পঙ্‌ক্তির অন্তস্থিত হ্রস্বস্বরও গুরু বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—

| | | | | | | | |
'তুমি সর্ব শরণ্য বরেণ্য গতি তুমি পূর্ণ পরাৎপর—বিশ্ব গুরু।'

(৩) বাংলায় এরূপ উচ্চারণ স্বাভাবিক নয়। অনেক স্থলেই দীর্ঘস্বরের লঘু উচ্চারণ হয়। কখনো কখনো হ্রস্ব স্বরেরও গুরু উচ্চারণ থাকে। বস্তুতঃ বাংলায় কোন স্বরেরই স্বাভাবিক দীর্ঘ উচ্চারণ নাই।

সংস্কৃতে আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও ঔ সর্বদা দীর্ঘ, কিন্তু বাংলায় ইহারা হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হইয়া থাকে। আবার সংস্কৃতের হ্রস্ব স্বর অ, ই, উ, ঋ বাংলায় দীর্ঘও হয়। তবে বাংলা উচ্চারণে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। একদল (Monosyllabic, একাক্ষর) শব্দের স্বর বাংলায় সাধারণতঃ দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। যেমন—'ফল' শব্দের 'ল' বাংলায় হলন্ত, সুতরাং 'ফল' শব্দ একদল; এ ক্ষেত্রে 'ফ'-এর অ-কারের উচ্চারণ দীর্ঘ। কিন্তু 'ফলটি' একদল নয়, তাই এখানে 'ফ'-এর অ হ্রস্ব। 'এক' (অ্যাক্) শব্দের এ দীর্ঘ, কিন্তু 'একা' শব্দের এ হ্রস্ব। বাংলা ছন্দেও স্বরবর্ণের সংস্কৃতানুরূপ হ্রস্ব-দীর্ঘের নিয়ম রক্ষিত হয় না। বাংলা ছন্দে হ্রস্ব-দীর্ঘের নূতন নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছে।

৭ক। **মুক্তস্বর, রুদ্ধস্বর।** হ্রস্ব-দীর্ঘভেদে স্বর যেমন দ্বিবিধ, তেমনি **মুক্ত-রুদ্ধ-**ভেদেও উহা দুই প্রকার। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অ, ই, উ, ঋ এবং ঌ মুক্তস্বর (open vowel); আ, ঈ, ঊ, (ৠ এবং ৡ প্রয়োগ নাই), এই মুক্ত (মৌলিক) স্বরগুলির দীর্ঘ রূপ। ঌ, ৠ, ৡ বাংলায় এই তিন স্বরের ব্যবহার নাই। এ, ও এই দুইটিও মুক্তস্বর। সংস্কৃত উচ্চারণে এই দুইটিও নিত্য দীর্ঘ, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ হ্রস্ব।

দুইটি স্বর এক সঙ্গে উচ্চারিত হইলে তাহাকে বলে **রুদ্ধস্বর** (বা যৌগিক স্বর বা যুক্তস্বর, closed vowel)। যেমন—শিউলি ও কেউটে শব্দের ইউ এবং এউ

একসঙ্গে উচ্চারিত। তাই ইহারা রুদ্ধস্বর। রুদ্ধস্বরের প্রথম অংশ স্বতন্ত্র উচ্চারিত হইতে পারে, দ্বিতীয় অংশ পারে না। দ্বিতীয় স্বর প্রথমটির উপরে নির্ভর করে। তাই রুদ্ধস্বরের প্রথমাংশকে বলা যায় মূলস্বর, আর দ্বিতীয়াংশকে বলা যায় আশ্রিত স্বর।

সংস্কৃতে রুদ্ধস্বর আছে মাত্র দুইটি—ঐ (উচ্চারণ—ওই), ঔ (উচ্চারণ—ওউ)। কিন্তু বাংলায় এই দুইটি ছাড়া আরও বহু রুদ্ধ স্বর দৃষ্ট হয়। যথা—আই (যাই, খাই), আউ (লাউ), এই (খেই), এউ (ঢেউ), অই (বই), অউ (বউ) ইত্যাদি।

৮। **দল**। বাগ্‌যন্ত্রের একটিমাত্র প্রয়াসে উচ্চারিত শব্দাংশকে বলা যায় **দল** (syllable, অক্ষর বা ধ্বনি)। দল দ্বিবিধ—**মুক্ত** (open) ও **রুদ্ধ** (closed)। মুক্তস্বরান্ত দলকে বলা হয় মুক্তদল। যেমন—ক, বি, তা। আর রুদ্ধস্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত দলকে বলা হয় রুদ্ধদল। যেমন—গৈ, রিক্। 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দে দল আছে চারটি। যথা—র, বীন্, দ্র, নাথ্। র, দ্র মুক্তদল ; বীন্, নাথ্ রুদ্ধদল।

৯। **মাত্রা বা কলা** (Mora)। স্বরের উচ্চারণ-সময়কে মাত্রা বলে। মাত্রার মূল তাৎপর্য কালপরিমাণ। সাধারণতঃ হ্রস্ব স্বরে একমাত্রা এবং দীর্ঘ স্বরে দুই মাত্রা গণনা করা হইয়া থাকে।

১০। **প্রস্বর** (Accent)। শব্দের বা শব্দগুচ্ছকে উচ্চারণকালে দলবিশেষের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তাহাকে **প্রস্বর** বলে। শব্দের প্রথম দলের উপরে জোর দেওয়াই আধুনিক বাংলা ভাষার বিশিষ্ট রীতি। যেমন—´কালিদাস, ´ভারতবর্ষ, ´কয়েকদিন। প্রস্বরকে কেহ কেহ **স্বরাঘাত** বা **শ্বাসাঘাত** বলেন।

বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি, ধ্বনি-বিলোপ ইত্যাদি

স্বরবর্ণের উচ্চারণ

অ

১১। বাংলায় অ-কারের দুই প্রকার উচ্চারণ আছে—উহার একটি সহজ, অপরটি ঋ-কারের ন্যায় বিকৃত।

অ—সহজ উচ্চারণ

(১) **অ-কারের সহজ (লঘু)** উচ্চারণ (ইংরেজী rock শব্দের o-এর ন্যায়)। যথা—অনন্ত, অবশ্য, (অবোশ্‌শো) তনয়, জনম।

(ক) 'নঞ্' এই অব্যয় শব্দের রূপান্তরিত নিষেধার্থক 'অ'-এর সহজ উচ্চারণ। যথা—অনঙ্গ, অনড়, অনধিকার, অনন্য (অনোন্‌নো), অনবকাশ।

ব্যতিক্রম—নাম বুঝাইলে অতুল, অসিত, অমূল্য প্রভৃতির আদ্য-অ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। চলিত ভাষায় অসিত অমূল্যর অ'র সহজ উচ্চারণও চলে।

(খ) যে সকল শব্দের আদিতে 'সহিত' অর্থে 'স' অথবা 'সম্পূর্ণ' অর্থে 'স' বা 'সম্' আছে, সেখানকার আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ সহজ। যথা—সদল, সজল, সক্ষম, সস্ত্রীক, সবিনয়, সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ।

(গ) একাক্ষর বা একদল (mono-syllabic) শব্দের অ-এর সহজ উচ্চারণ—জল, ফল, ঘর, পথ। কিন্তু বন, মন, ব্যতিক্রম। [১১ (ছ) অনু. দ্রঃ]

(ঘ) যে সকল শব্দের প্রথম স্বর 'অ' এবং দ্বিতীয় স্বর 'অ' 'আ' সেখানে প্রথম 'অ'-এর সহজ উচ্চারণ। যথা—কলম, কথা, সকল, করা, বলা।

(ঙ) ধ্বন্যাত্মক শব্দের আদ্য অ-কারের উচ্চারণ সাধারণতঃ সহজ হয়। যথা—কচ্‌কচ্‌ বা কচ্‌কচে, থপ্‌থপ্‌, গম্‌গম্‌ ইত্যাদি।

অ—বিকৃত উচ্চারণ

(২) অ-কারের বিকৃত উচ্চারণ পূর্ণব্যক্ত ও-কারের ন্যায় প্রসারিত (ইংরেজী home শব্দের o-এর ন্যায়।)

(ক) ই (ঈ), উ (ঊ)-কার বা ই-কারান্ত বা উ-কারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ পূর্ণব্যক্ত ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা—অতি (ওতি), অসি (ওসি), অনিল (ওনিল), অমিয় (ওমিও), অতিশয় (ওতিশয়), অম্বিকা (ওম্বিকা), মণি (মোনি), পরিশ্রম (পোরিশ্রম), তনু (তোনু), অরুণ (ওরুণ), সমুদ্র (সোমুদ্‌র), মনুষ্য (মোনুষ্‌ষ), কলু (কোলু), কটু (কোটু), ক্ষণিক (খোনিক), যদু (যোদু), অগ্নি (ওগ্নি), অঙ্গুলি (ওঙ্গুলি), অগ্রিম (ওগ্রিম), করিয়া (কোরিয়া), ধরিয়া (ধোরিয়া), পড়িলে (পোড়িলে), চড়িবে (চোড়িবে), হইল (হোইল), হউন (হোউন), কহুন (কোহুন)।

অভিশ্রুতির ক্ষেত্রে ই, উ লোপ পাইলেও এই নিয়ম বলবৎ থাকে। যথা—করিয়া হইতে ক'রে (কোরে), ধরি হইতে ধ'রে (ধোরে), পড়িলে হইতে পড়লে (পোড়লে) চড়িবে হইতে চড়বে (চোড়বে), হইল হইতে হ'ল (হোলো), হউন হইতে হ'ন (হোন), কহুন হইতে ক'ন (কো'ন)।

কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া করে, ধরে প্রভৃতির অ-কার অবিকৃত থাকে। কারণ ইহাদের মধ্যে ই, উ নাই বা ছিলও না।

(খ) পরবর্তী ধ্বনিতে য-ফলা থাকিলে পূর্ববর্তী অ ও-কারের ন্যায় প্রসারিত হয়। যথা—গণ্য (গোন্‌ন), দন্ত্য (দোন্ত্য), লভ্য (লোভ্য)।

কল ও কল্য, গণ ও গণ্য, দন্ত ও দন্ত্য—এইগুলির উচ্চারণ-ভেদ লক্ষ্য কর।

কিন্তু য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের পরস্থিত অ-কারের তিন প্রকার উচ্চারণ :—

(১) সাধারণতঃ সহজ। যথা—নব্য (নোব্‌ব), ভব্য (ভোব্‌ব), অব্যয় (অব্‌বয়), বাক্য (বাক্‌ক), পাঠ্য (পাঠ্‌ঠ)।

কিন্তু কখনও প্রসারিত হয়। যথা—কাব্য (কাব্‌বো) [পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ 'কাইব্ব'] চৈতন্য (চৈতন্‌নো), আস্য (আশ্‌শো), আহার্য (আহার্‌জো), আলস্য (আলোশ্‌শো)।

(২) ব্যা-বৎ উচ্চারণ। যথা—ব্যবহার (ব্যাবহার), ব্যক্ত (ব্যাক্‌ত), ব্যথা (ব্যাথা), ব্যবস্থা (ব্যাবস্থা), ব্যয় (ব্যায়)।

(৩) এ-বৎ উচ্চারণ। যথা—ব্যক্তি (বেক্তি), ব্যতীত (বেতীত), ব্যথী (বেথী) [ই বা ঈ-র প্রভাব]।

(গ) ক্ষ বা জ্ঞ (গ্‌গঁ্য) পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী 'অ' ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা—লক্ষ (লোক্‌খ), কক্ষ (কোক্‌খ), যক্ষ (যোক্‌খ), যজ্ঞ (যোগ গঁ), দৈবজ্ঞ দোইবোগ গঁ)।

(ঘ) ঋ-ফলাযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী 'অ' ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা—বক্তৃতা (বোক্তৃতা), কর্তৃক (কোর্তৃক), ভতৃ (ভোর্তৃ), মসৃণ (মোসৃণ)।

(ঙ) র-ফলাযুক্ত বর্ণের সহিত অ যুক্ত থাকিলে তাহা ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা—ভ্রমর (ভ্রোমর), শ্রম (শ্রোম), ব্রজ (ব্রোজ), গ্রহ (গ্রোহ)।

ব্যতিক্রম—কিন্তু য় পরে থাকিলে হয় না। যথা—ক্রয়, ত্রয়।

(চ) 'প্র' এই সংযুক্ত বর্ণের পরস্থিত অ-কারের উচ্চারণ সর্বদাই পূর্ণব্যক্ত ও-কারের ন্যায় প্রসারিত [প্র=প্রো]। যথা—প্রণাম, প্রভাত, প্রশ্ন, প্রমাণ, প্রকৃত, প্রত্যেক, প্রতিমা, প্রবেশ, প্রতি, প্রহর, প্রবীণ, প্রহার, প্রলয়।

(ছ) একাক্ষর শব্দের অন্ত্য ন বা ণ-এর পূর্ববর্তী 'অ' প্রায়ই ও-কারের ন্যায় প্রসারিত। যথা—বন (বোন), মন (মোন), ক্ষণ (খোণ), ধন (ধোন), জন (জোন), পণ (পোন=পরিমাণ)। কিন্তু পণ (প্রতিজ্ঞা অর্থে), সন, রণ, গণ প্রসারিত নয়। একাক্ষরের অধিক শব্দেও ইহা খাটে না। যথা—কনক, গণক, কহেন, হয়েন। কহেন—কন, হয়েন—হন ইত্যাদি পরিবর্তিত চলিত ভাষার পদের আদ্যবর্ণের অ 'ও' হইবে না।

তুলনা। কহুন—ক'ন্, কোন্। হউন—হ'ন, হোন; কহেন—ক'ন, কন। হয়েন—হ'ন, হন। বানান একবিধ হইলেও উচ্চারণ এবং অর্থ ভিন্ন।

(জ) চলিত ভাষায় দুই অক্ষরের বিশেষণ শব্দের কতকগুলি অন্ত্য 'অ' ও-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—ছোটো, বড়ো, কতো, এতো, মতো, খাটো, কোনো, মেজো, কালো (কৃষ্ণবর্ণ), ভালো।

(ঝ) ইল (ইল), ইত (ত), ইতেছিল (ছিল), ইয়াছিল (এছিল), ইতেছে (ছে), ইয়াছ (এছ), অ (ও), ইব (ব) বিভক্তিযুক্ত সাধু বা চলিত ক্রিয়াপদের অন্ত্য 'অ' ও-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—দেখো, গেলো, দেখছো, যেতো, যাবো, করিবো, করিয়াছিলো।

রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের অনেকে এই সকল শব্দ ও-কারান্ত করিয়াও লিখিয়াছেন। যথা—মেজো জা। কোনো ছুঁতো। মন ছোটো। কতো কথা। কিন্তু উচ্চারণ-অনুরূপ বানান সর্বত্র রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

(ঞ) দীর্ঘ শব্দকে আমরা উচ্চারণের সুবিধার জন্য সাধারণতঃ দ্ব্যক্ষর সমষ্টিতে ভাঙ্গিয়া লই। এইরূপ দ্ব্যক্ষর সমষ্টির শেষ অক্ষরে অ থাকিলে তাহা বিকৃত হয়। যথা—অনবরত=অনো-বরো-তো। হতভম্ব=হতো-ভম্বো।

(ট) তিন-অক্ষরের শব্দ যেখানে বাংলায় দ্ব্যক্ষররূপে উচ্চারিত হয়, সেখানে শেষ অক্ষরে অ থাকিলে তাহা বিকৃত হয়। যথা—অনল (=অ-নো-ল), পিতল (=পিতোল, পেতোল), কমল (=ক-মোল) ইত্যাদি।

অনুচ্চারিত (হলন্ত) অন্ত্য অ

আধুনিক বাংলা ভাষায় শব্দের পদান্ত অ-কারের প্রায়ই উচ্চারণ হয় না। অন্ত্য বর্ণের অ-এর হলন্ত উচ্চারণ আধুনিক বাংলার বিশিষ্ট রীতি। যথা—হাত্, ভাত্, ঘট্, পট্, আক্, নয়ন, রতন্, যেমন্, করেন্, বালক্, করিতেন্, উত্তম্, সমর্,

পরিহাস্, অবকাশ্। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলায় পদান্ত অ উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক রীতি ছিল। ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলীও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ইহার কতিপয় ব্যতিক্রম আছে।

উচ্চারিত অন্ত্য অ

(১) অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষ ক্রিয়াপদের স্বরান্ত উচ্চারণ হয়। কর, ধর, চল, বল। কিন্তু তুচ্ছার্থে ও সম্ভ্রমার্থে হলন্ত উচ্চারণ—কর্, চলুন্।

(২) পদান্তে হ বা যুক্তবর্ণ থাকিলে তৎসংযুক্ত অ সর্বদা উচ্চারিত হয়। যথা—মোহ, দেহ, বিদ্রোহ, গৃহ, মন্দ, বিজ্ঞ, বীরত্ব, বঙ্গ, কম্প, বাক্য, কষ্ট, শক্ত, জব্দ।

(৩) ক্ত, য, তর, তম প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা—গীত, পুলকিত, গত, নত, অনূদিত, শ্রেয়, হেয়, প্রেয়, বিধেয় (কিন্তু বিষয়্, উপায়্) গুরুতর গুরুতম, ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম।

কিন্তু ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য হইলে অন্ত্য অ লোপ হয়। যথা—গীত্, মত্, রক্ষিত্ (উপাধি), পালিত্ (উপাধি)।

(৪) পদের অন্ত্য বর্ণ ঢ় হইলে তৎসংযুক্ত অ উচ্চারিত হয়। যথা—গাঢ়, নিগূঢ়।

(৫) অন্ত্য বর্ণের পূর্বে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকিলে অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা—বংশ, হংস, দুঃখ।

(৬) দ্ব্যক্ষর শব্দের প্রথম অক্ষরে ঋ, ঐ, ঔ থাকিলে অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা—তৃণ, বৃশ, কৃশ, তৈল, শৈল, মৌন, গৌণ।

কিন্তু দ্ব্যক্ষর না হইলে হইবে না। যথা—কৃপণ, কৃষক, পৃথক্।

(তৎসম শব্দে এই উচ্চারণ হইবেই, কিন্তু তদ্ভব শব্দে ব্যতিক্রম কিছু দেখা যায়)।

(৭) দুই অক্ষরের বিশেষণ শব্দগুলির শেষ অ-কার প্রায়ই উচ্চারিত হয় এবং অ-এর বিকৃত উচ্চারণ হয়। [অনু. ১১ (জ) দ্রষ্টব্য)।

(৮) সংখ্যাবাচক এগার হইতে আঠার পর্যন্ত শব্দগুলির অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়।

(৯) দ্বিরুক্ত ও অনুকার শব্দ অ-প্রত্যয়যুক্ত হইয়া বিশেষণ হইলে উহাদের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা—কাঁদ-কাঁদ, ছল-ছল, পড়-পড় (নতুবা ছল্-ছল্, পড়্-পড়্)।

আ

আ—সংস্কৃতের ন্যায় বাংলায় সর্বত্র দীর্ঘস্বর নয়, উহার হ্রস্ব এবং দীর্ঘ দুই উচ্চারণই লক্ষিত হয়। একাক্ষর পদের আ-এর উপর জোর পড়ে এবং উহা দীর্ঘ হয়। আজ্, ভাত্, রাত্, পাত্। নিম্নলিখিত শব্দে আ-এর উচ্চারণ হ্রস্ব—আপন, কাপড়, বাড়ি, পাতা, বারুই। 'না' দীর্ঘ, কিন্তু 'যাব না' হ্রস্ব। আধুনিক বাংলায় আ-কারের ঈষৎ বিকৃত রূপ পরিলক্ষিত হয়। যথা—আ'জ (আইজ, আজি < অদ্য), কা'ল (কাইল, কালি < কল্য), ধা'ত (< ধাইত < ধাউত < ধাতু)। অ, আ—কণ্ঠ্য বর্ণ।

ই, ঈ

উভয়ের স্বাভাবিক উচ্চারণ একবিধ—উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্য নাই। তবে একাক্ষর পদের ই, ঈ দীর্ঘ। ই, ঈ—তালব্য বর্ণ।

জোর দিবার জন্য অথবা বিভিন্ন অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবহার অধুনা প্রচলিত হইয়াছে।

সে কি খাইয়াছে ? (সাধারণ প্রশ্ন)। সে কী খাইয়াছে ? কী তোমার হুকুম বলো।

উ, ঊ

বাংলায় উ এবং ঊ এই দুই স্বরের উচ্চারণে সাধারণতঃ কোন পার্থক্য নাই। ঢ-র পূর্বে ঊ-র উচ্চারণ দীর্ঘ। যথা—মূঢ়, গূঢ়। 'রূপা' শব্দের উ হ্রস্ব, 'রূপ' শব্দের ঊ দীর্ঘ। (পূর্বে আলোচিত হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। উ, ঊ—ওষ্ঠ্য বর্ণ।

দ্ব্যক্ষর শব্দে উ'র পর 'আ' অথবা উচ্চারিত 'অ' থাকিলে 'উ'র উচ্চারণ ও-কারের ন্যায় হয়। যথা—উঠ (ওঠ), উড়া (ওড়া)।

ঋ

বাংলা বর্ণমালার ভিতরে ঋ-কে একটি স্বতন্ত্র স্বর বলিয়া গ্রহণ করিলেও স্বর হিসাবে ঋ-কারের উচ্চারণ কদাচিৎ হইয়া থাকে। তৎসম শব্দে ঋ-কারের সাধারণ উচ্চারণ র+ই=রি। যথা—ঋষি (রিষি), ঋতু (রিতু), বৃষ (ব্রিশ), কৃষ্ণ (ক্রিশ্ন), অমৃত (অম্রিত), ঘৃত (ঘ্রিত) ইত্যাদি।

ঋ-কারের এই রি উচ্চারণের জন্য বিদেশী শব্দের বানানে অনেক সময়ে (র্+ই) ঋ-কারের ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—বৃটেন, খৃস্ট, কৃকেট ইত্যাদি। ব্রিটেন, খ্রীস্ট, ক্রিকেট লেখা উচিত। ঋ—মূর্ধন্য বর্ণ।

এ

বাংলার 'এ' স্বরবর্ণ শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হইলে তাহার দুই প্রকার উচ্চারণ হয়—একটি (১) **সহজ** 'এ' (ইংরেজী bet শব্দের e-এর ন্যায়)। যথা—ছেলে, মেয়ে, একটি, দেখিলে, বেল, তেজ, কে, সে, দেশ, বেশ ইত্যাদি। আর একটি (২) **বিকৃত** (open) 'অ্যা' (ইংরেজী bat শব্দের a-এর ন্যায়)। যথা—এক (এ্যাক), কেন (ক্যানো), মেও (ম্যাও), খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা)।

(ক) পরে ই-কার বা উ-কার থাকিলে তৎপূর্ববর্তী এ-কার কখনও বিকৃত হয় না। যথা—জেঠি, বেটী, কেলি, তেলা, কেতু, সেতু, ঘেটু। কিন্তু জেঠা (জ্যাঠা), বেটা (ব্যাটা), একা (এ্যাকা), পেঁচা (প্যাঁচা)।

(খ) পদের আদিতে স্থিতি না হইলে 'এ' সাধারণতঃ সহজরূপে উচ্চারিত হয়। যথা—মারে, ভাবে, দোষে-গুণে, স্থলে-জলে, নভো-তলে ইত্যাদি।

(গ) তৎসম শব্দের আদ্য 'এ'-র সহজ উচ্চারণ। যথা—কেশ, বেশ, হেম, প্রেম, খেদ, বেদ, তেজ। কিন্তু এক (এ্যাক) ব্যতিক্রম।

একাক্ষর তদ্ভব শব্দের অন্ত্য বর্ণ ক, খ, চ, ড়, ন, ণ, য় থাকিলে আদ্য 'এ'র উচ্চারণ সাধারণতঃ বিকৃত হয়। যথা—দেখ (দ্যাখ), ছেঁচ (ছ্যাঁচ), পেঁচ (প্যাঁচ্) বেঙ্ (ব্যাঙ্), দেয় (দ্যায়), নেয় (ন্যায়)।

(ঘ) ই-কারযুক্ত একাক্ষর ধাতুর সহিত আ-প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশেষ্য পদের 'এ'র উচ্চারণ সহজ। যথা—কিন্—কেনা, মিল্—মেলা, লিখ্—লেখা, গিল্—গেলা [কিন্তু যাওয়া অর্থে গেলা=গ্যালা]।

কিন্তু এ-কারযুক্ত একাক্ষর ধাতুর উত্তর আ-প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষ্য পদের আদ্য 'এ'র উচ্চারণ বিকৃত। যথা—বেচ—বেচা (ব্যাচা), ঠেল—ঠেলা (ঠ্যালা), দেখ্—দেখা (দ্যাখা), হেল্—হেলা (হ্যালা)।

(ঙ) একাক্ষর সর্বনাম পদের এ-কার সহজ। যথা—সে, কে, যে, এ।

কিন্তু কতকগুলি সর্বনাম ও সর্বনামজাত পদের আদ্য এ বিকৃত। যথা—এখন, কেমন, এমন, তেমন।

(চ) যুক্ত ব্যঞ্জন বা 'হ' পরে থাকিলে আদ্য 'এ' সহজ হয়। যথা—দেহ, গেহ, কেহ, তেষ্টা, শ্রেষ্ঠ, বেল্লিক, কেষ্ট।

(ছ) চন্দ্রবিন্দু এবং আ হইতে জাত 'এ' বিকৃত হয়। যথা—ছেঁদা (ছ্যাঁদা), সেঁতসেঁতে (স্যাঁতসেঁতে), ডেঙা (ড্যাঙা > ডাঙ্গা), কেঁথা (ক্যাঁথা > কাঁথা)।

ঐ

ঐ—ইহা যৌগিকস্বর বা রুদ্ধস্বর (বা সন্ধ্যক্ষর)। ইহার উচ্চারণ 'ওই'।

এ ঐ—কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ।

ও, ঔ

ও—বাংলায় ও-কারের উচ্চারণে পরিবর্তন নাই।

ঔ—ইহা যৌগিকস্বর বা রুদ্ধস্বর। ইহার উচ্চারণ 'ওউ'। ঐ-কারের ন্যায় ইহাকেও ছন্দে স্থানে স্থানে দুই মাত্রারূপে গণ্য করা হয়। ও, ঔ—কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ।

উচ্চারণ-ভেদে নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থভেদ লক্ষ্য কর :—

মত (মত)—সম্মতি ; মত (মতো)—তুল্য।

কাল (সহজ)—কল্য ; কা'ল (প্রসারিত)—সময় ; কাল (কালো)—কৃষ্ণবর্ণ ;

ভাল (ভাল্)—কপাল ; ভাল (ভালো)—উত্তম।

ক'রে (কোরে)—অসমাপিকা ক্রিয়া ; করে (অ সহজ)—সমাপিকা।

কোন (কোন্)—কে, কি ; কোন (কোনো)—অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

১২। পূর্বে (৩ অনু.) ব্যঞ্জনবর্ণের একটা সাধারণ শ্রেণী-বিভাগ দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে ক হইতে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শবর্ণকে নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

উচ্চারণ-স্থান	অঘোষ (Unvoiced)		ঘোষ (Voiced)		
	(১) অল্পপ্রাণ	(২) মহাপ্রাণ	(৩) অল্পপ্রাণ	(৪) মহাপ্রাণ	(৫) নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

নিম্নে এই পাঁচটি বর্গের অন্তর্গত প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

ক-বর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ—জিহ্বার মূল বা পশ্চাদ্ভাগদ্বারা কণ্ঠের দিকে তালুর কোমল অংশ স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। এই জন্য ইহাদিগকে **জিহ্বামূলীয় বর্ণ** বলা হয়। ইহাদিগকে **কণ্ঠ্যবর্ণও** বলে।

ক—অঘোষ কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি। জিহ্বার মূলদেশ কণ্ঠের দিকে কোমল তালুকে স্পর্শ করিয়া স্বরতন্ত্রীকে না কাঁপাইয়া যে উচ্চারণ পাওয়া যায় তাহাই ক ধ্বনি। ক অল্পপ্রাণ।

খ—ক-এর মহাপ্রাণ রূপ হইল খ, অর্থাৎ ক-এর সহিত হ-এর মত নিঃশ্বাস-ধ্বনির যোগেই খ উৎপন্ন হয়। ইহা অঘোষ কণ্ঠ্য মহাপ্রাণ।

গ—ক-এর ঘোষধ্বনি ; অর্থাৎ ক-বর্ণটিকে স্বরতন্ত্রী কাঁপাইয়া উচ্চারণ করিলেই গ পাওয়া যাইবে। ইহা ঘোষ কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি।

ঘ—খ যেরূপ ক-এর মহাপ্রাণ রূপ, ঘ তেমনই গ-এর মহাপ্রাণ রূপ, অর্থাৎ গ্+হ=ঘ। ইহা ঘোষ কণ্ঠ্য মহাপ্রাণ।

ঙ—ইহা কণ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি।

প্রাচীন কালে ইহার উচ্চারণ ছিল উঁঅ, সেই জন্য ইহার নাম উঁঅ। কিন্তু ইহার বর্তমান উচ্চারণ অনেকটা ং অনুস্বারের ন্যায় (অথবা ইংরেজী king শব্দের ng-এর ন্যায়)। সঙ, ব্যাঙ, রঙ, ঢঙ, বাঙলা প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই।

চ-বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ—জিহ্বার মধ্যভাগদ্বারা তালুর সম্মুখ ভাগ বা কঠিন অংশ স্পর্শ করিয়া ইহারা উচ্চারিত হয়, এজন্য ইহাদিগকে **তালব্য বর্ণ** বলে। আধুনিক উচ্চারণে ইহারা এখন আর বিশুদ্ধ স্পৃষ্টধ্বনি নয়, জিহ্বা ও তালুর স্পর্শ অপেক্ষা উভয়ের মধ্যস্থ বায়ুর ঘর্ষণ হেতু ইহারা **ঘৃষ্টবর্ণ**।

চ—ইহা অঘোষ তালব্য স্পর্শধ্বনি। স্বরতন্ত্রীকে না কাঁপাইয়া এই তালব্য উচ্চারণ হয়।

ছ—ছ চ-এর মহাপ্রাণ (চ্+হ)। ইহা অঘোষ তালব্য মহাপ্রাণ।

জ—ইহা চ-এর ঘোষধ্বনি অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীকে কাঁপাইয়া চ-এর উচ্চারণ করিলেই জ পাওয়া যাইবে। ইহা ঘোষ তালব্য স্পর্শধ্বনি।

ঝ—জ-এর মহাপ্রাণ (জ্+হ); ইহা ঘোষ তালব্য মহাপ্রাণ। পূর্ববঙ্গে তালব্যবর্ণের সাধারণ উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত। ইহা আর স্পৃষ্টধ্বনি নয়, উষ্মধ্বনি হইয়াছে।

ঞ—ইহা তালব্য নাসিক্য ধ্বনি।

ইহার উচ্চারণ ইঁঅ, নামও ইঁঅ। যথা—মিঞা (মিঁআ)। কিন্তু চ বর্গের পূর্বে বা পরে থাকিলে ইহা ন-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—সঞ্জয় (সন্‌জয়), সঞ্চয় (সন্‌চয়), যাচ্ঞা (যাচ্‌না)।

জ্ঞ—জ্ ও ঞ্ মিলিয়া অনুনাসিক দ্বিত্ব গ-কারের ন্যায় (গ্গঁ বা গ্যঁ) উচ্চারিত হয়। যজ্ঞ (যোগ্গঁ), আজ্ঞা (আগ্গাঁ)।

ট-বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টাইয়া বা প্রতিবেষ্টন করিয়া মূর্ধা বা তালুর শীর্ষ অংশ স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়, এই জন্য ইহাদিগকে **মূর্ধন্য বর্ণ** বা প্রতিবেষ্টিত বর্ণ বলে।

ট—ইহা অঘোষ মূর্ধন্য স্পর্শধ্বনি অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীকে না কাঁপাইয়া বিশুদ্ধ মূর্ধন্য ধ্বনি।

ঠ—ইহা ট-এর মহাপ্রাণ (ট্ +হ), অঘোষ মূর্ধন্য মহাপ্রাণ।

ড—ইহা ট-এর ঘোষধ্বনি অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত ধ্বনি।

ঢ—ইহা ড-এর মহাপ্রাণ (ড্ +হ) ; ঘোষ মূর্ধন্য মহাপ্রাণ।

ণ—মূলতঃ ইহা মূর্ধন্য নাসিক্যধ্বনি ; কিন্তু ণ-এর কোন বিশুদ্ধ উচ্চারণ বাংলায় নাই। লিখিবার সময় ণ লিখিলেও উচ্চারণে ণ এবং ন-এর মধ্যে কোন তফাৎ করা হয় না। লিখিবার ক্ষেত্রেও ণ-এর ব্যবহার সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

ড়, ঢ়—জিহ্বাগ্র উল্টাইয়া এবং মূর্ধা স্পর্শ করিয়া জিহ্বাগ্রের নিম্ন ভাগ দ্বারা দন্তমূলে তাড়ন বা আঘাত করিলে এই ধ্বনি উৎপন্ন হয়। ইহাকে **তাড়ন-জাত ধ্বনি** বলে। ড়-এর মহাপ্রাণ ধ্বনি ঢ়। ড়, ঢ় উচ্চারণ আধুনিক বাংলায় দেখা যায়, সংস্কৃতে ইহার এ জাতীয় উচ্চারণ ছিল না। ড়, ঢ় বর্ণ দুইটিও বাংলা বর্ণমালায় নূতন ; ড় ও ঢ়-এর উচ্চারণে পূর্ববঙ্গে শৈথিল্য দেখা যায়।

ত-বর্গ—ত, থ, দ, ধ, ন—প্রসারিত জিহ্বার দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। এজন্য ইহাদিগকে **দন্ত্যবর্ণ** বলে।

ত—স্বরতন্ত্রী না কাঁপাইয়া যদি বিশুদ্ধ ভাবে দন্ত্য স্পর্শধ্বনি উচ্চারণ করা যায়, তবেই ত-ধ্বনি পাওয়া যাইবে। ইহা অঘোষ দন্ত্য স্পর্শধ্বনি।

থ—ইহা ত-এর মহাপ্রাণ (ত্ +হ) ; ইহা অঘোষ দন্ত্য মহাপ্রাণ।

দ—ইহা ত-এর ঘোষরূপ, অর্থাৎ ত-এর উচ্চারণে ঈষৎ স্বরতন্ত্রী কাঁপাইয়া উচ্চারণ করিলেই দ পাওয়া যায় ; দ ঘোষ দন্ত্য স্পর্শধ্বনি।

ধ—ইহা দ-এর মহাপ্রাণ (দ্+হ) ঘোষ দন্ত্য মহাপ্রাণ।

ন—ইহা নাসিক্য দন্ত্য ধ্বনি অর্থাৎ ত-এর ঘোষরূপ। দ-এর উচ্চারণের সময় নাসিকা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেই ন পাওয়া যায়।

প-বর্গ—প, ফ, ব, ভ, ম—ওষ্ঠের সহিত অধরের স্পর্শে উচ্চারিত হয়। এজন্য ইহাদিগকে **ওষ্ঠ্য বর্ণ** বলে।

প—স্বরতন্ত্রী না কাঁপাইয়া যে বিশুদ্ধ ঔষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি পাওয়া যায় তাহাই প। ইহা অঘোষ ঔষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি।

ফ—ইহা প-এর মহাপ্রাণ (প্ +হ), অঘোষ ঔষ্ঠ্য মহাপ্রাণ।

ব—ইহা প-এর ঘোষরূপ, অর্থাৎ স্বরতন্ত্রী ঈষৎ কাঁপাইয়া প উচ্চারণ করিলেই ব-ধ্বনি পাওয়া যায়। ইহা ঘোষ ঔষ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি।

ভ—ইহা ব-এর মহাপ্রাণ (ব্ +হ) ঘোষ ঔষ্ঠ্য মহাপ্রাণ।

ম—ইহা ঔষ্ঠ্য নাসিক্যধ্বনি। প-এর ঘোষরূপ ব-এর উচ্চারণে নাসিকা দ্বারা নিঃশ্বাস বায়ু ত্যাগ করিলে ম-ধ্বনি পাওয়া যায়।

ম যখন অন্য বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া ম-ফলা হয়, তখন শব্দের আদিতে অনুচ্চারিত থাকে (শ্মশান=শশান), মধ্যে বা শেষে থাকিলে যে বর্ণের সহিত যুক্ত হয় তাহার দ্বিত্ব হয়; কোথাও কোথাও একটা অনুনাসিক ধ্বনি থাকে। যথা—লক্ষ্মী (লক্‌খী), পদ্ম (পদ্দোঁ), মহাত্মা (মহাত্তাঁ), ভীষ্ম (ভীশ্‌শঁ)।

অন্তঃস্থ বর্ণ—য, র, ল, ব—অন্তঃস্থ বর্ণের উচ্চারণ স্বরবর্ণের উচ্চারণ ও স্পর্শবর্ণের উচ্চারণের মাঝামাঝি; এ সকল বর্ণের উচ্চারণে মুখগহ্বরে শ্বাসবায়ুর পথ স্বরবর্ণের তুলনায় অধিক সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু স্পর্শ ঘটে না।

য—অন্তঃস্থ বর্ণের ভিতরে ইহা একটি অর্ধস্বর। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হইলে ইহা ব্যঞ্জন হইয়া যায়, তখন উচ্চারণ ঠিক জ-এর অনুরূপ।

য ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসিলে, ইহার রূপ ্য-ফলা হয়। ফলার য উচ্চারিত হয় না, কেবল সংযুক্ত বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা—অন্য (অন্‌ন), পুণ্য (পুন্‌ন)।

ইহার নীচে বিন্দু বসাইয়া **য়** (ইয়) সৃষ্টি হইয়াছে, য়-এর উচ্চারণ অ-কারের ন্যায়। উহাই য-এর অর্ধস্বর উচ্চারণ। যথা—সময়, তনয়, নিয়ম।

য-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন শব্দের আদিতে থাকিলে ইহা য-ফলার উচ্চারণ 'অ্যা' ও 'এ' বৎ হয়। যথা—ব্যক্ত (ব্যাক্ত), ব্যক্তি (বেক্তি)। (অনু. ১১ (২) খ (২, ৩), অনু. (১৩) ল-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণও দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যথা—বিপ্লব (বিপ্‌প্লব), অম্ল (অম্‌ম্ল)।

র—জিহ্বাগ্র কম্পিত করিয়া দন্তমূলে আঘাত করিয়া উচ্চারিত হয়। এজন্য ইহাকে **কম্পনজাত** বর্ণ (বা ধ্বনি) বলে। র ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হইলে র-ফলা (্র) এবং পূর্বে যুক্ত হইলে মাথায় চড়িয়া রেফ (র্) হয়। র-ফলার উচ্চারণ কঠিন, রেফের উচ্চারণ শিথিল। র-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা—বিক্রম (বিক্‌ক্রম্), নম্র (নম্‌ম্র)।

ল—জিহ্বাগ্রকে দন্তমূলে ঠেকাইয়া জিহ্বার দুই পার্শ্ব দিয়া বায়ু বাহির করিয়া ইহার উচ্চারণ হয়। এজন্য ইহাকে **পার্শ্বিক** বর্ণ (ধ্বনি) বলে।

ব—মূলে ইহা একটি অর্ধবর্ণ, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে উহার ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার প্রসিদ্ধ। অন্তঃস্থ ব (উয়=w) ও বর্গীয় ব (ব=b) এক্ষণে বাংলায় আকৃতি ও উচ্চারণে একই প্রকার। ওষ্ঠের সহিত অধরের সংযোগে ইহা উচ্চারিত হয়। ফলার ব অন্তঃস্থ ব, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহা উচ্চারিত হয় না, সংযুক্ত বর্ণটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যথা—সত্বর (সত্‌তর), বিশ্ব (বিশ্‌শ)। শব্দের আদ্যক্ষরে ব-ফলা থাকিলেও অস্পষ্টভাবে একটু দ্বিত্ব ধ্বনির ভাব থাকে। যথা—ধ্বনি, দ্বার, দ্বেষ। কয়েকটি তৎসম শব্দের ব-এর w-বৎ উচ্চারণের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যথা—জিহ্বা, আহ্বান, বিহ্বল।

উষ্মবর্ণ—শ, ষ, স, হ। যে সকল বর্ণের উচ্চারণে শ্বাসাধিক্য, তাহাদিগকে উষ্মবর্ণ বলে। ইহাদের উচ্চারণে মুখ-গহ্বরের অতি সঙ্কুচিত পথে শ্বাসবায়ু আবর্তিত বা জোরে নিক্ষিপ্ত হয়। স্পর্শধ্বনির সহিত উষ্মধ্বনির তফাৎ এই, স্পর্শধ্বনি উচ্চারিত হইবামাত্রই থামিয়া যায়, উষ্মধ্বনিকে ইচ্ছামত প্রলম্বিত করা যাইতে পারে। শিস্ দেওয়ার ধ্বনির অনুরূপ বলিয়া শ, ষ, স—এই তিনটি ধ্বনিকে **শিস্ ধ্বনি** বলে।

শ, ষ, স—এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ বাংলায় এখন এক রকম,—ইংরেজী sh-এর ন্যায়। পূর্বে শ-এর তালব্য উচ্চারণ, ষ-এর মূর্ধন্য এবং স-এর দন্ত্য উচ্চারণ ছিল। ঋ, র ও ন পরে যুক্ত হইলে শ ও স-এর দন্ত্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। যথা—শৃগাল, শ্রবণ, প্রশ্ন, স্বষ্টি। ত, থ যোগে স-এর দন্ত্য উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। যথা—ব্যস্ত, সুস্থ, স্নান (=snān, shnān নয়)।

হ—কণ্ঠে উৎপন্ন উষ্মবর্ণ। য-ফলার সহিত যুক্ত হইলে ইহা 'জ্‌ঝ'-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—বাহ্য (বাজ্‌ঝ), সহ্য (শোজ্‌ঝ)।

ক্ষ—এই যুক্তাক্ষরের (ক্+ষ) উচ্চারণ খ্য বা কখ-কারের ন্যায়। কিন্তু শব্দের আদিতে থাকিলে ইহা শুধু একটি খ-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—লক্ষ্য (লোক্‌খ, লোখ্য), ক্ষমতা (খমতা)।

ং (অনুস্বার)—বাংলায় ইহার উচ্চারণ ঙ-এর ন্যায়। যথা—বাংলা (বাঙলা), রং (রঙ)।

ঃ (বিসর্গ)—ইহা অনেকটা 'হ'র শিথিল ধ্বনি বা অঘোষ ধ্বনি। এই উচ্চারণ কয়েকটি অব্যয়ে পাওয়া যায়। যথা—উঃ, আঃ। পদান্তে ইহা প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। যথা—ক্রমশঃ। ইহা পদের মধ্যে থাকিলেও ইহার পরবর্তী বর্ণ দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যথা—দুঃখ (দুক্‌খ), নিঃশেষ (নিশ্‌শেষ), অতঃপর (অতপ্‌পর)। অনুস্বার ও বিসর্গকে **অযোগবাহ বর্ণ** বা 'পরাশ্রিত বর্ণ' বলে।

ঁ (চন্দ্রবিন্দু)—অনুনাসিকের চিহ্ন। কোন বর্ণের উপর চন্দ্রবিন্দু থাকিলে তাহা নাসিকা সংযোগে উচ্চারিত হয়।

১৩। কয়েকটি সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

পূর্বে বলিয়াছি, দুই বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে মিলিত হইলে তাহাকে **সংযুক্তবর্ণ** বা যুক্তাক্ষর বলে। [অনু. ৪ (২)]। কোন কোন যুক্তাক্ষরের গঠন দেখিয়া উহার মূল বর্ণগুলি বুঝা কঠিন। যথা—ক্ত (ক্+ত), ত্র (ত্+র), ক্র (ক্+র), ঙ্গ (ঙ্+গ), জ্ঞ (জ্+ঞ), ষ্ণ (ষ্+ণ), ঞ্চ (ঞ্+চ), ক্ষ (ক্+ষ), হ্ম (হ্+ম)। যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে সাধারণতঃ মূল বর্ণগুলির উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু কতকগুলির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। কখনও কখনও ধ্বনি-বিলোপ ঘটে। যথা—

(ক) ক্ষ (ক্+ষ)—ক্ খ (লক্ষণ—লক্‌খন)।

জ্ঞ (জ্+ঞ)—গ্ গঁ (আজ্ঞা=আগ্‌গাঁ, দৈবজ্ঞ=দোঁইবোগ্‌গঁ, জ্ঞান=গ্যাঁন),

স্ট (স্+ট)—ইংরেজী s-এর ন্যায় (স্টেশন)

ষ্ট (ষ্+ট)—ইংরেজী sh-এর ন্যায় (তুষ্ট=তুশ্‌ট)

হ্ম, হ্ব, হ্ণ, হ্ন, হ্ল—এই যুক্তাক্ষরগুলির 'হ' পরে উচ্চারিত হয়। যথা—

ব্রাহ্মণ—ব্রাম্‌হণ, আহ্বান—(আওহান, আওভান), জিহ্বা—জিউহা (জিউভা)।

আহ্নিক—(আন্‌হিক), অপরাহ্ণ—(অপরাণ্‌হ), আহ্লাদ (আলহাদ)।

(খ) ব-ফলা, ম-ফলা, র-ফলা প্রভৃতি যুক্ত বর্ণসমূহের উচ্চারণে যে বর্ণের সহিত ফলাগুলি থাকে, সাধারণতঃ উহাদের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা—ঈশ্বর=ঈশ্‌শর, বিদ্বান্=বিদ্‌দান, সত্ত্ব=সত্‌ত, সত্বর=শত্‌তর, গ্রীষ্ম=গ্রীশ্‌শঁ (কিন্তু উষ্মা=উশ্‌মা) শ্মশান=শ্‌শাঁন, শশান ; পদ্ম=পদ্‌দঁ, মহাত্মা=মহাৎতাঁ (হিন্দী ও ইংরেজী উচ্চারণ

'মহাত্‌মা'), অকস্মাৎ=অকোশ্‌শাৎ, বক্র=বক্‌ক্র, সাম্য=সাম্‌ম, বাক্য=বাক্‌ক, কাব্য=কাব্‌বো, পাঠ্য=পাট্‌ঠ। (অনু. ১২)

কিন্তু য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন শব্দের প্রথমে বসিলে উহার দুই প্রকার উচ্চারণ দেখা যায়।

(১) এ্যা-বৎ—ব্যবহার (ব্যাবহার), ব্যথা (ব্যাথা)।

(২) এ-বৎ—ব্যক্তি (বেক্তি), ব্যতীত (বেতীত) (অনু. ১২ দ্রষ্টব্য)।

হ্য—'হ'র সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হইলে উহার উচ্চারণ 'জ্‌ঝ'-এর ন্যায় হয়। যথা—বাহ্য (বাজ্‌ঝ), সহ্য (শোজ্‌ঝ)। (অনু. ১২)।

একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি—অ, এ, এ্য, শ, ষ, স—এই বর্ণগুলির দুই প্রকার উচ্চারণ হয় (অনু. ১১, ১২ দ্রষ্টব্য)।

বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি—ই ঈ, উ, ঊ, ঙ ং, জ য, ণ ন, বর্গীয় ব, অন্তঃস্থ ব—এই দুই-দুইটি বর্ণের একরূপ উচ্চারণ। (অনু. ১১, ১২ দ্রষ্টব্য)।

১৪। **বর্ণের উচ্চারণ-স্থান**। পূর্বে বর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-রীতি অনুসারে বর্ণের নামকরণ হয়। তদনুযায়ী নিম্নে বর্ণের শ্রেণী-বিভাগ প্রদর্শিত হইল।

উচ্চারণ-স্থান অনুসারে বর্ণের শ্রেণী-বিভাগ

বর্ণ	উচ্চারণ-স্থান	উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী নাম
অ আ হ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য
ক খ গ ঘ ঙ	জিহ্বামূল	জিহ্বামূলীয়
ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ	তালু	তালব্য
ঋ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য
ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত	দন্ত্য
উ ঊ প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য
ব (অন্তঃস্থ)	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য
এ ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ-তালব্য
ও ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য

১৪। (ক) উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী বর্ণসমূহের বিভাগ

স্পৃষ্টবর্ণ—(১) **অল্পপ্রাণ**—ক গ ট ড ত দ প ব ;
(২) **মহাপ্রাণ**—খ ঘ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ।

ঘৃষ্টবর্ণ— (১) **অল্পপ্রাণ**—চ জ ; (২) **মহাপ্রাণ**—ছ ঝ।

অনুনাসিক বা নাসিক্যবর্ণ— ঙ ঞ ন ণ ম ; ইহাদের উচ্চারণ-কালে মুখের বায়ু কেবল মুখ দিয়া বাহির না হইয়া মুখ ও নাসিকা উভয় পথ দিয়াই বাহির হয়।

তাড়নজাত—ড়, ঢ়। **কম্পনজাত**—র। **অর্ধস্বর**—য় ব (w)। **পার্শ্বিক**—ল।

উষ্মবর্ণ—হ (কণ্ঠ্য), শ (তালব্য), স (দন্ত্য), ফ (f). ব (v) (ওষ্ঠ্য)।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের আধুনিক উচ্চারণ

উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী বিভাগ ↓	উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী বিভাগ								
	কণ্ঠ্য Glottal	জিহ্বামূলীয় Velar	মূর্ধন্য Retroflex	তালব্য Palatal	দন্তমূলীয় তালব্য Palato-alveolar	দন্তমূলীয় Alveolar	দন্ত্য Dental	দন্তৌষ্ঠ্য Denti-labial	ঔষ্ঠ্য Bilabial
Unaspirated অল্পপ্রাণ		ক গ	ট ড				ত দ		প (p) ব (b)
Aspirate মহাপ্রাণ		খ ঘ	ঠ ঢ				থ ধ		ফ(ph) ভ (bh)
Affricate ঘৃষ্ট					চ ছ জ ঝ				
Nasal অনুনাসিক		ঙ	ণ		ঞ	ন			ম
Lateral পার্শ্বিক						ল			
Flapped তাড়নজাত			ড় ঢ়						
Trilled কম্পনজাত						র			
Fricative	হ				শ	স জ (z)		ফ (f) ব (w)	ফ (f) ব(v)
Semi-vowel অর্ধ-স্বর				য় (y)					অন্তঃস্থ ব (w)

দ্রষ্টব্য। অঘোষধ্বনি ও ঘোষধ্বনি। আমাদের কণ্ঠনালীর মধ্যে দুইটি পাতলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে, এই দুইটি স্বরতন্ত্রী নামে অভিহিত। যে ধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময়ে স্বরতন্ত্রী স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করে এবং নিঃশ্বাসবায়ু অবাধে অকম্পিতভাবে বাহির হইয়া আসে, তাহাকে **অঘোষধ্বনি** বলে। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে এই স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত একটা গম্ভীর অনুরণিত সুরের উৎপত্তি হয়, তাহাকে **ঘোষধ্বনি** বলে।

১৫। বাংলা উচ্চারণের এবং ধ্বনি-পরিবর্তনের বিশেষ রীতি।

(ক) **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ** (Anaptyxis বা Vowel Insertion)। শব্দ যাহাতে সর্বাপেক্ষা সহজে এবং অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়, সেই দিকেই বাংলা উচ্চারণ-রীতির প্রবণতা। বিভিন্ন বর্গীয় বর্ণের সংযোগে যে যুক্ত বর্ণের উৎপত্তি হয় তাহার সুষ্ঠু উচ্চারণ স্বভাবতঃই একটু কঠিন। উচ্চারণের এই আয়াস এড়াইবার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ভিতরে নানা প্রকার স্বরধ্বনি আনয়ন করা হয়, ইহাকে

স্বরভক্তি বা **বিপ্রকর্ষ** বলে। প্রাকৃতের যুগ হইতেই উচ্চারণের ভিতরে এই জাতীয় বিপ্রকর্ষের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—রত্ন—রতন, রঅণ; পদ্ম—পদুম, পউম। প্রাচীন বাংলা এবং মধ্য-বাংলায় বিপ্রকর্ষের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বিপ্রকর্ষে নানা প্রকার **স্বরের** আগম হয়। সরলতা ও মাধুর্য সম্পাদনে কবিতায় ইহার প্রয়োগ বেশি। যথা—

অ-আগম—কর্ম, ধর্ম, মর্ম > করম, ধরম, মরম; ভক্তি > ভকতি; বর্ষ > বরষ; গর্ব > গরব; মুগ্ধ > মুগধ; বিদেশী শব্দ—দর্দ > দরদ; জখ্ম্ > জখম; গার্ড > গারদ।

ই-কার আগম—শ্রী > ছিরি; মিত্র > মিত্তির; স্নান > সিনান; ফিক্‌র্ > ফিকির; জিক্‌র্ > জিকির, জিগির; ক্লিপ > কিলিপ; ফিল্ম > ফিলিম।

উ-কার আগম—পুত্র > পুত্তুর; শুক্র > শুক্কুর; ভ্রূ > ভুরু; মুল্ক > মুল্লুক; তুর্ক > তুরুক; ফ্লুট > ফুলুট; ব্রুশ > বুরুশ।

এ-কার আগম—গ্রাম > গেরাম; শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ; প্রেক > পেরেক; গ্লাস > গেলাস।

ও-কার আগম—শ্লোক > শোলোক; চক্র > চক্কোর; গ্রোস > গোরোস।

ঋ-কারযুক্ত শব্দে বিপ্রকর্ষ—তৃপ্ত > তিরপিত; সৃজিল > সিরজিল।

(খ) স্বর-সঙ্গতি (Vowel Harmony)। আমরা পূর্বে (৬ অনু.) দেখিয়াছি, আধুনিক বাংলায় চলিত অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও—এই সাতটি স্বর এবং প্রাদেশিক 'আ' স্বর; ইহাদের ভিতরে কতকগুলি **সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি** আর কতকগুলি **পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনি**। ইহাদের মধ্যে আবার কোনটি উচ্চস্বর, কোনটি মধ্যস্বর, কোনটি নিম্নস্বর। বাংলায়, বিশেষ করিয়া চলিত বাংলায়, শব্দের উচ্চারণের সময়ে পদস্থিত বিভিন্ন প্রকৃতির স্বরের ভিতরে একটি সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়, ইহাকে **স্বর-সঙ্গতি** বলে। যেমন—'বিলাতি' শব্দটির ভিতরে ই+আ+ই—এই তিনটি স্বর পাইতেছি; এই তিনটির ভিতরে ই-স্বরটি সম্মুখস্থ উচ্চ স্বরধ্বনি, আর আ-স্বরটি পশ্চাদ্ভাগস্থ নিম্ন-স্বরধ্বনি। এইরূপে দুই দিকে দুইটি সম্মুখস্থ উচ্চ স্বরধ্বনি রাখিয়া মাঝখানে একটি পশ্চাদ্ভাগস্থ নিম্ন-স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা খুব স্বাভাবিক নয়। তাই স্বরগুলি নিজেদের ভিতরে একটা সঙ্গতি স্থাপন করিয়া লইল, সম্মুখস্থ উচ্চস্বরের প্রভাবে পশ্চাদ্ভাগস্থ নিম্ন-স্বরধ্বনিটি সম্মুখস্থ মধ্যম স্বরধ্বনি এ-কারে পরিবর্তিত হইল; ফলে বিলাতি—বিলেতি। আরও সঙ্গতির ফলে এ-কারও ই-কার হইয়া গেল, তখন বিলেতি—বিলিতি।

স্বর-সঙ্গতির বেলায় পরস্পরের প্রভাবে পূর্বস্বর পরিবর্তিত হয়, আবার পূর্বস্বরের প্রভাবে পরস্বর পরিবর্তিত হয়।

পরস্বরের প্রভাবে পূর্বস্বরের পরিবর্তন—অতি (ওতি), মধু (মোধু), লিখ হইতে লিখি (লিখ্+ই) কিন্তু লেখে (লিখ্+এ); শুনে হইতে শোনে, শো হইতে শোয়া (শো+আ) কিন্তু শুই (শো+ই); ছোঁড়া, কিন্তু ছুঁড়ী; উনান > উনুন; চাকর+ঈ = চাকুরী; কুড়াল > কুড়ুল ইত্যাদি।

পূর্বস্বরের প্রভাবে পরস্বরের পরিবর্তন—শিক্ষা—শিক্ষে; ইচ্ছা—ইচ্ছে; ছিলাম—ছিলেম, ছিলুম; পূজা—পূজো; তুলা—তূলো; দুয়ার—দুয়োর; চূড়া—চূড়ো; হুকা—হুকো; চারিটা—চারটে, দুইটা—দুটো।

(গ) অপিনিহিতি (Epenthesis)—শব্দের মধ্যে ই বা উ থাকিলে পূর্ব হইতেই তাহাকে উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার প্রবণতাকে **অপিনিহিতি** বলে। বাংলা ভাষার মধ্যযুগ হইতেই আমরা বাংলার উচ্চারণ-রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারি। পূর্বে অপিনিহিতি সমগ্র বাংলা ভাষাতেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অধুনা পশ্চিমবঙ্গে অপিনিহিতি লুপ্ত হইয়াছে অথবা অভিশ্রুতি (পরে দ্রষ্টব্য) নামক নূতন স্বর-পরিবর্তনের রীতি আসিয়া অপিনিহিতিকে বদলাইয়া দিয়াছে। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে চলিত ভাষায় এই অপিনিহিতির প্রভাব এখনও খুব প্রবল। ইহা সাধু ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। য-ফলার ভিতরে যে ই-ধ্বনি আছে তাহাকে অবলম্বন করিয়াও অপিনিহিতি হয়।

দৃষ্টান্ত। আজি, কালি > আইজ, কাইল (পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক উচ্চারণ আজ, কাল); রাতি (রাত্রি) > রাইত > রা'ত ; গাঁটি > গাঁইট > গাঁট ; সাধু > সাউধ ; সাধুয়ের > সাউধের > সেধের ; সত্য > সইত্য (সইত্ত); কল্য > কইল্য ; কাব্য > কাইব্য [কাইব্ব] ; লক্ষ্য > লইক্ষ্য ; করিয়া > কইর‍্যা।

(ঘ) অভিশ্রুতি (Umlaut, Vowel Mutation)। উপরে আমরা দেখিয়াছি, অপিনিহিতির ই, উ পূর্ববঙ্গে এখনও উচ্চারিত হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে এই অপিনিহিতির স্বর একাক্ষর শব্দে সাধারণতঃ লোপ পায়। একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে এই ই, উ (বা উ-জাত ই) পূর্বস্বরকে প্রভাবান্বিত করিয়া পরিবর্তিত করিয়া দেয়। এই স্বর পরিবর্তনকে বা স্বরের বিলোপকে **অভিশ্রুতি** বলে।

যেমন—করিয়া > কইর‍্যা [অপিনিহিতি] > ক'রে [অভিশ্রুতি]। এইরূপ—ধরিব > ধ'রব ; রাখিও (রাখিহ) > রেখো ; আসিও (আসিহ) > এসো ; বাছিয়া > বেছে ; পানিহাটি > পেনেটি ; করিয়াছি > করেছি ; শহরিয়া > শহুরে ; গাছুয়া > গেছো ইত্যাদি।

(ঙ) ধাতুর মূল স্বরধ্বনির অপগমন বা বিকৃতিকে **অপশ্রুতি** (Ablaut বা Vowel Alterance) বলে। সংস্কৃতেই ইহার প্রয়োগ, বাংলায় কেবল কয়েকটি ক্রিয়ায় দেখা যায়। যথা—চল্—চলে, ণিজন্ত চালায়। নড়া—নড়ে, ণিজন্ত—নাড়ায়।

(চ) **দ্বিমাত্রিকতা**—বাংলা উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট রীতি এই যে, প্রস্বর বা স্বরাঘাত সাধারণতঃ শব্দের প্রথম অক্ষরের (সিলেবল্) উপরে পড়ে। তাহার ফলে বড় বড় শব্দগুলি উচ্চারণে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। চলিত বাংলায় এই জন্য তিন, চারি বা ততোধিক মাত্রার শব্দগুলি দুই মাত্রায় উচ্চারিত হয়। ইহাকেই বলে **দ্বিমাত্রিকতা**। যথা—

পাগল (পা-গল্), পাগলী (পাগ্-লী), পাগলা (পাগ্-লা), বাদল (বা-দল্) বাদলা (বাদ্-লা) ; চলিত (চ-লিত), চলতি (চল্-তি) ; হলুদ (হ-লুদ), হ'লদে (হ'ল্-দে) ; বিপিন (বি-পিন্), বিপনে (বিপ্-নে) ; করিতেছি—করছি (কর্-ছি), সমর্পিয়া—সঁপিয়া—সঁপে।

(ছ) **য়-শ্রুতি** ও (**অন্তঃস্থ**) **ব-শ্রুতি** (Glides)—বাংলায় পাশাপাশি দুইটি স্বরের উচ্চারণ করিতে আমাদের কষ্ট হয়, তাই সাধারণতঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য

এবং শুনিতে ভাল লাগে বলিয়া এই দুই স্বরের ভিতরে য়-ধ্বনি (y) বা ব-ধ্বনির (w=বাংলা ওয়, ও) আগম হয়। এই **য়-ধ্বনি ও ব-ধ্বনিকে য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি** বলে। যথা—কেআ>কেয়া ; শূকর>শূঅর>শূয়র>শূওর ; যাআ>যাওয়া ; করিআ>করিয়া ; মোআ>মোয়া ; ধোআ>ধোয়া ইত্যাদি।

(জ) **বর্ণ-বিপর্যয়**—একই শব্দে অবস্থিত বর্ণের পরস্পর স্থান পরিবর্তনের নাম বর্ণ-বিপর্যয়। যথা—বাস্ক (বাক্স, box), সিংহ (<হিন্স্+অচ্) ; পিচাশ (পিশাচ), রিস্কা (রিক্সা) ; বানারসী (বারাণসী)।

(ঝ) **স্বরাগম** বা **স্বরের পূর্বাগম**—শব্দের প্রথমে যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনি থাকিলে অনেক সময় উহার পূর্বে একটি স্বরধ্বনির আগম হয়। ইহাকে **স্বরাগম** (Prothesis) বলে। যথা—স্কুল>ইস্কুল, স্ত্রী>ইস্ত্রী, স্টিমার>ইস্টিমার, স্টেশন>ইস্টিশন, স্টেবল>আস্তাবল, স্ক্রুপ>ইস্ক্রুপ।

শব্দের শেষেও স্বরধ্বনির আগমন হয় (Apothesis)।—ইঞ্চ>ইঞ্চি, লিস্ট>লিস্টি, দুষ্ট>দুষ্টু, মিষ্ট>মিষ্টি।

(ঞ) **সমীভবন**—পাশাপাশি দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ একটি অপরটির সারূপ্য বা এক-জাতীয় ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাকে **সমীকরণ** বা **সমীভবন** (Assimilation) বলে। যথা—বজ্জাত (<বদ্জাত), ঘরকন্না (ঘরকরনা), বট্‌ঠাকুর (বড়ঠাকুর), এদ্দিন (<এতদিন), আন্নাকালী (<আর না কালী)।

(ট) **অসমীকরণ** বা **বিষমীভবন** (Dissimilation)—শব্দস্থিত সমবর্ণ বা প্রায় সমোচ্চারিত বর্ণের স্থলে অসমান বর্ণ উচ্চারণ করার রীতিকে **অসমীকরণ** বলে। যথা—লাঙ্গল>নাঙ্গল, লাল>নাল, তরবার>তলোয়ার।

(ঠ) **বর্ণদ্বিত্ব**—উচ্চারণে জোর দিবার জন্য শব্দস্থ ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা—বড্ড (বড়), সক্কাল (সকাল), সব্বাই (সবাই), পাক্কা (পাকা)।

(ড) **ধ্বনি-বিলোপ বা বর্ণলোপ**—সন্ধিস্থলে বা উচ্চারণে বর্ণবিশেষের লোপকে বর্ণলোপ বলে। যথা— কাঁচা+কলা=কাঁচকলা, মিশি+কালো=মিশ্‌কালো, জগৎ+বন্ধু=জগবন্ধু, জগৎ+মোহন=জগমোহন, আলাহিদা>আলাদা, ফাল্গুন>ফাগুন, আলোক>আলো, বউদিদি>বউদি।

আধুনিক বাংলা ভাষায় পদান্ত অ-কারের প্রায়ই উচ্চারণ হয় না। যথা—হাত্, ভাত্, করেন্, উত্তম্, অবকাশ্ (অনু. ১১ দ্রষ্টব্য)। ম-ফলা, য-ফলা, ব-ফলার, ম, য, ব কখন উচ্চারিত হয় না। (অনু. ১২, ১৩)।

(ঢ) **শব্দের মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কার লোপ**—সাধু ভাষায় শব্দের ভিতরে বা অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে র-কার বা রেফ থাকিলে চলিত ভাষায় সেই র-কার লোপ পায়। যথা—তর্ক>তক্ক ; করতে, কর্তে>কত্তে ; ধর্ম>ধম্ম। দুই স্বরের মধ্যে 'হ' থাকিলে তাহাও লোপ পায়। যথা—ফলাহার>ফলার ; গাহি>গাই ; কহে>কয় ; সিপাহি>সিপাই ;আল্লাহ্>আল্লা।

অনুশীলন

১। বর্ণ কাহাকে বলে ? বর্ণ কত প্রকার ? বাংলা বর্ণ কয়টি ? অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু কোন্ বর্ণ ?

২। নিম্নলিখিত বর্ণগুলি যোগ করিলে কিরূপ আকার হইবে দেখাও :—

ক্+ষ্, ক্+র্+উ, ক্+ষ্+ন, র্+ম্+য, ঙ+ক্+য, ত্+ত্+ব, হ্+ন।

৩। বর্ণ বিশ্লেষণ কর :—ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, সূক্ষ্ম, শর্মা, শ্বশ্রূ, স্কুল, হাইকোর্ট, দুঃখ, নিয়োগ।

৪। লঘু ও গুরু স্বর কাহাকে বলে ? উহাদের দৃষ্টান্ত দাও।

৫। 'মুক্তস্বর' ও 'রুদ্ধস্বর' কাহাকে বলে এবং কোন্‌গুলি ? (৫ক) 'মুক্তদল' ও 'রুদ্ধদল' কাহাকে বলে ? দৃষ্টান্ত দাও।

৬। অ-কার এবং এ-কারের বিভিন্ন উচ্চারণ কি কি ? (উঃ মাঃ, স্কুল ফাঃ) কোন্ কোন্ স্থলে অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের ন্যায় হয় ? 'নব্য' 'ব্যক্ত' 'ব্যক্তি' এই তিন শব্দে 'ব্য'-এর বিভিন্ন উচ্চারণ কি ? ক্ষ, হ্য, জ্ঞ—ইহাদের উচ্চারণ কিরূপ ?

৭। দল (ধ্বনি) কাহাকে বলে ? ৩টি রুদ্ধস্বর বা যুক্তস্বরের দৃষ্টান্ত দাও। নিম্নলিখিত শব্দগুলির দল ভাগ কর :—কলসী, রামচন্দ্র, নিয়ামৎ, ঘটক, শরীর, পালন, কৈলাস।

৮। জ ও য, ঙ ও ঞ, শ ও স, র ও ড় ইহাদের উচ্চারণে কোন পার্থক্য থাকিলে বল। অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ নির্দেশ কর।

৯। উচ্চারণ-স্থানভেদে বর্ণ-বিভাগ কর।

১০। শুদ্ধরূপে উচ্চারণ কর :—কাব্য, অব্যয়, অনন্ত, বাক্য, মণি, মন, যত্ন, প্রশ্ন, বড়, ছোট, কোন, মেজ, বর, বড়, পরা, পড়া, চর, চড়, অজর, অজড়।

১১। বিভিন্ন উচ্চারণসহ অর্থ-বৈলক্ষণ্য লিখ :—কি, কী, মেলা, গেলা, মত, ভাল, কাল, কোন, করে। কোন্ কোন্ বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি হয় দৃষ্টান্তসহ লিখ।

১২। যে কোন তিনটির বা চারিটির উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর :—অ, ঋ, ভ, স, ং, ক্ষ, (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৩)। ঋ, ঔ, ঞ, ভ, হ (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৪)। ঈ, ঐ, ঙ, চ, ভ, শ, (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৫)। এ, ও, চ, ঞ, জ্ঞ (কলিকাতা প্রবেশিকা, ১৯৪৬)। ঋ, ক, ঙ, ঞ, ল, শ, ষ, স, ও, ঐ (ঢাকা বোর্ড ১৯৪৮)। ঐ ল ক্ষ ং ষ ণ ঞ (স্কু. ফা. '৬২)। এ ও চ ঢ ব ল স্কু. ফা. ১৯৫৯)।

১৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপ্রকর্ষ দ্বারা পরিবর্তিত রূপ দাও :—মুক্তা, মূর্তি, ভ্রম, গাত্র, মর্দ, চক্র, মন্ত্র, গর্জন।

১৪। স্বর-সঙ্গতি কাহাকে বলে ? স্বর-সঙ্গতির কতকগুলি দৃষ্টান্ত দাও (যাহা এই বইতে দেওয়া নাই)।

১৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ভিতরে বাংলা উচ্চারণ-রীতির কি কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ?—বেগ্‌নে (বেগুনে), ছেলে, মেয়ে, রাইতের, ইচ্ছে, সুতো, পিরদীম (পেরদীম), পরখ (পরীক্ষা), ধোয়া (ধৌত করা), কান্না (কাঁদনা), হ'য়ে, রে'খে, গে'য়ে, কাল, মুকতি, পরম, পাগলী, গেছো, মেটে, রিস্‌কা, ইস্ত্রী, বড্ড।

১৬। উদাহরণসহ নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা কর বা টীকা লিখ :—বিপ্রকর্ষ, য়-শ্রুতি (কলিকাতা, ১৯৪৬), স্বর-সঙ্গতি (উ. মা. '৬২, ৬৪) অভিশ্রুতি (ঢাকা বোর্ড, ১৯৪৯) মহাপ্রাণ বর্ণ (স্কুল ফাইনাল, ১৯৫২) তালব্য বর্ণ, তৎসম শব্দ (স্কুল ফাইনাল, ১৯৫২), অল্পপ্রাণ বর্ণ, এ-কারের বিশুদ্ধ এবং বিকৃত উচ্চারণ, তদ্ভব শব্দ (স্কুল ফাইনাল, ১৯৫৩), উষ্মবর্ণ, স্বরভক্তি, তৎসম শব্দ (স্কুল, ফা. '৫৫), খাঁটি বাংলা সন্ধি, তদ্ভব শব্দ (স্কুল ফা. '৫৬), স্বরাগম, দ্বিমাত্রিকতা, অন্তঃস্থ বর্ণ, আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ, বর্ণাগম (উ. মা. '৬০), স্পর্শবর্ণ, অনুনাসিক বর্ণ, (উ, মা. '৬১) চলিত ভাষা, তদ্ভব শব্দ (উ. মা. '৬৪)। অল্পপ্রাণ বর্ণ, ভগ্ন তৎসম শব্দ, অন্তঃস্থ বর্ণ, দেশী শব্দ, (উ. মা. '৬৩)। অর্ধতৎসম শব্দ, বিপ্রকর্ষ, ঘোষবর্ণ, দেশী শব্দ, মহাপ্রাণ বর্ণ, স্বরসঙ্গতি (উ. মা. '৬২)। প্রাকৃতজ শব্দ, উষ্মবর্ণ, স্বরভক্তি, দেশী শব্দ (উ. মা. '৬১)। কোন্‌গুলি দন্ত্য বর্ণ এবং কেন (উ. মা. '৬৯)।

বাক্য-প্রকরণ

বাক্য—পদ-বিন্যাস ও পদান্বয়

(Syntax—Arrangement and Agreement)

যে পদসমূহের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়, তাহার নাম **বাক্য**।

১। **বাক্যের লক্ষণ**। মনে রাখিবে, বিশুদ্ধ বাক্যের তিনটি লক্ষণ—

(১) আকাঙ্ক্ষা, (২) যোগ্যতা, (৩) আসত্তি।*

২। **আকাঙ্ক্ষা**। বাক্যের অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত এক পদের পর অপর পদ শুনিবার যে ইচ্ছা তাহার নাম 'আকাঙ্ক্ষা'। আকাঙ্ক্ষা অনুসারে পদ-প্রয়োগ না করিলে বাক্যার্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় না। যেমন—

(১) শিক্ষক মহাশয় যদুর অভিযোগ শুনিয়া রমেশকে —।

(২) — যদুর অভিযোগ শুনিয়া রমেশকে তিরস্কার করিলেন।

(৩) শিক্ষক মহাশয় যদুর — শুনিয়া — তিরস্কার করিলেন।

এখানে প্রথম বাক্যে ক্রিয়াপদ, দ্বিতীয় বাক্যে কর্তৃপদ ও তৃতীয় বাক্যে কর্মপদ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, সুতরাং এগুলি বাক্য হয় নাই। প্রত্যেক বাক্যেই একটি কর্তৃপদ ও একটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ আবশ্যক এবং ক্রিয়া সকর্মক হইলে উহার কর্মপদ ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ বাক্য সম্পূর্ণ হয় না।

৩। **যোগ্যতা**। অর্থবোধ বিষয়ে পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধা না থাকাকে যোগ্যতা বলে। যথা—গাভীগুলি উড়িতেছে। পাখীগুলি ঘাস খাইতেছে।

গাভীর উড়িবার যোগ্যতা নাই, পাখীর ঘাস খাইবার যোগ্যতা নাই। সুতরাং এগুলি বাক্য হইল না, তবে ব্যঙ্গোক্তিতে এবং দেবপ্রভাবাদি বর্ণনস্থলে আপাততঃ যোগ্যতা না থাকিলেও বাক্য হইয়া থাকে।

ব্যঙ্গোক্তি—"আজ পূর্ণিমাতে অমাবস্যা তের প্রহর অন্ধকার।"

দেবপ্রভাব—"অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্বত্র গতাগতি।"

৪। **আসত্তি**। অর্থসঙ্গতিক্রমে বাক্যমধ্যে পূর্বাপর পদ-স্থাপনের নাম 'আসত্তি'। যথা—শিক্ষক মহাশয় অভিযোগ যদুর শুনিয়া করিলেন তিরস্কার রমেশকে

এই পদসমষ্টিতে আসত্তি নাই বলিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন পদগুলি পূর্বাপর সন্নিবিষ্ট হয় নাই বলিয়া উহার অর্থবোধ হয় নাই, কাজেই ইহা বাক্য নহে। এস্থলে কিরূপ ভাবে পদগুলি সন্নিবেশ করিলে বাক্য হইত, তাহা তোমরা বোধ হয় বলিতে পার।

৫। প্রত্যেক ভাষায়ই বাক্যে পদ-সন্নিবেশের বিশিষ্ট রীতি আছে। এ বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজী ভাষার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে।

---

* বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তপদোচ্চয়ঃ। —সাহিত্যদর্পণ (২য় পরিচ্ছেদ ১ সূত্র)

বাক্যে পদ স্থাপনের সাধারণ নিয়ম

৬। **বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ**। বাক্যস্থিত বিশেষ্যপদের সহিত ক্রিয়াপদের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম কারক। কর্তৃকর্মাদি-ভেদে এই সম্বন্ধ ছয় প্রকার। কারক অনুসারেই বাক্যে বিশেষ্যের স্থান নির্ণীত হয়। বিভিন্ন কারক-পদগুলি বাক্যে কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে কর্তৃপদ ও সর্বশেষে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বসে। ক্রিয়াপদ সকর্মক হইলে কর্মপদটি ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা—শিক্ষক মহাশয় রমেশকে তিরস্কার করিলেন।

২। দ্বিকর্মক হইলে গৌণকর্ম (ব্যক্তিবাচক কর্ম) মুখ্য কর্মের (বস্তুবাচক কর্মের) পূর্বে বসে। যথা—প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে ইংরেজী পড়ান। তুমি আমাকে কথা দিয়াছিলে।

৩। অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে এবং সকর্মক হইলে কর্মটি উহার পূর্বে বসে। যথা—তিনি এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন।

৪। করণ, সম্প্রদান ও অপাদান পদ কখনও কর্মপদের পূর্বে বসে, কখনও পরে বসে। যথা—রাখাল যষ্টিদ্বারা গাভীকে প্রহার করিতেছে। যোগ্যবরে কন্যা দিবে। আমি পুস্তকখানি আমার ভ্রাতাকে দিয়াছি। সে বালকটিকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতেছে। সরকার দুর্বৃত্ত লোকটিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রমণী কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছেন।

৫। অধিকরণ পদ অনেক স্থলে কর্তৃপদের পূর্বে বাক্যের প্রথমেই বসে, অনেক স্থলে কর্তৃপদের পরে ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা—তীর্থক্ষেত্রে রাজা দরিদ্রদিগকে ধন দান করিতেছেন, অথবা রাজা দরিদ্রদিগকে তীর্থক্ষেত্রে ধন দান করিতেছেন।

৬। যে পদের সহিত সম্বন্ধ, সম্বন্ধপদ তাহার অব্যবহিত পূর্বে বসে। যথা—রাজার ধন, গঙ্গার জল, গাভীর দুগ্ধ ইত্যাদি। একই বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে দুই বা ততোধিক সম্বন্ধ পদ প্রযুক্ত হইলে সাধারণতঃ শেষ সম্বন্ধপদে সম্বন্ধসূচক 'র' বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

৭। সম্বোধন পদ বাক্যের প্রথমে বা শেষে বসে। যথা—ভগবন্! কর্তব্য-পালনে যেন আমি কখনও বিরত না হই। আজ চল্‌লাম, দুলাল।

দ্রষ্টব্য। পদ্য রচনায় এই সাধারণ পদ-স্থাপন-বিধি অনুসৃত হয় না। ইহা কেবল গদ্য রচনার জন্য

৮। প্রশ্নবোধক বাক্যে স্থলবিশেষে এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম হয়।

৯। **সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম**। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনায় এই সাধারণ নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু দীর্ঘ বাক্য রচনায় এই সকল নিয়ম সর্বত্র খাটে না। বিশেষতঃ রচনা স্পষ্টার্থক ও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য সুকৌশলী লেখকগণ অনেক সময়েই এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন।

বাক্য-প্রকরণ

বাক্য—পদ-বিন্যাস ও পদান্বয়

(Syntax—Arrangement and Agreement)

যে পদসমূহের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়, তাহার নাম **বাক্য**।

১। **বাক্যের লক্ষণ**। মনে রাখিবে, বিশুদ্ধ বাক্যের তিনটি লক্ষণ—

(১) আকাঙ্ক্ষা, (২) যোগ্যতা, (৩) আসত্তি।*

২। **আকাঙ্ক্ষা**। বাক্যের অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত এক পদের পর অপর পদ শুনিবার যে ইচ্ছা তাহার নাম 'আকাঙ্ক্ষা'। আকাঙ্ক্ষা অনুসারে পদ-প্রয়োগ না করিলে বাক্যার্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় না। যেমন—

(১) শিক্ষক মহাশয় যদুর অভিযোগ শুনিয়া রমেশকে —।

(২) — যদুর অভিযোগ শুনিয়া রমেশকে তিরস্কার করিলেন।

(৩) শিক্ষক মহাশয় যদুর — শুনিয়া — তিরস্কার করিলেন।

এখানে প্রথম বাক্যে ক্রিয়াপদ, দ্বিতীয় বাক্যে কর্তৃপদ ও তৃতীয় বাক্যে কর্মপদ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, সুতরাং এগুলি বাক্য হয় নাই। প্রত্যেক বাক্যেই একটি কর্তৃপদ ও একটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ আবশ্যক এবং ক্রিয়া সকর্মক হইলে উহার কর্মপদ ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ বাক্য সম্পূর্ণ হয় না।

৩। **যোগ্যতা**। অর্থবোধ বিষয়ে পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধা না থাকাকে যোগ্যতা বলে। যথা—গাভীগুলি উড়িতেছে। পাখীগুলি ঘাস খাইতেছে।

গাভীর উড়িবার যোগ্যতা নাই, পাখীর ঘাস খাইবার যোগ্যতা নাই। সুতরাং এগুলি বাক্য হইল না, তবে ব্যঙ্গোক্তিতে এবং দেবপ্রভাবাদি বর্ণনস্থলে আপাততঃ যোগ্যতা না থাকিলেও বাক্য হইয়া থাকে।

ব্যঙ্গোক্তি—"আজ পূর্ণিমাতে অমাবস্যা তের প্রহর অন্ধকার।"

দেবপ্রভাব—"অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্বত্র গতাগতি।"

৪। **আসত্তি**। অর্থসঙ্গতিক্রমে বাক্যমধ্যে পূর্বাপর পদ-স্থাপনের নাম 'আসত্তি'। যথা—শিক্ষক মহাশয় অভিযোগ যদুর শুনিয়া করিলেন তিরস্কার রমেশকে

এই পদসমষ্টিতে আসত্তি নাই বলিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন পদগুলি পূর্বাপর সন্নিবিষ্ট হয় নাই বলিয়া উহার অর্থবোধ হয় নাই, কাজেই ইহা বাক্য নহে। এস্থলে কিরূপ ভাবে পদগুলি সন্নিবেশ করিলে বাক্য হইত, তাহা তোমরা বোধ হয় বলিতে পার।

৫। প্রত্যেক ভাষায়ই বাক্যে পদ-সন্নিবেশের বিশিষ্ট রীতি আছে। এ বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজী ভাষার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে।

---

* বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তপদোচ্চয়ঃ। —সাহিত্যদর্পণ (২য় পরিচ্ছেদ ১ সূত্র)

বাক্যে পদ স্থাপনের সাধারণ নিয়ম

৬। **বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ।** বাক্যস্থিত বিশেষ্যপদের সহিত ক্রিয়াপদের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম কারক। কর্তৃকর্মাদি-ভেদে এই সম্বন্ধ ছয় প্রকার। কারক অনুসারেই বাক্যে বিশেষ্যের স্থান নির্ণীত হয়। বিভিন্ন কারক-পদগুলি বাক্যে কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে কর্তৃপদ ও সর্বশেষে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বসে। ক্রিয়াপদ সকর্মক হইলে কর্মপদটি ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা—শিক্ষক মহাশয় রমেশকে তিরস্কার করিলেন।

২। দ্বিকর্মক হইলে গৌণকর্ম (ব্যক্তিবাচক কর্ম) মুখ্য কর্মের (বস্তুবাচক কর্মের) পূর্বে বসে। যথা—প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে ইংরেজী পড়ান। তুমি আমাকে কথা দিয়াছিলে।

৩। অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে এবং সকর্মক হইলে কর্মটি উহার পূর্বে বসে। যথা—তিনি এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন।

৪। করণ, সম্প্রদান ও অপাদান পদ কখনও কর্মপদের পূর্বে বসে, কখনও পরে বসে। যথা—রাখাল যষ্টিদ্বারা গাভীকে প্রহার করিতেছে। যোগ্যবরে কন্যা দিবে। আমি পুস্তকখানি আমার ভ্রাতাকে দিয়াছি। সে বালকটিকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতেছে। সরকার দুর্বৃত্ত লোকটিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রমণী কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছেন।

৫। অধিকরণ পদ অনেক স্থলে কর্তৃপদের পূর্বে বাক্যের প্রথমেই বসে, অনেক স্থলে কর্তৃপদের পরে ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা—তীর্থক্ষেত্রে রাজা দরিদ্রদিগকে ধন দান করিতেছেন, অথবা রাজা দরিদ্রদিগকে তীর্থক্ষেত্রে ধন দান করিতেছেন।

৬। যে পদের সহিত সম্বন্ধ, সম্বন্ধপদ তাহার অব্যবহিত পূর্বে বসে। যথা—রাজার ধন, গঙ্গার জল, গাভীর দুগ্ধ ইত্যাদি। একই বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে দুই বা ততোধিক সম্বন্ধ পদ প্রযুক্ত হইলে সাধারণতঃ শেষ সম্বন্ধপদে সম্বন্ধসূচক 'র' বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

৭। সম্বোধন পদ বাক্যের প্রথমে বা শেষে বসে। যথা—ভগবন্! কর্তব্য-পালনে যেন আমি কখনও বিরত না হই। আজ চল্‌লাম, দুলাল।

দ্রষ্টব্য। পদ্য রচনায় এই সাধারণ পদ-স্থাপন-বিধি অনুসৃত হয় না। ইহা কেবল গদ্য রচনার জন্য

৮। প্রশ্নবোধক বাক্যে স্থলবিশেষে এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম হয়।

৯। **সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনায় এই সাধারণ নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু দীর্ঘ বাক্য রচনায় এই সকল নিয়ম সর্বত্র খাটে না। বিশেষতঃ রচনা স্পষ্টার্থক ও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য সুকৌশলী লেখকগণ অনেক সময়েই এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন।

ইংরেজীতে বাক্যে সর্বদাই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু বাংলায় অনেক স্থলে ক্রিয়াপদ উহ্য রাখিলেই বাক্যের সৌষ্ঠব বর্ধিত হয়। বিশেষতঃ বর্তমান কালের 'হওয়া' ক্রিয়া উহ্য রাখাই সাধারণ নিয়ম। যথা—'সীতার কাহিনী দুঃখ, পবিত্রতা ও ত্যাগের কাহিনী। ইহার বিশাল আলেখ্য হিন্দুস্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও সুশোভিত।'—(দীনেশচন্দ্র সেন)। 'খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী অতীত। মহারাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের সুশাসন মহিমায় ভারতভূমি সম্পত্তি-শালিনী।' —(রজনীকান্ত গুপ্ত)

অনুশীলন

১। নিম্নলিখিত পদগুলি অর্থসঙ্গত রূপে ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

(ক) শ্রেষ্ঠ, পৃথিবী, বিস্মিত, দেখিয়া, হইতেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ, গবেষণা, জগদীশচন্দ্রের, আচার্য। (খ) ভাগই, আমাদের, তিন, দেহের, প্রায়, ভাগের জল, দুই। (গ) এক, অতি, নামে, ঋষি, পূর্বকালে, ছিলেন, আয়োদধৌম্য। (ঘ) শিক্ষালাভ হইতে, স্থান, নিকটে, আসিত, করিতে, তাহার, বিভিন্ন, ছাত্রগণ, ভারতের। (ঙ) কর্তব্য, তিনি, করিব, যাহা, বলিবেন, অবশ্যই, তাহা।

২। পদগুলি যথোপযুক্তরূপে সন্নিবেশিত করিয়া বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :—

(ক) আমার হাতে দেখিতেছ সেই পুঁথিখানি যাহা দিয়েছিলে কাল তুমি রমেশকে পড়িতে এবং পাঠ করিয়া যাহা পারে নাই হাস্যসংবরণ করিতে রমেশ। (কলিকাতা প্রবেশিকা)

(খ) নিকটে দণ্ডায়মান ছিল একটি লোক অতি বৃদ্ধ, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাকে সেই বাড়ীর কথা, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না সে ব্যক্তি।

বাক্যের শ্রেণী-বিভাগ

১। **উদ্দেশ্য ও বিধেয়।** প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় তাহা **উদ্দেশ্য** এবং 'উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে যাহা বলা যায় তাহা **বিধেয়**। বাক্যের কর্তা 'উদ্দেশ্য' এবং সমাপিকা ক্রিয়া 'বিধেয়'।

উদ্দেশ্য	বিধেয়
কাক	ডাকিতেছে।
বালকটি	আসিয়াছিল।

কোন বিশেষ্য পদ বা বিশেষ্যস্থানীয় অপর পদ বা পদসমষ্টি বাক্যের 'উদ্দেশ্য' হইতে পারে।

১। বিশেষ্য—'কাক' ডাকিতেছে।
২। সর্বনাম—'সে' পড়িতেছে।
৩। বিশেষণ—'ধার্মিকেরাই' প্রকৃত সুখী (হয়)।
৪। বাক্যাংশ—'মিথ্যাকথা বলা' বড় দোষ (হয়)।

কেবলমাত্র একটি সমাপিকা (Finite) ক্রিয়াই বাক্যের 'বিধেয়' হইতে পারে। কিন্তু ঐ ক্রিয়াপদটি যদি **সকর্মক** হয়, তবে উহার কর্মটিও বিধেয়ের সঙ্গে থাকে। কর্মটির কোন বিশেষণ থাকিলে তাহা উহার সঙ্গে বিধেয়াংশে থাকে। আবার, কোন কোন ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদ বা পদ-সমষ্টির ব্যবহার না থাকিলে বাক্যার্থ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় না। এগুলিকে বলে **অনুপূরক** পদ (Complement)। এইগুলি বিধেয়াংশভুক্ত থাকে। বিধেয়-বিশেষণগুলি প্রায়ই অনুপূরক পদরূপে ব্যবহৃত হয়। বাক্যের ক্রিয়াপদ অনেক সময় উহ্য থাকিতে পারে। কিন্তু ক্রিয়ার কর্মপদ ও অনুপূরক পদের ব্যবহার না করিলে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে। যথা—

অসম্পূর্ণ বাক্য	**সম্পূর্ণ বাক্য**
আমি তাহাকে শুনিলাম (অনুপূরক পদ নাই)	আমি তাহাকে 'না' বলিতে শুনিলাম।
সে হইয়াছে (অনুপূরক পদ নাই)	সে 'পাগল' হইয়াছে।
পুলিশে ধরিয়াছে (কর্ম নাই)	পুলিশে 'চোর' ধরিয়াছে।

২। **বাক্যের শ্রেণী-বিভাগ**। গঠন অনুসারে বাক্য **তিন** প্রকার—**সরল বাক্য, যৌগিক বাক্য ও জটিল বাক্য**।

যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা **সরল বাক্য** (Simple Sentence)। যথা—(১) তিনি বাজারে গেলেন। (২) আমি বাসায় আসিলাম।

ইহাদের প্রত্যেকটি সরল বাক্য।

পরস্পর-নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক বাক্য কোন সহযোগী সমুচ্চয়ী অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে পূর্ণবাক্য গঠিত হয়, তাহা **যৌগিক বাক্য** (Compound Sentence)।

(ক) তিনি বাজারে গেলেন এবং (খ) আমি বাসায় আসিলাম।

এখানে (ক) ও (খ) এই দুইটি পরস্পর-নিরপেক্ষ, কেননা ইহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যাকরণগত কোন সম্বন্ধ নাই—অর্থবোধের জন্য একটি অপরটির অপেক্ষা করে না, একটি না থাকিলেও অপরটির অর্থ-প্রতীতি হইতে পারে। এই দুইটি বাক্য 'এবং' এই সহযোগী সমুচ্চয়ী অব্যয় দ্বারা সংযোজিত হইয়া একটি পূর্ণবাক্য গঠিত করিয়াছে। ইহা **যৌগিক বাক্য**।

দুই বা ততোধিক সরল বাক্য দ্বারাই যে যৌগিক বাক্য গঠিত হয় তাহা নয়, দুই বা ততোধিক জটিল বাক্যের দ্বারা বা সরল এবং জটিল উভয় জাতীয় বাক্যের যোগেই যৌগিক বাক্য গঠিত হইতে পারে।

একটি প্রধান বাক্যের সহিত উহার অঙ্গীভূত অন্য অপ্রধান বাক্য কোন অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বা কোন সাপেক্ষ সর্বনাম দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে পূর্ণবাক্যটি গঠিত হয়, তাহা **জটিল বাক্য** (Complex Sentence)। যথা—

(ক) তিনি বলিলেন যে (খ) আমি দোষী।

এখানে (খ) এই অপ্রধান বাক্যটি (ক) এই প্রধান বাক্যের অঙ্গীভূত, কেননা উহা 'বলিলেন' ক্রিয়ার কর্ম, কাজেই বাক্য দুইটি পরস্পর-সাপেক্ষ,

অর্থাৎ একটি ব্যতীত অপরটির অর্থ প্রতীতি হয় না। এই বাক্য দুইটি 'যে' এই অনুগামী অব্যয়দ্বারা সংযুক্ত হইয়া যে পূর্ণ বাক্যটি গঠিত করিয়াছে, উহা জটিল বাক্য।*

যে বাক্যগুলি লইয়া একটি পূর্ণ যৌগিক ও জটিল বাক্য গঠিত হয়, তাহাদিগকে **উপাদান-বাক্য** (Clause)† বলে। উপাদান-বাক্য দ্বিবিধ—**নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্য** (Co-ordinate Clause) ও **সাপেক্ষ** বা **অপ্রধান উপাদান-বাক্য** (Sub-ordinate Clause)। যৌগিক বাক্যের উপাদান-বাক্যগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ (দৃষ্টান্ত পূর্বে দেখ)।

জটিল বাক্যে একটি প্রধান উপাদান-বাক্য (Principal Clause (এবং একটি বা একাধিক অপ্রধান উপাদান বাক্য থাকে।

অপ্রধান উপাদান-বাক্য তিন প্রকার— (১) বিশেষ্যস্থানীয়, (২) নাম বিশেষণীয়, (৩) ভাব-বিশেষণীয়।

(১) যে উপাদান-বাক্য বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত কোন্ পদের সহিত অন্বিত হয়, তাহা **বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান-বাক্য** (Noun Clause)। যথা—

প্রধান বাক্য	বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান-বাক্য	প্রধান বাক্যের সহিত সম্বন্ধ
আমি জানি না	সে কোথায় থাকে	'জানি না' ক্রিয়ার কর্ম
ইহা নিশ্চিত	সে শীঘ্রই আসিবে	'ইহা' এই কর্তৃপদের সমপদ

(২) যে উপাদান-বাক্য নাম-বিশেষণের মত ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত কোন পদকে বিশেষ করে, তাহা **নাম-বিশেষণীয় উপাদান-বাক্য** (Adjective Clause)। যথা—

প্রধান বাক্য	নাম-বিশেষণীয় উপাদান-বাক্য	প্রধান বাক্যের সহিত সম্বন্ধ
এমন লোক নাই	যে শোক পায় নাই	'লোক' পদের বিশেষণ
সে পায় না	যে চায়	'সে' পদের বিশেষণ

(৩) যে উপাদান-বাক্য ভাব-বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত কোন পদকে বিশেষ করে, তাহা **ভাব-বিশেষণীয় উপাদান বাক্য** (Adverbial Clause)। **যথা—**

ভাব-বিশেষণীয় উপাদান-বাক্য	প্রধান বাক্য	প্রধান বাক্যের সহিত সম্বন্ধ
আমি যখন পড়ি	সে তখন খেলা করে	'খেলা করে' ক্রিয়ার বিশেষণ (সময়বোধক)
যদিও সূর্যাস্ত হয় নাই	তথাপি অন্ধকার হইয়াছে	'হইয়াছে' ক্রিয়ার বিশেষণ (বৈপরীত্যসূচক)

* উপাদান-বাক্যকে কেহ 'আনুষঙ্গিক', কেহ কেহ বা 'অনুসন্ধি' বাক্যও বলিয়াছেন। এই উভয় শব্দেই Sub-ordinate Clause-এর ধ্বনি আসে।

† Complex Sentenceকে কেহ 'মিশ্রবাক্য', কেহ বা 'জটিল বাক্য' বলিয়াছেন। 'জটিল' শব্দটিই আমাদের নিকট সুসঙ্গত বোধ হয়। বিশেষতঃ যৌগিক ও জটিল বাক্যের যোগে যে বৃহত্তর জটিল বা যৌগিক বাক্য গঠিত হয়, ইংরেজীতে তাহাকে অনেক সময় মিশ্রবাক্য (Mixed Sentence) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাক্য দুই প্রকার—সরল ও মিশ্র। মিশ্র বাক্য আবার যৌগিক ও জটিল ভেদে দুই প্রকার।

ভাব-বিশেষণীয় উপাদান-বাক্য	প্রধান-বাক্য	প্রধান বাক্যের সহিত সম্বন্ধ
যেন সকলেই পায়	এইরূপ ভাবে পরিবেশন কর	'কর' ক্রিয়ার বিশেষণ (রকম বা পরিমাণ-বোধক)

কর্তা ও সমাপিকা-ক্রিয়াবিহীন পদসমষ্টিকে **বাক্যাংশ** (Phrase) বলে। বাক্যাংশ ত্রিবিধ—**বিশেষ্যস্থানীয়, নাম-বিশেষণীয়, ভাব-বিশেষণীয়।**

বিশেষ্যস্থানীয় বাক্যাংশ (Noun Phrase)—দুই মাসের ছুটি, বিবাহের হাসি-কোলাহল, ত্রিশ ক্রোশ পথ, একদল সিপাহী, তিন গাড়ী ইট ইত্যাদি।

নাম-বিশেষণীয় বাক্যাংশ (Adjective Phrase)—দুই ফুট উচ্চ, দশ মাইল দূরবর্তী, আহ্লাদে আত্মহারা, বিপদে অধীর, কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ইত্যাদি।

ভাব-বিশেষণীয় বাক্যাংশ (Adverbial Phrase)—দয়ার অনুরোধে, চিরকালের জন্য, যথোচিত সম্মানের সহিত, অতি সংক্ষেপে, অল্পে অল্পে ইত্যাদি

৩। **বাক্য-বিবর্ধন**। এক বা ততোধিক পদদ্বারা বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশকে বর্ধিত বা প্রসারিত করা যায়। যথা—

বালকটি আসিয়াছিল।

সেই বালকটি **কাল** আসিয়াছিল।

সেই দরিদ্র বালকটি **কাল এখানে** আসিয়াছিল।

সেই পিতৃহীন দরিদ্র বালকটি **কাল কাঁদিতে কাঁদিতে এখানে** আসিয়াছিল।

এস্থলে নিম্নরেখ পদগুলিদ্বারা 'উদ্দেশ্য' এবং বৃহদাকার পদগুলিদ্বারা 'বিধেয়াংশ' প্রসারিত হইয়াছে।

যে পদ বা পদসমষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্যটি বর্ধিত ও প্রসারিত হয়, তাহাকে বলে **উদ্দেশ্যের প্রসারক** (Adjuncts to the Subject)।

উদ্দেশ্যটি যখন বিশেষ্য পদ, তখন উদ্দেশ্যের প্রসারক অবশ্য বিশেষণ বা তৎস্থলবর্তী কোন পদ বা পদসমষ্টি হইবে। নিম্নলিখিত পদগুলি উদ্দেশ্যের প্রসারক হইতে পারে।

(১) বিশেষণ পদ—'সাধু' লোক সর্বদাই সুখী।
(২) সম্বন্ধপদ—'তাহার' পিতা কাল আসিবেন।
(৩) সমকারক পদ—'সম্রাট্' অশোক বিশ্বহিতৈষী ছিলেন।
(৪) নাম-বিশেষণীয় বাক্যাংশ—'তাঁহার মত ধার্মিক' লোক জগতে দুর্লভ।

যে পদ বা পদসমষ্টি দ্বারা বিধেয়টি প্রসারিত হয়, তাহাকে বলে **বিধেয়ের প্রসারক** (Adjuncts to the Predicative Verb)।

বিধেয়টি ক্রিয়াপদ, সুতরাং বিধেয়ের প্রসারকটি ক্রিয়া-বিশেষণ বা তৎস্থলীয় পদ বা পদসমষ্টি হইবে।

নিম্নলিখিতগুলি বিধেয়ের প্রসারক হইতে পারে :—

(১) ভাব-বিশেষণ—তিনি 'তাড়াতাড়ি' চলিয়া গেলেন।

(২) ভাব-বিশেষণীয় বাক্যাংশ—(ক) তিনি 'চিরকালের জন্য' চলিয়া গেলেন। (খ) 'মনোযোগ দিয়া' পড়িবে। (গ) 'স্মৃতিভ্রংশ হইতে' বুদ্ধিনাশ হয়। (ঘ) লক্ষ্মণ অগ্রজ 'রামচন্দ্রের সহিত' বনে গমন করিলেন। (ঙ) 'এস্থান হইতে' প্রস্থান কর। **বিধেয়ের প্রসারণ** সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখিবে—

বাক্য-বিবর্ধন—বিধেয়ের প্রসারণ

(ক) 'করিয়া', 'করিতে', 'করিলে', 'করাতে' ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াসংযুক্ত পদসমষ্টিকে বিধেয়ের প্রসারকরূপে গণ্য করিতে হয়। কারণ ঐগুলিতে ক্রিয়ার সময়, হেতু, রকম ইত্যাদি বুঝায় এবং উহারা প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়া-বিশেষণীয় পদসমষ্টি বলিয়া গণনীয়।

(খ) কর্ম, করণাদি **কারক পদগুলি** 'ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত', সুতরাং উহাদিগকে বিধেয়ের প্রসারকরূপে গণ্য করিতে হয়। এগুলি বিশেষ্য পদ, সুতরাং ইহাদের সঙ্গে বিশেষণ পদও থাকিতে পারে।

(গ) বিশেষণ পদ বাক্যের প্রসারকরূপে ব্যবহৃত হইলে উহাকে বিধেয়-বিশেষণ বলে; উহাও বিধেয়ের প্রসারকরূপে গণনীয়।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে উদ্দেশ্যের ও বিধেয়ের প্রসারক পদগুলি লক্ষ্য কর। নিম্নরেখ পদগুলি উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বৃহদায়তন পদগুলি বিধেয়ের প্রসারক।

দৃষ্টান্ত। লোক আসিয়াছিল। লক্ষ লোক আসিয়াছিল।

গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়াছিল।

অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়াছিল।

সেদিন অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়াছিল।

অতি পূর্বকালে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট্ ছিলেন।

একদিন মৃগের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা **শরাসনে শরসন্ধান** করিলেন। হরিণশিশু **তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলাইতে** আরম্ভ করিল।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় **যেরূপ দয়াশীল সেইরূপ তেজস্বী** ও মহানুভব ছিলেন।"

অনুশীলন

১। বাক্য কাহাকে বলে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দাও। শব্দ ও পদ কাহাকে বলে?

২। কয়েকটি বাক্য রচনা করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ও বিধেয়াংশ দেখাইয়া দাও।

৩। গঠনের ভিত্তিতে বাক্য কত প্রকার ও কি কি? এক একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৪। বাক্য (Sentence), উপাদান-বাক্য (Clause) ও বাক্যাংশ (Phrase)—উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও। প্রধান ও অপ্রধান উপাদান-বাক্যের দুইটি দৃষ্টান্ত দাও।

৫। কিরূপে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়াংশ বর্ধিত হইতে পারে তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৬। (ক) নিম্নলিখিতগুলিকে উদ্দেশ্যের প্রসারক রূপে ব্যবহৃত করিয়া প্রত্যেকটির দ্বারা বাক্য রচনা কর:—বেগশালী, গভীর, অর্থযুক্ত, অবশ্যকর্তব্য, পীড়িতের, অসংখ্য প্রাণীর, সুজলা, সুফলা, সসাগরা, ভগ্নস্বাস্থ্য, সকার্যসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প, শারীরিক পরিশ্রমে কাতর, হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থস্থান।

(খ) বিধেয়ের প্রসারকরূপে ব্যবহৃত করিয়া বাক্য রচনা কর:—বিধাতার বিধানে, দ্রুতপাদবিক্ষেপে, মুহুর্মুহু, দুর্গমগিরি, অতিক্রমপূর্বক, জাতিধর্মানবিশেষে, অযাচিতভাবে, আদ্যোপান্ত, দীনদুঃখীর দুর্দশা দেখিয়া, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, বিপদে সহিষ্ণু, জনসেবায় অগ্রণী, পরহস্তগত ধনের ন্যায়, ইংরেজীতে কাঁচা, খাইতে মিষ্ট, নদীতীরস্থ নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে।

বাক্যান্তরীকরণ বা বাক্য-পরিবর্তন

৪। নানা ভাবে এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীর বাক্যে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বাক্যের অর্থের কোন ব্যত্যয় না ঘটে। নিম্নে বাক্য-পরিবর্তনের বিবিধ নিয়মের ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) **বাক্য-সঙ্কোচন** (Contraction of Sentences)

৫। বাক্যের অন্তর্গত উপাদান-বাক্যকে (Clause) বা পদসমষ্টিকে (Phrase) এক পদে পরিণত করিয়া বাক্য সঙ্কোচন করিতে হয়। যেমন—আপনার কথা বিশ্বাসের অযোগ্য নহে=আপনার কথা অবিশ্বাস্য নহে। আবার, বৃহত্তর বাক্যের উপাদান-বাক্যকেও একপদে পরিবর্তিত করা যায়। যেমন—যে ভূমির উৎপাদন-শক্তি নাই তাহাতে বীজ বপন করিলে কোন ফল হয় না=অনুর্বর ভূমিতে বীজ বপন করা নিষ্ফল।

এইরূপ উপাদান-বাক্য বা পদসমষ্টিকে এক পদে পরিবর্তন নানাবিধ উপায়ে সাধিত হয়, তন্মধ্যে কৃৎ-প্রত্যয়, তদ্ধিত-প্রত্যয় ও সমাস-প্রক্রিয়া প্রধান। যথা—

সমাস সাহায্যে—লজ্জা নাই যার=নির্লজ্জ।

কৃৎ-প্রত্যয় সাহায্যে—যাহা করিতে হইবে বা করা উচিত=কর্তব্য, করণীয়।

তদ্ধিত-প্রত্যয় সাহায্যে—বিষ্ণুর উপাসক বা বিষ্ণুর উপাসনা করে যে=বৈষ্ণব।

বিবিধ প্রকারের পদসমষ্ট ও উপাদান-বাক্য সঙ্কোচনের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

পদসমষ্টি বা উপাদান-বাক্যের একপদে পরিবর্তন

অন্য দেশ—দেশান্তর। অমৃতের ন্যায় মধুর—অমৃতমধুর। অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা—অনুসন্ধিৎসা। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না যে—অবিমৃশ্যকারী। অতিশয় শীতও নয় উষ্ণও নয়—নাতিশীতোষ্ণ। অনায়াসে যাহা পাওয়া যায়—অনায়াসলভ্য। অল্প কথা বলে যে অল্পভাষী। অপত্য হইতে বিশেষ না করিয়া—অপত্যনির্বিশেষে। অন্য বিষয়ে মন যাহার—অন্যমনস্ক। আমিষের অভাব—নিরামিষ। আকাশে উড়িয়া বেড়ায় যে—খেচর। আপনাকে কৃতার্থ মনে করে যে—কৃতার্থম্মন্য। আপাততঃ মধুর যাহা—আপাতমধুর। আমার তুল্য—মাদৃশ। আদরের সহিত—সমাদরে। ইহার তুল্য—ঈদৃশ। ইতিহাস জানে যে=ঐতিহাসিক। উপায় নাই যার—নিরুপায়। যার শত্রু (জন্মে) নাই—অজাতশত্রু। একই গুরুর বা তীর্থের শিষ্য—সতীর্থ। একই সময়ে বর্তমান—সমসাময়িক।

কষ্ট সহ্য করিতে পারে যে—কষ্টসহিষ্ণু। কোন স্থান হইতে ভয় নাই যাহার—অকুতোভয় (এলাহাবাদ প্র. ক. ১৯২৬)। কি কর্তব্য তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না যে—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কোন্‌টা দিক্ কোন্‌টা বিদিক্ এ জ্ঞান যাহার নাই—দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য। খরচের হিসাব নাই যার—বেহিসাবী। ঘর নাই যার—হাঘরে। জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা। জানু পর্যন্ত লম্বমান—অজানুলম্বিত। জল্‌জল্ করিতেছে যাহা—জাজ্বল্যমান্। জন্ম হইতে—আজন্ম। ঝগড়া করিতে অভ্যস্ত যে ঝগড়াটে। দর্শন জানেন যিনি—দার্শনিক। দান করিবার যোগ্য—দেয়। দূর (ভবিষ্যৎ) দেখে না যে—অদূরদর্শী। নদী মাতা যাহার—নদীমাতৃক। নৌকা চালায় যে—নাবিক। পরের সৌভাগ্য দেখিয়া যে কাতর হয়—পরশ্রীকাতর। পরের মুখ চাহিয়া থাকে যে—

পরমুখাপেক্ষী। পা হইতে মাথা পর্যন্ত—আপাদমস্তক। পতি বিদেশে থাকে যে নারীর—প্রোষিতভর্তৃকা। পূর্বে দেখা যায় নাই যাহা—অদৃষ্টপূর্ব। পত্নী মারা গিয়াছে যার—বিপত্নীক। পুত্র নাই যার—অপুত্রক। পূতি গন্ধ যাহাতে (স্থান)—পূতিগন্ধ প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার করিয়া—প্রাণপণে।

বন্দোবস্ত নাই যে কাজে—বে-বন্দোবস্তী। বেগের সহিত—সবেগে। বিচার করিয়া কাজ করে না যে—অবিমৃষ্যকারী। বাস্তু হইতে উৎখাত হইয়াছে—উদ্বাস্তু। বিদেশে বাস করে যে—প্রবাসী। ব্যাকরণ যিনি ভাল জানেন—বৈয়াকরণ (কলি. প্র. ১৯২৮)। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে—ভবিতব্য। ভিক্ষার অভাব—দুর্ভিক্ষ। মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপী—আমৃত্যু। মর্মে পীড়া দেয় যাহা—মর্মন্তুদ। মাটির তৈয়ারী—মৃন্ময়। মুক্তি পাইতে ইচ্ছুক—মুমুক্ষু। মামলা করিতে অভ্যস্ত—মামলাবাজ। মানুষে যাতায়াত করে না যেখানে—মনুষ্যসমাগমশূন্য।

যার দ্বিতীয় নাই—অদ্বিতীয়। যাহা দেখা যায় না—অদৃশ্য। যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই—অদৃষ্টপূর্ব। যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই—অশ্রুতপূর্ব। যাহা সহজে নিবারণ করা যায় না—দুর্নিবার। যে নারী সূর্য দেখে নাই বা সূর্যের দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই—অসূর্যম্পশ্যা। যে স্ত্রীর স্বামী মারা গিয়াছে—বিধবা। যেখানে দুঃখে বা কষ্টে গমন করা যায়—দুর্গম। যার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই—নাস্তিক (ক. প্র. ১৯২১)। যার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে—আস্তিক। যাহা সহজে করা যাইতে পারে—সহজসাধ্য। যাহা সহজে পাওয়া যায় না—দুর্লভ। যাহা কথায় বর্ণনা করা যায় না—অবর্ণনীয়। যে সর্বস্ব হারাইয়াছে—সর্বহারা। যাহাতে আপাততঃ সুখ বোধ হয়—আপাতরম্য। যাহার চিত্ত এক বিষয়ে নিবিষ্ট আছে—একাগ্রচিত্ত। যাহা অবশ্যই হইবে—অবশ্যম্ভাবী। যাহা হইতে পারে না—অসম্ভব। ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়—ওষধি। যে গাছ মাটি ভেদ করিয়া ওঠে—উদ্ভিদ্। যে বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃতের মত—জীবন্মৃত। যাহা পূর্বে ভস্ম ছিল না, কিন্তু এখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে—ভস্মীভূত। যে বিদেশে থাকে না—অপ্রবাসী। যাহা পুনঃ পুনঃ দুলিতেছে—দোদুল্যমান। যাহার মমতা নাই—নির্মম (ক. প্র. ১৯১৭)। যাহা উড়িয়া যাইতেছে—উড়ন্ত বা উড্ডীয়মান। যাহা সহজে জানা যায় না—দুর্জ্ঞেয়। যাহা চিন্তা করা যায় না—অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়। যে দিনে এক বার ভোজন করে—একাহারী। যাহা সহজে দমন করা যায় না—দুর্দম। যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে উদ্যত—মরণোন্মুখ। যাহা খুব দীর্ঘ নহে—নাতিদীর্ঘ। যাহার অভিমান নাই—নিরভিমান। যাহা বলা যায় না—অবাচ্য, অবক্তব্য। যাহা বলা হইয়াছে—উক্ত। যাহা পূর্বে ছিল (এখন নাই)—ভূতপূর্ব (ঢাকা বোর্ড, ১৯২২)। যাহার অন্য উপায় নাই—অনন্যোপায় (ঢাকা বোর্ড, ১৯২৩)। যত্নের সহিত—সযত্নে। যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে—পণ্ডিতম্মন্য। যাহা লঙ্ঘন করা উচিত নয়—অলঙ্ঘ্য, অলঙ্ঘনীয়। যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না—দুর্লঙ্ঘ্য। যাহা বর্ণনা করা যায় না—অবর্ণনীয়।

শিক্ষা করিতেছে যে—শিক্ষানবীশ। শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া—যথাশক্তি। সহজে নাশ হয় যাহা—নশ্বর। স্মরণের যোগ্য—স্মরণীয়। সর্বদা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে যাহা—সতত-সঞ্চরমান। সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত—আসমুদ্র হিমাচল। সাধ্যের অতীত—অসাধ্য। হিসাব নাই যাহার—বেহিসাবী (লোক)।

(খ) বাক্য-সম্প্রসারণ (Expansion of Sentences)

৬। উপরি-উক্ত (ক)-অনুচ্ছেদের দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, একটি বাক্যের অন্তর্গত কোন একটি বা একাধিক পদ বা পদসমষ্টিকে উপাদান-বাক্যে পরিবর্তিত করিয়া বাক্য-সম্প্রসারণ করা যাইতে পারে। ইহা বাক্য-সঙ্কোচনের বিপরীত প্রক্রিয়া। যথা—

(১) অনধিকার চর্চা দূষণীয়—যে বিষয়ে অধিকার নাই তাহার চর্চা করা দূষণীয়।

(২) নির্দিষ্ট কার্য শেষ করিয়া অন্য কার্য করিবে—যে কার্য নির্দিষ্ট আছে তাহা শেষ করিয়া অন্য কার্য করিবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের প্রসারণ দ্বারাও বাক্য প্রসারিত করা যায় (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

(গ) সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন
(Conversion of Simple Sentences into Complex)

৭। সরল বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ বা পদসমষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয় অথবা সাপেক্ষ-সর্বনাম যোগে জটিল বাক্য গঠিত করা যায়। যথা—

সরল বাক্য	জটিল বাক্য
দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেকে বৃক্ষ-পত্রাদি খাইয়া জীবনধারণ করে।	যখন খাদ্য-দ্রব্যের অভাব হয় তখন অনেকে বৃক্ষ-পত্রাদি খাইয়া জীবনধারণ করে।
তিনি আরব্ধ কাজ শেষ করিয়া যাইবেন।	তিনি যে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা শেষ করিয়া যাইবেন।
রচনায় দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার অনুচিত।	যে সকল শব্দ সহজে বুঝা যায় না, তাহা রচনায় ব্যবহার করা অনুচিত।
তোমার মনস্কামনা সফল হউক।	তুমি মনে মনে যে কামনা করিয়াছ তাহা সফল হউক।

(ঘ) জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন
(Conversion of Complex Sentences into Simple)

৮। জটিল বাক্যের অন্তর্গত অপ্রধান বাক্যকে একটি পদ বা পদ-সমষ্টিতে পরিণত করিয়া সরল বাক্য গঠিত করা যায়। যথা—

জটিল বাক্য	সরল বাক্য
(ক) যাহার বুদ্ধি আছে সে কখনও এ কার্য করিবে না।	বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও এ কার্য করিবে না।
(খ) যে ব্যক্তি আশ্রয় বা শরণ লইয়াছে তাহাকে রক্ষা করা উচিত।	আশ্রিত বা শরণাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা উচিত।
(গ) যে সকল ছাত্র তাহার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ে, তাহাদের মধ্যে সে-ই প্রধান।	তাহার সহপাঠীদের মধ্যে সে-ই প্রধান।

জটিল বাক্য	সরল বাক্য
(ঘ) যে সকল জন্তুর চারি পা আছে, হস্তী তাহাদের সকলের চেয়ে বৃহৎ।	চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।
(ঙ) যখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর, তখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।	তিনি ১৬ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

দ্রষ্টব্য। ইহা বাক্য-সঙ্কোচনের অন্যতম প্রক্রিয়া। [(ক)-অনুচ্ছেদ দেখ]

(ঙ) সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন
(Conversion of Simple Sentences into Compound)

৯। একটি সরল বাক্যের কোন পদসমষ্টি (Phrase) একটি নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্যে (Co-ordinate Clause) পরিণত হইলে যৌগিক বাক্য গঠিত হয়। যথা—

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
(ক) সে বাড়ী যাইয়া পিতাকে সকল কথা বলিল।	সে বাড়ী গেল এবং পিতাকে সকল কথা বলিল।
(খ) তাহার যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও সে সুখী নহে।	তাহার যথেষ্ট অর্থ আছে বটে, কিন্তু সে সুখী নহে।
(গ) সত্য কথা বলাতে তুমি নিষ্কৃতি পাইলে।	তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, এইজন্য নিষ্কৃতি পাইলে।

দ্রষ্টব্য। ইহা বাক্য-সম্প্রসারণের অন্যতম প্রক্রিয়া। [(খ)-অনুচ্ছেদ দেখ]

(চ) যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন
(Conversion of Compound Sentences into Simple)

১০। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত কোন একটি নিরপেক্ষ উপাদান-বাক্যকে একটি পদে বা পদসমষ্টিতে পরিণত করিলে উহা সরল বাক্যে পরিণত হয়। যথা—

যৌগিক বাক্য	সরল বাক্য
(ক) তিনি অসুস্থ আছেন, এই জন্য বিদ্যালয়ে আসিতে পারিতেছেন না।	অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি বিদ্যালয়ে আসিতে পারিতেছেন না।
(খ) তিনি বিদ্বান্, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানশূন্য।	তিনি বিদ্বান্ হইলেও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য।
(গ) তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বাধিল এবং তাহারা সকলেই নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেল।	তাহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে তাহারা সকলেই নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেল।

দ্রষ্টব্য। ইহা বাক্য-সঙ্কোচনের অন্যতম প্রক্রিয়া। [(ক)-অনুচ্ছেদ দেখ]

কতিপয় দৃষ্টান্ত—ক্ষুদ্র বাক্যগুলিকে, এক একটি পৃথক্ বাক্যে পরিণত কর :—

১। (ক) এখন বিরত হও, পরিণাম সুখের হইবে না।

(খ) যদিও অল্পকালের অবিবেচনা, বহুকালের যাতনা ভোগ নিশ্চিত।

উত্তর—(ক) এখন বিরত না হইলে পরিণাম সুখের হইবে না।

(খ) যদিও অল্পকালের অবিবেচনা, তথাপি বহুকালের যাতনা ভোগ নিশ্চিত।

২। অনেক কাল অতীত, রাম সীতাকে ভুলিতে পারেন নাই—পারিবেন কিনা সেই বিষয়ে মহান্ সন্দেহ।

উত্তর—অনেক কাল অতীত, তথাপি রাম সীতাকে ভুলিতে পারেন নাই—পারিবেন কিনা, সেই বিষয়ে মহান্ সন্দেহ। (কলিকাতা প্রবেশিকা)

১১। বাক্যের সরলতা সম্পাদন (Resolution of Sentences)

দীর্ঘ সমাসাদি-বহুল ও সুদীর্ঘ মিশ্রবাক্যাদি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য সরল বাক্য-সমষ্টিতে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। এই পরিবর্তন সকল সময় তত সহজ নয়। মূল বাক্যের অর্থে কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটে, সেদিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৃহৎ মূল বাক্যটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে পরিণত করিতে হয়।

প্রশ্নাত্মক জটিল বাক্যকে ভাঙ্গিয়া সকলগুলি বা সর্বশেষটিকে প্রশ্নাত্মক সরল বাক্য করা যায়।

দৃষ্টান্ত। ১ সংখ্যক উদাহরণে একটি জটিল বাক্যকে ভাঙ্গিয়া কয়েকটি সরল ও পৃথক্ বাক্যে পরিণত করা হইয়াছে।

১। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্নভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায়, শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয় এবং তপনতাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সমীরণ সেবন করিলে অঙ্গসন্তাপ দূরীভূত হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা দুঃখিত জনেরও মনের সন্তাপ অন্তর্হিত হইয়া সন্তোষসহ প্রমোদ-সুধার সঞ্চার হয়। —অক্ষয়কুমার দত্ত

(১) দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্নভোজন করিলে পরম তৃপ্তি জন্মে। (২) পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া শীতল জল পান করিলে অতীব সুখানুভব হয়। (৩) তপনতাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে শরীরের সন্তাপ দূরীভূত হয় এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। (৪) প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনাবাক্য সেইরূপ। (৫) ইহাতে দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ দূরীভূত হয়, মনে সন্তোষ ও প্রবোধ উভয়ই লাভ হয়।

প্রশ্নাত্মক জটিল বাক্যকে দুই প্রকারে সরল করা যায়। কোন কোন স্থলে সর্বশেষে প্রশ্নাত্মক বাক্যটি লিখিতে হয় এবং কোন কোন স্থলে আগা-গোড়াই প্রশ্নাত্মক বাক্যটি লিখিতে হয়।

২। মানুষ যদি খাইতে না পায়, রোগজীর্ণ, দুর্বল দেহে যদি স্বাস্থ্যের আনন্দ অনেক দিন ধরিয়া আস্বাদন না করে, তাহার মুখের হাসি ফুটিতেই যদি মিলাইয়া যায়, তবে বিষাদক্লিষ্ট দেহভার সে আর কত দিন বহন করিতে পারিবে? —প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(১) মানুষ খাইতে না পারিলে তাহার দেহ রোগে জীর্ণ ও দুর্বল হয়। (২) সে স্বাস্থ্যের আনন্দ অনেক দিন ধরিয়া আস্বাদন করিতে পারে না। (৩) তাহার মুখে হাসি ফুটিতেই মিলাইয়া যায়। (৪) তাহার দেহ ভার হইয়া উঠে। (৫) উহা বিষাদে ক্লিষ্ট। (৬) এরূপ অবস্থায় সে আর কত দিন উহা বহন করিতে পারিবে?

১২। বাক্য-সংশ্লেষণ (Combination of Sentences)

অর্থের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া দুই বা ততোধিক বাক্যসমূহকে একটি বাক্যে প্রকাশ করার নাম বাক্য-সংশ্লেষণ বা বাক্য-সংযোজন।

ইহা তিন উপায়ে সাধিত হইতে পারে—

(ক) সরল বাক্যসমূহযোগে একটি সরল বাক্য গঠন। (খ) সরল বাক্যসমূহ-যোগে একটি যৌগিক বাক্য গঠন। (গ) সরল বাক্যসমূহযোগে একটি জটিল বাক্য গঠন।

(ক) সরল বাক্যসমূহ যোগে একটি সরল বাক্য গঠন

সরল বাক্যসমূহ—সূর্য উদিত হইল। হিংস্র জন্তুগণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল।

একটি সরল বাক্য—সূর্য উদিত হইলে হিংস্র জন্তুগণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল।

সরল বাক্যসমূহ—নাবিকগণ ঝড়ের পূর্বলক্ষণ বুঝিতে পারিল। তাহারা নিরাপদ হইতে ইচ্ছা করিল। তাহারা প্রাণপণে নৌকা বাহিতে লাগিল। নিকটে একটি খাল ছিল। তাহারা উহাতে প্রবেশ করিল।

একটি সরল বাক্য—নাবিকগণ ঝড়ের পূর্বলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া নিরাপদ হইবার জন্য প্রাণপণে নৌকা বাহিয়া নিকটবর্তী এক খালে প্রবেশ করিল।

সরল বাক্যসমূহ—বালকটি বিদ্যালয়ে পড়িত। সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাইত না। গুরুমহাশয় তাহাকে প্রহার করিলেন। প্রহার গুরুতর হইয়াছিল।

একটি সরল বাক্য—বালকটি নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হওয়ায় গুরুমহাশয় তাহাকে গুরুতররূপে প্রহার করিলেন।

(খ) সরল বাক্যসমূহ যোগে একটি যৌগিক বাক্য গঠন

সরল বাক্যসমূহ—এক ভদ্রলোকের একটি বাগান ছিল। বাগানটি তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি উহার কার্য নিজে দেখিতেন না, চাকরদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে দিয়াছিলেন। ইহাতে বাগানের আবাদ দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ঋণগ্রস্ত হইলেন। তিনি বাগানের অর্ধাংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

একটি যৌগিক বাক্য—এক ভদ্রলোক নিজের তত্ত্বাবধানে একটি বাগান রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু উহার কার্য নিজে না দেখিয়া চাকরদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে দিয়াছিলেন ; সুতরাং বাগানের আবাদ দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল এবং তিনি অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া বাগানের অর্ধাংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

সরল বাক্যসমূহ—"গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বালককে মারিলেন না। বালক বড়ই ভয় পাইয়াছিল। তাহার অপরাধ গুরুতর হইয়াছিল। কিন্তু সে সত্য কথা বলিয়াছিল। এই জন্য এবার গুরুমহাশয় তাহাকে মার্জনা করিলেন।" (ক. প্র. ১৯১১)

একটি যৌগিক বাক্য—গুরুমহাশয় তথায় উপস্থিত হওয়াতে বালকটি বড়ই ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু সে সত্য কথা বলাতে তাহার অপরাধ গুরুতর হইলেও তিনি তাহাকে না মারিয়া এবার মার্জনা করিলেন।

(গ) সরল বাক্যসমূহ-যোগে একটি জটিল বাক্য গঠন

সরল বাক্যসমূহ—এই স্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইয়াছিলাম। আপনার হস্তে তালবৃন্ত ছিল। ইহা আপনি আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। এই কথা আমার স্মরণ হইতেছে।

একটি জটিল বাক্য—আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। —বিদ্যাসাগর

সরল বাক্যসমূহ—কোন কোন রাজারা স্বেচ্ছাচারী। তাহারা কেবল প্রজাগণের ভয়াবহ হইতেই যত্নবান্। তাহারা অত্যাচার দ্বারা প্রজাদিগকে নম্রতা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা পায়। এরূপ রাজারা মানব-জাতির পক্ষে দৈবনিগ্রহ-স্বরূপ।

একটি জটিল বাক্য—যে রাজারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল প্রজাগণের ভয়াবহ হইতে যত্নবান হয় এবং অত্যাচার দ্বারা তাহাদিগকে নম্রতা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা পায়, তাহারা মানব-জাতির পক্ষে দৈবনিগ্রহ-স্বরূপ। —টেলিমেকস

অনুশীলন

১। একটি বাক্যে লিখ :—

সীতা নাম্নী জনক রাজার এক তনয়া ছিলেন ; তাঁহার রূপ সূর্যও কখনও দেখেন নাই। তিনি অতিশয় মুগ্ধস্বভাবা ছিলেন। তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য শত শত রাজপুত্র লালসা করিয়াছিলেন। তাঁহারা হর-শরাসনে জ্যা যোজনা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

২। সমাসবদ্ধ পদ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া লিখ :—"প্রীতি আমাদিগের আকাশকুসুম। উহা আমাদের পাশবসুখাসক্ত দূষিত দুর্গন্ধময় নিরয়তুল্য হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় না।"

৩। নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যগুলি পরিবর্তিত করিয়া লিখ :—

(ক) ভূপতিগণ প্রজাদের আবেদন লইয়া বিচার করিতেন বটে, কিন্তু সমুদয় কার্যে তাঁহাদের সবিশেষ মনোযোগ ছিল না। (সরল বাক্য)। (খ) প্রদেশের শাসনকর্তারা সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। ভূপতি এই সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেন। (সরল বাক্য)। (গ) শিক্ষানবিশেরা বেতন পায় না। (জটিল বাক্য)।

(ঘ) 'যাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল তাহারা' কেহই আসে নাই। (উদ্ধার-চিহ্নিত পদগুলিকে একপদে পরিণত কর)।

(ঙ) এইরূপ প্রকৃত সুখের স্থান সংসারে অধিক নাই। (অস্ত্যর্থক বাক্যে পরিণত কর)

৪। প্রত্যেকটি বাক্যকে যতগুলি সরল বাক্যে পরিণত করা সম্ভব তাহা কর :—

(ক) ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব মূর্তি, সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত, তদগ্রে দেহরত্ন। যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(খ) আমি ধন কিংবা জন কিংবা সিংহাসন কিংবা বাহুবল দেখিয়া তোমার সম্মান করিব না, কেবল তোমার মন দেখিয়া করিব।—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(গ) বিশ্বহিতে অনুপ্রাণিত নিয়ত ধর্মচিন্তানিরত জ্ঞানপিপাসু নবীন যুবক সন্ন্যাসী ভাবোজ্জ্বল মূর্তিতে এমন বিনয়নম্র মধুরভাবে নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকমাত্রের হৃদয়ে অনির্বচনীয় প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। (ক. প্র. ১৯১৩)

৫। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে একটি সরল বাক্যে পরিবর্তিত কর :—

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, গ্রাম বহুদূরে ; অন্ধকার বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কিনা, তাই এই মন্দিরে মনুষ্য-বসতি লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুসী হইল। [ক. প্র. ১৯৪০]

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির পরিবর্তন
(Direct and Indirect Narration)

১৩। যে বাক্যে বক্তার নিজের কথার অবিকল পুনরুক্ত করা হয়, তাহাকে **প্রত্যক্ষ উক্তি** বা প্রত্যক্ষ বাক্য বলে। এই পুনরুক্ত অংশ প্রায়ই উদ্ধার-চিহ্ন " " দ্বারা প্রকাশিত হয়। যথা—রাম বলিল, "আগামী কল্য বাড়ী যাইব।"

আর, যে বাক্যে বক্তার উক্তি প্রকাশকের নিজের কথায় প্রকাশ করা হয়, তাহাকে **পরোক্ষ উক্তি** বলে। যথা—রাম বলিল যে, সে পরদিন বাড়ী যাইবে।

প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন বাক্যান্তরীকরণের এক উপায়। সর্বদাই অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাক্যের পরিবর্তন করিতে হয়।

যদু বলিল, "আমি ভাত খাইতেছি।" যদু বলিল যে, সে ভাত খাইতেছে।

তিনি বলিয়াছিলেন, "রাম এখন বাড়ীতে আছে।"

= তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাম তখন বাড়ীতে ছিল।

সে বলিয়াছিল, "আমি আগামী কল্য ঢাকা যাইব।"

= সে বলিয়াছিল যে, সে পরদিন ঢাকা যাইবে।

জিজ্ঞাসা—সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

সে আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল।

আদেশ। **প্রত্যক্ষ উক্তি**—জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইঁহার কথায় কর্ণপাত করিও না; ইনি মহাশয় হইলেও তোমার অমঙ্গলের কারণ।"

পরোক্ষ উক্তি—জননী কুন্দকে ইঁহার কথায় কর্ণপাত করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন যে উনি মহাশয় হইলেও তাহার অমঙ্গলের কারণ।

অনুরোধ। **প্রত্যক্ষ উক্তি**—তারপর কৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হইবেন না।"

পরোক্ষ উক্তি—তারপর ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করিতে ক্রোধের বশীভূত না হইতে শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিলেন। (উ. মা. '৬৪)

প্রত্যক্ষ উক্তির অর্থাৎ বক্তার নিজের কথার অবিকল পুনরুক্তি করিয়া প্রকাশ করাই বঙ্গভাষার সাধারণ রীতি। পরোক্ষ উক্তি ইংরেজীর অনুকরণ; উহা অনেক স্থলেই রীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যবহার্য নহে। বাংলা ভাষায় সাধারণ কথাবার্তার বর্ণনায় প্রত্যক্ষ উক্তিই ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে উদ্ধার-চিহ্ন (" ") প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না।

অনুশীলন

১। উক্তি পরিবর্তন করিয়া লিখ :—

(ক) রামমোহন মালিকে বলিলেন, "যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়।"

(খ) তখন রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "যত ইচ্ছা নিচু খাও।"

(গ) তাহা শুনিয়া সক্রেটিস কহিলেন, "তোমার কি বাসনা, আমি সাপরাধ হইয়া প্রাণত্যাগ করি?"

(ঘ) ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর ভয় নাই, আমরা বড় গাঙে পড়েছি।"

(ঙ) তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। —মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

বাক্যের অর্থভিত্তিক শ্রেণীভেদ

১৪। **উদ্দেশ্য বা অর্থানুসারে** বাক্য নানা প্রকারের। যথা—নির্দেশক, প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক ইত্যাদি।

(১) **নির্দেশক বাক্য (Indicative Sentence)**—যে বাক্যে কোন ঘটনা অবস্থা বা ভাবের বিবৃতি সাধারণ ভাবে থাকে, তাহাকে নির্দেশক বাক্য বলে। যথা—কলিকাতার পশ্চিমে ভাগীরথী বহিতেছে। আলস্য মানুষের অমার্জনীয় অপরাধ। নির্দেশক বাক্য (Indicative Sentence) দুই প্রকার—(১) অস্ত্যর্থক বাক্য (Affirmative Sentence) ও (২) নাস্ত্যর্থক বাক্য (Negative Sentence)।

(ক) **অস্ত্যর্থক বাক্য** (Affirmative Sentence)—যে বাক্যে কোন ঘটনা, অবস্থা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অস্ত্যর্থক বাক্য। যথা—হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন।

(খ) **নাস্ত্যর্থক বাক্য** (Negative Sentence)—যে বাক্যে কোন ঘটনা, অবস্থা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়, তাহাকে নাস্ত্যর্থক বাক্য বলে। যথা—শহীদের বলিদান এদেশ কোন দিন ভুলিবে না।

(২) **প্রশ্নবোধক বাক্য** (Interrogative Sentence)—যে বাক্যে কোন কিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকে, তাহাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। সক্রেটিস বলিলেন, 'তোমার কি বাসনা, আমি সাপরাধ হইয়া প্রাণত্যাগ করি ?'

(৩) **আবেগসূচক বাক্য** (Interjective Sentence)—কি বিচিত্র এই দেশ ! লোকটা কি নিষ্ঠুর !

(৪) **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য** (Imperative Sentence)—ওঠো, জাগো, সাহস অবলম্বন কর। আগে চল আগে চল ভাই।

(৫) **ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য** (Optative Sentence)—ভগবান্ সকলের মঙ্গল করুন। তুমি শতায়ু হও।

(৬) **কার্যকারণাত্মক বাক্য** (Conditional Sentence)—ইহাতে কোন স্বীকৃতি বা শর্ত সূচিত হয়। যদি বৃষ্টি হয় তবে ফসল ভাল হইবে।

(৭) **সন্দেহদ্যোতক বাক্য** (Distributive Sentence)—বুঝি, হয়ত, বোধ হয়, সম্ভবতঃ, নিশ্চয় ইত্যাদি ক্রিয়া-বিশেষণ যোগে গঠিত হয়। যথা—

হয়ত এবার ভাল ফসল হবে। বোধ হয় লোকটি কাল আসিবে।

বাক্য-পরিবর্তন

অস্ত্যর্থক বা নিশ্চয়াত্মক (Affirmative) বাক্যকে নাস্ত্যর্থক বাক্যে এবং **নাস্ত্যর্থক** (Negative) বাক্যকে অস্ত্যর্থক বাক্যে পরিণত করা যায়।

অস্ত্যর্থক	নাস্ত্যর্থক
(ক) কাপুরুষেরাই মৃত্যুকে ভয় করে।	(ক) কাপুরুষ ব্যতীত অপর কেহ মৃত্যুকে ভয় করে না।
(খ) স্বদেশকে সকলেই ভালবাসে।	(খ) এমন লোক নাই যাহারা স্বদেশকে ভাল না বাসে।

নাস্ত্যর্থক	অস্ত্যর্থক
(ক) পৌরুষকে কলঙ্কিত করিও না।	(ক) পৌরুষকে অকলঙ্কিত রাখিও।
(খ) আত্মত্যাগ ব্যতীত সিদ্ধিলাভ নাই।	(খ) আত্মত্যাগেই সিদ্ধিলাভ হয়।
(গ) আত্মদান কখনো ব্যর্থ হয় না।	(গ) আত্মদান সর্বদাই সার্থক।

প্রশ্নবোধক বা **প্রশ্নাত্মক বাক্যকে** (Interrogative Sentence) নির্দেশক বাক্যে (Assertive Sentence) এবং **নির্দেশক** বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিবর্তিত করা যায়।

নির্দেশক	প্রশ্নবোধক
(ক) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও বড়।	(ক) জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গ হইতে বড় নয় ?
(খ) তুমি ভাইবোনকে ভালবাস।	(খ) তুমি কি ভাইবোনকে ভালবাস না ?
(গ) ঈশ্বর বিপদে বন্ধু।	(গ) ঈশ্বর কি বিপদে বন্ধু নহেন ?
(ঘ) রামমোহন নব্য ভারতের জন্মদাতা।	(ঘ) রামমোহন কি নব্য ভারতের জন্মদাতা নহেন ?

প্রশ্নবোধক	নির্দেশক
(ক) নেতাজীর নাম কে না শুনিয়াছে ?	(ক) নেতাজীর নাম সকলেই শুনিয়াছে।
(খ) তুমি কি বড় হইতে চাও না ?	(খ) তুমি নিশ্চয়ই বড় হইতে চাও।
(গ) গান কে না ভালবাসে ?	(গ) গান সকলেই ভালবাসে।

অন্যান্য বাক্য-পরিবর্তন—

নির্দেশক	অনুজ্ঞাবাচক
(ক) প্রত্যহ ব্যায়াম করা কর্তব্য।	(ক) প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে।
(খ) স্বদেশকে ভালবাসা উচিত।	(খ) স্বদেশকে ভালবাসিবে।

আবেগসূচক	নির্দেশক
(ক) কী সুন্দর দেশ !	(ক) দেশটি বড়ই সুন্দর।
(খ) অহো ! কে কহিবে সে সুদীর্ঘ কথা।	(খ) সে সুদীর্ঘ (দুঃখের) কথা কহিবার কেহ নাই।

১৫। বাচ্য-পরিবর্তন (Change of Voice)

(১) **কর্তৃবাচ্য**—যে স্থলে ক্রিয়াপদটি কর্তার সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হয়, অর্থাৎ কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়, সেই স্থলে ক্রিয়ার **কর্তৃবাচ্য** (Active Voice)। যথা—

আমি তোমাকে **ধরিলাম**। **তুমি** আমাকে **ধরিলে**। **পুলিশ** চোর **ধরিল**।

(২) **কর্মবাচ্য**—যে স্থলে ক্রিয়াপদটি কর্মের সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হয়, অর্থাৎ কর্মের পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়, সেই স্থলে ক্রিয়ার **কর্মবাচ্য** (Passive Voice)। যথা—আমাকর্তৃক **তুমি** ধৃত **হইলে**। তোমা কর্তৃক **আমি** ধৃত **হইলাম**। পুলিশ কর্তৃক **চোর** ধৃত **হইল**।

দ্রষ্টব্য। বাংলা ও ইংরেজী কর্মবাচ্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইংরেজীতে কর্মবাচ্যে কর্তা কর্ম বলিয়া অভিহিত হয় এবং কর্তাটি '*by*' (দ্বারা) এই পদান্বয়ী

অব্যয়ের (Preposition) সহিত অন্বিত হইয়া কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা—পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হইল—The thief was caught by the police.

এস্থলে বাংলায় 'পুলিশ' পদকে কর্তা ও 'চোর' পদকে কর্ম বলা হয়, কিন্তু ইংরেজীতে 'thief' পদ কর্তা এবং 'police' পদ '*by*' এই অব্যয়ের সহিত অন্বিত কর্ম।

(৩) **ভাববাচ্য**—যে স্থলে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়াটি কর্তার সহিত অন্বিত হয় না, সে স্থলে ক্রিয়ার ভাববাচ্য। ভাববাচ্যে ক্রিয়া সর্বদাই প্রথম পুরুষের একবচনান্ত হয় এবং কর্তায় বিভিন্ন বিভক্তি হয়। যথা—

অতি কষ্টে পথ চলা যায় (পথিক কর্তৃক)। আমার যাইতে হইবে। মহাশয়ের কোথা থাকা হয় ? আমায় যেতে হবে।

দ্রষ্টব্য। ইংরেজীতে **ভাববাচ্য** নাই। কেননা ইংরেজীতে ক্রিয়া সর্বদাই কর্তার সহিত অন্বিত হয়। যেমন—আমাকে যাইতে হইবে—I have to go.
তাহাকে যাইতে হইবে—He has to go.

(৪) **কর্ম-কর্তৃবাচ্য**—(Quasi-Passive Voice)। কখনও কখনও ক্রিয়াপদটির কর্তৃবাচ্যের রূপ হয়, কিন্তু উহা কর্মের সহিত অন্বিত হয় এবং কর্মবাচ্যের অর্থ প্রকাশ করে ও কর্মটি স্বয়ংই কর্তৃপদ প্রাপ্ত হয়। যথা—

(ক) বিছানা গরম লাগে (অনুভূত হয়)। (খ) কথাটা ভাল শুনায় না (শ্রুত হয় না)। (গ) 'পর্ণকুটীর স্বর্ণপ্রাসাদ হইতে সুন্দর দেখায় (দৃষ্ট হয়)।' (ঘ) বই কাটে। (ঙ) বাঁশ ভাঙ্গে। (চ) শঙ্খ বাজে। (ছ) জামাটি তোমাকে বেশ মানায়। (জ) 'রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে ?'—রবীন্দ্রনাথ।

দ্রষ্টব্য। বাংলায়—চন্দ্র মলিন দেখায় বা চন্দ্রকে মলিন দেখায়।
ইংরেজীতে—The moon looks pale.

বাংলা ও ইংরেজী উভয়ত্রই ক্রিয়ার রূপ কর্তৃবাচ্যের, কিন্তু অর্থ কর্মবাচ্যের। বিশেষ এই যে, বাংলায় কর্তৃপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়। অধিকন্তু বাংলায়, কর্ম-কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াগুলির রূপ অনেক স্থলেই প্রযোজক ক্রিয়ার ন্যায়।

(ক) কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন

বাংলা আ-প্রত্যয়ান্ত (ণিজন্ত হইলে 'আনো' প্রত্যয়ান্ত) এবং সংস্কৃত '**ক্ত**' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সহিত 'হ' বা 'যা' ধাতুর যোগে এবং কখনও কখনও 'পড়্' ধাতুর যোগে কর্মবাচ্যের মুখ্য ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। যথা—করা হয়, ধরা হয়, ধৃত হয় ইত্যাদি।

কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ কর্মে প্রথমা ও কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়াটি কর্ম যে পুরুষের সেই পুরুষেরই হয়। যথা—

কর্তৃ—'সে যে কত বড় পাকা মাঝি তাহা বুঝি নাই।'
কর্ম—সে যে কত বড় পাকা মাঝি তাহা বুঝা যায় নাই।
কর্তৃ—আমি কার্যটি করিয়াছি।
কর্ম—আমাকর্তৃক কার্যটি কৃত হইয়াছে বা করা হইয়াছে।
কর্তৃ—পুলিশ চোর ধরিয়াছে। কর্ম—পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে।*

* এস্থলে 'ধরা পড়িয়াছে' এই পদ ব্যবহৃত হয় ; ইহাই ভাষার রীতি (Idiom)।

কর্তৃ—ভিক্ষুকটিকে খাওয়াইয়াছে। কর্ম—ভিক্ষুকটিকেখাওয়ানো হইয়াছে।

কর্তৃ—জনৈক তস্কর তাহার পুস্তকখানি অপহরণ করিয়াছে।

কর্ম—জনৈক তস্কর কর্তৃক তাহার পুস্তকখানি অপহৃত হইয়াছে।

কর্তৃ—শার্দূল তাহার গৃহপালিত মেষটি ভক্ষণ করিয়াছে।

কর্ম—শার্দূল কর্তৃক তাহার গৃহপালিত মেষটি ভক্ষিত হইয়াছে।

কর্তৃ—প্রধান শিক্ষক মহাশয় আজ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিবেন।

কর্ম—প্রধান শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক আজ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরিত হইবে। (প্রবেশিকা প্রশ্ন)

কর্তৃবাচ্যের বিশিষ্ট ব্যবহার—খাস বাংলায় 'হ' ধাতু ব্যতীত 'পড়্', 'যা' এবং 'আছ্' ইত্যাদি ধাতুযোগেও কর্মবাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয় এবং ভাষার রীতি অনুসারে কখনও কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, কখনও হয় না। যথা—চোর ধরা পড়িয়াছে। চোরটাকে ধরা যাবে। হাত কাটা গেছে। ও কথা আমার শোনা আছে।

(খ) কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিবর্তন

বাংলা আ-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত 'হ' ধাতু যোগে ভাববাচ্যের মুখ্য ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়। যথা—বলা-হয়, যাওয়া হয় ইত্যাদি।

কর্তৃ—আমি আজ যাইব না। ভাব—আমার আজ যাওয়া হইবে না।

কর্তৃ—তিনি খাইতেছেন। ভাব—তাঁহার খাওয়া হইতেছে।

কর্তৃ—ছেলেদের ন্যায় মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিখাইবে।

ভাব—ছেলেদের ন্যায় মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিখানো চাই।

দ্রষ্টব্য। বাংলায় কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াপদই অধিক প্রচলিত। অপর বাচ্যে প্রয়োগ অনেক সময় রীতিবিরুদ্ধ ও শ্রুতিকটু হয়।

(গ) ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন

ভাব—এখন আমার যাওয়া চাই। কর্তৃ—এখন আমি যাইব।

ভাব—কোথায় থাকা হয়? কর্তৃ—কোথায় থাক বা থাকেন?

অনুশীলন

১। অর্থের ভিত্তিতে বাক্য কয় শ্রেণীর এবং কি কি দৃষ্টান্তসহ লিখ।

২। দৃষ্টান্তসহ সংজ্ঞা লিখ—অস্ত্যর্থক বাক্য, নাস্ত্যর্থক বাক্য, নির্দেশক বাক্য, প্রশ্নবোধক বাক্য, আবেগসূচক বাক্য।

৩। অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যগুলি রূপান্তরিত কর—ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা। (প্রশ্নবোধক)। রবীন্দ্রনাথ কি এদেশের শ্রেষ্ঠ কবি (অস্ত্যর্থক)? নিয়মানুবর্তিতা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় (অস্ত্যর্থক)। বৃথা সময় নষ্ট করিও না (অস্ত্যর্থক)। বিদ্যাসাগরের কীর্তি কখনও ক্ষুণ্ন হইবে না (অস্ত্যর্থক)। দার্জিলিং-এর শোভা কি অপূর্ব (অস্ত্যর্থক)! গরমের সময় সেখানে কি আরাম (অস্ত্যর্থক)! তিস্তা-নদী ভীষণ খরস্রোতা (প্রশ্নবোধক)। এদেশে খনিজ সম্পদের অভাব নাই ('নাই' বাদ দাও)। আমার দুঃখ তুমি কি বুঝিবে? (প্রশ্ন বর্জন কর)। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা বুঝে না (অস্ত্যর্থক)। ভুলিও না দরিদ্র ভারতবাসী তোমার ভাই (অস্ত্যর্থক)। ঘটনাটি বড়ই দুঃখের (আবেগসূচক)। ঐশ্বর্যশালীকে উপদেশ দেয় এরূপ লোক বিরল (নাস্ত্যর্থক)। সৎবংশে জন্মিলেই সৎ ও বিনীত হয়, একথা অগ্রাহ্য (নাস্ত্যর্থক)। অসুখের জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারি নাই। (অস্ত্যর্থক)। কর্মবন্ধে অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু এক দণ্ডের নিমিত্ত আমি কর্মশূন্য নই (অস্ত্যর্থক)।

বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশের তাৎপর্য ও ব্যবহার

অন্ধকারে ঢিল মারা (অনুমানে নির্ভর করা)—অন্ধকারে ঢিল মারলে কি আর প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায় ?

অমাবস্যার চাঁদ (যাহার দর্শন পাওয়া যায় না)—কমল আমার কাছে এখন অমাবস্যার চাঁদ।

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন)—কাজটির জন্য সকল উমেদারি অরণ্যে রোদন হইল।

অকাল-কুষ্মাণ্ড (অকর্মণ্য, অপদার্থ)—ছেলেটা অকাল কুষ্মাণ্ড, এত সুযোগ-সুবিধা পাইয়াও কিছু করিতে পারিল না।

অর্ধচন্দ্র দেওয়া (গলাধাক্কা দেওয়া, অপমান করা)—লোকটি সাহায্য তো করিলই না, উপরন্তু অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিল।

অন্ধের যষ্টি বা নড়ি (অসহায়ের অবলম্বন)—বৃদ্ধের নাতিটি এখন তাহার অন্ধের যষ্টি।

অকূলে কূল পাওয়া (অসহায় অবস্থায় সুযোগ লাভ)—পিতৃহীন বালকটি বিদ্যালয়ে পড়িতে পাইয়া অকূলে কূল পাইল।

অকূল পাথারে পড়া, অথৈ জলে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া)—আকস্মিক অগ্নি-কাণ্ডের ফলে উদ্বাস্তু পল্লীবাসী অকূল পাথারে পড়িল।

অহি-নকুল সম্বন্ধ (তীব্র শত্রুতা)—দুই প্রতিবেশীর মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ।

আক্কেল সেলামি (অনভিজ্ঞতার দণ্ড)—পরের জিনিষ হারিয়ে যাওয়াতে অনেকগুলো টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

আঁতে ঘা (মনে আঘাত দেওয়া)—সে আমার আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলেছে, আমি তাকে কখনও ক্ষমা করবো না।

আকাশ-কুসুম (অসম্ভব কল্পনা)—দরিদ্রের রাষ্ট্রপতি হওয়া গণতন্ত্রে আকাশ-কুসুম নয়। **আকাশ থেকে পড়া**—একান্ত বিস্মিত হওয়া।

আকাশ মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়া—অতর্কিত বিপদে বা অমঙ্গলের সম্ভাবনায় দিশাহারা হইয়া পড়া। **আকাশ পাতাল তফাৎ**—অনেক প্রভেদ।

আকাশ (আকাশের চাঁদ) হাতে পাওয়া—অভাবনীয় সাফল্য বা সৌভাগ্য লাভ করা। **আকাশে তোলা**—অতিরিক্ত প্রশংসা করা।

আহ্লাদে আটখানা (অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া)—নবকুমার পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ায় তাহার ভাইবোনেরা আহ্লাদে আটখানা হইল।

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর (সামান্য লোকের বড় বিষয়ে মাথা গলানো)—আমি সাধারণ কেরানী, মন্ত্রীদের বিষয়ে নাক গলানো আমার পক্ষে আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নয় কি ?

আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি)—খবরটা শুনে আক্কেল গুড়ুম, আর ভাবা যায় না।

আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ (বনিবনার অভাব, ঘোর শত্রুতা)—বিষয়-আশয় নিয়ে দুই ভাইয়ে আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ।

আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড় লোক)—কয়েক বছর ব্যবসা করে লোকটি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন।

আলালের ঘরের দুলাল (বড় লোকের আদুরে অপদার্থ সন্তান)—বেশী আদরে ছেলেটা আলালের ঘরের দুলাল হয়েছে।

আপন কোলে ঝোল টানা—অত্যন্ত স্বার্থপরতা।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি—অপদার্থ। **আঁতে ঘা দেওয়া**—মর্মান্তিক আঘাত দেওয়া।

আমতা আমতা করা—দ্বিধা বা সংকোচ করা, পরিষ্কার করিয়া না বলা।

আষাঢ়ে গল্প (অদ্ভুত গল্প, কাল্পনিক কাহিনী)—যে রকম আষাঢ়ে গল্প আরম্ভ করেছ, উঠি কি করে ?

আঠার মাসে বছর (কুঁড়ের বাদ্‌শা)—হাবু কখনও ঠিক সময়ে যেয়ে ট্রেন ধরতে পারবে না, ওর যে আঠার মাসে বছর।

আবোল তাবোল (বাজে কথা)—কি যে মাথামুণ্ডু আবোল-তাবোল বলে যাচ্ছ কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ক)—"দেখ্‌লে উপাধ্যায়দা, ইঁচড়ে পাকা ছেলে, ওর বাপের বে দিলুম সেদিন, ও আমায় শেখাতে আসে।"—বঙ্গে-বর্গী (নাটক)

উত্তম মধ্যম (প্রহার)—লোকটাকে ধরে বেদম করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দেওয়া হোক।

উলু বনে মুক্তা ছড়ানো (অপাত্রে অস্থানে দেওয়া)—শঠকে সদুপদেশ দেওয়া উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (একের দোষ অপরে চাপানো)—রামা অপরাধ করল, আর শ্যামা শাস্তি পেল, একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

একচোখা (পক্ষপাতদোষে দোষী)—তুমি বড় একচোখো, ছোট ছেলেটাকেই বেশী ভালবাস।

কলুর বলদ (পর-চালিত)—কলুর বলদের মত খেটেই যাই, বেতন তেমন পাই না।

কপাল ফাটা (অদৃষ্ট খারাপ হওয়া)—মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললে, "মাগো আমার কপাল ফাটা, নইলে একমাত্র ছেলে আমায় ছেড়ে যায় ?"

কথার কথা (অবাস্তব কথা)—আর ওতে মন খারাপ করবার কি আছে, এ একটা কথার কথা।

কাজীর বিচার (খেয়ালী বিচার)—বিনা দোষে এত বড় শাস্তি, এ যে দেখছি কাজীর বিচার।

কান ভারী করা (পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা)—তাহারা আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে ক্রমাগত নানা কথা বলিয়া আমার কান ভারী করিয়া তুলিল।

কানামাছি (পাকা চোর)—"কানামাছি চোরের ধারী, যদি ছুঁয়ে দেয় বুড়ি।"

কানাকড়ি (অচল কপর্দক)—আমার হাতে এখন কানাকড়িটি পর্যন্ত নাই।

কুড়ের বাদ্‌শা (ভয়ানক কুঁড়ে)—তুমি যে দেখছি দিন দিন কুড়ের বাদ্‌শা হয়ে পড়েছ, সারাদিনই তো শুয়ে কাটাও।

কোন্ গগনের চাঁদ (ব্যঙ্গোক্তি)—"বলি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ ?

খয়েরখাঁ (চাটুকার)—লোকটা বুড়ো জমিদারের খয়ের খাঁ।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা (কাহারো কৃতিত্বের দ্বারা তাহাকেই শ্রদ্ধানিবেদন)—শরৎচন্দ্রের বাণীদ্বারাই তাঁহার স্মৃতিতর্পণ হল, এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

গা' সহা হওয়া (সহ্য হওয়া)—লোকের নিন্দা-অপবাদে আজকাল আর আমার কোন কষ্ট হয় না ; ওসব একরকম আমার গা' সহা হয়ে গিয়েছে।

গুড়ে বালি (আশায় নিরাশ)—তুমি মনে ভেবেছিলে এ সুযোগটা তুমিই পাবে, সে গুড়ে বালি।

গোবর গণেশ (মূর্খ, নির্বোধ)—ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ, কিছুই হল না।

গায়ে মাখা (গ্রাহ্য করা)—আমার কোন কথাই সে গায়ে মাখে না, তুমি যদি একবার বলে দেখ তো ভাল হয়।

গোড়ায় গলদ (মূলে ভুল)—এ ব্যাপার কিছুতেই মীমাংসা হবে না, তা এর গোড়ায় গলদ রয়েছে।

গোঁফ-খেজুরে (ভীষণ কুড়ে)—গোপেশ্বর একটি গোঁফ-খেজুরে, না হ'লে ও তিন দিন ক্রমাগত ট্রেন ফেল করে ?

গৌরচন্দ্রিকা (সূচনা)—গৌরচন্দ্রিকা রেখে এখন আসল কথাটা বলে ফেল।

গণেশ ওল্টানো—ব্যবসায় গুটানো। ছুলিচাঁদ এবার গণেশ উলটিয়েছে।

গুড়ে বালি—নিরাশ হওয়া।

গোকুলের ষাঁড়, খোদাই ষাড়—নিষ্কর্মা, অপদার্থ।

চিনির বলদ—ভারবাহী কিন্তু ফলভোগী নয়।

চার-পোয়া (সম্পূর্ণ)—এবার তোমার চারপোয়া সুখই হয়েছে।

চোখে অন্ধকার দেখা (হতাশ হওয়া)—একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বৃদ্ধ চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

চোখে ধূলো দেওয়া (গোপন করা)—বাপের চোখে ধূলো দিয়ে ছেলে বেশ ক'রে আড্ডা মেরে বেড়ায়।

চোখের বালি (চক্ষুশূল)—একদিন তুমি আমাকে না দেখে থাক্‌তে পারতে না ; কিন্তু আজ আমি হয়েছি তোমার চোখের বালি।

চোখে সরষে ফুল দেখা (মাথা ঘুরিয়া যাওয়া, একান্ত কাতর হওয়া)—এই আকস্মিক দুঃসংবাদে সে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল।

টইটুম্বুর—কানায় কানায় পূর্ণ। রবির সংসার সম্পদে টইটুম্বুর।

টনক নড়া (জানিতে পারা—নিন্দার্থে)—আমরা যেই মামলা রুজু করেছি, আর অমনি তার টনক নড়েচে।

টাকার কুমীর (মস্ত বড় ধনী)—শুনেছি সে রাতারাতি ফেঁপে উঠে একেবারে টাকার কুমীর হয়ে বসেছে।

ঠোঁট-কাটা (স্পষ্টভাষী)—ছেলেটি এমন ঠোঁট-কাটা যে, যখন যা' মুখে আসে তাই বলে যায়।

ডান হাতের ব্যাপার (খাওয়া)—আগে ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নাও, তারপর বসে' গল্প করি, এস।

ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর—উভয় সঙ্কট।
ডুবে ডুবে জল খাওয়া—গোপনে স্বার্থসিদ্ধি করা।
ডুমুরের ফুল (যা'র দর্শন মেলে না)—তোমার যে দেখাই পাই না, দিন দিন যেন ডুমুরের ফুল হ'তে চলেছ।
তছ্‌নছ্‌ করা (নষ্ট করা)—দুষ্ট খোকাটা কাচের জিনিসগুলো সব ভেঙ্গে চুরে একেবারে তছ্‌নছ্‌ করে ফেলেছে।
তালকানা (বে-হিসাবী, খেয়ালশূন্য)—কি রকম তালকানা লোক তুমি বাপু, এই তো সামনেই চশমাটা পড়ে' রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না ?
দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (বিষম-ভাঙ্গা-চোরা বা ওলট-পালট ব্যাপার)—আজকাল ময়দানে খেলা তো নয়, যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।
দা-কুমড়ো (ঘোর শত্রুতা)—তার সঙ্গে আমার দা-কুমড়ো সম্পর্ক।
ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অহংকারে সকলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা)—কণ্ট্রাক্টরী করে রাতারাতি লাখপতি হয়ে রামহরিবাবু ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন।
নেই-আঁকড়া (নাছোড়-বান্দা)—ধন্য নেই-আঁকড়া ছেলে, কিছুতে সঙ্গ ছাড়বে না গো।
নেক্‌নজর (সুনজর)—কোথাকার এক রাজার নেক্‌নজরে পড়ে হরিশবাবু তাঁর অবস্থা আগাগোড়া ফিরিয়ে ফেলেছেন।
পরের মুখে ঝাল খাওয়া (পরের মতে চলা)—তোমার নিজের কি কোনো স্বাধীন মত নেই, পরের মুখেই চিরকাল ঝাল খাবে ?
পটল তোলা—মরা, বাস উঠানো।
পাকা ধানে মই দেওয়া—মহা অনিষ্ট সাধন।
পায়াভারি (অহঙ্কার)—চাকরি পেয়ে আজকাল তার পায়াভারি হয়েছে।
পুকুর চুরি (বেপরোয়াভাবে চুরি)—জমিদারী সেরেস্তায় ঢুকে তুমি যে একেবারে পুকুর চুরি আরম্ভ করলে দেখ্‌ছি।
পেটে পেটে বুদ্ধি (দুষ্টবুদ্ধি)—শয়তানের পেটে পেটে বুদ্ধি।
পোয়া বারো (চরম লাভ)—আজকাল তোমার পোয়া বারো, তুমি কি আমাদের চিন্‌তে পারো ?
মাণিক-জোড় (অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু)—দুইটি বন্ধু যেন মাণিক-জোড়।
বক-ধার্মিক (ভণ্ড)—তুমি যে বকধার্মিক, একথা আমি আগে জানতাম না।
ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব, বিদ্রূপাত্মক)—"কৃপণ কৃপানাথ যেদিন ঘি খাবে সেদিন ব্যাঙের সর্দি হবে।"
বাপের ঠাকুর (শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি—শ্লেষার্থে)—কি আমার বাপের ঠাকুর এসেছেন যে সর্বদা আমার উপর তম্বি করছেন।
বাগে পাওয়া—আয়ত্তে পাওয়া।
বিড়ালতপস্বী (অতি ভণ্ড)—"বিড়ালতপস্বী তিনি বড় শুদ্ধাচার। বাগে পেলে শিকারের করেন সংহার।"
বিদুরের ক্ষুদ (সামান্য উপকরণ)—"দুর্যোধনের রাজভোগের চেয়ে বিদুরের ক্ষুদেই আমার পেট ভরবে।"

বিষিয়ে ওঠা (বিরূপ হওয়া)—একথা শোনার পর আমার সারা মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠেছে।

বুক দিয়ে পড়া (আপ্রাণ সাহায্য করা)—পরের বিপদে এমন ক'রে বুক দিয়ে পড়তে তাঁর মত আর কেউ পারে না।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো—ফাঁকি দেওয়া। **ভুঁইফোঁড়**—হঠাৎ বড় হয়ে ওঠা।

ভরাডুবি—সমূলে বিনাশ। **ভূতের বেগার খাটা**—অর্থহীন পরিশ্রম করা।

মাঠে মারা যাওয়া—সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া। **মগের মুল্লুক**—অরাজক দেশ।

যমের অরুচি (যা'র মরণ নেই—গালি দেওয়া)—চণ্ডুলালের জ্বালায় গ্রামের সকলেই অস্থির, ওটা যমের অরুচি।

রগচটা (ভয়ানক ক্রোধী)—এমন রগচটা লোক কখনো দেখিনি।

রাঘব বোয়াল (বড় বেশী চাহিদা যা'র)—কিছুতেই হিটলারের দাবী মিটল না, অবশেষে রাঘব বোয়ালের মত পোলাণ্ডকে গ্রাস করে বসল।

রাশভারি (গম্ভীর প্রকৃতি)—রাসবিহারী এমনই রাসভারি যে, বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও তাঁর সাম্‌নে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না।

লম্বা দেওয়া (পালিয়ে যাওয়া)—লোকটা চুরি করেই লম্বা দিয়েছে।

লেজে খেলান (ফাঁকি দেওয়া)—তার শয়তানি তুমি ধরতে পারছ না, সে নিশ্চয়ই তোমাকে লেজে খেলাচ্ছে।

লেজে গোবরে (বিপদ্‌গ্রস্ত)—এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়, শেষে কিন্তু লেজে গোবরে হবে।

শাঁখের করাত (যেতেও কাটে, আসতেও কাটে—অর্থাৎ উভয়-সঙ্কট)—খাদ্যের কণ্ট্রোল হয়ে মধ্যবিত্তের উপর শাঁখের করাত চল্‌ছে।

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ্)—মেয়েটার বিয়ে সাম্‌নে, এমন সময় অসুস্থ হল শিরে সংক্রান্তি করে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা—গোপন করার দুঃসাধ্য ব্যাপার, গোপন করার বৃথা চেষ্টা।

শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র)—উমা এ বংশের শিবরাত্রির সলতে।

শাপে বর (অনিষ্টে ইষ্ট)—জমিতে বানের জল ঢুকিয়া শস্য গতবার নষ্ট হইল, কিন্তু এবার দ্বিগুণ ফসল হওয়ায় শাপে বর হইল।

শ্মশান-বৈরাগ্য (সাময়িক অনাসক্তি)—হঠাৎ রামবাবুর শ্মশান-বৈরাগ্যের কারণ তার কঠিন অসুখ।

সট্‌কে পড়া (পালানো)—সে যে এমনভাবে সট্‌কে পড়বে, তা' আগে বুঝিনি।

সর্ষে ফুল দেখানো (বিভ্রান্ত, অপদস্থ করা)—লোকটাকে সর্ষে ফুল দেখিয়েছে।

সাতসতেরো, সাতপাঁচ (প্যাচফের)—আমি এত সাতসতেরো বুঝি না।

সাতখুন মাপ—গুরুতর অপরাধে শাস্তি না পাওয়া।

সাপে-নেউলে (উৎকট শত্রুতা)—দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে যেন সাপে-নেউলে।

সাপের পাঁচ পা দেখা—সাপের পাঁচ পা দেখিলে নাকি অত্যন্ত ধন লাভ হয়, তাহা হইতে অতিশয় অহঙ্কারী হওয়া বা বাড়াবাড়ি করা।

সাপের হাঁচি বেদে চেনে—প্রকৃত লক্ষণ অভিজ্ঞ লোকেই বোঝে।

সুখের পায়রা—(সুদিনের বন্ধু যে অসময়ে ত্যাগ করে)—আজকাল কেউ আর আমায় দেখতে আসে না, সুখের পায়রারা উড়ে গেছে।

সোনায় সোহাগা, মণিকাঞ্চন যোগ (সুন্দর মিল)—প্রণব দেখতেও সুন্দর, আবার বিদ্যাবুদ্ধিতে তুখার, যেন সোনায় সোহাগা।

হাত-ধরা (বশবর্তী)—সে কি আমার হাত ধরা যে যা' বল্‌ব তাই শুন্‌বে ?

হাড়-হাবাতে (হাড়-জালানো, বিরক্তিকর)—আচ্ছা হাড়-হাবাতে লোকের পাল্লায় পড়েছি আমি।

হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল)—হাতের পাঁচ ঐ দশটা টাকা ছিল, তাও আজ চাল আনতেই শেষ হ'ল।

হাড়ে বাতাস লাগা (নিশ্চিন্ত হওয়া, হিংসা ও শ্লেষসূচক)—এত দিন পরে শত্রু নিপাত যাওয়াতে তার হাড়ে বাতাস লাগিল।

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা—গুপ্ত কথা প্রকাশ করা।

হাল ছাড়িয়া দেওয়া (হতাশ হওয়া)—কঠিন প্রশ্ন দেখিয়া হাল ছাড়িও না।

হালে পানি না পাওয়া—কর্মসাধনের পন্থা কার্যকরী না হওয়া, সঙ্কুলান করিতে না পারা।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (উপস্থিত সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা)—যে দাম পেয়েছ, তাই নিয়ে নাও, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।

হাতে মারা নয় ভাতে মারা—সোজাসুজি শাস্তি না দিয়ে আয়ের পথ বন্ধ করিয়া কাবু করা।

হিতে বিপরীত (ভাল করিতে মন্দ)—কাহারো উপকার করিতে গেলে অনেক সময় হিতে বিপরীত ঘটে।

হাতে স্বর্গ পাওয়া (অভাবিত সৌভাগ্য লাভ করা)—ছেলের প্রত্যাগমনে মা হাতে স্বর্গ পেয়েছেন।

হাতীর পাঁচ পা দেখা—সৌভাগ্য-গর্বে অতিশয় বাড়াবাড়ি।

হাড়ে দূর্বা গজানো (দীর্ঘ প্রতীক্ষায়)—স্কুলে সরকারি সাহায্য পেতে হাড়ে দূর্বা গজাবে।

কতিপয় বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশের বিশিষ্ট প্রয়োগ

অত্যাচারীরা **ডাঙার বাঘ, জলের কুমীর** (উভয়তঃ বিপদ)। তোমার কি **বয়সের গাছ-পাথর** আছে ? (এত প্রাচীনকালের লোক যে তাহার বয়সের হিসাব নাই)। তোমায় **যম ভুলেচে** ব'লে (মৃত্যু হয় না ব'লে) কি আমরাও ভুলব ? (রবীন্দ্রনাথ)। আর তুমি ছেলেমানুষ তোমার বাপকে সে **চোখের জলে নাকের জলে করে** (বিশেষ লাঞ্ছনা দেওয়া) তবে ছেড়েছিল।—(শরৎচন্দ্র)। তাহারা কাহারো **সাতেও থাকে না, পাঁচেও না** (ভালতেও না, মন্দতেও না)। হাসলে তিনি **তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন** (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন)।—(নজরুল)। শ্বশুর-শাশুড়ী যদি **সাতজন্মে** নাম না করে (কোন কালে) ?—(বঙ্কিমচন্দ্র)। '**লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে** (লজ্জা ত্যাগ করিয়া) মিছে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে ?'—(শরৎচন্দ্র)

প্রবাদ বা প্রবচন (Proverbs)

প্রবাদগুলি লোকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানপ্রসূত সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবপ্রকাশক উক্তি। এই কারণে প্রবাদ দুই প্রকার—(১) লোকোক্তি ও (২) প্রাজ্ঞোক্তি। এখানে কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট—খুব বেশী লোভে সব নষ্ট হয়। রাতারাতি বড়লোক হতে যেয়ে হরিবাবুর সব নষ্ট হল, কথায় বলে অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি—নিজেকে খুব বেশি বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিতে নাই। বেশি বুদ্ধির খেলা দেখাইতে গেলে অনেক সময় ঠকিতে হয়।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—অকারণ বেশি ভক্তি বা ভালবাসা গূঢ় অভিসন্ধি-সূচক। কর্তার সঙ্গে সঙ্গে নিমু সারাক্ষণ লেগে আছে, কিছু আদায় করে নেবেই, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ জান ত ?

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—অনেক লোক মিলিয়া এক জায়গায় কাজ করিলে সে কাজ অগ্রসর হয় না, বরং হৈ চৈ লাগিয়া যায়।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম—নিজেকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা উচিত। নিজের জীবন রক্ষা পাইলে পিতৃপুরুষের নাম বজায় থাকে।

আপনার থাকার ঠাঁই নাই শঙ্করাকে ডাকে—অর্থাৎ যে একদিন কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে সংসার চালাইতেছিল, অপর একজনকে আশ্রয় দেওয়াতে তাহার আর কষ্টের এবং নাকালের সীমা রহিল না।

এক মাঘে শীত যায় না—মাত্র এক বারের সংঘর্ষেই জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয় না। আমার ক্ষতি করে নিশ্চিন্ত হয়ো না, এক মাঘে শীত যায় না।

এক ঢিলে দুই পাখী মারা—এক সঙ্গে উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

কনের ঘরের পিসী, বরের ঘরের মাসী—দুইটি প্রতিপক্ষের নিকট পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়া ভাল মানুষ সাজিবার চেষ্টা।

কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ—কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ।

কালনেমির লঙ্কা ভাগ—কোন কিছু লাভের আগে ফল ভোগের চেষ্টা।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—শত্রুর দ্বারা শত্রুর অনিষ্ট সাধন।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা—অপমান বা দুঃখের উপর দুঃখ বা অপমান।

কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরা (এঁচোড়ে পাকা)—অল্প বয়সে পক্বতা লাভ করা।

কানা গরু বামুনকে দান—যাহাতে দান করাও হয়, অথচ নিজের কিছু ক্ষতি না হয় এই অভিপ্রায়ে কপট ব্যক্তিরা নিজের একান্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে দান করিয়া থাকে।

কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী—স্বার্থসিদ্ধির পর ভুলিয়া যাওয়া। চাকুরিটা পেয়ে আর দেখাই নেই। সাধে কি লোকে বলে **কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরালে পাজী।**

গরু মেরে জুতো দান—একটি সৎকাজ করিতে গিয়া অপর একটি ঘোর অন্যায় কাজ করা। অথবা, কাহারও যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া পরে তাহারই সামান্য উপকার করা। কালোবাজারী লোকটা এবার একটা অন্নসত্র করেছে, এ যেন গরু মেরে জুতো দান।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—লোকে না মানিলেও নিজেকে যে বড় মনে করে।

গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল—ভবিষ্যতের দুরাশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকা।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—চেনা গুণীর সমাদর নাই। বেঁচে থাকতে স্বভাব কবি গোবিন্দদাসকে লোকে তাচ্ছিল্য করত, সত্যি গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়—যে একবার বিপদের আঘাত সহ্য করিয়াছে, সে সামান্য বিপদের ভয়েই কাতর হইয়া পড়ে।

ঘরের (বাড়ীর) খেয়ে বনের মোষ তাড়ান—ঘরের কাজ না করিয়া বিনা লাভে সারা দিন বেগার খাটা।

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—প্রতারক ব্যক্তিকে ফাঁদে ফেলিয়া জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়া শাসান হইয়া থাকে।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই—দুষ্ট ব্যক্তির সহিত সচরাচর দুষ্ট ব্যক্তিরই বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। মজুতদার ও কালোবাজারীদের মধ্যে বড় ভাব, যেন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

চোরের উপর বাটপাড়ি—প্রতারককে প্রতারণা করিয়া বা দুষ্ট ব্যক্তিকে ঠকাইয়া জব্দ করা।

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা—দুষ্ট লোকই দুষ্ট লোককে সাহায্য করিয়া থাকে।

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—দুষ্ট লোক সদুপদেশ পছন্দ করে না।

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ—দুই দিকেই বিপদ, উভয়-সঙ্কট।

ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে—যে কার্য অপরের দ্বারা পরোক্ষে সাধিত হয়, সেই কার্য প্রত্যক্ষভাবে নিজের কৃতকর্ম বলিয়া বাহাদুরি লইবার অপচেষ্টা করা।

ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার—যাহার ক্ষমতা নাই, অথচ সর্দারি করিতে অগ্রসর হয়।

ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়—পরের ক্ষতি করিলে নিজের ক্ষতি।

ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে—নিজের স্বভাব ছাড়া যায় না। দাগী লোকটি
জেলেও চুরি করিত, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে।

দশের লাঠি একের বোঝা—যে কাজ দশ জনের সম্মিলিত চেষ্টায় সহজসাধ্য, তাহা এক জনের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্লেশকর। পল্লীসেবা সকলেরই করণীয়, একার নয়, দশের লাঠি একের বোঝা।

দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ—সকলে একযোগে কাজ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলেও লজ্জার কিছু নাই।

দিন দুপুরে ডাকাতি—প্রকাশ্যে অন্যায় আচরণ।

ধান ভান্‌তে শিবের গীত—প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বিপরীত প্রসঙ্গের অবতারণা করা অথবা এক কাজ করিতে যাইয়া অন্য কাজ আরম্ভ করা।

নাচতে না জান্‌লে উঠান বাঁকা—নিজে কাজ করিতে না পারিলে অপরের দোষ দেওয়া।

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা—নিজের ক্ষতি নিজে করা।

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল—কোন জিনিস একেবারে না থাকার চেয়ে তাহার কিছু থাকাও ভাল।

পেটে খেলে পিঠে সয়—খাইতে পাইলে মারধোরও সহ্য হয়, অর্থাৎ লাভ থাকিলে পরিশ্রম করা যায়।

(পাপের) লাভের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়—প্রবাদ এই যে, অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ প্রায়ই অপব্যয়ে নষ্ট হয়, সে অর্থ জমাইয়া রাখা যায় না।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো (Penny wise, pound foolish)—ছোটখাটো সামান্য ব্যাপারে ব্যয় সঙ্কোচ করা, অথচ বড় বড় ব্যাপারে এককালীন অধিক ব্যয় করা।

বয়সের গাছ-পাথর নেই—বয়সের হিসাব নেই, অতি বৃদ্ধ।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—বাপের চেয়ে ছেলের তেজ বেশী।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িলে কিছু না কিছু ক্ষতি হইবেই। কোর্ট-কাছারি একবার শুরু হলে তার শেষ কোথায়? কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

বাপ্‌কা বেটা সিপাইকা ঘোড়া (কুচ নেই তো থোড়া থোড়া)—পিতার দোষগুণ পুত্রে কিছু কিছু পাইয়া থাকে।

বোঝার উপর শাকের আঁটি—অনেক কাজের উপর আবার একটি বাড়তি ছোট কাজ চাপান।

ভিন্‌গাঁয়ের মধুসূদন স্বগ্রামের মেধো—লোকে যত বড়ই হউক না কেন, অতি পরিচিত ব্যক্তির নিকট বা নিজের গ্রামে সে উপযুক্ত সম্মান পায় না (তুলনায়—গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না)।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না—যাহাতে পাঁচ জনের সমান দাবী তাহার সুব্যবস্থা হয় না। দায়িত্ব ভাগাভাগি করিলে কাজ সুসিদ্ধ হয় না।

মরা হাতী লাখ টাকা—কাজের লোক বৃদ্ধ হইলেও অথবা যোগ্য ব্যক্তি দৈব-দুর্বিপাকে ক্ষণিক বিমূঢ় হইলেও সহজে অন্তঃসারশূন্য হয় না।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা—মর্মান্তিক আঘাত। চাকুরি শেষ হতেই বড় ছেলেটি মারা গেল, এ যে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

মশা মারতে কামান দাগা—ক্ষুদ্র কাজে বৃহৎ আয়োজন।

মৎস্যের মায়ের পুত্রশোক—যে সর্বদাই বিপদের ঝুঁকি লইয়া কাজ করিতেছে তাহার বিপদের ভয়ে ভীত হওয়া সাজে না।

মুখে মধু পেটে বিষ—মুখে যাহার মিষ্টি কথা অথচ মনের মধ্যে পরের সর্বনাশের চিন্তা। দুষ্ট লোকের সঙ্গে মেশো না, ওদের মুখে মধু পেটে বিষ।

যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই—কাহারও কোন কার্যসিদ্ধির জন্য আর পাঁচ জনে চেষ্টা করে, অথচ সে নিজে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকে।

যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা—যাহাকে মোটেই ভাল লাগে না, তাহার প্রত্যেকটি কথা এবং আচরণ বিরক্তিকর।

যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া—কাহারও নিজের জিনিস দিয়া তাহাকেই জব্দ করা। অথবা মোটামুটিভাবে উপকারীর অপকার করা।

যার তরে চুরি করি সেই বলে চোর—যার তরে ছেলে ধরি সেই বলে ডা'ন—যাহার সুখের জন্য, অথবা যাহার মনস্তুষ্টির জন্য হীন কর্ম করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সময়ে সময়ে সে নিজেই তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে।

যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ—যে মালিক, সে নিজে ভোগ করিতে পায় না, ভোগ করে অপরে।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—যে ব্যক্তি বহু অপরাধ করিয়াছে, তাহার পক্ষে আর একটা বেশী অপরাধ করা এমন কিছু নয়।

যে সয় সে রয়—যাহার দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি আছে, জগতে সেই উন্নতি করে। ধৈর্য ধর, উন্নতি হইবে, কথায় বলে যে সয় সে রয়।

যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর—দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে একমাত্র সেই যে তাহার চেয়েও দুর্বৃত্ত।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন—গৌরী সেন কলির দাতাকর্ণ ছিলেন, প্রার্থীকে তিনি কখনও বিমুখ করিতেন না, সেই জন্যই কাহারও কখনো কোন কিছুর প্রয়োজন হইলেই লোকে এই প্রবচনটি উল্লেখ করে।

সস্তার তিন অবস্থা—খুব বেশী সস্তায় জিনিষ কিনিলে তাহা প্রায়ই খারাপ থাকে।

সবুরে মেওয়া ফলে—ধীরভাবে অপেক্ষা করিলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। ব্যবসা করিতে ধৈর্য চাই, সবুরে মেওয়া ফলে।

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে
জহুরী জহর চেনে } —অর্থাৎ যে যে রকম লোকের সঙ্গে মেশে সে তাদের প্রকৃতি ভালভাবেই জানে।

স্বভাব যায় না মলে ইল্লৎ যায় না ধু'লে—প্রাণ গেলেও মানুষ স্বভাব ছাড়্তে পারে না।

সুখে থাকতে ভূতে কিলায়—অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন আরামে থাকিতে পারে না, অকারণে দুঃখ ডাকিয়া আনে।

স্রোতের মুখে বালির বাঁধ—স্রোতের মুখে বালির বাঁধ যেমন টিকিয়া থাকিতে পারে না, প্রবল বিপদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-চেষ্টা ঠিক তেমনি বিপর্যস্ত হইয়া যায়।

হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল—বড় বড় লোক যে কাজ করিতে পারে নাই, একজন সামান্য লোকের সেই কাজ করিবার স্পর্ধা।

বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি সংস্কৃত প্রবাদ-বাক্য

এগুলি (মোটা হরফে) অবিকৃতভাবে বাংলায় চলিত। (মূল শ্লোকসহ লেখা হইল)।

১। **অতি দর্পে হতা লঙ্কা** অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্‌॥

অতি দর্পে লঙ্কার রাজা রাবণ সবংশে নিহত হইয়াছিলেন, অতি মানে কৌরবেরা বিনাশ পাইল, অতি দানে বলি রাজা পাতালে আবদ্ধ হইলেন, বাড়াবাড়ি করিলেই ক্ষয় হয়। কোন কিছুতেই আতিশয্য ভাল নয়।

২। স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি ॥

যাহার যেরূপ স্বভাব তাহা কখনও যায় না, অঙ্গার শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলিনতা দূর হয় না।

৩। আতুরে নিয়মো নাস্তি, বালে বৃদ্ধে তথৈবচ।
কুলাচাররতে চৈব এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

রুগ্ন অবস্থায় নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষেও তাহাই ; কুলাচার-পালনকারীর পক্ষেও তাহাই ; ইহাই সনাতন বা শাশ্বত ধর্ম।

৪। লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্তা শরীরে কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকং আয়ুর্যাতি দিনে দিনে ॥

লোকে প্রশ্ন করে, শারীরিক কুশলের। আমাদের কুশল কোথায়? দিন দিন আয়ুক্ষয় হইতেছে।

৫। ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা আশা বৈতরণী নদী।
বিদ্যা কামদুঘাধেনুঃ সন্তোষঃ নন্দনং বনম্ ॥

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য জনৈক রাক্ষসের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন, মানুষের ক্রোধ কালসদৃশ ভয়ঙ্কর, আশা বৈতরণী নদীর ন্যায় অপার অর্থাৎ আশার শেষ নাই, বিদ্যা কামধেনুর ন্যায় অভীষ্টদাত্রী আর সন্তোষ নন্দন-কাননের ন্যায় প্রীতিপ্রদ।

৬। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ॥

উদ্যোগী পুরুষশ্রেষ্ঠকে লক্ষ্মী আশ্রয় করেন। দৈব ধনসম্পদ দিবে ইহা কাপুরুষেরাই বলে।

৭। অপাত্রঃ পাত্রতাং যাতি যত্র পাত্রো ন বিদ্যতে।
নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে ॥

যেখানে গুণী ব্যক্তি নাই সেখানে নির্গুণ ব্যক্তিও গুণবান্ বলিয়া পরিগণিত হয় ; বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ড (ভেন্না) গাছকেই বৃক্ষ বলা হয়।

৮। একবৃক্ষ-সমারূঢ়া নানাপক্ষ-বিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে তু দিশো যান্তি কা কস্য পরিবেদনা ॥

রাত্রিকালে নানা পক্ষী আসিয়া এক বৃক্ষে বাস করে, কিন্তু প্রভাতে নানা দিকে চলিয়া যায়। সুতরাং কাহার জন্য কি ব্যথা?

৯। অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ ॥

প্রতিদিন লোকের মৃত্যু হইতেছে অথচ যাহারা জীবিত থাকে তাহারা আপনাদিগকে চিরজীবী মনে করে। ইহার চেয়ে আর আশ্চর্য বিষয় কি আছে?

১০। চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি ॥

চিত্ত, বিত্ত, জীবন, যৌবন সবই চলিয়া যায়, কেবল কীর্তিমান্ পুরুষই অমর।

১১। কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাং মতম্‌ ॥

বেদবিদ্‌ পণ্ডিতগণ বলেন, যেমন মৃত ব্যক্তির পুনর্বার মরণ নাই, কৃতকার্যের পুনরায় করণ হয় না। সেইরূপ গতবিষয়ের জন্য অনুতাপ অকর্তব্য।

১২। **দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী**—একমাত্র দারিদ্র্যদোষেই সকল গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

১৩। পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা **পরহস্তগতং ধনম্‌**।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্‌ ॥

পুস্তকস্থ বিদ্যা ও পরহস্তগত ধনে কোন ফল নাই। কার্যকালে সে বিদ্যা আর বিদ্যা নয়, সে ধনও ধন বলিয়া গণ্য হয় না।

১৪। একভূরুভয়োরেকদলয়োরেক কাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ **ফলেন পরিচীয়তে** ॥

একই মাটিতে শালি ও শ্যামা ধান জন্মে, উভয়ের পত্রদল ও কাণ্ড একই প্রকার। কিন্তু ফল হইলেই উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৫। **শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্‌**। শরীরই ধর্ম সাধনের মূল অর্থাৎ শরীর সুস্থ না থাকিলে ধর্মসাধন সম্ভব নয়।

১৬। **বিষকুম্ভং পয়োমুখম্‌**। মনে বিষ, মুখে মধু। (এরূপ বন্ধু পরিত্যাজ্য—এরা দুগ্ধমুখ বিষের হাড়ির ন্যায়)।

১৭। **বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী**স্তদর্ধং কৃষিকর্মণি।
তদর্ধং রাজসেবায়াং **ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ** ॥

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, অর্থাৎ বাণিজ্যে সবচেয়ে বেশি ধন লাভ হয়। তাহার অর্ধেক কৃষিকার্যে, তাহার অর্ধেক রাজসেবা বা চাকুরিতে ; কিন্তু ভিক্ষায় কিছুমাত্র নয়।

১৮। গণ্ডূষজলমাত্রেন **শফরী ফরফরায়তে**। গভীর জলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ ॥ পুঁটিমাছ অল্পমাত্র জলেই ফর্‌ফর্‌ করে। কিন্তু গভীর জলে থাকিয়াও রোহিত অবিকারী। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

১৯। **ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ**। ধার করিয়াও ভাল জিনিস খাওয়া।

২০। **বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া**। অতি আড়ম্বর করিয়া কোন কাজ আরম্ভ করিয়া শেষে অতি সামান্য ভাবে শেষ করা।

অনুশীলন

১। নিম্নলিখিত শব্দসমষ্টি সার্থকভাবে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—অর্ধচন্দ্র দান, অরণ্যে রোদন, কড়ায় গণ্ডায়, বিড়ালতপস্বী, হাতে কলমে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, অন্ধকারে ঢিল মারা, শরীরের রক্ত জল করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, অন্ধের যষ্টি, স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া, মান্ধাতার আমল, উত্তম মধ্যম, আকাশকুসুম, বালির বাঁধ, তাসের ঘর।

২। লিখিত প্রবাদ-বাক্যের ব্যাখ্যা কর, নিবন্ধ রচনা কর এবং বাক্যে প্রয়োগ কর :—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা, কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ, চোরে চোরে মাসতুত ভাই, জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী, যে সয় সে রয়, সবুরে মেওয়া ফলে, ফলেন পরিচীয়তে।

বিরাম-চিহ্ন

ছেদচিহ্ন বা যতিচিহ্ন (Punctuation)

৩৭৩। একটি বাক্যকে বা বাক্যসমষ্টিকে একশ্বাসে উচ্চারণ করা যায় না, অর্থবোধের সৌকর্যার্থে এবং শ্বাসযন্ত্রের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে বিশ্রাম লইতে হয়। একটি বাক্যের উচ্চারণের ভিতরে ও বাক্যসমষ্টির উচ্চারণের সময়ে কোথায় কতটুকু এবং কি জাতীয় বিশ্রাম লইতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য আধুনিক কালে আমরা অনেক বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন বাংলায় এক দাঁড়ি '।' এবং দুই দাঁড়ি '॥' ব্যতীত অন্য কোন বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। বর্তমানে ব্যবহৃত অধিকাংশ বিরাম-চিহ্নই আমরা ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

আধুনিক বাংলা বিরাম-চিহ্ন :—

, **কমা**—সর্বাপেক্ষা অল্প বিরতি সূচনা করে।

; **সেমিকোলন**—কমা অপেক্ষা দীর্ঘতর বিরতি সূচনা করে।

: **কোলন**—প্রায় সেমিকোলনের তুল্য, পূর্ববর্তী উক্তির বিশদীকরণে ব্যবহৃত হয়।

:— **কোলন ড্যাশ্**—উদ্ধৃত বাক্য ব্যবহারে বা পুনরাবৃত্তিতে প্রয়োগ করা হয়।

— **ড্যাশ্**—উদাহরণ প্রয়োগ বা একই কথার নানাভাবে বিশদীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

- **হাইফেন**—সাধারণতঃ সমাসবদ্ধ করিতে ব্যবহৃত হয়।

। **দাঁড়ি**—পূর্ণ বিরতি, বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়।

॥ **জোড় দাঁড়ি**—পদ্যের দ্বিতীয় পংক্তির শেষে ব্যবহৃত হয়।

? **প্রশ্নবোধক চিহ্ন**—প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় বাক্যশেষে ব্যবহৃত হয়।

! **বিস্ময় বা ভাবসূচক চিহ্ন**—বিস্ময়, আনন্দ, শোক, ভয় ইত্যাদি প্রকাশে পূর্বে সম্বোধনে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইত।

' ' " " **উদ্ধৃতি চিহ্ন**—অন্যের বাক্যে বা বিশেষ শব্দে ইহা ব্যবহৃত হয়।

' **লুপ্তি চিহ্ন**—শব্দের কোন অংশ বর্জিত হইলে ব্যবহৃত হয়।

( ) [ ] **বন্ধনী**—বাক্যান্তর্গত ঈষৎ অসম্বদ্ধ অংশবিশেষ অথবা কোন বিকল্প উক্তি অথবা শব্দান্তর কখনও বন্ধনীর অন্তর্গত করা হয়।

, কমা (Comma)

পাঠ কালে কমা-চিহ্ন স্থলে সামান্য একটু বিরাম দিতে হয়। রচনায় নিম্নলিখিত স্থলসমূহে, কমা ব্যবহার করা আবশ্যক।

১। এক জাতীয় একাধিক পদ পর পর ব্যবহৃত হইলে উহাদিগকে কমাদ্বারা বিভক্ত করিতে হয়।

বিশেষ্য—রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির যন্ত্রণায় সকলেই অভিভূত হয়।

বিশেষণ—ধর্ম ও সত্য – একাত্ম, অভিন্ন, মঙ্গলময় পদার্থ।

সর্বনাম—তাহাকে, আমাকে, তোমাকে লইয়া বাবা কলিকাতা যাইবেন।

ক্রিয়া—দেখ, শুন, ভাব, বিচার কর, অভিজ্ঞতা লাভ হইবে।

অব্যয়—না, না—আমি কিছুতেই যাইব না।

২। কিন্তু যে পদের পর কোন সংযোজক অব্যয় থাকে, তাহাতে কমা দিতে হয় না। যথা—

তাঁহারা গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন।

৩। এক জাতীয় একাধিক বাক্যাংশ বা বাক্য পর পর ব্যবহৃত হইলে উহাদিগকে কমাদ্বারা বিভক্ত করিতে হয়।

বাক্যাংশ—যুদ্ধ ব্যবসায়ে, বুদ্ধি সঞ্চালনে, বিদ্যাবলে ইহারাই শিবাজীর সহায়তা করিয়াছিলেন।

বাক্য—রাজার রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল, স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

৪। জটিল বা যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত সরল বাক্যগুলিকে কমা দ্বার বিভক্ত করিতে হয়। যথা—

"আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি এবং আমার যাহা শিখিতে অবশিষ্ট আছে, এতদুভয়ের তুলনা করিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমি কিছুই শিক্ষা করি নাই।"

৫। কিন্তু উপরি-উক্ত কথাগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলে এবং সহজে অর্থবোধক হইলে কমার ব্যবহার করিতে হয় না। যথা—

(ক) রাম চলিয়া গেল এবং আমি বাড়ী আসিলাম।

(খ) সে বলিল যে, তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে।

৬। বস্তুতঃ, পরন্তু, অধিকন্তু, হাঁ, না, প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ ইত্যাদি অব্যয়ের পর কমার ব্যবহার করিতে হয়।

৭। পত্রাদিতে সম্বোধন পদের পর সাধারণতঃ কমা-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা—

মহাশয়, আশা করি আমার অনুরোধটি রক্ষা করিবেন।

৮। ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উপাধি প্রভৃতি বাংলায় লিখিলে কমা (অথবা . ডট্) ব্যবহার করিতে হয়। যথা—তিনি এবার বি,এ, (বি.এ.) পরীক্ষা দিয়াছেন।

; সেমিকোলন (Semi-Colon)

১। দুই বা ততোধিক বাক্য পরস্পর অঙ্গীভূত না হইয়া যদি নিকট সম্বন্ধ যুক্ত হয়, তবে ঐ বাক্যগুলি পরস্পর সেমিকোলন দ্বারা বিভক্ত হয়। যথা—

"যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম, যাহা ধর্ম, তাহাই প্রকাশ ; যাহা প্রকাশ, তাহাই স্বর্গ, যাহা স্বর্গ তাহাই সুখ।"

২। কিন্তু, সুতরাং, অতএব প্রভৃতি অব্যয়ের পূর্ববর্তী বাক্যের পর সাধারণতঃ সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যথা—

"তদীয় চিত্তক্ষেত্র সন্তোষের প্রিয়তম আবাসভূমি ; সুতরাং অসন্তোষজনিত অশান্তি কদাচ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না।"

পাঠকালে এইচিহ্ন স্থলে কমা অপেক্ষা একটু অধিক সময় বিরাম দিত হয়।

দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (Full Stop)

বাক্য সমাপ্তির পর পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার হয়।

প্রাচীন পদ্যে পয়ারাদির প্রথম চরণে এক বার ও শেষ চরণে পর পর দুই বার পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়। যথা—

কর্ম করে যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥

?! প্রশ্নবোধক ও সম্বোধনাদিসূচক চিহ্ন

(Notes of Interrogation and Admiration)

জিজ্ঞাসা স্থলে প্রশ্নবোধক-চিহ্ন (?) ব্যবহৃত হয়। সম্বোধন, বিস্ময়, হর্ষ, খেদ প্রভৃতি স্থলে সম্বোধন চিহ্ন (!) ব্যবহৃত হয়। যথা,—

অহো! বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে কি এই ছিল?

অন্যান্য চিহ্ন

১। ' ' " " **উদ্ধৃতি-চিহ্ন**। অন্যের কথা অবিকল উদ্ধৃত করিলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। উদ্ধৃত অংশ একটি পদ, বাক্যাংশ বা বাক্যসমষ্টি হইতে পারে। যথা—

তিনি আর্তস্বরে "সোলন" "সোলন" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন (অপিচ, সেমিকোলনের দৃষ্টান্তগুলি দেখ)।

কিন্তু বাংলা ভাষায় সাধারণ কথাবার্তার বর্ণনায় এই চিহ্ন প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। যথা—মা বলিলেন, শীঘ্র বাড়ী আসিও।

২। - **হাইফেন**। এইটি **সমাসজ্ঞাপক চিহ্ন**। যথা— সযত্ন-পরিবর্ধিত, কটু-তিক্ত-কষায়-রস-বিশিষ্ট।

৩। **— ড্যাশ্**। (ক) কোন কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা করিলে এই ড্যাশ্-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা—

"নাহি কাজ প্রিয়তমা সীতায় উদ্ধারি—
অভাগিনী !—নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে ?"।

(খ) দৃষ্টান্তস্থলে, যথা, যেমতি প্রভৃতি শব্দের পর কমা ও একটি ড্যাশ্ ব্যবহৃত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী প্রত্যেক উদাহরণে দেখিবে।

(গ) উদ্ধৃত বাক্যের পূর্বে একটি কমা ও ড্যাশ্ ব্যবহৃত হয়।

৪। ' কোন একটি অক্ষর উহ্য থাকিলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা— "কি ব'লে বুঝাব উর্মিলা বধূকে আমি।" "সন্ধ্যা হ'ল।"

৫। ( ) **বন্ধনী**। বাক্যের অন্তর্গত কোন অংশের ব্যাখ্যা করিতে হইলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ। প্রবন্ধও এক প্রকার সাহিত্য-সৃষ্টি। কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির ন্যায় প্রবন্ধও সাহিত্যিক মনের আর এক শিল্পকর্ম। প্রবন্ধ কোন লেখকের সুবিন্যস্ত মতামতের যুক্তিপূর্ণ প্রকাশমাত্র নয়। মনের গঠন ও চিন্তাধারা অনুযায়ী একই বিষয়ের প্রবন্ধ সকল ক্ষেত্রে এক রকম হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ যেখানে সিদ্ধান্ত এক সেখানেও যুক্তির পার্থক্য থাকে, প্রকাশভঙ্গির তারতম্য থাকে, বিশেষতঃ বিভিন্ন লেখকের হৃদয়ের স্পর্শে উহা বিভিন্নরূপে বিকশিত হয়।

আসল কথা হইল, মূল ভাব ও বিষয়টিকে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারায় যুক্তি দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে পরিবেশন করিতে হয়। 'প্রবন্ধ' শব্দটির মধ্যেই প্রবন্ধের সংজ্ঞা নিহিত আছে—'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন' এবং বন্ধন হইল ভাবের বন্ধন, যুক্তির বন্ধন ও ভাষার বন্ধন।

প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশ। সাধারণভাবে প্রবন্ধের **তিনটি** স্তর—ভূমিকা বা সূচনা, আলোচনা বা বিবৃতি, সিদ্ধান্ত বা উপসংহার। কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার পূর্বে প্রারম্ভে যে কথাগুলি বলিতে হইবে তাহার নাম ভূমিকা বা সূচনা। ভূমিকার মধ্যেই মোটামুটি ভাবে বিষয়টির সংজ্ঞা, ইতিহাস, আলোচনার কাঠামো, সিদ্ধান্ত বা উপসংহারের অস্ফুট ইঙ্গিত ইত্যাদি থাকে।

ভূমিকাতে যাহা অস্ফুট ইঙ্গিতময়, আলোচনার ক্ষেত্রে তাহাই যুক্তি-প্রমাণ সহকারে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই অংশ প্রবন্ধের অপেক্ষাকৃত বড় অংশ। আলোচনায় যুক্তিগুলিকে পর পর এমন করিয়া সাজাইতে হইবে যাহা দ্বারা একটি সিদ্ধান্তের দিকে উহার গতি নিবদ্ধ হইতে পারে। বিখ্যাত লোকের রচনা হইতে দুই একটি উপযোগী উদ্ধৃতি দেওয়া ভাল। প্রবন্ধের **আরম্ভ** ও **উপসংহার** সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ; এই দুইটি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রচনা-রীতি বা পদ্ধতি। প্রবন্ধ লিখিবার সময় এই স্তরগুলিকে যথাযথ ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট রচনা-রীতি (style) অবলম্বন করিতে হয়। যে বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া যাহা লিখিতে হইবে কয়েকটি সূত্রাকারে তাহা লিখিয়া ফেলিবে।

ইহার পর সূত্র-বিন্যাস। সূত্রগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলেই প্রবন্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। এক-একটি সূত্রে অন্ততঃ একটি করিয়া অনুচ্ছেদ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, অনুচ্ছেদগুলিকে এমন করিয়া শেষ করিতে হইবে যাহাতে একটির সহিত অপরটির একটি সহজ সম্বন্ধ ও পারম্পর্য থাকে। অনেক সময় পরীক্ষার প্রশ্নেই সংকেত-সূত্র দেওয়া থাকে।

প্রবন্ধের আয়তন। প্রবন্ধ কত বড় হইবে, তাহার বিশেষ কোনও নিয়ম নাই। অনেক সময় প্রশ্নকর্তা শব্দসংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে বেশি চিন্তা করিতে হয় না। নতুবা বিষয়-বস্তু, পরীক্ষার সময় ও প্রশ্নের নম্বর হিসাব করিয়া আয়তন ঠিক করিতে হয়।

প্রবন্ধের ভাষা। সহজ ও সাবলীল ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখিতে হয়। লেখকের সরল রচনা-ভঙ্গির সঙ্গে পরিমাণ-বোধ থাকা উচিত। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা মনে রাখিবে—"আপন অন্তরের ভাব প্রকাশের জন্য স্বচ্ছতা, সুপরিচ্ছন্নতা এবং বিশুদ্ধতাও যেমন চাই, তেমনি চাই ভাষার ঔজ্জ্বল্যও। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ বহন করিয়াই নয়, তথ্য ও তত্ত্বের প্রাচুর্য সন্নিবেশিত করিয়াও হয়, প্রাঞ্জল ও সরস বাণী ভঙ্গির গুণেই রচনা মূল্যবান হয়।"

বাংলা ভাষার দুই রূপ—একটি **সাধু ভাষা**, অপরটি **চলিত ভাষা**। পরীক্ষায় দুইটিই ব্যবহার করা যাইতে পারে। **কিন্তু একই প্রবন্ধে একসঙ্গে সাধু ও চলিত ভাষার প্রয়োগ করিবে না।** সাধু বা চলিত যে কোন একটি ভাষায় সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি লিখিবে। বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভাষা ঠিক করিবে। বিশুদ্ধতা ও সৌষ্ঠবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে। পরিমিত বাক্য ব্যবহার প্রবন্ধের একটি বিশেষ গুণ। উচ্ছ্বাসের আতিশয্য বাঞ্ছনীয় নয়। ভাষা, রীতি ও বানান সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবে।

মোট কথা, সার্থক প্রবন্ধ রচনা নির্দিষ্ট নিয়মের উপর যতটা নির্ভর না করে, তাহার চেয়ে বেশি নির্ভর করে লেখকের জ্ঞান-বুদ্ধি, ভাব-কল্পনা, সৌষ্ঠবময় প্রকাশভঙ্গি আর বস্তু-পরিচয়ের উপর। লেখকের বুদ্ধির দীপ্তি ও হৃদয়ের ভাবাবেগের পরিমিত প্রকাশের সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

নবম এশিয়ান ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা (১৯৮২ সাল)

১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু অলিম্পিকের অনুসরণে দিল্লীতে একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এটি ছিল প্রথম এশিয়ান গেমস্। এটি চার বৎসর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লীর পর যথাক্রমে ম্যানিলা, টোকিও, জাকার্তা, ব্যাংকক ও তেহেরাণ—এই পাঁচটি শহরে সাতটি গেমস অনুষ্ঠিত হয়। এই বারের নবম এশিয়ান গেমস্ ১৯শে নভেম্বর, ১৯৮২ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো। এশিয়ান গেমসের আয়োজন করা এত বিরাট ব্যাপার যে, খুব কম দেশই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। তাই গত আটটি গেমসের মধ্যে তিনটিই অনুষ্ঠিত হয়েছে থাইল্যাণ্ডের ব্যাংকক শহরে। সদ্য সমাপ্ত নবম এশিয়ান গেমস্ এশিয়ার বৃহত্তম ক্রীড়ানুষ্ঠান।

প্রথম এশিয়ান গেমস ও নবম এশিয়ান গেমসের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রথম এশিয়ান গেমসে মাত্র ১১টি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। আর প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল মোট ছয়টি। আট দিনের খেলার আসরে ঐ ১১টি দেশের ৩৮৯জন প্রতিযোগী যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় কেবল মাত্র দিল্লীতে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামেই সব খেলা হয়েছিল। তখন ফ্লাড লাইট ব্যবস্থা, অলিম্পিক ট্র্যাক, ইলেকট্রনিক স্কোর বোরড এবং হকির জন্য অ্যাসট্রোটারফের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

এই গেমস নিয়ে অনেক অনিশ্চয়তা এবং আশঙ্কা একেবারে গোঁড়ায় দিকে ছিল: এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার কথা হয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতায় এই আসর বসানোতে সম্মতি দেন নাই। এবং দিল্লীতেই ১৯শে নভেম্বর যথা সময়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল। ১৬ দিনের এই খেলায় যোগ দিয়েছিল তেত্রিশটি দেশ এবং প্রতিযোগী সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের কিছু কম-বেশী। এবার প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল একুশটি। তার মধ্যে কয়েকটি খেলা নতুন সংযোজন করা হয়েছে। উনিশটি খেলা দিল্লীর বিভিন্ন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি বম্বেতে, একটি জয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়। এতগুলি প্রতিযোগিতার বিষয় আর কোন বার খেলান হয় নাই এরূপ বেশী সংখ্যায় প্রতিযোগীও কোনবার আসে নাই। তাই সঙ্গত কারণেই দিল্লীকে সাজান হয়েছে। ৭টি ফ্লাইওভার, ১২টি বড় হোটেল, নতুন রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ-কেন্দ্র, বৈদ্যুতিক চক্ররেল, ৫০০ নতুন বাস, জলাধার, আধুনিক টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা, অলিম্পিক ট্র্যাক, ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ড, কমপিউটারের ব্যবস্থা, এবং হকির জন্য অ্যাসট্রো-টারফের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দিল্লী এখন ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক শহরের মত সুন্দর।

এশিয়ান গেমসে ভারত কোন্ বার কি রকম খেলেছে তার হিসাব করা যাক।—ভারতের মত বৃহৎ দেশ স্বাধীনতার এত বৎসর পরেও খেলাধূলার দিক থেকে খুব বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি। এশিয়ান গেমসে প্রথম বৎসরে ভারতের স্থান ছিল দ্বিতীয়। ব্যক্তিগত বিষয়ে ভারত ১২টি সোনা, ১৩টি রূপা ও ১৭টি ব্রোঞ্জ এবং দলগত বিষয়ে ৩টি সোনা, ৩টি রূপা ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে হয় দ্বিতীয়। জাপান প্রথম হয় ব্যক্তিগত বিষয়ে ২০টি সোনা, ১৮টি রূপা আর ১৪টি

ব্রোঞ্জ এবং দলগত ভাবে ৩টি সোনা, ২টি রূপা ও একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে। কিন্তু অষ্টম এশিয়ান গেমসে ভারতের স্থান ছিল ষষ্ঠ। প্রথম হয় জাপান। পরে ক্রমান্বয়ে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড। ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে ভারত ফুটবলে সোনা পায়। তার পর থেকে আর স্বর্ণপদক ভারত ফুটবলে পায়নি। ১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল-গঠনের জন্য ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। মোট ২১টি বিষয়ের ক্ষেত্রে কোচিং ক্যাম্প হয়েছে ২০৫টি। বেশির ভাগ কোচিং ক্যাম্প হয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ স্পোর্টসের পাতিয়ালা ও বাঙ্গালোর কেন্দ্রে। এ ছাড়া ক্যাম্প হয়েছে অমরাবতী, বেরিলি, বোম্বাই, কলকাতা, চণ্ডীগড়, কালিকট দিল্লী, গান্ধীনগর, জলন্ধর, লখনউ, মীরাট, মাদ্রাজ, নাগপুর, পুনে, হায়দরাবাদ, শ্রীনগর, জয়পুর, বিশাখাপত্তনম্ ইত্যাদি স্থানে। কোচিং-এর ব্যাপারে বিষয়গুলির যে রকম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম গ্রুপ—অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, হকি (পুরুষ), হকি (মহিলা) এবং কুস্তি।

দ্বিতীয় গ্রুপ—ব্যাডমিণ্টন, বাস্কেট্বল (পুরুষ), লন টেনিস, শুটিং, ভারোত্তোলন, পাল তোলা নৌকা, অশ্বারোহণ, সাইক্লিং, ফুটবল, ভলিবল এবং টেবিল টেনিস।

তৃতীয় গ্রুপ—তীরন্দাজী, বাস্কেটবল (মহিলা), জিম্‌নাষ্টিক, সাঁতার, ভলিবল (মহিলা), হ্যাণ্ডবল এবং রোয়িং। নানা বিষয়ের জন্য ১২ জন বিদেশী কোচের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

১৯শে নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে বেলা ১০টায় এশিয়াডের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে তিনি সৌরশক্তি থেকে পুতাগ্নি প্রজ্জলিত করেন। অপরাহ্ণ পৌনে তিনটা থেকে সত্তর হাজার লোকের স্থান করে দিয়ে নেহেরু স্টেডিয়ামটি জল জল করে জলে ওঠে। পুতাগ্নি বহন করে ন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে নেহেরু স্টেডিয়ামের শেষের দিকে আনেন ভারতের এশিয়াডের সফলকামী দুজন খেলোয়াড়—মিলখা সিং ও কমলজিৎ সন্ধু। তারা আবার এই অগ্নি গুরুবচন সিং-এর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। বলবীর ও সাইম্ সিঁড়ী দিয়ে উঠে আগুন জ্বালিয়ে দেন। সেই সময় দুটি হেলিকপটার থেকে পুষ্প বর্ষণ করে। বিভিন্ন প্রতিযোগী দলের মধ্যে প্রথমে প্রবেশ করে আফগানিস্থানের প্রতিযোগীরা। প্রত্যেকেই প্রায় নিজ নিজ দেশীয় পোষাকে ভূষিত ছিলেন। এই স্টেডিয়ামের গোল চত্বরের পাশে পাশে ভারতীয় ছোট ছোট একটি ছেলে ও একটি মেয়ে একই সাজে হাতে রুমাল নিয়ে নেড়ে নেড়ে প্রতিযোগীদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল। প্রতিযোগী দল নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াবার পর ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং "এশিয়াডের খেলা আরম্ভ হল" ঘোষণা করেন। তখন জাতীয় সঙ্গীত বাজান হয়। আকাশে দু' হাজার পায়রা ওড়ান হয় ও নানা রংএর পাঁচ হাজার বেলুন উড়ে চলে যায়। এর মধ্যে প্রতিযোগীদের প্রতিনিধি শ্রীমতী গীতা জুৎসি ভারতীয় জাতীয় পতাকা স্পর্শ করে শপথ-বাক্য উচ্চারণ করেন। কাগজের 'আপ্পু' আকাশে উড়ে তার অস্তিত্ব দেখিয়ে দেয়। আসে রাজ বেশে ৩১টি হাতী। পর পর সুশৃঙ্খল

ভাবে তারা স্টেডিয়ামের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যাণ্ড বাজানর তালে তালে সকল প্রতিযোগী স্টেডিয়াম ছেড়ে গেলে সেখানে নানা নাচের আসর বসে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ৫ মিনিটের জন্য এক-একটি নাচ দেখায়। হাত তালিতে, সঙ্গীত মূর্ছনায়, আধারে, আলোকে, লোক সমাগমে উদ্বোধন অনুষ্ঠান পর্ব সমাপ্ত হয়।

পর দিন ২০শে নভেম্বর থেকে প্রকৃত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এবারেও সব মিলিয়ে চীন ও জাপানের ক্রীড়া-নৈপুণ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ধারে-কাছে যাওয়ার ক্ষমতা তৃতীয় হয়েও দক্ষিণ কোরিয়ার ছিল না। অনেকগুলি গেমসে এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে সাঁতারে চীন ও জাপান। ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, অ্যাথলিটিক্সে এদের ক্রীড়া-কৌশল প্রশংসনীয়। মেয়েদের উচ্চলম্ফে, দীর্ঘলম্ফে এরাই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। নবম এশিয়ান গেমসের পদকের চূড়ান্ত খতিয়ান দেখে তাদের কৃতিত্ব বোঝা যাবে।

	সোনা	রূপা	ব্রোঞ্জ	মোট
চীন	৬১	৫১	৪১	১৫৩
জাপান	৫৭	৫২	৪৪	১৫৩
দক্ষিণ কোরিয়া	২৮	২৮	৩৭	৯৩
উত্তর কোরিয়া	১৭	১৯	২০	৫৬
ভারত	১৩	১৯	২৫	৫৭
ইন্দোনেশিয়া	৪	৪	৭	১৫
ইরান	৪	৪	৪	১২
পাকিস্তান	৩	৩	৫	১১
মঙ্গোলিয়া	৩	৩	১	৭
ফিলিপিন্স	২	৩	৯	১৪
ইরাক	২	৩	৪	৯
থাইল্যাণ্ড	১	৫	৪	১০
কুয়ায়েত	১	৩	৩	৭
মালয়েশিয়া	১	০	৩	৪
সিঙ্গাপুর	১	০	২	৩
সিরিয়া	১	১	১	৩
লেবানন	০	১	০	১
আফগানিস্তান	০	১	০	১
হংকং	০	০	১	১
ভিয়েতনাম	০	০	১	১
বাহারিন	০	০	১	১
কাতার	০	০	১	১
সৌদি আরব	০	০	১	১
	১৯৯	২০০	২১৫	৬১৪

ভারত ৫৭টি মোট পদক পেয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। গত ১৯৭৮ সালে ১২টি সোনা ভারত পেয়েছিল। এবার পেয়েছে ১৩টি সোনা। প্রতিবারের মত এবারও ভারত ও পাকিস্তান হকিতে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। এই নিয়ে ভারত ৭ বার পাকিস্তানের সঙ্গে ফাইনালে খেলছে। তার মধ্যে ১৯৬৬ সালে কেবল একবার ব্যাংককে ভারত জিতেছিল। এবার ভারতের মাটিতে ভারতের পরাজয় বড়ই করুণ, কিন্তু মেয়েদের হকিতে আশাতীত ফল ফলেছে। প্রথম বার নেমেই সোনা পাওয়া অতি গৌরবের। অ্যাথলেটিকসে ভারত গতবার আটটি সোনা, সাতটি রূপা, তিনটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। এবার পেয়েছে চারটি সোনা, নটি রূপা ও আটটি ব্রোঞ্জ। ফুটবলে সেমিফাইনালেই উঠতে পারে নাই। ভারতের চাঁদরাম (হাটা), চারলস বোরেমিয় (৮০০ মিটারে), বাহাদুর সিং (শটপুট) এবং এম. ডি. বালাসাম্ম (৪০০ মিঃ) স্বর্ণপদক পান। আমাদের ত্রয়োদশ স্বর্ণ পদকটি এনে দিয়েছ মুষ্টি-যোদ্ধা কাউর সিং।

প্রতিযোগী সকলেই কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও কর্মকর্তারা কম পারদর্শিতা দেখান নাই। এত বড় একটি কর্মকাণ্ডের এত সুষ্ঠু পরিচালন পদ্ধতি দেখে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি সামারঞ্চ সাহেব প্রশংসা না করে পারেন নাই। চীন, জাপান, কোরিয়া এক বাক্যে সে কথা স্বীকার করেছেন। খেলাধূলা করার যে প্রধান উদ্দেশ্য তাও যথেষ্ট অর্জিত হয়েছে এই এশিয়াডে। এসিয়াবাসী তখন দিল্লীতে হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করেছে, করেছে প্রতিটি দেশের প্রতি নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বোধ। দেশে দেশে রাজনৈতিক দিক থেকে কত পার্থক্য, কত ঘৃণা, কত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নিত্য পৃথিবীকে কলঙ্কিত করছে। কিন্তু এসিয়াডে সে সব ভুলে ইরাক, ইরানের সাথে খেলাধূলা করেছে। আফগানিস্তানও পাকিস্তানের সাথে দিব্বি সহজ সরল ভাবে মেলামেশা করেছে, বিধ্বস্ত লেবাননও এই আনন্দ-মেলায় যোগ দিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যকে আরও সফল করেছে। তাই দিল্লীর এশিয়াডে যে বিশ্বের দরবারে ভারতের মান, সম্মান আর প্রতিষ্ঠা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এসব সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন খেলায় পরাজয়ের জন্য যে শৈথিল্যই দায়ী এটা ঠিক। সেই শৈথিল্য হতে মুক্ত হবার শিক্ষাটুকু যদি আমরা না নিতে পারি, তবে এত অর্থব্যয়, আর এত আড়ম্বরও কিন্তু আমাদের লজ্জা ঢাকতে পারবে না।

প্রথম ভারতীয় মহাকাশ পথিক

ভারতের মহাকাশ চর্চার ইতিহাস—মহাকাশে প্রথম ভারতীয় রাকেশ শর্মা ও তাঁর পরিচয়—নির্দিষ্ট দিনে মহাকাশ যাত্রা ও সফল প্রত্যাবর্তন—মহাকাশ অভিযানে ভারত-সোভিয়েত যৌথ কর্মসূচী—তিন মহাকাশচারীর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সমীক্ষা—উপসংহার।

'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'—অজানার আহ্বান, সুদূরের হাতছানিই চিরকাল মানুষকে ঘরছাড়া করেছে। অসীম অনন্তলোকের ইশারায় মানুষ নিজের সীমিত, গণ্ডীবদ্ধ মর্ত্যসীমাকে লঙ্ঘন করে অদৃশ্য হতে চেয়েছে নীলাকাশের উদারতায়। সত্যসন্ধানী মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা তাকে অনন্ত আকাশের রহস্য সন্ধানে আগ্রহী করেছে। "সুদূর নীহারিকা যারা করে আছে ভীড় আকাশের নীড়"—সেই গ্রহ উপগ্রহ, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-খচিত নভোনীলের আকর্ষণ তাকে আকাশ-পথে বিচরণের প্রেরণা দিয়েছে। রূপকথার রাজপুত্রের পক্ষিরাজ ঘোড়া অবলীলাক্রমে আকাশ-গাঙে পাড়ি দিয়েছে, রামায়ণের রাম পুষ্পক রথে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ যুগের মানুষও মহাশূন্যে বিজয়কেতন ওড়াবার সঙ্কল্প নিয়ে চড়েছে বেলুনে। লঘুপক্ষ পাখির মত অসীম আকাশে পাড়ি দেওয়ার বাসনায় সৃষ্টি করেছে ব্যোমযান বা বিমান। বিংশ শতাব্দীর মানুষের বিজয়-রথ আরও একধাপ এগিয়ে পাড়ি দিয়েছে মহাশূন্যে, মাধ্যাকর্ষণের দুর্বার আকর্ষণ ছিন্ন করে মহাকাশের অসীম-লোকের রহস্য উন্মোচন করেছে।

পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী মানব য়ুরি গ্যাগারিনের আশ্বাস—"এমন একদিন আসবেই যখন রাশিয়ার মহাকাশচারীদের দলে থাকবে একজন ভারতীয় নাগরিক"—ভারতীয়দের চোখে আশার অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিল। মহাকাশের রহস্য জানবার জন্য ভারতবাসীও ক্রমে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কিন্তু মহাকাশ অভিযানের সঙ্কল্প রূপায়ণের পটভূমি ত আগে তৈরী হওয়া দরকার। তৎপর হয়ে উঠলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা, সঙ্কটের সার্থক রূপায়ণের জন্য তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুরু হল উদ্যোগ পর্ব—১৯৬২ সালে মহাকাশ-চর্চার প্রাথমিক পদক্ষেপ শুরু হল—স্থাপিত হল "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস"। তারপরের বছর ১৯৬৩ সালে স্থাপিত হল মহাকাশ তীর্থ থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। বেদ উপনিষদের দেশ ভারত চরৈবেতি মন্ত্রের সাধক—তাই তৃতীয় বিশ্বে ভারতই প্রথম দেশ যে মহাকাশ-অভিযানে সফল অংশ গ্রহণ করেছে। তার বিজয়-রথ প্রেরণ করেছে মহাশূন্যের নীলিমায়। সোভিয়েত সহযোগিতায় একে একে মহাকাশে প্রেরিত হল আর্যভট্ট ও ভাস্কর। ১৯৮০ সালে ভারতের মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত হল রোহিণী। এরপর মহাশূন্যে একে একে যাত্রা করল অ্যাপল, ইনস্যাট ১-এ, ইনস্যাট ১-বি। এবার শুরু হল দ্বিতীয় পর্ব—ভারতের মহাকাশ অভিযানের প্রথম মানব যাত্রী রাকেশ শর্মা দেশ ও জাতির গর্ব—গ্যাগারিনের আশ্বাসের বাস্তব প্রতীক। ১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর থুম্বা থেকে রকেট উৎক্ষেপণ করে ভারত-মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে যে যাত্রা সুরু করেছিল, ১৯৮৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল তাতে চিহ্নিত হ'ল একটি উজ্জ্বলতম দিন হিসাবে। রাকেশের মহাকাশ

অভিযান ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর প্রতীক, উভয় দেশের গঠনমূলক সহযোগিতার অনন্য উদাহরণ। শুধু তাই নয়, এবারের শুভ যাত্রা মহাকাশ শক্তি হিসাবে ভারতের মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছে।

১৯৪৯ সালের ১৩ই জানুয়ারী পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাক্-স্নাতক পর্যায়ে হায়দরাবাদের নিজাম কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯৬৬ সালে খড়্গভাসলার জাতীয় প্রতিরক্ষা আকাদেমিতে যোগদান করেন। প্রথম চার বছর বিমানবাহিনীর ক্যাডেট হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ক'রে ১৯৭০ সালে ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে কমিশন পান। উইং কমাণ্ডার রাকেশ শর্মা এবং রবীশ মালহোত্রা ভারত-সোভিয়েট যৌথ উদ্যোগে মহাকাশ অভিযানের অংশগ্রহণকারী হিসাবে নির্বাচিত হন এবং জটিল মহাকাশ বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশে ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েতের প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে উপনীত হন। চোখে তাদের সুদূরের স্বপ্ন, মনে অদম্য সঙ্কল্পের দৃঢ় প্রত্যয়, বুকে দুর্দম সাহসের লৌহ-কঠিন বর্ম। শুরু হল কঠিন সাধনা—'মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন নিয়ে দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন হলেন দুই তরুণ পথিক। দীর্ঘ দেড় বছরের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা ও একনিষ্ঠ অনুশীলন তাঁদের মহাকাশের দুর্গম পথযাত্রী হিসাবে গড়ে তুলল।

অবশেষে 'দিন আগত ঐ'। ১৯৮৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দিন। সোভিয়েত রাশিয়ার বৈকানুরে সয়ুজ-টি নামে ফেনশুভ্র মহাকাশ পাখিটি উড়বার অপেক্ষায় প্রস্তুত। মহালগ্ন উপস্থিত—ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬-৩৮ মিনিটে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মাটি-মায়ের বন্ধন ছিন্ন করে, মাধ্যাকর্ষণের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করে সয়ুজ-টি-১১ ডানা মেলল আকাশে, উষ্ণ জঠরের নির্ভয় আশ্রয়ে রয়েছেন তিন মহাকাশচারী—রাশিয়ার য়ুরি ম্যালিশেভ এবং গেন্নাডি স্ট্রেকালভ ও ভারতের পঞ্চনদের দেশের রাকেশ শর্মা। মহাকাশে মানবযাত্রী হিসাবে রাকেশের স্থান ১৩৬তম। মহাকাশ যাত্রায় ভারত ত্রয়োদশ মহাকাশচারী দেশ এবং রাশিয়ার যুক্ত কর্মসূচীর একাদশতম দেশ। এক কথায় বলা যায় রাকেশ শর্মার অভিযান মহাকাশ শক্তি হিসাবে ভারতকে নবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল। ভারত মহাকাশ বিজ্ঞানের নতুন দিগন্তে পৌছাল। এর আগে ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে স্যালিউট-৭ নামে মহাকাশ পরীক্ষাগার মহাকাশে স্থাপিত হয়। কক্ষপথে ঘুরন্ত গবেষণাগার স্যালিউট-৭ এর সঙ্গে ঐতিহাসিক সংযোগ সাধন করাও এবারের যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। ৫ই এপ্রিল রাত ৮-২ মিনিটে স্যালিউট-৭-এর সঙ্গে সংযুক্ত হবার পূর্বে সয়ুজ-টি-১১ সতের বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। স্যালিউটে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন লিওনিদ্ কিজিম, ভ্লাদিমির সোলভজভ ও ওগেল আট্‌কভ্। ৪ঠা এপ্রিল থেকে ১১ই এপ্রিল—এই সাত দিন মহাকাশ অবস্থানকালে মহাকাশচারীরা বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উভয় দেশের যৌথ কার্যসূচী রূপায়ণের ব্যাপারে তৎপর হয়েছেন। সাত দিন কাটিয়ে এবার ফেরার পালা। ১১ই এপ্রিল সকাল দশটায় স্যালিউট-৭ থেকে সয়ুজ-টি ১০-এ আরোহণ করেন রাকেশ ও তাঁর দুই সঙ্গী। বন্ধ হয়ে যায় স্যালিউট-সয়ুজ সংযোগ দরজাটি। দুপুরের পর

মঙ্গোল প্রজাতন্ত্রের ওপর বিচ্ছিন্ন হল স্যালিউট-সয়ুজ সংযোগ। সয়ুজ-টি ১১ মহাকাশ ফেরিটি স্যালিউট ৭-এর সঙ্গে মহাকাশেই রয়ে গেল। পৃথিবীর দিকে মুখ ফেরালো সয়ুজ-টি ১০। বিকেল ৪-১৯ মিনিটে ছোট্ট সোভিয়েট শহর আরকালিকের জলাভূমিতে মহাকাশ-তরী নোঙর বাঁধল, সফল অভিযান শেষে নেমে এলেন তিন অভিযাত্রী।

কিন্তু কেন এই মহাকাশ যাত্রা? অসীম শূন্যে অভিযান কি শুধু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য? ভারত-সোভিয়েট যৌথ কার্যসূচীতে এই মহাকাশযাত্রার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ আছে। এই যাত্রার প্রধানতম উদ্দেশ্য ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী দৃঢ়তর করা, গঠনমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে বন্ধুত্বের ভিত্তি সুদূরপ্রসারী করা। উভয় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই যাত্রা কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করবে, বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের সন্ধান—তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের সন্ধান করা হবে। ভারতের ক্ষেত্রেও বহু পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালানো হবে। মহাকাশ থেকে ভারত মহাসাগর ও হিমালয়ের ওপর সমীক্ষা চালানো হবে, সমীক্ষা হবে আন্দামান, নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপে। হিমালয় পর্বতমালা বহু প্রাকৃতিক সম্পদের আকর। এগুলির সন্ধান পাওয়া গেলে ভারত বৈষয়িক দিক দিয়ে আরও উন্নতি লাভ করবে। ভারতের জল-সম্পদের প্রধান উৎস হিমালয়। ভারতের সমৃদ্ধ নদীগুলির উৎস হিমালয় পর্বত। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নদীগুলিকে ব্যবহার করতে পারলে ভারত শিল্পের ক্ষেত্রে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারবে। হিমালয়-জাত নদীগুলির সমীক্ষা ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। ভারতের অরণ্য-সম্পদ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহও এই কার্যসূচীতে স্থান পেয়েছে। সমীক্ষাগুলি ভারতের অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে।

এবারের ঐতিহাসিক মহাকাশ যাত্রা আরও কয়েকটি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহাকাশের ভারহীনতায় ও বায়ুর শূন্যতায় পদার্থের ধর্মের নানা পরিবর্তনের পরীক্ষাও এই যাত্রার অন্যতম কার্যসূচী। বিশেষ কয়েকটি ওষুধ বিশুদ্ধভাবে তৈরী করতে গেলে মহাকাশের পরিবেশই যে যথাযোগ্য, মহাকাশচারীত্রয় তা-ও পরীক্ষা করবেন তাই এবারের মহাকাশ যাত্রা ভারত তথা বিশ্বের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বলতম দিক্‌চিহ্ন।

মহাকাশচারীদের দৈনন্দিন প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে যৌথ কর্মসূচীর প্রত্যেকটি পরীক্ষাই তারা সম্পন্ন করেছেন। রাকেশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল—বিশেষ করে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং ভারত মহাসাগরের ছবি তুলেছেন এবং অন্যান্য পরীক্ষা করেছেন, চুম্বকীয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার শব্দ রেকর্ড করেছেন। আন্দামান, নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপ তাঁর সমীক্ষায় অগ্রাধিকার পেয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতি, বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা এবং কারিগরি জগতে এই সব তথ্য ভারতকে সমৃদ্ধ করবে। মহাকাশের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিমানবাহিনীর পক্ষেও বিশেষ সহায়ক হবে। সর্বোপরি এই অভিযান ভারতকে মহাকাশ সচেতন করে তুলবে, দেশের তরুণদের করবে অভিযান-মনস্ক। রাকেশ শর্মা মহাকাশচারীদের

দেহের ওপর ইলেকট্রো রেডিওগ্রাফ, রক্তচাপ, হৃদ্স্পন্দন, দৈহিক তাপমাত্রা ও যোগাসনের প্রভাব নিয়ে যে বহুমুখী পরীক্ষা চালিয়েছেন তা চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করবে।

ভারতবাসী রাকেশকে স্বদেশভূমিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। রাকেশ দেশ ও জাতির গর্ব—সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। সোভিয়েট ইউনিয়ন রাকেশকে 'অর্ডার অব লেনিন, 'হিরো অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন' প্রভৃতি খেতাব দান করে সম্মানিত করেছেন, ভারত তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে 'অশোকচক্রে' ভূষিত করে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে, এই অভিযান বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত করবে। রাকেশ শর্মা গান্ধীজী ও জওহরলালের শান্তির আদর্শের প্রতীক। এই যৌথ অভিযানের দ্বারা ভারত-সোভিয়েট বন্ধুত্ব মহাকাশেও বিস্তৃত হ'ল। ভারত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ। ব্যয়-সাপেক্ষ মহাকাশ অভিযান ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে গুরুভার হ'লেও এই অভিযান দেশের অগ্রগতির সহায়ক। বিশ্বের সামগ্রিক অগ্রসর-মানতার সঙ্গে সমতালে চলতে হলে মহাকাশ অভিযানের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তাই রাকেশের এই সাফল্যকে আমরা স্বাগত জানাই। রাকেশের অভিযান দুঃসাহসী যৌবনের জয়। যে আশার প্রদীপ তিনি প্রজ্জ্বলিত করলেন তার অনির্বাণ দীপ্তি আগামী দিনের তরুণদের উৎসাহে উদ্দীপিত করবে।

প্রকৃতির অভিশাপ খরা ও বন্যা

বন্যা ও খরা কাকে বলে—বন্যা ও খরার কারণ—জীবকুলের দুর্দশা—প্রতিকার—উপসংহার।

নদীমাতৃক ভারতের কলধ্বনিমুখর জলপ্রবাহ তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দেশকে এক অতুলনীয় রূপলাবণ্যের প্রসন্ন দীপ্তিদান করেছে। দেশকে সমৃদ্ধির সম্পদ দান করতে হলে যে-সব উপাদান প্রয়োজন, তার সবই আছে ভারতের ভাণ্ডারে। কৃষি-প্রধান ভারতে আছে নদী-নালা-অধ্যুষিত প্রান্তরের প্রাচুর্য, আছে তার বিপুল জনসংখ্যার শক্তি। তবুও ভারতের দৈন্যের অন্ত নাই, খাদ্যশস্যের জন্য তাকে বিদেশের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। দেশব্যাপী বুভুক্ষা দারিদ্র্য ও হতাশা ভারতের উন্নয়নের পথে এক চরম অভিশাপ। খাদ্যসমস্যা ভারতের কর্মপ্রবাহ ও জীবনধারাকে আজ প্রতি পদে পঙ্গু ও বিধ্বস্ত করে দেশব্যাপী চরম অবক্ষয়ের সূচনা করেছে। স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির প্রতিজ্ঞা আজ মরীচিকার বিভ্রান্তির হাতছানিতে দিশাহারা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়। সভ্যতার অগ্রগতির চরম সমুন্নতির ক্ষণেও ভারতের কৃষি সম্পূর্ণ প্রকৃতি-নির্ভর। খামখেয়ালী মৌসুমী বায়ু ভারতীয় কৃষির ভাগ্যবিধাতা। স্বাভাবিক জলপ্রবাহ যখনই তটের সীমাবন্ধন অগ্রাহ্য করে গ্রাম ও নগরকে প্লাবিত ক'রে প্রবাহিত হয় তখন তাকে বন্যা বলে। প্রকৃতির অশান্ত কন্যা বন্যা জনজীবনের স্বাভাবিক ধারাকে পঙ্গু করে। জীবন ও সম্পত্তির বিনাশ সাধন

করে, শস্যক্ষেত্রের আগামী সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেশে এক ভয়াবহ রিক্ততার চিহ্ন এঁকে দেয়। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে খরার উদ্ভব। অনিয়মিত ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত শ্যামলা সজীব শ্যামল প্রকৃতির বুকে রুক্ষ শুষ্ক নিষ্করুণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে মাটি ও মানুষের জলতৃষ্ণার এক কঙ্কাল চিত্র রচনা করে। ভারতের ভাগ্যাকাশে খরা ও বন্যা একটি স্থায়ী দুগ্রহ।

বন্যা ও খরার পিছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। অতীতে ভারতের নদীগুলি ভারতের কৃষিলক্ষ্মীর সম্পদ-দায়িনী সহায়িকা। শ্যামল শস্যক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় জলদানের ভূমিকা পালন করত অকৃপণ ঔদার্য। নদীগুলির নাব্যতাও ছিল স্বাভাবিক, নদীগর্ভ ছিল গভীর ও পলিমুক্ত—তাই নদীর জলবহনের ও জলনিষ্কাশনের ক্ষমতাও ছিল বিমুক্ত। রাজা মহারাজা ও জমিদার শ্রেণী কল্যাণময়ী নদীগুলির নিয়মিত সংস্কার করতেন। কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য খনন করে দিতেন অজস্র খাল। তাই বন্যা হলেও তার এমন চরম সর্বগ্রাসী রূপ সেকালে ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ভারতের নদীগুলি তার স্বাভাবিক রূপলাবণ্য হারিয়ে শীর্ণকায় হয়ে গেছে। নদীবক্ষ দীর্ঘসঞ্চিত পলিতে ভারাক্রান্ত, তার জলবহনের ও জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক শক্তি ক্ষুণ্ণ। বরফগলা জলে পুষ্ট নদীগুলি বর্ষাকালে পাহাড়ী অঞ্চলে অতি বৃষ্টির ফলে বিপুল পরিমাণ জল বহন করতে পারে না—স্বাভাবিক গতির বাঁধনকে অস্বীকার করে তটের শাসনকে ভ্রুকুটি দেখিয়ে জনপদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে জীবন ও সম্পদকে গ্রাস করে। কৃষিক্ষেত্রের করে সর্বনাশ। অধিকাংশ নদী-খালগুলি বর্তমানে মজে গিয়েছে—বর্ষার সময় এই খালগুলিও নদীবাহিত জলভার বহনে অক্ষম। তাই প্রতি বৎসরই বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানুষ তার বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা আজ প্রকৃতিকে শাসন করছে। প্রকৃতি আজ মানুষের অনুগত ভৃত্য। নদী-শাসন করে সে নির্মাণ করছে বাঁধ ও জলাধার। বিভিন্ন নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে কৃষিলক্ষ্মীকে সম্পদশালিনী করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা প্রতিরোধ ত সম্ভব হয়-ইনি, পরিকল্পনাগত ত্রুটির জন্য বর্ষার সময় জলাধারগুলির বাড়তি জল ছেড়ে দিতে হচ্ছে এবং এই জলাধারের বাড়তি জল ও বৃষ্টির জলের যোগবন্ধন বন্যার সৃষ্টি করে জনজীবনে এক চরম ধ্বংসের পটভূমি রচনা করছে। তাছাড়া লোভী মানুষ নির্বিচারে বৃক্ষছেদন করে বন্যার ও নিয়মিত বৃষ্টির সম্ভাবনাকে দিনে দিনেই বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সামগ্রিক হিসাবে ভারতের জলভাণ্ডার পর্যাপ্ত হলেও খরা ভারতের আর একটি অভিশাপ। ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণে জলসম্পদ থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছরেই ভারতের কোন না কোন অঞ্চল খরার সম্মুখীন হয়। অনিয়মিত ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত এদেশে খরার মূল কারণ। বন্যা ও খরা ভারতের খাদ্যাভাবের অন্যতম প্রধান কারণ। মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালীপনা ভারতের বুকের এক স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন। আকাঙ্ক্ষিত সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না আবার কোন স্থানে সারাবছর যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তা হয়ে যায়। কৃষিনির্ভর ভারতে বৃষ্টিই চাষের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের প্রধানতম মাধ্যম। কিন্তু সারা বছরের বৃষ্টিপাত সমভাবে

বন্টিত হয় না বলেই খরার সৃষ্টি হয়। এই নিয়মিত খরা ও বন্যা ভারতের অগ্রগতির আশ্বাসকে প্রতি মুহূর্তে ব্যাহত করছে। বন্যা ও খরার তাণ্ডবে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, খরা ও বন্যাক্লিষ্ট জনসাধারণের প্রাণধারণের সামান্যতম ব্যবস্থা করছে, ব্যয় করা হচ্ছে প্রচুর, অর্থ উন্নয়নের কাজ এইভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এর ফলে মানুষ ও জীবজন্তুর দুর্দশার অন্ত থাকে না। বন্যার বিধ্বংসী আগমন জীবন ও সমাজকে গ্রাস করে, ফসলের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে। জীবজন্তু পশুপক্ষী কিছুই রেহাই পায় না। অনুরূপভাবে খরাও প্রকৃতি ও মানব-জীবনে যে মরু তৃষ্ণার সৃষ্টি করে তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। শ্যামল প্রান্তরে নেমে আসে মরুভূমির রুক্ষতা, পানীয় জলের অভাবে মানুষ প্রাণত্যাগ করে, অপেয় জল পান করে রোগ-ব্যাধির শিকার হয় এবং অকাল মৃত্যু ডেকে আনে।

স্বাধীন ভারতের খরা ও বন্যার হাত থেকে মুক্তির জন্য চিন্তাভাবনার অন্ত নাই। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীগর্ভ পলিমুক্ত করে নদীর জলবহনের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। নদী-খালগুলির সংস্কার সাধন করে সেগুলিকে বাড়তি নদীজল-বহনের দোসর করতে হবে। নদী-বাঁধগুলি ত্রুটিমুক্ত এবং মজবুত করতে হবে। বড় নদীর স্রোতধারাকে আশেপাশের ছোট নদীতে প্রবাহিত করতে পারলে বর্ষাকালে বন্যার আশঙ্কা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা। যে সব নদীতে প্রতি বৎসরই বন্যা হয় জলাধার নির্মাণ করে সেই জলধারাকে সঞ্চিত করলেও বন্যার ভয়াবহতা কম হবে। খরার প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের কৃষিযোগ্য জমিগুলিকে জলসেচ প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। নদীখাল খনন করে, বড় বড় নদীর জলাধার নির্মাণ করে, নদীর উদ্বৃত্ত জল সঞ্চিত করে, কূপ, নলকূপ, গভীর নলকূপ ও জলাশয় খনন করে ভারতের কৃষি ও জনসাধারণকে খরার সর্বনাশা প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে হবে। ভারতের ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারলে সমস্যার সমাধান সহজ হবে। অনাবৃষ্টির সময়ে সেচখাল ও নদীজলাধারগুলি থেকে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে কৃষির সর্বনাশ রোধ করা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে সরকার বহু প্রকল্প রূপায়িত করেছেন ও করছেন। স্বাধীন ভারতে ভাকরা নাঙ্গাল, চম্বল, তুঙ্গভদ্রা, হীরাকুঁদ, কুশী, দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, কৃষ্ণা, মহানদী প্রভৃতি নদীবাঁধ ও সেচ প্রকল্পগুলি সরকারী প্রচেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভারত স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিই তার সমৃদ্ধির বনিয়াদ। বন্যা ও খরার মত দুর্জয় প্রকৃতির অভিশাপের রুদ্ররোষে ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রতিপদে ব্যাহত হচ্ছে। তাই বন্যা ও খরার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে উপযুক্ত ও একটি মুক্ত পরিকল্পনা রচনা প্রয়োজন। পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণের মধ্যে দিয়েই ভারতের খরা ও বন্যার পুনরাবৃত্তি রোধ সম্ভব। অনাগত ভবিষ্যৎ তাহলে ফসলের ভারে সমৃদ্ধ হবে। জীবন ও সম্পদ অকাল বিনষ্টির হাত থেকে মুক্তি পাবে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি জগৎ সভায় ভারতকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করবে।

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

পরিবেশ সমস্যা ও জন-জীবন—পরিবেশ দূষণের কারণ—প্রতিকার—উপসংহার।

যে পারিপার্শ্বিক আমাদের দেহ মনকে প্রভাবিত করে তাকেই পরিবেশ বলে। জীবের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বহু অতিকায় প্রাণী প্রকৃতির বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের শক্তির অভাবে, অথচ পিপিলিকা প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী পরিবেশকে সহ্য করে টিকে আছে। সুতরাং জীবন ও পরিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

পরিবেশের উপাদানগুলি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত প্রাণময় বা সজীব উপাদান এবং প্রাণহীন বা জড় উপাদান। সূর্যালোক, তাপ বা উষ্ণতা, বাতাস, মাটি, জল প্রভৃতি পরিবেশের প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু বর্তমানে মানব-সভ্যতা যখন উন্নতির চরম শিখরে আসীন, তখনই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা আশঙ্কিত হয়ে আওয়াজ তুলেছেন—পরিবেশের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হচ্ছে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুকে জীবকুলের সুস্থ জীবন যাপনের আশা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে! পৃথিবীর পরিবেশ দিন-দিনই জীবনধারণের পক্ষে প্রতিকূল হচ্ছে—তাই সমূহ বিনষ্টির আশঙ্কায় বিজ্ঞানীগণও চিন্তিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব সমগ্র বিশ্বে এক নবদিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। বিজ্ঞানীদের অতন্দ্র সাধনায় নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মানবের জয়যাত্রা, মানব-সভ্যতা ধারণ করল নবকলেবর। জড় প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য স্থাপিত হল। যন্ত্রের প্রভাবে মানুষ আজ এমনই শক্তিধর যে নিজ মর্ত্যসীমাকে পর্যন্ত সে লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু এই যন্ত্রসর্বস্বতা মানুষকে সুখ ও আয়াসের স্বর্গরাজ্যের সন্ধান দিলেও মানব-সভ্যতা এক চরম জীবনসঙ্কটের সম্মুখীন—যন্ত্রদানবের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে মানব-জীবনের শ্যামল সুষমা বিবর্ণ ও পাণ্ডুর। মানুষের জীবন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যন্ত্রদানবের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও ব্যাপক প্রসার পৃথিবীর পরিবেশকে দূষিত করে সুস্থ জীবনধারণের অনুপযোগী করে তুলেছে। কলকারখানার বিষবাষ্পে আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন, কলকারখানার দূষিত জলে নদী-খাল-বিলের জল কলুষিত। এক কথায় যন্ত্রশক্তির ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশের প্রতিটি উপাদানকেই বিষদুষ্ট করে তুলেছে। তাই আজ জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন। যন্ত্রদানবের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বিশ্বের অতুলনীয় শিল্পকর্মগুলিও আজ মসীলিপ্ত। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা—অতিকায় যন্ত্রদানবের করালগ্রাস চিরবন্দিত শিল্পকর্মগুলির অন্তিম ঘনিয়ে আনছে। ভারতের তাজমহলের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা, অজন্তা-ইলোরার অনন্য গুহাচিত্রগুলিও এই বিষাক্ত পরিবেশের শিকার। হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন এই জাতীয় ললিত শিল্পসৃষ্টিগুলির কুৎসিত কঙ্কাল শুধু টিকে থাকবে। এই সব কারণে বিজ্ঞানী ও মানবকুল পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তিত।

পারমাণবিক গবেষণা যতক্ষণ শান্তি ও কল্যাণের কাজে ব্যবহৃত হয় ততক্ষণ তা মানব-জীবনের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু শক্তিধর মানুষ পরমাণু শক্তিকে সৃষ্টির

কাজে যেটুকু ব্যবহার করছে, তার চেয়ে বেশি প্রয়োগ করছে ধ্বংসের কাজে। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি অসীম শক্তিশালী পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে। নিজেদের শক্তি পরীক্ষার তাগিদে তাদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু এই পরীক্ষা বায়ুমণ্ডলকে এবং জীবন পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আজ যেমন মানুষের সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরূঢ়, তেমনি দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব। মানুষ আজ নানা অজানা রোগের শিকার, বিকলাঙ্গ ও মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত মানুষ আজ অসংখ্য। এমন কি মাতৃগর্ভের ভ্রূণও এই পরমাণু বিস্ফোরণের ফল ভোগ করছে।

প্রকৃতি আজ দূষিত বস্তুতে ছেয়ে গিয়েছে। মানুষ যত উন্নত হচ্ছে, তত পরিবেশ সচেতন হচ্ছে না। নগরের ও গ্রামের অধিবাসীদের গৃহসঞ্চিত আবর্জনা, কোন নির্দিষ্ট জায়গায় সঞ্চিত না হয়ে পথের ধারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পথচারী ও যানবাহনের পথচলার বিঘ্ন ঘটায়। স্তূপীকৃত আবর্জনায় মৃতজন্তুর দেহ পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়। সেই জঞ্জাল পর্বতপ্রমাণ হলেও পৌরকর্তাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। সেই জঞ্জাল ও পচাগলা জীবদেহ আকাশ-বাতাসকে বিষাক্ত করে। জীবনদায়িনী জলপ্রবাহে অজ্ঞ মানুষ নিক্ষেপ করে নানা আবর্জনা, নানারকমের অ্যাসিড এবং কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ। মাঠের শ্যামলিমাকে বিনষ্ট করে গড়ে ওঠে ইঁটের ভাঁটা, মাছের বদলে জলাশয়ে জমে ছাই ও আবর্জনা। যে গাছপালা ও বনসম্পদ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং পরিবেশ শোধনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে, লোভী মানুষ সেই বৃক্ষরাজির নিধন ঘটায় নির্বিচারে। মাটির উপরিভাগের উর্বর অংশ প্রতিদিনই মানুষের অজ্ঞতায় বিনষ্ট হচ্ছে। এই ভাবে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানই আজ কলুষিত।

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আজ সচেতন হবার সময় এসেছে। বিশ্বের মানুষ ৫ই জুনকে বিশ্বপরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করে। প্রাণী-জগৎ ও উদ্ভিদ্-জগৎকে সমূহ বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত করতে পারে। মানুষের নব-নব উন্মেষশালিনী সৃজনীশক্তি প্রতি মুহূর্তে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করছে অগ্রগতির তাগিদে। প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে বশে এনে তার দ্বারা বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করছে। প্রকৃতিকে স্বাভাবিক ও পবিত্র রাখতে গেলে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সভ্যতার অন্য নাম প্রগতি। প্রগতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে ভারসাম্য বিঘ্নিত হবেই। এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র সমাধান—প্রকৃতি ও প্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অস্তিত্ব রক্ষা এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার অবশ্যই প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্প পরিচালনা, জ্বালানির সতর্ক ব্যবহার এবং নাগরিকদের কয়েকটি মৌলিক নীতি পালনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ দূষণের মাত্রা ক্ষতিকারক সীমার নীচে রাখা সম্ভব। নইলে পৃথিবীতে এমন দিন আসবে যেদিন পৃথিবীর বুক থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ব্যাপক হারে ক্যানসার, ব্রঙ্কাইটিস ও অন্যান্য ফুসফুসের রোগের কারণ

পরিবেশ দূষণ। অত্যধিক পরিমাণে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার ও কৃত্রিম সারের প্রয়োগ পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। এগুলির পরিমিত ব্যবহার মানব তথা জীবকুলের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ও স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম পন্থা।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত পশ্চিমবঙ্গেও পরিবেশ দূষণ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার পরিবেশ সংক্রান্ত একটি নতুন দপ্তর স্থাপন করে এ ব্যাপারে একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। পরিবেশ দূষণ রোধের ব্যাপারে সরকার প্রচুর অর্থও মঞ্জুর করেছেন। পরিবেশ বিভাগ ইতিমধ্যে এ কাজে অগ্রসর হয়েছেন। কলকারখানা, মোটরগাড়ী এবং বিভিন্ন শিল্প থেকে নিঃসৃত গ্যাস ও ধোঁয়ার দিকে নজর রাখার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক ল্যাবরেটরি এবং দুর্গাপুরে একটি শাখা অফিস স্থাপন করা হয়েছে। কলকারখানার জঞ্জাল ও দূষিত জল নদীতে বিসর্জন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানা, দার্জিলিঙের পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্ক এবং লয়েড্‌স্ বটানিক ·ার্ডেনের পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব এই বিভাগের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এ ব্যাপারে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সরকার প্রচুর অর্থও মঞ্জুর করেছেন। শহর ও গ্রামাঞ্চলে উন্নত ধরণের শৌচাগার ও স্নানাগার স্থাপন করা হয়েছে।

কিন্তু শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টাতেই এই দুরূহ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জনসাধারণের সচেতনতা ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন পরিকল্পনাই সার্থক হতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন সমবেত প্রচেষ্টা। জীবের অস্তিত্ব রক্ষার তিনটি মূল উপাদান হল বাতাস, জল এবং মাটি। এগুলির বিশুদ্ধি রক্ষা ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগ ও জনগণের সচেতনতা প্রয়োজন। যানবাহন ও কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। কল্যাণমুখী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা বায়ুমণ্ডল শোধনের ব্যবস্থা হলে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাবে, 'কালের কপোলতলে' অনবদ্য শিল্প কর্মগুলি অক্ষয় স্থায়িত্ব-লাভ করবে। স্বাভাবিক জলের উৎসগুলির বিশুদ্ধতার দিকে প্রত্যেককেই নজর দিতে হবে। মাটির উপরিভাগের উর্বর অংশ খনি-খনন বালু সংগ্রহ এবং ইঁট তৈরীর জন্য মাটি আহরণের দ্বারা ধ্বংস হচ্ছে। মানুষ যদি সর্বগ্রাসী লোভ দমন করতে পারে তবে মাটি-মায়ের বুক ফসলের প্রাচুর্যে ভরে উঠবে, পৃথিবীর শস্যভাণ্ডার লক্ষীর অক্ষয় কৃপালাভ করবে।

আদি প্রাণ বৃক্ষ পরিবেশের একটি মূল্যবান সম্পদ। মানুষের লোলুপ ক্ষুধায় প্রতিনিয়তই বৃক্ষরাজি ধ্বংস হচ্ছে। নির্বিচারে বৃক্ষ ও বন-নিধন প্রকৃতির ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ করছে। একটি গাছ তার সমগ্র জীবনকালে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোধন করে এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে পরিবেশের সমতা রক্ষা করে, বৃক্ষনিধনে সেই সমতা বিঘ্নিত হয়। সুতরাং বন সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের দ্বারা পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে। এ ছাড়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণও পরিবেশ শুদ্ধিতার একটি প্রধানতম হাতিয়ার। উন্নত দেশগুলি অযথা অপচয় বন্ধ করে পরিবেশ শুদ্ধিতার কাজে সহায়তা করতে পারে।

কাজে যেটুকু ব্যবহার করছে, তার চেয়ে বেশি প্রয়োগ করছে ধ্বংসের কাজে। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি অসীম শক্তিশালী পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে। নিজেদের শক্তি পরীক্ষার তাগিদে তাদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু এই পরীক্ষা বায়ুমণ্ডলকে এবং জীবন পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আজ যেমন মানুষের সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরূঢ়, তেমনি দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব। মানুষ আজ নানা অজানা রোগের শিকার, বিকলাঙ্গ ও মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত মানুষ আজ অসংখ্য। এমন কি মাতৃগর্ভের ভ্রূণও এই পরমাণু বিস্ফোরণের ফল ভোগ করছে।

প্রকৃতি আজ দূষিত বস্তুতে ছেয়ে গিয়েছে। মানুষ যত উন্নত হচ্ছে, তত পরিবেশ সচেতন হচ্ছে না। নগরের ও গ্রামের অধিবাসীদের গৃহসঞ্চিত আবর্জনা, কোন নির্দিষ্ট জায়গায় সঞ্চিত না হয়ে পথের ধারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পথচারী ও যানবাহনের পথচলার বিঘ্ন ঘটায়। স্তূপীকৃত আবর্জনায় মৃতজন্তুর দেহ পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়। সেই জঞ্জাল পর্বতপ্রমাণ হলেও পৌরকর্তাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। সেই জঞ্জাল ও পচাগলা জীবদেহ আকাশ-বাতাসকে বিষাক্ত করে। জীবনদায়িনী জলপ্রবাহে অজ্ঞ মানুষ নিক্ষেপ করে নানা আবর্জনা, নানারকমের অ্যাসিড এবং কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ। মাঠের শ্যামলিমাকে বিনষ্ট করে গড়ে ওঠে ইঁটের ভাঁটা, মাছের বদলে জলাশয়ে জমে ছাই ও আবর্জনা। যে গাছপালা ও বনসম্পদ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং পরিবেশ শোধনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে, লোভী মানুষ সেই বৃক্ষরাজির নিধন ঘটায় নির্বিচারে। মাটির উপরিভাগের উর্বর অংশ প্রতিদিনই মানুষের অজ্ঞতায় বিনষ্ট হচ্ছে। এই ভাবে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানই আজ কলুষিত।

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আজ সচেতন হবার সময় এসেছে। বিশ্বের মানুষ ৫ই জুনকে বিশ্বপরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করে। প্রাণী-জগৎ ও উদ্ভিদ্-জগৎকে সমূহ বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত করতে পারে। মানুষের নব-নব উন্মেষশালিনী সৃজনীশক্তি প্রতি মুহূর্তে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করছে অগ্রগতির তাগিদে। প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে বশে এনে তার দ্বারা বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করছে। প্রকৃতিকে স্বাভাবিক ও পবিত্র রাখতে গেলে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সভ্যতার অন্য নাম প্রগতি। প্রগতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে ভারসাম্য বিঘ্নিত হবেই। এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র সমাধান—প্রকৃতি ও প্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অস্তিত্ব রক্ষা এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার অবশ্যই প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্প পরিচালনা, জ্বালানির সতর্ক ব্যবহার এবং নাগরিকদের কয়েকটি মৌলিক নীতি পালনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ দূষণের মাত্রা ক্ষতিকারক সীমার নীচে রাখা সম্ভব। নইলে পৃথিবীতে এমন দিন আসবে যেদিন পৃথিবীর বুক থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ব্যাপক হারে ক্যানসার, ব্রঙ্কাইটিস ও অন্যান্য ফুসফুসের রোগের কারণ

পরিবেশ দূষণ। অত্যধিক পরিমাণে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার ও কৃত্রিম সারের প্রয়োগ পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। এগুলির পরিমিত ব্যবহার মানব তথা জীবকুলের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ও স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম পন্থা।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত পশ্চিমবঙ্গেও পরিবেশ দূষণ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার পরিবেশ সংক্রান্ত একটি নতুন দপ্তর স্থাপন করে এ ব্যাপারে একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। পরিবেশ দূষণ রোধের ব্যাপারে সরকার প্রচুর অর্থও মঞ্জুর করেছেন। পরিবেশ বিভাগ ইতিমধ্যে এ কাজে অগ্রসর হয়েছেন। কলকারখানা, মোটরগাড়ী এবং বিভিন্ন শিল্প থেকে নিঃসৃত গ্যাস ও ধোঁয়ার দিকে নজর রাখার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক ল্যাবরেটরি এবং দুর্গাপুরে একটি শাখা অফিস স্থাপন করা হয়েছে। কলকারখানার জঞ্জাল ও দূষিত জল নদীতে বিসর্জন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানা, দার্জিলিঙের পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্ক এবং লয়েড্‌স্ বটানিক ·ার্ডেনের পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব এই বিভাগের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এ ব্যাপারে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সরকার প্রচুর অর্থও মঞ্জুর করেছেন। শহর ও গ্রামাঞ্চলে উন্নত ধরণের শৌচাগার ও স্নানাগার স্থাপন করা হয়েছে।

কিন্তু শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টাতেই এই দুরূহ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জনসাধারণের সচেতনতা ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন পরিকল্পনাই সার্থক হতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন সমবেত প্রচেষ্টা। জীবের অস্তিত্ব রক্ষার তিনটি মূল উপাদান হল বাতাস, জল এবং মাটি। এগুলির বিশুদ্ধি রক্ষা ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগ ও জনগণের সচেতনতা প্রয়োজন। যানবাহন ও কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। কল্যাণমুখী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা বায়ুমণ্ডল শোধনের ব্যবস্থা হলে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাবে, 'কালের কপোলতলে' অনবদ্য শিল্প কর্মগুলি অক্ষয় স্থায়িত্ব-লাভ করবে। স্বাভাবিক জলের উৎসগুলির বিশুদ্ধতার দিকে প্রত্যেককেই নজর দিতে হবে। মাটির উপরিভাগের উর্বর অংশ খনি-খনন বালু সংগ্রহ এবং ইঁট তৈরীর জন্য মাটি আহরণের দ্বারা ধ্বংস হচ্ছে। মানুষ যদি সর্বগ্রাসী লোভ দমন করতে পারে তবে মাটি-মায়ের বুক ফসলের প্রাচুর্যে ভরে উঠবে, পৃথিবীর শস্যভাণ্ডার লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপালাভ করবে।

আদি প্রাণ বৃক্ষ পরিবেশের একটি মূল্যবান সম্পদ। মানুষের লোলুপ ক্ষুধায় প্রতিনিয়তই বৃক্ষরাজি ধ্বংস হচ্ছে। নির্বিচারে বৃক্ষ ও বন-নিধন প্রকৃতির ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ করছে। একটি গাছ তার সমগ্র জীবনকালে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোধন করে এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে পরিবেশের সমতা রক্ষা করে, বৃক্ষনিধনে সেই সমতা বিঘ্নিত হয়। সুতরাং বন সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের দ্বারা পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে। এ ছাড়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণও পরিবেশ শুদ্ধিতার একটি প্রধানতম হাতিয়ার। উন্নত দেশগুলি অযথা অপচয় বন্ধ করে পরিবেশ শুদ্ধিতার কাজে সহায়তা করতে পারে।

কল্যাণমুখী কাজে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে হবে। পরম শক্তিধর পরমাণুশক্তি জনকল্যাণের কাজে ব্যবহৃত হলে জীবকুল ও প্রকৃতি ধ্বংসের আতঙ্ক থেকে রক্ষা পাবে। জঞ্জাল স্তূপ জনবসতির বাইরে সঞ্চিত করে পুনর্ব্যবহারের পথনির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। সুপরিকল্পিত উপায়ে এই জঞ্জাল স্তূপে ব্যাপক সব্‌জী উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। কলকাতার ধাপার মাঠ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া প্রচুর লোক এই আবর্জনা স্তূপ থেকে কয়লা, ছেঁড়া কাপড়, ডাবের খোলা, পলিথিন, কাগজ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ছোট বড় কলকারখানায় সরবরাহ করে। জঞ্জাল পুনর্ব্যবহারের সঠিক বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারলে পরিবেশ দূষণ সমস্যার সমাধান বহুলাংশে সম্ভব হবে। ময়লা জলে মাছ চাষ যে সম্ভব লবণ হ্রদ অঞ্চলের মেছো-ঘেরিগুলি তা প্রমাণ করেছে।

আজ মানুষের জীবন নানা সমস্যাভারে পীড়িত। শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বিজ্ঞানী, জনসাধারণ এবং সরকারকে সমভাবে উদ্যোগী হতে হবে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর পরিবেশ শোধনের কাজ ত্বরান্বিত হবে। দূষিত পরিবেশ জীবকুল তথা প্রকৃতিপুঞ্জের যে ক্ষতিসাধন করছে, কল্যাণকামী মানুষের শুভবুদ্ধিই সেই ক্ষতিরোধ করতে পারে। এর ফলে সুস্থ স্বাভাবিক, বিশুদ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হবে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিক সুস্থ প্রাণধারণের আশ্বাস লাভ করবে। জীবন এবং পৃথিবীর স্থায়িত্ব নিরাপদ হবে।

বিদ্যুৎ সঙ্কট

বিজ্ঞানের দান হিসাবে বিদ্যুতের পরিচয়—দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ—অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার—বিদ্যুৎ-বিভ্রাট—অস্বস্তি ও অসুবিধা—বিদ্যুৎ-সঙ্কটের কারণ ও প্রতিকার—উপসংহার।

আকাশের বিদ্যুৎ যেদিন মানুষের প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ হল, সেদিন সভ্যতা উন্নতির পথে এগিয়ে গেল বিস্ময়কর গতিতে। আদিম মানুষ চন্দ্র সূর্য, বৃষ্টিবন্যা বজ্রবিদ্যুৎকে অদৃশ্যদেবতার প্রতীক মনে করে পূজা নিবেদন করেছে। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানী অলৌকিক প্রতিভাবলে বিদ্যুতের দেবমহিমাকে চূর্ণ করে তাকে পরিণত করেছে বশংবদ দাসে।

আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত বিদ্যুতের অপার মহিমা। বর্তমান সভ্যতার একচ্ছত্র অধিপতি বিদ্যুৎ। আজ পৃথিবীতে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে, তার মূল কেন্দ্রবিন্দু বিদ্যুৎ। মানুষের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে বিদ্যুৎ। সন্ধ্যার অন্ধকার বিদ্যুৎ দূর করে। অসহ্য গরমে শীতল বাতাসের স্পর্শ দেয়। মানুষের যাতায়াত বিদ্যুতের দ্বারা ত্বরান্বিত হয়। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন রেডিও, টেলিভিশন কত সহজে নিকট করে। কল-কারখানার চাকা ঘুরিয়ে দ্রুত উৎপাদন দ্বারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হয় বিদ্যুতের সাহায্যে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও বিদ্যুতের

প্রধান ভূমিকা। এই জীবনের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়—শিক্ষা, জনসংযোগ, স্বাস্থ্য, আরামবিলাস, পরিবহণ, গৃহস্থালী—সব ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ মুখ্য নিয়ামক। বিদ্যুৎবিহীন সভ্যতা মানুষের কল্পনার বাইরে। বিদ্যুৎ ও বর্তমান সভ্যতা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

বর্তমান জগত গতিশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বিদ্যুৎ মানুষের নিত্যসহচর, সেই বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এখন নিত্যসঙ্কট। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও বিদ্যুৎ-সংকট আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত তীব্র বিদ্যুৎ সংকটের শিকার নয়। নানা সংকটের আবর্তে বিদ্যুতের সংকট একটি নতুন সংযোজন। চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের ঘাটতির ফলশ্রুতি লোডশেডিং। বর্তমানে এই লোডশেডিং মূর্তিমান অমঙ্গলের মত জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অন্ধকারময় করে তুলছে। কোনরকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই হঠাৎ নেমে আসা লোডশেডিং মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের গতিকে স্তব্ধ করে দেয়। কল-কারখানার চাকা ঘোরে না, ট্রেন, ট্রামের গতি স্তব্ধ হয়- ছাত্রের পড়াশুনা হয় ব্যাহত, অবসর বিনোদনের আনন্দঘন রোমাঞ্চ যেন হঠাৎ আঘাত-স্তম্ভিত, অনেকক্ষেত্রে ক্ষেত-খামারের কাজেও বিরতি। হাসপাতাল, ছাপাখানা, সংবাদপত্র সংস্থা, বেতারকেন্দ্র – সব জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানই লোড-শেডিংএর দাপটে ব্যতিব্যস্ত হয়। রাতে আলো ঝলমল শহরগুলিতে বিদ্যুৎ ছাটাই পথচারী মানুষ ও যানবাহনগুলোকে এক অসহনীয় সংকটের সম্মুখীন করে, নানা দুর্ঘটনা ঘটে জমাট অন্ধকারে। সমগ্র রাজ্য জুড়ে চলছে দিনে রাতে লোডশেডিং-এর তাণ্ডব।

এই লোডশেডিং-এর ব্যাপকতর ক্ষেত্রে নানা ক্ষতি হয়। উৎপাদন ব্যাহত হয়, শ্রমিক ছাটাই ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। অনেক সময় বহু কারখানা লক-আউট ঘোষিত হয়। সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প, আনন্দ ও জনসংযোগ—প্রতিক্ষেত্রে লোডশেডিং-এর করাল ছায়ার সঞ্চরণ।

এই সর্ব ব্যাপক বিদ্যুত সংকটের পিছনে বহু কারণ রয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদাও বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল, সাঁওতালদি, টিটাগর ও কোলাঘাট।

তাছাড়া কলকাতা মহানগরীর জন্য আছে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। এইগুলি সবই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গকে সচল ও আলোকিত রাখতে হলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা প্রয়োজন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ যোগাতে পারছে না। এর পেছনে বহু কারণ বর্তমান। বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতিগুলো উন্নতমানের নয়। যন্ত্রাংশে ও বয়লারে গোলযোগ লেগেই আছে—উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও মেরামতের অভাবে চালু যন্ত্রগুলিও অকেজো হয়ে যাচ্ছে। কোন একটি ইউনিট কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ অচল হয়ে পড়লেই দেশ জুড়ে নেমে আসে অন্ধকারের কালো যবনিকা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কয়লার ঘাটতিও

অনেক সময় বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণ। পশ্চিমবঙ্গে জলঢাকা ও ময়ূরাক্ষীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প চালু হয়েছে। এ-দুটির উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত, বর্ষা ও খরা এই দুটি প্রকল্পকে প্রভাবিত করে বাৎসরিক হিসাবে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সংকটের মূল আরও কতগুলি দুষ্টক্ষত বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে। কর্মীদের কর্মে অনীহা ও দক্ষতার অভাব, রাজনৈতিক দলাদলি, সর্বোপরি পরিচালকমণ্ডলীর অসহযোগিতা বিদ্যুৎ-সংকটকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে।

এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সরকার এবং জনসাধারণকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। দীর্ঘদিনের নানাবিধ ত্রুটির ফলশ্রুতি বর্তমান বিদ্যুৎসংকট।

জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যবস্থা হয় নি। তীব্রতর সংকট সমাধানের জন্য বিদ্যুৎ রেশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়নি। সমস্যা সমাধান করতে হলে প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা। তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্পের পাশাপাশি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করলে অবস্থার উন্নতি সম্ভব। তাছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদন-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কর্মীগোষ্ঠীর সহযোগিতা একান্ত দরকার। অকারণ ধর্মঘট ও কর্মীদের অসন্তোষের ফলে যাতে উৎপাদন বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যন্ত্রপাতির মেরামতি এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দিকেও নজর রাখতে হবে। বর্তমানে যে তীব্র বিদ্যুৎসংকট দেখা দিয়েছে তার সমাধান হয়তো দু'চার বছরে হবে না, তবুও নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ভবিষ্যতের কথা স্মরণ রেখে। সকলের পূর্ণ সহযোগিতা ও কর্মোদ্দীপনাই এই সংকট সমাধান করতে পারে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

নিরক্ষরতা বলতে কি বোঝায়—নিরক্ষরতার অভিশাপ—ভারতের নিরক্ষরতার চিত্র—ভারতে নিরক্ষরতার কারণ—নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়—উপসংহার।

অক্ষর বা বর্ণমালা সম্বন্ধে যাদের কোন জ্ঞান নাই, তাকেই নিরক্ষরতা বলে। ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ, ভারতের জনসংখ্যাও অগণিত, কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতে শতকরা ত্রিশজন মাত্র অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন। এর অর্থ এই নয় যে এরা শিক্ষিত, সমগ্র জনসংখ্যার এই ক্ষুদ্রতম অংশ নিজের মাতৃভাষায় শুধুমাত্র নাম সহি করতে পারে। কি ভয়াবহ চিত্র। একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এরচেয়ে দুঃখজনক ও লজ্জাকর পরিস্থিতি আর কি হতে পারে। স্বাধীনতার পর ছত্রিশ বছর পার হয়েছে। সংবিধানের পবিত্র ধারার অন্যতম প্রধান ধারায় আছে ১৪ বছর পর্যন্ত সর্বজনীন ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই লক্ষ্যমাত্রায় দেশ একধাপও অগ্রসর হয়নি। নিরক্ষরতা ভারতের একটি প্রধান

সামাজিক ব্যাধি ও পাপ। এই ব্যাধির জন্য জাতির অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত। নিরক্ষরতার অভিশাপ আজ জাতিকে পঙ্গু করে তুলেছে। নিরক্ষরতার অন্ধতামস জাতির ভাগ্যাকাশে জড়তার কালিমা লেপন করে দিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ১৮০১ সালে ডাক্তার হ্যামিল্টন বরিশালের বাখরগঞ্জ জেলায় জনগণনায় এই তথ্য পেশ করেন যে, তখন জেলার জনসংখ্যা ছিল ৯২৬৭৪৬। কিন্তু এই বিপুল জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও সমগ্র জেলাতে একটিও পাঠশালা ছিল না। হ্যামিল্টন সাহেবের এই চিত্র থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশে শিক্ষাগত পরিস্থিতির একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্র নিঃসন্দেহে লজ্জাজনক। কিন্তু আজ ভারত স্বাধীন, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও অবস্থার কোনই উন্নতি হয় নি। ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সর্বজনীন ভোটাধিকার জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, নিরক্ষর ভোটদাতা এখনও ব্যক্তির বদলে প্রতীকে ভোট দেয়, কারণ নিরক্ষরের পক্ষে প্রার্থীর নাম পড়া সম্ভব নয়। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক চিত্র আর কি হতে পারে ?

অদৃষ্টনির্ভর, দৈবনির্ভর জাতিকে রাহুমুক্ত করতে হলে জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তীর্ণ করতে হবে। এরজন্য চাই ব্যাপক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা। শিক্ষাই জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। অবশ্য শুধু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শিক্ষাকে সহজলভ্যও করতে হবে। দেশের অধিকাংশ অধিবাসী দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করে। দারিদ্র্য ও অনটন শিক্ষা গ্রহণের পথে একটি প্রধান বাধা। ভারত গ্রাম-প্রধান দেশ। গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় অধিকাংশই ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। যারা শহরে কলকারখানার কাজ করে তারাও চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ কোন মতে বাঁচিয়ে রাখে। এই সব পিতামাতার সন্তানেরা লেখাপড়া শেখার চেয়ে পিতামাতাকে ক্ষেতখামারে এবং কলকারখানায় সাহায্য করে সংসারের অন্ন সমস্যা লাঘবের চেষ্টা করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সময় কাটাতে হয় সেটা তাদের পক্ষে সময়ের অপব্যবহার। অর্থনৈতিক কারণে চাষী বা শ্রমিকের ঘরের ছেলেমেয়ে মাঠে কাজ করে অথবা চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করে অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা করে। এই সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য।

বর্তমানে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। কিন্তু শুধুমাত্র অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে পারবে না। চাষী ও শ্রমিকের চরম দারিদ্র্য কিছু পরিমাণ লাঘব করতে পারলে সমস্যার সমাধান কিছুটা সম্ভব। তাছাড়া গ্রামে গ্রামে নৈশ-বিদ্যালয় ও বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। কর্মের অবসরে বয়স্ক লোককে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করতে হবে। বিনা মূল্যে ছাত্রদের বই সরবরাহ করতে হবে। সর্বোপরি দেশের অগণিত জনসাধারণকে শিক্ষা সচেতন করে তুলতে হবে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ না থাকলে শিক্ষা গ্রহণের প্রেরণা কি ভাবে আসবে ?

স্বাধীন ভারতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কিছু পরিকল্পনা সরকারী উদ্যোগে গৃহীত

হয়েছে। World literacy programme অনুসারে কিছু লোককে সাক্ষর করা হয়েছে। বিশ্বের সব জায়গায় ৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব-সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি স্থাপিত হয়েছে এবং এই সমিতি পুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে। তবে শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগ ও আর্থিক দাক্ষিণ্য এই সমস্যা দূর করতে পারবে না। শিক্ষিত জনসাধারণ ও ছাত্রদের এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সরকার ও শিক্ষিত জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা নিরক্ষরতার যুগ যুগ সঞ্চিত অন্ধতামস দূরীভূত করে দেশকে আলোর পথে নিয়ে যাবে।

বনমহোৎসব

বৃক্ষের কাছে জীব-জগতের ঋণ—বর্তমান কালে বনভূমি ধ্বংসের আয়োজন—পরিবেশে এর কুফল—প্রতিকার—উপসংহার।

সূচনা

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হ'তে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ,
উর্ধ্ব শীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-প'রে; আনিলে
বেদনা নিঃসার নিষ্ঠুর মরুস্থলে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৃক্ষবন্দনা কবিতায় আদিপ্রাণ বৃক্ষের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। বিশ্বের প্রাণচেতনার প্রথম প্রকাশ বৃক্ষরাজির অভ্যন্তরে। প্রাচীন আর্য ঋষিরা অরণ্যের উদার বক্ষপটে মুক্তির সাধনা করতেন, ভূমার আস্বাদ লাভ করতেন বৃক্ষরাজির প্রশান্ত ছায়াঘন সান্নিধ্যে। বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমের তলায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন—তাঁর প্রচারিত পরমা মুক্তিতত্ত্বে বোধিবৃক্ষের অদৃশ্য প্রভাব। আরণ্যক ঋষি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বৃক্ষের অন্তরে উপলব্ধি করে ঘোষণা করেছিলেন, "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" তাঁরা শুনেছিলেন, 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।" তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'। প্রথম প্রৈতির বাধাবন্ধনহীন উন্মেষ বৃক্ষসমূহে ঘটেছিল বলেই বেদ-উপনিষদ্ যুগের ঋষিরা বৃক্ষবন্দনাকে ও দেববন্দনাকে সমমূল্য দিয়েছিলেন, অকুণ্ঠ ভক্তিযুক্ত প্রণাম নিবেদন করেছিলেন বৃক্ষের বেদীমূলে।

অতীতে অরণ্যসম্পদ ছিল দেশ ও জাতির প্রাণসম্পদ। অতীতে রাজাগণ পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করতেন, আবাসস্থলে নানাজাতীয় ফল ও ফুলের গাছ রোপণ করতেন এবং সেই বৃক্ষরাজির সযত্ন সংরক্ষণের দিকেও তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

আলোর প্রেমে মত্ত গাছগুলি যেন গৃহ-পরিবারেরই একটি অঙ্গ ছিল। তারা ছিল মানুষের প্রিয় সখা, আত্মার আত্মীয়।

বৃক্ষের নিকট জীবজগতের ঋণের অন্ত নাই। খাদ্য ব্যাপারে প্রাণী মাত্রেই উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলির সমতা রক্ষা করে। খাদ্যতৈরীর ব্যাপারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং বিশুদ্ধ অক্সিজেন বাতাসে যোগ করে পরিবেশ শুদ্ধিতায় সহায়তা করে। কলকারখানার দূষিত গ্যাস শোষণ এবং বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা সংগ্রহ করে জীবকুলের পরম উপকার করে। শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিকাগুলিকে আকড়ে ধরে রেখে ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং বন্যার আশঙ্কা দূর করে। অরণ্যরাজি মেঘ সৃষ্টি এবং বৃষ্টিপাতের সহায়ক। বৃক্ষের পাতা ও ডালপালা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে অন্যতম। প্রকৃতির কল্যাণময় রূপে বৃক্ষের সমারোহে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনেও বৃক্ষের ভূমিকা অতুলনীয়। বস্ত্র-শিল্প, কাগজ-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, ভেষজ ও রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি বৃক্ষনির্ভর। সিঙ্কোনা, সর্পগন্ধা, বেলেডোনা, পেনিসিলিয়াম প্রভৃতি উদ্ভিদ্ থেকে জীবনদায়ী ঔষধ প্রস্তুত হয়। নানারকম সুগন্ধি-দ্রব্যের আকর এই আদিপ্রাণ বৃক্ষ। একটি বৃক্ষ তার জীবনকালে যে পরিমাণ অক্সিজেন উৎপন্ন করে বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করে, ভূমিক্ষয় রোধ করে, বাতাসে যে পরিমাণ জলকণা যোগ করে, তা যদি লোকবলের সাহায্যে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা হত, তবে বহু টাকা ব্যয় হত। সুতরাং এককথায় বলা যায় জগতের প্রাণসমূহের কেন্দ্রবিন্দু, বৃক্ষ-জীবের জীবনধারণের প্রধানতম সহায়ক।

বর্তমানে পৃথিবী জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। এই জনতরঙ্গের সুষ্ঠ বসতির ব্যবস্থা হিসাবে নির্দয়ভাবে বনভূমি ধ্বংসের এক মারণযজ্ঞ শুরু হয়েছে। বন কেটে নতুন নতুন নগর স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। মানুষের লোভ মানুষকে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছে—তাই অরণ্যের নীরব ক্রন্দন উপেক্ষা করে জল্লাদ মানুষ বনভূমি নিধন করে কলকারখানা স্থাপন করছে, বণিকবুদ্ধির তাড়নায় দিশাহারা মানুষ অপরিণামদর্শিতার চরম পরিচয় দিচ্ছে বৃক্ষনিধনের মাধ্যমে। দরিদ্র জনসাধারণ নিজেদের প্রাত্যহিক জীবন যাপনের তাগিদে জ্বালানি হিসাবে নির্বিচারে বৃক্ষরাজিকে ব্যবহার করছে। বনভূমির সৌন্দর্যহানি ঘটিয়ে আসবাবপত্র তৈরী করে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। সরকারের সংরক্ষিত বনও এদের ক্ষুধিত দৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা পায় না। রাতের অন্ধকারে নির্লজ্জ বেপরোয়া তস্করের দল বৃক্ষছেদন করছে অর্থলালসায়। বনভূমি নিধনের ফলে যে সর্বনাশা বিনষ্টি মানবকুলকে গ্রাস করবে অদূর ভবিষ্যতে সেদিকে ক্ষুধিত লোভী মানুষের লক্ষ্য নাই। আপাতলাভের হাতছানি ভবিষ্যতের নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করছে। বৃক্ষবিনষ্টির দ্বারা যে বিপুল ক্ষতির দায়ভার ভবিষ্যৎ মানবকে বহন করতে হবে বর্তমানের মানুষ সে সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়। বৃক্ষনিধন দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদে আঘাত হানছে। ভারতের বনভূমিগুলিতে বহু মূল্যবান বৃক্ষ আছে। এইসব গাছের কাঠ সরকারী ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থের যোগান দেয়। তাই সরকারের সংরক্ষিত বনভূমিগুলি সতর্ক

প্রহরায় রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া বহু শিল্প বৃক্ষনির্ভর ; বৃক্ষনিধনে সেই সব শিল্পের পঙ্গু হয়ে যাবার সম্ভাবনা। শিল্পসমাজ বিনষ্ট হলে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বৃক্ষ-নিধনই বন্যা, অতিবৃষ্টি ও ভূমিক্ষয়ের কারণ। বর্তমানে ভারতের আবহাওয়ায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। কৃষিনির্ভর ভারত মৌসুমী বায়ুর দাক্ষিণ্যে পুষ্ট। কিন্তু সুষম ও সময়োচিত বারিপাতের অভাবে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি, বন্যা ও খরা যেন বর্তমান ভারতের ললাটলিপি। অতিরিক্ত এবং নির্বিচার অরণ্যনিধন ও বৃক্ষছেদন এর মূল কারণ। বৃক্ষছেদন পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। আজকের পৃথিবী-পরিবেশ কলুষিত, জীবের জীবন ধারণের অনুপযুক্ত। গাছ পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে। অক্সিজেন সরবরাহ করে, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ধূলিকণা শোধন করে জীবকুলের অশেষ উপকার সাধন করে। তাই পরিবেশকে সুস্থ ও বিশুদ্ধ রাখার জন্যও বৃক্ষনিধন বন্ধ হওয়া দরকার।

বনভূমির ও বৃক্ষরাজির যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে আজ সচেতন হবার দিন এসেছে। মানবের পরম বন্ধু বৃক্ষসম্পদ-রক্ষা আজ জাতির প্রধান প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। আজ পৃথিবীর মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় প্রকৃতিকে নিজের দাসে পরিণত করেছে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধের আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করে আজ মানবকুল চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। তাই বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষসংরক্ষণ আজকের দিনের একটি বহুল প্রচারিত ধ্বনি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনার মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব। সরকার এ ব্যাপারে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন। জনগণকে নতুন নতুন বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বনবিভাগ বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে শিশুচারা সরবরাহ করে জনগণকে সচেতন করছেন। গৃহসীমায় উন্মুক্ত প্রান্তরে, পথের ধারে বৃক্ষরোপণের জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে। অকারণ বৃক্ষ নিধনের বিরুদ্ধে সর্বদাই বাণী প্রচারিত হচ্ছে। 'গাছ লাগাও, বন বাঁচাও'—এই আজকের দেওয়াল লিখন হওয়া উচিত। অজ্ঞ মূর্খ অশিক্ষিত ভারতবাসীকে বৃক্ষ-সচেতন করার গণ-মাধ্যম হিসাবে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, ম্যাজিক-লণ্ঠন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় অরণ্য-সম্পদ রক্ষার কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করবে। জনগণকেও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। বৃক্ষরোপণ এবং বনমহোৎসবকে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা দিয়ে পালন করার দিন আজ এসেছে। গৃহে, বিদ্যালয়ে, সরকারী প্রতিষ্ঠানে, কলকারখানায় সুপরিকল্পিত-ভাবে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী গ্রহণ করে 'শ্যামলের সিংহাসন' পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তরুর মর্মরের সঙ্গে মানবমর্মের আত্মীয়তা স্থাপন করে বৃক্ষবন্দনার সঙ্গীতে দশদিক মুখরিত করতে হবে—

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও, শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে।
হে কোমল প্রাণ।"

বিশ্ব প্রতিবন্ধী-বর্ষ

[প্রতিবন্ধী বর্ষ—ঘোষণা ও তাৎপর্য ; প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা, সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ ; প্রতিবন্ধীদের সমস্যা ও সমাধান ; সমস্যার সমাধানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ ; প্রতিবন্ধীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দায়-দায়িত্ব ; উপসংহার ।]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দ বিশ্ব-প্রতিবন্ধী-বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বপ্রতিবন্ধী-বর্ষ পালনের লক্ষ্য হলো, প্রতিবন্ধীজনের শিক্ষা, নিয়োগ, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অধিকার-প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা, এবং প্রতিবন্ধের যথাসম্ভব প্রতিরোধ ও প্রতিকার। অর্থাৎ, শারীরিক পঙ্গুতা বা মানসিক বৈকল্যের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তাঁরা যাতে সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, সেইটিই হবে জাতিপুঞ্জ-ঘোষিত পাঁচ দফা নীতির মূল লক্ষ্য।

শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে যাঁর কোনো প্রতিবন্ধ বা বাধা আছে, সাধারণ-ভাবে তিনিই প্রতিবন্ধী। দৃষ্টিহীন-মূক-বধিরেরা শারীরিক প্রতিবন্ধী, আর জড়বুদ্ধি মানুষেরা মানসিক প্রতিবন্ধী। মেরুদণ্ড, অস্থি, অস্থিগ্রন্থী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসুবিধা-গ্রস্ত ব্যক্তিরা দৈহিক প্রতিবন্ধী। আর, বোধ-শক্তির অভাব বা স্বল্পতা-জনিত অসুবিধা যাঁদের, তাঁরাই মানসিক প্রতিবন্ধী। সারা বিশ্বের প্রতিবন্ধী-জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দৃষ্টিহীনদের। বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার (W. H. O.) এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, বিশ্বের সর্বমোট প্রতিবন্ধী-সংখ্যা ৪০ থেকে ৪৫ কোটি। অবশ্য, সাধারণভাবে প্রতিবন্ধী বলে গণ্য হন না, এমন সাধারণ প্রতিবন্ধযুক্ত ব্যক্তিরাও এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। বিশ্বের দৃষ্টিহীন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১½ কোটি। যথাযথ প্রতিকার অসম্ভব হলে বর্তমান শতকের শেষে এ-সংখ্যা ৩ কোটিতে বর্ধিত হতে পারে, এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ভারতের অংশ-ই সর্বাধিক—প্রায় ৯০ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা ৮০-৮৫ হাজার। দৃষ্টিহীনদের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগই আবার গ্রামবাসী।

প্রতিবন্ধীদের সমস্যা প্রধানতঃ চার শ্রেণীর—কাজকর্ম করার অসুবিধা, চলাচলের সমস্যা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ-জনিত সমস্যা এবং জীবিকা-অর্জনের সমস্যা।

এইসব সমস্যার প্রতিকার করতে জাতিপুঞ্জের আহ্বানে দেশে দেশে যে সাড়া জেগেছে, তা আনন্দের কথা। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকার এ ব্যাপারে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক যন্ত্রাদি বিনামূল্যে বা অর্ধমূল্যে এঁদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আনুষঙ্গিক অর্থব্যয়ের দায়িত্ব-ও সরকার গ্রহণ করছেন। সরকারী চাকুরীর দুই শতাংশ সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি প্রতিবন্ধীকে স্বাবলম্বী করে তোলার অনুকূলে বার্ষিক অনুদান দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কর্ম-বিনিময় দপ্তরে [Employment Exchange] প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক্ বিভাগ খোলা হয়েছে। সমাজকল্যাণ-বিভাগ কলকাতার উপকণ্ঠে পাতিপুকুরে একটি

প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র খুলেছেন। যেসব প্রতিবন্ধী তেমন মেধাবী নয়, বিশেষ করে যারা মানসিক প্রতিবন্ধী, তাদের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব হলো প্রতিবন্ধীর প্রয়োজন এবং ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাদান, পৃথক্ পদ্ধতির বিদ্যালয়-স্থাপন, এবং বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-নিয়োগ। বয়স্ক এবং কর্মে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য 'হোম'-এর ব্যবস্থা করার কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। সেলাই, ছাপাখানা, বই-বাঁধানো প্রভৃতি কুটির-শিল্প-জাতীয় গঠনমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেবার পরিকল্পনাও ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া, গত চার বছরে ১৩২২ জন প্রতিবন্ধীকে সাত লক্ষাধিক টাকার কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিতরণ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে।

বেসরকারী উদ্যোগও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, বলা যায়। ইউ. এন্. ও., আই. এল্. ও., কলকাতার ডেফ্ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল, বেহালার ব্লাইণ্ড স্কুল, মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য অলকেন্দু বোধ-নিকেতন, বোধিপীঠ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন এবং মাদার টেরেসার মিশনারিস্ অব্ দ্য চ্যারিটি—প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আর্তসেবা প্রতিবন্ধী-সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রয়াসে উৎসর্গিত। এছাড়া, টালিগঞ্জের লাইট্ হাউস্ ফর্ দ্য ব্লাইণ্ড (১৯৪১) এবং মাঝের হাটের রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডিয়া (১৯৬৮)—এ দুটি প্রতিষ্ঠানের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত, আরো উল্লেখযোগ্য এই, এ দুটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা প্রতিবন্ধী দুই ব্যক্তি। প্রতিবন্ধী সমস্যার প্রতিকারে বিজ্ঞানও উদাসীন থাকে নি। প্রযুক্তিবিদ্যা এগিয়ে এসেছে এঁদের সাহায্য করতে। হস্তচালনা-যোগ্য সাইকেল রিক্সা, দৃষ্টি-সহায়ক যন্ত্র, শ্রুতি-সহায়ক যন্ত্র এর দৃষ্টান্ত। সেদিন প্রায় আসন্ন, যখন মাইক্রো-প্রসেসর-এর সাহায্যে বিভিন্ন স্নায়ুতে সূক্ষ্মতর 'ইলেক্ট্রোড্' লাগিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংবেদন সংযুক্ত করে দেওয়া যাবে। এর ফলে, প্রতিবন্ধী বক্তির চেতনায় বস্তু-ধারণাকে পৌঁছে দেওয়া অনেকখানি সম্ভব হবে।

সমাজের সুস্থদেহী মানুষ সাধারণভাবে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা এবং তার প্রতিকার বিষয়ে উদাসীন থাকেন। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিবন্ধীরা কোনো ভিন্ন সমাজের মানুষ নন, তাঁরা আমাদেরই ঘরের সন্তান, আমাদেরই ভাই-বোন। এমন কি আকস্মিক অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সুস্থদেহীর জীবনেও প্রতিবন্ধের অভিশাপ এনে দিতে পারে। প্রতিবন্ধী-বর্ষ পালনের মধ্য দিয়ে এঁদের সম্পর্কে সুস্থদেহী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটুক এটাই কাম্য।

দেশ-বিদেশের বহু প্রতিবন্ধী-ই প্রমাণ করেছেন যে, দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধ কোনো অনতিক্রম্য বাধা নয়। মনোবল, অধ্যবসায় এবং সমাজের সহযোগিতা পেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেন। আমাদের কর্তব্য, অনুকম্পা দিয়ে নয়—সেবা এবং প্রীতি দিয়ে প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ হওয়া। বিশ্ব-প্রতিবন্ধী-বর্ষ-পালনের সামাজিক এবং নৈতিক সার্থকতা সেইখানেই।

মাদার টেরেসা

'আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন-সাধনা,
জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই বাণীতে মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শের যে পরিচয় উচ্চারিত হয়েছিলো, ভারতের বুকে আমরা সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি বারে বারে, মহৎ প্রাণকে উজ্জীবিত হতে দেখেছি আর্ত মানুষের সেবায়। দেখেছি ঈশ্বরচন্দ্রকে, বিবেকানন্দকে, ভগিনী নিবেদিতাকে। তেমনই এক মহৎ ব্যক্তিত্বকে আজো আমরা প্রত্যক্ষ করছি একজন নারীর মধ্যে, যিনি পৈতৃক পরিচয়ে বিদেশিনী হলেও তাঁর সমগ্র সত্তা উৎসর্গিত হয়েছে মুখ্যতঃ আমাদের দেশের অসহায় অবহেলিত মুমূর্ষু মানুষের সেবায়। তাঁর নাম মাদার টেরেসা—'মাদার' সন্ন্যাসিনীর উপাধিমাত্র নয়, স্নেহে, সেবায়, যত্নে, করুণায় তিনি যথার্থ-ই মা।

সূচনা

১৯১০ সালের ২৭শে আগস্ট যুগস্লাভিয়ার স্কোপ্‌জে অঞ্চলের একটি কৃষকের কুটির আলোকিত করেছিলেন যে নবজাতক, তিনিই আজকের লোকমাতা—মাদার টেরেসা। পিতামাতা দু'জনেই আলবেনিয়ান। তাই, মাদারও জন্মসূত্রে যুগস্লাভ হলেও জাতিতে আলবেনিয়ান-ই। পাঁচ জনের ছোট পরিবার—মা, বাবা, ভাই, দুটি বোন। টেরেসার বাল্যনাম অ্যাগ্‌নেস্‌। বাল্যের পাঠচর্চা শুরু হল মিশনারী বিদ্যালয়ের বদলে একটি সরকারী বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের পাশে ছিল একটি ধর্মীয় সংগঠন। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ অ্যাগ্‌নেস্‌ আকর্ষণ বোধ করলেন ধর্মযাজকদের আদর্শে। বয়ঃসন্ধির মুহূর্তে বাস্তব সংসারের সঙ্গে আদর্শের সংঘাত বাঁধলো তাঁর হৃদয়ে। একদিকে বাবা-মা ভাই-বোনের স্নেহ-মমত্ব-শান্তি-ভরা সুন্দর সংসার, অন্যদিকে সুদূর এবং বিশাল বিশ্বের দুঃখ-দারিদ্র্য-যন্ত্রণায় ভরা লক্ষকোটি আর্ত মানুষের আর্তনাদের অশ্রুতধ্বনি—এ দুয়ের মধ্যে তীব্র সংঘাত। একদিকে একান্ত নিজের ব্যক্তিগত সুখ, অন্যদিকে বিশ্বের দুঃখী মানুষের জন্য নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া—এর কোন্‌টি তিনি বেছে নেবেন পরবর্তী জীবনের আশ্রয় হিসেবে? এ প্রশ্নের উত্তর এলো তাঁর হৃদয়ে, দ্বিধার মেঘ কেটে গিয়ে তাঁর চিত্ত নির্মল হলো—সুখের ছোট ঘরখানি ছেড়ে দুঃখের বিশাল বিশ্বকেই গ্রহণ করলেন তিনি।

জীবনঃ জন্ম
পিতৃ-পরিচয়, শৈশব

যুগস্লাভিয়ার সন্ন্যাসী-সংঘের প্রথম দলটি কলকাতায় এলো ১৯২৫ সালে। তাদেরই একজন কালিম্পং থেকে যুগস্লাভ জেসুইট্‌দের জানালেন, মানবসেবার বিস্তীর্ণ অবকাশ এবং অফুরন্ত আবশ্যকতা রয়েছে ভারতবর্ষে। এর জন্য প্রয়োজন বেশীসংখ্যক সন্ন্যাসীর। অ্যাগ্‌নেসের কানে যথাসময়ে এলো সেই সংবাদ। সংকল্প ঘোষণায় তাঁর কণ্ঠে আর দ্বিধা নেই। আর্তজনের সেবায় পার্থিব প্রাণকে নিবেদন করার এ মহৎ সুযোগ তিনি কিছুতেই হারাবেন না। সূচিত হল অ্যাগ্‌নেসের জীবনে মানব-ব্রতের এক দুশ্চর তপস্যার অধ্যায়।

মানব-সেবার আহ্বান :
সন্ন্যাস-গ্রহণ

১৯২৮ সালে যুগস্লাভ জেসুইট্-সংঘ আঠারো বছর বয়সের তরুণীকে আয়ারল্যাণ্ডের সন্ন্যাসিনীদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন—অ্যাগ্‌নেস্‌ চলে এলেন লরেটো

অ্যাবিতে। কলকাতা এসে ভারতের দুঃখ-পীড়িত মানুষের পাশে নিজের যথার্থ স্থানটি বেছে নিয়েছিলেন। কেননা, আয়ারল্যাণ্ডের ঐ প্রতিষ্ঠানটিই ছিলো কলকাতার ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের পরিচালক। ১৯২৯-এ অ্যাগ্‌নেস কলকাতা এলেন। প্রথমে তাঁর ভূমিকা নির্দিষ্ট হলো শিক্ষয়িত্রীর পদে। তিনি হলেন সেণ্ট মার্গারেট স্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা, তারপর তাঁর ওপর এলো বাঙালী ছাত্রী-বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব। ক্রমে সেখানকার অধ্যক্ষার পদ এবং অবশেষে 'ডটারস্ অফ সেণ্ট অ্যান্'-এর পরিচালনার ভার। তাঁর তাপসী-জীবনের সাত বছর কাটলো। যে আদর্শের আহ্বান তাঁকে গৃহছাড়া করেছিলো, জীবনের মধ্যে—কর্মের মধ্যে তাঁকে যেন পুরোপুরি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই, তাঁর মনে এলো পুরানো প্রশ্ন নতুন রূপে—আর্ত মানুষের অসহ্য যন্ত্রণা-ব্যথা-বেদনার শরীক না হয়ে, সেই দুঃখকে প্রশমিত করার কাজে আত্মনিয়োগ না করে একটি সংকীর্ণ বিদ্যালয়ের ছক-বাঁধা বিদ্যাচর্চার মধ্যে নিজেকে সংকুচিত করে রাখাই কি জীবনের পরম লক্ষ্য ? অবশ্যই নয়। ১৯৪৬ সালের ১০-ই সেপ্টেম্বর পূজোর ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়ার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় কলকাতাব ক্ষুধার্ত বস্তিবাসীর করুণ ক্রন্দনের মধ্যে যেন তিনি শুনতে পেলেন পরম পিতার বাণী—'clothe the naked christ, shelter the homeless christ,' হৃদয়ে যে প্রশ্ন জেগেছিল, হৃদয়ের মধ্যেই তার উত্তর মিলেছে। যুগস্লাভিয়ার অ্যালবেনিয়ান কৃষক-কন্যা ভারত তথা বিশ্বের স্নেহময়ী জননী-পদে অভিষিক্তা হলেন।

এরপর শুরু হ'লো তাঁর জীবনের উজ্জল অধ্যায়—নীলপাড়-যুক্ত সাদা স্থূতী শাড়ী-পরিহিতা বিশ্বজননী মাদার টেরেসার বিশ্বজয়ের গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৪৮ সালে তিনি হলেন ভারতীয় নাগরিক। স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেলেন মিশনের বাইরে থেকে কলকাতায় বস্তিবাসীদের সেবা করার। ঐ সালের ১৮ই আগস্ট থেকে শুরু হলো তাঁর আর্ত-সেবা। পাটনা থেকে নার্সিং শিখে এলেন। কলকাতার পথ থেকে তুলে-আনা মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে হাসপাতালে ভরতি করলেন, হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে-দেওয়া রোগীকে তিনি আশ্রয় দিলেন। শেষ পর্যন্ত মিশন ছেড়ে ক্রীক লেনের গোমেশ পরিবারের একটি ফ্ল্যাটে তিনি উঠে এলেন মুমূর্ষু রোগীকে আশ্রয় দিতে এবং সেবা করতে। এমনি করে একটি সেবা-প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলো। ১৯৫৪ সালে কালিঘাটের কালীমন্দিরের পাশে স্থাপিত হলো মুমূর্ষুদের শেষ শান্তির আশ্রয়—'নির্মল হৃদয়'। পথের ধূলোয় যে মৃত্যু হতো অবহেলিত, 'নির্মল হৃদয়ে' এসে তা হলো শ্রদ্ধেয়। অনিবার্য মৃত্যুও যথাসাধ্য সুন্দর হলো, প্রশান্ত হলো। কেউ কেউ আবার মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এলো জীবনের আলোয়, জননীর স্নেহস্পর্শের গুণে। প্রায় অর্ধ লক্ষ মানুষ এযাবৎ করুণাঘন মায়ের পুণ্য স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছে—ধন্য হয়েছে তাদের জীবনের অন্তিম পর্ব।

মানব-সেবায় আত্মনিয়োগ : ভারতে

১৯৫০ সালে গড়ে উঠলো 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'। এলো রোমের মহামান্য-পোপের সানন্দ স্বীকৃতি। ক্রমে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হলো এর বহু-সংখ্যক শাখা-

প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৫ সাল থেকে সেগুলো পেলো পোপের অনুমোদন। অনাথ শিশুদের জন্য স্থাপিত হলো "নির্মল শিশু ভবন।' ভারতের ৩৫টি শহরে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়লো মাদারের প্রতিষ্ঠানগুলি। ভারতে তাঁর পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬০, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭৫০০, দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র ২১৩টি, রোগীর সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ ৬০ হাজার, কুষ্ঠ চিকিৎসা-কেন্দ্র ৫৭টি, চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৭ হাজার। আর, 'নির্মল শিশু-ভবনে' লালিত বর্ধিত শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। এক বিরাট সেবিকা-বাহিনী এবং কর্মিগণ মানবসেবার এই মহৎ কর্মযজ্ঞে আজ নিবেদিত-প্রাণ।

মাদার টেরেসার কর্মকেন্দ্র কলকাতা। আর, কর্মবৃত্ত সমগ্র পৃথিবী। নিউইয়র্ক থেকে অস্ট্রেলিয়ার পল্লী পর্যন্ত তার বিস্তার। পৃথিবীর যেখানেই অসহায় আর্ত মানুষের ক্রন্দন-ধ্বনির উচ্চারণ, সেখানেই মাদার টেরেসার স্নিগ্ধ করস্পর্শের শীতল সান্ত্বনা। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯—এই স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর কর্মধারা প্রবাহিত হয়েছে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, জর্ডন, তানজানিয়া, কলম্বো, ভেনেজুয়েলার আর্ত মানুষের কুটিরে কুটিরে। ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে 'মিশনারী ব্রাদার্স্ অফ্ চ্যারিটি'—পুরুষদের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে কর্মভার। দেশে-বিদেশে গড়ে উঠেছে অজস্র 'নির্মল হৃদয়' আর 'নির্মল শিশু-ভবনের' অনুরূপ প্রতিষ্ঠান।

মানবসেবায় আত্মনিয়োগ : ভারতের বাইরে

মানবসেবা-ব্রতের এই মহত্তম দৃষ্টান্তের কাছে সম্ভবতঃ কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি-ই যথেষ্ট নয়। তবু দেখি, বিশ্বের নানা দেশ থেকে একের পর এক সম্মান আর স্বীকৃতি এসেছে মাদারের কাছে। ১৯৬৫ সালে ভারত-সরকারের দেওয়া 'পদ্মশ্রী', আর 'ইন্টারন্যাশনাল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং'-এর জন্য 'ম্যাগাসেস্' পুরস্কার, ১৯৭৩-এ 'পোপ জন ২৩ শান্তিপুরস্কার', আমেরিকার 'গুড সামারিটান পুরস্কার', 'জন কেনেডি আন্তর্জাতিক পুরস্কার', ওয়াশিংটনের 'Doctor of Human Letters' ডিগ্রী; ১৯৭২-এ পেলেন ভারতের 'নেহেরু পুরস্কার' ১৯৭৩ সালে পেলেন 'প্রোগ্রেস ইন রেলিজিয়নের' জন্য 'টেম্পলিয়ন' পুরস্কার। তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হল 'টেম্পলটন ফাউণ্ডেশন প্রাইজ ফর ইন্টারন্যাশনাল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং'; ১৯৭৪-এ পেলেন 'মাস্টার অফ্ ম্যাজিস্ট্রা', 'থার্ড অর্ডার অফ্ সেন্ট ফ্রান্সিস অফ্ আসাই' পুরস্কার; ১৯৭৯ সালের ১৭ই অক্টোবর—শান্তির জন্য 'নোবেল পুরস্কার'। আর ১৯৮০ সালে প্রদত্ত হলো ভারত-সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'ভারত-রত্ন'।

সেবার স্বীকৃতি

রত্ন তিনি বিশ্বের হলেও মুখ্যতঃ ভারতেরই। কারণ, ভারতেই তাঁর মূল কর্মস্থল, ভারতেরই তিনি নাগরিক। তাই, তাঁর সেবাধর্ম এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর স্বীকৃতি প্রতিটি ভারতবাসীর পক্ষেই গর্বের। জন্মসূত্রে বিদেশিনী হলেও কর্মসূত্রে তিনি ভারতীয় আমাদেরই প্রতিবেশী, আমাদের পরম আত্মীয়—পরম গৌরব। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী'র নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের মাঝখানে মাদার টেরেসার এই অক্লান্ত সেবাধর্ম, মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ—জমাট অমাবস্যার মধ্যে একটি উজ্জ্বল অনির্বাণ দীপশিখার মতো জ্বলতে থাক্—হিংসার তমসা থেকে আমাদের প্রেমে জ্যোতির্লোকে উন্নীত করুক।

লোক-গণনা ও ভারতবর্ষ

[ভূমিকা—'লোক-গণনা' এবং এর প্রচলিত প্রতিশব্দের তাৎপর্য ; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—দেশে-বিদেশে ; লক্ষ্য—প্রাচীন ও আধুনিক, দেশে ও বিদেশে ; দায়িত্ব ও সতর্কতা ; পদ্ধতি—প্রাচীন ও আধুনিক ; নির্ভুল তথ্য-সংগ্রহের অপরিহার্যতা—ভুল তথ্য-পরিবেশনের বিপদ—উপসংহার ।]

'লোক-গণনা' কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে দুটি শব্দ আমাদের দেশে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে প্রচলিত—ইংরেজী 'সেন্সাস্' আর উর্দু 'আদমসুমারী'। 'সেন্সাস্' শব্দটির অর্থ—দেশের জনসংখ্যা এবং সম্পদ-নিরূপণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া। আর, 'আদম' অর্থ 'মানুষ' এবং 'সুমার' অর্থ 'গণনা করা'—অতএব, 'আদমসুমারী' শব্দের অর্থ লোক-গণনা।

কোন্ দেশে এবং কোন্ কালে প্রথম এই লোক-গণনার তত্ত্বটি প্রশাসন-কর্তৃপক্ষের মাথায় আসে, সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট তথ্য আমাদের জানা নেই। কারো কারো বিশ্বাস, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম উইলিয়ম 'ডুম্‌স্-ডে-বুক'-এ সমকালীন ইংলণ্ডীয় জীবনের যেসব তথ্য সংকলন করেছিলেন, সেইটিই লোক-গণনার প্রথম প্রচেষ্টা। যতদূর জানা যায়, ব্যাবিলন মিশর প্রভৃতি দেশে এ-প্রথার প্রচলন হয়েছিলো খ্রীস্ট-জন্মের বহু বছর আগে। বাইবেলে এ-প্রসঙ্গের একাধিক উল্লেখ আছে। 'নিউ টেস্টামেন্টে' রোম-সম্রাট সিজার অগস্টাসের সময়কার লোক-গণনার তথ্যটি রয়েছে। আধুনিক কালে ১৮শ শতকে এই ব্যবস্থার সূচনা হয় স্পেন সুইডেন জার্মানী প্রভৃতি দেশে।

ভারতবর্ষে লোক-গণনার প্রচলনও যথেষ্ট প্রাচীন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে এ উদ্যোগ যে গৃহীত হয়েছিলো, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তার উল্লেখ রয়েছে। তারপর মুঘল যুগেও যে জন-গণনা হয়েছিলো, আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-র সাক্ষ্যই তার প্রমাণ। ইংরেজ-শাসনের গোড়ার দিকে লোক-গণনা স্থগিত ছিলো। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে এর সূচনা করলো ইংরেজ-সরকার। তারপর, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত—গত একশ' বছর ধরে এ কর্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রতি দশ বছর অন্তর হয়ে আসছে। ব্রিটিশ-রাজত্বে ৭-বার এবং স্বাধীন ভারতে ৪-বার, মোট ১১-বার জন-গণনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই শতবর্ষে। স্বাধীন ভারতে প্রথম লোক-গণনা হয় ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে।

সাধারণভাবে মনে হয়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিষয়ে আমাদের মধ্যে যে কৌতূহল জাগ্রত আছে, তা নিবৃত্ত করাই লোক-গণনার একতম উদ্দেশ্য। কিন্তু, নিছক কৌতূহল-নিবৃত্তি আমাদের মতো দরিদ্র দেশে এতো বড়ো ব্যয়বহুল কর্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। কালের পরিবর্তনে এর লক্ষ্যেরও পরিবর্তন হয়েছে, সন্দেহ নেই। কেননা, জনজীবনের পক্ষে এই কর্মকাণ্ডের আবশ্যকতার পরিবর্তন ক্রমশঃই ঘটছে। প্রাচীন মিশরে ব্যাবিলনে জন-গণনার মূল উদ্দেশ্য ছিলো যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর হার, গৃহ-সংখ্যা, বৃত্তির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ এবং রাজস্ব-নির্ধারণ। অর্থাৎ, মূলতঃ প্রশাসনিক উদ্দেশ্যই এর পশ্চাতে

সক্রিয় ছিলো। ইংরেজ-রাজত্বে ভারতের লোক-গণনা হতো আপাতদৃষ্টিতে প্রশাসনিক প্রয়োজনে, কিন্তু পরোক্ষে তার লক্ষ্য ছিলো মারাত্মক। এ দেশের সম্পদের সন্ধান ও শোষণ এবং নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার অসৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে অনেক সময় লোক-গণনা করা হতো। কিন্তু, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে দেশের অর্থনীতির সর্বস্তরের উন্নতিসাধন এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-রচনাই এর বড়ো উদ্দেশ্য। সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব। দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা বন্যার মতো দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ এবং তদনুগ ব্যবস্থা নেবার জন্য জনসংখ্যা সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রশাসন-কর্তৃপক্ষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এছাড়া, দেশের সার্বিক উন্নতির প্রয়োজনে, যেমন, বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঠিক তথ্যগুলো জানা আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক অতীতের জীবন-ধারা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। ভবিষ্যতের কল্যাণমুখী পথের রেখাঙ্কন অতীত আর বর্তমানের অভিজ্ঞতার ওপরই সম্ভব। আর, ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে জনজীবন সম্পর্কে তথ্যাবলীর প্রস্তুতি তো অপরিহার্য।

উদ্দেশ্যের ভিন্নতার জন্য বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন কালে লোক-গণনার পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। 'ডুমস্-ডে-বুক'-এর পদ্ধতি একটি বিশেষ কালে ইংলণ্ডের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হলেও অন্য দেশে অন্য কালে তা আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হতে পারে না। আবার, একই ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিলো, বর্তমান ভারতে তা অচল। কারণ, জাতীয় উন্নয়নের কোনো মহৎ লক্ষ্য প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের পদ্ধতিতে ছিলো না। মূলতঃ সমাজ-জীবন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দেশগত এবং কালগত বৈষম্য-ই পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রচনাই যেহেতু ভারতের বর্তমান সমাজ-জীবনের মূল কথা, সেই কারণে এমন তথ্যই সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যার ভিত্তিতে কোন্ অঞ্চলে কী ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তা আগে থেকেই বোঝা সম্ভব। সেই অনুসারে সংগ্রাহ্য তথ্যগুলো মোটামুটি এই ধরণের—নাগরিকের বয়স, কর্মী বা অকর্মী, বিবাহিত বা অবিবাহিত, সন্তান-সংখ্যা, গৃহ এবং কক্ষ-সংখ্যা, সেচ-জমি, অরণ্য, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, নলকূপ—ইত্যাদি জাতীয় তথ্য। সেইসঙ্গে, জনগণের শিক্ষা, বৃত্তি, আয়, ভাষা, ধর্ম, খাদ্য, সম্পত্তি, জমির পরিমাণ, ভূমি, বৃষ্টিপাত, বসতির ঘনত্ব, গ্রাম ও শহরের সংখ্যা, স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা, নৃতাত্ত্বিক বিভাগ, শ্রমজীবী পরিসংখ্যান, উদ্বাস্তু —প্রভৃতি বিশদ তথ্য প্রস্তুত করে নিতে হয়।

সঠিক নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। ইংরেজ-আমলে যে সব তথ্য-বিকৃতি ঘটতো, তা ছিল ইচ্ছাকৃত। কিন্তু, গত ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের লোক-গণনাতেও কিছু কিছু বিভ্রান্তি ঘটেছিলো। বর্তমান বছরে লোক-গণনার যে জাতীয় অনুষ্ঠান সম্প্রতি সম্পূর্ণ হলো, সেখানে যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলেছে। একটি নির্দিষ্ট এবং সীমিত কালের মধ্যে এ পর্বটি সম্পূর্ণ করতে

এক সঙ্গে বহু লোককে নিয়োগ করতে হয়। সমষ্টির এই প্রয়াসকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির—যাঁরা গণনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যাঁদের গণনা করা হয়—এই উভয় তরফের সহযোগিতা এবং সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা—ভারতবর্ষের মতো একটা বিরাট দেশের, কাশ্মীর থেকে কুমারীকা এবং গুজরাট থেকে মিজোরাম—এই বিশাল ভৌগোলিক চৌহদ্দিতে যার বিস্তার, সেই কারণে, কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানেই এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে সরকারী উদ্দীপনা এবং ব্যয়ভার-গ্রহণই যথেষ্ট নয়। একটি সত্য এবং শক্ত ভিত্তির ওপর দেশের যাবতীয় তথ্যকে বিন্যস্ত করতে কর্তৃপক্ষ এবং কর্ম-যন্ত্রকে সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। তথ্য ভুল হলে, যে উদ্দেশ্যে তার সংগ্রহ-চেষ্টা, সেই উন্নয়নমূলক কর্মসূচীও হবে ত্রুটিপূর্ণ, এবং দেশবাসীর—বিশেষ করে বিত্তহীন মানুষের কল্যাণকর প্রয়াস স্তব্ধ হবে, রুদ্ধ হবে দেশের অগ্রগতি। এই কথা স্মরণে রেখে দেশের কল্যাণময় ভবিষ্যৎ রচনার স্বার্থে এই মহৎ কর্মপ্রয়াসকে সফল এবং নির্ভুল করে তোলা অত্যাবশ্যক।

ভারতের মহাকাশ-গবেষণা

ভূমিকা—মানুষের মনে মহাকাশ স্পর্শ করার ব্যাকুলতা ; মহাকাশ-গবেষণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—বিশ্ব ও ভারতবর্ষ ; উপগ্রহ উৎক্ষেপণের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা ; ভবিষ্যতের প্রত্যাশা—উপসংহার।

শৈশবের যে মুহূর্ত থেকে চাঁদমামা শিশুর কপালে টী দিয়ে যায়, সেই থেকেই চাঁদের প্রতি মানুষের আত্মীয়তার সূচনা, চাঁদ সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। মহাকাশের যে বিশাল রাজ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা নিরন্তর ভেসে চলেছে, সেই রাজ্যে ভ্রমণ করবার, সেই মহাকাশকে স্পর্শ করবার ব্যাকুলতাও মানুষের প্রায় শৈশবাবধি। এদের নিয়ে মানুষের কতো কল্পনা, কতো কাব্য আর গান। মর্ত্যের যে সীমানায় আমরা বন্দী, তাকে অতিক্রম করে অসীম অনন্তলোকে উধাও হয়ে যাবার স্বপ্ন কল্পনায় মানুষ বিভোর : 'মানুষ চূর্ণিবে যবে নিজ মর্ত্যসীমা

তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?'

আদিকাল থেকে ১৭শ শতক পর্যন্ত আকাশ-দর্শনে মানুষ ছিলো একান্ত চক্ষু-নির্ভর। গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ মানুষের দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দিলো ঐ শতকেই। দু' শ কোটি আলোকবর্ষ দূরের আকাশও মানুষের দৃষ্টিসীমায় ধরা দিলো। ১৮শ শতক থেকে প্রায় এক শ' বছর ধরে বেলুনে চড়ে কোনো কোনো পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানী আকাশে উঠলেন। ২০শ শতকের উড়োজাহাজ আকাশকে মানুষের নিত্যসঙ্গী করে তুললো। এর পরই আকাশ থেকে মহাকাশে উত্তরণের—পৃথিবীর অভিকর্ষ-সীমা অতিক্রম করার সূচনা হলো। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম সোভিয়েট রকেটের আকাশ বিদীর্ণ করার ঘটনা মহাকাশ-অভিযানের নতুন পর্বের উদ্বোধন ঘটালো। প্রথমে রাশিয়া, তারপর একে একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ক্যানাডা ইত্যাদি দেশের পর ভারতবর্ষও মহাকাশ-গবেষণাগারে প্রবেশ-পত্র পেলো।

মহাকাশ-গবেষণায় ভারতবর্ষের ভূমিকা নতুন নয়, বৈদিক যুগ থেকেই এ-জাতীয় বিজ্ঞান-চর্চার পরিচয় আমরা লাভ করি। সে-যুগের মহাকাশ-জিজ্ঞাসা মূলতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলেও তা ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধনাকে অনেক দূর পৌঁছে দিয়েছিলো। সে যুগের কৃতী পুরুষ আর্যভট্ট ভাস্করাচার্য গণিত-গবেষণার মধ্য দিয়ে যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, সেই পথ ধরেই বর্তমান ভারত বিশ্বের অন্য দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছে।

মুসলমান যুগ এবং ব্রিটিশ যুগে ভারতে মহাকাশ-গবেষণার কোনো দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই না বটে, তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীন প্রবাহটি যে মধ্যযুগেও অব্যাহত ছিলো, তার প্রমাণ ভারতে স্থাপিত মানমন্দিরগুলো। সেই প্রবাহ-পথ ধরেই ২০শ শতকের মহাকাশ-বিজ্ঞান-সভায় ভারতের সদস্য-পদ-লাভ সম্ভব হলো ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকারের আগ্রহে, ভারতের পারমাণবিক সংস্থার তদানীন্তন ডিরেক্টার ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা এবং মহাকাশ গবেষণা সমিতির প্রধান ডিরেক্টার ডঃ বিক্রম সরাভাই-এর তত্ত্বধানে কেরলের থুম্বা নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক সন্ধানী রকেট-উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র। সেইসঙ্গে স্থাপিত হলো আবহ-গবেষণাগার। মূলতঃ পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে গবেষণা এর লক্ষ্য হলেও ভারতের মাটিতে এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ভারতের আবহাওয়া সম্পর্কে গবেষণা করার সুযোগ অনেকখানি বৃদ্ধি করেছে। ভারতের মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে এইটিই হলো প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২১শে নভেম্বর থুম্বা থেকে যে একস্তর-বিশিষ্ট রকেটটির উৎক্ষেপণ হলো, তা NASA [National Aeronautics and Space Administration] থেকে প্রাপ্ত। পরীক্ষামূলকভাবে উৎক্ষিপ্ত বিদেশে প্রস্তুত এই সব তথ্য-সন্ধানী রকেটের নাম দেওয়া হলো 'মেনকা'। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী ফরাসী এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যুগ্ম প্রয়াসে ভারতে প্রস্তুত দু'পর্যায়ের রকেট এখান থেকে উৎক্ষিপ্ত হলো, এর নাম 'কিন্নর' [Centaur]। ভারতের দ্বিতীয় রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র স্থাপিত হলো ভারতের পূর্ব উপকূলে অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটায়। সম্পূর্ণ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের হাতে প্রস্তুত প্রথম ভারতীয় রকেট 'রোহিণী' উৎক্ষিপ্ত হলো শ্রীহরিকোটা থেকে। এমনি করে, রকেট-উৎক্ষেপণ-বিষয়ক প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারতে একটি নতুন যুগের সূচনা হলো।

আধুনিক মহাকাশ-বিজ্ঞান-চর্চার প্রথম স্তরে ভারতবর্ষকে অবশ্য অন্য দেশের সহায়তা এবং সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে। রকেট-উৎক্ষেপণের মতো উপগ্রহ উৎক্ষেপণেও সেই সহযোগিতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহযোগে একটি শিক্ষামূলক উপগ্রহ 'SITE' [Satellite Instructional Television Experiment] পাঠিয়েছিলো। তারপর, ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল বেলা একটায় রাশিয়ার বিয়ার্স্ লেকের মহাকাশ-বন্দর কস্‌মোড্রোম থেকে রুশ রকেটের সহায়তা নিয়ে উৎক্ষিপ্ত হলো ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'।

এটি নিঃসন্দেহে মহাকাশ-জয়ের পথে ভারতের প্রথম এবং সফল পদক্ষেপ। এ উপগ্রহটি ভারতের বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে। বলা বাহুল্য, এ-ব্যাপারে ভারতীয়রা সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মূল্যবান উপদেশ এবং সক্রিয় সহায়তা লাভ করেছিলো। মহাকাশে সঞ্চরমাণ 'এক্স-রশ্মি', 'গামা-রশ্মি' এবং 'নিউট্রন-কণা' সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহই ছিলো আর্যভট্ট-উৎক্ষেপণের বিশেষ উদ্দেশ্য। সে সব উদ্দেশ্য সফল করে এবং প্রত্যাশিত ছ'মাস কাল অতিক্রম করে প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ আজো তার পৃথিবী-পরিক্রমার নির্দিষ্ট কক্ষপথ ধরে আবর্তন করে চলেছে, যদিও পৃথিবীর সঙ্গে এখন আর তার সক্রিয় সংযোগ নেই।

এই সাফল্যের উৎসাহে উদ্দীপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত হলেন দ্বিতীয় উপগ্রহ-উৎক্ষেপণের জন্য। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে উৎক্ষিপ্ত হলো 'ভাস্কর'। এ উৎক্ষেপণও রাশিয়ার কেন্দ্র থেকেই করা হলো। তৃতীয় উপগ্রহ 'রোহিণী-১' হলো ভারতের মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রথম উপগ্রহ। রুশ রকেটের সাহায্যে এর উৎক্ষেপণ হলো ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুলাই। এর গঠন এবং আকার আর্যভট্টের অনুরূপ হলেও ওজন কিছু বেশি। আর্যভট্টের উদ্দেশ্য সৌরজগতের নানা তথ্য সংগ্রহ, 'রোহিণী'-র উদ্দেশ্য আবহ-বিজ্ঞান, জল-বিজ্ঞান এবং 'সমুদ্র-বিজ্ঞান' বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ভূ-পৃষ্ঠের চিত্র-গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুটি টেলিভিশন-ক্যামেরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো। এরপর ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মে ISRO-র প্রয়াসে উৎক্ষিপ্ত হলো ভারতের চতুর্থ উপগ্রহ 'রোহিণী-২'। ভারতীয় রকেটের (SLV—3/2) সাহায্য নিয়ে এটি ভারতের আকাশেই উড্ডীন হলো শ্রীহরিকোটা থেকে। ভারতের মহাকাশ-গবেষণার ইতিহাসে এটিও একটি সার্থক এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকলো। যদিও মাত্র ন' দিন পৃথিবী পরিক্রমার পর রোহিণী-২ ভেঙে পড়েছিলো [৯ই জুন, ১৯৮১], তবু আত্মনির্ভর উদ্যোগের এই দৃষ্টান্ত উপগ্রহ-উৎক্ষেপণের পরবর্তী স্তরগুলোতে সফল পদক্ষেপে অগ্রসর হবার প্রেরণা যে সৃষ্টি করলো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মহাকাশ-চর্চার সর্বশেষ বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত APPLE [Ariane Passenger Pay Load Experiment]। ফরাসীদেশ থেকে উৎক্ষিপ্ত এই ভারতীয় উপগ্রহটি পৃথিবীর আবর্তন-গতির সঙ্গে সামঞ্জস্যকারী একটি সমলয় উপগ্রহ [Synchronus Satellite]। ভূ সমলয়-কক্ষে দৃশ্যতঃ স্থিত থেকে এই উপগ্রহ [১২০° পূঃ দ্রাঘিমায় সুমাত্রার ওপরে] পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে এই কক্ষের দূরত্ব ৩৬,০০০ কি. মি.। সূচনা-পর্বের নানা বিপত্তির পর শেষ পর্যন্ত ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে এটি প্রত্যাশিত কক্ষে স্থাপিত হয়েছে। এর সাহায্যে দিল্লী আমেদাবাদ মাদ্রাজে স্থাপিত ভূ-কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সারা দেশে বেতার ও টেলিভিশনের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হবে এবং ছ'টি ভাষায় টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে প্রচার করার সুবিধে হবে। ভারতীয় রেল-বিভাগ APPLE-এর সাহায্যে রেল-চলাচলের ওপর নজর এবং নিয়ন্ত্রণ রাখার কথা ভাবছেন।

সাধারণভাবে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান সপ্তম হলেও ভূ-সমলয় কক্ষে স্থাপিত উপগ্রহ-উৎক্ষেপণে ভারত পঞ্চম। আসন্ন ভবিষ্যতে ভারতীয় মহাকাশ-সাধনাকে দ্রুত অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই কর্মসূচী রচিত হয়েছে। তার সফল রূপায়ণের জন্য ভারতের দুজন মহাকাশচারী সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রেরিত হবেন প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশে।

দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল ভারতের পক্ষে মহাকাশ-চর্চার মতো ব্যয়সাধ্য উদ্যোগকে সক্রিয় রাখা কতটা সংগত, সাধারণভাবে এ প্রশ্ন কোনো কোনো মহলে দেখা দিলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মানুষের পক্ষে কল্যাণকর এমন অনেক তথ্যের আবিষ্কার এই অভিযান-প্রকল্প থেকে সম্ভব হবে, যা ভারতের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করায় এবং ভারতবাসীর নিরক্ষরতা দূর করার পক্ষে সহায়ক। একটি সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, আবহাওয়ার ত্রুটিহীন পূর্বাভাস বছরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার সাশ্রয় ঘটাতে পারে। উপগ্রহ-নিয়ন্ত্রিত দূর-সংযোজন-ব্যবস্থায় চিকিৎসাক্ষেত্রে যুগান্তরের সম্ভাবনা—দূরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারবেন প্রত্যন্ত পল্লীর বিত্তহীন রোগী। এইসব কারণে দারিদ্র্য এবং বিস্তর সমস্যা সত্ত্বেও মহাকাশ গবেষণা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী রূপে বিবেচিত হয়েছে। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মহাকাশ-গবেষণা সমগ্র বিশ্বের পক্ষে বিস্ময়কর হয়ে উঠবে—জ্ঞানের গরিমায় আর্যভট্ট ভাস্করাচার্যের উত্তরসূরীরা বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করবেন।

একটি ভিখারীর একটি দিন

জীবনের আর একটি দিন পেরিয়ে গেলো। একটি দিনের অর্থ—কিছু দীর্ঘশ্বাস, মানুষের কাছে আর ঈশ্বরের কাছে একই আবেদনের পুনরাবৃত্তি—একটি ভাঙা গ্রামোফোন-রেকর্ড বারে বারে বেজে চলা। প্রতি সকালের মতো আজও সূর্য উঠেছিলো, প্রতি সন্ধ্যার মত আজও তা তলিয়ে গেছে। আজকের রাত জ্যোৎস্নায় ঝলমল—আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। আমার জ্বলন্ত ক্ষুধার খবর নাকি পেয়েছিলেন এ-কালের কোন্ এক কবি, তাঁর মনে হয়েছিলো—'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

কাক-ভোরে রোজই আমার ঘুম ভাঙে, আজও ভেঙেছিলো। খড়দহ রেল-স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফরমের একটি কোণে যে চাদরটি পাতা ছিলো, সেটিই আমার শয্যা। পুঁটলিটি আমার বালিশ। রাত-বারোটার ডাউন-কল্যাণী পেরিয়ে গেলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি ঐ চাদর-শয্যায় আর পুঁটলির বালিশে। কাল তাই করেছিলাম। ভোর সাড়ে চারটের আপ-নৈহাটি প্রতিদিন আমাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। আজো তাই গিয়েছে। সেই থেকে আমার দিনের শুরু—অনেক প্রত্যাশায় ভরা একটি সকাল। থালাটি আজ ভরে উঠবে কানায় কানায়—সিকি-আধুলি আর টাকায়। আজ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবোই।

ডান পা-টা আমার অচল। লাঠির ওপর ভর দিয়ে ৫টা ১০-এর ডাউন নৈহাটির একটি কামরায় উঠে আমার দিনের যাত্রা শুরু হলো। সকালের ট্রেন হলেও

যাত্রীতে ঠাসাঠাসি, তারই মধ্যে ঢুকে পড়ি, রামপ্রসাদী সুরে গান গাই, আর হাতের থালাটি তুলে ধরি এক এক জন যাত্রীর অন্যমনা চোখের সামনে। থালা বেজে ওঠে, গানের কথার ফাঁকে ফাঁকে মন খুসিতে ভরে ওঠে—গান গাই, খুসির গান। এমনি করে কেটে যায় ঘণ্টা-প্রহর-দিন। খড়দা থেকে নৈহাটি, নৈহাটি থেকে শেয়ালদা, শেয়ালদা থেকে নৈহাটি, নৈহাটি থেকে খড়দা—সকাল থেকে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল থেকে সন্ধ্যে, তা থেকে রাত। কল্যাণী লোকাল—নৈহাটি লোকাল—রাণাঘাট লোকাল—কৃষ্ণনগর লোকাল। একটি বৃত্তের পরিধির মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া। পয়সা জমে, চাল-ডাল, তেল-নুন কিনি, রাঁধি, খাই, বিশ্রাম করি—অথবা শূন্যপ্রায় থালা ঘরে ফিরে আসে, উনুন জ্বলে না, অনাহার চলে এবং বিশ্রাম করি। আজ থালা ভরেছিলো, ভরেছিলো মনটাও। দুপুরে আজ নৈহাটির হোটেল থেকে কিছু খাবার খেয়েছিলাম। এরপর বিকেল থেকে আবার নৈহাটি-খড়দা-শেয়ালদার অভিযান চললো—শুনিয়ে চলি রামপ্রসাদী আর ভাটিয়ালি—ক্লান্ত তৃপ্ত জাগ্রত তন্দ্রাহত অজস্র যাত্রীর কানে সেগুলো পৌঁছে দিতে থাকি। কেউ থালায় ছুঁড়ে দেয় দশটি-পাঁচটি পয়সা, কেউ ডেকে তুলে দেয় একটি সিকি, আবার কেউ জানালা দিয়ে তার উদাশ দৃষ্টিখানি মেলে দেয় দূর আকাশের দিকে, কেউ অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে। কারো চোখ ছলছল করে, কারো চোখে-মুখে বিরক্তি, কারো ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের রেখা। তবু থালা বাজে, ভারি হয়, মন খুসিতে ভরে এবং খুসির গান গাই। স্টেশনে ট্রেন থামে, কামরা বদলাই। আবার গান—একই অথবা অন্য। উদাসীন্য, তাচ্ছিল্য আর অনুকম্পার ফাঁকে ফাঁকে আবার থালা বাজে, মনে খুসির ঢেউ, গলায় খুসির গান। এমনি করে নৈহাটি থেকে খড়দা, খড়দা থেকে শেয়ালদা এবং সন্ধ্যে হয়ে যায়।

অফিস-যাত্রীদের প্রচণ্ড ঠেলাঠেলির মধ্যে আজ আমার হাতের লাঠিটা হাত-ফসকে পড়ে গিয়েছিলো। আমি পড়ে গেলাম, শেয়ালদার প্ল্যাটফরমে। ভিড়ের মধ্যে কার ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম জানি না। পেছন থেকে এলো জনতার চাপ, আমি পিষ্ট হলাম, ছিটকে পড়লো আমার থালা, পয়সাগুলো ঝন্‌ঝনিয়ে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো, কেউ তা জানে না। আমার মনের খুসি, গলার গান মুহূর্তে কোথায় হারিয়ে গেলো। সকালবেলার প্রত্যাশা সন্ধ্যের চাপে চূর্ণ হলো।

ধীরে ধীরে পিঠের ব্যথাটা কমে আসে—বাড়ে রাত আর মনের ব্যথা। সেই ব্যথা নিয়েই আজ ফিরতে হলো খড়দহে—খড়দহের চার নম্বর প্ল্যাটফরমের দক্ষিণ কোণটিতে—আমার বহুকালের ঠিকানা। আপ ট্রেন আসে, যায়—ডাউন ট্রেনও আসে যায়; আমার ঠিকানা কিন্তু বদলায় না। বদলায় না আমার শতচ্ছিন্ন সহস্র-তালি-দেওয়া চাদরখানির মমতা, আমার একটুকরো ছেঁড়া কম্বলের পুঁটলিটির আদর করে ঘুম-পাড়ানো।

আজ একটু সকাল সকাল ফিরে এসেছি। চাদর পেতে পুঁটলিতে মাথা রেখে শুয়ে আছি। পাশ দিয়ে আপ-ডাউন ট্রেনগুলো ঘণ্টা মিনিটের হিসেব-মতো যাচ্ছে-আসছে। রোজই যেমন হয়। খোলা আকাশটা চোখের ওপর রেখে আমি

আজ অন্যমনস্ক—পিঠের নীচে চাদর, তার নীচে দুটো-একটা পাথরের টুকরো, মাথার নীচে পুঁটলিটি। আজ পেটে অন্ন নেই, চোখে তন্দ্রা নেই, মনে শান্তি নেই। মনে আসছে অতীতের দুটো একটা আবছা এলোমেলো স্মৃতি। কোন্‌-এক উদ্বাস্তু শিবিরে বাবা-মায়ের সঙ্গে কেটেছিলো আমার শৈশবের কিছু কাল। পাশের রাস্তায় সম্ভবতঃ কানামাছি খেলছিলাম সঙ্গীদের সঙ্গে। এলো একটা মোটরগাড়ী, ধূলো উড়িয়ে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো আমার ছোট্ট শরীরটাকে রাস্তার পাশে। সেই থেকে ডান-পায় চলার শক্তি হারালাম। তারপর বাবাকে ও মাকে। তারপর বিরাট আকাশের তলায় আমি একা। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন কেটে গেছে। আজ এসে পৌচেছি বার্ধক্যের দোরগোড়ায়। তবুও থামি নি, এগিয়ে চলছি না—ঘুরপাক খাচ্ছি। বাঁচতে হয় বলে বেঁচে থাকা, গাইতে হয় বলে গান-গাওয়া, চলতে হয় বলে চলতে থাকা। আমি দেখেছি তাচ্ছিল্যের পাশে অনুকম্পাকে, ঘৃণার পাশে দয়াকে। আমি বুঝেছি, মানুষের জীবন এক একটি বৃত্তের মতো। মানুষ তারই মধ্যে ঘুরতে থাকে, আমারই মতো। সে ঘুরপাক খাওয়ায় দুঃখের পাশে সুখ আছে, আশার পাশে নৈরাশ্য আছে। তবু মানুষ চলছে, আমিও চলছি। মানুষ চলে, এগিয়ে যায়, হোঁচট খেয়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়, আবারও ওঠে এবং চলতে থাকে। আমি আজ ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছি, মনের খুসি আর গলার গান থেমে গিয়েছে।

একটু পরেই বারোটার ডাউন-ট্রেন শাঁখ বাজিয়ে চলে যাবে। পূর্ণিমার আকাশের উজ্জ্বল চাঁদখানি ঢলে পড়বে পশ্চিমে। আমি জানি, আমার চোখে তন্দ্রা নেমে আসবে আগের মতোই। আবার কাক-ভোরে জেগে উঠবো, সকালের রোদ নতুন আশায় ভরে দেবে নতুন দিনের তাজা মনটিকে। সে মন আবার খুসির গান গাবে।

হে অরণ্য কথা কও

[ভূমিকা—প্রাচীন ভারত ও অরণ্য-সভ্যতা ; নগর-সভ্যতার আগ্রাসন ও তার প্রতিক্রিয়া—বন-সম্পদের বিনাশ, অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি, ভূমিক্ষয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যনাশ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য-চ্যুতি ; পরিবেশ-দূষণ ও তার প্রতিকার ; অরণ্য-সংরক্ষণের প্রয়াস ; অরণ্য-সংরক্ষণের আবশ্যকতা—বনজ সম্পদের ব্যবহার্যতা ; অরণ্য-চেতনার জাগরণ আবশ্যক—উপসংহার ।]

অরণ্যের বাণীই বিশ্বের প্রথম বাণী। বাণীশূন্য জল-স্থল-অন্তরীক্ষে যে সংগীত প্রথম উচ্চারিত হয়েছিলো, তা অরণ্যেরই। প্রাণের প্রথম জাগরণ-মুহূর্তে অন্ধ ভূমিগর্ভ থেকে সূর্যের প্রথম আহ্বান যে শুনেছিলো, তার নাম বৃক্ষ—অরণ্য তারই রচনা।

বিশ্বের তাবৎ জীব অরণ্যের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় লালিত হচ্ছে দু'শ' কোটি বছর ধরে এই অরণ্য-ই একদিন লালন করেছিলো ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি এবং মনীষাকে। 'স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়-গরিমা' এবং 'মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা'-র সহাবস্থান প্রাচীন ভারতের অরণ্য আশ্রয়ে সম্ভব হয়েছিলো। বর্তমান যুগের যন্ত্র-সভ্যতা প্রাচীন

ভারতের সহজ-সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাই প্রথম বাণীর উচ্চারক অরণ্য আজ স্তব্ধ, মূক। নগর-জীবন-যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট কবির কণ্ঠে আজ ব্যাকুল প্রার্থনা—'হে অরণ্য কথা কও'। নিষ্ঠুর রাক্ষসে বর্তমানের কাছে বিক্ষুব্ধ কবির দাবি— 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ, লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা।'

আধুনিক সভ্যতা তার দানব-মূর্তি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার কালো ধোঁয়ার বিষাক্ত নিশ্বাসে বিধাতার দেওয়া উদার আকাশ আর মুক্ত বাতাস আজ দূষিত—লক্ষ কোটি জীবাণুর আশ্রয়। ভাগীরথী-কূলের উদার শ্যামলিমা আজ শিল্প-কারখানার উদ্ধত উৎগারে আচ্ছন্ন।

জনজীবনের স্বাভাবিক বিস্তার অরণ্যকে সংকুচিত করে নগর গড়ে তুলেছো। নগর-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করতে অরণ্যের এ আত্মবলি রবীন্দ্রনাথকে একদিন ব্যাকুল করে তুলেছিলো। সেই ব্যাকুলতার গর্ভে-ই বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের জন্ম।

অরণ্য অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার। নগর-সভ্যতার দুর্জয় আগ্রাসন সেই ভাণ্ডারকেও ক্রমশঃ শূন্য করে ফেলেছে। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা বিপর্যয়ের সূচনা করেছে নিঃসন্দেহে। বৃক্ষের মূল মাটিতে শক্ত করে ধরে রাখে। সেই বৃক্ষের বিনাশের অর্থ ভূমিক্ষয়। কেবলমাত্র সৌন্দর্যের ভাণ্ডার হিসেবেই নয়, অরণ্য এবং মানুষের সহাবস্থান মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বৈজ্ঞানিক কারণেই অপরিহার্য। অরণ্যের ক্রমিক অবলোপ সুস্থ জীবন-যাপনকেই প্রায় অসম্ভব করে তুলছে। অতএব, নাগরিক জীবনের সম্প্রসারণের জন্য যেমন অরণ্যের বহিষ্কারে আমরা তৎপর হয়ে উঠেছিলাম, ঐ জীবনের সুষ্ঠু সংরক্ষণের কারণেও সেই অরণ্যকে আবার শঙ্খধ্বনির আবাহনে স্বাগত জানাতে হচ্ছে। বন-মহোৎসব-উদ্‌যাপন সেই অরণ্য-আবাহনেরই আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি।

পরিবেশকে নির্মল রাখছে অরণ্য। অক্সিজেন দিয়ে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ-করে নীলকণ্ঠ বনভূমি আমাদের সুস্থদেহে বাঁচিয়ে রাখছে। কিন্তু অরণ্যের ক্রম সংকোচন যেভাবে ধীরে ধীরে আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে, জল-হাওয়াকে সুস্থ জীবনের পক্ষে প্রতিকূল করে তুলছে, ভূমিক্ষয়ের ভয়ংকর পরিণামকে যেভাবে অনিবার্য করে তুলছে, তার দ্রুত প্রতিকার এখন আমাকে করতেই হবে। অতএব কেবলমাত্র সৌন্দর্য সম্ভোগের আত্মিক বা মানসিক প্রয়োজনে নয়, জীবন-ধারণের স্থূল স্বার্থে-ই অরণ্যকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ আমরা বোধ করছি।

আমরা লক্ষ্য করছি, গত ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই নানাবিধ উদ্দেশ্য সামনে রেখে অরণ্য-বিস্তারের প্রয়াস চলছে। ভারত সরকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমিগুকে অরণ্য অঞ্চলরূপে গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ভূমিক্ষয় রোধ, আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রণ, সৌন্দর্য-বর্ধন—সবই এ প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

বনজ সম্পদ আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও অপরিহার্য। ঘরের আসবাবপত্র, রান্নার জালানী, নিত্য-ব্যবহার্য রঞ্জক দ্রব্য, উদ্ভিজ্জ তেল, তার্পিন, প্লাইউড্, জৈবসার,

ধূপ, আঠা, মধু—সবই তো অরণ্যের উপহার। আবার, অরণ্য-প্রাণী বাইরের স্বভাবে হিংস্র হলেও জীবন-ধারণের ক্ষেত্রে তারা আমাদের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। প্রাকৃতিক অনুশাসনে ওদের বিনাশ আমাদের বিনাশকেও ডেকে আনে। তাই, বন্য প্রাণীর সংরক্ষণেও সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়েছে, স্থাপন করতে হয়েছে 'অভয়-অরণ্য'। সুতরাং, অরণ্যের সমাধির ওপর আধুনিক মানুষের গৃহশয্যা রচনা করা অসম্ভব। অরণ্যের আশ্রয়েই আমাদের যথার্থ জীবন-যাত্রা। অরণ্য আমাদের একান্ত আত্মীয়। যার কোলে প্রাচীন ভারত একদিন আর্য মন্ত্রে ভারতের তথা বিশ্বের মহাকাশকে মন্দ্রিত করে তুলেছিলো, সেই অরণ্য-ই আধুনিক ভারতেরও প্রাণবায়ুর অপরিহার্য উৎস।

একদিন যে অরণ্য-ভূমি ছিলো শ্যামলে-শ্যামল, আজ তা আধুনিক মানুষের স্বার্থের আঘাতে জর্জরিত, বিবর্ণ। অরণ্যের প্রতি মানুষের এই অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ কি প্রকৃতি নেবে না?

মানুষের মধ্যে অরণ্য-চেতনার শোচনীয় অভাবই এসব অনিষ্টের মূল। অতএব, আমাদের সুস্থ জীবন-যাপনের স্বার্থেই অরণ্য-চেতনায় মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 'একটি শিশুর একটি গাছ'—এই শ্লোগানটিকে কার্যকর করে তুলতে পারলে একদিন নাগরিক জীবন বনের সবুজ ছায়ার আশ্রয়ে স্নিগ্ধ এবং সতেজ হয়ে উঠতে পারবে। ফলে ফুলে অরণ্য-সম্পদে ভারতবর্ষ তার হৃত ঐশ্বর্যকে ফিরে পাবে। আজকের নির্বাক নির্জিত অরণ্য মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা পাবে, সজীব এবং সবাক সহচররূপে সে চিহ্নিত হবে মানুষের কাছে—বর্তমান সভ্যতার কাছে।

বিদ্যালয়-পত্রিকা

[পত্রিকা ও তার শ্রেণীভেদ; শিশু-পত্রিকার অস্তিত্ব সত্ত্বেও শিশু-রচনা-নির্ভর পত্রিকার অভাব; পত্রিকার উদ্দেশ্য ও বিদ্যালয়-পত্রিকা; বিদ্যালয়-পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা; লেখকের মনোজগতের সীমানা—বিদ্যালয়-জীবনের প্রতিফলন; পত্রিকা-প্রকাশনায় আবশ্যক দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি; বিদ্যালয়-পত্রিকার কাছে পাঠকের প্রত্যাশা এবং পাঠকের কাছে পত্রিকার দাবী; পত্রিকা-পরিচালনা—শিশু-কিশোরের সংগঠনী-শক্তির উন্মেষ; পত্রিকার সার্থকতা বা উপযোগিতা—সুপ্ত প্রতিভার মুক্তি ও আত্মপ্রকাশের ভূমি; সমস্যা ও প্রতিকার; বিদ্যালয়-পত্রিকার ভবিষ্যৎ—উপসংহার।]

'পত্রিকা' কথাটির সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। কারণ, প্রতিটি সকালেই আমরা এর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকি। দৈনিক পত্রিকা আমাদের জন্য সংবাদ বহন করে আনে। একে আমরা সংবাদপত্র বা চলতি কথায় 'খবরের কাগজ' বলে থাকি। কিন্তু, সব পত্রিকাই সংবাদপত্র নয়। একটি মনের ভাবনাকে বহুমনের দিকে প্রসারিত করে দেওয়াও একশ্রেণীর পত্রিকার দায়িত্ব। সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ইত্যাদি বিচিত্র সম্ভার নিয়ে এ-ধরণের পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য বিদ্যালয়-পত্রিকাও এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

কিছু কিছু শিশু-পত্রিকা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অপরিণত শিশু-কিশোরেরাই এর পাঠক। কিন্তু শিশু-পত্রিকার ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা এইখানে যে, এর লেখকেরা সাধারণতঃ বয়স্ক মানুষ। বয়স্ক মানুষের রুচি ও চিন্তা-চেতনা শিশু-কিশোরের পক্ষে যথাসাধ্য গ্রহণযোগ্য হয়ে এসব রচনায় আত্মপ্রকাশ করে বটে, কিন্তু অপক্ক শিশুমনের আর্তি আকাঙ্ক্ষা আনন্দে রূপায়িত হবার সুযোগ এসব পত্রিকায় একান্ত অনুপস্থিত। সম্প্রতি শিশু-রচনা-নির্ভর কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকলেও সংখ্যায় তা নিতান্ত নগণ্য।

বিদ্যালয় মুখ্যতঃ বিদ্যাশিক্ষার স্থান হলেও শিশুমনের সার্বিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার দায়িত্বও বিদ্যালয়েরই। তার জন্যে একদিকে প্রয়োজন খেলার মাঠের, অন্যদিকে বিদ্যালয়-পত্রিকার। অপরিণত শিশু বা কিশোর-মনের অস্ফুট সাহিত্যানুরাগ কল্পনাশক্তি এবং রচনা-প্রীতিকে সতেজ করে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়-পত্রিকার ভূমিকা অসাধারণ। ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রেরা তো ঘুমিয়ে আছে আজকের শিশু-কিশোরের অন্তরেই। সেই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে জাগিয়ে তোলার জন্যেই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পত্রিকা-প্রকাশনার ব্যবস্থা আবশ্যক। সাধারণ পত্র-পত্রিকা পক্ষকাল বা মাসের ব্যবধানে সাধারণতঃ প্রচারিত হয়। কিন্তু, বিদ্যালয়-পত্রিকার ক্ষেত্রে তেমন প্রয়োজন নেই। ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক বিদ্যালয়-পত্রিকাই যথেষ্ট। তবে, কোনো কোনো বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণীর উদ্যোগে মাসে মাসে বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যে-শ্রেণীরই হোক, পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিশু-মনের উদগ্র কৌতূহল এবং অদম্য প্রেরণাকে মুক্ত করতে পারলেই বিদ্যালয় পত্রিকা উদ্দেশ্যমুখী হয়।

সাধারণ পত্র-পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যালয়-পত্রিকার কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ পত্রিকার লেখক বয়স্ক অভিজ্ঞ ও বিদ্বজ্জন, পাঠকও বয়স্ক এবং সাহিত্যানুরাগী। পত্রিকার বিষয় বিচিত্র। কিন্তু, বিদ্যালয়-পত্রিকার লেখক বারো কি ষোল বছরের অনভিজ্ঞ কিশোর-কিশোরী, পাঠক সাধারণতঃ একই বয়সের সীমিত সংখ্যক বিদ্যার্থী এবং অঙ্গুলিমেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা আর অভিভাবক। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পটভূমিতে এসব রচনার জন্ম। মলাটে বিদ্যালয়ের ছবি, কবিতায় মধ্যযুগীয় পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ, পাঠ্যগ্রন্থে-পড়া বঙ্কিমী বা বিদ্যাসাগরী রীতিতে লেখা দুটো-একটা প্রবন্ধ, সরস্বতীর কাছে পরীক্ষা-পাশের জন্য পদ্যে লেখা আবেদন-পত্র, ট্রেনে দার্জিলিঙ-ভ্রমণের সরল কাহিনী অথবা একটি বেদনাময় দুর্ঘটনার বিষয়বস্তু নিয়ে কাঁচা বাক্য-বিন্যাস এবং শিথিল গাঁথুনীতে যে পত্রিকাটি বৎসরান্তে কচিমনের সবুজ রঙে উজ্জ্বল হয়ে হাতে হাতে ফিরতে থাকে, তারই নাম বিদ্যালয়-পত্রিকা। এর সার্থকতা পরিণামে নয়, সম্ভাবনায়।

ছাত্র-ছাত্রীর চৈতন্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ইঁট-কাঠ-পাথর নয়, তার আন্তর রূপটিই ছাত্র-ছাত্রীর চিত্তকে অধিকার করে থাকে। তাই, পত্রিকায় প্রকাশিত রচনায় বিদ্যালয়ের সেই মর্মরূপটির প্রতিফলন পড়ে স্বাভাবিক কারণেই। মোটের ওপর, ক্ষুদে লেখকের পরিবারগত এবং বিদ্যালয়গত

চিন্তা-চেতনাই বিদ্যালয়-পত্রিকার রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব, বিদ্যালয়-পত্রিকায় বয়স্ক মহৎ লেখকের বৃহত্তর জগতের সন্ধান কেউ করে না।

বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারে এমন দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি নির্ধারণ করা কর্তব্য, যা রচনা-প্রবণ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের হতোদ্যম না করে বরং উৎসাহী করে তোলে। রচনার মানকে অতিমাত্রায় উঁচুতে তুলে রচনা নির্বাচন করতে গেলে রচনার প্রথম প্রয়াসকে অনেক ক্ষেত্রেই নিরুৎসাহ করা হবে। নিজের লেখাটি মুদ্রিত অক্ষরে দেখতে পাবার উৎসাহে যাদের সাহিত্য-সাধনার হাতে-খড়ি, তাদের স্বাভাবিক অপটুতাকে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর মার্জনায় বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয়। কে জানে, ঐ অপটু অক্ষরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কিনা একটি রবীন্দ্রনাথ না হোক—নিদেনপক্ষে একটি শীর্ষেন্দু কিংবা নীরেন্দ্রনাথ!

বিদ্যালয়-পত্রিকা মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীদেরই পত্রিকা। অতএব, এর পরিচালনার-সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর থাকাই বাঞ্ছনীয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে উপদেষ্টার ভূমিকায় থাকাই যথেষ্ট। রচনা-নির্বাচন, পত্রিকার শোভা-সৌষ্ঠবের পরিকল্পনা, রচনা-বিন্যাস, মুদ্রণ ইত্যাদি ব্যাপারের সঙ্গে সরাসরি যোগ সৃষ্টি হলে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে সাংগঠনিক শক্তির উন্মেষ ঘটতে থাকে, আত্মবিশ্বাস জাগতে থাকে। এমনি করেই তারা ভবিষ্যৎ জীবনে গুরুভার দায়িত্ব-গ্রহণে যোগ্য হয়ে ওঠে।

ভবিষ্যতের সুস্থ মানসিকতা-সম্পন্ন মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়-পত্রিকার অবদান অসীম। লেখক বা সাহিত্যিক হওয়ার প্রথম প্রেরণা এই পত্রিকা থেকেই পাওয়া যায়। লেখক হবার জন্য সুদীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধন পথের ছাড়পত্র এনে দেয় বিদ্যালয়-পত্রিকাই। সাহিত্যিক জীবনের শিক্ষানবিশীর সুযোগ দেবার জন্যই এই পত্রিকা। অতএব, আমাদের জীবনে আপাত তুচ্ছ এই বিদ্যালয়-পত্রিকার মূল্য অসামান্য।

আমাদের দেশের যে-কোনো মহৎ উদ্যোগেই যেমন বিস্তর সমস্যা থাকে, বিদ্যালয়-পত্রিকা-প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তা অবশ্য আছে। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা অর্থাভাব। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই পত্রিকা-প্রকাশ করার মতো আর্থিক সংগতি নেই। এ-সমস্যার সমাধান দু'দিক থেকে হতে পারে। উৎসাহী লেখকেরা তাদের নির্বাচিত রচনা সম্ভার নিয়ে হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে। অথবা, সরকারী অনুদানের একটা অংশ পত্রিকার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। দারিদ্র্য একটা সমস্যা বটে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তা যে অনতিক্রম্য বাধা নয়, পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য বিদ্যালয়ে নিয়মিত বা অনিয়মিত পত্রিকা-প্রকাশের দিকে দৃষ্টি দিলেই তা বোঝা যায়।

লেখক-পাঠক-প্রকাশনা—সবদিক থেকেই বিদ্যালয়-পত্রিকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ-পত্রিকা চিরকাল বেঁচে থাকবে, নতুন নতুন প্রকাশ-ব্যাকুল মনের স্পর্শ নিয়ে এর প্রকাশের ধারা অনাহত অব্যাহত থাকবে। কোনো অশুভ শক্তিই এর গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারবে না। হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা অসংখ্য পত্র-পত্রিকা স্ফুলিঙ্গের মতো জলে উঠে পরক্ষণেই ভস্ম হয়ে যায়, কিন্তু বিদ্যালয়-পত্রিকার অম্লান প্রদীপটি শিশু-কিশোরের মনের রসে চিরকাল অনির্বাণ থাকবে।

দুর্গোৎসব

বাংলার সর্বপ্রধান উৎসব—দেবীর আগমনে শারদীয় পটভূমিকা—বাঙালীর আকাঙ্ক্ষা—দশভুজার বর্ণনা—দুর্গাপূজার পুরাণোক্ত কাহিনী—দুর্গাপূজার প্রচলন—বারোয়ারী ও সার্বজনীন পূজা—পূজার সময় ব্যস্ততা—পূজার দিনগুলির বর্ণনা—বিজয়া।

দুর্গোৎসব বাংলার প্রধান উৎসব। শরৎকালে আকাশে বাতাসে নূতনের আভাস দেবীর আগমন-বার্তা ঘোষণা করে। আকাশে জলহারা হাল্‌কা মেঘের অবাধ সঞ্চরণ, নদীতীরে শুভ্র কাশের হিল্লোল, শেফালি ফুলের মন-মাতানো গন্ধ, সোনালী রঙের উজ্জ্বল রৌদ্র চারিদিকে নূতনের শিহরণ জাগাইয়া তোলে। প্রবাসী ঘরে ফিরিবার জন্য আকুল হইয়া ওঠে, স্বামীগৃহের বধূ পিতৃগৃহে আসিবার জন্য উন্মুখ হয়। প্রকৃতিতে ও মানব-মনে যেন জগজ্জননীর আবির্ভাবের পটভূমিকা আপনা-আপনিই রচিত হয়।

বাঙালী হিন্দু দেবী দুর্গাকে স্নেহলালিতা কন্যার মত গৃহে বরণ করিবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। মা মেনকার আর্তি—"যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, বিলম্ব আর করো না।"—ইহা যেন বাঙালী মায়ের আকুলতার প্রতিধ্বনি। অসুরনাশিনী শক্তিরূপিণী দেবী একাধারে বরাভয়দায়িনী মাতৃরূপে এবং আদরিণী কন্যারূপে বাঙালীর গৃহে আগমন করেন। শারদীয়া দুর্গাপূজা বাঙালীর নিজস্ব কল্পনা ও সৃষ্টি। ইহাতে তাহার অন্তরের ভাব এবং সাধনা মূর্ত হইয়া ওঠে।

দশভূজা দশপ্রহরণধারিণী রণরঙ্গিণী শ্রীদুর্গার মৃন্ময় মূর্তি রচনায় হিন্দুর পারিবারিক ও জাতীয় জীবনের মূর্ত প্রকাশ। দেবী সিংহবাহিনী, মহিষাসুর দলনে উদ্যতা। দেবীর দক্ষিণে শ্রী ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ, বামে বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী ও দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়। বাঙালী দীর্ঘকাল ধরিয়া ভক্তি-নম্রচিত্তে সর্বমঙ্গলা সর্বার্থসাধিকা মাতৃরূপিণী ভগবতীর আরাধনা করিতেছে। বর্তমান যুগে 'বন্দে মাতরমে'র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দশপ্রহরণ-ধারিণী দশভূজাকে দেশ-মাতৃকারূপে কল্পিত করিয়াছেন। এই কল্পনা স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালীর প্রাণে নবপ্রেরণা দিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দুর্গাপূজার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে, স্বর্গে দেবতাগণকে মহিষাসুরের অত্যাচার হইতে ত্রাণ করিবার জন্য দেবী আদ্যাশক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। শক্তিরূপিণী দেবী মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক মহাপরাক্রান্ত অসুরদিগকে বধ করিয়া দেবতাগণকে উৎপীড়ন হইতে মুক্ত করেন। পুরাকালে রাজা সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হৃত রাজ্য উদ্ধারকল্পে বসন্তকালে দেবী দুর্গার পূজা করেন। ইহা বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত। রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার মানসে রাবণ বধের জন্য শরৎকালে দুর্গাপূজা করেন। শরৎকাল পূজার পক্ষে অকাল, শরৎকালের দুর্গা পূজাকে এইজন্য অকালবোধন বলে।

মধ্যযুগ হইতে বাংলাদেশে দুর্গাপূজার প্রচলন দেখা যায়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশের প্রতাপশালী হিন্দু জমিদারগণ এবং বিত্তশালী বণিকগণ

সাড়ম্বরে এই মহাপূজার অনুষ্ঠান করিতেন। ইহা যেন সেকালের সমাজ-জীবনের শক্তি ও ঐশ্বর্য প্রকাশের প্রতীকস্বরূপ ছিল। এক-একটি পূজাবাড়ি সমগ্র পল্লীর প্রাণকেন্দ্র হইয়া উঠিত এবং সমগ্র পল্লী উৎসবে মুখরিত হইত। সেই একক পূজা সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতায় সার্থক হইয়া উঠিত। বর্তমানে সার্বজনীন পূজা সবচেয়ে জনপ্রিয় হইয়াছে।

দুর্গাপূজার একমাস পূর্ব হইতেই চারি দিকে যেন 'পূজো পূজো' ভাব। মণ্ডপে মণ্ডপে ও কুমোর-বাড়িতে বাঁশ খড় মৃত্তিকার সাহায্যে প্রতিমা তৈয়ারীর কাজ সুরু হয়। ধীরে ধীরে পূজার দিন অগ্রসর হয়, ছেলেমেয়েরা নূতন জামা-কাপড়-জুতা ও পূজার আনন্দের পরিকল্পনায় মাতিয়া ওঠে। প্রবাসী বিচিত্র বস্ত্র ও নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া বাড়ী আসেন। স্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারী পূজা উপলক্ষ্যে দীর্ঘ দিন ছুটি থাকে। এ সময় কলিকাতাবাসীরা দলে দলে দেশ-ভ্রমণে বাহির হন।

মহালয়ার দিন দেবীর ঘট স্থাপন করা হয়। ষষ্ঠীর দিন দেবীর কল্পারম্ভ ও বোধন। সন্ধ্যাবেলায় পূজা-মণ্ডপে বোধনের সানাই সকলের মনে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—এই তিন দিনই মহাসমারোহে পূজা ও অঞ্জলী প্রদান হয়। পূজায় ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টার তুমুল বাদ্য বাজে। সন্ধ্যায় দেবীর সম্মুখে আরতি হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাসিমুখে নূতন জামা-কাপড় পরিয়া প্রতিমা দর্শনে বাহির হয়। রাত্রিতে উৎসব-প্রাঙ্গণ আলোয় ঝলমল করিতে থাকে। বিচিত্র বেশে নর-নারী অধিক রাত্রি পর্যন্ত প্রতিমা ও আরতি দর্শন করে। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেই পূজার আনন্দে মাতিয়া ওঠে। সকলেরই মুখে হাসি, প্রাণে উৎসবের পরশ। নবমী রাত্রিতে বাঙালীর মনের আকুলতা— "না পোহাইও নবমীর নিশি।" নবমীর রাত্রির অবসানেই যে বিজয়া দশমী।

দশমীর দিন সকাল হইতেই সানাইয়ে বিষাদের সুর বাজিতে থাকে। সকালে দেবীর পূজার পর প্রতিমা ভাসান বা বিসর্জনের পালা সুরু হয়। বিসর্জনের দিন বিকালে প্রতিমাকে আলো বাজনা ও শোভাযাত্রাসহ নদীতীরে অথবা নিকটস্থ দীঘির পাড়ে লইয়া যাওয়া হয়। অনেক স্থলে নদীতীর আলোকদ্বারা সাজানো হয় এবং ভাসানের মেলা বসে। নৌকায় প্রতিমা তুলিয়া নদী-পরিক্রমা হয়। রাত্রে প্রতিমার বিসর্জনের পর সকলে বিষন্ন অন্তরে গৃহে ফিরিয়া আসে।

ইহার পর বিজয়ার সম্ভাষণ। গুরুজনদিগকে প্রণাম এবং বন্ধুদের আলিঙ্গন। বাঙালী বিজয়াতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করে, গৃহে গৃহে অভ্যাগতদের মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করে। দূরের আত্মীয়-বন্ধুদের পত্রদ্বারা যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানানো হয়। শুধু বাংলা-দেশেই নয়, বহির্বঙ্গেও ধূমধামের সহিত দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। নেপালী ও অন্যান্য অবাঙালীদের মধ্যেও এই পূজার প্রচলন দেখা যায়। দুর্গোৎসব, সাম্প্রদায়িক ও মূর্তিপূজা মাত্র নয়, ইহাতে জাতীয় উৎসবের আবেদন পূর্ণমাত্রায় আছে। এইজন্য জাতি-ধর্ম-

নির্বিশেষে সকলেই ইহার আনন্দ উপভোগ করেন। কবি মধুসূদন নিজে খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী হইলেও বাঙালী-হৃদয়ের এই আনন্দ-বিষাদের গভীরতা অনুভব করিতেন। তাই তিনি তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন অন্তরের মর্মবেদনায়।

বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

বাল্য-স্মৃতি বা (ছাত্র-জীবন)

বাল্য-স্মৃতি মধুর—বিদ্যালয়ের প্রথম জীবন—বাল্য-ঘটনা—শিক্ষা লাভ—বাল্য-স্মৃতি—স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম—সহপাঠীদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব—স্কুল-জীবনের স্মৃতি বড় সম্পদ্।

বাল্য-স্মৃতি মানুষের মনে মায়াজাল রচনা করে। দুঃখের হোক বা সুখের হোক, আনন্দের হোক বা বেদনার হোক, শৈশবের স্মৃতি আমাদের কল্পনা-লোকে কত না রঙিন হইয়া দেখা দেয়। মধুময় বাল্য জীবনের মধুর স্মৃতির কথা ভাবিতে আনন্দ পাই, বলিতে সুখ পাই। যত বয়স বাড়ে, যত আমরা শৈশব হইতে দূরে সরিয়া যাই, ততই যেন শৈশবের স্মৃতিগুলি মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠে।

আমার শৈশবের মধুর স্মৃতিগুলি আজ আমার মনের দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। নদীর স্রোতধারার ন্যায় জীবনে একবার যাহা গত হয়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। তবে মনে হয়, আমার সেই হারানো দিনগুলি আবার যদি ফিরিয়া পাইতাম। আবার যদি বাল্যসাথীদের সঙ্গে চপল শিশুটির মতো অশান্ত চরণে দুরন্তপনা করিয়া বেড়াইতে পারিতাম।

মনে পড়ে সেই দিনটির কথা যেদিন আমি প্রথম আমাদের বিদ্যালয়ে পড়িতে যাই। যাইতে আমার কেমন ভয় ভয় করিতেছিল। কিন্তু আমার সমবয়সী বন্ধুদের উৎসাহ দেখিয়া আমার সেই ভয় অনেকটা কাটিয়া গেল। আমি খুব ভাল কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিতাম। আমার আবৃত্তি শুনিয়া আমাদের শিক্ষক মহাশয় এক দিন আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন—"বা বেশ ছেলে তো! খুব ভাল করে পড়ো, তা হলে বৃত্তি পাবে।"

শিক্ষক মহাশয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। আমি প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইলাম। মায়ের সেদিন কি আনন্দ! পাড়ার ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইল। সেদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে।

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আমার ছেলেবেলার বিচিত্র দিনগুলি যেন ভাল ভাবেই কাটিতেছিল। ওদিকে যে আমার ভাগ্যাকাশে সকলের অলক্ষ্যে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল, সেকথা আমি কেমন করিয়া বুঝিব! এক দিন হঠাৎ আমার চোখের সামনে সব আলো যেন নিভিয়া অন্ধকারে একাকার হইয়া গেল,—আমি পিতৃহীন হইলাম। নিষ্ঠুর নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! কয়েক দিনের পীড়ায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় আমার পিতৃদেব চলিয়া গেলেন।

বড় ব্যথায়, বড় অভিমানে আমার চোখ ফাটিয়া জল ঝরিতে লাগিল। আমি দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—"মাগো, আমাদের কি হবে?" মা শুধু উপরের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন—"ভগবান্ আছেন।"

সত্যই ভগবান্ আছেন। একথা আমি আজও ভুলি নাই, কোন দিনই ভুলিব না। কৃষ্ণনগরে আমার এক দূরসম্পর্কীয় দাদা থাকিতেন, তাঁহারই কাছে আমার পড়াশুনার ব্যবস্থা হইল। দাদার কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে আমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু আমার স্নেহময়ী বৌদির আদর-যত্নে আমার সকল লজ্জা, সকল ব্যথার অবসান হইল।

শহরের কোল ঘেঁসিয়া একটি ছোট নদী। আমি প্রায়ই বিকাল বেলায় নদীর ধারে একটি নিরিবিলি জায়গায় গিয়া বসিতাম। আমি এক মনে কালো জলে ছল ছল শব্দ শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতাম। মধ্যে মধ্যে এক-একটি পাল-তোলা নৌকা কোন্ অজানা অচেনা দেশের দিকে দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া যাইত। কখনও বা নদীর বুকের উপর দাঁড় টানার অস্পষ্ট শব্দ আর মাঝিদের গান আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিত। কখনও বা হঠাৎ মনে পড়িত মায়ের কথা। নদীর পরপারে দূরে দিগন্ত-বিস্তৃত বনানীর ছায়াঞ্চল তাহারই কিছু আগে, নদীর যেখানে একটু ঘুরিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, ঠিক সেইখানে ফুলে-ভরা অশোক গাছে ঘেরা একটা ভাঙা মন্দির আমাকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিত। তারপর সন্ধ্যার কালো ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া আশেপাশের সকল ছবিই যখন অন্ধকারে একাকার করিয়া দিত, তখন আমি নদীতীর হইতে উঠিয়া আবিষ্ট মনে বাড়ী ফিরিতাম।

স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম ও কড়া শাসন প্রথমে স্বাভাবিক ভাবে লইতে পারি নাই। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। কিন্তু এখন বুঝিতে পারি, নিয়মানুবর্তিতা মানুষের জীবনে উন্নতির পক্ষে মস্ত বড় সহায়। বাধ্যতাও ছাত্র জীবনের একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ; গুরুজনকে মানিয়া চলার অভ্যাস আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রয়োজন। স্কুল জীবনই চরিত্র গঠনের ভিত্তি, এই ভিত্তি যাহাতে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্কুলে না গিয়া মানুষ পরীক্ষা পাশ করিতে পারে, কিন্তু মানসিক উন্নতি অনেক দিক্ হইতে পঙ্গু থাকিয়া যায়। আবার স্কুল-জীবন আমার মনকে নানা ভাবে সবল, সমৃদ্ধ ও সরস করিয়াছে।

সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদিগকে ভালভাসিয়া, শিক্ষকদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া এবং সকলের ভালবাসা পাইয়া ক্রমে ক্রমে শ্রেণীর পর শ্রেণী পার হইয়া আসিয়াছি। আজ স্কুল সমাপ্তির পর বুঝিতে পারিতেছি, ইহা কত আনন্দের এবং গৌরবের। সকলকে ভালবাসায় এবং সকলের ভালবাসা পাওয়ায় একটা বিমল আনন্দ আছে। স্কুল-জীবনে আমি এই আনন্দের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া স্কুল-ম্যাগাজিন, বিতর্ক-সভা ও ছাত্র সমিতিতেও আমার উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়ানোয়, রোগীর পরিচর্যায়, ঐতিহাসিক স্থান বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আমরা সবাই দল বাঁধিয়া যোগ

দিতাম। বিভিন্ন মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন দেশবাসী ছাত্রদিগের সহিত মিশিতে পারিয়া জীবনে অনেক বিষয়ে লাভবান হইয়াছি।

আমার ছাত্র-জীবন দুঃখের ভিতর দিয়া আরম্ভ হইলেও ছাত্র-জীবনের স্মৃতি কত মধুর এবং কত সুন্দর। সেই অসহায় আমি ধীরে ধীরে কি সুন্দর ভাবে নিজেকে ক্লাসের মধ্যে এবং স্কুলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলাম! বিদ্যালয়ের প্রতিটি কোণের সহিত কত স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। প্রতিটি গাছের ছায়া পুরানো কথা মনে করাইয়া দেয়। স্কুল-জীবনের স্মৃতি আজ আমার মস্ত বড় সম্পদ্। এখন মনে হয়, স্কুলে না পড়িলে বোধ হয় জীবনের অনেক কিছুই অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। সুন্দর দিনগুলি হারানোর দুঃখে স্কুল জীবনের স্মৃতি শুধু মধুর নয়, বেদনা-বিজড়িতও।

সময়ের মূল্য

সময়ের অপব্যয় নিকৃষ্টতম অপরাধ—সময় ও নদীস্রোতের তুলনা—যথাসময়ে কাজ করা—কাল অনন্ত, জীবন স্বল্পস্থায়ী—বর্তমানের সদ্ব্যবহার—কর্মে অধিকার, ফলে নয়—মনীষীদের সময়নিষ্ঠা—য়ুরোপীয়দের সময়নিষ্ঠা—ছাত্র-জীবনে আলস্য সময়নিষ্ঠার প্রধান শত্রু।

পৃথিবীতে যত প্রকারের অপব্যয় আছে, সময়ের অপব্যয় তাহার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে অমার্জনীয় অপরাধ। মানুষ সময়ের অপব্যয় করিয়া যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই হয় নাই। কারণ এ ক্ষতি অপূরণীয়।

ইংরেজীতে একটি কথা প্রচলিত আছে—"Time and tide wait for none"—সময় এবং জলস্রোত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। নদীর স্রোতের সহিত সময়ের তুলনা করা হয়। নদীর স্রোতের মত সময়ও সদা-চঞ্চল। গতিই সময়ের ধর্ম। নদীর স্রোত যেমন একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না, তেমনি যে-সময় একবার গত হয়, অর্থের বিনিময়েও তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। এই কারণে জীবনের প্রতি মুহূর্ত সৎকাজে ব্যয়িত করা উচিত, নতুবা ভাবী জীবনে বিফলতা-জনিত অনুতাপ অনিবার্য।

কর্তব্য কর্ম পরে করিব বলিয়া কখনই ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। দীর্ঘসূত্রী লোকের কাজ কখনই সুসম্পন্ন হয় না। সংস্কৃত নীতি-গল্পে একটি প্রবাদ-বাক্য আছে—"কর্তব্য কর্ম যথাসময়ে না করিলে কাল তাহার রস শুষিয়া লয়।" এই কথার অর্থ এই যে, কর্তব্য যথাসময়ে না করিয়া পরে করিলে সে কাজের কোনো মূল্যই থাকে না। তাহা ছাড়া কালক্রমে মানুষের মনেরও পরিবর্তন হয়। পূর্বে কর্ম সম্পাদনে যেরূপ আগ্রহ ছিল, পরে সেরূপ আর নাও থাকিতে পারে।

কাল অনন্ত, কিন্তু মানব-জীবন সীমাবদ্ধ ও স্বল্পস্থায়ী। মানুষের পরমায়ু কতকগুলি ক্ষুদ্র মুহূর্তের সমষ্টিমাত্র এবং যে ব্যক্তি হেলায়-খেলায় এই সকল মহামূল্য

মুহূর্ত নষ্ট করে, তাহাকে আত্মঘাতী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সময়ের অপব্যবহার করা আত্মহত্যার তুল্য মহাপাতক।

অতীত এবং ভবিষ্যতের চিন্তাকে প্রাধান্য না দিয়া বর্তমানের উপর নির্ভর করিয়া নিবিষ্টচিত্তে কাজ করিয়া যাওয়াই সুবিবেচনার কাজ। অতীতের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকাও যেমন নিরর্থক, ভবিষ্যতের জন্য মনে মনে আকাশ কুসুম রচনা করাও তেমনি নিরর্থক। যুগে যুগে বর্তমানই আজ অতীতের বুকে আশ্রয় লইয়াছে, আবার সুদূর ভবিষ্যৎও একদিন বর্তমান রূপে আমাদের চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। তখন যেন তাহাকে হাসিমুখে অভিনন্দন জানাইতে পারি।

একটা কথা আছে, 'শুভস্য শীঘ্রম্', অর্থাৎ শুভ কাজ যত শীঘ্র করা যায় ততই ভাল। প্রতিটি মুহূর্ত ফলপ্রসূ। 'এই কাজের পরিণাম কি হইবে, ইহার কতটুকু ফল আমি পাইব'—কাজ করিবার সময় এই সব চিন্তা করিলে কাজ অগ্রসর হয় না। সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে,—"কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।"

আমাদের দেশে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্মী বা মনীষী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, একটি মুহূর্ত সময়ও তাঁহারা বৃথা অতিবাহিত করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ করিলে সময়ের মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা পাওয়া যায়।

বিখ্যাত মনস্বী বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্লিন ভোরবেলায় ডাকিয়া দিবার জন্য চাকরকে প্রত্যেক দিন একটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিতেন। পাছে এই কথা শুনিয়া কেহ উপহাস করে, তাই তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, এই ভাবে প্রাতঃকালে উঠিবার ফলে তাঁহার যাহা লাভ হইত, তাহার নিকট ঐ সামান্য একটি মুদ্রা কিছুই নয়। এইজন্যই ইংরেজীতে বলা হয় 'Time is money' অর্থাৎ সময়ই যথার্থ ধন।

ইউরোপীয়গণ সাধারণতঃ সময়নিষ্ঠ। আর সেই জন্যই বোধ হয় বর্তমান জগতে তাহারা এত দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে জাতি সময়নিষ্ঠ নয়, তাহার উন্নতি সুদূর-পরাহত।

ছাত্র-জীবন মানব-জীবনের প্রস্তুতির পর্ব। ছাত্র-জীবনে সময়নিষ্ঠ হইতে না পারিলে ভবিষ্যতে আর কোন দিন এই মহৎ গুণটি আয়ত্ত করিতে পারা সম্ভব নয়। সময়নিষ্ঠার প্রধান শত্রু আলস্য, আর এই আলস্যই ছাত্র-জীবনের মারাত্মক ব্যাধি। এই সর্বনাশা ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—অটুট স্বাস্থ্য, দৃঢ় সঙ্কল্প, অলস লোকের সংসর্গ পরিহার।

পূজায় কলিকাতা

কলিকাতার পূজায় সমগ্র বাঙালীর প্রাণোচ্ছ্বাস—সার্বজনীন পূজা, কলিকাতার পূজার বিশেষত্ব—সার্বজনীন পূজার আড়ম্বরের প্রাচুর্য, ভক্তিনিষ্ঠার স্বল্পতা—পূজা অবকাশের প্রস্তুতি, দোকান-পাটের জাঁকজমক—অপরূপ প্রতিমাসজ্জা ও দর্শনার্থীদের শোভা—দেশপর্যটন—পূজা-সাহিত্য—কলিকাতার প্রাণস্পন্দন—উপসংহার।

এক-একটি উৎসবে এক-এক জাতির প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রকাশ। দুর্গোৎসবে সমগ্র বাঙালী জাতির প্রাণসত্তা যে ভাবে প্রবলোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, তেমনটি আর কখনও দেখা যায় না। এই উদ্বেলিত বিপুল প্রাণোচ্ছ্বাস কলিকাতায় পূজার সময় জোয়ারের মতো তরঙ্গায়িত। ইহার প্রাণবন্ত যাদুস্পর্শে ও প্রভাবে বাঙালী অবাঙালী সকলেই প্রাণপ্রাচুর্যে উল্লসিত হইয়া ওঠে। সত্যই পূজায় উৎসবময়ী কলিকাতা উচ্ছ্বাসময়ী, প্রাণময়ী, উন্মাদিনী।

বর্তমানে সামাজিক বিবর্তনের ফলে দুর্গাপূজা গণতান্ত্রিক প্রভাবে সার্বজনীন পূজার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। শহরে ও গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় পূজা-সমিতি গঠন করিয়া সার্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে আমাদের দেশে বারোয়ারী পূজার চল ছিল। গ্রামের বা বাজারের লোকেরা সকলে মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া কালীপূজা, শীতলাপূজা, ইত্যাদি করিত। কিন্তু আধুনিক কালের সার্বজনীন পূজার প্রচলন সম্পূর্ণ নূতন। এখন পারিবারিক পূজা প্রায়ই উঠিয়া যাইতেছে। সার্বজনীন পূজায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দিকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে, এখন প্রাধান্য উৎসবের দিক্‌টায়—মণ্ডপসজ্জায়, আলোকে, মাইকে ও বিচিত্রানুষ্ঠানে। প্রতিমা তৈরীতেও চিরাচরিত রীতির পরিবর্তে সৌন্দর্য ও শিল্পরুচিকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে—শিল্পীর কল্পনা বিচিত্র শিল্প-পদ্ধতির বিভিন্ন আঙ্গিকে মূর্তি পরিগ্রহ করে। পূজাবাড়ীর যাত্রা বা সখের থিয়েটারের পরিবর্তে সিনেমা, পাবলিক থিয়েটার ও যাত্রা আসর জমাইয়া বসিয়াছে।

বর্তমানে শহরের অধিকাংশ স্থানে সার্বজনীন দুর্গাপূজা প্রচলিত। এই সকল সার্বজনীন দুর্গোৎসবে বাহ্য সমারোহই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একই পাড়ায় একাধিক পূজাও হয়। মাইকে ও আলোকমালায়, প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জায়, প্রীতি-সম্মেলনে ও বিচিত্রানুষ্ঠানে কে কাহার উপর বাহাদুরী নিবে, তাহারই উৎকট প্রকাশ দেখা যায়। কোন কোন উৎসব-মণ্ডপে ও বিসর্জনের শোভাযাত্রায় অশালীন ও অভব্য আচরণ পীড়াদায়ক। অতীতের সেই প্রীতি-ঘন অন্তর-সৌন্দর্যের স্পর্শ বিরল। কোথায় সে ভক্তি, প্রীতি, নিষ্ঠা? আছে অন্তঃসার-শূন্য বাহ্যাড়ম্বরের প্রাচুর্য। ইহা জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতার পরিচায়ক কি? ইউরোপীয় বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা উৎসবের প্রাণপ্রবাহকে শোষণ করিয়া একটি কৃত্রিম আবরণ নিক্ষেপ করিয়াছে। যে দুর্গোৎসব বাঙালীর সামাজিক এবং আত্মিক মিলনের সেতু, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই জাতি পুনরায় আপন পুরাতন ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কলিকাতা শহরে দুর্গাপূজার উৎসবের মহাসমারোহের তুলনা নাই। দুর্গাপূজার কিছু পূর্ব হইতেই শহরের সর্বত্র কেবল পূজা পূজা ভাব। স্কুল-কলেজ ও অফিস-আদালত বন্ধ হইবার জন্য উন্মুখ। অবসর ও উৎসবের আনন্দ উপভোগের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ওঠে। সবারই প্রাণে একটা হালকা আমেজ। ব্যবসায়ী মহলও বৎসরের সর্বাপেক্ষা অধিক উপার্জনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিতে অত্যন্ত তৎপর হইয়া ওঠে। বিশেষতঃ জামা-কাপড়ের দোকানগুলি বিচিত্র বস্ত্রসম্ভারে ও চোখ-ঝলসানো আলোক-সজ্জায় মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে।

কলিকাতায় মহা আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত জগজ্জননীর মহাপূজায় সমগ্র বাঙালী জাতি যেন মাতিয়া ওঠে। শহরের প্রতিটি পল্লীতে অপরূপ ঐশ্বর্যশালিনী রণরঙ্গিণী দশভুজা-মূর্তি অপূর্ব রূপসজ্জায় ঝলমল করিতে থাকেন। পূজামণ্ডপ ও প্রবেশপথ বহু-বিচিত্র অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা ও আলোক-স্তম্ভে আলোকোদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। বাদ্যে, গানে, আনন্দধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া ওঠে। পূজামণ্ডপে দেখা যায় বিচিত্র রঙ ও রূপের শাড়ীর মিছিল, মেয়েদের ফ্রকের এক চলমান প্রদর্শনী। সন্ধ্যার পর হইতে প্রতিমা-দর্শনার্থী সুবেশ নরনারী ও ছেলেমেয়েরা দলে দলে রাস্তায় যেন শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হয়। সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় হয় বিসর্জনের শোভাযাত্রা।

এই সময়ে পূজার বন্ধে দলে দলে কলিকাতাবাসী দিন কয়েকের জন্য সমুদ্রতীরে, পাহাড়ে বা পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদল করিতে যান। সে সময়কার দারুণ ভীড় দেখিয়া মনে হয় যেন হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনের ফুটো দিয়া কলিকাতা উধাও হইয়া গেল। গাড়ি, ট্যাক্সি বা রিক্সা চড়িয়া ও পায়ে হাঁটিয়া শহর ভাঙ্গিয়া যাত্রী চলে। এমনি ভীড়ে অকস্মাৎ রাস্তা জাম। এ সময় ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কলিকাতা হইতে যেমন দলে দলে লোক যায়, তেমনি আসেও।

পূজার সময় পোষাক-পরিচ্ছদ, ভোজন ও আমোদ-প্রমোদের মত সাহিত্য-আসরেও দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকার বিশেষ পূজাসংখ্যা ও ছেলেমেয়েদের জন্য পূজা-বার্ষিকীগুলি বাহির হয়। একালে ইহাও পূজার বৈশিষ্ট্য।

যদি কেহ কলিকাতার শোভা দেখিতে চাও এবং তাহার প্রাণস্পন্দনের স্পর্শ পাইতে চাও, তবে পূজায় এখানে আসিও. কলিকাতাবাসীর সহিত তুমিও এই প্রাণবন্যায় ভাসিবে, ডুবিবে, মজিবে। এই সময় দূর দূরান্তর হইতে লোকেরা উৎসব-মুখরিত কলিকাতার শোভা ও আনন্দ উপভোগের জন্য আসেন। পর্যটন-বিভাগের প্রচার-যন্ত্রও এ সময় এজন্য মুখর হইয়া ওঠে। ইহার ফলে কলিকাতার আয় বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রতি বৎসর বাঙালীদের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়, তাহা সঞ্চিত হইলে জাতীয় কল্যাণে বিরাট ধনভাণ্ডার গড়িয়া উঠিতে পারিত।

নববর্ষ উৎসব

উৎসবপ্রিয় বাঙালী—নববর্ষে আশা ও আনন্দ—প্রাচীন ভারতে বৎসর আরম্ভ—পয়লা বৈশাখ ব্যবসায়ীদের হালখাতা—বর্তমানে নববর্ষ জাতীয় উৎসব দিবস—নববর্ষের বাণী, সার্থকতা।

উৎসব মানুষের প্রাণ-প্রাচুর্যের পরিচায়ক। উৎসবের দিনে মানুষ আপন গণ্ডীবদ্ধ আমিত্বকে অতিক্রম করিয়া বহুর সহিত মিলিত হয়। বাঙালী উৎসবপ্রিয় জাতি। বাঙালীর বার মাসে তেরো পার্বণ লাগিয়াই আছে। কোনো একটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালী উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠে। এই সকল বিভিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়া বাঙালীর মানবিকতা প্রকাশ পায়। নিজের আনন্দ অন্য সকলের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া নিজে আনন্দিত হওয়া—এই বাসনাতেই বাঙালী দোল-দুর্গোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া কবি, দেশব্রতী প্রভৃতি বরণীয় ব্যক্তিদের জন্মদিন, গৃহ-প্রবেশ, ঋতু-পরিবর্তন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া দেশের আকাশ-বাতাস মুখর করিয়া তোলে। নববর্ষ তেমনি বাংলাদেশের একটি উৎসব।

পুরাতন বৎসরের অবসান—পুরাতন বৎসরের হতাশা-বেদনা, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া মানুষ নূতন আগ্রহে, নূতন আশায় নববর্ষকে বরণ করে। বৎসরের প্রথম দিনটিতে মানুষের মনে নানা আশা ও আনন্দের বাণী লইয়া আসে। উত্থান-পতন, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনায় ভরা মানব-জীবন—তবুও মানুষের আশাবাদী মন দুঃখ-বেদনার স্মৃতি ভুলিতে চেষ্টা করে। নববৎসরের নবীন সূর্য বিগত বৎসরের গ্লানি হতাশা-বেদনা বিদূরিত করিয়া জীবনকে সফল করিয়া আনন্দের সিংহদ্বারে উত্তরণ করিবে, এই প্রত্যাশাতেই বিপুল আনন্দে মানুষ নববর্ষকে বরণ করে, নূতন উদ্দীপনায় সে যেন নূতন প্রাণ পায়। তাই নূতন বৎসরের প্রথম দিনটি মানুষের উৎসবের দিন।

প্রাচীন ভারতে অগ্রহায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন মাসে বর্ষারম্ভ হইত। বাংলাদেশে বর্তমানে পয়লা বৈশাখ হইতে নববর্ষ গণনা করা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির রাত্রিশেষে পুরাতন বৎসরের অবসান হয়, নবীন আশা ভরসা ও প্রত্যাশা লইয়া নববর্ষের প্রভাত আসে।

এতকাল পয়লা বৈশাখে প্রধান উৎসব ছিল হালখাতা। ব্যবসায়ীদের দোকানে দোকানে হালখাতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুরাতন বৎসরের হিসাব মিটাইয়া দিয়া ব্যবসায়ী নূতন-খাতার উদ্বোধন করে। পূর্বদিন দোকান ঝাড়িয়া মুছিয়া ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং নববর্ষের দিন সকাল হইতেই আম্রপল্লব, কদলীগাছ ও মঙ্গলঘট দ্বারা সজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যাবেলায় প্রতিটি দোকান অলোকসজ্জায় ঝলমল করিতে থাকে, রেডিও বা গ্রামোফোনে গান বাজিতে থাকে। ক্রেতাগণ দলে দলে দোকানে আসিতে থাকেন। দোকানীর সে দিন ক্রেতার সহিত পণ্যবিনিময়ের সম্পর্ক নয়, হালখাতার দিনে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সহৃদয়তা ও সহযোগিতার সম্পর্ক। সেদিন দোকানে বেচাকেনার সঙ্গে হৃদয়-বিনিময়ের মাধ্যমে দোকানী পরম আশ্বাস লাভ করেন—আশা করেন নূতন বৎসরে

তাঁহার ব্যবসায় নূতন রূপে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। অভ্যাগত ও শিশুদের কলকাকলিতে এবং তাহাদের আপ্যায়নে দোকান মুখরিত হইয়া উঠে।

পয়লা বৈশাখ গ্রামে এবং শহরের অনেক জায়গায় মেলা বসে। তাহাতে কেনাবেচার সঙ্গে অনেক রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিকট এই মেলার বড় আকর্ষণ।

বর্তমান কালে নববর্ষ উৎসব শুধু ব্যবসায়ীদের হালখাতা উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। বর্তমানে ইহা জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। এখন নগর ও পল্লীর প্রতিটি গৃহে, ক্লাবে, লাইব্রেরীতে, বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন সংস্থায় নববর্ষ উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। নববর্ষের প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতফেরীর মধুর ঐকতান বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। ছেলে-মেয়েরা নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া নির্দিষ্ট ক্লাব, লাইব্রেরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। পতাকা উত্তোলন, সম্মিলিত ব্যায়াম, ব্যাণ্ডসহ প্যারেড, বক্তৃতা, নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি দ্বারা উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া ওঠে। বড় বড় শহরে ছেলেমেয়েরা এই উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত পালন করে। সন্ধ্যাবেলায় বিভিন্ন স্থানে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাচ, গান, অভিনয়ে উৎসব পূর্ণতা লাভ করে। এই দিনটি সকলেই একটু ভাল ভাবে কাটাতে চান—একটু ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাবনাহীন আনন্দে দিন যাপন করা সবারই কাম্য হয়। আশাবাদী মানুষ নববর্ষ উৎসবের মাধ্যমে আগামী দিনের সুখশান্তি কামনা করে, নূতন সংকল্প ও ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করে, নূতন কর্মসূচী অবলম্বন করে।

নববর্ষের দিনটি প্রতিদিনের মতো একটি সামান্য দিবস নয়। এই দিনটিতে আমরা শুধু নিজেকে লইয়া থাকিতে পারি না, আমরা বিশ্বমানবের সহিত, বিশেষতঃ স্বদেশের সকল মানুষের সহিত মিলিত হইবার প্রয়াস পাই। এখানেই নববর্ষ-উৎসবের যথার্থ সার্থকতা। নববর্ষের দিনে বিশ্বদেবের নিকট আমাদের প্রার্থনা, "যে মস্তকে তোমার প্রভাত-কিরণ বর্ষিত হইল সে মস্তককে লজ্জা ও হীনতার অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া তোমারই পূজায় প্রণতি করি।" (রবীন্দ্রনাথ)। এই দিনেই তাই কবির কণ্ঠে উৎসারিত হইয়াছিল নবযুগের এই বাণী—

নব বৎসরে করিলাম পণ, লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রয়ে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর-চরিত্র সকলের আদর্শ—জন্ম ও পরিচয়—শৈশব, শিক্ষালাভ, প্রতিভার পরিচয়—কর্মক্ষেত্র—স্বাধীন ব্যবসায়ে—সাহিত্য ও সমাজ-সেবায়—দীনের বন্ধু, বিধবা-বিবাহ—চরিত্র-সমালোচনা—পর্বত-প্রমাণ চরিত্র-মাহাত্ম্য—বঙ্গারণ্যে বনস্পতি—তাঁহার চরিত্র জাতীয় তীর্থ—অজেয় পৌরুষ—বিদ্যাসাগর-চরিত্র অনুসরণই বর্তমানে বাঁচিবার পথ।

বিগত দেড় শত বৎসরে এদেশের মাটিতে বহু প্রতিভাশালী মনীষী ও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ন্যায় দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের আদর্শ পুরুষ বেশি দেখা যায় নাই। ছাত্র বল, শিক্ষক বল, কর্মচারী বল, ব্যবসায়ী বল, সমাজ-সেবক ও দেশ-নেতা বল, বিদ্যাসাগর সকলেরই আদর্শ। কেবল বিদ্যা নয়, দয়া নয়, মাতৃভক্তি নয়, সমাজ-সেবা নয়, বিদ্যাসাগর তাঁহার পৌরুষ, তেজস্বিতা ও মহোন্নত মনুষ্যত্বের জন্য চিরস্মরণীয় থাকিবেন।

বিদ্যাসাগর ১২২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন তারিখে (১৮২০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতামহের নাম রামজয় তর্কভূষণ এবং জননী ভগবতী দেবী।

তিনি জননীর কোমলতা ও পিতামহের তেজস্বিতা পাইয়াছিলেন। পিতার কর্মক্ষেত্র কলিকাতা তাঁহাকে নিভৃত পল্লীগ্রাম হইতে বৃহৎ জগতে টানিয়া আনে।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ঈশ্বরচন্দ্র গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। আট বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতার সঙ্গে কলিকাতা গমন করেন; তখন এদেশে রেলগাড়ীর প্রবর্তন হয় নাই। বাড়ী হইতে তিনি কলিকাতা পর্যন্ত পদব্রজে গিয়াছিলেন। পথে মাইল-পোস্টের নম্বর দেখিয়া পিতার নিকট উহার মর্ম বুঝিয়া পথিমধ্যে ইংরেজী এক হইতে দশ পর্যন্ত অঙ্ক শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতা আসিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি পাঠ সমাপ্ত করেন। কলেজে শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় বালক বিদ্যাসাগর স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে খাওয়াইতেন।

সংস্কৃত কলেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তিনি একুশ বৎসর বয়সে অতি সামান্য বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' নামক একখানি বাংলা পুস্তক লিখেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন এবং কালক্রমে এই কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার

সাহেবের সহিত মতভেদ হওয়াতে তিনি অল্প দিন পরেই পদত্যাগ করেন। (১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ)। ইহার পর তিনি স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। স্বরচিত গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য ছাপাখানা ও দোকান স্থাপন করেন। ছাপাখানার 'কেসে' অক্ষর সন্নিবেশেরও তিনি সংস্কার করেন, উহা এখনও 'বিদ্যাসাগরী সাট' নামে পরিচিত। পুস্তকের ব্যবসায় হইতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত এবং উহাই তাঁহার বিপুল দানভার বহন করিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিক্ষিতদের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করা এবং বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা দ্বারা মধ্যবিত্তদের সঞ্চয়-ব্যবস্থা ও অর্থ লগ্নির সুযোগ করিয়া দেওয়া বিদ্যাসাগরের নূতন দান।

তাঁহার 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি পুস্তক বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ। তিনি বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' ও 'ঋজুপাঠ' প্রভৃতি পুস্তক কঠিন সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ-পথ সুগম ও সহজসাধ্য করিয়াছে।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক। বস্তুতঃ, "তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নয়, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছিলেন।"

—রবীন্দ্রনাথ

রাজা রামমোহন রায়ের পরে বিদ্যাসাগরই এদেশে শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক। বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগর অত্যন্ত জেদী ছিলেন। এই অসাধারণ মনের বলই সেকালের বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারে ও শিক্ষাবিস্তারে যোদ্ধার সাহস ও শক্তি দিয়াছিল। বিদ্যাসাগর দীন-দুঃখীমাত্রেরই আশ্রয়স্থল ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়া কেহ বিফলকাম হয় নাই। বাল-বিধবাদিগের প্রতি অমানুষিক নির্যাতনে মর্মাহত হইয়া তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন এবং ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহারই প্রচেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। তিনি নিজের পুত্রকে একটি বিধবার সহিত বিবাহ দেন। বিদ্যাসাগর নিজে লিখিয়াছেন, "বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ম।" নিজে চেষ্টা করিয়া ও অর্থব্যয় করিয়া তিনি বহু বাল-বিধবার বিবাহ দেন। তিনি নিজব্যয়ে স্বগ্রামে ও দেশের বহু স্থানে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। কলিকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) তাঁহারই অর্থে ও পরিশ্রমে স্থাপিত। শিক্ষার বিস্তার, বিশেষতঃ মেয়েদের শিক্ষার জন্য দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন তাঁহার জীবনে যেন নেশার মত ছিল।

বিদ্যাসাগর ১২৯৭ সালে ১৩ই শ্রাবণ (১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে ২৯শে জুলাই) সত্তর বৎসর বয়সে রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"তিনি নিজের মধ্যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথবা পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি।"

বিদ্যাসাগর এই বঙ্গারণ্যে মহামহীরুহের মতো উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, বনস্পতির মতো সকলের স্ব-নির্ভর আশ্রয়। তাঁহাকে যদি আমরা অনুসরণ করিতে পারি, তবে আমরা আবার উঠিব। তাঁহার বলিষ্ঠ চরিত্র যদি আমরা অর্জন করিতে পারি, তবে আমরা শতচ্ছিন্ন হইয়াও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব। তাঁহার কর্মশক্তি, স্বাবলম্বন, স্বাধীনচিত্ততা, তেজস্বিতা, মহাপ্রাণতা যদি বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে পারি, তবে জগতে অজেয় হইব ও অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিব। আজিকার দিনে বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন আমাদের সবচেয়ে বেশি, তাঁহার সবল হস্ত আমাদের সকল ক্ষুদ্রতা ও দুর্নীতি সবলে দূর করিয়া দিবে। আজ বিদ্যাসাগরকে চাই—তাঁহার মহোন্নত মনুষ্যত্ব ও মহোজ্জ্বল সাহিত্য-সৃষ্টি উভয়ই আমাদের তরুণদের জীবনগঠনে সহায়ক হইবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র

বংশ-পরিচয়—বিদ্যাশিক্ষা—জীবন-সংগ্রাম ও বিজ্ঞান সাধনা—আচার্যের বিভিন্ন আবিষ্কার—বেতার-বার্তার প্রথম উদ্ভাবক—উদ্ভিদ্-তত্ত্বের গবেষণা—স্বনির্মিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র—প্রাচ্যের যাদুকর—গবেষণার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি—বসু-বিজ্ঞান-মন্দির—স্বদেশ-প্রেম।

ভারতের যে সকল মনীষী বিশ্বজগতে স্বদেশের নাম গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য জগদীশ অন্যতম।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্রের জন্মকালে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইঁহাদের পৈত্রিক নিবাস ছিল ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রাঢ়িখাল গ্রামে। ভগবানচন্দ্র উদ্যোগী, কর্মিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। পিতার জীবনব্যাপী ব্যর্থ প্রচেষ্টা জগদীশচন্দ্রের জীবনে এক মহাশিক্ষা প্রদান করে, ইহাই জগদীশচন্দ্রকে জীবন-সংগ্রামে নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ করিয়া তোলে।

শৈশবে বাংলা স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতার সেণ্ট-জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে এই বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং দুই বৎসর পরে সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। ইহার পর ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায়ও বিজ্ঞান-শাখায় দ্বিতীয় বিভাগেই উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থ জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন। কিন্তু কালাজ্বরের আক্রমণে বাধ্য হইয়া তিনি ডাক্তারি পড়া পরিত্যাগ করিলেন। এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-বিভাগে ভর্তি হইলেন। জগদীশচন্দ্র এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'ট্রাইপস্' (Tripos) এবং উক্ত সময়েই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বি. এস্‌সি.' উপাধি লাভ করেন। এইরূপে বিদেশের শিক্ষা সমাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এখন হইতে জগদীশচন্দ্রের জীবনে প্রকৃত সাধনা ও সংগ্রাম আরম্ভ হইল। জগদীশচন্দ্র প্রতিদিন কলেজের অধ্যাপনা সমাপ্ত করিয়া বিজ্ঞানাগারে নিবিষ্টচিত্তে গবেষণায় ব্রতী হইলেন। সেকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের বীক্ষণাগার উচ্চ বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী ছিল না। কিন্তু স্থিরসঙ্কল্প জগদীশচন্দ্র কোন বিঘ্নকে বিঘ্ন বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন না। অবিচলিত অধ্যবসায়ের ফলে অল্পকাল মধ্যেই মৌলিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার গবেষণার জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডি. এস্‌সি.' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ইতঃপূর্বে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান 'রয়েল সোসাইটি' সুষ্ঠুরূপে গবেষণা-কার্য পরিচালনার জন্য তাঁহাকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক গবেষণাতেই নিরত ছিলেন এবং বেতার বার্তাবহ যন্ত্রের উদ্ভাবনে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে মূক-উদ্ভিদ-জীবনই তাঁহার প্রধান গবেষণার বিষয় হয়।

উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়ার স্থূলকথা এই যে, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্বের ভিত্তিমূল অভিন্ন এবং বৃক্ষ-জীবন মানবীয়-জীবন একই নিয়মে চলে। জগদীশচন্দ্রের নিজের আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফ বা বৃদ্ধিমান যন্ত্রে বৃক্ষের গতি নির্ধারণ এবং রেজোনাণ্ট রেকর্ডার বা সমতাল-যন্ত্রে বৃক্ষের স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইয়া এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করিয়াছে।

এই উদ্ভিদ্-তত্ত্বের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জগদীশচন্দ্র অনেক বার য়ুরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সমাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত ও আহূত হইয়া সেখানে গমন করিয়াছিলেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো (সভ্য) বা এফ. আর. এস. রূপে গণ্য হন।

এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যথোপযোগী কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় জগদীশচন্দ্র ইহার প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেন। এই অভাব দূরীকরণার্থ ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে তিনি 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান তাঁহার সঞ্চিত ও সংগৃহীত অর্থে স্থাপিত হয়। এই বিজ্ঞান-মন্দির জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি, আমাদের

জাতীয় গৌরব এবং জগতের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর মহাতীর্থ। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিকল্পনা, সংগঠন ও আভ্যন্তরিক শোভা পরম রমণীয়।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার কথা বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার জীবনের আর এক প্রধান বিশেষত্ব ছিল তাঁহার মাতৃভাষা-প্রীতি ও স্বদেশ-প্রেম। জগদীশচন্দ্র আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার বাংলা রচনা প্রাঞ্জল, ভাবাঢ্য ও কবিত্বপূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন—

"যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুৎ করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতির স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে?"

স্বামী বিবেকানন্দ

জাতীয় সংকটকালে বীর সন্ন্যাসীর আবির্ভাব—বাল্য-জীবন ও বিদ্যাশিক্ষা—রামকৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ—রামকৃষ্ণ-শিষ্য—পরিব্রাজক, ভারত-কল্যাণের সঙ্কল্প—আমেরিকার ধর্ম-মহাসভায়—জন-সেবা, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ—দেহত্যাগ—যোগ্য শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা—তেজোদীপ্ত ভাষা—অবদান।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদল তরুণ ভারতীয় বিদেশী চিন্তাভাবনায় উন্মাদনায় ঐতিহ্যভ্রষ্ট হইয়া জাতির দেহে মনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। দেশ এবং জাতির এই চরম সংকটকালে এক তেজস্বী মহামানব ভারতবাসীকে জড়তা ত্যাগ করিয়া আপন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন,—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। উঠ, জাগো, উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হও।" এই কালজয়ী জাতীয়তাবাদী বীর সন্ন্যাসীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের চরম সংকটে বিবেকানন্দের শুভ অভ্যুদয় দেশ ও জাতির পক্ষে এক পরম আশীর্বাদ। এদেশে স্বাধীনতার প্রেরণাদান এই জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে উত্তর কলিকাতার শিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম জীবনের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণত্ব সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অপরিমেয়। নরেন্দ্রনাথের সুন্দর সুঠাম চেহারা, সুধাকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব সকলকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিত। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর জেনারেল এসেম্বলীজ কলেজ হইতে তিনি সম্মানের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন।

ছাত্র জীবনেই তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, ধর্ম ইত্যাদির সহিত পরিচয় হইয়াছিল। এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরের পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা

তাঁহার কর্ণগোচর হইল। বন্ধুবান্ধবদের সহিত একান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই তিনি এই সাধুকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য দর্শনে বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ প্রথমে রামকৃষ্ণের সাধনাকে অবিশ্বাস্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে কি এক অজানা আকর্ষণ-শক্তি ছিল। সেই শক্তির আকর্ষণে নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁহাকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। পরে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস-জীবনের নাম হইল স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকের বেশে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতের দারিদ্র্য-নিপীড়িত, অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের প্রকৃত স্বরূপ তিনি এই সময় প্রত্যক্ষ করেন এবং ভারতের দৈন্য দূরীকরণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে এক ধর্ম-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। একমাত্র হিন্দুধর্মের কোন প্রতিনিধিকে এখানে আহ্বান করা হয় নাই। বিবেকানন্দ নানা চেষ্টা করিয়া, নানা লোকের অর্থ সাহায্যে চিকাগো নগরে অনাহূত ভাবে উপনীত হইলেন এবং তিন মিনিটের জন্য বক্তৃতা করিবার অনুমতি লাভ করিলেন। "হে আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ" বলিয়া বক্তৃতারম্ভে স্বামীজী যখন উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন, আমেরিকাবাসী সকলে তুমুল করতালি দ্বারা তাঁহাকে সাদর অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। এই সভায় তিনি ভারতীয় ধর্মের চিরন্তন বাণী প্রচার করিলেন। বিবেকানন্দের মুখে ভারতীয় ধর্মের উদার ব্যাখ্যা শুনিয়া বহু পাশ্চাত্য নর-নারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি ইউরোপের বহু দেশ পর্যটন করিয়া বেদান্তের বাণী প্রচার করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া (১৮৯৭) তিনি গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। শুধু ধর্ম-সাধনা এবং আত্মোন্নতি বিবেকানন্দের আদর্শ ছিল না। তিনি স্বদেশের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

'বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥'

অজ্ঞ ও অস্পৃশ্য জনগণের সেবা ভগবানের সেবা। এক দল সেবাব্রতী সন্ন্যাসীদ্বারা তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিয়া এই সেবাব্রতের আদর্শ প্রচার করিলেন। ভারতের তরুণদলকে ত্যাগমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিলেন। বিবেকানন্দ মানব-প্রেমিক হইয়াও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। স্বদেশের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের জন্য, স্বদেশের উন্নতির জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। ঐক্য ও সাম্যের বাণী প্রচার করিয়া স্বামীজী লিখিলেন, "হে ভারত, ভুলিয়ো না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী,

দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" এই উদাত্ত বাণী দেশবাসীকে সেবাধর্মে ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

সেবাধর্মের প্রেরণায় তিনি দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন, বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিয়াছেন। এই ভাবে বিভিন্ন সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ এবং অন্যান্য পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে এই কর্মযোগী সাধকের দেহাবসান ঘটে।

নারীজাতির কল্যাণ ও উন্নতির জন্যও তিনি আমরণ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এক-পক্ষ পক্ষীর উড্ডয়ন যেরূপ সম্ভবপর নয়, নারীকে বাদ দিয়া কেবল পুরুষদের উন্নতিতেও জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ—গার্গী, মৈত্রেয়ীর মহৎ জীবনের আদর্শ তিনি নারীজাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার তেজস্বিনী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে তাঁহার এই চেষ্টার সার্থক প্রকাশ দেখা যায়।

বিবেকানন্দ মাতৃ-ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পত্রাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার সাহিত্য-সেবার নিদর্শন। তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা যেন তাঁহার ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া উহাকে তেজোদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে আদর্শ এবং কর্মচেতনা জাতির জীবনে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাহা অনাগত দিনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে এবং যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসীকে কল্যাণব্রতে প্রেরণা দিবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব পরম বিস্ময়—বাল্য-জীবন ও শিক্ষা—অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান—পত্রিকা সম্পাদন ও স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন—দুই বার কংগ্রেস-সভাপতি—রাজবন্দী ও অন্তর্ধান—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনী গঠন—'দিল্লী চলো'—অসাধ্য-সাধন—সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, অবদান, রহস্যময় অবসান।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই গৌরবময় শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইল আরও একটি মহিমদীপ্ত জীবন—যাঁহার শৌর্য, বীর্য, কর্মসাধনা ও ত্যাগ শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বে বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ইনি প্রবাদতুল্য বীর পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল তেজোময় জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়।

ইংরেজী ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক শহরে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্রের পিতৃভূমি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রাম। পিতা জানকীনাথ বসু কটকের এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। অসাধারণ মেধার অধিকারী

সুভাষচন্দ্র ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি সকলের অগোচরে গৃহ-ত্যাগ করেন এবং বহু তীর্থ পর্যটন করিয়া উপযুক্ত গুরুর সন্ধান না পাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নকালে তিনি ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন সাহেবের অসঙ্গত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করাতে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হন এবং পরে স্কটিশ-চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন এবং আই. সি. এস. পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গমন করেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আই. সি. এস. পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিদেশে অধ্যয়নকালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বাংলার বীর-সন্তান সুভাষচন্দ্র দেশমাতৃকার এই সংকটে স্থির থাকিতে পারিলেন না। সরকারী উচ্চপদের মোহ ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের আন্দোলনে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দিলেন এবং কারাবরণ করিলেন। কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু-পরিচালিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করিলেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তিনি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে সরকার তাঁহাকে পুনরায় কারারুদ্ধ করে। এই সময়েই তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নিযুক্ত হন। কিন্তু ব্রিটিশ-সরকারের দমন-নীতির পেষণে তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। পুনঃ পুনঃ কারাবাসের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সরকারের অনুমতি পাইয়া স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়। বিপ্লবী সুভাষ ব্রিটিশ সরকারের নিকট কখনও মাথা নত করেন নাই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিবার কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসের সদস্যদিগের সহিত মত ও পথের বৈষম্য হওয়াতে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন, কংগ্রেসের আপোষমূলক মতবাদ তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। সুভাষচন্দ্রের সমুন্নত বিরাট ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তির ছায়া কোন কালেই আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তিনি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে স্বতন্ত্র দল গঠন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি 'মহাজাতি সদন' প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সরকার সুভাষচন্দ্রকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করেন এবং স্বগৃহে অন্তরীন করিয়া রাখেন। সহসা ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র কলিকাতার এলগিন রোডের বাসভবন হইতে অন্তর্হিত হন। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের বিভীষিকা তখন পৃথিবীব্যাপী মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ইংরেজের প্রাণে আশঙ্কা এবং ভারতবাসীর মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিল।

সুভাষচন্দ্র সকলের তথা সরকারের সদা সচেতন চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে জিয়াউদ্দীন নামে মূক-বধিরের বেশে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত কাবুলের পথে জার্মানীতে উপনীত হইলেন। মালয়, ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুর তখন জাপানের করতলগত। সুভাষচন্দ্র জার্মানী হইতে সাবমেরিন বা ডুবো জাহাজে জাপান হইয়া সিঙ্গাপুরে আসিলেন এবং জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ভারতীয় অধিবাসী ও সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করিয়া 'আজাদ-হিন্দ্-বাহিনী' গঠন করিলেন। এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার সৈন্যদের লইয়া দেশের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য জীবন পণ করিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ও পর্যুদস্ত ভারতীয় জনগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া অসাধারণ নেতৃত্বশক্তির বলে তিনি যে জাতীয় সমর-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তিনি যথার্থ-ই নেতাজী ছিলেন। জীবন পণ করিয়া তাঁহার সেনাবাহিনীকে লইয়া দুশ্চর ব্রত-সাধনার পথে অগ্রণী হইয়াছেন। দুর্গম পথ, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, সুবিশাল সমুদ্র এবং অপরাজেয় মার্কিন ও ইংরেজ-শক্তি—কিছুই তাঁহার দুর্দমনীয়তাকে বাধা দিতে পারে নাই। আপন সংকল্পে অচল অটল নেতাজী নিয়তই আপন লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। 'দিল্লী চলো'—এই ধ্বনি ছিল আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর জপমন্ত্র। ব্রহ্ম-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোহিমায় নেতাজী তাঁহার সৈন্যগণের সহায়তায় স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের' মাধ্যমে নেতাজী হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রাদেশিকতা অপসারণ করিয়াছেন। এক মহাভারতবর্ষের সন্তান হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ ছিল—'স্বাধীনতা', দিল্লীর লালকেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকার উত্তোলন।

আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে, বাংলার বিপ্লবী সন্তান সুভাষচন্দ্রের মহতী বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে। নেতাজীর অসাধারণ সামরিক শক্তির অভ্যুত্থান ইংরেজের ভারতত্যাগ ত্বরান্বিত করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। নেতাজী'র বিস্ময়কর জীবন, অসাধারণ নেতৃত্বশক্তি, দুর্জয় সাহস অনমনীয় প্রতিজ্ঞা এবং কঠোর আত্মত্যাগ ভারত-ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় নেতাজী যথার্থ ই এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক সমর-নায়ক। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের এক বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজী প্রাণ ত্যাগ করেন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার রহস্যময় ভারত ত্যাগের ন্যায় তাঁহার অন্তর্ধানও রহস্যময়। আমাদের শোকতপ্ত হৃদয়ে সুভাষচন্দ্র চির অমর। ভারত-ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে তাঁহার ন্যায় স্বচ্ছদৃষ্টি শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব আমাদের জাতীয় জীবনকে অভূতপূর্ব গৌরবে ও সাফল্যে মহোজ্জ্বল করিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার উত্তারাধিকার

অহিংসার বাণী-বাহক—জন্ম, বংশ-পরিচয়, শিক্ষা—দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—কংগ্রেসে যোগদান—অসহযোগ আন্দোলন—লবণ আন্দোলন—'৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন—ভারতের স্বাধীনতা লাভ—অহিংসার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ—সত্যাগ্রহ, উপবাস নূতন অস্ত্র—অহিংসার পথে সকল সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা—বই, পত্রিকা প্রকাশ—মহাত্মারূপে, রাষ্ট্রনেতারূপে জগৎখ্যাতি—ভারত-রাজনীতিতে গণ-সংযোগ গান্ধীজির দান।

ইউরোপের একজন মনীষী বলিয়াছেন,—"গান্ধীজির কথা মনে পড়িলে যীশু-খ্রীস্টের কথা মনে হয়।" সত্যই যীশুর মত গান্ধীজির মনে কোন হিংসা ছিল না, কোন দ্বেষ ছিল না, অর্থ-প্রতিপত্তির প্রতি দৃষ্টি ছিল না। বাক্যে, কার্যে ও চিন্তায় তিনি ছিলেন অহিংসার প্রতীক ও বাণী-বাহক।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দর নামক স্থানে গান্ধীজীর জন্ম হয়। গান্ধীজির পুরা নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁহার পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী, মাতার নাম পুতলী বাঈ। বাল্যকালে তিনি একটি নম্রস্বভাব সাধারণ বালক ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য তিনি বিলাত যান এবং ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। এই সময়ে এক জন ভারতীয় বণিকের বৈষয়িক প্রয়োজনে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে গমন করেন এবং উহাই তাঁহার কর্মক্ষেত্র হয়। নাটালে শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয় ও স্থানীয় কৃষ্ণকায়দের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করিত। গান্ধীজি কুড়ি বৎসর নাটালে থাকিয়া এই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন (Passive Resistance Movement) পরিচালনা করেন।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজি ভারতে আগমন করেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা-লব্ধ পদ্ধতি ও অহিংসা-নীতি ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রয়োগ করেন। প্রথমে তিনি বিহারের চম্পারণ জেলায় নীল-ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষীদের সংঘবদ্ধ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। এই ভাবে গান্ধীজি জনসাধারণের দরদী বন্ধুরূপে পরিচিত হন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজির নেতৃত্বে ইংরেজের শাসন দূর করিবার হাতিয়ার-রূপে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পরই সমগ্র ভারতে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল জাতীয় আন্দোলন তরঙ্গায়িত হইয়া ওঠে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য এই সময়কার তাঁহার 'ডাণ্ডি-অভিযান' এক ঐতিহাসিক ঘটনা। উহার ফলে আসমুদ্র হিমাচল জাতীয় আন্দোলনে উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

এই সময় ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার জন্য ইংরেজ সরকার লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন, কিন্তু গান্ধীজি সেই সম্মেলন হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

ইহার পর ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধের সময় ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগস্ট গান্ধীজি 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকার কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। প্রবল আগস্ট আন্দোলনের ফলে ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল নড়িয়া ওঠে। পুনায় আগা খানের প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় গান্ধীজির সুযোগ্যা সহধর্মিণী কস্তুরবা পরলোক গমন করেন।

অবশেষে মহাযুদ্ধ-শেষে ইংরেজকে ভারত-ত্যাগ করিতেই হইল, কিন্তু ইংরেজের কূটবুদ্ধি ও এক দল ভারতীয় নেতার আগ্রহাতিশয্যে গান্ধীজির অমত সত্ত্বেও ভারত দ্বিখণ্ডিত হইল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জন্ম হইল খণ্ডিত স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের। স্বাধীনতার অল্প পরেই ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে গান্ধীজি প্রার্থনা সভায় যাইবার সময় নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে নামক এক যুবকের হস্তে পিস্তলের গুলিতে নিহত হন। এই ভাবে একটি ভাবাঢ্য কর্মময় মহাজীবনের অবসান ঘটিল, অবসান ঘটিল একটি ঘটনাবহুল মহাযুগের মূর্ত বিগ্রহের।

বহু শতাব্দীর পর অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী আবার মহাত্মার মুখে নূতন প্রেরণা লইয়া উচ্চারিত হইয়াছে। গান্ধীজি বলিয়াছেন, জগতে এমন কোন কাজ নেই যাহা অহিংসার দ্বারা সাধিত না হইতে পারে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অহিংসার প্রয়োগে সাফল্য অর্জন করা যায়। তাঁহার নিকট এই মত সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সর্বোত্তম এই মতের কাছে তিনি নিজেকে পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। গান্ধীজি তাঁহার এই নীতি বিরাট্‌ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করিয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজ-দেহের রক্ত-ক্ষয়ী ব্যাধি, উহা দূরীকরণের জন্য হরিজন আন্দোলন মহাত্মাজীর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে অস্পৃশ্যতা নিবারণকে উপরে স্থান দিয়াছিলেন।

অহিংসার সাধনায় তিনি নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি অনেক বার সত্যাগ্রহ করিয়া বিভিন্ন আন্দোলনে সফলতা লাভ করিয়াছেন। দিল্লীতে একবার হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হয়। উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গান্ধীজি ২১ দিন উপবাস করিয়াছিলেন। তিনি দেশবাসী হইতে নিজেকে ভিন্ন করিয়া দেখেন নাই, তাই দেশবাসীর অপরাধকে নিজের অপরাধ মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার পূজারী। সত্য ও অহিংসা তাঁহার জীবনসর্বস্ব। উহাই তাহার নিকট মুখ্য, রাজনীতি গৌণ। তিনি লিখিয়াছেন, "সত্যই ভগবান,

সত্যের সেবার জন্য আমি রাজনীতি করি।" তিনি নিজের জীবন দিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং মানব-সেবাকেই সত্যোপলব্ধির পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজি ইংরেজীতে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' 'হরিজন' পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। তাঁহার ইংরেজী লেখা অতিশয় প্রাঞ্জল ছিল। তাঁহার 'আত্মকথা' একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ।

তিনি শুধু মহাত্মা নন, তিনি রাষ্ট্রীয় নেতা। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে অহিংস পন্থার অনুশীলনের জন্য গান্ধীজি সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অহিংসা নীতি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁহাকে এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া পরিচিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় যোগের ভিতর দিয়া তাঁহার সকল সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজি প্রাণ দান করিয়াছেন, উহার চলিবার গতি দিয়াছেন। তাঁহার স্পর্শে ভারতের জন-জীবনের স্রোতধারা নির্ঝরিণীর মত পাষাণ ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে। ভারতের রাজনীতিতে জন-সংযোগ গান্ধীজির বড় দান।

জওহরলাল নেহেরু

প্রস্তাবনা—বংশ-পরিচয়, শৈশব-শিক্ষা—বিদেশে শিক্ষা—ব্যারিস্টারি—রাজনৈতিক জীবন শুরু, হোমরুল আন্দোলন—জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড—মহাত্মাজীর আন্দোলনে—কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, কারাবরণ—স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁহারা নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদ শহরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বিখ্যাত ধনী আইনজীবী ছিলেন। পিতামাতার একমাত্র পুত্র জওহরলাল। ধনীর পুত্র শৈশবে ও কৈশোরে নানা রকম বিলাস ও ব্যসনের মধ্যে জীবন-যাপন করেন। পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারে মতিলাল ইংরেজী পন্থা অবলম্বন করেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মতিলাল সপরিবারে বিলাত যান। ইংলণ্ডের হ্যারো স্কুলে তখন অভিজাত পরিবারের ছেলেরাই শুধু পড়িবার সুযোগ পাইত। জওহরলাল হ্যারো স্কুলে পড়া-শুনা করিতে থাকেন।

হ্যারোর পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনার্স গ্রাজুয়েট হন এবং ব্যারিস্টারি পড়েন।

তেইশ বৎসর বয়সে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে জওহরলাল দেশে ফিরিয়া আসেন এবং খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী পিতার সান্নিধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। জওহরলালের পিতা স্বাধীনতাকামী হইলেও নরমপন্থী ছিলেন। পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত জওহরলাল তখনও মুক্তি-পথের সন্ধান পান নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে বাল গঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীতে 'হোমরুল আন্দোলন' চলে এবং জওহরলাল তাহাতে যোগদান করেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জওহরলালের সাক্ষাৎ ঘটে। গুরু-শিষ্যের এই প্রথম সাক্ষাৎ ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করে।

দেশে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয়গণকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখার উদ্দেশে এই সময়ে ইংরেজ সরকার 'রাওলাট অ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন। ভারতবর্ষে এই আইন লইয়া ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের এক সভায় ইংরেজ সরকার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালায় এবং বহু লোককে হত্যা করা হয়। তখন জাতীয় কংগ্রেস এক তদন্ত-কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি তদন্ত করিবার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকারীরূপে জওহরলালও কাজ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এই সময় হইতেই তিনি ভারতবর্ষকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ লাভ করেন।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইল। এই সময়ে জওহরলাল ও তাঁহার পিতা কারাবরণ করেন। পরে বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে তাঁহাকে আবার এক বৎসর নয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে জওহরলাল ইউরোপে যান। সেখানে ব্রুসেল্সে তখন বিশ্ব-নির্যাতিতদের সম্মেলন হয়। জওহরলাল তাহাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-রূপে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে আইনস্টাইন, রোমাঁ রোঁলা, মাদাম সানইয়াতসেন প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কংগ্রেসের সাধারণ-সম্পাদকরূপে কাজ করিতে থাকেন এবং পরের বৎসরের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জওহরলাল ছয় মাস কারাবরণ করেন। মুক্তি পাইবার পর কৃষক সম্মেলনে বক্তৃতার জন্য আবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার স্ত্রী কমলা নেহেরু পরলোক গমন করেন।

কারাজীবনে জওহরলাল 'আত্মজীবনী', 'ভারত আবিষ্কার' প্রভৃতি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরেজীতে তিনি একজন সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জওহরলাল আবার কারারুদ্ধ হন। তখন ভারতীয় জনগণের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট আন্দোলনে সারা ভারত অশান্ত। ইংরেজরা বুঝিল, তাহাদের ভারত ছাড়িবার দিন আসিয়াছে। কিন্তু যাইবার পূর্বে তাহারা ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া গেল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইল, জওহরলাল হইলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নানাপ্রকার পরিকল্পনা দ্বারা ভারতকে তিনি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার নিরপেক্ষতার নীতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

অত্যধিক পরিশ্রম, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অন্যায় জুলুম, চীনের অতর্কিত আক্রমণ প্রভৃতি শেষ জীবনে তাঁহার চিত্ত ভারাক্রান্ত ও ক্লান্ত করিয়া তোলে। তিনি বিশ্রাম নিতে চাহিয়াও বিশ্রাম নিতে পারেন নাই। দীর্ঘ সতের বৎসর তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অবশেষে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মে তিনি দেশবাসীকে শোকাতুর করিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, স্বাধীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক এবং বিশ্বজগতে ভারতীয় গৌরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার আসন স্থায়ী হইয়া রহিল।

সারদা দেবী

নারীত্বের আদর্শ—পরিচয়—বাল্য-জীবন—শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য—সংঘ-জননী—চরিত্র-মাধুর্য স্বাভাবিকতা, কল্যাণময়ী—ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ—মমতা ও ঔদার্য।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যে কয় জন মহীয়সী মহিলা বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেবা ও লোকশিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সারদা দেবী তাঁহাদের অন্যতমা। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা এবং ছোট-বড় সকল কার্যের মধ্য দিয়া তিনি আদর্শ নারী-জীবন গঠনের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে সারদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। অতি রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এই জয়রামবাটী। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী। রামচন্দ্রের অবস্থা আদৌ সঙ্গতিপন্ন ছিল না। অতি কায়ক্লেশে তিনি জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী উভয়েই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন।

সারদা দেবী জীবনে বিদ্যাশিক্ষার তেমন সুযোগ পান নাই। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। একটু বড় হইলে গৃহস্থালীর সকল কাজকর্মে তিনি তাঁহার মায়ের সহায়তা করিতেন। সামান্য পড়াশুনা যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহার ফলেই সারদা দেবী রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিতেন।

নিতান্ত বালিকা বয়সেই সারদা দেবীর বিবাহ হয়। তাঁহার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর, সেই সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে জয়রামবাটী হইতে চার মাইল দূরে অবস্থিত কামারপুকুর গ্রামে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। এই গদাধরই হইলেন পরবর্তী কালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহিমান্বিত বিগ্রহ, দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বিবাহের পর দীর্ঘকাল স্বামী-স্ত্রীতে সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পর সারদা দেবী একদিন আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য জয়রামবাটী হইতে পদব্রজেই

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জীবনের এই অধ্যায় অতি মনোরম। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ষোড়শীরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে পূজার্ঘ্য এবং করকমলে স্বীয় সাধনালব্ধ ফল অর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতের যুগযুগান্তরের অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে সে এক বিচিত্র অভূতপূর্ব কাহিনী। সারদা দেবী স্বামীকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করিতেন। জীবনের যে ১৪ বৎসর সারদা দেবী স্বামীর সন্নিধানে বাস করিয়াছিলেন, সেই ১৪ বৎসর রামকৃষ্ণদেব সারদা দেবীকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়া তাঁহার শিক্ষার অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। পরম পুরুষ স্বামীর নিকট হইতে সারদা দেবী যে জ্ঞানলাভ করেন, তাহাই সম্বল করিয়া তিনি স্বামীর প্রয়াণের পর এক বিপুল সঙ্ঘের জননীর স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তাঁহার আরব্ধ কার্যের দায়িত্ব স্বভাবতঃই সারদা দেবীর উপর অর্পিত হইয়াছিল। এখন হইতে তিনি জনসাধারণের নিকট ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নিকট মাতাঠাকুরাণী রূপে পরিচিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যগণ সারদা দেবীকে সাক্ষাৎ মাতৃজ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করিতেন। সারদা দেবী মাতৃত্বের বিপুল ঐশ্বর্য নারীজাতির হিতের জন্য উজাড় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যে ৩৪ বৎসর সারদা দেবী বাঁচিয়া ছিলেন, সেই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁহার চাল-চলনে, আচরণে ও কথাবার্তায় যে মাতৃত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিত, তাহা সমসাময়িক ইতিহাসে বিরল। বাংলার এক দরিদ্র পল্লীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তখন কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, তাঁহার জীবনকে ঘিরিয়া ভবিষ্যতে এত শ্রদ্ধা, এত আবেগ, এত খ্যাতি দিকে দিকে বিকীর্ণ হইবে? ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বর্ষকালব্যাপী সর্বত্র সারদা দেবীর শতবার্ষিকী উৎসব ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, মানুষের ইতিহাসকে এই সরলা নিরক্ষরা গ্রাম্য রমণী সত্যই আলোকিত করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ৬৭ বৎসরের জীবনের বিরামহীন সাধনার কাহিনীতে ভারতের নারীত্বের এক নূতন রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

সারদা দেবীর জীবনের অনুপম মাধুর্য তাঁহার অপরিসীম স্বাভাবিকতায়। তিনি কখনও পরিবার ও সমাজের অপর দশ জন হইতে পৃথক্ হইয়া দেখা দেন নাই। তিনি সকলের ভিতর এক হইয়া উঠিয়াছেন, বসিয়াছেন, চলিয়াছেন, দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, অথচ ভিতরে ছিল তাহার প্রদীপ্ত দীপশিখার ন্যায় অলৌকিক জ্ঞান ভক্তি করুণা—পাপকে ভস্ম করিবার, ধর্মকে সমৃদ্ধ করিবার অমিত শক্তি। বিদ্যা-বাগ্মিতা বেশ-বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও একান্ত অন্তঃপুরে বসিয়া নারী যে তাঁহার পবিত্রতার শক্তিতে, উদার নিঃস্বার্থ স্নেহে, ত্যাগে এবং সেবায় মানব-সমাজে অপরিমেয় কল্যাণ আনিতে পারেন, ইহা সারদা দেবীর জীবন না দেখিলে এ-যুগে বিশ্বাস করা কঠিন হইত।

এই মহীয়সী নারী সম্পর্কে ভারত-সেবিকা ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই বলিয়াছেন, "ভারতীয় নারীকুলের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষকথা তিনিই।

যত নূতন বা জটিল প্রশ্ন তাঁহাকে করা হউক না কেন, আমি তাঁহাকে কখনো উদারভাবের মত প্রকাশ করিতে ইতস্তত: করিতে দেখি নাই। সারা জীবন ধরিয়া তিনি নীরবে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার যত কিছু অভিজ্ঞতা সকলের মূলে রহিয়াছে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণীরূপে তিনি মানুষের ভাগ্যে যতদূর চরিত্রোৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব, তাহা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।"

বস্তুতঃ, সারদা দেবী যখন সঙ্ঘজননীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, সেদিন হইতে মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণের সন্তানদের আপন সন্তানরূপে জ্ঞান করিয়া নিজের মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়া তাহাদিগকে সর্বক্ষণের জন্য ঘিরিয়া রাখিতেন। সঙ্ঘের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সারদা দেবীর স্নেহ-মমতা ও ঔদার্য সকল মানুষের প্রতি প্রসারিত হইত। শিক্ষিতা হিন্দু স্ত্রীলোকদের নিকট সারদা দেবী সত্যই নারীত্বের ও মাতৃত্বের একটি নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সে আদর্শ কোন দিন ম্লান হইবার নয়। সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর সহিত সারদা দেবীও তাঁহার অনুপম ত্যাগ, সেবা ও বাৎসল্যের দ্বারা সমান মর্যাদায় স্থান লাভ করিয়াছেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুলাই এই মাতৃরূপিণী মহীয়সী পরলোক গমন করেন।

ভগিনী নিবেদিতা

উপক্রমণিকা—পরিচয়—বিদ্যাশিক্ষা—কর্মজীবন—স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে নব-জীবন লাভ—ভারতের কর্মধারা—বালিকা বিদ্যালয়—স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা—শেষ জীবন—চারিত্রিক বিশেষত্ব।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দ। আর ভারতমাতার পায়ে তাঁহারই শ্রেষ্ঠ উপহার ভগিনী নিবেদিতা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফল মহীয়সী নারীর মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের মৃত্তিকাতে তিনি আপনার অন্তরতম ভাবজীবনকে আবিষ্কার করিয়া এদেশের সেবাতেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়া আমাদের তথা ভারতকে ধন্য করিয়াছেন।

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের ডাংগানন শহরে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্যামুয়েল রিচ্‌মণ্ড নোবল্, মায়ের নাম মেরী হ্যামিলটন্ নোবল্। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ তাঁহাদের প্রথম সন্তান। নোবল্ পরিবার উগ্র দেশাত্মবোধের প্রেরণায় দেশের মুক্তি-আন্দোলনে বহু বার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। মার্গারেটের পিতা রিচ্‌মণ্ড নোবল্ও পরিবারের সেই ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া আয়র্ল্যাণ্ড মুক্তি-আন্দোলনে নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন

মার্গারেটের বয়স যখন চারি বৎসর, তখন পিতা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন পিতৃভক্ত মার্গারেট পিতার সহিত গির্জায় যাইতেন, উপাসনা

করিতেন। অবসর সময়ে পিতার মুখে আয়ার্ল্যাণ্ডের বৈপ্লবিক উত্থানের ইতিহাস শুনিয়া বালিকার মনে তীব্র উত্তেজনার উদ্ভব হইত। পিতার অকাল মৃত্যুর পর মার্গারেট হ্যালিফাক্সের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার অধিকারিণী মার্গারেট বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এবং সহপাঠিনীদের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন এবং কৃতিত্বের সহিত ছাত্র-জীবন সমাপ্ত করিলেন।

এইবার শুরু হইল তাঁহার কর্মজীবন। তিনি শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করিলেন, মানুষ গড়ার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি কর্মের মধ্যেই নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলেন। উইম্বলডনের একটি শিশু বিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া মার্গারেট নোবল্ সহজ শিক্ষার পথে শিশুদের পরিচালিত করিলেন।

এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার মধ্য দিয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ় মর্মকথা এবং বেদান্তের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। এই সাধকের অপূর্ব বক্তৃতার আসরে তিনি যোগ দিলেন। ভারতীয় সাধনার মর্মবাণী মার্গারেটকে উত্তরোত্তর আকৃষ্ট করিতে লাগিল, তাঁহার মনের সংশয় অপনীত হইতে লাগিল। একদিন মার্গারেট স্বামীজীকে তাঁহার মনের সংশয়ের কথা বলিলেন। তিনি তাঁহাকে ভারতীয় দর্শনের সারতত্ত্ব সরলভাবে বুঝাইয়া দিলেন। বিবেকানন্দের বাণী তাঁহাকে মহাজীবনের সন্ধান দিল। খণ্ড ক্ষুদ্রকে বর্জন করিয়া সেই শাশ্বত এক অবিনশ্বর ধ্যানে নিজেকে উৎসর্গ করিলেন। মার্গারেট স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আয়র্ল্যাণ্ড-দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার বেদীমূলে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন এবং জগতের কল্যাণ সাধনের ব্রত গ্রহণ করিলেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী মার্গারেট ভারতভূমিতে পদার্পণ করিলেন। এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল্ 'নিবেদিতা' এই নবনামে ভূষিতা হইয়া তপস্বিনীর ন্যায় ভারতের সেবায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিলেন।

মার্গারেটের নবতর শিক্ষা জীবন-শুরু হইল। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত স্বামীজী তাঁহার পরিচয় সাধন করাইলেন; নিবেদিতার মনের সকল সংশয় উৎপাটিত করিয়া স্বামীজী শিখাইলেন—জীব-সেবাই শিব-সেবা, নরই নারায়ণ। স্বামীজী তাঁহাকে পরিপূর্ণ ব্রহ্মচারিণী করিলেন, ব্রহ্মচারি-ব্রতে দীক্ষা দিলেন। মঠের সন্ন্যাসিগণ এই বিদেশিনী তরুণী তাপসীকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইবার জন্য স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিলেন।

ইহার পর বেলুড়ে ফিরিয়া নিবেদিতা কলিকাতার বাগবাজারে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। রক্ষণশীল অভিভাবকেরা প্রথমে মেয়ে দিতে অস্বীকৃত হইলেও ক্রমে ক্রমে ছাত্রীসংখ্যা বর্ধিত হইল। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কার্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন।

এই সময় কলিকাতায় মারাত্মক প্লেগ রোগ দেখা দিল। নিবেদিতা স্বহস্তে পীড়িতদের সেবা ও ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কার করিতেন। নিবেদিতার এই অসম সাহসিক কার্যে পাড়ার ছেলেরা অনুপ্রাণিত হইল এবং তাঁহার সঙ্গে সেবাকার্যে যোগদান করিল।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর মৃত্যুর পর ভগিনী নিবেদিতা গুরুর প্রদর্শিত আদর্শ একান্তভাবে অনুসরণ করিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহাযজ্ঞেও নিবেদিতা যোগদান করিলেন। সাহচর্য লাভ করিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ স্বদেশ-প্রেমিক নেতৃবৃন্দের। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনায় নিবেদিতার প্রেরণা অনেকখানি ছিল। বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক আদর্শ ও স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিবেদিতা ভারতের কলঙ্ক অপনোদনের ব্রত গ্রহণ করিলেন। দেশবাসীকে অগ্নিগর্ভ বাণী শুনাইলেন, রাজনৈতিক কার্যে মনঃসংযোগ করিলেন। শাসকবর্গের অপকীর্তিকে তীব্র কশাঘাত করিয়া কাগজে প্রবন্ধ লিখিলেন অগ্নিগর্ভ ভাষায় এবং বৈপ্লবিক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিলেন। ফলে ইংরেজ সরকারের শ্যেনদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। বন্ধুদের আন্তরিক অনুরোধে তিনি কিছু দিনের জন্য ভারত পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে চলিয়া গেলেন।

লণ্ডনে আসিয়াও ভারতের চিন্তা তাঁহার সদাজাগ্রত চিত্তকে পীড়িত করিয়া তুলিল। অবশেষে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কর্ম-ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের সহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন।

কিন্তু অরবিন্দ গ্রেপ্তারী পরোয়ানার তাড়নায় ফরাসী রাজ্য পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় লইলে নিবেদিতা জীবন-দেবতার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। ভারতের তীর্থক্ষেত্রের ধূলিকণার মধ্যে তিনি মহাজীবনের স্পর্শ অনুভব করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আবার অজস্র কর্মের নাগপাশে জড়াইয়া পড়িলেন। অত্যধিক কর্মের চাপ তাঁহার আর সহ্য হইল না, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জগদীশ বসুর অনুরোধে তিনি বিশ্রাম মানসে দার্জিলিঙ গেলেন। কিন্তু দার্জিলিঙে তিনি রক্ত-আমাশয়ে আক্রান্ত হইলেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ১৩ই অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দীপ নির্বাপিত হইল।

"...ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া, সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। ...বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা। নিবেদিতার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা এক দিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল, আর এক দিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মত প্রচণ্ড।" —রবীন্দ্রনাথ

খেলার মাঠে একদিন

উপক্রমণিকা—খেলার মাঠের বর্ণনা—স্টেডিয়ামের মাঠের বর্ণনা—খেলার বর্ণনা—দর্শকদের বৈচিত্র্য—বিরতির সময়ে—হঠাৎ গোলযোগ—বাইরে বিচিত্র দৃশ্য—উপসংহার।

ক্রিকেট সত্যি খেলার রাজা—রাজকীয় তার ভাবভঙ্গী, আয়োজন-উদ্যোগ, দর্শক-সমাবেশ, রাজকীয় তার ব্যয়-বাহুল্য। ক্রিকেট ইংরেজদের জাতীয় খেলা। কিন্তু আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ক্রিকেট ফুটবলের পরেই জনপ্রিয় খেলা। এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার খবরের জন্য পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক রেডিও টেলিভিসনের পাশে ভিড় জমায়। ছেলে-মেয়েদের নিকট ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ মস্ত বড় হিরো।

এই রাজকীয় খেলাটি দেখার সুযোগ পেলাম ইডেন উদ্যানের স্টেডিয়ামে। ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলা হবে। দাদার সঙ্গে খেলা দেখতে গেলাম। অনেক চেষ্টা করে দাদা দু'খানি টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন।

ইডেন উদ্যানের সামনে গিয়ে দেখি গড়ের মাঠে এক জনসমুদ্র—অশান্ত উদ্বেলিত দর্শকদের অনেকের কাঁধে ঝোলাব্যাগ, ফ্লাস্ক, ক্যামেরা বাইনোকুলার। পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে আমরাও দীর্ঘ লাইনের মন্থর গতিতে এগিয়ে চললাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলে অবশেষে আমাদের সংরক্ষিত আসনে গিয়ে বসতে পারলাম।

স্টেডিয়ামের ডিম্বাকৃতি সবুজ মাঠটি ঘিরে চারিদিকেই গ্যালারি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যালারির সমস্ত আসন পূর্ণ হয়ে জনসমুদ্র যেন উপচে পড়তে লাগল। শীতের আরামের রোদ বেশ ভাল লাগছিল। খেলা আরম্ভ হবার তখনও কিছু দেরি। চার দিকটা এক বার কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলাম। আমাদের পাশে কয়েকটি স্থূলাকার মাড়োয়ারি মহিলা বসে বসে চিনাবাদামের খোসা ছাড়িয়ে আত্মসাৎ করছিলেন। মাঝে মাঝে পাশের ভদ্রলোককে কি প্রশ্ন করছিলেন। হঠাৎ পেছনে একটা গোলমাল শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি আমাদের উঁচুতে এক ভদ্রলোককে কয়েক জন টেনে তুলছেন। ভদ্রলোক অকস্মাৎ দুই সারির মাঝের ফাঁকে পড়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলছিলেন। আমাদের বিপরীত প্রান্তে স্কোর বোর্ডটি বেশ চোখে পড়ছিল। দাদা দেখিয়ে দিলেন, সাংবাদিক, বিশিষ্ট অতিথি ও খেলোয়াড়দের নির্দিষ্ট আসনগুলো। দূরে গ্যালারির পেছনে নানা রঙের কাপড়ে লেখা বিজ্ঞাপনগুলো জল্ জল্ করছিল।

হঠাৎ মাইকে খেলা আরম্ভ হবার সংকেত ঘোষিত হল। দু'দলের ক্যাপ্টেন শিবির বা প্যাভিলিয়ন হতে বাইরে এসে মাঠে দাঁড়ালেন। আম্পায়ারের সামনে টস্ করা হল। টসে ভারতীয় দল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেল। অমনি দর্শকগণ উচ্চ রবে হাততালি দিয়ে ভারতীয় অধিনায়ককে অভিনন্দন করল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়গণ মাঠে ছুটে এসে বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পাত্রীর পোশাক পরা দু'জন আম্পায়ার উইকেটের দু'দিকে স্থান নিলেন। ভারতের দুই সেরা ব্যাট্সম্যান খেলতে নামলেন। উভয় দলের ক্যাপটেন বলটি ভাল করে দেখলেন। তারপর বোলার খেলোয়াড়দের মাঠের নানা স্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বোলিং আরম্ভ করলেন।

এত বড় ক্রিকেট খেলা কোন দিন দেখি নি। দাদা সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। স্কোর-বোর্ডটাও পড়তে শিখে গেলাম। মাঝে মাঝে চীৎকার শুনছিলাম—স্পিন, ফুলটস, হাফটস, গুগলি, অফব্রেক, লেগব্রেক ইত্যাদি। দর্শকদের অনেকে তর্কের ঝড় বইয়ে দিচ্ছিলেন। অনেকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্যও কানে আসছিল। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে সব দেখছিলাম ও শুনছিলাম। আমার মত অবুঝের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না।

আমাদের সাম্‌নের সারিতে এক সুবেশা মহিলা একমনে উল বোনা দ্রুত শেষ করছিলেন। দাদা বলছিলেন, আসল দর্শকেরা টিকিটের জন্য হা-হুতাশ করে, আর এই সব অপদার্থের দল মাঠে এসে উল বোনে, বাদাম খায় আর পিকনিক করে। নিকটেই দুই বয়স্ক ভদ্রলোক পুরনো দিনের নামকরা খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের তুলনায় এখনকার অর্বাচীন খেলুড়েদের দুগ্ধপোষ্য বলে প্রমাণিত করার জন্য সোৎসাহে গলাবাজি করছিলেন।

দর্শকদের উত্তেজনা, মজার মজার কথাবার্তা, বিচিত্র আচরণ, খেলোয়াড়দের দৌড়াদৌড়ি, ব্যাটের ঠকঠকানি—সব মিলে বেশ সময় কাটছিল। এমন সময় খেলার বিরতি হোল। বেলা ১২টা ১৫ মিনিট হতে ১টা পর্যন্ত লাঞ্চের বিরতি। দর্শকদের অনেকেই টিফিনের জন্য বাইরে গেলেন। আমরা কিছু খাবার সঙ্গে এনেছিলাম, বসে তার সদ্ব্যবহার করলাম। অদূরে মাড়োয়ারী মহলের দিকে দৃষ্টি পড়ল, ওরা যেন রীতিমত পিকনিকের আয়োজন নিয়ে এসেছেন। বড় বড় টিফিন কেরিয়ার হতে নানা চর্ব্য চোষ্য দ্রব্য বের হচ্ছে, আর মুখ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, মহানন্দে ভোজন-পর্ব চলছে। এদের কাছে এটাই যেন মুখ্য, খেলা দেখা গৌণ। খেলার বিন্দুবিসর্গও যারা বোঝে না, তারাই সমাজে মেশবার জন্য অনেকটা ফ্যাশান হিসাবে মাঠে হাজিরা দেয়। আর খেলা যাদের কাছে প্যাশন বা অনুরক্তি, সেই অনুরাগী আসল দর্শকদের দল টিকিটের জন্য পুলিশের গুঁতো খায়, কখনও প্রাণ দেয়।

লাঞ্চ পর্বটি আধা-পিকনিকের মতো। বেলা ১টায় খেলা আরম্ভ হ'ল। এবার যেন থমথমে ভাব। দর্শকগণ ধৈর্য সহকারে খেলা দেখছেন আর খেলোয়াড়দের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করছেন। এভাবে দু' ঘণ্টা খেলা চলল। ভারত ৫টি উইকেট হারিয়ে দু'শত রান করেছে। খ্যাতনামা খেলোয়াড় সোলকার ব্যক্তিগত ৯০ রান তুলে সেঞ্চুরির আশায় সন্তর্পণে খেলে যাচ্ছেন।

পড়ন্ত রোদ একটু ঝিমিয়ে আসছে, এমন সময় মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা উত্তেজনা দেখা গেল। লাঠিধারী পুলিশ ঐ দিকে ছুটে চলেছে। খেলা শেষ হতে

মাত্র কুড়ি মিনিট বাকি। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় বহু দর্শক আসন ছেড়ে গেটের দিকে ছুটতে লাগল। আমরাও কিছু ঠাহর করতে না পেরে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে একেবারে বাইরে চলে এলাম। খেলার শেষটুকু দেখতে না পেয়ে মনটা কেমন ভারাক্রান্ত লাগছিল।

ইডেন গার্ডেনের স্টেডিয়ামের বাইরে এসে দেখি এক বিচিত্র ও বিপুল জন-সমাবেশ। ঘোড়-সওয়ার পুলিশ জনতা নিয়ন্ত্রিত করছে। ফেরিওয়ালার দল চীৎকার করছে। শত শত গাড়ী হর্ন বাজিয়ে ছুটে যাবার চেষ্টা করছে, হাজার হাজার লোক পিল্ পিল্ করে চলেছে আর উত্তেজিত তর্ক চালাচ্ছে। মনে হয় যেন কলকাতার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী খেলা দেখতে ভেঙ্গে পড়েছিল। খেলা দেখার এমন নেশা আর দেখিনি। এতে হুজুগও যেমন আছে, নিষ্ঠাও তেমনই আছে।

তোমার প্রিয় লেখক বা কবি

প্রস্তাবনা—শিশুদের কবিরূপে প্রথম আকৃষ্ট হই—জন্ম, পরিবেশ, ঠাকুর পরিবারের প্রভাব প্রকৃতির প্রভাব—আত্ম-প্রতিভার বিকাশ—নোবেল পুরস্কার—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন—কবিতা, গান, নাটক—বিচিত্র প্রবন্ধ—চিত্রশিল্পী—ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক—স্বদেশপ্রেম—বিশ্বকবি—বহু পর্যটন—জন্মশতবার্ষিকী।

কোন জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড তাহার কবি ও সাহিত্যিক। তাঁহারাই মানব-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ। তাঁহাদের সৃষ্টি মানুষকে জ্ঞান দেয়, আনন্দ দেয়, জীবনের পাথেয় যোগায়। কবিরা দেশকালের অতীত, তাঁহারা বিশ্বমানবের। ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র আজ শুধু ইংরেজদিগকেই নয়, তাঁহার সাহিত্য রাশিয়ানদিগকেও প্রচুর আনন্দ দান করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কেবল ভারতবাসীকে নয়, বিশ্ববাসীকেও মুগ্ধ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের কবি হইয়াও বিশ্বকবি।

বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা মুখে মুখে শিখিয়াছিলাম। শিশুকালে তাঁহার লেখা অনেক কবিতা ও গল্প পড়িয়াছি। এই সব কবিতা ও গল্পই অলক্ষ্যে আমার শিশু-হৃদয়ে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এত বড় কবি হইয়াও তিনি এই ভাবেই শিশুমনে শ্রদ্ধার আসন পাতিতে পারিয়াছেন। শিশুর দৃষ্টি নিয়া জগৎকে নিরীক্ষণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি শিশু-জগতেরও কবি-সম্রাট্।

কলিকাতার ঠাকুর-পরিবার উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের এক প্রাণকেন্দ্র ছিল। এই পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ১২৬৮ সনের ২৫শে বৈশাখ, (১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ, ৮ই মে) জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যুগন্ধর মহাপুরুষ ছিলেন। কবির অগ্রজগণ প্রত্যেকে জ্ঞানী গুণী প্রতিভাশালী ছিলেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সহিত

ঠাকুর বাড়ির নিবিড় যোগাযোগ ছিল। এই পরিবেশের উদার শিক্ষা, মার্জিত রুচিবোধ, গভীর ধর্মবিশ্বাস ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বাদেশিকতা সহজাত সংস্কারের মতো রবীন্দ্রনাথের জীবনকে প্রভাবিত করে। কোন বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষালাভ হয় নাই। কিন্তু ঠাকুর-পরিবারই ছিল একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকৃতির মাঝে আপনাকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দিবার অখণ্ড অবসরও রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগসূত্রই তাঁহার কাব্যশক্তির অন্যতম উৎস।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া সৌন্দর্যাতীত সাধনায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য-প্রতিভা এমনই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণতির দিকে চলিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে মোটামুটি ভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, ছোট গল্প ও উপন্যাস এবং বিবিধ প্রবন্ধ রচনা। তাঁহার প্রতিভা যাহা-কিছু স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই রূপে রসে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি গান ও কবিতায় রাজাসন লাভ করিয়াছেন। নাট্যকলায় তিনি নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি শুধু নাট্যকার নন, সুদক্ষ অভিনেতাও ছিলেন। বাল্যবয়সে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামে গীতি-নাট্য রচনা ও অভিনয় করেন। উহাতে তিনি নিজে বাল্মীকির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার দক্ষতা ছিল। তাঁহার গীতি-নাট্য, রূপক-নাট্য, কৌতুক-নাট্য, ঋতু-নাট্য ও নৃত্য-নাট্য প্রত্যেকখানি অপূর্ব সৃষ্টি। রাজা ও রাণী, রক্তকরবী, নটীর পূজা, অরূপরতন, চিরকুমার-সভা, ডাকঘর, বিসর্জন, মুক্তধারা, তাসের দেশ প্রভৃতি এক-একটি ভাব বিগ্রহ নাটক পরম উপভোগ্য।

এমন বিষয় নাই যে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা না করিয়াছেন। বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ, স্বদেশ, চরিত-কথা, সাহিত্য-বিচার, সঙ্গীত, আর্ট, ধর্ম, রাজনীতি, তিনি কি না লিখিয়াছেন। প্রত্যেকটি রচনা যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের চিন্তার খোরাক যোগাইবে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিও বাংলা সাহিত্যের আর এক সম্পদ।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাগুলি প্রকাশ করিয়া সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে বীরভূম জেলার বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় এবং পরে উহার নিকটবর্তী সুরুল গ্রামে শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য শ্রীনিকেতন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

কবি-সাহিত্যিক বলিয়াই রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানি, কিন্তু তিনি যে একজন বড় চিত্রশিল্পী তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃদ্ধ বয়সে তিনি চিত্রশিল্পে অসাধারণ

দক্ষতা ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অধুনা গানের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রাচীন-নৃত্যের প্রচলন হইয়াছে, তাহার মূলে আছে রবীন্দ্র-গীতিনাট্য, আর শান্তিনিকেতনের নৃত্যকলা।

ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলিতে তাই দেখিতে পাই, প্রাচীন ভারতের গরিমা ও ঐশ্বর্য মূর্ত হইয়া ফুটিয়াছে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির এক মধুর রূপ রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। এই দেশের পায়ে মাথা নোয়াইয়া তিনি গাহিয়াছেন—

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।"

তাঁহার 'জনগণ-মন' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য স্বদেশী গান আছে যাহা ভাব-গাম্ভীর্যে ও তেজস্বিতায় যে কোন দেশের জাতীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যে অক্ষয় আসন দাবী করিতে পারে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ স্বদেশী গান রচনা করেন এবং তাহা নিজে সভা-সমিতিতে গান করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি 'স্যর' উপাধি বর্জন করেন।

রবীন্দ্রনাথ সত্য-সুন্দরের উপাসক। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অমৃতের বার্তা বহিয়া আনে। ঋষি-কবির সহিত আমরাও কণ্ঠ মিলাইয়া 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো' সেই প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করি। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কেবল নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রাচী ও প্রতিচীর মহামিলনের বাণী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এশিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ পর্যটন করিয়াছেন এবং সর্বত্র অজস্র সম্মান পাইয়াছেন।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮সন) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে পরলোক গমন করেন।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির চরিত্র

রাজনৈতিক পরিস্থিতি—পরিচয় ও বাল্য-জীবন—আদর্শ ও লক্ষ্য—শক্তির প্রসার—স্বাধীন রাজ্য-প্রতিষ্ঠা—রাজনৈতিক প্রতিভা—চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—ইতিহাসে তাঁহার স্থান।

মারাঠা-বীর শিবাজী একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সংকটকালে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তখন মুঘল শক্তি সমগ্র ভারতকে গ্রাস করিয়াছিল। দিল্লীর তথা সমগ্র ভারতের অধীশ্বর তখন ঔরঙ্গজেব। তাঁহার অনুদার নীতির ফলে তাঁহার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল—শিখ-বিদ্রোহ, সৎনামী-বিদ্রোহ, জাঠ-বিদ্রোহ, বুন্দেলগণের বিদ্রোহ। কিন্তু সকল বিদ্রোহ ছাপাইয়া যাঁহার বিদ্রোহ ঔরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে এক বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইল, তিনি হইলেন সামান্য একজন জায়গীরদারের পুত্র

শিবাজী। তাঁহার অটুট সাহস, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অপূর্ব বীরত্বের পতাকাতলে মারাঠাগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। সেদিন যুবক শিবাজীর সম্মুখে যে আদর্শ ছিল তাহা মারাঠাদের জন্য এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

শিবাজীর পিতা বিজাপুরে এক মুসলমান শাসকের অধীনে কাজ করিতেন। মাতৃকোলে বসিয়া রামায়ণ মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংকল্প হইল, তিনি অর্জুনের মত বীর যোদ্ধা হইবেন। বাল্যকালের এই সংকল্পই তাঁহাকে প্রথম হইতে নানা বিপদের মধ্যে পরিচালিত করিয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মাওয়ালী নামক কষ্টসহিষ্ণু পাহাড়িয়াদের লইয়া একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠিত করিলেন। সেই অশিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক পাহাড়িয়া দ্বারা গঠিত মুষ্টিমেয় সৈন্যদলটি লইয়াই শিবাজীর জীবন-নাট্য আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রথম যৌবনেই গুরু রামদাস স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বাধীন রাজ্য গঠনের জন্য দৃঢ় পণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে শক্তি প্রয়োগ বা প্রলোভনের দ্বারা বশীভূত করা বা আনুগত্যের শৃঙ্খলে বাঁধা ঔরঙ্গজেবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শিবাজী প্রথমে বিজাপুরের এবং অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান শাসকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। একের পর এক দুর্গ জয় করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার শক্তি ও সংগঠনী প্রতিভা দেখিয়া মুঘল সম্রাট্ চিন্তিত হইলেন।

ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, সেদিনের 'পার্বত্য মূষিক' আজ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার সৈন্য-বাহিনী পাঠাইয়া শিবাজীকে দমন করিতে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু শত চেষ্টায়ও তিনি শিবাজীকে দমন করিতে পারেন নাই। শেষে কৌশলে বন্দী করিয়াও শিবাজীকে আয়ত্তে রাখিতে পারিলেন না। শিবাজী কৌশলে মুঘল প্রহরীদের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিলেন।

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শিবাজীর শক্তি ও সাহস আরো বাড়িয়া গেল, সংকল্প আরো দুর্জয় হইল। ঔরঙ্গজেবের জীবিত অবস্থায়ই তিনি স্বাধীন মারাঠা-রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইলেন। দেশবাসী তাঁহাকে 'ছত্রপতি' নামে আখ্যায়িত করিলেন এবং মহাসমারোহে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভাই তাঁহার জীবনের সফলতার কারণ।

রাজা হইয়া শিবাজী স্বেচ্ছাচারী হন নাই। বৈরাগীর উত্তরীয় ছিল তাঁহার পতাকা, তাই তিনি বিলাস-ব্যসনে মত্ত হন নাই। অল্প সময়ের মধ্যেই সুশৃঙ্খল শাসনের দ্বারা মারাঠাগণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। মারাঠা রাজ্যকে দৃঢ় করিয়া তিনি মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় স্বাধীন রাজ্য ইতিপূর্বে আর কেহ গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।

শিবাজী বীর ছিলেন বলিয়া দুর্বলের উপর অযথা অত্যাচার করেন নাই। তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নিজ রাজ্যে কখনো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করিতে দেন নাই। তাঁহার বহু কর্মচারী ও সেনানী মুসলমান ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের এই মহত্ত্ব তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে।

মাতৃজাতির উপর তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। শিবাজী বন্দী নারীদের উপর নির্যাতন না করিবার জন্য তাঁহার সৈন্যদের উপর কঠোর নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

মারাঠা-জাতির স্রষ্টারূপে তাঁহার নাম চিরদিনই ইতিহাস সগৌরবে বহন করিবে। আচার্য যদুনাথ শিবাজীর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'শিবাজী মধ্যযুগের ভারতে এক অসাধ্য সাধন করেন। তাঁহার আগে কোন হিন্দুই মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত প্রখর দীপ্তিশালী শক্তিমান্ মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হন নাই। শিবাজীর চরিত্রে সাহস ও স্থির চিন্তার অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছিল।

একটি মেলা

মেলা-পণ্য, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম মিলন-ক্ষেত্র—মেলার উপলক্ষ্য—মেলার বিচিত্র পণ্য—কৃষির প্রাধান্য—লোকরঞ্জনের আয়োজন—একাধারে হাট-বাজার-মেলা—মেলার সার্থকতা।

মেলা এদেশের পণ্য, শিল্প ও সংস্কৃতির-প্রাচীনতম মিলন-ক্ষেত্র। গ্রামে ও শহরে বিভিন্ন পর্ব উৎসব বা অনুষ্ঠান, পৌষ বা চৈত্র সংক্রান্তি, নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে মেলা বসে, বেশির ভাগই ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যদিও বর্তমানে এর অর্থনৈতিক দিকটা বেশি প্রকট। কোন মেলা একদিনের জন্য হয়, কোনটি সাত দিনের, কোনটি বা এক মাস দেড় মাস পর্যন্ত বসে। বেশির ভাগ মেলাই বর্ষাশেষে হেমন্ত বা শীতের সময় বসে।

বারুইপুরের রাসের মেলা দক্ষিণ অঞ্চলের একটি নামকরা মেলা। স্থানীয় জমিদারের গৃহ-দেবতার রাস-উৎসব উপলক্ষে এই মেলা বসে। এটি এক মাস কাল স্থায়ী হয়। কলকাতা থেকে যে বড় রাস্তাটি বারুইপুরের ওপর দিয়ে দক্ষিণে উত্তর-ভাগের দিকে গেছে, তারই গায়ে ঠাকুর-বাড়ীর দীঘির পাড়ে বড় মাঠে মেলাটি বসে। মেলাটি একটি বড় হাটের মতো। দৈনন্দিন বেচাকেনার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের কতকগুলি আয়োজন থাকে। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বা অনুষ্ঠান তত পরিস্ফুট নয়, যদিও ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষ্যেই মেলার জন্ম ও আয়োজন।

মেলায় এক এক রকমের দোকান এক একটি অঞ্চল জুড়ে সাজিয়ে বসে। তরিতরকারি, ফলমূল, মাছ-মাংস, চাল-ডাল, শস্য, বাঁশের ডালা-কুলো, পাট ও বেতের জিনিস, মাদুর ও হোগলার জিনিস, লোহার জিনিসপত্র, গাছপালা, চারা বীজের দোকান—সব সারি সারি বসে গেছে। মিষ্টি, রুটি-বিস্কুট, চা-বিস্কুট, পাপড় ও বেগুনি, ভাজা-ভুজি, চীনা-বাদাম, খৈ-মুড়ির দোকান, অনেকগুলো

খাবারের দোকান বেশ জেঁকে বসেছে। খাবার ও চায়ের দোকানগুলোতে খুব ভিড়। মণিহারি দোকান, জামা-কাপড়, এলুমিনিয়ামের বাসন-কোসন ইত্যাদির দোকানগুলো বেশ সাজানো গোছানো। মাটির হাঁড়ি কুঁড়ি নিয়ে কুমোরেরা বেশ খানিকটা জায়গায় ছড়িয়ে বসেছে। এ অঞ্চলটি কৃষিপ্রধান। কাজেই এখানে কৃষি-পণ্য প্রচুর আমদানি হয়, কৃষি ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেশি ওঠে, ভিড়ও কৃষকদেরই বেশি।

লোকরঞ্জনের জন্য নানা আমোদের আয়োজন করা হয়। ছোটদের জন্য কতকগুলো রাধাচক্র বা নাগরদোলা ঘুরছে। ছোট বড় সার্কাস পার্টি বিরাট্ তাঁবু ফেলে পল্লীবাসীদের আনন্দ দান করে। কোন তাঁবুতে ম্যাজিক দেখানো হয়ে থাকে।

এ মেলাটির বিশেষত্ব—এটা হাট-বাজার ও মেলার একত্র মিলন-ক্ষেত্র। দৈনন্দিন বাজারও এখানে বসছে, আবার রবিবার ও বুধবারে হাটও বসছে। এ দু'দিন মেলায় জিনিসপত্রও বেশি আসে, ভিড়ও খুব বেশি হয়। কলকাতা থেকে নানা সৌখীন জিনিসের দোকান এসে মেলাকে আরো চকমকে করে তোলে। মেলাটি এক রকম সারা দিন ও রাত্রি চলে। সাধারণতঃ দুপুর হতে রাত্রি ৯।১০টা পর্যন্ত মেলায় ভিড় খুব বেশি। সার্কাস ও বায়স্কোপে সন্ধ্যা বেলায় ভিড় বেশি হয়।

বড় রাস্তার ধারে বাস চলাচলের পথে মেলাটি বসে বলে চারদিক থেকে যাতায়াতের সুবিধা খুব। আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে দলে দলে লোক আসে—কেহ পণ্য নিয়ে, কেহ মেলা দেখতে ও কেনাকাটা করতে। বিকেলের দিকে মেলাটি সবচেয়ে মুখর হয়ে ওঠে; লোকের ভিড়, চেঁচামেচি, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, বাঁশি, সানাই, ঢাক-ঢোলের বাজনা, লাউড-স্পীকারে গান, সব মিলিয়ে মেলাটি গমগম করতে থাকে।

মেলায় অর্থনৈতিক দিকের চেয়ে এর আনন্দদানের দিকটাও কম নয়। এইজন্যই মেলায় যাবার আকর্ষণ ছেলে বুড়ো সকলেরই এত বেশি। এখানে কেনাবেচা দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে ভাবেরও আদান-প্রদান ঘটে। এক গ্রামের সঙ্গে অপর গ্রামের, গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগসূত্রই মেলা। মেলায় কেবল দ্রব্যের মিলন নয়, মানুষেরও মিলন। এও মেলার এক সার্থকতা।

একটি দুর্ঘটনা

প্রস্তাবনা—দুর্ঘটনার দিন—দুর্ঘটনার বর্ণনা—উপসংহার।

ঢং ঢং ঢং পরীক্ষার ঘণ্টা বাজিল। আমি অনেকটা উদাসীন মনোভাব লইয়া পরীক্ষা-গৃহে উপস্থিত হইলাম। পরীক্ষা লইয়া উদ্বিগ্ন হইবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। প্রশ্নপত্র পাইলাম। প্রশ্নগুলি একবার পড়িলাম। তিনটি রচনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি লিখিতে হইবে। 'একটি দুর্ঘটনা' এই তিনটির মধ্যে একটি। এই রচনাটি দেখিয়া আমার অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। ভাবিলাম, হায়রে খোকন, তোর মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া আমার পরীক্ষার

কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, ইহা আমি কোন দিনই ভাবি নাই। যে কলম দিয়া তোর মৃত্যু সম্বন্ধে রচনা লিখিব এখনও তাহাতে তোর স্পর্শ লাগিয়া আছে। বুকটা ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। অবশ্য অন্য আরও দুইটা রচনা ছিল। কিন্তু আমার এই ব্যথা-ভরা মনটার অসহ্য ভাবগুলিকে ভাষা দিবার একটা ইচ্ছা হইতেছিল। তাই এই রচনাটি বাছিয়া লইলাম।

যে বিশেষ দিনটির কথা লিখিতে বসিয়াছি, তাহার স্মৃতি আমার কাছে যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন সেই দিনটিতে স্বাভাবিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই দিন সকাল হইতেই খোকনের খুব বেশী স্ফূর্তি লক্ষ্য করিতেছিলাম। তাহার পাঁচ বছরের ছোট জীবনটির পরিসমাপ্তি হইবে বলিয়াই বোধ হয় সে তাহার পরিচিত সব কিছুই অনুভব করিয়া লইতেছিল। সে ছোট ছোট কবিতা আধ আধ ভাষায় বড় সুন্দর আবৃত্তি করিত। অন্য দিন অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তাহাকে বলাইতে হইত, কিন্তু সেদিন সকালে আমাকে সে নিজে সাধিয়া কবিতা শুনাইল। এইরূপ সব রকম বিষয়েই তাহার যত কৃতিত্ব আছে, বাড়ীর সবাইকে দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি অঙ্ক বই লইয়া অঙ্ক করিতেছি—পরীক্ষা আসন্ন; একটি অঙ্কের সমাধান লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় খোকন কোথা হইতে আসিয়া আমার চোখের চশমাটা টানিয়া লইয়া নিজের চোখে লাগাইয়া গুরুমহাশয় সাজিয়া আমাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিল। সকাল হইতে নানা রকমে বড়ই বিরক্ত করিতেছিল, রাগ করিয়া কান দুইটা জোরে মলিয়া দিলাম। সহজে কাঁদা তাহার স্বভাব নয়। অভিমানে ক্ষুব্ধ মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। কচি গাল অভিমানে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। হাতখানা ধরিয়া কাছে টানিয়া লইলাম। আমার স্নিগ্ধ স্পর্শ জলভরা মেঘে ঠাণ্ডা হাওয়ার ন্যায় কাজ করিল। আয়ত বুদ্ধিদীপ্ত শিশুর সারল্যে পূর্ণ চোখ দিয়া অশ্রু বড় বড় ফোঁটায় ঝরিয়া পড়িল।

চাকরটাকে ডাকিয়া কিছু চকোলেট আনিতে দিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া ৪।৫টা নানা রং-এর ঘুড়ি দেখিল। তখন তাহার চোখ দুইটি জলে পূর্ণ ছিল, কিন্তু ঘুড়ি দেখিয়া হাসিতে তাহার মুখখানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, চোখে জল, মুখে হাসি—বড় ভাল লাগিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নিবি? সে বলিল, "হ্যাঁ, সব নেব, লাল, নীল, সাদা সব।" ঘুড়ি দেখিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না—হাতে তালি দিয়া নিজের মনে নাচিতে থাকে। একটি ঘুড়ি বারে বারে আমাদের জানালার কাছে আসিতেছিল, ফড়্ ফড়্ করিয়া আবার উড়িয়া যাইতেছিল। ঘুড়ি যিনি উড়াইতেছিলেন, তাঁহার বোধ হয় জানালার ভিতর ঘুড়িটি প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা। খোকন জানালা দিয়া বারে বারে হাত বাড়াইতেছিল। ঘুড়িটি ধরিবার জন্য সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি মেঝের উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম। খোকন জানালার কাছে

খাটের উপর দাঁড়াইয়া জানালা দিয়া হাত বাড়াইতেছিল। আমি পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "পড়ে যাবি, আমি ধরে দিচ্ছি।" এইবার ঘুড়িটি খুব কাছে আসিল। আমি হাত বাড়াইলাম, খোকন আনন্দের আতিশয্যে বুক পর্যন্ত বাড়াইয়া দিল। চক্ষের পলক না ফেলিতে এ কি হইল! খোকন তেতলার জানালা হইতে উল্টাইয়া নীচে পড়িয়া গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বন্ধ করিলাম। নীচের দিকে তাকাইলে কি দেখিব এই ভয়ে সারা দেহ কাঁপিতেছিল। কি করিয়াছিলাম আমার ঠিক মনে নাই।

একটা অব্যক্ত ব্যথা আমার সমস্ত পাঁজরগুলিকে ভাঙিয়া খান খান করিতেছিল। খোকনের পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বোধ হয় চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মা পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর দিবার মত কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলাম না। মিনিট দু'এর জন্য বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু থাকিতে পারিলাম না। কি হইল দেখিবার জন্য নীচে ছুটিয়া নামিলাম। ইতিমধ্যে রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল। নীচে গিয়া উপরে তাকাইয়া দেখিলাম, মা জানালা দিয়া দেখিতেছেন। মা বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, রাস্তায় কোন বড় দুর্ঘটনা হইয়াছে। তিনি তখনও ভাবেন নাই, তাঁহার বুকের মানিক খোকন রক্তাক্ত কলেবরে মাটির ধূলায় লুটাইতেছে।

ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। যে মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিলাম তাহা আমি কি করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিব? যাহাকে তিলে তিলে স্নেহে যত্নে আদরে পাঁচ বৎসর ধরিয়া মানুষ করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহার দেহের এই পরিণতি দেখিয়া কি করিয়া সহ্য করিয়াছি এবং করিতেছি তাহাই ভাবি। দেখিলাম, খোকনের কোঁকড়া বাবরি চুলগুলি রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। মাটিতে খানিকটা জায়গা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। গাল বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে। আমি ছুটিয়া বুকে জড়াইয়া লইতে গেলাম। একজন পুলিশ আসিয়া আমাকে বিরত করিল। তারপর বাবা, দাদা সকলেই আসিলেন। পুলিশের হাঙ্গামা মিটাইয়া খোকনকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল।

রাত বারোটায় ফিরিয়া আসিলাম। যে ঘর হইতে সে পড়িয়াছে তাহাতে ঢুকিলাম। দেখিলাম, চকোলেটগুলি টেবিলের উপর রহিয়াছে। চকোলেটগুলি হাতে লইয়া যে জানালা দিয়া সে পড়িয়াছে সে জানালা দিয়া ফেলিতে গেলাম, কিন্তু আবার তুলিয়া রাখিলাম।

যখনই আমার এই বলিষ্ঠ বাহু দুইটির দিকে তাকাই, তখনই মনে হয়, এই বাহু দুইটি থাকিতে কি করিয়া আমার পাশ হইতে খোকন পড়িয়া গেল! আমার ব্যায়ামলব্ধ এই বলিষ্ঠ দেহটার উপর ধিক্কার আসে।

এমন ভাগ্যের বিড়ম্বনা লইয়া বোধ হয় খুব কম লোকই পরীক্ষা দিতে আসে। এমন একটি প্রিয়জনের মৃত্যু লইয়া বোধ হয় অল্প লোকেরই রচনা লিখিতে হয়।

সুখী জীবনের আদর্শ

সুখী জীবনের নির্দিষ্ট আদর্শ নাই—সন্তোষ সুখের মূল—বিভিন্ন আদর্শ—অর্থ ও সুখ—জীবনের সার্থকতা।

জীবনের এমন কোন একটি বিশেষ ধারা নাই যে ধারায় চলিলে আমরা যথার্থ 'সুখী' আখ্যা পাইতে পারি। ব্যক্তিগত সুখী জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তবু কিছু বলা যায়, কিন্তু সাধারণ ভাবে সুখী জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এক জনের কাছে যাহা সুখের, অন্যের কাছে তাহা দুঃখের। ধনীর সম্পদের প্রতি তাকাইয়া দরিদ্র ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলে; দরিদ্রের সুন্দর স্বাস্থ্য নষ্টস্বাস্থ্য লক্ষপতির ঈর্ষার সামগ্রী। রাজকোষে রাজার মন ওঠে না, কিন্তু উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইয়া ভিখারী পরম আনন্দে গান করিতে করিতে তাহার আস্তানায় ফিরিয়া যায়। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে যখন শহরবাসী ঘরে বসিয়া হাঁফাইয়া উঠে, বৈদ্যুতিক পাখা ভিন্ন থাকিতে পারে না, তখন প্রখর কিরণ মাথায় লইয়া চাষীরা হাসিমুখে ক্ষেতের কাজ করে।

জীবনে সুখকে আয়ত্ত করিতে হইলে সর্বপ্রথম চাই সন্তোষ। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। কাঙ্ক্ষিত বস্তু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের অতৃপ্তি বাড়িতে থাকে। মরুভূমিতে মরীচিকার মত সুখের পিছনে ছুটিতে হয় যদি মনে শান্তি অথবা তৃপ্তি না থাকে। যে ব্যক্তি নিজের সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় সে কখনও সুখী হইতে পারে না। সুখ-ত নিজের সৃষ্ট জিনিষ। উপযুক্ত শিক্ষা এবং সংযম দ্বারা মনকে এভাবে তৈয়ারী করা উচিত যে, যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন মনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ যেন কিছুতেই নষ্ট না হয়। জীবনের সাফল্য এবং ব্যর্থতা পাশাপাশি চলে ঠিক আলো আঁধারের মত। জীবনে একটানা সুখের অধিকারী খুব কম লোকই হইতে পারে। তাই মনের শান্তির জন্য চাই সন্তোষ। দুঃখে ভাঙিয়া পড়িলে জীবনে উন্নতি করা যায় না। দুঃখ আসিয়া যখন জীবনকে দুর্বিসহ করিয়া তোলে, তখন নিজের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখীর কথা চিন্তা করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থ করিয়া তোলা উচিত।

অবশ্য অতৃপ্তিরও একটা মূল্য আছে। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই আমাদিগকে নব নব বস্তু লাভের চেষ্টায় উৎসাহিত করে। বর্তমান সভ্যতার গগনচুম্বী বিজয়-সৌধ এই অতৃপ্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। অতৃপ্তি জাতীয় জীবনকে উন্নত এবং শক্তিশালী করিতে পারে, কিন্তু শান্তি দিতে পারে না। তাই বর্তমান সভ্যতা আমাদের সুখ দিতে পারে, সম্পদ দিতে পারে, কিন্তু শান্তি বা স্বস্তি দিতে পারে না। অভাব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন করিয়া রাখে।

পূর্বেই বলিয়াছি, যেখানে জীবন-স্রোত অজস্র ধারায় ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে এমন বিশেষ একটি আদর্শের কথা বলা যায় না যাহা মানিয়া চলিলেই যথার্থ সুখ পাওয়া যায়। আবার তরুণ মনে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতে গেলেও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়।

তরুণ চিত্তে যখন যাহা ভাল লাগে, তাহারই ছাপ লাগিয়া যায়। কখনও মনে হয়, সংগ্রামজয়ী মহাবীর হইতে পারিলে জীবনে সুখী হইতে পারিব। আবার সন্তানহারা মাতার, স্বামীহারা নারীর, পিতৃহীন শিশুদের কথা ভাবিলে মনটা বিরূপ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম জানাই। তিনি আমাদের নিভৃততম ভাবকে ভাষা দিতে পারিয়াছেন, যিনি শাশ্বত জীবন-বার্তাকে মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবন-যাত্রা আমার কাছে কাম্য হইয়া ওঠে। আবার যখন দারিদ্র্যব্রত মহামানব গান্ধীজীর কথা মনে হয়, তখন ভাবি, যদি মহাত্মার মত পুণ্যচরিত্র নেতা হইতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবনে কত সুখীই না হইতে পারিতাম। এইরূপ নব নব উচ্চাশা, কল্পনা, শুভ সঙ্কল্প আসিয়া চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে।

লক্ষ্য উচ্চ হওয়াই কাম্য, কিন্তু লক্ষ্য বস্তুকে না পাইলে নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। জীবনে সুখী হইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন তবে অপরিমিত নয়। অপরিমিত অর্থের সদ্ব্যবহার হয় না। অর্থ কিছুই নয়, অনর্থের মূল ইত্যাদি সাধু উপদেশ সংসারী লোককে অর্থের প্রলোভন হইতে সতর্ক করিবার নিমিত্ত, অর্থের শক্তিকে হেয় করিবার জন্য নয়। জাগতিক সুখলাভ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া ধরা উচিত নয়। ইহা শুধু আমাদের জীবন-ধারণের সহায় মাত্র। ধনবান হইলেই যে সুখী হইব তাহা নয়, তবে আমাদের জীবনে অর্থের প্রয়োজন উপেক্ষার বিষয় নয়।

অর্থে, সামর্থ্যে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে চরিত্র-বলে সবার মাঝে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা হয়। জীবনে একটানা নিস্তরঙ্গ শান্তিলাভ সম্ভব নয়। ঝড়ঝঞ্ঝা ও বিপদ আসুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু জীবনের সার্থকতা চাই। জীবনে তখনই যথার্থ সার্থকতা আসে যখন মানুষ নিজের জীবনকে পরিচালিত করে 'বহুজন হিতায় বহুজন-সুখায় চ'। এই সার্থকতাই কাম্য, তাহাতেই প্রকৃত আনন্দ। আত্মোদর-পরায়ণ হইয়া প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না। সুখ ও আনন্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দশের সেবায়, দেশের সেবায়, মানব সেবায় পরম দুঃখ বরণ করিয়াও যে বিমল আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত সুখ, তাহাই কাম্য। তাই মনীষিগণ বলিয়াছেন, 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'—অল্পে সুখ নাই, ভূমাতে অর্থাৎ বৃহত্তেই সুখ। অর্থাৎ নিজের গণ্ডীবদ্ধ ব্যক্তি-জীবনকে বিশ্ব-জীবনের মধ্যে প্রসারিত করাতেই মানুষের সার্থকতা ও আনন্দ, তাহাই প্রকৃত সুখ। আরাম ও সুখ এক কথা নয়। আরাম মানুষকে আলস্যের দিকে, জড়তার দিকে আকর্ষণ করে। তাহাতে মনুষ্যত্বের অধোগতিই সূচিত হয়। পক্ষান্তরে মহৎ আদর্শের জন্য বিপদ্ বরণের এমন কি মৃত্যু বরণের মধ্যেও যে আনন্দ ও শান্তি লাভ হয়, তাহাই জীবনের পরম লাভ। তাই কবি বলিয়াছেন, 'অশান্তির অন্তরেতে শান্তি সুমহান্।' এই যে সুমহান্ শান্তি তাহাই প্রকৃত আনন্দ, তাহাই প্রকৃত সুখ। এই সুখ কেহ কাহাকেও দিতে পারে না।

তাহা অর্জন করিতে হয় নিজের শক্তিতে, নিজের সাধনায়। তাই মনীষী কণ্ঠে উৎসারিত হইয়াছে এই মহাবাণী—'সর্বমাত্মবশং সুখং সর্বং পরবশং দুঃখম্।' এই বাণী ব্যক্তি-জীবন ও সমষ্টি-জীবনের পক্ষে সমভাবে সত্য।

দেওয়ালী উৎসব

ভূমিকা—সময়—কেন্—উৎসবের অঙ্গ—কালীপূজা—তাৎপর্য—উপসংহার।

বাঙালীর সমাজ-জীবনে উৎসব অনুষ্ঠানের অন্ত নাই। বার-মাসে তের-পার্বণ, বৎসরের প্রথম দিনটি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দিন পর্যন্ত একটানা উৎসব লাগিয়াই আছে। বিভিন্ন ঋতুতে বাংলার গৃহে গৃহে নিত্য নব নব উৎসবের সমারোহ—সেই সকল উৎসব বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের সকল প্রকার অভাবঅনটন ও দুঃখ-দৈন্যকে মুছিয়া দিয়া তাহার প্রাণে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর জাতীয় জীবনে স্বতঃই বিরাজ করে এক কল্যাণময় প্রীতি-ইতিহাস যাহার প্রতিটি অংশ করুণাময় দেবতার স্নেহস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা স্বর্গ ও মর্ত্যের দুই সীমানাতেও স্নেহের বন্ধন প্রসারিত করিয়াছে—এমন একটি উৎসব হইতেছে 'দেওয়ালী'। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দেওয়ালী উৎসবের প্রাণসূত্রটি গাহিয়াছেন,

"দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি।'

শারদীয়া দুর্গাপূজার পরদিন হইতে প্রতি সন্ধ্যায় আকাশ-প্রদীপ জ্বালিবার রীতি আছে। প্রকৃতপক্ষে এই আকাশ-প্রদীপ দানে দেওয়ালী উৎসবের আবির্ভাব কাল সূচিত হয়। হেমন্তের ম্লান সন্ধ্যায়—আকাশ-প্রদীপ স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের বন্ধন ঘোষণা করে। পক্ষকাল শেষে কার্তিকী চতুর্দশী ও অমাবস্যাতে দেওয়ালী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

দেওয়ালী কথাটি সংস্কৃত দীপাবলী শব্দের তদ্ভব রূপ। কোন কোন পণ্ডিতের মতে দেওয়ালী এককালে বৌদ্ধ উৎসব ছিল।

আমাদের দেশে দেওয়ালী বা দীপান্বিতা উৎসবের প্রধান আকর্ষণ আলোকসজ্জা ও বাজী পোড়ানো। এই উৎসব বাংলা দেশের বাহিরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও উদ্‌যাপিত হয়। চতুর্দশীর সন্ধ্যায় প্রতি গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করে। অট্টালিকার আঙ্গিনায়, চত্বরে ও ছাদে যেন আলোর মেলা বসে। আকাশের নক্ষত্ররাজি যেন মর্ত্যভূমিতে নামিয়া আসে। পল্লীগ্রামের রূপটিও মনোহর হয়। চতুর্দশীর গাঢ় অন্ধকারে সারিবদ্ধ প্রদীপ এক আলোকের বন্যা সৃষ্টি করে।

দেওয়ালী উৎসবের দ্বিতীয় অঙ্গ অগ্নিক্রীড়া বা বাজী পোড়ানো। এই উপলক্ষে ভারতের প্রায় সর্বত্র বাজী পোড়ানোর মহোৎসব লাগিয়া যায়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া নানাপ্রকার বাজী তৈরী হয়। আতস বাজী, হাউই বাজী, তারা

বাজী, পটকা প্রভৃতি সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পুড়িতে থাকে। উহাদের কানফাটা আওয়াজে, তীব্র আলোয় ও বিচ্ছুরিত ধোঁয়ায় হর্ষ ও আতঙ্ক জাগে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা শহরের বাজীর মহড়া অত্যন্ত বেশী রকমের। এক দিকে আলোকমালার আভরণ ও অপর দিকে বাজীর তীব্র দ্যুতিতে দৃষ্টি-বিহ্বলতা আসে। মনে হয়, 'দেওয়ালী' কথাটির প্রকৃত অর্থ উৎসবের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। অন্য কোন উৎসবে এমন অন্তরঙ্গ ভাবটি জাগ্রত হয় না। অমাবস্যার রাত্রিতে এই উৎসব যেন অন্ধকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের সমারোহ। এক দিকে দীপমালা বিদূরিত করিয়া মর্ত্য ধরণীর অন্ধকার, অপর দিকে আতস বাজীগুলি উর্ধ্বলোকের তমোজাল ভেদ করিয়া মিতালি পাতায় আকাশের জ্যোতিষ্কমালার সঙ্গে। এই আলোর সংগ্রাম যেন এক দিকে বর্তমানের দুঃখ-দৈন্যের অন্ধকারের বিরুদ্ধে এবং অপর দিকে ভাবী কালের নৈরাশ্য-তিমিরের বিরুদ্ধে।

'দেওয়ালী' উৎসবের তাৎপর্য জনসমাজে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। দেওয়ালী উৎসব শক্তিসাধনার প্রতীক। আলোর মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, দেওয়ালী উৎসবে তাহাই অনুভূত হয়। জীবনের একঘেয়ে পথে এই উৎসব বৈচিত্র্য বহন করিয়া আনে, মনের বিশেষ ভাবগুলিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য বিচিত্র উৎসবের আয়োজন। ভবিষ্যৎ-অন্ধ মানুষের অনিশ্চয় পথকে আলোকিত করিয়া উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শক্তি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে যে সহস্র আলোক-বর্তিকার উৎসব, তাহার সহিত জনমানসের একাত্মতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই উৎসব শুধু বাংলার নয়, এই উৎসব সর্বভারতীয় উৎসব। এই দিনটিতে সমগ্র জাতি এক সঙ্গে ভারতব্যাপী অন্ধকার অপসারণের মহোৎসবে মাতিয়া ওঠে, ইহার তাৎপর্য সামান্য নয়। এই ঐক্যের তাৎপর্য যদি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি, তবেই এই উৎসব সার্থক হইয়া উঠিবে, নিছক ছেলে-খেলা মাত্র থাকিবে না।

অগ্নিকাণ্ড

প্রস্তাবনা—অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা ও দুর্ঘটনা—অগ্নি-নির্বাপনের চেষ্টা—অগ্নিকাণ্ডের পরে।

গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িয়াছিল। অনেক দিন কোথাও না যাওয়ায় কেমন যেন একঘেয়ে লাগিতেছিল। মামা প্রত্যেক বারেই যাইতে লিখেন, কিন্তু যাওয়া হয় না। এবার বাবার মত লইয়া মামাবাড়ী যাওয়া ঠিক করিলাম। আনন্দের আতিশয্যে সঙ্গে কি লইব, কি করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। একা যাইব, এই আনন্দটাই বেশি। সাবালক হইয়াছি, এই কথা ভাবিয়াই বোধ হয় বেশি মাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলাম। মার অনেক সাবধানতা ও সতর্কতামূলক উপদেশ লইয়া রওনা হইলাম।

আমাকে পাইয়া মামা মামীমা এবং ভাই-বোনেরা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সন্ধ্যাবেলায় দোতলায় বারান্দায় বসিয়া চা খাইতেছিলাম, হঠাৎ একটা বিকট

হাসির শব্দে চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। 'এ কি?' দাদা নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, "ও বাড়ীর গিন্নি পাগল কি না, তাই এ ভাবে হাসছেন।" ওদের অভ্যস্ত কানে কিছুই মনে হইল না। আমি কেবল ভাবিতেছিলাম, মানুষের হাসি কি এত বিকট হইতে পারে? উৎসুক হইয়া রেলিং হইতে ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলাম। একজন মহিলা একটি ৫।৬ বছরের খোকাকে লইয়া ঠিক ছেলে-মানুষের মত দেখিতেছেন। শুনিলাম, পাগল হইলেও ছেলেটিকে নাকি কিছু বলেন না। ছেলেটি কাছছাড়া হইলে অস্থির হইয়া পড়েন। পাগলামি তাহার মাতৃ-হৃদয়কে একেবারে নষ্ট করিতে পারে নাই।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা সবাই মিলিয়া গল্প করিতেছি, একটা অদ্ভুত শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম। বুঝিলাম, পাগলের বাড়ী হইতে শব্দটি আসিতেছে। আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া দেখিতে গেলাম—দেখিলাম, ঘরের ভিতর হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম—ও বাড়ীতে এত ধোঁয়া কেন? দাদা বলিলেন—উনানে আগুন দেবার জন্য বোধ হয়। আমার যেন কেমন সন্দেহ হইল, আবার দেখিতে গেলাম। ঘরের ভিতর হইতে একটি শিশুর আর্তনাদ শুনিলাম, আর দেখিলাম জ্যোৎস্নালোকে মহিলাটি মাথা নীচু করিয়া পায়চারী করিতেছেন। একটু অন্যমনস্ক হইয়া অন্য দিকে তাকাইয়াছিলাম, চোখ ফিরাইতেই দেখিলাম উহাদের শোবার ঘর হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। আমি ছুটিয়া গিয়া জানাইলাম, পাশের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। ছুটাছুটি করিয়া যাইয়া দেখিলাম গৃহখানি সম্পূর্ণ অগ্নিময়। ভিতর হইতে একটি শিশুর আর্তনাদ শুনিলাম। ছুটিয়া দরজা খুলিতে গেলাম, দেখিলাম তালাবন্ধ। কিছুক্ষণ আগে দেখিয়াছি বাড়ীর ভদ্রলোক বাহিরে গিয়াছেন—বোধ হয় কোন জরুরী কাজে। কাহাকে জিজ্ঞাসা করি। উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। তালা বন্ধ কে করিয়াছে এবং চাবি কোথায়, মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কিছুই উত্তর দিলেন না, অর্থহীন চোখে তাকাইয়া আবার পায়চারী আরম্ভ করিলেন। ভগবানের অদ্ভুত লীলা। পাগল হইয়াও যিনি এক মিনিটের জন্য সন্তানের অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না, যিনি সন্তানকে দিবারাত্রি ছায়ার মত অনুগমন করেন, তাহার আজ এ কি খেয়াল! অদৃষ্টের এ কি পরিহাস, মা হইয়া সন্তানকে আগুনে দগ্ধ করিবার প্রয়াস।

আমি ছুটিয়া গিয়া তালাটি ভাঙ্গিলাম। ইতিমধ্যে ঘরের ভিতরে আগুনের মাতামাতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। দেখিলাম, খোকাটি দরজার কাছেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে কোলে লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। ছেলেটির দেহের অনেক জায়গা পুড়িয়া গিয়াছিল। দাদা ডাক্তারি পড়িতেন, শিশুটিকে লইয়া আমাদের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। অন্যান্য ডাক্তারের সাহায্যে ছেলেটির প্রাথমিক চিকিৎসা ভালভাবেই করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের সেবক-সমিতির ছেলেরা কলসী, বালতি প্রভৃতি লইয়া আসিল। তাহারা

প্রাণপণে আগুন নিভাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মহিলাটি পূর্ববৎ পায়চারী করিতেছিলেন। তাঁহার মুখে একটুও উদ্‌বেগের ছায়া পড়ে নাই। যেন কিছুই হয় নাই।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকটি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখের ভাব বর্ণনা করা যায় না। সৌম্য শান্ত বেদনা-মাখা মুখখানা দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি ছুটাছুটি করিলেন না, হা-হুতাশ করিলেন না,, এমন কি দীর্ঘনিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলিলেন না, যেন তিনি এই অগ্নিকাণ্ডের নিরপেক্ষ দর্শক। বুঝিলাম, পাগল স্ত্রীকে অত যত্ন করিয়া পোষণ করিতে হইলে এমন মানুষই দরকার। তাঁহার করুণ মুখখানা আমাকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিল। কাছে গিয়া ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বলিলাম। শুনিয়া তিনি ঠোঁটের কোণে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা ভাল আছে ত?" কান্নার রূপান্তর এই হাসিটুকু যে কি বেদনাদায়ক তাহা না দেখিলে বোঝান যায় না। আমি বলিলাম, "ঠিক ভাল নেই, শরীরের কিছু কিছু জায়গা পুড়েছে এবং অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।" তাঁহার এই অভিশপ্ত জীবনে একমাত্র লক্ষ্য এই শিশুটির অসুস্থতার সংবাদে ভদ্রলোক একটু যেন অস্থির হইলেন। তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া গেলেন ; যাইবার সময় স্ত্রীর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখো'। কোথাও একটুকু কর্তব্যের বিচ্যুতি নাই। তখনও আগুন কিছু কিছু জলিতেছিল। মহিলাটি ঐ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। আমি বাধা দেওয়াতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা কোথায় আছে?" আমি আঙ্গুল দিয়া আমাদের বাড়ী দেখাইয়া দিলাম। বুঝি বা ক্ষণিক সুপ্ত মাতৃ-হৃদয় জাগিয়া উঠিতেছিল। দেখি, মহিলাটির চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছে। আমি আস্তে আস্তে তাঁহার হাতখানা আকর্ষণ করিলাম। তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে খোকা যে ঘরে ছিল সে ঘরে লইয়া গেলাম। প্রথমে ছেলেটির পাশে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া জ্ঞানহারা সন্তানটিকে বুকে জড়াইতে চাহিলেন। আমি ভদ্রলোকটির ইঙ্গিতে আস্তে তাঁহার হাতখানা ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ বাহিরে থাকিয়া আবার তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন, আস্তে খোকার বিছানার পাশে বসিলেন। সেই যে বসিলেন আর উঠিলেন না। অপলক নেত্রে সন্তানের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মুখে তাঁহার কোন অস্বাভাবিক ভাব ছিল না, শুধু একটা বেদনার ছাপ ছিল। এত বড় আঘাতে বোধ হয় তাঁহার মাতৃ-হৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের শত অনুরোধেও তিনি উঠিলেন না, জলস্পর্শ পর্যন্ত করিলেন না।

একটি চেয়ারের আত্ম-কাহিনী

উপক্রমণিকা—জন্ম-বৃত্তান্ত—দোকানের জীবন—গৃহের জীবন—দুঃখময় কাহিনী—শেষ পরিণতি।

শিরোনামা দেখেই তোমাদের হয়ত হাসি পাচ্ছে, আবার অনুকম্পাও হচ্ছে। একটা চেয়ার, তার আবার আত্ম-কাহিনী—এই তো তোমরা ভাবছ। বড় বড় মহাপুরুষ, রাজনীতিজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এঁদেরই আত্মকাহিনী তোমরা সবাই পড়তে অভ্যস্ত। তাই সামান্য একটা কাঠের তৈরী চেয়ারের আবার আত্ম-কাহিনী হ'তে পারে এ তোমরা ভাবতেই পার না। আমি একটা সামান্য চেয়ার, গদিমোড়া নয়, শুধুমাত্র কাঠের তৈরী। চেয়ারের আবার জাতিভেদও আছে। ধর, আমি যদি কোন বিখ্যাত ব্যক্তির ব্যবহারের চেয়ার হ'তাম, অথবা শাহ্‌জাহানের ময়ূর-সিংহাসনের মত আমার কোন গৌরবময় ঐতিহ্য থাকত, তবে তোমরা নিশ্চয়ই আমার ইতিকথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে। কিন্তু না—আমি সত্যিই সামান্য—আমি সত্যিই তুচ্ছতম। কিন্তু তুচ্ছের কি এই পৃথিবীতে দাম নেই? আজ যদিও আমি সামান্য, তবুও আমার ইতিবৃত্ত আছে, আত্ম-কাহিনী আছে, যা অন্য আর পাঁচজনের জীবন-কাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর।

এই পৃথিবীতে এসে অনেক কিছু দেখলাম। আমি প্রথমে কিন্তু চেয়ার ছিলাম না। আমি বৃক্ষরূপে তোমাদের সকলের চোখের অন্তরালে এক নিবিড় অরণ্যানীর বুকে বিরাজ করছিলাম। সেখানে আমি সত্যিই সুখে ছিলাম। ভোরবেলায় পাখিদের কলকাকলীতে আমার ঘুম ভাঙত, সন্ধ্যাবেলায় নদীর সুমধুর কলধ্বনি আমার চোখে এনে দিত ঘুমের পরশ।

তারপর এল আর এক অধ্যায়। এক দিন এক দল লোক এল সেই বনে। তারা এসে নির্দয়ভাবে গাছ কাটতে লাগল। একদিন তারা কুঠার দিয়ে আমাকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। আমি বেদনায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। সমস্ত বন যেন আমার ব্যথায় ব্যথিত হল। আমার দেহকে খণ্ড খণ্ড করে টুক্‌রো করে তারা আমাকে আমার অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে গাড়ী করে নিয়ে এল শহরে। তারা আমাকে নিয়ে তুলল এক কাঠের আড়তে।

একদিন সুবিশাল করাত দিয়ে আমার দেহকে চিরে ফেলা হল এবং আমাকে এক ছুতারের দোকানে নিয়ে বিক্রী করা হ'ল। সেখানে সুনিপুণ ছুতার হাতুড়ী বাটালির সাহায্যে আমাকে নানা আকারের নানা খণ্ডে পরিণত করল এবং অপার দক্ষতায় জুড়ে দিয়ে আমাকে রূপান্তরিত করল এই চেয়ারে। আমার দেহে রঙ দিল, বার্নিশ করল, চেহারাটা আমার সুশ্রীই হ'ল।

দোকানে এই ভাবে কয়েক দিন কাটাবার পর এক দিন এক জন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আমাকে কিনে কুলির মাথায় চাপিয়ে দিলেন। আবার অজানা পথে যাত্রা শুরু হ'ল। শহরের রাস্তায় কিছুক্ষণ চলার পর একটা ছোট একতলা বাড়ীর দোরে ভদ্রলোক থামলেন। ছোট পরিচ্ছন্ন বাড়ীটি—আমার বেশ ভাল

লাগল। বাড়ীর মধ্যে আমাকে নিয়ে একটা ঘরে রাখা হ'ল। তারপর ভদ্রলোক 'খোকা' 'খোকা' বলে ডাকতে লাগলেন। একটি কিশোর আর একটি কিশোরী দৌড়ে এল। ভদ্রলোক বললেন, "দেখ্, তোদের জন্য কি এনেছি"—বলে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। ছেলেটি মহানন্দে আমার দিকে দৌড়ে এল—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখল, আমার গায়ে হাত বুলাল। একবার বসল, তারপর বলল—"বেশ সুন্দর।" নিবিড় অন্তরঙ্গতার স্পর্শ আমার প্রাণে শিহরণ জাগালো। আমি যেন খোকার মধ্যে সহৃদয় বান্ধবের সন্ধান পেলাম।

ভদ্রলোক বিপত্নীক, এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন, নাম হীরেনবাবু। ছেলে মেয়ে দু'টি স্কুলে পড়ে—সুশান্ত ও রমা। দুই ভাই-বোন চেয়ারে ব'সে পড়ে। সেই দু'টি কিশোর-কিশোরীর প্রাণ-মাতানো চাপল্য আমার মন ভরে দেয়। তাদের বন্ধুরা আসে—আমার উপর ব'সে কত কি গল্প করে তারা—পড়াশুনার, খেলাধূলার স্কুলের। দুপুরে যখন দু'জনে স্কুলে যায়, তখন আমি একা পড়ে থাকি। বড় একা লাগে। আকুলভাবে প্রতীক্ষা করি কখন ওরা আসবে। সন্ধ্যাবেলা ঝি এসে ঘরে আলো দিয়ে যায়—ভাই-বোন এসে পড়তে বসে। কিছুক্ষণ পরে ওদের বাবা আসেন পড়ার তদারক করতে।

এইভাবে দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল। নিত্য নূতন বৈচিত্র্যের আস্বাদে আমি বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু সুখ আমার কপালে নেই। সেই ছোট পরিবারের এবং আমার জীবনের দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। হঠাৎ এক দিন হীরেনবাবু স্নান করতে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। সুশান্ত আর রমা দিশেহারা—বাড়ী-ঘর লোকে ভরে গেল। ডাক্তার এলেন। সুশান্ত-রমার মামাকে টেলিগ্রাম ক'রে আনা হ'ল। তিন দিন পর হীরেনবাবু ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-পরিজন, অগণিত ছাত্র ও সহকর্মীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন। সুশান্ত-রমার সে কি বুকফাটা আর্তনাদ, পাষাণও বোধ হয় গলে যায়।

তারপর—তারপর আমার কথাটা ফুরালো। ঠিক হ'ল সুশান্ত-রমা মামার সঙ্গে চলে যাবে—সেখানে লেখাপড়া করবে। ওদের বাড়ীর সব জিনিসপত্র একে একে বিক্রি হ'তে লাগল। আমিও বাদ গেলাম না। ওদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে—এই ব্যথায় বুক ফেটে যেতে লাগল, আমার ব্যথা বুঝবে কে? আমাকে বিক্রি করা হ'ল এক ছুতারের কাছে।

আমি ভাঙামনে দোকানে পড়ে আছি। আমাকে নতুন খদ্দেরের কাছে বিক্রি করার জন্য আমার গায়ে নতুন ক'রে রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। আবার আমার যাত্রা কবে শুরু হবে, কোথায় যাব, জানি না। সুশান্ত ও রমার কথা ভাবি, ওরা কেমন আছে, আমার কথা মনে করে কিনা জানি না—কিছুই জানি না। প্রার্থনা করি, ওরা মানুষ হোক, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, ফুলে ফলে ভরে উঠুক ওদের জীবন।

আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ

আবাল্যের কল্পনা-জড়িত রামায়ণ—রামায়ণের আদর্শ—রামায়ণ ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস—প্রভাব—বিভিন্ন চরিত্র—পারিবারিক জীবনের আদর্শ—গৃহাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য—রামায়ণের শিক্ষা।

গ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হইবার পূর্বে যে গ্রন্থখানি আমার শিশু-মনকে বিস্ময়ে, আনন্দে, বেদনায় এবং সহানুভূতিতে আবিষ্ট করিয়া রাখিত, সেই রামায়ণ আজও আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ। রামায়ণ আমাকে শুধু শৈশবেই মুগ্ধ করে নাই, কৈশোরেই আকৃষ্ট করে নাই, এখনও আমি উহা তন্ময় হইয়া পড়ি। পড়িতে পড়িতে উহার আদর্শোজ্জ্বল চরিত্রসকলও ভারতভূমির শাশ্বত সনাতন গৌরবময় উজ্জ্বল রূপটি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে, সম্ভ্রমে মাথা নত করি। যুগ যুগ ধরিয়া এই গ্রন্থখানি দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া রাজার গগনচুম্বী প্রাসাদ পর্যন্ত সমভাবে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধাধারা এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বর্ধিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তা শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। ইন্দোনেসিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানেই ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে, সেখানেই গ্রন্থখানি শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে এবং সেই সকল অধিবাসীর জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে।

রামায়ণ আমাদের অতি পবিত্র গ্রন্থ, শুধু পবিত্র নয়, অতি প্রিয়। রামায়ণ আমাদের জীবনের উৎস ও আদর্শ, আমাদের শান্তি ও প্রাণের আনন্দ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ইহা আমাদিগকে প্রেরণা দিয়াছে, আদর্শ দিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে, আর দিয়াছে পরম শান্তি। পিতাকে পুত্রকে ভ্রাতাকে জায়াকে মাতাকে বন্ধুকে সেবককে রাজাকে প্রজাকে রামায়ণ যে আদর্শ শিক্ষা দিয়াছে, তাহা চিরকালের শাশ্বত আদর্শরূপে বিরাজ করিবে। পিতার সত্য রক্ষার্থ রামচন্দ্রের সিংহাসন ত্যাগ ও বনগমন, পতিব্রতা সীতার স্বামীর অনুসরণ, ভ্রাতৃপ্রেমের মূর্ত বিগ্রহ অনুজ লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন, রামচন্দ্রের বনবাসে বিক্ষুব্ধ ভরতের সিংহাসন ত্যাগ ও স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ, বীরভক্ত হনুমানের অসাধারণ নিষ্ঠা ও আজ্ঞানুবর্তিতা—রামায়ণের এই সকল আদর্শ ভারতবাসীকে যুগ যুগ ধরিয়া প্রেরণা দিয়াছে। ইঁহারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী। 'ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নয়, রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য।' বাল্যকালে আমরা রামায়ণের কাহিনী তন্ময় হইয়া শুনি, পরিণত বয়সে তাহাই জীবনের জটিল কর্মক্ষেত্রে আলোক-বর্তিকার ন্যায় পথ নির্দেশ করে।

"রামায়ণ শুধু আদর্শ বা উদ্দেশ্যমূলক গ্রন্থ নয়, সুন্দর কাব্যরসসিক্ত একখানা মহাকাব্য। ইহা কেবল মহাকাব্য নয়, ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাস—ঘটনাবলীর বা সময়বিশেষের ইতিহাস নয়, ইহা ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন নাই।

ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই বিপুল কাব্য-হর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।" —রবীন্দ্রনাথ

বাল্মীকি-রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণ অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। বাংলার কৃত্তিবাস অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বসাধারণের জন্য রামায়ণ রচনা করিয়া বাঙালীর ঘরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন।

চিরদুঃখিনী সীতার দুঃখে সহানুভূতির অশ্রু ও দীর্ঘ-শ্বাস-বিজড়িত এই গ্রন্থখানি। রামের দৃঢ় পৌরুষ ও কর্তব্যনিষ্ঠা, লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র, সীতার পতিভক্তি, উর্মিলার আত্মত্যাগ প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইলেও ইহা ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে। কবির অমর-তুলিকার স্পর্শে রামায়ণে তৎকালীন সামাজিক চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। রামায়ণকে কেন্দ্র করিয়া কত কাব্য, কত গাথা, কত নাটক, কত গান যে যুগ যুগ ধরিয়া রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কবি দেব-চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই, মানব-চরিত্রকেই দেবত্বে উন্নীত করিয়াছেন। প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ-মমতা ও দুর্বলতা লইয়া যে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, কবি রামায়ণে সেই মানব-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রামায়ণ পড়িতে পড়িতে পাঠকগণ পুলকে শিহরিয়া উঠে, কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হয়, পতিভক্তি দেখিয়া মস্তক অবনত করে, পুত্র-স্নেহাতুর পিতার পুত্রশোক দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অপূর্ব ভ্রাতৃভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হয় এবং দুর্বৃত্তের দুরভিসন্ধি দেখিয়া ভীত ও আতঙ্কিত হয়। মাতৃভাবে পূর্ণ রাম-জননী কৌশল্যার সপত্নী-পুত্রদের প্রতি সমব্যবহার চিরদিনই তাঁহাকে ভারতের নারীদিগের আদর্শস্থল করিয়া রাখিবে। হনুমানের প্রভুভক্তি, রামের পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন, ভরতের কর্তব্যপরায়ণতা, লক্ষ্মণের অপূর্ব ভ্রাতৃভক্তি, প্রজারঞ্জনের জন্য রামের সীতা-বনবাস, দশরথের সত্য-পালনের নিমিত্ত প্রাণপ্রিয় সর্বগুণাকর পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ, রাম-লক্ষ্মণের বীরত্ব প্রভৃতি শিক্ষিত হইতে অশিক্ষিত, শিশু হইতে বৃদ্ধ, সকলেই চিরকাল আনন্দ এবং বিস্ময়ের সহিত পড়িবে।

"আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান ছিল, এই কাব্য তাহাই প্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না। গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থ মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি; রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।" —রবীন্দ্রনাথ

রামায়ণ মহৎ আদর্শের বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টিতে অনুপম। এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, মানুষের মহৎ জীবন যাপনের শাশ্বত প্রেরণা। রামায়ণ হইতে আমরা সকল রকম মহৎ কর্মের প্রেরণা পাই। এই আদর্শ আমাদের চোখের সামনে আছে বলিয়া ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ভারতের নারী কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী হইয়া ঘরে ঘরে আনন্দ ও শান্তি দান করিতেছে; দলে দলে যুবক দেশের জন্য দশের জন্য আত্মদান করিতেছে, ভাই ভাইকে সুনিবিড় স্নেহ-আলিঙ্গনে বুকে লইতেছে, কত কবি সাহিত্যিক ইহা হইতে কাব্যরস সঞ্চয় করিতেছেন। বস্তুতঃ, রামায়ণ শাশ্বত ভারতের মহোন্নত আদর্শ ও প্রেরণার অন্যতম উজ্জ্বল প্রতীক।

বিতর্ক-সভার প্রয়োজনীয়তা

বিতর্ক-সভার সংগঠন— বিতর্ক-সভার প্রয়োজনীয়তা—ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও যুক্তিতর্ক—অনুশীলন আবশ্যক—রাষ্ট্র-পরিচালনায়—উপকারিতা।

এখন স্কুলে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্লাবে, লাইব্রেরীতে 'বিতর্ক-সভা' গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজীতে ইহাকে Debating Society বা Debating Club বলে। এই ধরণের সভায় কোন একটি বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। আলোচনায় সাধারণতঃ দুই পক্ষ থাকে এবং এক জন সভাপতি ও একাধিক বিচারক থাকেন। যে বিষয়ে আলোচনা হয় তাহা লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক চলিতে থাকে। দুই পক্ষই যুক্তির সাহায্যে নিজেদের বক্তব্যের সমীচীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পায়। সর্বশেষে সভাপতি দুই দলের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া নিজের বক্তব্য সভার সামনে তুলিয়া ধরেন। বিচারকগণের রায় এক্ষেত্রে চূড়ান্ত। কখনও শ্রোতাদের মতামতও গৃহীত হয়।

বর্তমান যুগ ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের মত আছে। সে তাহার বক্তব্য দশের সামনে তুলিয়া ধরিতে চায় এবং দশের স্বীকৃতিও সে কামনা করে। প্রত্যেকের এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কারণ নিজের মত শুধু ব্যক্ত করিলেই চলিবে না। নিজের মতকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উহা যুক্তিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক এবং বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে মতে যদি কোন ত্রুটি থাকে, সেই ত্রুটি ধরাইয়া দিতে গেলে রীতিমত যুক্তির অবতারণা করিতে হয়। অন্য দিকে, যাহার মত খণ্ডন করা হইতেছে তিনিও নিজের মতকে অভ্রান্ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। প্রত্যেকেই নিজের বক্তব্য যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান।

শুধু গলাবাজি করিয়া মত প্রতিষ্ঠা করিলে চলে না। যুক্তির দ্বারা তাহার যাথার্থ্য বা সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়। অনেক সময় এমনও হইতে পারে যে, আমি যাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছি তাহাতে এমন কোন ত্রুটি ছিল যাহা আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। অথচ অন্যেরা তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া ধরিতে পারিয়াছে। আমি যাহা এক দিক হইতে বিচার করিয়া খাঁটি বলিয়া মনে করি, আর এক জন তাহা আর এক দিক হইতে বিচার করিয়া ভুল বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। কাজেই নিজের মতটি প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে খুব সতর্ক-ভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার। বিপক্ষের যুক্তি সম্বন্ধেও অবহিত থাকা দরকার। এই ভাবে নানা মতের তুলনার ভিত্তিতেই নিজের মতকে দৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হয়।

বর্তমান যুগে তাই প্রত্যেকটি মতই যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সেই কারণে যুক্তি-তর্কের সুষ্ঠু অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজন-বোধ স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্লাবে, লাইব্রেরীতে বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। কিন্তু এই অনুশীলন কেবল গ্রন্থপাঠের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রয়োগ-বিদ্যার দ্বারাই তাহা সম্ভবপর। বাস্তব ক্ষেত্রে তর্ক-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াই আমরা তর্ক-বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারি। অন্যের সঙ্গে তর্কে বা বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই পরস্পরের তর্ক-শক্তি বা বিচার-শক্তির গুণাগুণ ধরা পড়ে। মনে রাখিতে হইবে যে, কলহের দ্বারা কোন মতের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। কারণ কলহের দ্বারা কোন সুবিচার হয় না।

যুক্তি-বিচারের পথ ধরিয়া মতামতের সত্যাসত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বিতর্ক-সভার প্রয়োজন। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই বিতর্ক-সভার প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। দেশের ও সমাজের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের পরিচালকরাও এই ধরণের বিতর্ক-সভার ব্যবস্থা করেন। সেখানে সকলেই নিজ নিজ মত জ্ঞাপন করেন। এই বিতর্ক-সভার কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে। প্রত্যেকের নিজস্ব অভিমত প্রয়োগের সীমা ও সময় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কেহ নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগের অপব্যবহার করিতে পারেন না। তাহাকে সভার নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। কাহারও ক্ষেত্রে যদি ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে সভাপতি তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন। কেহ যদি বক্তৃতা দিতে দিতে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথ ধরেন অথবা অসংযত আচরণ করেন, সভাপতি তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন। বক্তারা সময়ের যথেচ্ছ অপব্যবহার করিতে পারেন না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেকের বক্তব্য শেষ করিতে হয়। ফলে প্রত্যেককেই সীমিত ভাবে যুক্তিযুক্ত মত প্রকাশ করিতে হয়।

বর্তমানে স্কুল-কলেজে যে বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে এই নিয়মগুলি সতর্কভাবে পালন করা উচিত। ইহার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীরা একদিকে যেমন যুক্তি-তর্কের অনুশীলন করিতে পারে, অন্য দিকে তেমনিই নিয়ম-কানুন সম্বন্ধেও সচেতন

হইতে পারে। ভবিষ্যতে বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে তাহারা নিজেদের যুক্তি-বিচারের সার্থক পরিচয় দিতে পারে। বিতর্ক-সভা মানুষের চিন্তাশক্তি, বাকৃপটুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, মার্জিত রুচি ও উপস্থিত বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি বাক্-বিভূতির বিস্তার দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, বিতর্ক-সভাই তাহার বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা মানুষকে পরমতসহিষ্ণু ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোলে। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনে ব্যক্তিত্ব গঠনে ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। বিতর্ক-সভার শ্রোতারাও নানা ভাবে উপকৃত হন—একদেশদর্শিতা ও অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া তাহাদের মনের প্রসার ঘটায়। সত্যের মূল্যায়ন করাও সহজতর হয়। শাস্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।" যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে। যুক্তিই বিতর্ক-সভার প্রাণ।

কলিকাতা

কলিকাতার ইতিবৃত্ত—নামকরণ—ভারতের নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র—রাজনৈতিক আন্দোলন-কেন্দ্র—বিদ্যা ও শিক্ষাকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক জীবন—পুণ্যপীঠ কলিকাতা—শিল্প-বণিজ্য-নগরী—কলিকাতা ঋতুর শোভা।

আজকের প্রাসাদময়ী ঐশ্বর্যময়ী কলিকাতা মহানগরী আড়াই শত বর্ষ পূর্বে ছিল ছোট ছোট তিনটি ক্ষুদ্র গ্রাম-- সুতানুটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুর। কুঁড়েঘর, ঝোপ-জঙ্গল, নালা-ডোবা, বাঘ-ভালুক আর ডাকাতের দল—এই নিয়ে ছিল সেদিনের কলকাতা।

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ জব চার্নক পণ্য-বোঝাই জাহাজ নিয়ে এসে কলকাতায় নোঙর করেন এবং পত্তন করেন ইংরেজের বাণিজ্য-কেন্দ্র। কলকাতায় এসে জব চার্নক পোর্তুগীজ, আর্মানী, গ্রীক, ইহুদী, হিন্দু, মুসলমান সকলকে নানা সুযোগ-সুবিধা দানের কথা ঘোষণা করে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য আহ্বান জানালেন। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ-কোম্পানি বাংলার সুবাদারের অনুমতি নিয়ে স্থানীয় জমিদারের নিকট হতে মাত্র ১২০০ টাকা খাজনায় কলকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর গ্রামের ইজারা নেয়।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। বাণিজ্য-কেন্দ্র কলকাতা পরে রাষ্ট্রকেন্দ্ররূপে নবমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড-রূপে দেখা দিলে কলকাতার উন্নতিও দ্রুত হতে দ্রুততর হতে থাকে। দিগ্বিজয়ী ফরাসী বীর নেপোলিয়ন যে জাতকে 'দোকানদারের-জাত' ('a nation of shop-keepers') বলে অভিহিত করতেন, তারাই ভাগ্যচক্রে রাজশক্তিরূপে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করল, আর কলকাতা সেই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজধানীর গৌরব লাভ করল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার এই গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল।

কলকাতার সাধুভাষার রূপ 'কলিকাতা' নাম সম্বন্ধে অনেক মত প্রচলিত আছে! কেহ কেহ বলেন, কলি চূণ তৈরীর কেন্দ্র ছিল ব'লই কলিকাতা নাম হয়েছে। কলকাতার চৌরঙ্গীর নাম বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য চৌরঙ্গীনাথের নামে হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন, যেমন—চিত্রেশ্বরী দেবীর নামে চিৎপুরের নাম হয়েছে।

কলকাতা ভারতের নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকে সামাজিক, ধর্ম্য, শিক্ষা-বিষয়ক, রাজনৈতিক সর্ববিধ চিন্তা ও কর্মধারা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালীই এ দেশে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য ও সভ্যতার মৃতসঞ্জীবনী আকণ্ঠ পান করেছিল এবং কলকাতার বাতায়ন-পথেই সেদিন পাশ্চাত্যের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি ভারতে প্রবেশ করেছিল। কলকাতার দর্পণেই সেদিন প্রতিফলিত হয়েছিল পাশ্চাত্য ভাবধারার ঔজ্জ্বল্য।

পাশ্চাত্যের স্বাধীন চিন্তাধারা আমাদের চিত্তে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করে এবং এরই ফলে শুরু হয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ও পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলন; ভারতের রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলায় কলকাতার নেতৃবৃন্দ ও জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ও শিক্ষাকেন্দ্র এবং সংস্কৃতির পুণ্যপীঠ; ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ব্যতীত ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অবশিষ্ট অংশ পাঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এবং সিংহল ইহার অধীন ছিল। বর্তমানে এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এখানে কয়েক শত স্কুল-কলেজ আছে। এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য-পরিষদ লাইব্রেরী, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, কমার্শিয়াল লাইব্রেরী প্রভৃতি জ্ঞানপীঠ অবস্থিত। এখানে কতকগুলো প্রথম শ্রেণীর স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ আছে যা ভারতের অন্য বড় বড় শহরে বিরল। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অন্যান্য চারু ও কারুশিল্প শেখার প্রতিষ্ঠানও অনেকগুলো আছে।

কলকাতার ইতিহাস একদিকে চমকপ্রদ ও গৌরবময়, অন্য দিকে বেদনা-দায়ক। এখানে সিরাজের হাতে ইংরেজের পরাজয় ঘটে, এখানে ইংরেজ মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি দেয়। এখানেই বিপ্লবী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন জন্ম নিয়েছে এবং এরই কারাগারে বিপ্লবী বীর যোদ্ধারা স্বাধীনতার জন্য ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছেন, দুঃসহ অত্যাচার সহ্য করেছেন। এরই ধূলোমাটি ও আকাশ-বাতাস কত মহাপুরুষের সঙ্গ পেয়ে পবিত্র হয়েছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, কত কত মনীষীর ভাবনা-কল্পনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এই কলকাতা নবভারতের পুণ্যপীঠ, নবযুগের পবিত্র তীর্থ।

কলকাতা পূর্বোত্তর-ভারতের বৃহত্তম শিল্প-বাণিজ্য নগরী ও বন্দর। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যে দু'টি প্রধান পণ্য পাট ও চা, তা এই বন্দর দিয়েই বিদেশে রপ্তানি হয়। কলকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি সবচেয়ে ব্যাপক—পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং পশ্চিম-উত্তরে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও কাশ্মীর। কাজেই কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এখানে জাহাজ নোঙ্গর করার, নির্মাণ বা মেরামত করার এবং মালপত্র বোঝাই ও খালাস করার বিরাট ব্যবস্থা আছে। এই বন্দরের পরিচালনা 'কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট' নামে একটি সংস্থার হস্তে ন্যস্ত।

প্রকৃতি-জগতে যে ঋতুগুলি বিশ্ব-প্রকৃতির শোভা বাড়ায়, কলকাতায় তাদের দেখা পাওয়াই ভার। একমাত্র শুষ্কতপ্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষণমুখর বর্ষাকে আমরা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করার প্রয়াস পাই। বর্ষাকালে অট্টালিকাময়ী কলকাতার ম্লান দৃশ্য উপভোগ্য না হলেও বর্ষায় রবীন্দ্র সরোবরের সবুজ শোভা এবং গড়ের মাঠের বিস্তীর্ণ শ্যামলিমা ও পশ্চিম আকাশের সূর্যাস্তের বিচিত্র রঙের লীলা শুধু কবি চিত্তে নয়, সাধারণ মানুষের চিত্তের পুলক জাগায়। আর বিভিন্ন ঋতুতে পথপার্শ্বের ও গড়ের মাঠের ফুলের শোভা ও বসন্তকালের প্রাণজুড়ানো দক্ষিণা বাতাসও কম উপভোগ্য নয়।

কলিকাতার সমস্যা

শিল্প-বিপ্লবের পথিকৃৎ—বাণিজ্য-কেন্দ্র—ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য—অশান্ত কলিকাতা—জনতার চাপ—পরিবহণ, পানীয় জল, বস্তি উন্নয়ন, জল নিকাশ, বাসগৃহ, বেকার সমস্যা—কলিকাতার ভবিষ্যৎ—মেট্রোপলিটান সংস্থা—ফরাক্কা বাঁধ, হলদিয়া বন্দর।

শিল্পনগরী কলকাতায় বিগত দেড়-শ বছরে হাজার হাজার ফ্যাক্টরি ও মিল গড়ে উঠেছে। পশ্চিম ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের ফলে বাষ্প ও বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রপাতি যে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, ভারতবর্ষে কলকাতাই সেই শিল্প-বিপ্লবের পথিকৃৎ। কলকাতা বন্দরের মাধ্যমেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছে, কলকাতাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে শিল্প-বিপ্লব প্রবর্তন করেছে। ভাগীরথীর তীরে তীরে, রেলপথের ধারে ধারে, রাজবর্ত্মের আশে-পাশে অসংখ্য মিল ফ্যাক্টরি ছোট-বড় চিমনি তুলে দিনরাত লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর কর্মকোলাহলে সারা শহরকে সজীব ও সক্রিয় করে রেখেছে। চট-কল, কাপড় ও কাগজের কল, লোহালক্কড়ের কারখানা, অস্ত্র তৈরীর কারখানা, ঔষধের কারখানা, তেলকল, ময়দার কল, গেঞ্জীর কারখানা, প্লাসটিকের কারখানা ইত্যাদি বহুবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কলকাতা ও গঙ্গার অপর পারস্থিত হাওড়া শহর দিনরাত মুখরিত। বাণিজ্যেও কলকাতা কত স্ফীতি লাভ করেছে, এখানকার বিশাল সওদাগরী অট্টালিকাগুলি দেখলে তা বোঝা যায়। কলকাতায় লক্ষ্মী বাঁধা পড়েছেন। লোটা-কম্বল সম্বল করে রাজস্থানবাসী এখানে এসে কোটিপতি হয়েছে, এরূপ ভূরি-ভূরি

দৃষ্টান্ত আছে। একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী সত্যই বলেছেন, কলকাতায় টাকা ছড়ান হয়েছে, কুড়াতে জানলেই হয়।

পৃথিবীর অনেক বড় শহরের মতো কলকাতায়ও এক দিকে বিপুল ঐশ্বর্য, গগনচুম্বী অট্টালিকা, যান্ত্রিক স্বাচ্ছন্দ্য ও যানবাহন, অন্য দিকে অপরিসীম দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি বস্তিবাড়ি, কায়ক্লেশে দিন গুজরানো। এই বিরাট্ বৈষম্য বর্তমান সমাজতান্ত্রিক যুগে মানব-সভ্যতার কলঙ্ক।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাবার পথে পথচারীদের চোখে পড়বে, বালিগঞ্জের রবীন্দ্র সরোবর ও স্টেডিয়াম, রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইনস্টিটিউট, বিড়লা একাডেমি, কালীঘাটের কালীমন্দির, জাতীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্র-সদন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, সেণ্টপলস্ গীর্জা, বিড়লা মান-মন্দির, যাদুঘর, শহীদ মিনার (অক্টরলনি মনুমেণ্ট), ইডেন উদ্যান, বিধান-সভা-গৃহ, রাজ-ভবন, হাইকোর্ট, নূতন সেক্রেটারিয়েট, (১১ তলা অট্টালিকা), রাইটার্স বিল্ডিংস, বড় ডাকঘর, হাওড়ার পুল, নাখোদা মস্‌জিদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বসু বিজ্ঞান-মন্দির, পরেশনাথের মন্দির, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রভৃতি। গত কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতার আকাশ-সীমায় এক বিরাট্ পরিবর্তন এসেছে গগনচুম্বী বহুতল অট্টালিকা-সমূহের আবির্ভাবে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার এই উর্ধ্বগামী সু-উচ্চ স্থাপত্য কলকাতার চেহারা বদলে দিয়েছে।

ভারতের একজন বিখ্যাত নেতা বলেছিলেন—কলকাতা 'মিছিলের নগরী'। কেহ বলেন, এটা 'ঘেরাও'এর শহর। একসময় শ্রমিক-বিক্ষোভ এখানকার নিত্যকার ব্যাপার ছিল। মাঝে মাঝে একটা না একটা দাবীতে এখানে পথে পথে বের হত পতাকা-বাহী ধ্বনি-মুখরিত মিছিল। মনুমেণ্টের তলদেশে বিরাট জনসভায় শোনা যেত উত্তপ্ত বক্তৃতা। জনতার চাপে এবং জনসাধারণের জীবনধারণের প্রাণান্তকর প্রয়াসে জর্জরিত এই কলকাতা। ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ি, লরি, টেম্পো, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রিক্সা, সাইকেল প্রভৃতিতে এর পথ-ঘাট ছেয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় সিনেমা, থিয়েটার, দেয়ালের গায়ে গায়ে এদেরই বিচিত্র প্রাচীর-পত্রের ছড়াছড়ি। গড়ের মাঠে গেলে হঠাৎ শুনতে পাওয়া যাবে উল্লাসে কারা 'গো—ল' করে চেঁচিয়ে উঠল। খেলার মাঠে লোক ধরে না। কোন দিন আবার সেই লোকারণ্যে রণাঙ্গণ সৃষ্টি হয়। সিনেমায়, থিয়েটারে, খেলার মাঠে, রেস্টুরেণ্টে, চায়ের দোকানে, পথে-ঘাটে, সর্বত্রই কেবল ভিড় আর ভিড়। এ বিরাট জনসমুদ্র দেশকে কি তলিয়ে দেবে, না তুলে ধরবে?

শ্রমিক ও কর্মচারী বিক্ষোভের সঙ্গে একদা এখানে ছাত্র-অসন্তোষের প্রকাশও ছিল প্রবল। দীর্ঘকালের ধূমায়িত অসন্তোষের প্রকাশ শ্রমিকদের বিক্ষোভ। কিন্তু ছাত্র-বিক্ষোভের প্রকাশে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়, তা ছাত্রদের পক্ষে ও ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়। এসবের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের

উৎপাদন ও প্রসার যেরূপ ব্যাহত হয়, শিক্ষার বিস্তার ও জাতীয়-জীবন গড়ার কাজও পর্যুদস্ত হয়।

আয়তনে ও জনসংখ্যায় কলিকাতার স্ফীতি বর্তমানে অত্যধিক। দেশ-বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ কলকাতার বুকে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে কলকাতার ও আশেপাশের সমস্ত অঞ্চল জনবহুল হয়েছে এবং কলকাতার পৌরনিগমের ওপর অত্যধিক চাপ পড়েছে।

পরিবহণ-ব্যবস্থা, পানীয় জল, জল-নিকাশের ব্যবস্থা, বস্তি-উন্নয়ন, বেকার-সমস্যা—এইগুলি আজকের কলকাতার প্রধান সমস্যা। অসম্ভব লোকবৃদ্ধির ফলে প্রচলিত পরিবহণ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। যে ভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে মানুষকে প্রতিদিন ট্রামে বাসে চলতে হয়, দেখলে আতঙ্ক জাগে এর প্রতিকারের জন্য চক্রবেড় রেলপথ, ভূগর্ভ রেলপথ ও গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু, জনবহুল রাস্তার কোথাও উড়াল পুল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। পানীয় জল সরবরাহের অপ্রাচুর্য, পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার বা প্রসারের অভাবে বর্ষায় মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট, বাসগৃহের স্বল্পতা ও বস্তির অস্বাস্থ্যকর অবস্থা—এ সকলের অবিলম্বে প্রতিকার আবশ্যক। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাদ্বারা অতি সত্বর বিপুল বেকার-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন।

বৃহত্তর কলকাতার লোক-সংখ্যা বর্তমানে ষাট লক্ষাধিক। এই বিশাল জন-সংখ্যা ও বিপুল আয়তনের শহরটির সুষ্ঠু পরিচালনার ও উন্নতির জন্য মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা-সংস্থা গঠিত হয়েছে এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় মাস্টার প্ল্যান তৈরী করার দায়িত্ব এঁদের উপর অর্পিত হয়েছে। বজবজ হতে কল্যাণী পর্যন্ত সমস্ত পৌর-সভাকে একত্র করে এই বিশালায়তন বৃহত্তম কলকাতা গড়ে উঠবে।

ভাগীরথীর জলাল্পতার জন্য কলকাতা-বন্দরের সমূহ বিপদ উপলব্ধি করে ফরাক্কা বাঁধ তৈরী হয়েছে যার ফলে গঙ্গার মূল প্রবাহের জলধারার এক বৃহৎ অংশ ভাগীরথী-বক্ষে প্রবাহিত হবে। এ ছাড়া ফরাক্কা সেতু দ্বারা কলকাতার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ ও পূর্বোত্তর ভারতের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠ রেল ও বর্ত্মসংযোগ স্থাপিত হয়েছে। কলকাতা-বন্দরের চাপ কমিয়ে এর সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য হুগলী ও হলদী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হলদিয়া বন্দর গড়ে উঠেছে কলকাতার সহযোগী বন্দররূপে। কলকাতা শহরের উন্নয়ন ও কলকাতা বন্দরের সংরক্ষণ বর্তমান কলকাতাকে বাঁচাবার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কালবৈশাখী

প্রস্তাবনা—ঝড়ের পূর্বের দিনগুলি—ঝড়ের সময়ে—ঝড়ের পরে।

চলমান জীবনের বিচিত্র যাত্রায় ছোট-বড় কত ঘটনা সর্বদাই ঘটেছে, তার কিছু মনে থাকে, কিছু বা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। কর্মব্যস্ত জীবনের ক্ষণিক অবসরে মাঝে মাঝে ফেলে আসা দিনের স্মৃতি মনের মধ্যে উঁকি মারে, আনন্দ-স্মৃতির "হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে," মন কখনও ঝলমল করতে থাকে, কখনও বা দুঃখের স্মরণে মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। অবচেতন মনে এমনি কত ঘটনার স্মৃতি লুকিয়ে আছে। আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল কিশোর বয়সে, যার স্মৃতি এখনও আমার মনে আতঙ্কের শিহরণ জাগায়। গ্রীষ্মের ছুটি আসন্নপ্রায়। ঠিক হ'ল সবাই মিলে আমরা দেশের বাড়ীতে যাব। আমাদের দেশ ছিল ঢাকা জেলায়—পদ্মা-ধলেশ্বরী-মেঘনা-শীতললক্ষ্যা-বিধৌত ঢাকা জেলার ছোট্ট এক গ্রামে আমাদের বাড়ী। মনটা খুশিতে নেচে উঠল। কলকাতায় থাকি, প্রাসাদ-নগরী কলকাতার যান্ত্রিকতা থেকে কিছু দিনের জন্য মুক্তি পাব, এই আনন্দে আমরা ভাই-বোনেরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলাম। গ্রীষ্মের ছুটি হলে মা-বাবা, ভাই-বোন মিলে রেলপথে জলপথে স্থলপথে এলাম দেশের বাড়ীতে।

বড় সুন্দর আমাদের গ্রাম। চারদিকে সবুজের সমারোহ, আম-কাঁঠালের বাগান, মাথা উঁচু করে তাল, নারিকেল, সুপারি গাছ আর বাঁশের ঝাড়, বুনো ঝোপ ও শেয়াল-কাঁটার বনে হলদে ফুলের সমারোহ, ছায়াঘেরা আঁকাবাঁকা পথ আর শান্ত কুটীর, দীঘির কাজল-কালো জলের স্নিগ্ধতা—সব আমার মনকে আকর্ষণ করল নিবিড় স্নেহস্পর্শে। মনটা আমাদের সকলেরই ভরে উঠল। নিরঙ্কুশ স্বাধীন জীবনে অবাধ সঞ্চরণ করছি আমরা, সবুজের দাক্ষিণ্যে মনও আমাদের সবুজ হয়ে উঠেছে।

সেদিন ছিল শনিবার—দুপুরের পর থেকেই চারদিকের আবহাওয়া ঘোলাটে হ'য়ে উঠল। যত বিকেল হতে থাকল, চারদিকের গুমোট ভাব আরও বেড়ে উঠল। চারদিক যেন থম্থম্ করছে—মনে হচ্ছে গাছপালাগুলো যেন সব নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্থির নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে ওরা যেন ভয় পেয়েছে। আকাশে ধূসর রঙের মেঘ, কেবল পশ্চিম-উত্তর আকাশে একখণ্ড নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ আস্তে আস্তে সূর্যকে আড়াল করে দিচ্ছে, আমার মনে হল সূর্যও যেন ভয় পেয়ে আড়ালে লুকোচ্ছে। আকাশ, মাটি, গাছপালা সব যেন নীরব, নিথর, নিস্পন্দ হয়ে এক ভয়াবহতার মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে—জমাট কালো অন্ধকার ধীরে ধীরে জল, স্থল, অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে পড়ছে।

দেখতে দেখতে অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল। আমাদের বাড়ীর বৃদ্ধরা বললেন, এখনি নাকি ঝড় উঠবে। ঘরের মধ্যে মা-বাবার কাছ ঘেঁষে বসে আছি।

হঠাৎ শুনি কেমন একটা একটানা গোঁ গোঁ শব্দ। মনে হচ্ছে দূর থেকে কে যেন ক্রোধের তীব্র উত্তেজনায় ছুটে আসছে। দূরাগত কণ্ঠের গোঁ গোঁ শব্দে প্রাণে আতঙ্ক জাগায়। দেখতে দেখতে যেন সব চঞ্চল হয়ে উঠল। গাছপালা আকাশ-বাতাস সব মাতাল হয়ে উঠল। একটানা ঝড়ো হাওয়া দূর থেকে প্রবল বেগে এসে গাছপালা ঘরবাড়ীর উপর আছড়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট রাক্ষসী উন্মত্ত ক্রোধে তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াচ্ছে, তারই চরণ-বিক্ষেপে প্রকৃতিতে এই আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ, মধ্যে মধ্যে কড়-কড় করে বিদ্যুতের শব্দ এবং চোখ-ঝলসানো তীব্র আলোকচ্ছটা যেন তার লেলিহান জিহ্বা মেলে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটোছুটি করছে। চারদিক ধুলোয় ভরে গিয়েছে। জানালা ফাঁক করে বাইরে তাকিয়ে দেখি, গাছগুলো একবার মাটিতে নুয়ে পড়ছে, আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। বাঁশঝাড়গুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে—শুকনো পাতাগুলো চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। কত গাছ উপড়ে পড়ে গেছে মাটিতে, কারো বা মাথা ভাঙা। দেখতে দেখতে বৃষ্টি এলো তুমুল শব্দে। ঝড়ের নির্ঘোষ আর বৃষ্টির ঝাপট, বাইরে প্রলয় চলছে। আমাদের ঘরটাও যেন দুলছে আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল, শক্ত হাতে মাকে আঁকড়ে ধরলাম। হঠাৎ একটা মড়মড় শব্দে আঁৎকে উঠলাম, পুবের ভিটের ঘরের পাশে জামরুল গাছটা ভেঙে পড়ে গেল, প্রচণ্ড আঘাতের তাড়নায় ঘরটিও ভেঙে পড়ল। হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, যদি এ ঘরটা ভেঙে পড়ে। এমন সময় বিদ্যুতের আলোকে আমার ছোট কাকা প্রবল ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ভিজতে ভিজতে আমাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঢুকলেন। তার মাথায় ও হাতে পায়ে চোট লেগে কেটে গেছে। তবু যে বেঁচেছেন, এই ভাগ্য।

সারা রাত এই ভাবে একটানা ঝড়বৃষ্টি চলল—প্রবল ঝড়ের বেগে বাড়ীঘর কাঁপছে, টিনের চালে ঝড়জলের ঝাপটা ঘরটিকে মুহূর্তে ভেঙে চুরমার করে দিবে মনে হচ্ছে, মড়মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে, কোথাও টিনের চালা উড়িয়ে সশব্দে ফেলছে, কড় কড় করে বাজ পড়ছে; সর্বোপরি উন্মত্তা পদ্মা নদীর প্রলয়ঙ্কর গর্জন প্রাণে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলছে।

এর মধ্যে শেষ রাতে কখন যে চোখে তন্দ্রা এল জানি না। ভোরে জেগে দেখি আকাশ নির্মেঘ, সোনালী আলোতে চার দিক্ ভরে গেছে।

কিন্তু বাইরে এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তা যেমন কল্পনাতীত তেম্‌নি হৃদয়-বিদারক। একটি রাতের প্রচণ্ড ঝড়ের প্রলয়-নর্তনে সারা পল্লীকে বিপর্যস্ত ও তছনছ করে দিয়ে গেছে, তার সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে। কোন বাড়িরই ঘরদোর অক্ষত নেই, রাস্তাঘাট গাছপালা পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে, এক হাঁটু কাদা জমেছে, ফলবান গাছগুলো ফলশূন্য।

গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই টিনের বা খড়ের ঘর, সকলেরই ঘরদোর গেছে। জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। লোকেরা বিমর্ষ মুখে বিষণ্ন চিত্তে বিগত রাত্রির প্রলয়

তাণ্ডবের ধ্বংসলীলার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। অতি কষ্টে গ্রাম হতে বেরিয়ে নদীর দিকে গেলাম। সেখানে যে করুণ দৃশ্য দেখলাম, তা কোন দিন ভুলব না। গিয়ে দেখি নদীর লঞ্চঘাট একেবারে শূন্য, একটিও লঞ্চ বা নৌকো নেই। এখানে মালবোঝাই নৌকো থাকে, দোকান-পাট থাকে। আজ কোন কিছুর চিহ্নমাত্র নেই।

সেদিন কতকগুলি বেদের নৌকো সেখানে নোঙর করা ছিল। সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবল দূরে শুক্‌নো বালুকাময় চড়ে দু-একটি নৌকো উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে, আর তারই আশে-পাশে কয়েকটি মৃতদেহ। বেদেরা নদীর দুলাল, নৌকোই এদের ঘরবাড়ী। রাতের প্রলয়-ঝড়ে সর্বনাশা নদী এদের টেনে নিয়ে গেছে। বেদনা-ভরা মন নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম।

বন্যা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণে নদী-পরিকল্পনা

প্রস্তাবনা—বন্যায় ক্ষতি—বন্যার কারণ—বন্যায় উপকার—বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা—নদী নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বন্যা রোধ—দেশের বিভিন্ন নদী-পরিকল্পনা।

যে বৃষ্টিধারা মানুষের জীবনে আশার সংবাদ বহন করিয়া আনে, তাহার আতিশয্য জীবন ও জীবনের সম্বলটুকুও ভাসাইয়া নেয়। বর্ষাকালে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে যে প্রবল জলস্রোতের সৃষ্টি হয়, নদ-নদীর পক্ষে তাহা ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলে নদীর স্ফীত জল দুই কূল ছাপাইয়া উঠে এবং নদীতীরের শস্যক্ষেত্র, বাড়িঘর সব প্লাবিত করে।

বাংলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল অনেকে চোখে দেখিয়াছেন, অনেকে সংবাদ-পত্রের মাধ্যমেই বিস্তৃত সংবাদ পাইয়াছেন। উত্তরবঙ্গের বন্যা, মেদিনীপুরের বন্যা, দামোদর ব্রহ্মপুত্রের প্লাবন প্রভৃতি গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যগুলিও বন্যার দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। বন্যা সর্বত্রই মহা-ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। দুর্নিবার জলস্রোত মানুষ পশু এক সঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ইহার পরও যাহারা অতি কষ্টে টিকিয়া থাকে তাহারা অন্নবস্ত্রের তীব্র অভাবে এবং রোগে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। যানবাহনের কোন সুবিধা থাকে না, বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। বন্যা-পীড়িতের সাহায্য পাঠাইয়াও ঠিকমতো সাহায্য দান করা ও বন্যা-পীড়িতদের সেবা করা সম্ভব হয় না। ফলে আরও লোক মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হয়। বন্যার এই ভয়াবহতা দেখিয়া মনে হয়, মানুষ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাছে কত অসহায়।

বন্যার যে-সকল কারণ দেখিতে পাই উহাদের মধ্যে প্রধান কারণ যে অতি বৃষ্টি, একথা বলাই বাহুল্য। পূর্বেই বলিয়াছি, বর্ষাকালে অতি বর্ষণের ফলে নদীগুলি

স্ফীত হইয়া উঠে। তখন নদীর পাড় ছাপাইয়া নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলপ্রবাহ বেগে ধাবিত হইয়া গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ, জল প্লাবন শুধু জলই বহন করিয়া আনে না, মাটি বালি প্রভৃতিও বহন করিয়া আনে। এই মাটি বালি প্রভৃতি নদীগর্ভে জমিয়া নদীর অগভীরতা কমাইয়া ফেলে। ফলে অনেক সময় বৃষ্টিপাত বেশি না হইলেও নদীর অগভীরতার জন্য প্লাবন দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় ভূগর্ভের জল স্ফীত হইয়া উঠে। তখন উপরের জল দীর্ঘ দিনের জন্য উপরেই থাকিয়া যায়। অনেকের মতে ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যার ইহাই প্রধান কারণ।

তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বন্যা মানুষের কিছু কিছু উপকারও করে। বন্যার জলের সঙ্গে যে পলিমাটি আসে তাহা দ্বারা শস্য-ক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, বন্যার জল আবর্জনা দূর করে—এমন কি ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপও কমিয়া যায়। কিন্তু যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, তাহার তুলনায় ইহা নগণ্য।

জলপ্লাবন বন্ধ করিতে হইলে প্রথমে নদীর বাঁধের (dam) ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই বাঁধের দ্বারা জলের উন্মত্ত গতি কিছুটা রোধ করা যায়। তাহা ছাড়া যে-সকল নদী বন্যার প্রধান উৎস, উহাদের জলধারা দ্বারা বড় বড় জলাধার নির্মাণ করা দরকার। এই সব জলাধারে বর্ষার জল সঞ্চিত করা হয়। বন্যার সময় জলস্রোতের সঙ্গে যে মাটি বালি প্রভৃতি নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া নদীর গভীরতা কমাইয়া দেয়, সেই মাটি বালি প্রভৃতি ড্রেজারদ্বারা সরাইবার ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্তব্য। নদীর গভীরতা বজায় রাখার জন্য পলি অপসারণের কার্যে নিয়মিত ড্রেজার-যন্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক।

অনেকের মতে নদীর মাঝখানে গাইড ব্যাঙ্ক (Guide Bank) নির্মাণ করিলেও জলস্রোতের প্রচণ্ডতা কতকটা রোধ করা যায়। বড় বড় নদীর স্রোতকে প্রশমিত করিতে হইলে উহাদের কয়েকটি উপধারা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বড় নদীগুলির কাছাকাছি যে সব ছোট নদী আছে, তাহাদের মধ্যে জল সরাইবার ব্যবস্থা করা দরকার। যে সব নদীতে প্লাবন দেখা দেয়, সে নদীগুলি হইতে যদি কয়েকটি খাল কাটাইয়া দেওয়া যায়, তাহার দ্বারাও জলের বেগ কিছুটা কমানো যায়। ঐ খালগুলির মুখ বর্ষার দিনে বন্ধ করিয়া দিয়া আবার শীতের দিনে খুলিয়া দিলে জলের বেগ অনেকখানি প্রশমিত করা যায়। পাহাড়-পর্বত হইতে যে সব নদী নামিয়া আসে, অতি বৃষ্টির ফলে অনেক সময় জলস্রোতে প্রচণ্ড বেগে নামিয়া আসিয়া সমতল ভূমিকে আঘাত করে, এই সব নদীর জলের বেগ রোধ করিবার জন্য মাঝে মাঝে বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। ইহার দ্বারা এক দিকে তীরবর্তী জমিগুলির উর্বরা শক্তি বাড়ে, অপর দিকে বৈদ্যুতিক শক্তি লাভ করা যায় এবং প্লাবনও রোধ করা যায়।

স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতবর্ষে কতকগুলি বড় বড় নদী-পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। ইহাতে কতকগুলি নদীর বড় বড় বাঁধ ও বিশাল জলাধার তৈরী হইয়াছে এবং ইহার ফলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, সেচের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে পাঞ্জাবের ভাক্রা ও নাঙ্গাল বাঁধ দুইটি শতদ্রু নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এবং সুদীর্ঘ খালদ্বারা ঐ জল পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বিরাট অঞ্চল জলসিঞ্চিত করিতেছে। ভাক্রা বাঁধটি ২২৫·৬ মিটার উঁচু পৃথিবীর উচ্চতম বাঁধ।

উড়িষ্যার মহানদীর জলধারাকে হীরাকুঁদ বাঁধে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। দামোদর নদ ছিল বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অভিশাপ। বছরের পর বছর ইহার প্রলয়ঙ্কর বন্যায় বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বুকে হাহাকার জাগিত। আমেরিকার বিখ্যাত টেনেসি নদী উপত্যকা পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ার দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেত হিল, এই চারিটি বাঁধ ও জলাধার তৈরী করিয়া বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের চিরন্তন বন্যার আতঙ্ক দূরীভূত করা হইয়াছে, উপরন্তু সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ ও বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান পরিকল্পনা ময়ূরাক্ষী নদী পরিকল্পনা, তিলপাড়া ও মাসাঞ্জোর বা কানাড়া বাঁধ তৈরী হওয়াতে ময়ূরাক্ষীর জলপ্লাবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণার বিরাট এলাকায় জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। কংসাবতী পরিকল্পনায় বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার বিস্তৃত অংশ জলসেচ দ্বারা শস্যশ্যামলা হইবার সুযোগ পাইয়াছে। কোশী, গণ্ডক ও বিহার পরিকল্পনা দ্বারা বিহার ও উত্তর প্রদেশের, তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা দ্বারা অন্ধ্র ও মহীশূরের, কৃষ্ণা নদীর জলধারায় নাগার্জুন সাগরের দ্বারা মহীশূরের প্লাবন নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

একটি বন্যার বিবরণ

উত্তরবঙ্গের বন্যা—বন্যার বিবরণ—বন্যার কারণ—উপসংহার

১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর তারিখের আকস্মিক বন্যা উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় যে সর্বগ্রাসী মহাধ্বংসের সৃষ্টি করিয়াছিল, সাম্প্রতিক কালে তাহার তুলনা নাই। প্রলয়ের কল্পনা আমরা করি, উত্তরবঙ্গের বন্যায় সেই প্রলয় প্রত্যক্ষ করিলাম। ১৯৬৮ সালের বর্ষাকালে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তাহা স্মরণীয় কালে এমন কখনও হয় নাই। দিন কয়েকের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে সর্বনাশী তিস্তা, পাহাড়ের উচ্চদেশ হইতে তীব্রবেগে সমতলের মাটিতে ছুটিয়া

নামিল, সেই প্রবল স্রোতবেগে ভাসিয়া গেল পাথর-ঘেরা নদীর দুই পাড়, ভাসিয়া গেল বিশাল বৃক্ষরাজি, বাড়ী-ঘর, কংক্রিটে তৈরী সিভোক পুল, রেল-পুল, আরো শত শত ছোট পুল ও পাকা সড়ক, ভাসিয়া গেল শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র, জনাকীর্ণ গ্রাম, উহাদের অধিবাসী মানুষ ও গবাদি পশু আর লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। রাত্রিতে দ্রুত জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিস্তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমগ্র জলপাইগুড়ি শহর অতর্কিতে জলপ্লাবিত হইয়া গেল। একতলা বাড়ি, টিনের ঘর, কুঁড়ে ঘর—সব ডুবিয়া গেল, ভাসিয়া গেল অসহায় অপ্রস্তুত নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ। চতুর্দিকে আতঙ্ক আর করুণ আর্তনাদ। সবাই আশ্রয় খোঁজে, কে কাহাকে বাঁচাইবে? বন্যার আকস্মিকতায় ও প্রবলতায় কর্তৃপক্ষও সাময়িকভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চারিদিকে কেবল কনকনে ঠাণ্ডা ঘোলা জল, আলো নাই, খাবার নাই, পানীয় জল নাই।

কয়েক দিন পরে জল কমিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সমস্ত শহর কয়েক ফুট মাটিতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, রাস্তায় রাস্তায় গবাদি পশুর মৃতদেহ, গাছপালা, ভাঙ্গা-চোরা আবর্জনা, দুর্গন্ধ। এই চরম বিপদের সময় শিলিগুড়ি হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ খাবার, পানীয় জল, ঔষধ ইত্যাদি আনিয়া ত্রাণকার্য শুরু করেন। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দও সাহায্যার্থ ও রাস্তাঘাট পরিষ্কারের কাজে নামিয়া পড়েন। এইরূপ ভয়াবহ বন্যায় কত যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত সন্তান পিতৃমাতৃহীন, স্ত্রী স্বামীহারা, স্বামী স্ত্রীহারা, কত জন বন্ধুহারা, আত্মীয়হারা হইয়াছে। হাসপাতালে অসহায় রোগীরা নিতান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কত ধনবান নিঃস্ব হইয়াছে, সম্পন্ন ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এই বন্যায় জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলা ব্যতীত মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের বিস্তৃত অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। পাহাড়ী অঞ্চলে জলস্রোত ও ধ্বংস কত বস্তি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, কত চা-বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা ঘটে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিপদ-সীমার বহু ঊর্ধ্বে উঠিলে, তাহা যথাসময়ে জ্ঞাপিত হয় নাই। হইলে লোকে অধিকতর সতর্ক হইতে পারিত। কিন্তু এই বন্যার আকস্মিকতা ও প্রবলতার বিরুদ্ধে সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রয়াসেরই সুযোগ মিলে নাই। বন্যার পরে অবশ্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও সরকার ঋণদানাদি নানা সাহায্য দ্বারা বন্যার্তদের সহায়তা করিয়াছে।

প্লাবন রোধকল্পে মানুষের ঐকান্তিক প্রয়াস যদি আংশিক সাফল্য লাভ করে তাহা হইলেও দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে একেবারে এড়াইতে না পারিলেও অন্ততঃ উহার বীভৎস পরিণাম হইতে মুক্তি পাইতে পারি। বন্যা-নিরোধের গুরু দায়িত্ব সরকারের। সরকারকে এই বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এই অবাঞ্ছিত মর্মান্তিক আঘাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে হইবে।

খেয়াল বা শখ (Hobbies)

খেয়াল কি—বিভিন্ন খেয়াল—প্রয়োজনীয়তা ও উপকার—অপকার—উপসংহার—কর্মক্লান্ত জীবনে অবসরের আনন্দ অনুষ্ঠান।

খেয়াল অথবা Hobby যে কত প্রকারের আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অল্প বিস্তর খেয়াল আছে। বিভিন্ন মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রকমের খেয়াল অথবা বাতিক থাকে। খেয়ালের ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তবে খেয়ালের জন্য লোকে যাহা করে, তাহা জাগতিক লাভের জন্য করে না, নিছক আনন্দের জন্যই তাহা করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ যে সকল খেয়াল আমাদের চোখে পড়ে উহাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের ডাক-টিকিট অথবা মুদ্রা সংগ্রহ করা, ছবি আঁকা, ফটো তোলা, বাগান করা, পশু-পক্ষী পালন করা, খেলনা বা পুতুল প্রস্তুত বা সংগ্রহ করা, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, মাছ ধরা, শিকার করা, নানা রকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস (Curio) সংগ্রহ করা, নানা খেলা-ধূলা করা, বিশেষ কোন বিষয়ের বই সংগ্রহ করা, বই দিয়া আলমারী সাজানো, Cross Word Puzzle-এ সমাধান করা, ফুটবল, ক্রিকেট বা টেনিস খেলা দেখা, থিয়েটার ও সিনেমা দেখা, তাস-পাশা খেলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অধিকাংশ খেয়াল বা শখ ব্যক্তিগত জীবনে নির্দোষ আনন্দ দিয়া থাকে। ইহা মনের খোরাক জোগায়। রোগে শোকে জীর্ণ মনকে বাঁচাইবার জন্য অনেকে নানা রকম খেয়ালগ্রস্ত হইয়া পড়েন। দুঃখ ভুলিবার ইহা একটি করুণ প্রয়াস। অবশ্য সকলেই যে আঘাত পাইয়া দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হইয়া ইহার আশ্রয় লন, তাহা নহে। শত কাজের বাঁধাবাঁধির মধ্যে মানুষের একটি খেয়ালী মন আছে। তাহার তুষ্টির জন্য মানুষ সাময়িক ভাবে খেয়াল লইয়া ভুলিয়া থাকে। অনেক সন্তানহীনাকে দেখা যায়, তাহারা নানা রকম পশু-পক্ষী পালন করেন। ইহা তাঁহাদের অতৃপ্ত মাতৃ-হৃদয়ের একটি বিশেষ ধারা। সন্তান পালনের আকাঙ্ক্ষাকে পশু পালন করিয়া মিটান। এই ধরণের খেয়ালগ্রস্ত লোকদের নিকট হইতে খেয়াল কাড়িয়া লইলে তাঁহারা দিশেহারা হইয়া পড়েন এবং জীবন-যাত্রা তাঁহাদের কাছে শুষ্ক ও বিস্বাদ হইয়া যায়। এই সব দিক হইতে খেয়ালের অনেক মূল্য আছে। যেসব দুর্দান্ত ও দুষ্ট লোকের সঙ্গ অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহারা যদি নিজের খেয়াল লইয়া ভুলিয়া থাকে, তাহা হইলে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। অনেকের ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে খেয়াল গড়িয়া ওঠে। এই সব খেয়াল কোন অপকার করে না। ইহারা আকস্মিক আসে না বলিয়া ক্রমনির্দিষ্ট জীবনযাত্রায় বিপর্যয় ঘটায় না। অনেক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির বই কিনিয়া আলমারী সাজানোর খেয়াল থাকে। এইরূপ খেয়ালদ্বারা কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। শিশুদের মধ্যে ছোটকাল হইতে যদি পড়াশুনার খেয়াল জাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে শিশুদের পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক। ইহাতে

তাহাদের জ্ঞান পিপাসা বাড়িয়া যাইবে। বিভিন্ন দেশের ডাক-টিকিট অথবা মুদ্রা, ছবি প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার খেয়াল থাকা ছোটদের পক্ষে ভাল। ইহাতে ছোটকাল হইতে সংগ্রহ করিবার একটা অভ্যাস হয় এবং আনন্দ লাভ হয়। অবশ্য কোন-কিছুরই আতিশয্য ভাল নয়।

কিছু কিছু অপকার্যও খেয়ালদ্বারা সাধিত হয়। অনেকের খেয়াল থাকে রেস (ঘোড়দৌড়) খেলা। রেস খেলিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছেন এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এমন অনেক প্রতিভাশালী বুদ্ধিমান্ লোক থাকেন, যাঁহারা তাঁহাদের নানারূপ খেয়ালের জন্য জগতের কোন উপকারেই আসেন না। তাঁহারা খেয়ালের বশে বুদ্ধি ও প্রতিভাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। অনেকে শিকার অথবা অন্য কোন খেয়াল লইয়া এরূপ ভাবে মত্ত থাকেন যে, তাঁহাদের কর্তব্য কর্মের প্রতি অবহেলা ও শৈথিল্য আসে। এইরূপ খেয়ালী লোকের শত শত কর্তব্য কার্যে অবহেলার জন্য ব্যক্তিগত জীবন ব্যর্থ হয় এবং সমাজ জীবনের ক্ষতি হয়। এইগুলিকে খেয়াল না বলিয়া ব্যসন বলা যায়।

ব্যক্তিগত খেয়ালের ন্যায় যুগেরও এক প্রকার খেয়াল থাকে। এই যুগের খেয়াল সিনেমা ও খেলা দেখা। জাতীয় জীবনের উপর ইহার প্রভাব উপেক্ষণীয় নহে।

সুখে-দুঃখে মেশানো এই কঠিন পৃথিবীর বুকে বাস করিতে হইলে নির্দোষ খেয়ালের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা যায় না। মানুষের নির্দিষ্ট-নিয়মবদ্ধ এবং কঠিন কর্তব্যপূর্ণ জীবন-ধারা মনকে সর্বক্ষণ তৃপ্তি দিতে পারে না। এই জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহ করে। খেয়ালের ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ লুকান থাকে। মুক্তিকামী মানব খেয়ালের ভিতর দিয়া সাবলীল গতিতে বন্ধনমুক্ত জীবনের আনন্দ পাইতে চায়।

কর্মজীবনে মানুষ একঘেয়ে ও একটানা কাজ হইতে খানিকটা অবকাশ চায় এবং এই অবকাশকালে পাইতে চায় বিমল আনন্দ। এই আনন্দ দান করে মানুষের শখ বা খেয়াল। খেয়ালে যে অনাবিল আনন্দ লাভ হয়, তাহা কোন কিছুর প্রত্যাশী নয়, নিছক আনন্দলাভের জন্যই এই সব আনন্দের অনুষ্ঠান। এই সব নির্দোষ শখ বা খেয়াল কর্মক্লান্ত জীবনে আনে সজীবতা, প্রাণে জাগায় নূতন উদ্দীপনা ও নব উৎসাহ, জীবনকে করে মধুময়।

ধর্মঘট

যন্ত্রশিল্পের যুগে শ্রমিক সংঘবদ্ধ—ধর্মঘট শ্রমিকদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র—ধর্মঘটের কষ্ট ও অসুবিধা—ধর্মঘটের ফলাফল—রাজনৈতিক ধর্মঘট—ধর্মঘট নিরুপদ্রব ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—ছাত্রদের ও অত্যাবশ্যক সেবা-কর্মীদের ধর্মঘট অবাঞ্ছিত—উপসংহার।

বর্তমান যুগ বৃহৎ শিল্পের যুগ। ইহার অঙ্গ ফ্যাক্টরি-প্রথা। এই প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে। তাহারা স্বাধীন ব্যক্তিগত হস্তশিল্প ছাড়িয়া ফ্যাক্টরিতে একত্র কাজ করিতে ও বসবাস

করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের একত্র সংঘবদ্ধ হইবার সুবিধাও হইয়াছে। এতকাল কেবল বণিকেরা সংঘবদ্ধ ছিল। ফলে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচার চলিত। কিন্তু শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া বণিকের নির্যাতন হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের অভাব অভিযোগ কমিয়াছে। বস্তুতঃ, দরিদ্র শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধতা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাহাদের অধিকার বা দাবী আদায় করিবার পথ নাই। সংঘবদ্ধ না হইলে প্রবল ধনিকের প্রভাবে শ্রমজীবীরা অত্যন্ত অসহায় থাকে। এক এক ফ্যাক্টরির বা এক একটি শিল্পের শ্রমিক-দল এক এক সমিতি গঠন করিয়া থাকে, উহারই নাম ট্রেড্-ইউনিয়ন। অনেক সময় এক এক বিভাগের শ্রমিকগণও একত্র সংঘবদ্ধ হয়।

ধর্মঘট শ্রমিকদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। দরিদ্র শ্রমিক সংঘবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হয়। তখন ধর্মঘটদ্বারা তাহাদের দাবী-দাওয়া বা অধিকার আদায় করিয়া লয়। সাধারণতঃ ট্রেড ইউনিয়ন পূর্বে স্থির করিয়া ধর্মঘট ঘোষণা করে এবং সমস্ত শ্রমিক ইহাতে যোগদান করে।

ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকদের কষ্টের একশেষ হয়। এই সকল দরিদ্র শ্রমিকদের পুঁজি কিছুই থাকে না। সুতরাং কাজ ছাড়িয়া দীর্ঘদিন বসিয়া থাকিলে তাহাদিগকে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও দুঃখ সহ্য করিতে হয়। ইহা ছাড়া অনেক সময় মালিকগণ শ্রমিকদের উপর অনেক জুলুম করিয়া থাকেন। শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে সর্বসাধারণের অসুবিধা হয়। শহরে মেথরগণ বা ট্রাম-বাস-কর্মচারী ধর্মঘট করিলে রাস্তাঘাটে আবর্জনা জমিয়া অস্বাস্থ্যকর হয়, লোকের চলাচলের অসুবিধা হয়। কলে ধর্মঘট হইলে দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া যায়, ফলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। লোকের অসুবিধা হয়, জাতীয় অর্থাগম বিঘ্নিত হয়।

সরকারী কর্মচারীদের, রেল, ডাক, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ কর্মীদের, হাসপাতালে, স্কুল-কলেজে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক জন-স্বার্থের কার্যে নিযুক্ত কর্মীদের ধর্মঘট বাঞ্ছনীয় নয়।

মজুরদের ধর্মঘটের ফলে তাহারা নিজেদের মজুরী বৃদ্ধি, বাসস্থানের ভাল বন্দোবস্ত প্রভৃতি আদায় করিতে সক্ষম হয়। শ্রমিকদের ট্রেড্-ইউনিয়নকে মালিক-পক্ষীয়দিগকে স্বীকার করিতে হয় এবং আপোষ-নিষ্পত্তিতে উহার অংশ গ্রহণে অধিকার থাকে। বস্তুতঃ, ট্রেড্-ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়াই দুনিয়ার শ্রমিক-দল স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে।

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীত রাজনৈতিক কারণেও ধর্মঘট হইয়া থাকে। কোন অন্যায়, অবিচার বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা উহার প্রতিকারকল্পে অথবা বিক্ষোভ ও অসম্মতি প্রদর্শনের নিমিত্ত রাজনৈতিক ধর্মঘট হয়। সুতরাং ধর্মঘট যেমন অর্থনৈতিক অস্ত্র, তেমনি রাজনৈতিক অস্ত্রও বটে।

ধর্মঘট সুনিয়ন্ত্রিত ও নিরুপদ্রব হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ প্রবল প্রতিপক্ষকে চাপ দিয়া বা ভীতি-প্রদর্শন

করিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ধর্মঘটের অন্যতম লক্ষ্য থাকে বলিয়া ধর্মঘটীদের মধ্যে একটা তীব্র ভেদ থাকে। অনেক সময় এই কারণেই ধর্মঘট বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

অধুনা শ্রমিক ব্যতীত ছাত্রদের মধ্যেও কোন কিছুর প্রতিবাদে বা প্রতিকারের জন্য অথবা দাবী-দাওয়া আদায় করিবার জন্য ধর্মঘট অবলম্বিত হয়। স্বাধীনতা-প্রীতি ভাল, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা ক্ষতিকর। ছাত্র-ধর্মঘট অনেক সময় ছাত্রদিগকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলে। সংঘবদ্ধতা ছাত্রদের মধ্যে প্রয়োজন বটে, কিন্তু তাহা সংগঠনমূলক কার্যের নিমিত্ত।

শ্রমিক-ধর্মঘট বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানব-সমাজে নিতান্তই অশোভনীয় ব্যাপার। শ্রমজীবীই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী, তাহাদিগের স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তুষ্টি ও উন্নতিই দেশের যথার্থ উন্নতি। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হওয়া উচিত। মুনাফার একটি মোটা অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত করিয়া শ্রমিক বিক্ষোভ দূর করিলে ও তাহাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপরিপূর্ণ ও সুখী করিয়া তুলিলে ধর্মঘট সমাজ-দেহ হইতে নিশ্চিহ্ন হইবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, সমাজে ধনবৈষম্য হ্রাস পাইবে, দেশে শান্তি ও ঋদ্ধি বিরাজ করিবে।

জীবনে ছুটির মূল্য

ছুটির অর্থ—স্কুল-কলেজ-অফিস-কারখানার ছুটি—ছুটির উপলক্ষ্য; ধর্মীয় উৎসবে, ঋতুবিশেষে ছুটি—ছুটির প্রয়োজন—ছুটির সদ্ব্যবহার—ছুটির যথার্থ উপভোগ।

'ছুটি' কথাটি ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যন্ত প্রিয়। শুধু ছাত্র-ছাত্রী কেন বয়স্কদের জীবনেও ছুটির মূল্য কম নয়। কখন ছুটির দিনটি আসবে সবাই তার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকে। সাধারণতঃ ছুটির দিন বলতে আমরা বুঝি সেইদিন যেদিন আমাদের কোন বাঁধা কাজ করতে হয় না, যেদিন অফিসের তাড়া নেই, স্কুল-কলেজের তাড়া নেই। এই দিন কাজের চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয় না। কিন্তু ছুটির দিনকে আমরা সম্পূর্ণ বিরতির দিন বলতে পারি না। কারণ কাজের চাপ না থাকলেও মনের কোন বিরতি নেই। বরং কাজের চাপ না থাকাতে, মনের কাজ আরও বেড়ে যায়। সে তখন ফাঁক পেয়ে বাইরে ছুটে ছুটে করে বেড়ায়।

কিন্তু 'ছুটি' কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। ইংরেজীতে 'Holiday' বলতে যে ধরণের ছুটি বোঝায় তা প্রধানতঃ 'Holy Day'র ছুটি। কোনো পবিত্র ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে অথবা কোনো ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে কর্মবিরতির দিন, তাহাকেই 'Holy day' বলা হয়। খ্রীস্টমাস, গুডফ্রাইডে, সেন্ট পিটারস্‌ডে প্রভৃতি খ্রীস্টানদের অতি পবিত্র দিন। তা ছাড়া প্রতি রবিবারকেও তারা পবিত্র দিন বলে গ্রহণ করেন। এখন এই 'Holyday' শব্দটির অর্থপ্রসার

ঘটেছে। এখন ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া, আমোদ-প্রমোদের দিনগুলিকেও 'Holiday' বলা হয়। কর্মবিরতির আনন্দোচ্ছল ভাবকে 'হলিডে মুড' বলা হয়।

অফিসে, কল-কারখানায়, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে ছুটির দিনের সংখ্যা কম। এর মধ্যে আবার ডাকঘর ও হাসপাতালে কর্ম-বিরতির দিনের সংখ্যা সবচেয়ে কম। একটুখানি বিশ্রাম নেবার অবকাশ এদের দেওয়া হয় না। হাসপাতালে ছুটির দিনের সংখ্যা কম হবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। সেখানে যাঁরা আর্ত-পীড়িতদের সেবাব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে অবকাশ পাওয়াও সহজ নয়। তবে তাঁদের প্রতিদিনের কাজের ফাঁকে অথবা সপ্তাহে কিছুটা সময় কাজের ভিড়ের বাইরে এসে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দেওয়া হয়। কল-কারখানা, হাসপাতাল প্রভৃতিতে সবাই পালা করে ছুটি ভোগ করেন। যিনি সকালে কাজ করেন, তাঁর দুপুরের পর থেকে আর কাজ করতে হয় না। যিনি দুপুরের পর থেকে কাজ করেন, তিনি সকালে ছুটি পান। কলিকাতার ট্রামে-বাসে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদেরও এ ধরণের ছুটি থাকে। ডাকঘর, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে কেবল পূজোর দু'একটি দিন, স্বাধীনতা দিবস, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দিনগুলিতে ছুটি থাকে।

নানা ধর্ম সম্প্রদায়েরও আলাদা ছুটির দিন আছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রীস্টান প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম-কর্ম উপলক্ষে ছুটির দিন নির্দিষ্ট থাকে। হিন্দুদের সরস্বতী পূজা, দোলপূর্ণিমা, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে ছুটি থাকে। মুসলমানদের ইদুজ্জোহা, ঈদ-উল্-ফিতর, মহরম, শব-ই-বরাত প্রভৃতির জন্য ছুটি থাকে। বৌদ্ধদের বুদ্ধ-পূর্ণিমা বিশেষ পবিত্র দিন। খ্রীস্টানদের ছুটির দিনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। শিখদের গুরু নানকের জন্মদিবস উপলক্ষেও ছুটি থাকে।

প্রাচীন কালেও গ্রীষ্মের ছুটি, বর্ষার ছুটি এবং অন্যান্য পার্বণে অনধ্যায় বা কর্ম-বিরতির ব্যবস্থা ছিল। যারা গুরুগৃহে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসে বিদ্যাভ্যাস করত, তাদের গ্রীষ্ম ও বর্ষার ছুটি একটু দীর্ঘই হতো। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দার্জিলিং শিলং প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রীষ্মের দিনে কোনো ছুটি নেই, কিন্তু শীতের আধিক্য হেতু শীতকালে দীর্ঘ ছুটি দেওয়া হয়। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজে ছুটির সংখ্যা বেশী। গ্রীষ্মকালীন ছুটি ও শারদীয় ছুটি বেশ দীর্ঘ। তা ছাড়া সকল সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানের দিনগুলি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের আবির্ভাব-তিরোভাব তিথি, স্বাধীনতা-দিবস, গণতন্ত্র-দিবস, নববর্ষ প্রভৃতির ছুটি তো আছেই। এই প্রসঙ্গে রবিবারের ছুটির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করিনি, কারণ এই দিনটা ট্রাম-বাস-হাসপাতাল ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই সাপ্তাহিক বিরতির দিন হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

কাজের জীবনে ছুটির মূল্য অনেকখানি। মানুষ প্রতিদিন কাজ করে চলেছে, কোনো দিকে ফিরে তাকাবার তার অবকাশ নেই। বিরামহীন কাজের মধ্যে মন

খাবি খেতে থাকে। প্রতিদিনের কাজের একঘেয়েমিতে মানুষ অকেজো হয়ে পড়ে। কাজেই এই নীরস যান্ত্রিকতা থেকে মনকে মুক্তি দেবার জন্যই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটি চাই। মানুষের জীবনে কাজের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই বিরতির প্রয়োজন আছে। যন্ত্রের কর্মশক্তি অটুট রাখবার জন্য উহাকেও নিয়মিত বিশ্রাম দিতে হয়, উহাকে বন্ধ রাখতে হয়। মানুষেরও কর্মশক্তি ও জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা ও বৃদ্ধির জন্য তার জীবনে ছুটি বা অবসর অধিকতর প্রয়োজনীয়। ছুটির পর মানুষের উৎসাহ ও কর্মশক্তি এবং পরমায়ু বর্ধিত হয়। কাজের মাঝে অবকাশ না থাকলে তার জীবনে সমস্ত হাসি গান কাজের গুরুভার পাষাণ চাপে তলিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। যাঁরা অফিসে কাজ করেন, তাঁদের জীবনে মাঝে মাঝে কর্ম-বিরতির ক্ষণ আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তের সৃষ্টি করে। কাজের বাইরেও যে পৃথিবীর আনন্দ-সম্ভার রয়েছে, তার আস্বাদ তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন। কল-কারখানার শ্রমিকরা ক্লান্তিকর কাজের ফাঁকে বিশ্রামের অবসর পেলে বাইরের আলোর গানে সুর মেলাতে পারে অথবা স্কুল-কলেজের ছুটির দিনে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারে বা দেশ-ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ছুটির দিনগুলোতে সবাই বাঁধা-নিয়মের বাইরে নির্মল আনন্দের পরিবেশে নিজেকে চিন্তা ও ক্লান্তির ভার থেকে মুক্ত করতে পারে।

তবে ছুটির মাত্রা বাড়িয়ে কাজে অবহেলাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কাজও চাই, আবার প্রয়োজনে কাজের ফাঁকে জীবনের আনন্দ উপভোগের ক্ষণটুকুও চাই। কাজকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে হলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই অবসর ক্ষণটুকু না থাকলে চলে না। জীবনের আনন্দই তাকে সহজ ও সুন্দর করে তোলে। যে শক্তি দিয়ে মানুষ কাজ করে, সেই শক্তি সঞ্চয়ের অবকাশও তার থাকা দরকার।

আমরা জীবনে যে বিরতির ক্ষণটুকু লাভ করি, তাকে কতোখানি জীবনের কাজে লাগাতে পারি, তা থেকে কতখানি অনাবিল আনন্দ সঞ্চয় করতে পারি, তা বিচার-সাপেক্ষ। স্কুল কলেজে ছুটির দিনের সংখ্যা বেশী, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা তার কতোখানি সদ্ ব্যবহার করতে পারে? কেউ কেউ হয়ত আর্থিক চাপে ছুটির আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু যাদের সেই অসুবিধা নেই, তারা কি ছুটির দিনগুলিকে কি করে সুন্দর ও মধুর করে তোলা যায়, তা বুঝতে পারে? অনেকে আবার ঘরের দাওয়ায়, পথের মোড়ে, চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে অযথা সময়ের অপব্যবহার করে। একে ছুটির সদ্ব্যবহার বলা চলে না, এ শুধু অলসতা ও অকর্মণ্যতার প্রশ্রয় দান।

ছুটির দিনগুলি সংযতভাবেই উপভোগ করা উচিত। বন্ধুরা মিলে গান-বাজনা চড়ুইভাতি, নৌকাভ্রমণ, কোন দ্রষ্টব্য-স্থান দেখা, বাস-ভ্রমণ, সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় অতিবাহিত করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি ছুটি পেয়ে শহরের কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে বেড়িয়ে এলে দেহ-প্রাণের উপকার হয়;

চলচ্চিত্র প্রভৃতি দেখেও বাকি দিনগুলি উপভোগ করা যায়। সাহিত্য ও সমাজ-সেবার কাজও করা যায়। এছাড়া খেলাধূলা ত আছেই। তবে এখনকার দিনে কাজে ফাঁকি দিয়ে, লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে, সিনেমা খেলাধূলা প্রভৃতিতে মেতে থাকা একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দ্বারা ছুটির যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয়, এখনকার দিনে ছুটির দিনগুলি অকাজেই কেটে যায়। অন্য দিকে এই আর্থিক সংকটের দিনে আনন্দ উপভোগ করার মত মনের অবস্থাও অনেকের থাকে না, অথচ এই ছুটির দিনগুলিই এক দিন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে আনন্দোচ্ছল করে রাখত। আমরা কাজের বাইরে এসে হৃদয়ের সম্পর্কটুকু স্থাপন করার অবকাশ পেতাম। আজ যন্ত্র-দানব মানুষের জীবনের এই অবকাশ-মাধুর্যটুকু বিনষ্ট ঘটিয়েছে। তাই যাঁরা অবকাশ পান, তাঁদের অবকাশ-মুহূর্তগুলির অপব্যয়ই ঘটে থাকে। যেটুকু অবকাশ পাই, তা যদি বলিষ্ঠ মন নিয়ে সংযত ভাবে উপভোগ করতে পারি, তবেই ছুটির যথার্থ মূল্য দেওয়া হবে, কর্ম-বিরতির দিনগুলি সার্থক হয়ে উঠবে।

উৎসব ও সমাজ-জীবনে উহার প্রভাব

উৎসবের তাৎপর্য —বিভিন্ন রূপ —ঋতু উৎসব—ধর্ম উৎসব—শস্যোৎসব—নবান্ন, পৌষ-পার্বণ—ফল-শস্য-পিষ্টক উৎসব—গৃহ ও পারিবারিক উৎসব—পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ উপলক্ষে উৎসব—সাধারণ উৎসব।

উৎসব মানুষের শক্তির প্রকাশ, মহত্ত্বের প্রকাশ, প্রাচুর্যের প্রকাশ, আনন্দের প্রকাশ। উৎসবে ব্যষ্টি-সমষ্টির সহিত, বিশ্বাত্মার সহিত একাত্মবোধ অনুভব করে, ক্ষুদ্র আমি বৃহৎ আমির সহিত মিলিত হয়।

বাঙালী উৎসবপ্রিয় জাতি। কথায় বলে, বার মাসে তের পার্বণ। বৎসরের বার মাসের মধ্যে বহুবিধ উৎসবের ভিতর দিয়া বাঙালীরা জীবনের আনন্দকে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এইসব উৎসব অনুষ্ঠানের তাই একটি বিশেষ স্থান আছে। ধর্ম, ঋতু, ফসল, ফল, পিষ্টক, পরিবারের নানা অনুষ্ঠান, গ্রামের নানা জনহিতকর কার্য উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া বর্তমানে নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, মনীষী ও মহাপুরুষের জন্মতিথি প্রভৃতি উৎসব আমরা করিয়া থাকি।

সুখকর ঋতুর সমাগমে আনন্দ প্রকাশ করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। বর্ষার দুঃখশেষে শরৎ ও শীতের কষ্টের অবসানে বসন্ত মানব হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত অভিনন্দন লাভ করিয়া থাকে। তাই শরৎ ও বসন্তকালে বিভিন্ন দেশে কোনো-না কোনো উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে উৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজা শারদোৎসব নামেই পরিচিত। শ্রীপঞ্চমী ও দোল বসন্তোৎসবেরই নামান্তর। দীপান্বিতা হেমন্তোৎসব। দুর্গোৎসব বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উৎসব। সরস্বতী পূজা ছাত্র-সমাজের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় উৎসব। দীপান্বিতা ও দোল বা

হোলি বাঙালী অবাঙালী সকলেরই প্রিয়। রথ, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে মেলা, বক্তৃতা, যাত্রা-নাটক, শোভাযাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। মুসলমানদের প্রধান উৎসব ঈদ আর মহরম, খ্রীস্টানদের বড় দিন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

বাঁচিবার জন্য অন্নসংস্থান জীবমাত্রেরই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য। উহার উপর সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ নির্ভর করিতেছে। তাই শস্যোৎসবের বিভিন্ন অবস্থায় ভাবী অন্ন-ব্যবস্থার ভরসায় মানুষ নানারূপ উৎসব করিয়া থাকে।

বর্তমানে বিভিন্ন শস্যোৎসবের মধ্যে অম্বুবাচি ও নবান্ন উল্লেখযোগ্য। আষাঢ়ের প্রারম্ভেই অম্বুবাচী। ইহা আসলে শস্যোৎপাদনের সূচনাকাল। এই সময় নববর্ষা সমাগমে পৃথিবীর শস্যোৎপাদন সম্ভাবনা জাগিয়া উঠে। তাই এই সময় চাষীরা নূতন করিয়া কৃষিকার্য আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং কোথাও কোথাও কিছু আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থাও হইয়া থাকে।

নূতন ধান ওঠার পর সর্বত্র আনন্দ ও উৎসবের ঢেউ বহিয়া যায়। শুভদিনে সেই ধান হইতে প্রস্তুত চাল প্রথম ব্যবহার উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব নবান্ন। নবান্নে নূতন অন্ন প্রথমে দেবতা ও আত্মীয়-স্বজনকে দিয়া পরে গৃহস্থ নিজে ব্যবহার আরম্ভ করেন। অগ্রহায়ণ মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পৌষের পৌষ-পার্বণ এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের অন্তরালেও নব শস্যাগমের আনন্দের প্রকাশ।

প্রধান প্রধান ফসল ছাড়া অন্যান্য কোনো জিনিস লইয়াও এইরূপ উৎসবের ব্যবস্থা আছে। নূতন আমের সময় এখনও অনেকে দেবতা বা পাঁচ জনকে আম খাওয়াইয়া তবে নিজেরা আম খাইয়া আম্রোৎসব করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাসে শুভদিনে সরিষা দিয়া কাসুন্দি (কাসন্দি) তৈয়ার করার সর্ষপোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। ছাতুসংক্রান্তি নামে পরিচিত চৈত্র সংক্রান্তিতে ছাতুদান ও ছাতু খাওয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পিঠাপর্বগুলির ভিতর দিয়াও বাংলার উৎসবের কিছু পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

সন্তান জন্মের আনন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশে এক সময়ে নানাবিধ উৎসবের প্রচলন ছিল। এইগুলির বেশির ভাগই বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিলেও মধ্যযুগ হইতে এই উৎসব মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে। মেয়েদের অনুষ্ঠিত বহুবিধ বার-ব্রতের ভিতর দিয়াও বাংলার উৎসবের একটি দিক প্রকাশ পাইয়াছে। স্বজনের নামের সহিত বাঙালীর পারিবারিক জীবনের আজো যে দুইটি উৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের নাম ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া ও জামাই-ষষ্ঠী। এই দুইটি উৎসবেরই প্রচলন খুব বেশি। বর্তমানে জন্মদিনের উৎসব। একটি নূতন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।

সমাজের মঙ্গল সাধন কোন কোন উৎসবের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কূপ বা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ রোপণ, মন্দির-সংস্কার বা প্রতিষ্ঠা উৎসব বিবিধ দান-কর্মের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিত। বর্তমানে এদেশে কতকগুলি নূতন উৎসব

বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নববর্ষ উৎসব, স্বাধীনতা দিবস ও গণতন্ত্র দিবসে উৎসব, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, গান্ধীজী প্রমুখ নেতা ও মনীষীদের জন্মোৎসব আমাদের দেশে মহাসমারোহে প্রতিপালিত হইতেছে। আগের দিনের প্রচলিত উৎসবগুলি হইতে এগুলির জনপ্রিয়তা অনেকাংশে অধিক। কারণ ইহাতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করেন।

বাংলার উৎসব এইভাবে পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনকে নানাভাবে পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছে।

হাট

অর্থনৈতিক কেন্দ্র—হাটের বর্ণনা, বিচিত্র পণ্য—হাটের দ্বিবিধ ভূমিকা : অর্থনৈতিক ও ভাবের আদান-প্রদান—হাটের শেষে।

হাট গ্রামের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। কেবল তাই নয়, গ্রামবাসীদের এই প্রাণকেন্দ্রে ভাবের আদান-প্রদানও চলে, আর চলে গ্রামের সঙ্গে শহরের সংযোগ। গ্রামগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু হাটের মাধ্যমে তাহাদের অর্থনৈতিক পূর্ণতা লাভ ঘটে। যে গ্রামে যে কৃষিপণ্য বা শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়, হাটে তা আনীত হয়ে অন্যান্য গ্রামে চালান হয়ে যায়। এই সকল পণ্য বা শিল্পদ্রব্য লোকেরা মাথায় করে, গরুর গাড়ীতে বা ট্রাকে বা ট্রেনে হাটে নিয়ে আসে এবং অনুরূপ যান-বাহনে উহা গ্রামান্তরে ও শহরে চলে যায়। এমনি করে গ্রামের উদ্বৃত্ত দ্রব্য হাটের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে গ্রামের সমৃদ্ধি আনে।

হাট সাধারণতঃ খাল বা নদীর ধারে, রেল-স্টেশন বা বড় রাস্তার নিকটে বসে যেখানে যাতায়াতের সুবিধা থাকে। হাটের বেশির ভাগ দোকানই খোলা অনাবৃত জায়গায় বসে, কতক বসে চালা ঘরে ও স্থায়ী পাকা ঘরে। দুপুরের পর হতেই দোকানীরা দোকানপাট সাজিয়ে বসে, কত রকম পণ্যদ্রব্যে হাট ভরে ওঠে। এক এক রকম পণ্য এক এক জায়গায় বিক্রী হয়, দোকানীরা সেই ভাবে দোকান সাজিয়ে বসে। তরিতরকারির দোকানের সংখ্যা বেশি, অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে। এই অঞ্চলটি কৃষিপ্রধান বলে প্রচুর কৃষিপণ্য আমদানী হয়। এটি জেলার শ্রেষ্ঠ ফল উৎপাদন অঞ্চল বলে জেলা-গেজেটিয়ারে উল্লিখিত হয়েছে। এজন্য এই হাটে প্রচুর আম, লিচু, পেয়ারা, আতা প্রভৃতি ফল আমদানি হয় এবং ফলের মরসুমে হাটে বেশি লোক সমাগম হয়। এখানে চালেরও প্রচুর আমদানি হয়। এ ছাড়া পাটেরও একটি ছোট কেন্দ্র। হাটে তরিতরকারি ফল ও শস্য ছাড়া আরো অনেক রকম জিনিস আসে। মেটে হাঁড়ি, কলসী, মণিহারি জিনিস, হোগলা, মাদুর, বাঁশের ঝুড়ি, ডালা, কুলো, মাছ ধরার চাই, দড়াদড়ি ইত্যাদি যথেষ্ট কেনা-বেচা হয়। জামা-কাপড়, লুঙ্গি, গামছার দোকান, ময়রার দোকান, মুড়ি, চিঁড়ে, খই, রুটী-বিস্কুট, চীনা-বাদাম, তেলে-ভাজার দোকান—কোথাও ভিড় কম নেই। কামারের দোকানে দা, কাস্তে, হেঁসো, নিড়েন, হাতী, খুন্তি,

ইত্যাদি বেশ বিক্রী হয়। ফেরিওয়ালার দল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে গান গেয়ে হাটের আবহাওয়ায় একটু আমেজ আনে। কোন দোকানী ট্রানজিস্টারে গান শুনিয়ে দোকানে ভিড় জমিয়ে তোলে।

হাটে হাঁস, মুরগী, ছাগল প্রভৃতিও বিক্রী হয়। মাছের বাজারটি একটি জায়গা জুড়ে বসে। সপ্তাহে এক দিন গোহাট বসে, সেটি এই হাট হতে খানিকটা দূরে একটি বিস্তীর্ণ মাঠে।

হাটে যেমন গ্রামের গৃহস্থদের বেচাকেনা চলে, তেমনি চলে বাইরের পাইকার, বা ফড়িয়াদের লেন-দেন। শহরের পাইকারগণ স্থলভে পণ্য কিনে টেম্পো, লরি, সাইকেল, ভ্যান বা নৌকা করে চালান দেন। এটি যেন হাটের বহির্বাণিজ্য। এই ভাবে পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমে শহরের সঙ্গে গ্রামের যেমন অর্থনৈতিক যোগাযোগ ঘটে, তেমনি গ্রামবাসীর সঙ্গে শহরবাসীর মনের একটা মৈত্রী সম্পর্কও গড়ে ওঠে। এইভাবে গ্রামের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

বাজার যেমন প্রত্যহ বসে, হাট বসে সপ্তাহে এক দিন কি দুই দিন। অনেক হাটের নিকট স্কুল, ডাকঘর, আপিস প্রভৃতিও থাকে। ডাকপিয়নগণ অনেক সময় দূর গ্রামের চিঠিপত্র হাটেই বিলি করে এবং টিকেট খাম পোস্টকার্ডও বিক্রি করে। অনেক সময় খবরের কাগজও হাটের দিন বিক্রি হয়। এইভাবে হাট গ্রামবাসীর একটি বড় প্রয়োজন সাধন করে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনে সকলেই নিজ নিজ চাষবাস বা শিল্পকাজে, চাকুরী বা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকে, এজন্য হাটের দিনটির জন্য সকলেই উন্মুক্ত থাকে। হাটের দিনটি যেমন আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্র, তেমনি ইহা পরস্পর দেখাসাক্ষাতে ভাবেরও আদান-প্রদানের বড় উপায়। এইজন্যও হাটে যাবার আকর্ষণ সবার এত প্রবল।

সন্ধ্যায় হাটে কেরোসিনের বাতি টিম টিম করে জ্বলতে থাকে। কোথাও দু'একটা গ্যাস-লাইট বা হ্যাজাক জ্বলে হাট আলোকিত করে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দোকানীরা দোকানপাট গুটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়। "কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরবার বেলা। ভাঙা হাট ধীরে ধীরে জনশূন্য অন্ধকারে পড়ে থাকে নির্জন নিঝুম।"

ছাত্র-জীবন—দায়িত্ব ও কর্তব্য

ছাত্র-জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব আদর্শ ও লক্ষ্য—জীবন গঠন প্রধান কর্তব্য, ছাত্র-জীবন তপস্যার জীবন—প্রাচীন ভারতে ছাত্র-জীবন ব্রহ্মচর্যের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠ—সংযম, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা—লক্ষ্য ও আদর্শ সমাজ-সেবা ও দেশসেবা।

জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল ছাত্র-জীবন। ছাত্র-জীবন বড়-সুখের সময়। আবার ছাত্র-জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি, কর্তব্য সর্বাপেক্ষা কঠোর। ইহাই জীবন গড়ার সময়—কর্ম-জীবন গঠনের প্রস্তুতিপর্ব। সংযম শৃঙ্খলা ও

নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে দেহ মন ও মস্তিষ্কের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করিয়া জীবন-সংগ্রামের যোগ্য সৈনিক হওয়াই ছাত্র-জীবনের কর্তব্য ও লক্ষ্য। দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ মেধাবী জীবন, শ্রদ্ধাশীল নিষ্ঠাবান্ উন্নত চরিত্র, বহুজন-হিতায় মহৎ কর্ম-প্রয়াস—ছাত্র-জীবনের ইহাই মহোত্তম আদর্শ।

ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ, ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা, ছাত্র-জীবন তপস্যার জীবন, সাধনার জীবন। এই সময়ে অধ্যয়নই সর্বোত্তম তপস্যা, কিন্তু একমাত্র নয়। ছাত্রগণ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, ভবিষ্যৎ নায়ক। পরিবার সমাজ ও দেশের প্রতি তাহাদের গুরু কর্তব্য রহিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা এই কর্তব্য ও দায়িত্বের ভার সুষ্ঠুভাবে বহন করিতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে এই সময়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এই সময় দেহে অটুট স্বাস্থ্য, মনে অদম্য উৎসাহ ও সাহস, বুদ্ধিবৃত্তি সুস্পষ্ট, সজাগ ও সহিষ্ণু থাকে। জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পারিবারিক ও সামাজিক নানাবিধ জনহিতকর কার্য করিয়া জীবনকে গঠিত ও পূর্ণবিকশিত করা কর্তব্য। এই সময় ব্যায়াম-চর্চা দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জন করা, পাঠ্যগ্রন্থের বহির্ভূত বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থপাঠ দ্বারা জীবনে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করা, জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আত্মিক জীবন সমৃদ্ধ করা, সাংসারিক বা কোন বৃত্তিবিষয়ক কাজ করিয়া অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হইবার যোগ্যতা অর্জন করা—ছাত্র-জীবনের মুখ্য করণীয়। শিক্ষা লাভ বা জ্ঞানার্জন আমাদের জীবনব্যাপী সাধনা হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেহ, মন ও চিত্তের সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতির সুযোগ জীবনে আর কখনও আসিবে না। ছাত্র-জীবনে যে ভিত্তিশিলা স্থাপিত হয় তাহার দৃঢ়তা বা শৈথিল্যের ওপরই ভবিষ্যতের জীবন-সৌধের উন্নতি, স্থায়িত্ব ও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে। সুতরাং এই মূল্যবান্ দিনগুলি হেলায় বা অবহেলায়, আলস্যে বা বাজে কাজে, গল্পগুজব করিয়া বা সিনেমা-খেলা দেখিয়া অপচয় করা মানব-জীবনের সর্বাপেক্ষা অমার্জনীয় অপরাধ।

প্রাচীন আর্য-সমাজে মানুষের জীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। ছাত্র-জীবন ছিল ব্রহ্মচর্য আশ্রম। উহা ছিল পরবর্তী গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের প্রস্তুতি-পর্ব। গার্হস্থ্য আশ্রমই ছিল চারি আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এজন্য ছাত্রকে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বাস্থ্যে শক্তিতে কর্মঠতায় সংযমে সেবায় শ্রদ্ধায় ত্যাগে পরিপূর্ণ জীবন গঠন করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমের যোগ্য হইতে হইত। এজন্য কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে গুরুগৃহে বা আশ্রমে ছাত্রগণকে অতিবাহিত করিতে হইত। অধ্যয়নের সঙ্গে কায়িক শ্রম, সংযম ও সর্ববিধ বিলাস-ব্যসন বর্জন বাধ্যতামূলক ছিল। এই ভাবে এক এক জন ছাত্র আদর্শ মানুষ হইয়া সংসারে প্রবেশ করিত।

সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছাত্রাবস্থায় জীবনকে সুগঠিত করিবার পথে অপরিহার্য। ভবিষ্যতের সুযোগ্য নাগরিকরূপে দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার গ্রহণ করিবার

যোগ্যতা ইহাতেই আনিবে। এই তিনটি গুণ জীবনে অভ্যস্ত হইলে ভবিষ্যতের কর্ম-জীবনে উহারা সফলতার পথ সুগম করিবে। ভবিষ্যতে যাহারা দেশের কর্ণধার হইবে, তাহাদের পক্ষে এই তিনটি গুণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

ছাত্র-জীবনেই জীবনের আদর্শ স্থির করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কেবল আত্মপরায়ণ হইয়া ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ জীবন যাপনে অমূল্য মানব-জন্মের সার্থকতা কোথায়? মানুষ অমরত্বের আকাঙ্ক্ষী। বহুর মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বহুজন-হিতায় জীবন যাপন। ত্যাগেই বৃদ্ধি, ত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ। স্বার্থ বিসর্জন দিয়া জগতের হিতে আপনাকে সমর্পণ করাতেই যথার্থ মহত্ত্ব, বীরত্ব ও সার্থকতা। সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগের দ্বারাই অর্জিত হয় পরমার্থ।

ছাত্র-সমাজ ও সক্রিয় রাজনীতি

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ও দেশোন্নতি-কার্যে ছাত্রদের দান—সাম্প্রতিক ছাত্র-বিক্ষোভ—সক্রিয় ও দলীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়।

বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রগতি-আন্দোলনে ছাত্র-সমাজের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনে, বিপ্লবী আন্দোলনে ও অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রগণ সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া অশেষ কষ্ট ও নির্যাতন, কারাবরণ ও দ্বীপান্তর-ভোগ করিয়াছে, ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন বিসর্জন দিয়াছে। মুক্তি-সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তাহাদের ত্যাগ ও বীরত্ব অতুলনীয়। এই সকল আদর্শ-পাগল স্বদেশ-প্রেমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন সার্থক, তাহারা চিরস্মরণীয়। ছাত্র-সমাজ পৃথিবীর যে কোন নবচিন্তা ও কর্মধারার সহজ ও স্বাভাবিক গ্রহীতা ও নেতা। এই জন্যই দেখিতে পাই, নূতন মতবাদ ও কর্মধারার প্রেরণার মুখপাত্র ও জয়যাত্রার অগ্রণী এই ছাত্র-সমাজ।

এদেশে ছাত্র বিক্ষোভ চিন্তাশীল দেশহিতৈষী মানুষ-মাত্রকেই উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। যে কোন ব্যাপারেই ছাত্রদের বিক্ষোভ চলিলে শিক্ষা বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ছাত্রদের দাবী-দাওয়া উত্থাপন, প্রতিকার-ব্যবস্থা, প্রতিবাদ প্রকাশ সংযত ও শান্তিপূর্ণ ভাবে হওয়া সঙ্গত ও শোভন এবং ছাত্র-জীবনের মর্যাদার অনুরূপ। জাতির শ্রদ্ধার পাত্র শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের লাঞ্ছনা ও 'ঘেরাও', জাতীয় সম্পদ ধ্বংস, পরীক্ষা ভণ্ডুল, হিংসাত্মক আচরণ প্রভৃতি ছাত্র-সমাজের সুনামের পরিপন্থী ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। ছাত্র-বিক্ষোভ সুস্থ ও স্বাভাবিক

জীবনযাত্রার পরিচায়ক নয়। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক হতাশা ইহার অন্যতম কারণরূপে নির্দেশ করা যায়। কিন্তু এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পরিচালিত হইলে কি অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব? ইহাতে ছাত্র-জীবন ব্যর্থ হয়, অভীপ্সা বহু দূরে অপনীত হয়। উচ্চাশা দুরাশার মরীচিকায় পরিণত হয়।

ছাত্রবিক্ষোভ প্রায়শঃ রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থে অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নানা বিষয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে বহুবিধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যধারার সংস্পর্শে আসিতে হয়। চিন্তার রাজ্যে বিচরণে অধিকার সকলেরই আছে এবং ছাত্র-জীবনেই নানা চিন্তা ও কর্মধারা চিত্তকে আলোড়িত করে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এক কথা আর সক্রিয় ভাবে রাজনৈতিক দলে যোগ দান ও কার্যে অংশ গ্রহণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। অবশ্য জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে ছাত্রদিগকেও দেশরক্ষার কার্যে যোগদান করিতে হয়, তাহা বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজনেই ঘটে।

ছাত্রদের অপরিণত বয়সে চিন্তাশক্তি পরিপকতা লাভ করে না, ভাবাবেগের প্রাবল্য থাকে, তখন নানাভাবে জীবন সহজেই প্রভাবিত হয়, যুক্তি, বিচার, বিবেচনা, দূরদৃষ্টি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সব-কিছুই তখন অপরিপুষ্ট। অনেকে ঝোঁকের মাথায় কখনও অন্যের প্রভাবে, কখনও দশ জনের চাপে অথবা যৌবনোচিত বাহবা লাভে এই সকল কার্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু যেদিন ব্যর্থতার অনুতাপে জীবন ভাঙিয়া পড়ে, সেদিন তো আর প্রতিকারের পথ থাকে না। ছাত্রদেরও যেমন প্রতিটি কর্তব্য ও দায়িত্ব বিচার করিয়া গ্রহণ করা উচিত, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্ব আছে দেশের নেতৃবৃন্দের। যথার্থ জীবন গড়া ও দেশ-গঠনের কাজে তরুণ জীবনগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিবার দায়িত্ব তো তাহাদেরও কম নয়। জীবন তো কেবলমাত্র আন্দোলন নয়, বিক্ষোভ নয়, জীবন সাধনা, জীবন তপস্যা।

দেশ-ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা

বিবিধ উদ্দেশ্য—শিক্ষার অঙ্গ—শিক্ষার পূর্ণতা দান—পুঁথিগত বিদ্যা ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পার্থক্য—বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয়ের ফল—উদার ও প্রসারিত দৃষ্টি—অভিজ্ঞতার উপকার—প্রয়োজন ও ফলাফল—তীর্থভ্রমণ—আধুনিক বিশ্বে ভ্রমণের অত্যাবশ্যকতা ও ভ্রমণ-ব্যবস্থার অত্যুন্নতি—উপসংহার।

অবসর যাপন, আনন্দ লাভ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ, অর্থোপার্জন, তীর্থস্থান দর্শন, আবিষ্কারের আকর্ষণ ইত্যাদি নানা উদ্দেশে লোকে দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকে।

দেশ-ভ্রমণ ভিন্ন জ্ঞানের প্রসার সম্ভবপর নয়। স্কুল-কলেজের শিক্ষায় মানুষ সাধারণতঃ যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তাহা পুঁথিগত এবং সীমাবদ্ধ। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, তাহাকে আমরা বাস্তবে

প্রত্যক্ষ ও রূপায়িত করিয়া দৃঢ়বদ্ধ করি। আমাদের অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এবং উহার সহিত নব নব জ্ঞান সংযোজিত করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে হইলে ভ্রমণ একান্ত আবশ্যক। পুঁথিগত বিদ্যার সহিত বাহিরের পৃথিবীর জ্ঞান মিলাইয়া লইতে পারিলেই শিক্ষা সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়। এজন্যই বর্তমানে অন্যান্য দেশে দেশ-ভ্রমণ শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। য়ুরোপের প্রায় শিক্ষায়তনেই দেশ-ভ্রমণ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। সেখানে ছাত্রেরা বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হয়।

আমরা পুস্তকের মধ্য দিয়া বহির্বিশ্বের সহিত পরিচিত হই। আমরা সমাজ-বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পড়ি এবং তাহার মধ্য দিয়া বিশাল পৃথিবীকে জানিবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাহাতে আমরা কতটুকু কৃতকার্য হই? পুঁথির ভিতর দিয়া বিশাল পৃথিবীর কতটুকু পরিচয় আমরা লাভ করি। সমাজ-বিদ্যা বা ইতিহাস হউক, আর ভূগোলই হউক, বা যে-কোন বিষয়ই হউক, কোন ক্ষেত্রেই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পৃথিবীর মানব-সমাজের সাক্ষাৎ পরিচয় না পাইতেছি। যে বিচিত্র প্রাণী এবং যে বিচিত্র বস্তুপুঞ্জ সমাজ-বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল হইতে মুখস্থ করিলাম, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অন্তরে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাই শিক্ষা আমাদের অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। আমাদের পুঁথিগত এই শিক্ষাকে যেদিন প্রত্যক্ষ করিয়া লইতে পারিব, তাহাকে বাস্তব সত্যের মধ্যে গ্রহণ করিব, সেই দিনই বিদ্যানিকেতনের শিক্ষা যথার্থ হইয়া উঠিবে। দেশ-ভ্রমণের মধ্য দিয়া পুঁথিগত বিদ্যাকে যাচাই করিয়া লইবার সুযোগ পাই। তাই দেশ-ভ্রমণ শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ ও দেশ ছাড়া অন্য কিছুকে জানিবার চেষ্টা করি না। যে-সব আচার-ব্যবহার ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই বড় হইয়া উঠে, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লই। কিন্তু বহির্বিশ্বের চারিদিকে যে বিচিত্র মানবগোষ্ঠী রহিয়াছে, তাহার সহিত নিজেকে এক করিয়া লইতে পারি না। সত্যজ্ঞান ও প্রগতির পথে নানা সংস্কারে পরিপূর্ণ দেশাচারই আমাদের পদে পদে বাধা দেয়। দেশ-ভ্রমণের মধ্যে মানুষ সেই বাধাকে উল্লঙ্ঘন করে, সংস্কারের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে, অন্তরকে মুক্ত করে, পবিত্র করে, পূর্ণ করে। বৃহত্তর মানব-সমাজের সহিত পরিচিত হওয়ার ফলে মানুষ যে শিক্ষা লাভ করে, তাহা স্কুল-কলেজে বসিয়া ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি পাঠ করা অপেক্ষা অনেক অধিক।

দেশ-ভ্রমণের মধ্য দিয়া মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও প্রসারিত হয়। পল্লীর ক্ষুদ্র নিকেতনে বাস করিয়া আমরা দূর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকি। আমাদের মধ্যে মানুষের চেয়ে সত্য হইয়া উঠে লৌকিক আচার-ব্যবহার এই আচার-ব্যবহার দিয়া আমরা মানুষে মানুষে একটা বিভেদ সৃষ্টি করি। কিন্তু দেশ-ভ্রমণের

ফলে যখন সেই সীমাকে অতিক্রম করি, তখন আচার-ব্যবহারের গণ্ডীর মধ্যে মানুষকে বিচার করি না। জগতের বিচিত্রতাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে মানুষে মানুষে যে দূরত্ব তাহা অতিক্রম করা যায় না।

শিক্ষা ও জ্ঞানের সঙ্গে অভিজ্ঞতাও মানুষের জীবনে বড় সম্পদ্। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া মানুষ শিক্ষাকে অনেকটা বড় করিয়া তুলিতে পারে। দেশ-বিদেশে ভ্রমণের ফলে মানুষ কেবলমাত্র শিক্ষাই লাভ করে না, নানা অভিজ্ঞতাও সে সঞ্চয় করে যে অভিজ্ঞতা মাতৃভূমির মঙ্গলসাধনে ব্যবহৃত হইতে পারে। উন্নত দেশে ভ্রমণের ফলে অনুন্নত দেশের অনেক উপকার সাধিত হয়। উন্নত দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিল্প-ব্যবস্থা, বাণিজ্য-ব্যবস্থা প্রভৃতির জ্ঞান ভ্রমণের ফলে লাভ করা যায় এবং সেই সমস্ত শিক্ষাই দেশের অনুকূলে আসিয়া দেশের উন্নতির কারণ হয়। রাশিয়ার সম্রাট্ জার পিটার দি গ্রেট নিজের দেশের উন্নতির জন্য য়ুরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং পশ্চিম য়ুরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে তিনি স্বদেশের উন্নতি সাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন।

বিদেশে ভ্রমণের ফলে যুগের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় এবং সেই ভাবে নিজের দেশকে চালিত করা যায়। এইজন্য দেশের ব্যবসায়ী, শিল্পী, রাজনীতিবিদ্, শিক্ষাবিদ্ প্রমুখ লোকদের বিদেশে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অনেকে আনন্দ পাইবার জন্যও দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন। ভ্রমণের প্রতি মানুষের আকর্ষণের ইহাও একটি বড় কারণ। আনন্দলাভের সঙ্গে হৃদয়ের প্রসারণ ও পারস্পরিক বোঝাপড়াও দেশ-ভ্রমণের একটি উল্লেখযোগ্য ফল। ইহা ছাড়া নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের আকর্ষণও যুগে যুগে দেশ-ভ্রমণের প্রেরণা জোগাইয়াছে।

ভারতবর্ষে অসংখ্য তীর্থস্থান রয়েছে। এই সব তীর্থের অধিকাংশই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্রোড়ে অবস্থিত। সেই সব স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিলে চক্ষু যেমন তৃপ্তিলাভ করে, মনও তেমনি প্রসন্ন হইয়া উঠে এবং হৃদয়ে উদার মানব-প্রেম জাগ্রত হয়।

বর্তমানে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও শিক্ষার বিস্তার এবং রাজনৈতিক আদান-প্রদানের ফলে পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠী পারস্পারিক স্বার্থে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক সম্মেলনাদি প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের পরস্পর বিভিন্ন দেশে যাতায়াত অপরিহার্য হইয়াছে। এই সকল ভ্রমণ ও সম্মেলনের ফলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্তমানে বাস, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, জাহাজ, এরোপ্লেন প্রভৃতি পরিবহণ-ব্যবস্থা উন্নততর হওয়ায়, উন্নত ধরণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সড়কগুলি প্রসারিত হওয়ায় এবং সর্বত্র ভাল হোটেল ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা থাকায় লোকের

ভ্রমণ-স্পৃহা বাড়িয়াছে। তাই ভ্রমণও সহজসাধ্য হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই ভ্রমণ প্রসারের জন্য সরকারি ভ্রমণ-বিভাগ পর্যটকদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়া থাকে। বিদেশীয় পর্যটকদের আগমনে দেশের বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হয়।

মোট কথা, ভ্রমণের মধ্য দিয়া মানুষ অন্তরের বিস্তার ও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। শিক্ষার দিক হইতে, অভিজ্ঞতার দিক হইতে, আনন্দের দিক হইতে, জাতির উন্নতির প্রয়োজনে এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনে দেশ-ভ্রমণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

বেতার ও জন-জীবনে উহার প্রভাব

উপক্রমণিকা—বেতারের উন্নততর রূপ টেলিভিশন—বেতারের বিস্ময়কর আবিষ্কার ও বেতার-তত্ত্ব—বেতার এ যুগের শ্রেষ্ঠ শক্তি—পরিচালনা—বেতারের ব্যাপক জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার—আনন্দদান—আকাশ-বাণীর ভূমিকা—জনজীবনে বেতারের গুরুত্ব।

আধুনিক কালে বিজ্ঞান যেমন দূরকে নিকট করিয়া দিয়াছে, দূরের কথা কাছে আনিবার বা মুখের কথা দূরে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থাও তেমনি করিয়াছে। ফলে পৃথিবীর মানুষ পরস্পরের নৈকট্য বেশী করিয়া অনুভব করিতেছে। দূরকে নিকট বন্ধু আর পরকে আপন করিবার কাজে যে সব বৈজ্ঞানিক পন্থা আমাদের সহায়ক হইয়াছে, বেতার-বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আজ ইহার সাহায্যে নিজের দেশের কথা পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে পৌঁছাইতে পারি এবং সেখানকার বক্তব্যও তৎক্ষণাৎ শুনিতে পারি। ইহার চেয়েও বিস্ময়কর টেলিভিশন (television)। টেলিভিশনে শোনা ও দেখা যুগপৎ চলে। ইহা বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হন, সেই ঘটনা টেলিভিশন যোগে দূরের এক সভাগৃহে হুবহু দৃষ্ট হইয়াছিল। টেলিভিশন-যন্ত্রে গায়ক, বাদক, বক্তা ও অভিনেতাদের গান, বাজনা বা কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে এবং তাহাদের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গীও দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রালোকে মহাকাশ-যাত্রীদের গতিবিধি ও চন্দ্রে অবতরণের প্রতিটি ঘটনা টেলিভিশন যোগে পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং পৃথিবীর আট কোটি লোকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, ভারত, প্রভৃতি দেশে বসিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিরীক্ষণ করিয়াছে।

বেতারবার্তা বিদ্যুৎশক্তির এক বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া। ইহা বহু যুগের বহু বিজ্ঞান-সাধকের সাধনার ফল। আমাদের আচার্য জগদীশচন্দ্রও ইহার অন্যতম আবিষ্কারক। কিন্তু ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের বিজয়মালা লাভ করেন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি। নব-উদ্ভাবিত টেলিভিশন আবিষ্কারের গৌরব মুখ্যতঃ জন বেয়ার্ডের।

জনজীবনে বেতারের অসীম প্রভাব। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর কোন কালে সৃষ্টি হয় নাই। এত সহজে এত অল্প সময়ে এত বিস্তৃত

ভাবে এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকের জ্ঞান, শিক্ষা, আনন্দ বিতরণের ব্যবস্থায় বেতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বেতার বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শক্তি, সর্বোৎকৃষ্ট শাণিত হাতিয়ার। বেতারের ক্ষমতা গত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। শিশুশিক্ষা বল, বয়স্ক-শিক্ষা বল, বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা বল, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তমধ্যে সমস্ত বিদ্যা ও জ্ঞান বিকীর্ণ করা একমাত্র বেতারেই সম্ভবপর। গান, ভাষা প্রভৃতিও বেতারের মাধ্যমে শেখানো চলে। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বেতারের সাহায্যে দেশের লোকের অজ্ঞতা অতি অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে দূর করিতে সক্ষম।

আমাদের দেশে বেতার-শক্তির নিয়ন্ত্রণ-অধিকার রাষ্ট্রায়ত্ত। ভারত সরকারের একটি পৃথক্ মন্ত্রণালয় ইহা পরিচালনা করেন। অবশ্য ইহাকে স্বশাসিত সংস্থায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাবও উত্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের 'ব্রিটিশ ব্রড্কাস্টিং কর্পোরেশন' (বি. বি. সি.) ও আমেরিকার 'আমেরিকান রেডিও ব্রড্কাস্ট' বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রায়ত্ত বা লোকায়ত্ত যেরূপ প্রতিষ্ঠানই হউক, বেতারকে রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ বা শ্রেণীস্বার্থ-বিমুক্ত রাখা উচিত। বিগত মহাসমরের সময়ে যুধ্যমান জাতিগুলির প্রচার-যন্ত্র জনসাধারণকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করিত এবং মানুষকে বিপথে চালিত করিত। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বেতার-শক্তির সাহায্যে মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন এবং মানুষকে মহৎ চিন্তা, উন্নত জীবন ও অনাবিল আনন্দের অধিকারী করিতে পারেন।

সংবাদ-পত্রে আমরা যে-সকল সংবাদ দীর্ঘ সময় ধরিয়া ও অনেক পরে জানিতে পারি, বেতারের কল্যাণে তাহা আমরা ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে পরিজ্ঞাত হই। ইহাতে আমাদের সময় ও শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। বেতার ছাত্র শিক্ষক ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, রাজনীতিজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিক, বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই সমভাবে উপকারে আসে। বর্তমান ভারতে আকাশ-বাণীতে ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হইয়া থাকে। অনেক শহরে, পার্কে ও রাস্তার মোড়ে রেডিও যন্ত্রদ্বারা সংবাদাদি প্রচারের ব্যবস্থা আছে। কেবলমাত্র বধির ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেকটি মানুষের বর্তমান জীবনযাত্রায় বেতার-যন্ত্র অপরিহার্য সঙ্গী বলা যায়। ইহা তাহার আনন্দে দুঃখে অবসরে প্রয়োজনে সর্বাবস্থায় একান্ত সাথী। শিক্ষিত লোকের পক্ষে খবরের কাগজ এখনকার দিনে নিত্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বেতার শিক্ষিত বা নিরক্ষর সকলের জন্যই প্রয়োজনীয়। ইহার উপযোগিতা সর্বাধিক। বেতার একাধারে আমাদের গৃহশিক্ষক, নাট্যমঞ্চ, গানের ওস্তাদ, সংবাদ-পত্র। এত বড় বন্ধু আর নাই।

বেতারের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর যে-কোন মনীষী ব্যক্তির ভাষণ স্বকর্ণে শুনিতে পারি, যে কোন নূতন আবিষ্কার-কাহিনী সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারি। বেতারের আবিষ্কার না হইলে এই সুযোগ মুষ্টিমেয় লোকেরও ঘটিত কিনা

সন্দেহ! অকূল মহাসমুদ্রে জাহাজের, মহাশূন্যে মহাকাশ যানের, দুর্লঙ্ঘ্য হিমাবৃত পর্বতে, মরুভূমিতে, গভীর অরণ্যে, মেরুদেশে বা দুর্গম পর্বত-শিখরে মানুষের শ্রেষ্ঠ সহায় বেতার। বেতারের সাহায্যে মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান কত জাহাজ এবং আকাশে দিক্‌ভ্রান্ত কত উড্ডীয়মান আকাশযান রক্ষা পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমানে মহাকাশচারীরা বেতারকে সঙ্গী করিয়া মহাকাশে শুধু পর্যটনই করেন নাই, মহাকাশের বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যও পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। বেতার সাহায্যে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের যুদ্ধ-বিগ্রহের সংবাদ, দুর্ঘটনার খবর, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিবর্তন ইত্যাদি মুহূর্তমধ্যে সর্বত্র বিস্ফুরিত হইতেছে। বর্তমানে বেতার সংবাদ-পত্রেরও একটি অপরিহার্য অঙ্গ। টেলিপ্রিন্টার ও রেডিও-ফটো ব্যতীত আধুনিক দৈনিক পত্রিকা পরিচালনা সম্ভবপর নয়।

বেতার মানুষের জীবনে আনন্দ দানের এক বিরাট ও ব্যাপক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। পৃথিবীর যে কোন দেশে গুণী শিল্পীর গান, বাজনা, অভিনয় আমরা আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া বিনা পয়সায় অনায়াসে উপভোগ করিতে পারি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও কি এ কথা কল্পনা করিতে পারিত? দিল্লীতে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে, মোটা টাকার টিকিট কিনিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দ সেখানে গান শুনিতেছেন, আর আমরা লক্ষ লক্ষ লোক শত সহস্র মাইল দূরে থাকিয়া গৃহকোণে, প্রান্তরে, ট্রেনে বা বাসে পথ চলিতে চলিতে সেই সকল গান ক্ষুদ্র ট্রানজিস্টারে শুনিতেছি। আমেরিকার বক্তৃতা, জার্মানীর বেহালা বাজনা, ইংলণ্ডের গান, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার বর্ণনা আমরা ভারতবর্ষে বসিয়াই শুনিতে পারি। একই সময়ে একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোককে আনন্দ দানের এত বড় মাধ্যম পৃথিবীতে কোন কালে ছিল না।

জন-জীবনে বেতারের অসীম প্রভাব। কেবল শহরের মানুষ নয়, পল্লীর জনসাধারণও ইহার প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, তাহাদের পক্ষে বেতার-যন্ত্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ সম্ভবপর নয়। এইজন্য সরকার গ্রামে গ্রামে এবং স্কুলে স্কুলে বেতার-যন্ত্র দিয়াছেন। পল্লীবাসীদের উপযোগী বহু বিষয় আজকাল আকাশবাণী হইতে পরিবেশিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, কৃষি-বিষয়ক তথ্য পরিবেশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পল্লীজীবনকে আনন্দমুখর করিয়া তুলিবার জন্য নাটক, যাত্রা, কবিগান, পল্লী-সঙ্গীত, শ্যামা-সঙ্গীত, খনার-বচন, পালাগান, পদাবলী-কীর্তন ইত্যাদি আকাশবাণী হইতে নিয়মিত প্রচারিত হইয়া থাকে। এজন্য আকাশ-বাণীর বিভিন্ন আসর পল্লীবাসীর পরম বান্ধব।

পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর। তাহাদের সাক্ষর করিয়া তোলার কাজে বেতার অনেক সহায়তা করিতে পারে। একটি সুপরিকল্পিত পাঠক্রম নির্ধারণ করিয়া বেতারে প্রচারের জন্য যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যাইবে সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। প্রত্যহ সংবাদ-পত্রে যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা নিরক্ষর পল্লী-বাসীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সপ্তাহে একবার পরিবেশন করিতে পারিলে বয়স্ক-শিক্ষার কাজ অনেক অগ্রসর হইতে পারে। পল্লীর লুপ্তপ্রায় উৎসব-আনন্দ, খেলাধূলা পুনরুজ্জীবনের কাজেও আকাশবাণী যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। কথকতা, পল্লী-সঙ্গীত, কৃষি-তথ্য পরিবেশিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐগুলি পল্লীবাসীদের অধিকতর বোধগম্য করিয়া তুলিতে পারিলে জনসাধারণের আরও উপকার হইবে। সাধারণভাবে সমগ্র জনজীবনের নৈতিক মানের আদর্শ উন্নত করিয়া তোলাই আকাশবাণীর আদর্শ হওয়া উচিত। বেতারকে সর্বস্তরের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সহায়ক করিয়া তুলিতে পারিলেই বিজ্ঞানের এই শক্তিটির সদ্ব্যবহার করা হইবে। জন-জীবনের সহিত বেতারের সংযোগ যত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, বেতার-যন্ত্র ততই জন-জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের ও তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সহায়ক হইবে।

তোমার মাতৃ-ভাষা ব্যতীত অপর যে ভাষাটি তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে তাহার পরিচয়

প্রস্তাবনা—আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজীর স্থান—ইংরেজীর দান—প্রিয় কেন—ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

পৃথিবীর প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই স্বীকার করেন যে, একাধিক ভাষা শিক্ষা না করিলে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কেবলমাত্র মাতৃ-ভাষায় পারদর্শী হইলে মাতৃ-ভাষা ও সেই ভাষাশ্রয়ী সাহিত্যের মহিমা যেমন সম্পূর্ণ বুঝা যায় না, তেমনি বিশ্বের নানা বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভও সম্ভবপর হয় না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মাতৃ-ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাশ্চাত্যের প্রায় রাষ্ট্রে ইংরেজী, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলির মতো শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকিলেও স্কুল-জীবন হইতে একাধিক ভাষা শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়। স্কুলে আমরা বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও সংস্কৃত শিখিবার সুযোগ পাই। বাংলা আমাদের মাতৃ-ভাষা, তাই ইহাকে এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। হিন্দী বর্তমানে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রাধান্য পাইতেছে, তাই ইহা শিখিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। হিন্দীর সাহায্যে অন্ততঃ উত্তর-ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়। সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইতে পারি। ইংরেজী ভাষাকে বর্তমানে অনেকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে না চাহিলেও ভারতবর্ষে অন্যতম প্রধান ভাষা হিসাবে ইহার গুরুত্ব খুবই বেশি। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে

রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন করা হইয়া থাকে এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষিত হয়।

ইংরেজ জাতি আমাদের দেশে অধিকার বিস্তার করিয়া প্রায় দুই শত বৎসর আধিপত্য করে। তাহারা এক দিকে যেমন আমাদের দেশের ধন-সম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে, অন্য দিকে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাইয়াছে। বাহিরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ এই ইংরেজী ভাষারই মাধ্যমে সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের মাতৃ-ভাষার পরে ইংরেজী ভাষাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। সত্যি বলতে কি, মাতৃ-ভাষার পরেই আমি এই ভাষাটিকে ভালবাসি। ইংরেজী ভাষার প্রতি আমার অনুরাগ বা শ্রদ্ধা আকস্মিক কিছুই নয়। আমাদের পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রায় সকলেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগী। হয়তো আমাদের পারিবারিক পরিবেশই আমাকে ইংরেজীর প্রতি এতখানি অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ছেলে-ভুলানো ছড়া বা নার্সারী রাইমের বই আমাকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আমি তখনও ইংরেজী পড়িতে পারি না। তাই আমার দিদি ইংরেজী ছড়াগুলি আবৃত্তি করিতেন, আর আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটি ছড়া মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম, উঠিতে বসিতে সব সময় বলিতাম—

Ba-a Ba-a Black sheep, have you any wool ?
Yes Sir, yes Sir, three bags full ;
One for the master, one for the dame,
One for the naughty boy who lives down the lane,

সেই 'Jack and Jill went up the hill' আবৃত্তি করিতে কি যে আনন্দ অনুভব করিতাম, তাহা এখনও ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। একটু বড় হইবার পর গালিভারের কাহিনী, রবিনসন ক্রুসো, রবিনহুডের কাহিনী পড়িয়াছি। চিরকালের মতো হারাইয়া যাওয়া ভাইটিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য শিশু-মনের সেই আকুলতা আজও আমার দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে—

O, call my brother back to me
I cannot play alone,
The summer comes with flowers and bee,
Where's my brother gone ?

আরও যখন বয়স হইয়াছে, তখন বুঝিয়াছি, এই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আমাদের কতখানি সাহায্য করিয়াছে। ইংরেজ আমাদের ক্ষতি করিলেও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আমাদের ক্ষতি করে নাই। বরং জ্ঞান-পিপাসা অনেক পরিমাণে পূরণ করিয়াছে। বিশ্বের সকল জ্ঞান-ভাণ্ডার এই ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। ইংরেজী-সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে অনেক কিছু জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি।

মাতৃ-ভাষার পরই ইংরেজী ভাষা আমার প্রিয় বটে, কিন্তু এই ভাষা-শিক্ষার কুফলও এক কালে আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিল। একদল ইংরেজী শিক্ষিত মাতৃ-ভাষাকে অনাদর ও অবহেলা করিতে থাকে। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী রীতি-নীতি আয়ত্ত করিয়া সাহেব বনিবার অবাঞ্ছিত ঝোঁকও দেখা যায়। ইংরেজী ভাষাকে আয়ত্ত করা আর ইংরেজী ভাষাকে নিজের ভাষা মনে করা, এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মাতৃ-ভাষাকে আমি ভালবাসি, ইংরেজী ভাষাকে আমি অবজ্ঞা করি না। আর যাই হউক এই ভাষা শিখিয়া বর্তমান জগতের যে কোন জ্ঞান বা বিদ্যা শিখিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি। ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। জ্ঞাতব্য এমন কোন বিষয় নাই যাহা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত না হইয়াছে। পৃথিবীর বিখ্যাত ভাষাগুলির যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষাতেই অনূদিত হইয়া থাকে।

স্কুল-জীবন সমাপ্ত করিয়া যখন আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার লাভ করিব, তখন অর্থ-নীতি, সমাজ-নীতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ইংরেজী ভাষাই প্রধান সহায়। অনেকে হয়ত বলিবেন, এখন ত বাংলাতেই সকল বিষয়ে পঠন-পাঠনের সুযোগ আছে, আবার ইংরেজী কেন? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রক্ষার পক্ষে ইংরেজীর গুরুত্ব খুবই বেশী। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া জানিলে অনেকখানি জানা হয় বটে, কিন্তু সব জানা হয় না। আমরা ইংরেজীয়ানার পক্ষপাতী নই। কিন্তু যতখানি ইংরেজী আমাদের ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং যতখানি না হলে আমরা জীবন-যাত্রার পথে পিছাইয়া পড়িব, ততখানি ইংরেজী শিক্ষা যে প্রয়োজন একথা অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী সাহিত্য-সম্ভার যে ভাব-সম্পদ বিতরণ করে তাহার রসবৈশিষ্ট্য সর্বজন-স্বীকৃত। তাই আমি মাতৃ-ভাষার পরই ইংরেজীকে প্রধান স্থান দিই। ইংরেজীর বাতায়ন-পথেই সমগ্র বিশ্ব আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে সর্ববিধ প্রগতির পথে চলিতে সহায়তা করিতেছে এবং স্বাধীন ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজীর মাধ্যমেই সংযোগ রক্ষা করিতেছে। ইংরেজী-শূন্য অখণ্ড ভারত এবং বর্তমান যুগের জীবন-যাত্রা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

তোমার দেখা একটি স্মরণীয় স্থান

(একটি ভ্রমণ কাহিনী)

প্রস্তাবনা—পুরীযাত্রা—পথের দৃশ্য—খণ্ডগিরি—উদয়গিরি—ভুবনেশ্বর—পুরীধাম—জগন্নাথ মন্দির—পুরী বাঙালীর অতি প্রিয়—রথযাত্রা উৎসব—সমুদ্রের শোভা—সমুদ্র স্নান—প্রত্যাবর্তন।

বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে থাকতে থাকতে মন যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন বাইরে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। প্রতিদিনের জীবন ধরাবাঁধা নিয়মে চলে। এক-এক

দিন মনে হয়, নিয়মের গণ্ডীর বাইরে এসে খেয়াল খুশীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই।

তাই পূজোর ছুটিতে আমরা চার বন্ধুতে মিলে ঠিক করলাম, ছুটির মধ্যে ভুবনেশ্বর হয়ে এবার পুরী যাওয়া যাক। পুরীতে এর আগে আমরা কেউ যাইনি। লক্ষ্মী-পূজার পর পুরী যাবার অনুমতি পেলাম। বহু কালের বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতি-জড়িত উড়িষ্যার এই পুণ্যধামটি দেখার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে রইলাম। অবশেষে লক্ষ্মী-পূজার পর আমাদের বহুবাঞ্ছিত দিনটি এল। আমরা চার বন্ধুতে যখন হাওড়া থেকে রেলগাড়ীতে পুরীর পথে যাত্রা করলাম, তখন আমাদের আনন্দ আর ধরে না।

আমরা পুরী এক্সপ্রেসে যাত্রা করলাম। পূজার পর বলে রেলগাড়ীতে তেমন ভিড় ছিল না। গাড়ী ছাড়তেই জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে লাগল। শীত তখনও পড়ি পড়ি করেও পড়েনি। তাই হাওয়া বেশ ভালই লাগছিল।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রি। চাঁদের আলোয় চারিদিকে যেন আনন্দের বান জেগেছে। রেল-লাইনের দু'পাশে দূরে দূরে গ্রাম। কোথাও বা দু'একটি শীর্ণ নদী দেখা যাচ্ছে, চাঁদের আলোয় তার রুপোলী জল চিক্ চিক্ করছে। আমাদের এক্সপ্রেস গাড়ী কত নাম-না-জানা স্টেশনের উপর দিয়ে হুস্ হুস্ করে ছুটে চলেছে। খড়্গপুর প্রভৃতি বড়ো বড়ো স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য গাড়ী থামছিল। ঘুমোবার নানা চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারলাম না। আমাদের ভুবনেশ্বরের টিকিট কাটা ছিল। ভোর পাঁচটার দিকে ভুবনেশ্বরে এসে পৌঁছলাম। ভুবনেশ্বর ভারতের প্রাচীন তীর্থস্থান এবং উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী।

ভুবনেশ্বরের স্টেশন মাস্টারের নিকট আমাদের জিনিসপত্র রেখে ভুবনেশ্বর মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা ঠিক করলাম, আগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখে ফেরার পথে ভুবনেশ্বর হয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরব। অনেকক্ষণ হাঁটার পর দু'টি পাহাড়ের চূড়া দেখা গেল। চূড়ার উপর মর্মর-পাথরের সুন্দর মন্দির সূর্যের আলোতে ঝলমল্ করছিল। বামদিকে খণ্ডগিরি, ডানদিকে উদয়গিরি। পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা আছে। প্রাচীনকালে এসব গুহায় জৈন-সাধকেরা তপস্যা করতেন। এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক চূড়ার ওপর মর্মর পাথর দিয়ে ছোট জৈন মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন। এই পাহাড় দু'টি জৈনদের তীর্থস্থান। খণ্ডগিরি দেখে আমরা উদয়গিরি দেখতে গেলাম। উদয়গিরির অনেক গুহায় মূর্তি, শিলালেখ ও চিত্র আঁকা রয়েছে। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে রাজা খারবেলের নেতৃত্বে ইহা জৈনধর্মের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এখানে প্রাচীন অক্ষরে লিখিত শিলালেখগুলিতে খারবেলের বিজয়যাত্রা ও জৈনধর্ম সমর্থনের কথা লেখা আছে।

খণ্ডগিরি উদয়গিরি থেকে ফেরার পর ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখতে গেলাম, অনাদিলিঙ্গ শিব-মন্দির। এমন বিচিত্র কারুকার্য-খচিত মন্দির আর কখনও চোখে দেখিনি। পাথরের উপর এত সুন্দর, সূক্ষ্ম ও প্রাণবন্ত কারুকার্য কখনও কল্পনা

করতে পারিনি। ভুবনেশ্বর মন্দিরময়, প্রায় সবই শিব মন্দির। এখানকার মন্দিরের কারুকার্য জগদ্বিখ্যাত। যম ও যমুনা মন্দির এবং রাজরাণী মন্দিরের সূক্ষ্ম ও সৌষ্ঠবময় কারুকার্য অপূর্ব। শিল্পীগুরু হ্যাভেল সাহেবের মতে এই সকল মন্দির পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অট্টালিকার অন্যতম। মন্দিরের নিকটে যে বাজার আছে, তার কাছে 'বিন্দু সরোবর' নামে এক দীঘি আছে। সবাই এই জলকে পবিত্র বলে, কিন্তু এর জল তেমন পরিষ্কার নয় বরং নোংরাই বলা যেতে পারে। এই বিন্দু সরোবরের মাঝখানে একটি মন্দির। গৌরী-কেদার কুণ্ডের জল খুব হজমকারক।

সব দেখে ভুবনেশ্বর স্টেশনে ফিরে এসে দুপুরের গাড়িতেই পুরীর পথে রওনা হলাম। পৌছাতে বেশী দেরী হ'ল না। সমুদ্রের পারে স্বর্গদ্বারে একটি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হলো।

পুরী বা শ্রীক্ষেত্র অতি প্রাচীন পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ভারতবর্ষের চারি প্রান্তে অবস্থিত বদরীনাথ, দ্বারকা, রামেশ্বর ও পুরী—এই চারিটি ধাম হাজার বৎসরের অধিক কাল যাবৎ হিন্দুধর্মের কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত।

পুরীর প্রাচীনতম আকর্ষণ শ্রীজগন্নাথ মন্দির এবং দ্বিতীয়টি সমুদ্র। দুই-ই বিশাল, দুই-ই মানুষকে যুগ যুগ ধরে আকৃষ্ট করেছে। পুরীর মন্দির তুর্কী আক্রমণের পূর্বে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক নির্মিত হয় এবং জগন্নাথের দারুমূর্তি স্থাপিত হয়। জগন্নাথের সহিত তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং ভগ্নী সুভদ্রাও মন্দিরের গর্ভ-দেউলের রত্নবেদীতে স্থাপিত আছেন। পুরীর মন্দিরের গঠন বড়ই সুন্দর, ইহার ৩ অংশ—ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির ও মূলমন্দির বা গর্ভ-দেউল। ভোগমণ্ডপের সম্মুখে একটি গরুড় স্তম্ভ আছে, এখানে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভু ভাবাবেগে জগন্নাথ দর্শন করতেন। মন্দিরের সুগঠিত উচ্চ চূড়া বহু দূর হতে চোখে পড়ে। মন্দিরের বিশাল চত্বরের চার দিকে অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে, এবং সমগ্র চত্বরটি উচ্চ-প্রাকার বেষ্টিত। প্রাকারের চার দিকে চারটি বিশাল দ্বার আছে, তন্মধ্যে সিংহদ্বারই প্রধান। পুরীতীর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এখানে জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণে জাত-বিচার নেই।

পুরী বাঙালীর এত প্রিয় হবার কারণ, ইহা মহাপ্রভুর শেষ জীবনের লীলাক্ষেত্র। এখানেই তাঁর তিরোভাব ঘটে। রাধাকান্ত মঠে (কাশী মিশ্রের বাটীতে) তাঁর বাসগৃহ গম্ভীরা আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। যবন ঠাকুর হরিদাসের সিদ্ধপীঠ সিদ্ধবকুল ও সমুদ্রতীরে তাঁর সমাধি-স্থান বৈষ্ণবদের পবিত্র তীর্থ। নরেন্দ্র সরোবরের তীরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠ ও শান্ত আশ্রমটি বড়ই রমণীয়। ইহা ছাড়া পুরীতে আরও বহু মঠ-মন্দির, আশ্রম, বিশাল দীঘি, অট্টালিকা ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান আছে।

রথযাত্রা, পুরীর বৃহত্তম উৎসব। রথযাত্রার সময় তিনখানি বিশাল কাষ্ঠময় নূতন রথে ত্রিদেবতা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে মন্দির হ'তে লক্ষ লক্ষ লোকের

সমাবেশে মাসীর বাড়ী গুণ্ডিচাবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ছয় দিন অবস্থানের পর উল্টো রথের দিন এই ত্রিমূর্তি আবার রথারোহণে শ্রীমন্দিরে ফিরে আসেন।

পুরীর সমুদ্রের শোভা ও সৌন্দর্য অতুলনীয়। বিশাল সমুদ্র তরঙ্গের পর তরঙ্গের শুভ্র ফেনিল শীর্ষবিস্তার করে সৈকতদেশে আছড়ে পড়ছে, কি তার গর্জন, কি তার আর্তনাদ—অবিশ্রান্ত গতিতে যুগ যুগ ধরে চলছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল নীলিমা, আর নীলিমা, বিশাল অনন্ত—বহু দূরে দিকচক্রবাল রেখার নীল আকাশ আর নীল সাগর কোলাকুলি করছে। সমুদ্রে সূর্যোদয়ের শোভার তুলনা নেই। প্রভাতের রক্তবর্ণ আলোকচ্ছটার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্র ও আকাশের মিলন রেখায় সূর্যদেব উদিত হন; পরক্ষণেই উজ্জ্বল আলোকে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিকালে অসীম সমুদ্র ও অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মন উদাস হয়ে যায়, কাণে ভেসে আসে সমুদ্রের একটানা কল্লোলধ্বনি।

পুরীতে সমুদ্রস্নান বড়ই উপভোগ্য। সমুদ্রের লবণাক্ত ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও সাঁতার যেমন আনন্দের তেমনি স্বাস্থ্যপ্রদ। স্থানীয় নুলিয়া নামক সমুদ্রচারীদের সঙ্গে নিয়ে আমরাও সাগরজলে হৈ হৈ করে সাঁতার কেটেছি, ঢেউয়ের উপরে নীচে ভেসেছি ডুবেছি। পুরীর স্বর্গদ্বারের সৈকতেই ভোরে বিকালে দলে দলে লোক ভিড় করে, ভ্রমণার্থীদের বেশির ভাগই বাঙালী। গ্রীষ্মকালেই পুরীর আবহাওয়া সবচেয়ে আরামপ্রদ। এ সময়ে জোর সামুদ্রিক হাওয়া বইতে থাকে, বাতাসে বলপ্রদ ওজোনের প্রাচুর্য স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটায়।

পুরীর ৫ মাইল দূরে সমুদ্রতীরের নিকটে কোণারকের প্রস্তরময় সূর্য-মন্দির বিখ্যাত। এরূপ সুনিপুণ শিল্পসৃষ্টি পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

অবশেষে ফিরে আসার সময় হ'ল কয়েক দিনের মধ্যে পুরী এতই ভালো লেগেছিল যে, ফিরে আসতে মন চাইছিল না। কিন্তু ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। নিতান্ত অনিচ্ছায় পুরী ছেড়ে এলাম। আসার সময় মনে হল যেন প্রিয়জনকে ছেড়ে দূরে যাচ্ছি।

বাংলার কৃষি ও কৃষিজীবী

বঙ্গভূমি—উর্বরা, অর্ধেক অধিবাসী কৃষিনির্ভর—দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব—কৃষির অনুন্নতির কারণ—উন্নতির উপায়—অন্যান্য দেশে কৃষির উন্নতি—কৃষির শত্রু।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির মাটি অতিশয় উর্বরা; এদেশের মাটিতে সোনা ফলে। দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গের একটি বড় অংশ শিল্পাঞ্চল হইলেও এখানকার অর্ধেকের কিছু বেশি লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের সুবিস্তীর্ণ উর্বর প্রান্তর, ছোট-বড় নদীনালা, প্রচুর বৃষ্টিপাত, সমস্তই কৃষিকার্যের উপযোগী। এদেশের কৃষকগণ পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ। তথাপি তাহাদের অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। বেশি জমির স্বত্বাধিকারী চাষীগণ বর্তমান

দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির ফলে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণ ছোট ছোট চাষীদের বা কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ভূমিহীন চাষী ও কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়। কৃষিজীবীদের দারিদ্র্য ও দেশের খাদ্যাভাব দূর হইতেছে না। ইহার কারণ কি?

ইহার প্রধান কারণ, আমাদের লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন সেই তুলনায় বৃদ্ধি পায় নাই এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন-ব্যবস্থারও বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

ইহা ছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষিজীবী অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। আধুনিক কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার। কেবল সাধারণ লেখাপড়া নয়, কৃষিজীবী ও তাহাদের সন্তানদের কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করিতে হইলে চতুর্মুখী প্রয়াস প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় উত্তম বীজ, উত্তম সার, বিভিন্ন সেচ-ব্যবস্থা ও উন্নত চাষের প্রণালী একান্ত অপরিহার্য।

আমরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের কাঠের লাঙ্গল ও বলদ দ্বারাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলি চাষ-আবাদ করিয়া থাকি। জমিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত থাকায় ইহাতে ট্রাক্টর বা যন্ত্র সাহায্যে চাষ করা সম্ভব নয়। বহু বৎসরের চাষে ক্ষীয়মাণ জমির উর্বরতাশক্তি বাড়াইবার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আমাদের নাই। আমরা হাতে বীজ ছড়াই, সেই পুরানো কাস্তে দ্বারা শস্য কাটি, কাঠের উপর ঝাড়াই বা বলদ দ্বারা শস্য মাড়াই করি। সেচের জন্য অনিশ্চিত বৃষ্টির উপর অসহায়ের মতো নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি। ইহা ছাড়া নিম্নস্তরের বীজ, চড়া সুদে টাকা ধার, শস্য বিক্রয়ের সমবায়-প্রথার অভাব প্রভৃতি ত্রুটি কৃষি ও কৃষকের উন্নতির পরিপন্থী। এই সকল ত্রুটির ফলে এদেশে প্রতি বিঘায় জমির ফলন অন্য দেশের ফলনের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। ভূমিহীন প্রকৃত চাষীর জমি নাই। জমির ঘন ঘন হস্তান্তর রোধ করা চাই। ক্ষুদ্র খণ্ড জমির সমবায়-প্রথায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একত্র চাষ-আবাদ করা কৃষির উন্নতিতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ না করিতে পারিলে অধিক ফসল ফলন সম্ভবপর নয়। বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ। কৃষি-ব্যবস্থার যান্ত্রিক-উন্নতি না হইলে কৃষির উন্নতি ও ফসলের প্রাচুর্য ঘটানো অসম্ভব। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাগ্রসর দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেই সকল দেশে জমি চাষ, বীজ বোনা, সার দেওয়া, শস্য কাটা, তোলা, ঝাড়া, গুদামজাত করা—সমস্তই যন্ত্রসাহায্যে সম্পন্ন হয়। কোন কোন দেশে সমবায়-প্রথায় জমি চাষ ও যৌথ খামার প্রবর্তন করিয়া ফসলের উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার শত শত মাইলব্যাপী কৃষিক্ষেত্রগুলিতে বড় বড় ট্রাক্টর সাহায্যে জমি চাষ করা হয় এবং এরোপ্লেন হইতে বীজ বপন, কীটনাশক ঔষধ

ছড়ানো প্রভৃতি করা হয়। এমন কি সেচের জন্য কৃত্রিম বৃষ্টিপাতও করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের চাষের জমির মোট পরিমাণের অতি সামান্য অংশেই দোফসলী চাষ হয়। ৩৩ লাখ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়। যাহাতে সকল জমিতেই দোফসলী চাষ হয়, সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সেচ-ব্যবস্থার জন্য খাল কাটিয়া বা পুরাতন খাল ও নদী সংস্কার করিয়া নদীতে বাঁধ তৈরী করিয়া জলাধার হইতে ছোট ছোট খাল বা নালা তৈরী করিয়া গভীর নলকূপ বসাইয়া, কূয়া কাটিয়া এবং পুকুর বা দীঘি সংস্কার করিয়া বা কাটাইয়া পাম্পের সাহায্যে শস্যক্ষেত্রে জল সরবরাহ ইত্যাদি নানা প্রকার সেচের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সারের মধ্যে গোবর প্রভৃতি জৈব সার, কম্পোস্ট সার, রাসায়নিক সার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সারের ব্যবহার দ্বারা জমির উর্বরতাশক্তি বাড়ানো প্রয়োজন। ইদানীং অনেক অঞ্চলে কৃষকগণ সরকারী উদ্যোগে এই সকল সারের প্রয়োগ করিয়া ধান উৎপাদনে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

সেচ ও সারের সাহায্যে একই জমিতে বোরো ধান, আউস ধান, ভুট্টা বা পাট, তারপর আমন ধান এবং শীতের ফসল, গম, যব, সরিষা, খেসারী, মটর, মুগ, মশুর, ছোলা প্রভৃতি ডাল উৎপাদন করিতে পারিলে কৃষিজীবীদের অবস্থার উন্নতি হইবে, খাদ্যেও দেশ স্বয়ম্ভর হইতে পারিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কৃষি-পদ্ধতির উন্নতির জন্য আধুনিক কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তন করা অন্যতম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কৃষি-শিক্ষার বিস্তার দ্বারা কৃষিজীবীদিগকে বর্তমান উন্নতিশীল দেশগুলির সমপর্যায়ে আনা সম্ভবপর। কৃষিকার্যকে শিল্পীকরণের কার্যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সর্বাধিক। এজন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। খাদ্য সমস্যার-ক্রমাবনতির আশঙ্কায় দেশবাসী ও সরকার বর্তমানে এ-বিষয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টিত রহিয়াছেন।

পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্রে, কৃষিবিষয়ক পরীক্ষাগার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, কৃষি-শিক্ষালয় ইত্যাদি দেশের প্রতিটি অঞ্চলে স্থাপন করিয়া কৃষির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। খাদ্য-শস্য বা পাট ইত্যাদি ফসল উৎপাদনের সঙ্গে নানাপ্রকার শাক-সব্জী, বিভিন্ন প্রকার ফল, মাছ ও হাঁস-মুরগীর চাষ, নানাবিধ কৃষিভিত্তিক শিল্পকার্য দ্বারা কৃষিজীবীর যথেষ্ট আর্থিক উন্নতিসাধন সম্ভবপর।

কৃষির বড় শত্রু বন্যা, খরা, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রোগ, পোকা ও পঙ্গপালের আক্রমণ। ইহা হইতে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্ভবপর নয়, সরকারকেই ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। নানাপ্রকার কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগ, পোকা ইত্যাদি নিবারণ করা যায়।

তোমার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ও তাহা সফল করিবার উপায়

প্রস্তাবনা—আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ—জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য চাই—শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য চাকুরী বা ব্যবসায় নয়—পরার্থে মানব-জীবনের সার্থকতা—দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ—দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—চিকিৎসক হইবার আকাঙ্ক্ষা ও তাহার কারণ।

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। মানুষের জীবনে কত আশার স্বপ্ন জাগে। তাহা যদি সত্য হইত, তবে জীবন কত না সুখের হইত। কিন্তু সবই সত্যরূপ লাভ না করিলে কোনটাই কি বাস্তবে রূপায়িত হয় না?

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাই তাহার জীবনকে সামনের পথে আগাইয়া লইয়া যায়। জীবনের কোন আদর্শ ও উদ্দেশ্য না থাকিলে মানুষের সকল চেষ্টা সকল সাধনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কোনো বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্যই মানুষের এত পরিশ্রম, এত সাধনা। তাই উদ্দেশ্য বা আদর্শ কিছু না থাকিলে লক্ষ্যহীন সাধনার কোনো অর্থই হয় না। ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়াছি।

লেখাপড়া শিখিব, এই লক্ষ্য আমার ছেলেবেলা হইতেই ছিল। কারণ বর্তমান যুগে সমাজে মানুষের মত বাস করিতে হইলে মূর্খ হইয়া থাকিলে চলে না। বিশেষতঃ প্রতিনিয়ত জীবনে যে নূতন নূতন প্রশ্ন দেখা দিতেছে, জগতে যে নূতন তত্ত্ব বা তথ্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে মানব-সমাজে বাস করাও কঠিন হইয়া পড়িবে। তাই লেখাপড়ার প্রতি আমার বরাবরই শ্রদ্ধা আছে। কেবলমাত্র চাকুরী করিবার জন্য লেখাপড়া শিক্ষার আগ্রহ আমার বিন্দুমাত্র নাই। অবশ্য ইহাও সত্য যে, অর্থ উপার্জন করিতে না পারিলে সংসারে অন্নের সংস্থান করা দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু চাকুরী লক্ষ্য করিয়া লেখাপড়া শিখিতে গেলে জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। তাই অনেক সময় দেখি, আমরা যে পরিমাণ বিদ্যা লাভ করি, সে পরিমাণ শিক্ষা লাভ করি না।

এখনও জীবনের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করি নাই। কাজেই হয়ত আমার জীবনের লক্ষ্য কিছুটা অগভীরই হইবে। কিছুদিন আগেও মনে মনে কল্পনা করিতাম, ভবিষ্যৎ জীবনে ব্যবসায়ী হইব। কারণ ব্যবসায়ই আমাদের পরিবারের প্রধান জীবিকা। এদিকে উন্নতির সুযোগও ছিল। কিন্তু অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছি ব্যবসায়ী হইব না।

চাকুরীই বলি, আর ব্যবসায়ই বলি, সবই নিজের স্বার্থের জন্য। বর্তমানে আমাদের তীব্র সংকট মুহূর্তে নিজের স্বার্থকে অত বড়ো করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় না। হয়ত অনেকে বলিবেন, অল্প বয়সে এই ধরণের ভাবালুতা সকলেরই থাকে।

টাকা-পয়সা অনেকের আছে, অনেকেই ভালো খাইয়া-পরিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। কিন্তু উহাই যদি মানব-জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে মানুষ আর অন্য প্রাণীতে পার্থক্য কোথায় ?

দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সমাজ যাহাতে শিক্ষিত ও সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা এবং নিরক্ষর বয়স্করা যাহাতে অল্প ব্যয়ে বা বিনা-ব্যয়ে লেখাপড়া শিখিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এদেশে অশিক্ষার অন্ধকারে বেশীর ভাগ লোকই দিন যাপন করে। কাজেই শিক্ষার প্রসারের জন্য আত্মনিয়োগ করার আকাঙ্ক্ষা আমি অনেক দিন হইতেই পোষণ করিয়া আসিতেছি।

শিক্ষার ভিতর দিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আমার কাম্য হইলেও শিক্ষাব্রতী হইয়াই যে দেশকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই এত মানসিক দীনতাও দেখা দিয়াছে। ইহা ছাড়া অধিক উন্নতির জন্য যুগোপযোগী কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য আমি একা কখনও ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব না। আমাদের সরকারকে পূর্ণ সহানুভূতি লইয়া এদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে জাতীয় স্বাস্থ্যের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক দরিদ্র ও নানা রোগে জর্জরিত। রুগ্ন অসুস্থ মানুষ আজ আর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছ না।

এই সব দরিদ্র রোগজীর্ণ মানুষের মুখে নূতন জীবনের সুর ধরাইতে হইবে এবং আশার আলো জ্বালাইতে হইবে। তাই স্থির করিয়াছি, ভাগ্য প্রতিকূল না হইলে আমি চিকিৎসক হইব। হয়ত অনেকেই বলিবেন, যদি চিকিৎসকই হইবে, তবে ব্যবসায় করিতে আপত্তির কারণ কি ছিল ? আমি মনে করি, নিজের ভরণ-পোষণের জন্য যতখানি প্রয়োজন, ততখানি দক্ষিণা গ্রহণ করা চলে। আর যাহাদের অর্থ-সামর্থ্য আছে তাহাদের নিকট হইতে দক্ষিণা গ্রহণ করিতে আপত্তি কি ? দরিদ্রদের বিনা দক্ষিণাতেই চিকিৎসা করিতে হইবে।

আমাদের দেশে অনেক সময় মহামারী ও নানা প্রকার ব্যাধি বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে, তাহা দূর করা অত্যাবশ্যক। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে, ঔষধের অভাবে দরিদ্র দেশবাসীকে অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়া যদি আমি আমার দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। পারিবারিক অবস্থা প্রতিকূল না হইলে এবং আমার পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হইলে, আমার এই আত্মবিশ্বাস আছে যে, আমি নিশ্চয়ই চিকিৎসা-শাস্ত্রে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব।

যে বিষয় তোমাকে পড়িতে হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি তোমার সর্বাধিক প্রিয় বিষয় এবং কেন?

প্রস্তাবনা—ইতিহাস প্রিয় কেন—ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা—বর্তমান ও ভবিষ্যতের নির্দেশ—জাতির সামগ্রিক পরিচয়—যে জাতির ইতিহাস নাই সে জাতি আত্মবিস্মৃত—ভারত-ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য—ইতিহাস পাঠে আনন্দ লাভ—ঐতিহাসিকের সাধনা—ইতিহাস পাঠে অতীতের স্পন্দন।

আমাকে ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি পাঠ্য-বিষয় পড়তে হয়েছে। পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য সকল বিষয়েই সমান অধিকার থাকা দরকার। তবে এর মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে ভালো লাগা ও না লাগার প্রশ্নও এসে পড়ে। যেমন বাংলা বা ইংরেজী সাহিত্য পড়তে গিয়ে তার সঙ্গে ব্যাকরণ পড়া অনেকেরই নিশ্চয় ভালো লাগে না। সাহিত্য পাঠে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সেটা হয়ত অঙ্ক বা ভূগোলে পাওয়া যায় না। তবে এই ভালো লাগা না লাগা অনেকটা আপেক্ষিক। এমন অনেকে আছেন, যারা সব বিষয়ের চেয়ে অঙ্ক খুব ভালবাসেন। আবার অঙ্কের নাম শুনলে অনেকের গায়ে জ্বর আসে।

পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে ইতিহাসই আমার সব চেয়ে প্রিয়। অতীতের মানব-সমাজের সুখ-দুঃখময় এক একটি জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী পড়তে আমার বেশ ভালো লাগে। ইতিহাস শুধু অতীতের কাহিনী বলেই ক্ষান্ত হয় না, সে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথও নির্দেশ করে।

ইতিহাসের কাহিনীর মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ নিহিত থাকে। অনেকের মতে প্রকৃতির নিয়মে ব্যতিক্রম নেই, একবার যা ঘটেছে তা আর একবার ঘটতে বাধ্য। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, 'History repeats itself'—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। অনেকে এ কথা মানতে চান না। আমরা দেখতে পাই, মানুষের প্রবৃত্তির ও রুচির বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে বটে, কিন্তু তার অন্তঃপ্রকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। অতীতের ঘটনা-পরম্পরা অনুভব করলে বর্তমান ও ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিবেশে মানুষের মনোভাব ও কর্মপ্রবৃত্তি কেমন হতে পারে, তা নিরূপণ করা অসম্ভব নয়।

ইতিহাসে একদিকে যেমন রাজ-রাজড়ার কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহের সংবাদ, তেমনি তাতে অতীত দিনের সমাজ-জীবন ও ধর্ম-জীবন, মানব-সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার কথাও লিপিবদ্ধ থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাদের জীবন-যাত্রার মান কি ছিল, ইতিহাস পাঠে তাও জানা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'যে জাতির অতীতের ইতিহাস নাই, সে জাতির বড় দুর্ভাগ্য, সে জাতি আত্মবিস্মৃত।' জাতিগত স্বভাবটি বা বৈশিষ্ট্য জানতে না পারলে শুধু অন্য একটি উন্নত জাতির কর্মপন্থার অন্ধ অনুকরণের মধ্য দিয়ে কোনো জাতিই বড়ো হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাই হয়ত বলেছিলেন, 'ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবে, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলেই নয়।'

আমাদের পূর্বপুরুষের কর্ম-সাধনার ইতিহাস ভালো করে জানা দরকার। সে ইতিহাস সুষ্ঠুভাবে না জানলে আমরা প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারব না।

আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান না নিয়ে নিছক পরানুকরণের পথে কোনো জাতি আপন চরিতার্থতার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না। ভারত ইতিহাসের স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব, তখন বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"

ইতিহাস পাঠে প্রয়োজনের বাইরে আনন্দ অনুভব করা যায়। কত বিদগ্ধ ব্যক্তি যুগে যুগে শিল্প-প্রেরণায়, অতীতের রহস্যদ্বার উন্মোচনের আগ্রহে ঐতিহাসিক কাহিনীর সন্ধানে ঘুরেছেন। মাটি খুঁড়ে কত বিচিত্র ঐশ্বর্য সম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এসব অতীত দিনের মানব-সমাজের নীরব সাক্ষীর মত মাটির নীচে দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে ছিল। অতীত যুগের মানুষের জীবন-যাত্রার বিচিত্র কাহিনী আমাদের মুগ্ধ করে। এই জন্যই পরবর্তী কালের কবি চিত্রশিল্পী প্রভৃতি নিজেদের সাধনার বিষয়বস্তুকে অতীত দিনের জীবন-যাত্রার বৈচিত্র্য থেকে খুঁজে বার করবার প্রয়াস পান। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে আমাদের এই ধরণের রস-পিপাসা অনেকখানি মিটতে পারে।

কত মনীষী ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য নিজেদের অমূল্য সময়, এমন কি সংসারের সব ভোগ-বিলাস অকাতরে বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা কত বিপদসঙ্কুল অরণ্যে, মরুপথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কত প্রাচীন সম্পদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন, তাঁরা প্রাচীন শিলালেখ, তাম্রশাসন ও অতীত কালের মুদ্রা, তৈজস-পত্র ও গ্রন্থাদির সন্ধানে দুঃখময় প্রবাস-জীবন যাপন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

ইতিহাসের কাহিনী পড়তে আমার ভালো লাগে। অতীতের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী, সুখ-দুঃখের কাহিনী পাঠে আমি নিজের মধ্যে যেন অতীতের একটি রহস্যময় স্পন্দন অনুভব করি। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনাময় অতীত আমার চোখের সামনে একটি সুন্দর স্বপ্নরাজ্যের ছবি তুলে ধরে। মানুষকে মানুষ ভুলতে চায় না, তাই মানুষের ইতিহাস। মানুষকে ভালবাসি বলে ইতিহাসও ভালবাসি।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে

অন্যায় প্রশ্রয় না দেওয়া—ক্ষমা মহৎ ও বীরের ধর্ম—অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা পাপ—অন্যায়কারীর প্রশ্রয় দানও অন্যায়—অন্যায়ে নিষ্ক্রিয়তা পাপ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো—দুঃখ-বরণ ও সৎ-সাহস।

আমাদের মহাপুরুষেরা বলে গিয়েছেন, "জীবনে কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না, কখনও অন্যায় করবে না। যা ন্যায়, যা সত্য, তার শাসনই সব সময় মেনে চলবে।" তাঁদের এই নির্দেশ আমরা মেনে চলতে চাই বটে, কিন্তু সব সময় কি মেনে চলি? অন্যায়কে কি আমরা প্রশ্রয় দিই না?

ক্ষমা মানুষের এক মহৎ গুণ। এই সংসারে ক্ষমার মতো বড় ধর্ম আর নেই। যিনি আপন-পর শত্রু-মিত্র সকলকেই ক্ষমা করতে পারেন, তিনি সমগ্র বিশ্বকে জয় করতে পারেন। মানুষকে ভয় দেখিয়ে শাসন করার চেয়ে প্রেমের দ্বারা ক্ষমার দ্বারা শাসন করাই শ্রেয়ঃ। ভয় দেখিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না, কিন্তু প্রেমের বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করা যায় না। ক্ষমার ভিত্তি হল প্রেম বা ভালবাসা। ক্ষমার মধ্যে যথার্থ বীরত্বের পরিচয় নিহিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যুদ্ধ বীরধর্ম বটে, ক্ষমা তার চেয়ে বীরত্বে অধিক।'

কিন্তু ক্ষমারও সীমা আছে। ক্ষমাধর্ম জগতে অমৃতস্বরূপ হলেও অবস্থা-বিশেষে এই অমৃতও গরলে পরিণত হতে পারে। সকলকে ক্ষমা করাও অনেক সময় মঙ্গলজনক হয় না। অন্যায়কারী উৎপীড়ককে চোখ বুজে ক্ষমা করার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই, বরং সেখানে ভীরুতা ও দুর্বলতাই যেন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেউ যদি প্রতিনিয়ত অন্যায় করে, সেই অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে ক্ষমা পায়, তা হলে তার অপরাধ-প্রবণতা দিন দিন বেড়েই যাবে। যদি অন্যায়ের জন্য কোন রকম বাধা না পায়, ধীরে ধীরে সে সমাজের পরম শত্রু হয়ে ওঠে। এই ধরণের দুষ্কৃতকারীদের ক্ষমা করাও পাপ, কারণ তাদের অন্যায়কে ক্ষমা করলে তাদের অন্যায় করার স্পর্ধা বেড়ে যেতেই থাকে।

অন্যায় যে করে, তার মতো অপরাধী আর নেই। মানুষ হয়ে মানুষের উপর যারা অন্যায় আঘাত হানে, তাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিধাতার দরবারে বিচার প্রার্থনা করে প্রশ্ন করেছেন—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"

অন্যায়কারীকে সকলেই ঘৃণা করে। কিন্তু যিনি অন্যায় করেন না অথচ অন্যের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন, তাঁকেও কেউ কম ঘৃণা করে না। যে অত্যাচারী, যে উৎপীড়ক, সে ন্যায়ের বিধানে অপরাধী। কিন্তু এদের যাঁরা কেবলই ক্ষমার প্রশ্রয় দেন, তাঁদেরও অপরাধ কম নয়। এই অন্যায়কারীদের অন্যায়কে বাধা না দিয়ে ক্রমশঃ বাড়তে দিলে পরোক্ষভাবে সমাজেরই অনিষ্ট করা হয়।

সমাজের শত্রুদের সম্বন্ধে আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হয়। সেখানে যেন আমরা নির্মম হতে পারি, সেখানে যেন ক্ষমার দুর্বলতা দেখা না দেয়। অপরাধীর অপরাধের দণ্ড দিতে যেন কোন দ্বিধা না আসে। এই ব্রত পালনে যে পিছিয়ে পড়বে, মনুষ্যত্ব তাকে ক্ষমা করবে না।

আমরা যাকে অন্যায় বলি, তা কখনও নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্তভাবে পালন করা যায় না। 'আরেক জনে অন্যায় করলেও, আমি তো অন্যায় করছি না'— এই ধরণের নিষ্ক্রিয় মনোভাব চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচায়ক, ইহা কখনও মনুষ্যত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ নয়। অন্যায় দেখে উদাসীন থাকা চারিত্রিক অবনতি আনে, জাতিকে অধোগতির পথে নিয়ে যায়। এই নিষ্ক্রিয় মনোভাব সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইহা সমাজ-জীবনে ও ব্যক্তি-জীবনে পাপেরই নামান্তর।

আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দ্বিধা ও জড়তা থেকে মুক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি, তা হলে অন্যায়, অসত্য ভীরুর মত পালাবে। অন্যায়কে ধ্বংস করতে পারলে মানুষের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হবে, মনুষ্যত্ব অম্লান ও উচ্চশিরে রহিবে। কিন্তু অন্যায়কে অন্যায়ভাবে প্রশ্রয় দিলে অন্যায়ের ক্ষমাকারীকে ইতিহাস কখনো ক্ষমা করবে না।

মানুষ হয়ে মানুষকে অশ্রদ্ধা করা অনুচিত। কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, দুষ্কৃতকারী যদি নিকটতম প্রিয়জনও হয়, তবু তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিতে কোন দ্বিধা যেন না আসে। এই শাস্তি দেবার সৎসাহস মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। অন্যায়কে সমূলে উৎপাটিত করতে গেলে ব্যক্তিগত দুঃখবরণ মানব-কল্যাণের বৃহত্তম স্বার্থেই প্রয়োজন।

সব দুর্বলতা ছেড়ে মনুষ্যত্বের তেজ ও পৌরুষের দ্বারা অন্যায়কারীকে প্রতিহত করা পবিত্র কর্তব্য। এই অন্যায় ও অবাঞ্ছিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ যদি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তা' হলেই অন্যায়ের অবসান ঘটবে। এমন কি, অন্যায় মাথা তুলে দাঁড়াবারও সাহস পাবে না। তাই কবির ভাষায় আমরাও প্রার্থনা জানাই—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি সেথা তোমার আদেশে।"

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

জীবনে কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা—ছাত্র-জীবনে কষ্ট-স্বীকারের আবশ্যকতা—জীবনে দুঃখ-কষ্টকে উপেক্ষা—মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত—দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সাফল্য, সার্থকতা—সুখ-দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করা।

জীবনে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেতে হলে প্রত্যেক মানুষকেই কষ্ট স্বীকার করতে হয়। প্রবীণেরা বলেন, "কষ্ট ছাড়া কেষ্ট লাভ হয় না।"

মানুষ নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ করিতে চায়। কিন্তু এই সুখ বা শান্তি, পরিশ্রম বা চেষ্টা ছাড়া কখনও পাওয়া যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি থাকলেই সুখ-শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখ-কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়া বিষয়-সম্পত্তি অর্জন বা সংরক্ষণ কিছুই সম্ভবপর হয় না।

"দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে"—কথাটির মর্ম ছাত্র-জীবনের কথা আলোচনা করলেও আমরা বুঝতে পারি। ছাত্র-জীবনের প্রধান কর্তব্য "ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ। অধ্যয়নই ছাত্র-জীবনের তপস্যা। কিন্তু তপস্বীর জীবন আরামের নয়। তপস্বীকে ইষ্ট লাভের জন্য অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে গেলে এবং বিদ্যাশিক্ষায় সাফল্য লাভ করতে গেলে ছাত্রদেরও তপস্বীর মত অনেক দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করতে হয়। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় যদি কেউ হেলায় সময় নষ্ট করে, তা হলে তাকে পরিণামে ব্যর্থতাই পেতে হয়। ছাত্র-জীবন আলস্যে না কাটিয়ে যদি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা যায় এবং সাফল্য লাভের জন্য নিষ্ঠাসহকারে পরিশ্রম করা যায়, তা হলে কোন ছাত্রকেই জীবনে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হয় না।

মানুষের জীবনে উদ্যমহীনতা বা সংগ্রামহীনতা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবনে চলার পথে প্রতি পদক্ষেপেই মানুষকে দুঃখ ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধা অতিক্রম করতে পারলেই জীবনে আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। দুঃখকে এড়িয়ে গিয়ে কখনও সুখ পাওয়া যায় না। নিরুদ্যম জীবন কারো আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।

জীবনে সফলতা পেতে হলে অনেক বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে মানুষকে অগ্রসর হতে হয়। আঘাত-সংঘাত অতিক্রম করে, দুঃখের জয়-টীকা ললাটে পরে তাকে জীবন-পথে চলতে হবে। জীবনে যে দুঃখ আসে তা আনন্দকেই বহন করে আনে।

বিশ্বের অমর মানবদের জীবনী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা জীবনে যে সার্থকতা লাভ করেছেন, তার জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও সংগ্রাম তাঁদের করতে হয়েছে। পৃথিবীর অনেক ধনী ব্যক্তিও দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেই বড়ো হতে পেরেছেন। বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওকে তাঁর আবিষ্কারের জন্য লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর জীবনের মহান্ ব্রত অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন পালন করতে গিয়ে তাঁকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে সংগ্রাম করেই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক মনীষীদের গবেষণার পেছনে রয়েছে তাঁদের অক্লান্ত ও অতন্দ্র সাধনা। যাঁরা ভারতের পরাধীনতার গ্লানি দূর করবার মহান্ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, বিদেশী শাসকদের হাতে

তাঁদের অজস্র নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। কত দেশ-সেবক দীর্ঘকালের জন্য কারাগৃহে, দ্বীপান্তরে, বন্দীশালায় নির্যাতিত হয়েছেন, কত তরুণ-তরুণী ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের জীবনের এই সাধনা, এই দুঃখ-বরণ, স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। দেশ-প্রেমিকের সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটেছে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ভিতর দিয়ে।

ইংরেজ কবি বলেছেন, "If winter comes, can spring be far behind ?"—শীত এলে বসন্তের আর কতই বা দেরী? আমাদের কবিও বলেন, "মেঘ দেখে তুই করিস্‌নে ভয়, আড়ালে তার সূর্য আছে।" অন্ধকার আছে বলে আলোর মাহাত্ম্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শীতের রিক্ততার শেষে বসন্তের পরিপূর্ণতা দেখা দেয়। এই ভাবেই দুঃখের ভিতর দিয়ে সুখের মাধুর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি। দুঃখের সঙ্গে লড়াই করেই সত্যকে পেতে হয়। ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটার ভয়ে দূরে থাকলে, ফুল পাওয়ার আনন্দ কখনও অনুভব করা যাবে না। জীবনে যা পেতে চায়, তা' পাওয়ার জন্য কেউ যদি দুঃখ-কষ্টকে স্বীকার করতে ভয় পায়, তা হলে তার সারা জীবনে কখনও অভীষ্ট লাভ হবে না। দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করতে পারলেই মানুষ জীবনে সুখ লাভ করতে পারে। সাধক-কবি রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই।"

দুঃখের মন্থন-শেষে অমৃত মিলে, তাই জীবনে সুখ পেতে হলে দুঃখের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষকে বলতে হবে—

"তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।"

মানব-জীবনে সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ ঘূর্ণিত হচ্ছে। এ যেন নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধি। সুখ-দুঃখ জীবনের এপিঠ-ওপিঠ। মানুষকে দুই-ই সমভাবে ভোগ করতে হয়। কোন একটিকে পরিহার করে কেবলমাত্র অপরটি নিয়ে মানুষের জীবন-যাত্রা চলে না। এজন্য গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, "সুখ-দুঃখ শীত-গ্রীষ্মের মত মানুষের জীবনে আসে যায়, তুমি সুখ-দুঃখ সমভাবে গ্রহণ কর, উহা সহ্য কর। এই তিতিক্ষা মানুষকে অমৃতত্ব দান করে, জীবনকে মধুময় করে।

বাংলার পশু-পক্ষী

পশু-পক্ষী বাংলার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে সহায়ক—গৃহপালিত পশু—বন্য-পশু—বাংলার পাখী—ডাঙার পাখী, জলের পাখী, গায়ক পাখী, পাহাড়ের পাখী—উপসংহার—যাযাবর (মৌসুমী) পাখী।

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন অনির্বচনীয়, তেমনই বাঙালীর জীবনযাত্রাও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের এক অংশ জুড়িয়া আছে এ দেশের পশু-পক্ষী। বাঙালী যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ রাখে নাই, তেমনি পশু-পক্ষীকেও সে আপনার করিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছে। সকল পশু-পক্ষী যে তাহার বশ মানিয়াছে তাহা নয়, তবে অনেক পশু-পক্ষীকেই সে সন্তানবৎ লালন-পালন করিয়াছে, সংসারের সঙ্গী করিয়াছে।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরুর স্থান সর্বাগ্রে। তারপর মহিষ, ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, কুকুর ও বিড়াল। মানুষ যখন আদিম যুগে যাযাবরের মতো ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন ঘোড়া ছিল তাহাদের প্রধান জন্তু। পরে যখন মানুষ কৃষিকার্য শিখিল, তখন প্রয়োজন হইল গরুর। গরু বাঙালীর বড় সম্পদ্। গাভী বাঙালী পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিরীহ তৃণভোজী গরু আমাদের দুধ দেয়, আমাদের কৃষিকার্যে সাহায্য করে, আমাদের পণ্য বহনের সহায়তা করে। জীবিতাবস্থায় অথবা মৃতাবস্থায় গরু আমাদের অশেষ সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

বাংলার গরু ছোট-খাটো চেহারার, ইহারা এদেশের মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে যেন নিজেদের সঙ্গী করিয়া নিয়াছে। দলে দলে গরু-বাছুর যখন মাঠে চড়িয়া বেড়ায়, আমাদের সেই শ্যামলী ধবলীরা গোচারণভূমির শোভা বর্ধন করে।

বাংলার অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে মহিষ, ছাগল, কুকুর ও বিড়াল উল্লেখযোগ্য। মহিষও গরুর মতই তৃণভোজী, তবে গরুর মত তেমন শান্ত-প্রকৃতির নয় এবং গরুর চেয়ে আকারে বড়। মহিষও গরুর মত দুগ্ধ দান করিয়া, কৃষিকার্যে সহায়তা করিয়া এবং গাড়ী টানিয়া আমাদের অনেক উপকার করে। ছাগলের দুধও পুষ্টিকর এবং ছাগ-মাংস বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। কুকুর আমাদের অত্যন্ত উপকারী প্রাণী, গৃহে প্রহরীর কাজ করিয়া চোরের উৎপাত হইতে রক্ষা করে। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ কুকুরের ছয়টি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—বহুভোজী অথচ স্বল্পতুষ্ট, সুনিদ্র অথচ শীঘ্র চেতন, প্রভুভক্ত ও সাহসী। বিড়াল পোষা অনেকের শখ। বিড়াল উপকারীও বটে, আবার অপকারও যথেষ্ট করে।

অন্যান্য দেশের চেয়ে কম হইলেও বাংলাদেশেও ভেড়া, ঘোড়া, গাধা এবং শূকর দেখিতে পাওয়া যায়। ভেড়ার লোম দিয়া কম্বল তৈয়ারী হয়। মোটরগাড়ির যুগে ঘোড়ার ব্যবহার কমিয়া আসিলেও এখনও অনেক অঞ্চলে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন রহিয়াছে। গাধা প্রধানতঃ ধোবার মোট বহিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শূকর আমাদের মাংস যোগায় এবং শূকর পালন একটি লাভজনক ব্যবসায়।

বন্য-পশুর মধ্যে বাঘ, হরিণ, শূকর, শৃগাল, বানর, সাপ, নেউল, খরগোশ,

কাঠবিড়ালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে মহানদী ও গরুমারা গেম স্যাংকচুয়ারীতে এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ডুয়ার্সের জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে (ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংকচুয়ারী) ও নাগরাকাটা-রক্ষিত অরণ্যে ভ্রাম্যমাণ গণ্ডার, বাঘ, বন্য বরাহ, হাতী, চিতা, হরিণ, বাইসন, প্রভৃতি বন্য-পশু দেখিতে পাওয়া যায়। ডুয়ার্স ও তরাইর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশে হাতীতে চড়িয়া বা বন-বিভাগের বাংলোয় বসিয়া এইসব অরণ্যচারীদের স্বচ্ছন্দ বিহার পরিদর্শন বড়ই রোমাঞ্চকর। দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবনের বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও সুদর্শন হরিণ বিখ্যাত। অরণ্যময় সুন্দরবনের নদীনালায় মোটরলঞ্চে আরোহণ করিয়া বন্যজন্তু ও বনশোভা দর্শন রোমাঞ্চকর ও আনন্দদায়ক। বাংলার পশ্চিমের বনভূমিতে ভালুক, সজারু প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলার শোভা বর্ধন করিয়াছে বিচিত্র রঙের বিচিত্র গড়নের বিচিত্র সুরের বিচিত্র পাখীর দল। বিচিত্র পশুকুলের পাশাপাশি বিচিত্র স্বভাবের কত যে পাখি বাংলার গ্রাম, প্রান্তর ও বন-উপবনের সৌন্দর্য বাড়াইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাংলার গাছে গাছে নানা রঙের পাখীর সমাবেশ আমাদের চোখকে তৃপ্ত করে, তাহাদের কলরব আমাদের কান ও মনকে আনন্দ দান করে। প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই পাখীর গান শুরু হয়, অস্তায়মান গোধূলি-বেলায়ও সে গানের বিরতি নাই। তাই আমরা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখীর ডাকেই জাগি।

বাংলা দেশের পাখীর নাম করিয়া শেষ করা যায় না। কাক, কোকিল, ময়না, শালিক, কাঠঠোকরা, পাপিয়া, ফিঙ্গে, দোয়েল, শ্যামা, টিয়া, চন্দনা, চড়াই, বাবুই, বুলবুল, খঞ্জন, টুনটুনি, ঘুঘু, মাছরাঙা, কাকাতুয়া, বউ কথা কও, পায়রা, হাঁস, বক, পানকৌড়ি, ছাতার, পেঁচা, বাদুড়, চিল, শকুন প্রভৃতি আরও কত রকমের পাখী যে বাংলা দেশে আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কাহারও মধুর স্বর, কাহারও বিচিত্র রূপ আমাদের বিস্মিত করে। কোকিল, দোয়েল, শ্যামা, পাপিয়া, টিয়া, খঞ্জন প্রভৃতির সুমিষ্ট গান অমাদের কানে সুধা বর্ষণ করে। শালিক, চড়াই, টুনটুনি প্রভৃতির গতি-ভঙ্গিমা আমাদের মুগ্ধ করে। মাছরাঙা পাখী জলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছোঁ মারিয়া কেমন করিয়া মাছ তুলিয়া নেয়। বক কেমন এক পায়ে তপস্বীর মত দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে মাছ ধরিবার সাধনা করে, নীল আকাশে কালো মেঘের বুকে কেমন করিয়া ধবল বকের সারি উড়িয়া যায়। বাংলার গায়ক পাখীদের মধ্যে কোকিলের কুহুতান, পাপিয়ার পিউ পিউ, বউ কথা কও পাখীর মিষ্ট স্বরে আমাদের অভিভূত করে। ঘুঘুর একটানা করুণ সুর, চাতকের জল প্রত্যাশায় 'ফটিক জল' আমাদের মনকে বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। রাত্রিবেলা পেচার ডাকে শিশুদের আতঙ্ক জাগে।

জলের পাখীদের মধ্যে পাতিহাঁস, রাজহাঁস, আমরা দীঘি-পুকুরের জলে সাঁতার কাটিতে দেখিতে পাই। বক, পানকৌড়ি ও মাছরাঙাও দেখি। বড় বড় নদী ও সমুদ্র-উপকূলে বেলে হাঁস, কাদাখোঁচা, জলপিপি, গাঙচিল, গাঙশালিক প্রভৃতি দেখা যায়।

পাখীদের মধ্যে কাকের সঙ্গেই আমাদের প্রতিদিন দেখা হয়। তার পরেই চবুতরে কপোতের দলকে দেখি বিশ্রাম করিতে। আকাশে চিল উড়িয়া বেড়ায়। কাকের কর্কশ রবে আমরা বিরক্ত হই বটে, কিন্তু কাক, শকুন, চিল প্রভৃতি পাখি নোংরা জিনিস খাইয়া আমাদের কিছুটা উপকার করে।

পাখীদের বাসা-নির্মাণেও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাই। বাবুই, টুনটুনি প্রভৃতির বাসা-নির্মাণ সত্যই বিস্ময়কর। কোকিল বাসা নির্মাণ করে না। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধি আছে—কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে। জলপিপি ও সারসের বাসা জলের উপর ভাসিতে থাকে। গাঙ-শালিকেরা জলের ধারেই বাসা বাঁধে।

হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখীর মাংস মানুষের মুখরোচক ও বলকারক খাদ্য। হাঁস ও মুরগীর ডিম নিত্য-প্রয়োজনীয় ও পুষ্টিকর। এজন্য অর্থকরী ব্যবসায় হিসাবে হাঁস মুরগী পালনের উপর আজকাল লোকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে।

বাংলার সমতলের পাখির কথাই এতক্ষণ বলিয়াছি। পক্ষি-সম্পদে পার্বত্য দার্জিলিং জেলা অতি সমৃদ্ধ। এই জেলায় পাঁচ শতাধিক বিচিত্র পাখী দেখা যায়।

ঋতু বৈচিত্র্য যেমন বাংলাকে বিভিন্ন ঋতুতে নব নব ভূষণে সাজাইয়া অপূর্ব শ্রী দান করে, তেমনই বাংলার পশু পক্ষীও তাহাকে অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়া রাখে, তাহার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া রাখে।

আর একটি বিচিত্র পক্ষী-সংবাদ। প্রতি বৎসর শীতকালে ৭ হইতে ১০ হাজার মৌসুমী পাখী সাইবেরিয়া, কাস্পিয়ান সাগরের ওপার ও হিমালয় অঞ্চল হইতে কলিকাতার-চিড়িয়াখানার বাগানে ও লবণ হ্রদ অঞ্চলে আসে। এখানে ইহারা শীতকাল কাটাইয়া চলিয়া যায়।

বাংলার বর্ষা

বর্ষার পূর্বে—বর্ষার আবির্ভাব দিগ্বিজয়ী বেশে—নবজীবনের সাড়া, বর্ষা-মেঘের জন্ম-কথা—বর্ষার অর্থ নৈতিক কর্মধারা—সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বর্ষার অবদান—বর্ষার দুই রূপ—আনন্দ ও ধ্বংসের রূপ।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাহনে পৃথিবী দগ্ধ হতে থাকে, মানুষ প্রচণ্ড সূর্যের তীব্র দাহনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তখন মাঠে মাঠে ধরেছে ফাটল, নদ-নদী তড়াগ জলশূন্য, গাছপালা ক্লান্ত-ক্লিষ্ট, পাখীরা গান ভুলে স্তব্ধ। তৃষ্ণাকাতর মানুষ বার বার আকাশের দিকে আকুল কণ্ঠে বারিবর্ষণের কামনা জানায়।

এমনি কালে যদি হঠাৎ আকাশের বুকে মেঘের সমারোহ দেখা দেয়, তা হলে তৃষিত চিত্ত কি যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক টুকরো কালো মেঘ মানুষের বুকে অসীম ভরসা জাগিয়ে তোলে।

বাংলা দেশে বর্ষা আসে দিগ্‌বিজয়ী বীরের বেশে—তাহার রথের ঘর্ঘর-ধ্বনিতে আর ডম্বরু-নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত করে বিদ্যুতের অসি-লতায় দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ

করে, প্রবল বরুণবাণের ধারাবর্ষণে ধরণীকে সিক্ত ও প্লাবিত করে আবির্ভূত হয় নবযৌবনা বরষা। মুহূর্ত মধ্যে সারা দেশের প্রকৃতি অপূর্ব রূপলাবণ্যে ও চার দিক্ প্রাণ-স্পন্দনে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আকাশ সিক্ত, ধরণী সিক্ত, মানুষের মনও সিক্ত হয়ে ওঠে। শুষ্ক রুক্ষ তীব্র গ্রীষ্মের অগ্নিবাণের পরেই শ্যামল স্নিগ্ধ পুঞ্জীভূত কালো মেঘে ও অজস্র বর্ষণে বাংলাদেশের অঙ্গে আনে এক বিরাট পরিবর্তন, বর্ষার নবজলধারায় আমাদের মনও ময়ূরের মত আনন্দে নেচে ওঠে।

শুধু মানুষের অন্তরে নয়, বর্ষার আবির্ভাবে সমগ্র প্রাণীজগতেই নবজীবনের সাড়া পড়ে যায়। উদ্ভিদ্ ও জড়জগৎ এই নূতনের ছোঁয়ায় যেন নূতন করে প্রাণ পায়। গ্রীষ্মের দিনে যে সকল নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় শুকিয়ে গিয়েছিল, বর্ষার জলে তারা কানায় কানায় ভরে ওঠে। বৃক্ষলতা তৃণগুল্ম যারা গ্রীষ্মে মৃতপ্রায় হয়েছিল, নববর্ষার জলধারায় তারা আবার সজীব হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মে রুক্ষ বিদীর্ণ মাঠে বর্ষার স্পর্শে আবার নূতন কচি ঘাসের সমারোহ দেখা দেয়। যে সকল বীজ আগে শুক্‌নো মাটিতে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পায়নি, বৃষ্টির জল পেয়ে তারা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। বর্ষার জলধারা প্রকৃতির বুকে সবুজের মেলা সাজিয়ে দেয়। ফলে শস্যে পত্রে পুষ্পে বঙ্গজননী অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। এ সময় কেয়া, যূঁই, কামিনী, কুমুদ, কমল, কদম্ব পুষ্প বঙ্গের অঙ্গাভরণ। বর্ষায় কলা, শশা, পেয়ারা, আনারস, তাল প্রভৃতি নানা রকম ফল আমাদের তৃপ্তি দেয়। সুস্বাদু ইলিশ মাছ বর্ষারই দান।

মাছেরা নূতন জলধারায় প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। ভেকেরা আনন্দে গলা ছেড়ে ডাকতে শুরু করে। বক, সারস হাঁস, প্রভৃতি পাখীরা জলাশয়ে ভিড় করে।

তাপদগ্ধ আকাশে হঠাৎ মেঘ আসে কোথা থেকে, মেঘের দল কোথা থেকে বৃষ্টিধারা নিয়ে আসে? বিজ্ঞান বলে, গ্রীষ্মে ভারত মহাসাগরের জলরাশি রৌদ্র-তাপে উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পের আকারে ওপরের দিকে ঠেলে উঠতে থাকে। এই জলীয় বাষ্পরাশি মৌসুমী বায়ুতে ভেসে পূর্ব-ভারতের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই বাষ্পরাশি ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। বাষ্পরাশির মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট জলকণা থাকে, এই অসংখ্য জলকণা মেঘের মধ্যে জমাট বেঁধে সঞ্চিত হয়ে থাকে। বর্ষাকালে এই জলকণাই বৃষ্টির আকারে বাংলা দেশের বুকের উপর ঝরে পড়ে।

বাংলা দেশে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বিকেলের দিকে আকাশে কালবৈশাখী দেখা দেয়, সে মেঘে সামান্য বৃষ্টি হয়, প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি করে, মেঘ আবার উড়ে চলে যায়। বর্ষা আরম্ভ হবার আগে মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হয় এবং তাতে ফসলের এবং সদ্য-মুকুলিত আমের খুব ক্ষতি হয়।

প্রকৃত পক্ষে আষাঢ় মাস থেকে বর্ষার শুরু। বাংলাদেশে আষাঢ় ও শ্রাবণ—এই দু'টি মাসকে কেন্দ্র করেই বর্ষাকাল। কিন্তু প্রায়ই বর্ষা ভাদ্র মাস পর্যন্ত বর্ষণ করে চলে। বর্ষার জলধারায় **শস্যক্ষেত্রগুলি** আর্দ্র হয়, কৃষকগণ আনন্দে সারা বছরের অন্নের সংস্থানের জন্য মাঠের কাজে ব্যস্ত হন এবং স্নানাহার ভুলে ফসল ফলাবার

আনন্দে তন্ময় হয়ে থাকেন। বর্ষার শুরুতেই আমাদের দেশে বোরো ধান, আউস ধান ও পাটের চাষ শুরু হয়, আর বর্ষার মাঝামাঝি আমন ধানের বীজ বোনা হয়।

বর্ষায় নদী, খাল, বিল জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বলে জল-পথে নৌকোয় যাতায়াতের খুব সুবিধা হয়। পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা জলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। গ্রামবাসীরা এই সময় বেচা-কেনার ব্যাপারে দূরাঞ্চলের হাটে-বাজারে-গঞ্জে নৌকো করে যায়।

আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে বর্ষা সত্যই দেবতার আশীর্বাদ। এই ঋতুই আমাদের অন্ন-সমস্যা সমাধানের ঋতু। উপযুক্ত সময়ে বর্ষা শুরু হলে আমাদের অন্ন-চিন্তা থাকে না। তাই বর্ষা 'ভুবন ভরসা'।

কলকাতায় বেশী বর্ষণে অনেক রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়, ট্রাম বাস প্রভৃতি যান-বাহনও বন্ধ হয়ে যায়। তখন অফিসগামী লোকদের ও স্কুল-কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার সৃষ্টি করে। বস্তি এলাকা জলমগ্ন হয়ে লোকের দুর্গতি ভোগ করতে হয়।

বর্ষা আমাদের সকলেরই প্রিয় ঋতু—কিন্তু সব চেয়ে প্রিয় কৃষকের আর কবির। কৃষক বর্ষায় উৎফুল্ল হয় তার সারা বছরের অন্ন-সংস্থানের সুযোগের আশায়, কবির হৃদয়ে বর্ষা জাগায় কল্পনার মায়াজাল, রচিত হয় কাজরী, ভাটিয়ালী, বর্ষামঙ্গল। মহাকবি কালিদাস 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' মেঘদূতের যে সূচনা করেছিলেন, আমাদের রবীন্দ্রনাথ সেই ধারারই বাহক হ'য়ে শত শত বর্ষার গান ও কবিতা দিয়ে বাঙালীর বর্ষামঙ্গল কাব্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। বর্ষা আমাদের হৃদয়ের, কালের ও কাব্যের সিংহাসন জুড়ে আছে।

উৎসব-মুখর বাঙালী-জীবনে বর্ষার অবদানও কম নয়। তাহার কাব্যিক-জীবনে যেমন, সাংস্কৃতিক জীবনেও বর্ষা বাঙালীকে নব নব রসে সিঞ্চিত করে। ধরিত্রী বর্ষার আগমনে যেমন শস্যের সম্ভাবনায় অপূর্ব সৌন্দর্যে শোভিত হয়, আমাদের মনের প্রাঙ্গণও রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, মনসার ভাসান প্রভৃতি উৎসবে এবং বর্ষামঙ্গলের গান ও অভিনয়ে আনন্দমুখর হয়ে উঠে।

আর বর্ষার দুই রূপ—আনন্দের রূপ, ধ্বংসের রূপ। অনাবৃষ্টিতেও যেমন শস্যের ক্ষতি, অতিবর্ষণেও তেমনি ক্ষতি। অতিবৃষ্টিতে পল্লীগ্রামের পথঘাট কর্দমাক্ত হয়, মেটে ঘরগুলো ধ্বসে পড়ে, জলে-ঝড়ে লোকের কষ্টের একশেষ। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ আসে যখন বর্ষার প্রলয়ঙ্করী বন্যায় গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ধ্বংস করে সোনার ফসল, নাশ করে মানুষের জীবন ও তার নিত্যসঙ্গী গরু মোষ। তখন মানুষ বিত্তহারা বাস্তহারা সর্বহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু বন্যাবিধ্বস্ত মানুষ আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, গড়ে ঘর, চষে জমি, স্বপ্ন দেখে সোনার ফসলের, সোনালী সূর্যের আলোর। ভয়ঙ্কর বন্যাকেও সে মাথা পেতে নেয়, বর্ষা যে তার বরাভয়দায়িনী—তার অন্নদাত্রী ও আনন্দদাত্রী।

আমার প্রিয় ঋতু শরৎ

সূচনা—বর্ষাবিদায়—শারদশ্রী—শস্যপূর্ণা—ছুটির ঋতু—শারদ সাহিত্য।

শরৎ আমার বড় প্রিয়, বড় মধুর। বর্ষায়-ভারাক্রান্ত মনটা শরতের হালকা হাওয়া, নীল আকাশ আর সোনালী রোদে এক মুহূর্তে যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ছুটে যেতে চায় দূর দূরান্তে। আনন্দে ভেসে যেতে চায় নিরুদ্দেশের অভিমুখে। উৎসবে অবসরে পরম উপভোগ্য।

ভাদ্রমাস, শ্রাবণের ধারা কমে এসেছে। মাঝে মাঝে ঝুপ্ঝুপ্ করে এক পশলা বৃষ্টি হয়, কিছুক্ষণ পরেই থেমে যায়। কখনও ঝির্ ঝির্ বৃষ্টি হতে থাকে, আবার পরক্ষণেই সুন্দর রোদের হাসিতে চারদিক্ ঝলমল করতে থাকে। আকাশ জুড়ে কালো মেঘের আড়ম্বর শেষ হয়ে গেছে। দলে দলে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। আকাশ নীল হয়ে উঠে। মাঝে মাঝে চলে ঝির্ঝির্ হালকা বারিপাত। মেঘের ডাকও শোনা যায়। বর্ষা বিদায় নেয়, আর শুরু হয় শরতের আগমনী।

শরতের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি বিস্ময়ের ও আনন্দের। কবি লিখেছেন, 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী।' চার দিকে সবুজের সমারোহ, মাঠগুলি সবুজ শস্যে শ্যামল। প্রাণের প্রাচুর্যে আর সোনালী রোদে ঝলমল করছে। দেখে দেখে চোখ ফেরানো যায় না। মাথার উপর নীল আকাশে ছোট ছোট টুকরো টুকরো সাদা মেঘের আনাগোনা, পায়ের তলে শিউলি-ঝরা শিশির-ধোয়া শ্যামল পৃথিবী। খাল-বিল, নদী-নালা, দীঘি-ডোবা, জলে কানায় কানায় ভরা। পদ্ম, শাপলা প্রভৃতি জলজ ফুল ফুটে জলাশয়গুলোকে শোভাময় করে তুলেছে। নদীর পাড়ে শুভ্র কাশফুলের গুচ্ছ হালকা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। বাড়ির আঙিনায় শিউলি ফুল ফুটে মিষ্টি সুবাসে চারদিক আমোদিত করছে। নদীতে মাঝিরা সাদা পাল তুলে গান গেয়ে তরতর্ করে নৌকা বেয়ে চলেছে। মানুষের প্রাণেও এ আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে।

শরতে ধরণী শস্যপূর্ণা। ধানের ক্ষেতগুলো এ সময় ফলসম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। যেমন নয়ন-লোভন সবুজ শোভা, তেমনি ধনধান্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় প্রাণবন্ত। ধানই এ দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বুনিয়াদ, চাষীর পরম নির্ভর। দু-এক মাস পরেই তো ঘরে ঘরে ধান্য-লক্ষ্মীর আগমন ঘটবে। তাই চাষীর প্রাণও আনন্দ-উচ্ছল। তবে শ্রমের সার্থকতা, প্রাণের পরিতৃপ্তি।

শরৎ আমাদের উৎসবের ঋতু। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া পূজা আশ্বিনে অনুষ্ঠিত হয়। জগজ্জননী দুর্গাদেবী যেন বঙ্গজননী-রূপেই মহাসমারোহে বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন। শরতে প্রকৃতি নিজেই যেন মায়ের আগমনীর জন্যে সাজ-গোজ করে তৈরি হয়। বনে বাগানে মাঠে ঘাটে আকাশে বাতাসে সৌন্দর্য, আনন্দ ও উচ্ছলতা ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকেই নূতনের শিহরণ, প্রাণের চাঞ্চল্য,—

মানুষের মনও উদ্বেল হয়ে উঠে। আনন্দময়ীকে বাংলার মায়েরা কন্যারূপে বরণ করে নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। শারদীয়া পূজার সঙ্গে সঙ্গেই উৎসবময় শরতের শুরু হয়—লক্ষ্মীপূজা, দেওয়ালী ও কালীপূজা, ভাইফোঁটা একটির পর একটি অনুষ্ঠিত হয়। এদেশের মানুষেরা শরতে এমনি করেই মেতে থাকে।

এ সময় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও আপিস-আদালতে পূজার লম্বা ছুটি থাকে। মানুষের মনও তাই উড়ু-উড়ু ছুটি ও অবসর যাপনের জন্য উন্মুখ হয়। এজন্য অনেকেই ভ্রমণে বের হন।

এ সময় শহরে সার্বজনীন দুর্গা-পূজার সাড়া পড়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা দল বেঁধে পূজার আয়োজন করে। বহুবিচিত্র দেবীমূর্তি, অপূর্ব মণ্ডপ-শোভা ও আলোক-সজ্জা, বিচিত্রানুষ্ঠান, বিসর্জনের সমারোহ—সব কিছুতে পূজার দিনগুলো খুব হৈ চৈ করে কেটে যায়। পূজোয় কলকাতা নগরী আবেগে আনন্দে ঐশ্বর্যে মেতে উঠে। পূজোয় কলকাতা দেখলে মনে হয় যেন সারা বাঙালী জাতিটাই একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। দুর্গাপূজা আমাদের জাতীয় উৎসব বলেই শরৎকালের এত মর্যাদা।

পূজোর সময়টা ব্যবসায়ীদেরও অর্থাগমের সময়, বিশেষতঃ কাপড়-জামা ও জুতা-ব্যবসায়ীদের এটিই সারা বছরের ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় সুযোগ। ভারতের অন্যান্য রাজ্য এ সময় বাংলা হতে প্রচুর অর্থাগম করে থাকে। এদিক দিয়ে শরৎকালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশী।

শরৎকাল সাহিত্য প্রকাশেরও একটি স্মরণীয় ঋতু। শারদীয় সাহিত্য অজস্র পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে বিপুল-আয়তন। এ-ছাড়া ছেলেমেয়েদের ছড়াছবি ও গল্পের বই, বড়দের উপন্যাস ও অন্যান্য বহু রকম বই পুজোর প্রাক্কালে বের হয়। ঋতুর দিক দিয়ে এত বই অন্য কোন সময় প্রকাশিত হয় না, এক শীতকালের পাঠ্য বই ছাড়া। সাহিত্যের ভাণ্ডারে শরৎকালের দান সবচেয়ে বেশী বলা যায়।

সর্বোপরি শরৎ ঋতু কবিদের অন্যতম প্রিয় ঋতু। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান অপূর্ব রস-মাধুর্যে মণ্ডিত করে শরৎ ঋতুকে বাঙালীর হৃদয়ে চিরকালের মতো প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। তাঁর 'শারদোৎসব' নাটকটি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ্।

বাংলার ঋতুরঙ্গ ও শীত ঋতু

ঋতুরঙ্গশালার বৈচিত্র্য—শীত আনে কর্মশক্তি, প্রাচুর্য, আনন্দ, স্বাস্থ্য—শীতের দান—শস্য সব্জি ফলমূল—বিবিধ খাদ্যের বিপুল আয়োজন—অপূর্ব পুষ্পশোভা—উৎসবময় শীত ঋতু—শীতের নিষ্ক্রমণ, বসন্তের সূচনা।

বিচিত্র আমাদের এই মাতৃভূমি—বিচিত্র তার প্রকৃতির রূপ। এখানে বিধাতার ঋতুরঙ্গশালায় নিত্য চলছে প্রকৃতির বিচিত্র অভিনয়। 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' বসুন্ধরার সেরা দেশ এইবঙ্গ ভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও সৌন্দর্যের তুলনা নেই।

এক-একটি ঋতুর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার রূপমঞ্চের পট-পরিবর্তন আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ করে। বিভিন্ন ঋতুর এমন বৈচিত্র্য অন্য দেশে বিরল। বাঙালীর মনের উপর সেই ঋতু-বৈচিত্র্যের প্রভাবও কম নয়। বিভিন্ন ঋতু যে ঐশ্বর্য-সম্পদ, যে রূপ বৈভব নিয়ে আসে, এ দেশের মানুষের উপর তার প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলার মধুর ও সুন্দর প্রকৃতি বাঙালীকে ভাবুক করেছে, সাধক করে তুলেছে। রসসমৃদ্ধ বাংলা-সাহিত্য বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা-ভূমিতেই রূপ লাভ করেছে।

বাংলার ঋতু-রঙ্গশালার পট-পরিবর্তন অপূর্ব বৈচিত্র্যময়। গ্রীষ্ম বাংলার বুকে রুদ্রমূর্তি ধরে, দিক দিগন্তে তার তপ্ত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দেয়। বাংলা মায়ের রূপও যেন তখন শুষ্ক রুক্ষ। এই গ্রীষ্মে তিনি তাপদগ্ধা ক্লান্ত-ক্লিষ্টা তপস্বিনীর রূপ ধারণ করেন। এর পরই আবার বর্ষার কালো কাজল মেঘ চার দিকে তার ঘন কালো ছায়ার মায়া বিস্তার করে দেয়। তাপদগ্ধ মাটির তৃষ্ণা দূর করে দেয় বর্ষা, চার দিকে জাগে প্রাণের জোয়ার। শরতের সুনীল আকাশে ছোট ছোট সাদা মেঘের টুকরো, আর নীচে শেফালী-ঝরা শিশির-ধোয়া শ্যামল পৃথিবী, শুভ্র কাশফুলের গুচ্ছ বাংলার যে শুচিশুভ্র রূপটি প্রকাশ করে, তা আমাদের নয়ন ও মন দুই-ই আকর্ষণ করে কোন সুদূরের পানে নিয়ে যায়। প্রাত্যহিক কর্মচাঞ্চল্য হতে অবসরের ও উৎসবের আনন্দলোকে মন ছুটে চলে। শারদ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব-ঋতু আমাদের উৎসবের ঋতু। এই সময়ে জগজ্জননী দশভূজার পূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা ও দীপাবলী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি উৎসব সারা শরৎকাল জুড়ে চলে। শরতের নাতিশীতোষ্ণ আরামপ্রদ আবহাওয়ায় শহরের লোক দলে দলে বেরিয়ে পড়ে দূর দূরান্তরে।

তারপর আসে হেমন্তের স্নিগ্ধ প্রশান্তি। কুয়াসার আবরণে সে প্রকৃতিকে ঢেকে রাখে। এই হেমন্তই ধরার আঁচল সোনার ধানে ভরে দেয়। এই সময়ে নবান্নের তৃপ্তিতে মানুষের মন পরিপূর্ণ থাকে।

শীত আসে দুর্দান্ত কর্মশক্তি নিয়ে, সারা বছরের পরিপূর্ণ খাদ্য-ভাণ্ডার নিয়ে, বিচিত্র পুষ্পশোভিত বেশভূষা নিয়ে, স্বাস্থ্যের আনন্দ ও প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে। শীতের দেশের শীতঋতুর মত বাংলার শীত রিক্ত নিষ্প্রাণ নিরাভরণ নয়। বাংলার শীতে আমাদের কর্মশক্তি বর্ধিত করে, বাংলার চাষীরা সবল হস্তে শস্য তোলে, শ্রমিকেরা কল-কারখানায় বলিষ্ঠ হস্তে পণ্য উৎপাদন দ্বিগুণিত করে। শীত, আমাদের পরম সুখের ও উপভোগের আরাম ও আনন্দের।

সাধারণতঃ পৌষ ও মাঘ এই দু'মাস শীত ঋতু। এই সময়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্য হতে দূরে থাকে বলে সূর্যের তাপ আমাদের দেশে কম। আমাদের দিন ছোট, রাত্রি বড়। সকাল বেলা অনেক সময় কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে, শিশিরে তৃণগুল্ম সব ভিজে থাকে। এ সময় পাকা আমন ধান কাটা হয়, মাঠে রবিশস্যও থাকে, কৃষকগণ মহানন্দে শস্যকর্তনে মাঠে কর্মব্যস্ত থাকেন।

"এলো যে 'শীতের বেলা' বরষ পরে। এবার ফসল কাটো লও গো ঘরে।"

অতিরিক্ত শীতে বৃদ্ধ ও দরিদ্রের কষ্ট হয়, পশুপাখিও বেশি শীতে মুষড়ে পড়ে। প্রকৃতির অঙ্গেও শীতের কাঁপুনি লাগে, অনেক বৃক্ষ পত্রহীন হয়, শস্যহীন শুষ্ক মাঠে শূন্যতা বিরাজ করে। কিন্তু শীত রিক্ত সন্ন্যাসী নয়। শীত ত্যাগী, শীত দাতা—সে তো তোমার আমার জন্য ত্যাগ করেই। আমাদের খাদ্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করে সে তার শস্য-ক্ষেত্র রিক্ত করে দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তার সব্‌জী ও ফলের বাগান আর পুষ্পোদ্যানের প্রাচুর্যে ও শোভায় আমাদের দেহ মন ভরিয়ে তোলে। শীতের মাছ-মাংসের প্রাচুর্যের সঙ্গে যাবতীয় উৎকৃষ্ট শাক-সব্‌জী ও তরকারি বাজার ভর্তি করে দেয়। ধনী-দরিদ্র সকলেই এই সময় পেট পুরে খেয়ে তৃপ্তি পান। পৌষ-পার্বনের পিঠে ও নলেন গুড়ের মিষ্টি গন্ধে, শহরের বিপণিতে বিচিত্র কেক বিস্কুটের মনো লোভা ঘ্রাণে আমাদের রসনা সজল হয়ে ওঠে। ভোজনবিলাসী বাঙালীর নিকটে শীতের দিনগুলি বড়ই লোভনীয়।

ফুলের অপরূপ শোভা যদি দেখতে চাও তবে শীতের বাগিচায় এসো। কমলা, হল্‌দে ও ঘোর রক্তবর্ণ গাঁদা, রক্ত বর্ণাঢ্য গোলাপ, নানা রং-এর বহুবিচিত্র চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া ও অন্যান্য মৌসুমী ফুল আর শ্বেতশুভ্র কুন্দের ঝাড় বাগান আলো করে রাখে। এ সময় আলিপুরের বিখ্যাত হর্টিকালচারাল বাগানে বিচিত্র ফুলের বাৎসরিক প্রদর্শনী হয়।

শীত আনন্দের ঋতু, উৎসবের ঋতু। শীতের সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় উৎসব ছাত্র-ছাত্রীদের সরস্বতী পুজো, সমগ্র ছাত্র-সমাজের উৎসাহ ও আনন্দে সারা সমাজ-দেহ পুলকিত হয়ে ওঠে। এ সময় খ্রীস্টমাস বা বড়দিনের উৎসবও শহরের জীবনের এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান। এই সময় সঙ্গীতের মজলিস, অভিনয়ের আয়োজন, সাহিত্য-শিল্প প্রদর্শনী ও সম্মেলন, সার্কাস, ক্রিকেট, টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলা ইত্যাদির অনুষ্ঠান সারা শীত জুড়ে মানুষকে আনন্দ দান করে। শীত ঋতু ভ্রমণের উৎকৃষ্ট ঋতু, দলে দলে ছেলেমেয়ে নারী-পুরুষ গরম জামা-কাপড় ও বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে নানাদিকে বেড়িয়ে পড়ে।

শীতের শেষে আসে নবরূপ নিয়ে নূতন প্রাণ নিয়ে প্রিয় ঋতু বসন্ত। বসন্তের সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে ওঠে শীত-সমাহিত-প্রকৃতি। শীত সার্থকতা লাভ করে বসন্তে। দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করে, নব পত্রোদ্গমে গাছপালা সবুজ শোভায় ভরে ওঠে, বাগানে বাগানে আবার সুগন্ধি ফুল ও মৌসুমী ফুল সৌন্দর্যের বাগিচা বিছিয়ে দেয়, পাপিয়া গান গেয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে, মানুষের প্রাণেও বসন্তের ছোঁয়া লেগে পুলক জাগিয়ে তোলে—'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'।

গ্রন্থের সাহচর্য

প্রস্তাবনা—লেখা ও লিপি—গ্রন্থ ও মুদ্রাযন্ত্র—গ্রন্থ ও মানব-সভ্যতা গ্রন্থপাঠে•কাব্য-সুধা ও সজ্জন-সঙ্গ—গ্রন্থ কালের ও দেশের ব্যবধান ঘুচায়—গ্রন্থ দ্বারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংযোগ—গ্রন্থহীন গৃহ আত্মাহীন দেহতুল্য—গ্রন্থ প্রিয় বন্ধু—গ্রন্থপাঠে মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি—অজ্ঞতা দূরীকরণ ও উন্নত চরিত্র গঠন—গ্রন্থ সর্বাবস্থায় মানুষের মরমী সহচর।

মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান-পিপাসাও ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে। এই জ্ঞান-পিপাসায় পরিতৃপ্তি একমাত্র গ্রন্থের মাধ্যমেই সম্ভব। বিপুল ঐশ্বর্য-সম্পদ্ নয়, ছায়াশীতল এক নিভৃত কোণে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ জ্ঞান ও আনন্দ-পিপাসু মানব-মনের একমাত্র কামনা। এক জন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিকের যখন দ্বাদশ বর্ষের কারাবাস হইয়াছিল, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি এই বার বছর কিভাবে কাটাবে?' পিতা বলিলেন, 'সমুদ্র দেখিয়া।' পুত্রকে সেই প্রশ্ন করিলে পুত্র উত্তর দিলেন, 'আমি সেক্সপীয়ার পড়িয়া কাটাইব।' বস্তুতঃ, সমুদ্র যেমন বিশাল, অকূল ও অতল, সদ্‌গ্রন্থও তেমনি গভীর ও বিস্ময়কর।

সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে জাগিল জ্ঞানের পিপাসা, শুরু হইল জ্ঞানের চর্চা। তাহার জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তু লিপিমালায় ধরা দিল। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ছাপার অক্ষরে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ভরা মানব-জীবনের বিচিত্র অনুভূতি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমরা গ্রন্থের সাহচর্য লাভ করিলাম।

বর্তমান যুগে গ্রন্থকে বাদ দিয়া মানুষের সভ্যতার কথা ভাবা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচুর ঐশ্বর্য সম্পদ্ লইয়া আজ পৃথিবীতে কত গ্রন্থ যে রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। গ্রন্থের কালো কালো অক্ষরের আড়ালে লুকাইয়া রহিয়াছে কত না মানুষের চিন্তালব্ধ ভাব-সম্পদ্, কত না হাসি-কান্নার বিচিত্র ইতিহাস। যাঁহারা তাঁহাদের মনের ব্যাকুল ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সাক্ষাৎ আর কখনও আমরা পাইব না বটে, কিন্তু তাঁহাদের কথা নিত্যকালের জন্য ঐ গ্রন্থে ধরা রহিয়াছে। যুগের পর যুগ চলিয়া যাইবে, মানুষের পর মানুষও চলিয়া যাইবে, কিন্তু সুদূর অতীতের হৃৎস্পন্দন শুনিতে হইলে এই গ্রন্থের বুকে কান পাতিয়া শুনিতে হয়। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়াই নীরব অতীত বর্তমানের কানে তাহার মনের কথা খুলিয়া বলে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেন, সংসারে আমাদের যে নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই দুঃখের মধ্যে দুইটি জিনিস আমাদের বহুল পরিমাণে সান্ত্বনা দিতে পারে, উহাদের একটি কাব্য-সুধার আস্বাদন, অপরটি সজ্জন সংসর্গ। গ্রন্থ-পাঠের দ্বারা এই দুইটি সুফলই আমরা লাভ করিতে পারি। এক দিকে আমরা যেমন

বাল্মীকি, বেদব্যাস, হোমার, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভার্জিল, দান্তে, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রস আস্বাদন করিতে পারি, তেমনিই অপর দিকে অতীত-বর্তমান, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মহাজীবনের সঙ্গ গ্রন্থের মাধ্যমেই লাভ করিতে পারি। কালের দুস্তর ব্যবধান তখন আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া পড়ে। তখন মনে হয়, বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের যে উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার সেই শিষ্যদের মধ্যে আমিও আছি, সক্রেটিস ও প্লেটোর শ্রোতাদের সঙ্গে আমার কোন দূরত্ব নাই।

গ্রন্থের মাধ্যমে হাফিজ, পেত্রার্ক, গ্যেটে, তুলসীদাস, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঘরের লোক, আমাদের আত্মার আত্মীয়। গ্রন্থ না থাকিলে ইহাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিত না।

গ্রন্থ না থাকিলে অমাদের বর্বর যুগেই বাস করিতে হইত। এক দেশের মানুষ গ্রন্থের ভিতর দিয়া অন্য দেশের আচার-ব্যবহার, সংস্কার, রীতি-নীতি, সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে। অন্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজের জাতীয় সংস্কৃতির শুভ সংযোগ সাধনে গ্রন্থ আমাদের প্রভূত সাহায্য করে।

গ্রন্থ একাধারে আমাদের বন্ধু ও গুরু। জীবনের দুঃখের দিনে এই গ্রন্থ হইতে সাহচর্য লাভ করিতে পারি। জীবনের নানা প্রশ্নের উত্তর গ্রন্থ পাঠেই অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়; গ্রন্থের সঙ্গে বন্ধুত্বের মধ্যে জাতিভেদের কোনো সঙ্কীর্ণতা নাই, ছোট-বড়র কোনো ভেদাভেদ নাই। ধনীর প্রাসাদ ও দরিদ্রের কুটীরে তাহার গতি অবাধ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা গ্রন্থকে অন্যান্য সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কার্লাইলের মতে গ্রন্থসম্ভারই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় (The true university of our days is a collection of books)। গ্রন্থহীন গৃহ আর আত্মাহীন দেহে কোন পার্থক্য নাই।

গ্রন্থ আমাদের অতি প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুও বন্ধুকে প্রতারণা করিতে পারে, কিন্তু গ্রন্থ কখনও মানুষকে প্রতারণা করে না। ইহাকে ভুল বুঝিবারও কোনও অবকাশ নাই। সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে ইহার রূপের কোনও পরিবর্তন হয় না। দিনের পর দিন সেই চিরকালের সুখ-দুঃখ, শৌর্য-বীর্যের কাহিনী, মানুষ, বিশ্ব-প্রকৃতি ও অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কথা আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে প্রয়াস পায়। কি করিয়া সুস্থ জীবন যাপন করিতে হয়, কেন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, মনের ভ্রান্তি ও কুসংস্কার পরিহার করিয়া কি ভাবে সঠিক পথে চলিতে হয়, তাহার শিক্ষা আমরা গ্রন্থ হইতে পাই। ভালো-মন্দ-মাঝারি সকল মানুষের সঙ্গেই সে আমাদের পরিচিত করিয়া দেয়।

মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনের জন্য গ্রন্থের সাহচর্য অনস্বীকার্য বটে, তবে গ্রন্থ পাঠ দ্বারা উপকৃত হইতে হইলে যে কোন গ্রন্থের সাহচর্য যথেষ্ট নয়, উপযুক্ত গ্রন্থ নির্বাচন ও পঠন সব চেয়ে বড় কথা। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে মানুষ যে বিমল আনন্দ লাভ করে, অন্য গ্রন্থ পাঠে তাহা কখনও সম্ভব নয়। পাঠ করিবার উদ্দেশ্য

অনুসারে একই গ্রন্থ বিভিন্ন ফল দান করিতে পারে। আবার অশ্লীল গ্রন্থ মানুষকে অধোগতির পথে চালিত করে।

জাতির অজ্ঞতা দূরীকরণ এবং উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য গ্রন্থের উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী। একমাত্র সদ্‌গ্রন্থের সাহচর্য লাভের দ্বারাই জাতীয় চরিত্রে ও রুচি-বোধের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে।

সম্পদে বা বিপদে, আনন্দে বা দুঃখে, নিঃসঙ্গ একাকিত্বে বা বহুজন-সমাবেশে, যৌবনে বা বার্ধক্যে গ্রন্থ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। গ্রন্থ তাহাকে সম্পদে আনন্দ দেয়, বিপদে সাহস জোগায় ও শোকে সান্ত্বনা দেয়, জীবন-সংগ্রামে প্রেরণা দেয়, বৈষয়িক উন্নতির সহায়তা দান করে, সর্বোপরি মানব-জীবনকে সার্থকতা দানের উদ্দীপনা দেয়। শৈশবে ও যৌবনে গ্রন্থ মানুষকে বৃত্তি ও বিদ্যা দান করে, পরিণত বয়সে জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত করে, বার্ধক্যে জীবনের পরম লক্ষ্যের পথে চালিত করে। গ্রন্থের মত মানুষের সারা জীবনের এমন মরমী সহচর দ্বিতীয়টি আর নাই।

ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা সমস্যা

সূচনা—পূর্বকালে ভাষা-সমস্যা—বহু-ভাষা-ভাষীর দেশ—আঞ্চলিক ভাষা—রাষ্ট্র-ভাষা সমস্যা—ভাষার ঐক্য জাতীয় ঐক্য ও এক-রাষ্ট্রিকতার পক্ষে অপরিহার্য নয়—বাংলা ভাষা—দক্ষিণের ভাষাসমূহ—ইংরেজী ভাষা—হিন্দী ভাষা—বহুভাষী রাষ্ট্র—একাধিক রাষ্ট্রভাষা বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের দেশ। ষাট কোটির অধিক লোক ভারতবর্ষে বসবাস করে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর লোক সংখ্যার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ইহার আয়তনের বিশালতা, অধিবাসীর সংখ্যা-বাহুল্য এবং জাতিগত বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ রাখিলে বুঝা যাইবে যে, এখানে বিভিন্ন ভাষার সমাবেশ অস্বাভাবিক নয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে ভাষা-সমস্যা তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। প্রাচীন কালে নানা ভাষা থাকিলেও সমস্যা এত তীব্র ছিল না। সেকালে আঞ্চলিক ভাষাগুলি এত উন্নত ছিল না, শিক্ষার বিস্তার ছিল না, ভাষা সম্বন্ধে লোকের মমত্ত্ব এমন প্রখর ছিল না। প্রাচীন কালে প্রথমে প্রাকৃতে ও পরে সংস্কৃতে এবং মধ্যযুগে ফারসীর সাহায্যে রাষ্ট্র-পরিচালনা করা হইত এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ও শিক্ষিতদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হইত।

ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা শতাধিক, উপভাষার সংখ্যা আরও বেশি। তবে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত প্রধান ভাষা ১৬টি। প্রাচীন কালে উত্তর-ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় এবং দক্ষিণে দ্রাবিড় ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃত ছিল সর্বজনীন ভাষা। তাই ভাষাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন আশঙ্কা ছিল না।

পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের এক-একটি অঞ্চলে স্বতন্ত্র ভাষা গড়িয়া উঠে এবং উহা দ্বারা বিশিষ্ট সাহিত্য রচিত হইতে থাকে। এক-একটি অঞ্চলের ভাষাই অঞ্চলগুলির বা বর্তমানের রাজ্যগুলির শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

ভারতবর্ষের ভাষা-সমস্যার মূল এইখানেই। নিজ নিজ রাজ্যের ভাষাগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে প্রত্যেক রাজ্যের লোকেরা অতি সচেতন।

এক-জাতিত্বের পক্ষে এক-ভাষিতা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু উহা একজাতি-গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। অবশ্য এক রাষ্ট্রভাষা বহুভাষী দেশকে এক-রাষ্ট্রিকতার ও এক জাতিত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিতে সাহায্য করে।

আমাদের প্রধান সমস্যা হইতেছে, আমরা কোন একটি ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দিতে পারি কিনা এবং দিতে পারিলে কোন্‌টি? অথবা তাহা সম্ভব না হইলে কি ভাবে এই সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর? ভারতের শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত যোলটি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে হিন্দী, উর্দু, বাংলা, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া, অসমীয়া প্রধান। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে একাধিক রাষ্ট্র ভাষা আছে। কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী দুইটিই রাষ্ট্র-ভাষা। সুইজারল্যাণ্ডে তিন্‌টি পৃথক্ রাষ্ট্র-ভাষা থাকা-সত্ত্বেও সুইস্‌গণ এক জাতি। গ্রেটব্রিটেনে ইংরেজী, ওয়েল্‌শ্ ও গেলিক ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। বেলজিয়ামে ফরাসী ও ফ্লেমিশ দুইটিই রাষ্ট্র-ভাষা। যুগোস্লাভিয়ায় সার্ব, স্লোভেন ও ম্যাসিডোনীয়— তিনটিই সমান মর্যাদার রাষ্ট্র-ভাষা। আবার জার্মানী অষ্ট্রিয়ায় একই জার্মান ভাষা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও উহারা পৃথক্ রাষ্ট্র। আমেরিকা ও কানাডা উভয়ত্র ইংরেজী ভাষা প্রচলিত থাকিলেও উহারা পৃথক্ রাষ্ট্র। ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, মিশর, লিবিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো প্রভৃতি অনেকগুলি দেশের অধিবাসীরা সকলেই জাতিতে আরব, সকলেরই ভাষা আরবী। কিন্তু তথাপি তাহারা এক-জাতিত্বের বা এক রাষ্ট্রিকতার সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বাংলা হইলেও উহারা পৃথক্ রাষ্ট্রান্তর্গত। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ভাষা এক হিন্দী ভাষা হইলেও উহারা কখনও এক রাজ্যে পরিণত হয় নাই কেন? উর্দু ভাষা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত একটি শক্তিশালী ভাষা। উর্দু সাহিত্যও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ ভাষা। অথচ উর্দু-ভাষীদের কোনো স্বতন্ত্র রাজ্য নাই। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ তাহারা বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী। মূল কথা, ভাষার ঐক্য জাতীয় ঐক্য ও এক-রাষ্ট্রিকতার পক্ষে অপরিহার্য নয়। কাজেই ভারতের মত বহু-ভাষাভাষী দেশে একাধিক রাষ্ট্র-ভাষা থাকা অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক নয়। যদি বিশেষ একটি রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিলে বেশীর ভাগ ভারতবাসীর অসুবিধা হয়, তাহা হইলে একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া সমীচীন।

প্রথমে বাংলা ভাষার কথা ধরা যাক্। আমাদের মাতৃ-ভাষা বাংলা। এই ভাষা পূর্ব-ভারতের অধিকাংশ লোক বুঝিতে পারে। আসাম, উড়িয়া ও বিহারের

কোনো কোনো অঞ্চলে হিন্দীর চেয়ে, বাংলা সহজবোধ্য। আসামের কাছাড় জেলায়, পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা রাজ্য ভাষা। বিশ্বের দরবারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষা তথা ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা বাংলা ভাষাকে সম্মানের আসন দেয়। ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে সাহিত্য-সম্পদে বাংলাকে শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-ভারতে বাংলার প্রচলন নাই।

দক্ষিণ-ভারতে তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম ভাষা ব্যবহৃত হয়। সেখানে ইংরেজীর প্রচলন উত্তর ভারতের চেয়ে বেশী। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের ভাষা পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অধিবাসীরা বলিতেও পারে না, বুঝিতেও পারে না। সুতরাং দক্ষিণ-ভারতের কোন ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকার করা সম্ভব নয়। উত্তর ও মধ্য ভারতে হিন্দীর প্রচলন বেশী। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে ইহার প্রচলন নাই বলিলেই হয়। মারাঠী ও গুজরাটী ভাষা পশ্চিম ভারতের স্ব স্ব রাজ্যে সীমাবদ্ধ।

কোনো বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হইলে, একমাত্র ইংরেজী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা ইংরেজীর সমর্থন করেন, তাঁহাদের মতে বহু দিনের ব্যবহারে ইংরেজী ভাষা আমাদের কাছে আর বিদেশী ভাষা নয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে। ভারতের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের এবং কেরালা রাজ্যের কিছু লোকের মাতৃ-ভাষা ইংরেজী। ইংরেজী সমগ্র ভারতের বুদ্ধিজীবীদের ভাষা, যদিও ইংরেজী জানা লোক অত্যন্ত সংখ্যাল্প। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠতাই রাষ্ট্র-ভাষা নির্ধারণে একমাত্র মাপকাঠি নয়।

রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে ইংরেজীকে একমাত্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া না লইলেও ইহাকে প্রধান স্থান দেওয়া বর্তমানে অপরিহার্য। উচ্চ শিক্ষায় বাহনরূপে, আন্তঃরাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনায় এবং আইন-কানুন রচনায় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক।

অনেকে সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দিবার কথা বলেন। ইহা সত্য যে, বর্তমানে ভারতীয় ভাষার অধিকাংশই সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত এবং সংস্কৃতের দ্বারা প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত। সংস্কৃত ভাষা হিন্দুদের প্রাচীন ভাষা বলিয়া ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা উহা সঙ্গত বলিয়া অনেকে মনে করেন না। সর্বোপরি ইহার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি, সংস্কৃত সমৃদ্ধ হইলেও প্রচলিত ভাষা নয়।

একক বৃহৎ ভাষা হিসাবে হিন্দীর দাবী প্রবল। হিন্দীর দাবী প্রবল হইলেও হিন্দীর বিভিন্ন রূপ আছে। সর্বত্র এক প্রকার হিন্দী ব্যবহৃত হয় না। উত্তর-ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক এক জায়গায় মিলিত হইলে ইংরেজী জানা না থাকিলে হিন্দীতে কথা বলেন। ইহাকে বাজার হিন্দুস্থানী বলে। রাষ্ট্র-ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে হিন্দীর সম্যক্ যোগ্যতা এখনও হয় নাই, ইহা এখনও পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও সমৃদ্ধ হইবার অপেক্ষায় আছে।

বর্তমানে হিন্দীকে একক রাষ্ট্র-ভাষা করার ব্যাপারেও তীব্র আপত্তি উঠিয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া দক্ষিণ-ভারতের যে বিরূপ মনোভাবের প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। হিন্দী যত দিন স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইতেছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ যত দিন না হিন্দীকে রাষ্ট্র-ভাষারূপেও গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতেছে, তত দিন হিন্দীকে ইংরেজীর সহিত রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দীকে জোর করিয়া অহিন্দী-ভাষী রাজ্যের উপর চাপানো রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। একক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়া সুবিধাজনক হইলেও ভারতবর্ষের মতো বহুভাষা-ভাষী দেশে একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকা অযৌক্তিক নয় এবং ইংরেজীসহ প্রধান ষোলটি ভাষাকে সম-মর্যাদার আসন দান করিলে এই বিতর্কিত ও উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে। ইংরেজীকে আমরা বিদেশী ভাষা ভাবিতে পারি। কিন্তু বিদেশী বলিয়া উহাকে অবজ্ঞা করিলে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সংযোগ রক্ষা করার সূত্রটি দুর্বল হইবে, উচ্চ-শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের পথ ব্যাহত হইবে এবং জাতীয় সংহতিও বিঘ্নিত হইবে।

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা—গ্রন্থাগার জ্ঞানের মিলনক্ষেত্র—গ্রন্থাগারের উদ্ভব—প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার—বর্তমানের গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগার সভ্যতা ও প্রগতির পরিচায়ক—গ্রন্থাগার-আন্দোলন—উপসংহার।

গ্রন্থাগার সভ্য মানুষের জীবনযাত্রার এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বাড়িতে গৃহ-লাইব্রেরী আছে, অন্ততঃ একটি বইএর আলমারী তো আছেই। কেহ জ্ঞান ও আনন্দের জন্য, কেহ বা কেবলমাত্র সামাজিক মর্যাদায় থাকিতে গৃহ-লাইব্রেরী গড়িয়া তোলেন। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার প্রাচীন কালেও ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে-সকল সাধারণ গ্রন্থাগার বা সরকারী গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আমাদের মতো দরিদ্র ও শিক্ষাবঞ্চিত দেশের পক্ষে সর্বাধিক। সাধারণ গ্রন্থাগার সকল মানুষের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটায়, সমস্যার সমাধান দেয়, চিত্তে রস সঞ্চার করে। দেশের অজ্ঞতা দূরীকরণে ও শিক্ষা-বিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগারে প্রবেশ করিলে মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনের ঝঞ্ঝাট হইতে যেন দেব-মন্দিরের সুদূর আনন্দলোকে লইয়া যায়।

গ্রন্থাগার যুগ-যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানধারার মহামিলন-ক্ষেত্র। এখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলিত হইয়াছে, পৃথিবীর নানা দেশের নানা চিন্তাধারা একত্রিত হইয়াছে। ইহা সকল জ্ঞানের মিলন-তীর্থ। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারা আমাদিগের হৃদয় ও মস্তিষ্কের শান্তি ও তৃপ্তি দেয়, আনন্দ দেয়, আর দেয়

উদার দৃষ্টিভঙ্গী। এ তো বই-এর মেলা নয়, জ্ঞানের মেলা। সারা জীবনেও এত জ্ঞান কেহ কুড়াইতে পারিবে না। গ্রন্থাগার অফুরন্ত প্রাণ-প্রবাহ, ইহাতে অবগাহন করিলে মানুষ সিদ্ধি ও সার্থকতা লাভ করে।

সুপ্রাচীন কালেই জ্ঞানচর্চার ফলে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, কিন্তু লিপির আবিষ্কার না হওয়ায় উহা লিখিত ছিল না। 'বেদ' পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য। প্রথমে বেদ মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এই জন্য বেদের অপর নাম শ্রুতি। উহার এক এক অংশ আর্যদের এক এক বংশীয়দিগকে কণ্ঠস্থ করিয়া রক্ষা করিতে হইত। যাহাতে কোন প্রকার বিকৃতি বা ভুল না হয়, সেজন্য শ্লোকসংখ্যা, ছন্দের নাম, রচয়িতা ঋষির নাম ইত্যাদিও কণ্ঠস্থ থাকিত। এইভাবে পুরুষানুক্রমে শ্রুতিধর পুরুষদের দ্বারা এই বিদ্যা সুরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা পরবর্তী কালে অবিকৃত ভাবে লিখিত হইতে পারিয়াছে। লিপি আবিষ্কারের পরে গ্রন্থ লিখিত হয়। প্রাচীন মিশরে চিত্রলিপি ও ব্যাবিলোনিয়ায় কীলক লিপি প্রচলিত ছিল এবং সেখানে পোড়া মাটিতে লেখার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে তালপাতায় ও ভূর্জপত্রে (ভূর্জবৃক্ষের বল্কলে) গ্রন্থ লিখিত হইত। অনেক দেশে পাথরের ফলকে, চামড়া ও কাঠের উপরে পুঁথি লেখা হইত। মধ্যযুগে তুলট কাগজের আবিষ্কার হওয়ায় গ্রন্থ তুলট কাগজে লেখা আরম্ভ হয়।

চীনদেশে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয় এবং সেখানে অনেক বড় গ্রন্থাগার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা, নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। এই সকল জ্ঞান-তীর্থ সহস্র সহস্র ছাত্র ও বৈদেশিক পরিব্রাজকদের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইত। কাশী, কাঞ্চী, সোমনাথ প্রভৃতির হিন্দু মন্দিরে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। এইসকল যুগসঞ্চিত গ্রন্থাগার তুর্কীদের আক্রমণে বিনষ্ট হয়। নবজাগ্রত মুসলিম-বাহিনীর হস্তে আলেকজাণ্ড্রিয়া প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অথচ পরবর্তী কালে আরব ও অন্যান্য মুসলমানগণ পশ্চিম এশিয়ায় ও ভারতে অনেক বড় বড় গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের পূর্বে গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সেই সময়ে মঠ-মন্দির, রাজা, ধর্মযাজক, অর্থশালী বা বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে গ্রন্থ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ছিল না। এই সকল গ্রন্থাগার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিত না। সুতরাং তখনকার দিনে মনীষীদের ভাবধারার সহিত পরিচিত হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল। মধ্যযুগে আমাদের দেশে এক-এক জন পণ্ডিত বড় বড় গ্রন্থ সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। এজন্য তাঁহাদিগকে 'গ্রন্থী' বলা হইত। তাঁহারা ছিলেন জীবন্ত গ্রন্থাগার।

জ্ঞানচর্চা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং মুদ্রা-যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর অতি বৃহৎ গ্রন্থাগার এই চারিটি—প্যারিস

নগরীর বিবলিওথেক ন্যাশন্যাল (Bibliotheque Nationale), লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী (British Museum Library), আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরের লাইব্রেরী অব কংগ্রেস এবং সোভিয়েত রাশিয়ার লেনিন লাইব্রেরী। জ্ঞানপিপাসু তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এবং ছাত্র-ছাত্রী এই সকল গ্রন্থ গার দ্বারা প্রভূত উপকৃত হইতেছেন।

আমাদের দেশে কতকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থাগার আছে। কলিকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী), এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিখ্যাত। জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা ব্যতীত বোম্বাই প্রভৃতি শহরেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে ও স্কুলে এবং বড় বড় শহরে সাধারণ গ্রন্থাগার আছে।

জ্ঞান ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশে লাইব্রেরী-আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য-বই পড়ার সুযোগ দিবার জন্য অনেক পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে।

পুঞ্জীভূত জ্ঞানের প্রতীক গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই গ্রন্থাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানব-আত্মার অমর-আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে।"

গ্রন্থাগার জাতির সভ্যতার বার্তাবহ, জাতীয় অগ্রগতির পতাকাবাহী। গ্রন্থাগার মানব-জীবনের পরম আশ্রয়, পবিত্র মন্দির ও পুণ্যতীর্থ। জ্ঞানলিপ্সু ও রসপিপাসু মানুষের ইহা সাধন-পীঠ ও শান্তির নীড়। এখানে মানুষ প্রেরণা ও অমৃত লাভ করে।

বাংলার মধ্যবিত্ত

বাংলার মধ্যবিত্ত—ভারতের অগ্রগতির পথিকৃৎ—মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ—বুদ্ধিজীবী—নিম্ন-মধ্যবিত্ত—মধ্যবিত্তের বিপর্যয়ের কারণ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পরে অধিকতর বিপর্যয়—মধ্যবিত্তের সংকট মূলতঃ অর্থ নৈতিক—উপসংহার।

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড, নব্য বাংলার তথা নব্য ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ইহাদের কথা স্মরণ করিয়াই মহারাষ্ট্র-নায়ক গোপালকৃষ্ণ গোখলে একদিন সগর্বে বলিয়াছিলেন, 'বাঙালী যাহা আজ চিন্তা করে, ভারত তাহা কাল চিন্তা করে।' বস্তুতঃ বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষা-বিস্তারে, সমাজ-সংস্কারে, ধর্ম-সংস্কারে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং সর্ববিধ প্রগতিমূলক চিন্তা ও কর্মধারায় ভারতে

নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছে। এক কথায়, বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ ভারতের উনবিংশ শতকের নবজাগরণের পুরোধা।

সেই শক্তিশালী বুদ্ধিজীবী বিচক্ষণ সাহসী ও প্রাণবন্ত মধ্যবিত্ত সমাজ আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। প্রচণ্ড আঘাতের পর আঘাতে ও বিপর্যয়ে শতাধিক বর্ষের সেই সমাজ-সৌধ এখন ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম, মধ্যবিত্তের নেতৃত্বশক্তি পথভ্রষ্ট, তাহার দুরন্ত প্রাণশক্তি স্তিমিত মনে হয়।

বাংলার বর্তমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ ইংরেজ রাজশক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বঙ্গদেশে এক নব্য জমিদার-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং উহার আনুষঙ্গিক মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার, জোতদার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এই ভাবে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইংরেজের শাসন-পরিচালনা-কার্যে ও ইংরেজের ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তার জন্য একদল ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী অগ্রণী হইল। ইঁহারাই বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড। ইঁহারা ভূমি-নির্ভর গ্রাম্য জীবন হইতে কতকটা বিচ্যুত হইয়া শহরমুখী হইল এবং ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা ও রীতি-নীতির সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃ নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হইল।

এই সম্প্রদায়ের ভিতর উকিল, ডাক্তার, সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, কেরানী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, দালাল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী মানুষেরাও রহিয়াছেন। ইংরেজীতে ইহাদেরই বলা হয় বৃত্তিজীবী শ্রেণী (professional classes)। কেননা এক-একটি পেশা বা বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের জীবন-যাত্রার রীতি ও আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের চিন্তা ও কল্পনার গঠনের ভিতর শুধু স্বশ্রেণীর নয়, স্বীয় বিশেষ বৃত্তিটির ভাবনা-চিন্তার ছাপ রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত নীতিবুদ্ধির দ্বারা ইহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। ইহারা সহজাতভাবে সৎ, পরিশ্রমী, সহিষ্ণু, চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহাদিগকে বলা হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত। ইঁহাদের ভূমির সম্বল নাই, গ্রাম্য-জীবন হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ইহারা শহরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। চাকুরি ব্যতীত অথবা অনুরূপ অন্যবিধ ক্ষুদ্র জীবিকা ভিন্ন ইঁহাদের বাঁচিবার উপায় নাই। রাজধানী এবং মফঃস্বল শহরগুলির অগণিত অধিবাসীই নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। সাধারণ কর্মচারী, কেরানী, শিক্ষক, সামান্য ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র দোকানদার, ক্ষুদ্র শিল্পী, দালাল, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষের দ্বারা এই শ্রেণীর কলেবর পুষ্ট। অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা, ও অনিশ্চয়তার পীড়নে ইঁহাদের জীবন-যাত্রা সর্বদাই দোদুল্যমান। ইঁহাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী-রূপে জীবিকা অর্জনে বাধ্য হইতেছে।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির আঘাত-সংঘাতের ফলে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ আজ বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে প্রথম ঋণসালিসী বোর্ড দ্বারা লগ্নী কারবার বন্ধ করায় এবং পরে জমিদারী ব্যবস্থা রদ করায় মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের উপর

প্রচণ্ড আঘাত আসে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির অনুশীলনকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারায় বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন অত্যন্ত দ্রুত হইতে থাকে। যুদ্ধের দাক্ষিণ্যে ব্যবসায়ী ও কলকারখানার মালিকগণ রাতারাতি স্ফীত হইয়া উঠিল। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য হু হু করিয়া বর্ধিত হওয়ায় নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরিয়া মধ্যবিত্তদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এবং বাণিজ্য-সংস্থা ও কলকারখানা অবাঙালীদের অধিকারে থাকায় বাঙালী যুবক-যুবতীদের বেকার সমস্যা দারুণ ভাবে বাড়িয়া উঠিল।

বিশ্বযুদ্ধের দক্ষিণাস্বরূপ কালো বাজার প্রভৃতি নৈতিক অধোগতি জাতির দেহে দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে প্রকটিত হইল। অবশেষে স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ বিভাগের অভিশাপ বাঙালী মধ্যবিত্তের চরম সর্বনাশ করিল। বাংলার যে মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ মূল্য দিয়াছেন, তাঁহারাই ইংরেজের নির্মম নির্যাতনে সর্বাপেক্ষা অধিক নির্যাতিত হইয়াছেন। ইংরেজ তাঁহাদের শুধু দৈহিক ও মানসিক লাঞ্ছনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহাদের অর্থনৈতিক জীবনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে রিক্ত নিঃস্ব সর্বহারা করিয়া দিয়াছে। সর্বশেষ প্রবঞ্চনা করিল তাঁহাদের সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনার স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ভারত। স্বাধীনতার সৌভাগ্য বর্ষিত হইল সেই সব ধনকুবেরদের উপর যাহারা চিরকাল ছিল ইংরেজের অনুগত অর্থদাস ও স্বাধীনতা-বিরোধী। আর যাঁহাদের রক্ত ও অস্থিদানে স্বাধীনতা লাভ হইল, তাঁহারা হইলেন বিত্তহীন, আশ্রয়হীন, আশাহীন, এক কথায় সর্বহারা।

মধ্যবিত্তের সংকট মূলতঃ অর্থনৈতিক। দীর্ঘ দেড় শতাধিক বৎসরের দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধীরে ধীরে ধ্বসিয়া পড়ায় মধ্যবিত্ত আজ চরম দুর্দশাগ্রস্ত। মধ্যবিত্তের নৈতিক চরিত্র ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ফলে তাহাদের পক্ষে ধনতন্ত্রের আওতায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। মধ্যবিত্তের বাঁচিবার দায় প্রধানতঃ নিজেদের উপরে বর্তিলেও দেশের সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে মধবিত্তের বাঁচিবার অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার কার্যকরী ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

মধ্যবিত্তের কেবল চাকুরি-সর্বস্ব হইয়া থাকিলে এখন আর চলিবে না। মধ্যবিত্তকে কায়িক ও মানসিক সর্বপ্রকার শ্রম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। নিষ্ঠাবান্ কর্মযোগীর ন্যায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ কায়িক, মানসিক সকল কর্ম-সাধনায় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহাদের আর্থিক ভিত্তিভূমি নূতন করিয়া দৃঢ় করিয়া গড়িতে হইলে তাঁহাদিগকে নিষ্ঠাসহকারে শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। এককালে বাঙালী ছিল শিল্পজীবী ও বাণিজ্যজীবী জাতি। আজ আবার তাহাকে নূতন উদ্যমে ও নূতন পথে সেই গৌরবের ঐতিহ্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

মধ্যবিত্তের গর্ব ও গৌরব বিত্তে নয়, তাঁহার চিত্তপ্রকর্ষে ও চরিত্র-শক্তিতে। মধ্যবিত্তের প্রধান বিশেষত্ব তাঁহার নৈতিক শুচিতা, প্রবল আত্ম-মর্যাদা ও

আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ, সূক্ষ্ম, সৌন্দর্য ও রুচিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে একান্ত নিষ্ঠা, সরস হৃদয়বত্তা ও ত্যাগস্পৃহা এবং গ্রহিষ্ণু মনের কল্পনাপ্রবণতা ও বুদ্ধির দীপ্তি। জাতির কল্যাণ সাধনে মধ্যবিত্ত চিরকালই উন্মুখ ও তৎপর। মধ্যবিত্তের অস্থিদানে ভারতের নবজাগরণ—ইঁহাদেরই আত্মবিসর্জনে ভারতের স্বাধীনতা। আজ পরম দুর্ভাগ্য, দেশ ইঁহাদিগকে ভুলিতে বসিয়াছে। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়, স্বাধীন ভারত এই বুদ্ধিমান্ পরিশ্রমী ও স্বদেশবৎসল বিরাট জনশক্তিকে দেশোন্নতির কার্যে সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ করিতে পারিল না।

যে সহে, সে রহে

জীবন সংগ্রামে সহনশীলতা—সহনশীলতার জয়—দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার সার্থকতা—সহনশীলতার প্রকৃত অর্থ—সহিষ্ণু মানবই যথার্থ বাঁচার ও অমৃতের অধিকারী।

এই পৃথিবীতে মানুষকে প্রতিদিন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। বেঁচে থাকার জন্যই মানুষের এত সংগ্রাম, একেই ইংরেজীতে জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence) বলে। এই সংগ্রামে যে জয়ী হতে পারে, যে শত দুর্যোগ, শত ঝঞ্ঝা অতিক্রম করতে পারে, সে-ই বাঁচার মত বাঁচতে পারে। এই যে বাঁচা, একেই যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) বলা হয়। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করবার মত শক্তি না থাকলে, বাইরের বাধাকে প্রতিহত করার সাহস ও বল না থাকলে, স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষকে পরাজয় বরণ করতে হয়। জীব-জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, কত জীব জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে এই পৃথিবী থেকে একেবারে বিদায় নিয়েছে। মানুষও লড়াই করেই বেঁচে আছে। এর মূলে রয়েছে মানুষের অসামান্য সহনশীলতা।

মানুষের ক্ষেত্রে বাঁচা বলতে কোনো রকমে প্রাণ ধারণ করে থাকাই বোঝায় না। প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের মতো বাঁচা চাই। টিকে থাকা ও বেঁচে থাকা এক কথা নয়। মানুষের যে বাঁচা, তা তার সমস্ত প্রাণের আনন্দ ও অনুভূতি নিয়ে এবং ক্রমবর্ধমান কর্মশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বাঁচা। এই পৃথিবীতে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের প্রতিপদেই বিরুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে, কত না দুঃখ তাদের সহ্য করতে হয়েছে। অসাধারণ সহনশীলতার বর্ম পরেই তাঁরা অন্যায়ের কাছে, অসত্যের কাছে মাথা নোয়াননি। সহিষ্ণুতার প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের জীবন জয়ী হয়েছে।

প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হতে হ'লে মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার শক্তি থাকা চাই। দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করে আয়ত্ত করতে না পারলে জীবনে কেউ শাশ্বত আনন্দ লাভ করতে পারে না। দুঃখ-দারিদ্র্যের আঘাতে যারা মুষড়ে পড়ে তারা নিতান্ত কাপুরুষ। জীবনে যে আঘাতই আসুক না কেন, তাকে সহজভাবে গ্রহণ করে সহ্য করতে হবে।

যথার্থ মানুষ হিসাবে বাঁচতে গেলে জীবনে শক্তি, সাহস ও সহিষ্ণুতার একান্ত প্রয়োজন আছে। আঘাত-সংঘাতের মাঝে যে অটল থাকতে পারে, এ পৃথিবীতে তারই বাঁচার অধিকার আছে। বিপদে ভয় পেয়ে পিছিয়ে পড়লে চলবে না। মানুষকে নির্ভীক কণ্ঠে বলতে হবে—"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে যেন করিতে পারি জয়।"

সহনশীলতা বলতে সব কিছু সহ্য করার কথা বলা হচ্ছে না। বিপদ-আপদ দুঃখ-শোক সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের থাকা উচিত। কিন্তু অন্যায় বা অসত্যের আঘাতকে সহ্য করা অনুচিত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

সহনশীলতাও অভ্যাস করে আয়ত্ত করতে হয়। মানুষকে কষ্ট করেই শ্রেয়ঃ অর্জন করতে হয়। চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে লক্ষ্মী কখনও আপনা থেকে ধরা দেন না। মানুষকে স্বচেষ্টায় অর্জন করতে হয়, আদায় করতে হয়। যে ভীরু, যে দুর্বল, সে নিজের জীবনের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য শুধু অদৃষ্টের দোহাই দেয়। যে বীর, তাকে অনেক সময় দৈনন্দিন জীবনে অনেক নিন্দা গ্লানি সহ্য করতে হয়। যে-নিন্দা ভীরুতা, দুর্বলতা বা ঈর্ষা-প্রসূত, যে-নিন্দা অসত্য, তাকে উপেক্ষা করেই জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়। জীবনের সত্য সাধনায় যদি দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তাহলে তাকে সহ্য করার শক্তিও অর্জন করতে হবে। তবেই পৃথিবীতে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার জন্মে। সহিষ্ণুতাই মানুষকে অমৃতের অধিকারী করে তোলে। সুখ দুঃখ মানুষের জীবনে চক্রবৎ আবর্তিত হচ্ছে, সেগুলিকে যদি সহজভাবে বরণ করে নিতে পারি, তবেই আমরা জীবনের অমৃতের স্বাদ পাব। বর্তমানে সমাজ-জীবনে যে অসহিষ্ণুতার মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়, তাহা জাতির নিদারুণ ব্যাধি।

ইতিহাসের আদিযুগ থেকেই মানুষ আপন শক্তির প্রতি অটুট আস্থা নিয়ে একক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সর্ববিধ দুঃখ-কষ্টকে নিবারণের ও বিঘ্নবিপদ অতিক্রম করার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই নিরন্তর প্রয়াসেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ, সভ্যতার বিকাশ ও বিজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটেছে। দুঃখ-কষ্টকে ভাগ্যের দোষ বা পূর্বজন্মের কর্মফল মনে করে তা নিশ্চেষ্টভাবে সহ্য করা কাপুরুষতার নামান্তর। তাতে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা। পুরুষকারকে আশ্রয় করে সর্ববিধ প্রতিকূলতার প্রতিবিধান-প্রয়াসেই মানব-জীবনের সার্থকতা। কিন্তু যে সব দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার একেবারেই অসাধ্য, হা-হুতাশ না করে সেগুলোকে নীরবে সহ্য করে যেতে হয়। এই নীরব সহনশীলতায় বীরত্বই প্রকাশ পায়, দুর্বলতা নয়। তাই সংস্কৃতে একটা কথা আছে—"যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ"। অর্থাৎ, চেষ্টা করেও যদি ফল না পাওয়া যায় তাতে দোষ নেই। চেষ্টা না করাই দোষের। ইংরেজী প্রবাদ-বাক্যেও অনুরূপ কথা ধ্বনিত হয়েছে। "What cannot be cured must be endured"—অর্থাৎ যে দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার অসাধ্য, সে দুঃখ-কষ্ট সয়েই যেতে হয়।

স্বাবলম্বনের মূল্য ও শ্রমের মর্যাদা

শ্রমই মানব-জীবনের উন্নতির সহায়—অবিরাম কর্মজীবন-সাধনা, পরনির্ভরতা দুঃখময়—আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী উদ্যোগীরই জয়, কর্মভীরুর নয়—আত্মবিশ্বাসী স্বাবলম্বীর আনন্দ ও সফলতা—শ্রমের মর্যাদা জীবনে অপরিহার্য—মানব-সভ্যতা শ্রমের ফল—কায়িক ও মানসিক শ্রমের মর্যাদা—স্বাবলম্বী ও পরিশ্রমীর জীবনে উন্নতি ও আনন্দ।

ভগবান্ মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অজস্র উপকরণ দিয়াও কিছু বাকী রাখিলেন। তিনি তাহাকে আলস্যের অবকাশটুকুও দিলেন না, দিলেন কঠোর পরিশ্রমে ও নিজের শক্তিতে সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করিয়া লইবার মর্যাদা। শ্রম তাহার নিত্যসঙ্গী, তাহার অস্ত্র, তাহার অবলম্বন। মানুষের জীবনে এক মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। মানব-জীবন একটি নিরন্তর যুদ্ধক্ষেত্র। এই পৃথিবীর বুকে মানুষকে সাহসী যোদ্ধার মত সতত সংগ্রাম করিয়া জীবনের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়।

মানব-জীবনের জন্য যা কিছু দরকার, মানুষের কাছে তা নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু মানুষকে পরিশ্রম করিয়া তাহা আয়ত্ত করিয়া লইতে হয়। জীবনে অবিরাম কর্ম-করিয়া যাওয়াই মানব-জীবনের সাধনা। যে এই সাধনার পথ হইতে সরিয়া যায়, তাহার আত্ম-প্রত্যয়ও থাকে না, কর্ম-শক্তিও সে হারাইয়া ফেলে। আত্ম-প্রত্যয় ও কর্মশক্তি হারাইয়া দিন দিন সে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং এই দুর্বলতাই তাহাকে একান্ত পর-নির্ভর করিয়া তোলে। পর-নির্ভর ব্যক্তির জীবন যেমন লজ্জাকর, তেমনি দুঃখময়। মানুষের অনাদর ও অবহেলা তাহার জীবনকে নৈরাশ্যে ভরিয়া দেয়, তাহার জীবনের বোঝা দুর্বহ হইয়া উঠে।

প্রত্যেক মানুষই অনন্ত শক্তির অধিকারী। মানুষ যদি তাহার সেই শক্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পর-নির্ভরতার গ্লানির বোঝা বহন করিতে হয় না। আর যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহাদের জীবনে সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই দেখা দেয়। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ"—লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই বরণ করিয়া থাকেন। কর্মভীরু মানুষ জীবন-যুদ্ধে কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। নিজের উপর বিশ্বাস না থাকিলে, নিজের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, মানুষের আত্মশক্তি কখনও জাগ্রত হইতে পারে না। আত্ম-বিশ্বাসহীন ব্যক্তির অন্যের উপর আস্থা থাকে না।

আত্ম-বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ কখনও স্বাবলম্বী হইতে পারে না। আমরা কাজের ভিতর দিয়া যে আনন্দ লাভ করি, তাহা বাহিরের যে কোন উপকরণ, অবস্থা বা অবলম্বনের উপর নির্ভর করে না। অবিরত শ্রম ও স্বাবলম্বনই তাঁহার একমাত্র উপায়। স্বাবলম্বী ব্যক্তির আত্মনির্ভর ও অন্য-নিরপেক্ষ প্রচেষ্টার মধ্যে যে তৃপ্তি ও আনন্দ আছে, তাহা পর-নির্ভরতার মধ্যে পাওয়া যায় না। স্বাবলম্বী দরিদ্র ব্যক্তি পর-নির্ভর ধনীর চেয়ে কৃতী ও সুখী।

আত্ম-নির্ভরতা আত্মশক্তি বিকাশের ও মানসিক বলবুদ্ধির প্রধান সহায়। যে জাতি আত্মনির্ভর, সে জাতির অগ্রগতি ও উন্নতি অব্যাহত থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনেও স্বাবলম্বনের গুণে লোকে সামান্য অবস্থা হইতে যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে পারেন তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পর-নির্ভর ব্যক্তিকে খ্যাতিহীন, দীপ্তিহীন, শক্তিহীন জীবন যাপন করিতে হয়।

স্বাবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের মর্যাদার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। জীবনে স্বাবলম্বী হইতে গেলে মানুষকে পরিশ্রম করিতে হয়। বিনা আয়াসে কখনও মানুষের অভীষ্ট লাভ হয় না। শ্রম ব্যতীত মানুষের পক্ষে জীবনধারণও সম্ভবপর নয়।

মানব-সভ্যতার অত্যুচ্চ সৌধ মানুষের সমবেত ও ব্যক্তিগত শ্রমের ফল। মানুষের শ্রমই পৃথিবীকে এত সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। তবে সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিশ্রম করিবার রীতি-নীতিতে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। মানুষ পরিশ্রম করিবার জন্য নানা কলা-কৌশল উদ্ভাবন করিয়া পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তাই দেখি, যে জাতি যত পরিশ্রমী, সে জাতি তত উন্নতিশীল। আগেকার দিনে ব্যক্তিগত পরিশ্রমের উপর মানুষকে বেশী নির্ভর করিতে হইত। বর্তমান কালে সমষ্টিগত পরিশ্রমের দ্বারাই জাগতিক উন্নতি সাধিত হইতেছে। শ্রমকে আজ আর কেহ হীন বলিয়া মনে করে না। শ্রমের এই অব্যাহত গতি যে পৃথিবীর নানা জাতির উন্নতির সহায়ক হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ আত্মনির্ভরতা এবং মানুষের শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা। শ্রম করাতে মর্যাদাহানি হয় না এবং শ্রমের দ্বারা সকল প্রকার উন্নতি সম্ভব, এই মনোভাব পরিশ্রমকে যথোচিত স্বীকৃতি দিয়াছে।

যে জাতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রমের স্বীকৃতি দেয় নাই, তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতিও সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। দৈহিক ও মানসিক শ্রম মানুষকে আর্থিক ও আত্মিক উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে। এই দ্বিবিধ শ্রমের সমন্বয় সাধন দেশের ও দশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। একটিকে বাদ দিয়া অন্যটির দ্বারা জীবনে সুফল আশা করা যায় না। অনেকে দৈহিক শ্রমকে হীন বলিয়া মনে করেন। এই ধরণের মনোভাব অত্যন্ত অনিষ্টকর। মানসিক শ্রমের দ্বারা আত্মিক উৎকর্ষ লাভ হয় বটে, কিন্তু দৈহিক শ্রমের প্রতি অবহেলা আর্থিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, ফলে আত্মিক উন্নতিও ব্যাহত হয়।

জীবনে উন্নতি লাভের জন্য মানুষকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে এবং সেই কারণেই তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইবে। জীবনে কোন কাজই তুচ্ছ নয়। ছোট-বড় সকল কাজেরই মূল্য ও মর্যাদা আছে। কাজ করিতে গেলেই পরিশ্রম করিতে হয়। শ্রমলব্ধ সাফল্যের আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। যিনি স্বাবলম্বী, তিনি কাজ করিয়াই আনন্দ পান। কাজেই পরিশ্রমকে তিনি অগৌরবের বা ক্লেশের বলিয়া মনে করেন না। যিনি স্বাবলম্বী, তিনি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী এবং শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন, তিনি আত্ম-নির্ভর উন্নত চরিত্রের অধিকারী

হইয়া নির্মল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। মানব-জীবনে শ্রম ও সাধনার মধ্যে পার্থক্য নাই। কোন মনীষী শ্রমের সমবায়কেই প্রতিভা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, অনলস শ্রমেই প্রতিভা স্ফুরিত হয়।

যে আত্মপ্রত্যয়হীন ও কর্মবিমুখ, সে পরের সহায়তা হইতেও বঞ্চিত হয়। আত্মপ্রত্যয়শীল ও কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পরের সহায়তাও পায়। তাই স্বাবলম্বী ইংরেজ জাতির মধ্যে এই প্রবাদবাক্য প্রচলিত হইয়াছে—God helps, those who help themselves. যাহারা নিজেদের সহায়তা নিজেরা করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করেন।

আমাদের বেকার-সমস্যা

বেকার-সমস্যা জাতীয় সঙ্কট : যুবশক্তির অপচয় ও নৈরাশ্য—বেকার সমস্যার কারণ—ঐতিহাসিক কারণ, যন্ত্রযুগের আবির্ভাব—শিক্ষিতের চাকুরী সীমাবদ্ধ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ছাঁটাই—দেশ-বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু—শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অবাঙালীর হস্তগত—বাংলার সকল শ্রমক্ষেত্রে অবাঙালী—বাংলায় বেকার সর্বাধিক—সমাধানের পথ—বৃহদায়তন মৌলিক শিল্পের সঙ্গে অনুপূরক ক্ষুদ্র শিল্প—কৃষির শিল্পীকরণ—সমবায় প্রথায় ব্যাঙ্কের সাহায্যে যৌথ প্রয়াস।

বর্তমানে বাংলা দেশের তথা ভারতের তীব্র বেকার সমস্যা এক বিরাট জাতীয় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের নবীন যুবশক্তির কর্মহীনতা জাতির প্রাণশক্তিকে তিল তিল করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। নৈরাশ্যের ফলে যুবশক্তির যে অপচয় ও অবনতি ঘটিতেছে, তাহারই প্রকাশ জীবনের উচ্ছৃঙ্খল ও অনুচিত আচরণে ও জীবন-যাত্রায় অথবা দায়িত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্যতায়।

এদেশে বেকার-সমস্যা নূতন নয়, তবে বর্তমানে ইহা পুরাতন ক্ষয়রোগের মতো জাতির প্রাণশক্তি তীব্রভাবে শোষিত ও নিঃশেষিত করিতেছে। ইংরেজের শাসন এদেশে প্রবর্তিত হইবার পর এদেশের হস্তশিল্প ও কুটীর-শিল্পগুলি যন্ত্রশক্তির প্রতিযোগিতায় ও ইংরেজের অত্যাচারে ধ্বংস হইতে থাকে। ফলে দলে দলে শিল্পীরা বেকার হইয়া পড়ে এবং ইহাদেরই এক দল নবগঠিত কারখানায় মজুর হিসাবে প্রবিষ্ট হয়। অনেকে কৃষিজীবী হয় এবং সেখানেও সীমিত জমির ওপর অত্যধিক চাপ পড়ায় বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে।

ইংরেজের শাসনতন্ত্র ও সওদাগরী সংস্থাগুলি পরিচালনার জন্য বহুসংখ্যক ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থান প্রথম দিকে হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং চাকুরি সীমাবদ্ধ থাকায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে এই সামরিক চাকুরি চলিয়া যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়।

অবশেষে দেশ-বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারী গৃহহীন, বৃত্তিহীন, অর্থহীন অবস্থায় ভারতে আগমন করে এবং ফলে এদেশে বেকার-বাহিনীর সংখ্যা

ভয়াবহ হইয়া দাঁড়ায়। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তরা ভারত সরকারের নিকট হইতে যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে, বাঙালীরা তাহার সামান্য অংশ পাইলেও স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, ভিক্ষোপজীবীর ভিক্ষাপাত্র হস্তে করুণা ভিক্ষা করিতে হইত না।

স্বাধীনতার পর এদেশের অধিকাংশ বিদেশী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত হইয়া অবাঙালী মালিকানায় পর্যবসিত হয়। এদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ পুরাতন ও নূতন বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য-সংস্থা অবাঙালীদের অধিকারে যাওয়ায় বাঙালী শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের চাকুরির পথ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

এদেশে কল-কারখানায়, হাট-বাজারে, ডকে-স্টেশনে, ছোট-বড় ব্যবসায়-বাণিজ্যে, সর্বত্র অবাঙালী মালিক ও শ্রমিকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানে সকলেরই কর্মসংস্থান হইতেছে, কিন্তু এই মাটির সন্তানেরা কর্মহীন, বিত্তহীন, অন্নহীন। একটা জাতির অর্থনৈতিক জীবন যদি অন্যের কুক্ষিগত হয়, তবে তাহার জীবিকার তথা বাঁচিবার সমস্ত পথই অবরুদ্ধ হয়।

বর্তমানে ভারতের বেকার-সংখ্যা তিন-চার কোটি বলিয়া ধরা হয়। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা সর্বাধিক। পরিকল্পনা বা যোজনা-বিশেষজ্ঞগণও বেকার-সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী উভয়বিধ সুচিন্তিত পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তি লইয়া এই বিরাট্ সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রেরই দ্রুত অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। বৃহদায়তন শিল্প-উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থা গড়িয়া কর্ম ও শ্রম-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি-শিল্পায়ন এবং বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র-সাহায্যে ক্ষুদ্র-শিল্প ও গৃহ-শিল্পগুলিকে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অনুপূরক হিসাবে চালু করিতে পারিলে বিপুল জন-সংখ্যার কর্মসংস্থান হইতে পারে। শহরে ও গ্রামে ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়নে ও কৃষির শিল্পীকরণে সমবায় ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অধিকতর টাকা লগ্নি করা উচিত। সততা ও কর্মঠতা দ্বারা এই প্রকার অর্থ সাহায্যে সমবায় প্রথায় যৌথ প্রচেষ্টায় ডেনমার্ক প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেশের ন্যায় এ দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা বেকারি দূরীকরণ সম্ভবপর। তবে এজন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করা কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে, সাধারণ শিক্ষার সহিত কারিগরি তথা কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞানাদির ব্যবহারিক ও কার্যকরী বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষিতকে চাকুরির মোহ ত্যাগ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দৃঢ়হস্তে স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী প্রধানতঃ চাকুরিজীবী বলিয়াই তাহাদের অর্থনৈতিক সংকট অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই বুদ্ধিজীবী দল আজ

বৃত্তিহীন, বিত্তহীন, আশ্রয়হীন, আশাহীন—হীনম্মন্যতায় সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজ আকণ্ঠ নিমগ্ন।

বিদ্যার নিজস্ব মূল্য বা মর্যাদা আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যার সহিত জীবিকার সম্পর্কও অনস্বীকার্য। বেকারির বিপাকে পড়িলে বিদ্বানও বিপথগামী হন, ন্যায় ও শ্রেয়ের পথ ত্যাগ করিয়া অন্যায় ও অনৌচিত্যের পথে পা বাড়ান, নৈরাশ্য ও হীনম্মন্যতার পাকে পড়িয়া সমস্ত কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়েন। যে আশা, কল্পনা ও উদ্দীপনা লইয়া ছেলেমেয়েরা যৌবনে পদার্পণ করে, শিক্ষার অবসানে নৈরাশ্য ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ তাহাদের জীবনের গতিপথ যাহাতে রোধ করিয়া না দাঁড়ায় সেইদিকে সামগ্রিক প্রয়াস চালাইতে হইবে।

সুষ্ঠু ও দ্রুত মীমাংসা করিয়া তাহাদের জীবন সুস্থ স্বাভাবিক ও সুখময় করা অত্যধিক প্রয়োজন। বর্তমানে ইহাই আমাদের রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য ও দায়িত্ব। জাতীয় সমস্যার ভিত্তিতে এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সমাজ-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতির সহায়ে এই সর্ববিধ্বংসী ব্যাধির প্রতিকার করিয়া জাতিকে অবনতি ও অবলুপ্তি হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

সাধারণ জীবন-যাত্রায় বিজ্ঞানের দান

(প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান ক. প্র. '৫০, উ. মা. ১৯৬৯)

সূচনা—বিজ্ঞান সহায়ে প্রকৃতির উপর আধিপত্য—বিজ্ঞানদ্বারা প্রকৃতিকে জানা—আগুন আবিষ্কার সভ্যতার নব পদক্ষেপ—ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের দান—সংবাদ-পত্র—বিজ্ঞান বর্তমান জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—বিজ্ঞান মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞান আমাদের নিত্যসঙ্গী।

সভ্য মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের দান অসীম। বিজ্ঞান আজ মানুষের নিত্য সহচর। বিজ্ঞান ছাড়া মানুষ এক পা-ও চলিতে পারে না। বিজ্ঞান আজ তাহার জীবনকে নিরাপদ করিয়াছে, সুখ-সমৃদ্ধিতে উন্নত করিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে।

ইতিহাসের আদি যুগে মানুষ ছিল একান্ত অসহায়। তখন তাহার চতুর্দিকে ছিল প্রকৃতির ভয়াবহ কুটিল মূর্তি। ভয়ার্ত মানুষকে সেই সময় হিংস্র শ্বাপদ আর ভয়াল প্রকৃতির মধ্যে পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। বাধাকে অতিক্রম করিবার ও দুর্জ্ঞেয়কে জানিবার যে দৃঢ় ইচ্ছা মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাই ছিল সেই আদিম পৃথিবীর বুকে মানুষের একমাত্র অস্ত্র। এই অস্ত্রের সাহায্যেই মানুষ আদিম যুগে অসভ্যতাকে এবং পাশবিক জীবনকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সেদিনের ইতিহাসে কি দেখিলাম? প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতার সহিত মানুষ নিয়ত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে মানুষই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল।

মানুষের সন্ধানী শক্তিতে যেদিন আগুন জ্বালিবার রহস্য আবিষ্কৃত হইল, সেই দিনই মানব-সভ্যতার নব অধ্যায়ের সূচনা। আগুন আজ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রধান সহায়। বিজ্ঞানের দান ব্যবহারিক জীবনে প্রচুর। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়াছে বিজ্ঞান।

বিদ্যুৎ-শক্তি আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান এক দিকে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছে, অপর দিকে তেমনি দূরপ্রান্তে গমনাগমনের আবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে সহজ করিয়া দিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিও, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিভিশন আমাদের জীবন-যাত্রাকে কেমন সুন্দর ও সহজ করিয়াছে। রেডিও সাহায্যে আমরা মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবীর সংবাদ পাইতেছি, নানা বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতেছি, আনন্দ লাভের উপকরণ পাইতেছি। টেলিগ্রাফের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরণ করিতেছি। টেলিফোনের সাহায্যে দূরের লোকের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিতেছি। বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ও টেলিগ্রাম বর্তমান জগতে নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। রেডিও ট্রানজিস্টারে আমরা দূরের শব্দ শুনি, টেলিভিশনে শোনার সঙ্গে সঙ্গে দূরের ঘটনাবলীও স্পষ্ট দেখিতে পাই। এইগুলিকে বাদ দিলে আমাদের জীবন-যাত্রা অপূর্ণ থাকে, আমাদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইয়া যায়। আমরা ট্রাম, বাস, মোটর, ট্রেন, বিমান ও জাহাজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অতি অল্প সময়ে যাতায়াত করিতেছি। স্থান ও কালের দূরত্ব আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে হ্রাস পাইয়াছে।

যে কাগজে যে কালি ও কলম দিয়া লিখিতেছি, যে বই পড়িয়া জ্ঞান আহরণ করিতেছি, সেই বই বিজ্ঞানের দান।

যে দৈনিক সংবাদ-পত্র প্রভাতে আমাদের সম্মুখে বিশ্বের সংবাদ বহন করিয়া আনে, তাহাও বিজ্ঞানেরই দান। মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কৃত না হইলে আজ তাহা সম্ভবপর হইত না। আমরা সংবাদ-পত্রের মধ্য দিয়া বিশ্ববাসীর সহিত পরিচিত হই। সংবাদ-পত্র বর্তমানে লোকশিক্ষারও অন্যতম মাধ্যম।

বিজ্ঞানের দানকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের সহিত একেবারে মিশাইয়া দিয়াছি। গৃহকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রিক জীবনে অহরহ বিজ্ঞানের দানকে গ্রহণ করিতেছি এবং তাহা ব্যবহার করিতেছি। আমাদের জীবন-যাত্রাকে সহজ সুন্দর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ও নীরোগ করিয়া তুলিতে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টার অভাব নাই। ভেষজ-চিকিৎসা ও শল্য-চিকিৎসার অসামান্য উন্নতি মানুষকে কঠিন কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিতেছে। এ্যাণ্টি-বায়োটিক ঔষধে অনায়াসে রোগ দূর হইতেছে।

বিজ্ঞান আমাদের অভাব অনেকাংশে দূর করিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে, আমাদিগকে শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। বিবর্তনের পথে মানুষকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই মানুষের জীবনে বিজ্ঞান আজ বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ হইয়াছে। পৃথিবীর বিগত দুই শতাব্দীর ইতিহাস বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার ইতিহাস। বিজ্ঞান যথার্থই আমাদের নিত্যসঙ্গী।

সংবাদ-পত্রের প্রভাব

বিশ্ব-পরিচয়—আধুনিক জীবনের নিত্যসঙ্গী—সংবাদ-পত্রের ইতিবৃত্ত—লোকশিক্ষার বাহন—সংবাদ-পত্রের গুরুত্ব, বর্তমানে সংবাদ-পত্রের জনপ্রিয়তা—জন-শিক্ষা—গণতন্ত্রের নির্ভীক প্রহরী—উপসংহার।

বর্তমানে পৃথিবীতে সংবাদ-পত্র আমাদের নিত্যসঙ্গী। সমাজ-জীবনে উহার প্রভাব অপরিসীম। মানুষের ক্রমবর্ধমান বহুমুখী চেতনার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পত্রের দায়িত্বও বৃদ্ধি পাইতেছে। সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞানের যত শ্রেষ্ঠ দান আছে, সংবাদ-পত্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সংবাদ-পত্রের সাহায্যে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র ঘরে বসিয়াও বিশ্বের সহিত পরিচিত হইতেছি। সংবাদ-পত্র দূরকে নিকটে আনিয়া বিশ্বকে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্ববাসী আমাদের প্রতিবেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমরাও একাত্মতা অনুভব করি, পৃথিবীর হৃৎস্পন্দন আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি। নিমেষ-মধ্যে আমাদের বিশ্ব-দর্শন ঘটে। পৃথিবীর লোক-চরিত্র, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—সব কিছুই যেন আমাদের নিত্য-পরিচিত। বর্তমান মানব-সমাজে সংবাদ-পত্রের ইহাই শ্রেষ্ঠ দান।

প্রাচীন কালে এক ধরণের লোক থাকিত, যাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহারা স্বচক্ষে দেখা বিভিন্ন দেশের গল্প বলিত এবং কৌতূহলবশতঃ শ্রোতারা তাহা শুনিত। মধ্যযুগেও এক ধরণের রাজকীয় সংবাদ-পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার সহিত গণ-জীবনের পরিচয় ছিল না। সংবাদ-পত্রের প্রথম প্রচার হয় চীনদেশে। কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পত্রের প্রচার আরম্ভ হইল। ভারতীয় উপমহাদেশে সংবাদ-পত্রের আবির্ভাব হয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আমলে। ইহা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীদের, বাংলার নব-শিক্ষিতদের এবং শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফল। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় আট হাজার সংবাদ-পত্র প্রচারিত, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত।

সংবাদ-পত্রের আবিষ্কারের পর ইহা দীর্ঘকাল কেবল শহর অঞ্চলের মুষ্টিমেয় পাঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের ফলে সংবাদ-পত্রের চাহিদা শহর অঞ্চলের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে লোক-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন সংবাদ পত্র এবং জনমত গঠনে ইহার প্রভাব অপরিসীম।

প্রতিদিন আমরা সংবাদ-পত্রের জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। সংবাদ-পত্রের অভাবে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করি এবং এক দিন সংবাদ-পত্র না পড়িলে মনে হয় বিশ্বের নিকট হইতে কতখানি পিছনে পড়িয়া রহিলাম। একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছিলেন, সংবাদ-পত্র পৃথিবীর দর্পণস্বরূপ। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমেই চলমান পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের কর্মব্যস্ততা প্রতিফলিত হয়। সংবাদ-পত্রের এই যে বিপুল জনপ্রিয়তা, ইহার কারণ সংবাদপত্র বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন পাঠকের নিকট সমভাবে আবেদন জানাইতে সক্ষম হইয়াছে। সংবাদ-পত্রে শুধু বিশ্বের সংবাদই থাকে না, সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধূলা, সবকিছুরই সমাবেশ থাকে। সংবাদ-পত্রের এক বড় অংশ জুড়িয়া আছে পণ্য, বৃত্তি, বিবাহাদির বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন সংবাদ-পত্রের অন্যতম বিশেষ প্রয়োজনীয় আকর্ষণ এবং সংবাদ-পত্রের আয়ের একটি পথ। কাজেই সকল প্রকার পাঠকের নিকটেই সংবাদ-পত্র আদরণীয়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ-পত্রের মূল্য বর্তমানে প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাতীয় জীবনে সংবাদ পত্রের প্রভাব অপরিসীম। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদের সহিত প্রধান প্রধান ঘটনার সুষ্ঠু সমালোচনা এবং ভাষ্যও প্রকাশিত হয়। এগুলিকে বলা হয় সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয় স্তম্ভের আলোচনা পাঠে জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা লাভ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ-পত্রের এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণ সংবাদ-পত্রের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতিকার করিবার পথ পায়। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমেই এখন জনমত গঠিত ও পরিচালিত হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ-পত্রের দায়িত্বও অনেকখানি। সংবাদ-পত্রকে বলা হইয়া থাকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সদাজাগ্রত নির্ভীক প্রহরী। উহা মুখ্যতঃ জন-সাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে এবং সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি প্রভৃতি সমস্যাগুলির সমাধানে জনগণকে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ-পত্র শুধুমাত্র সংবাদই বহন করে না, জনসাধারণের মধ্যে তাহার একটা শিক্ষা-বিস্তারেরও দিক্ আছে। সংবাদ-পত্র যদি অতিমাত্রায় সরকার-ঘেঁষা হয়, অথবা বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়, তবে জনসাধারণের পক্ষে উহা অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া থাকে। ইহার ফলে স্বাধীন মত প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। স্বাধীন নাগরিকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সরকারের নির্বিচার সমর্থন ও নির্বিচার বিরুদ্ধতা, দুই-ই দেশের পক্ষে সমভাবে অহিতকর। এই জন্য সংবাদ-পত্রকে সরকারী এবং দলীয় প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা দরকার। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। নিরপেক্ষতাই সংবাদ-পত্রের চরিত্র, নির্ভীকতাই ইহার আভিজাত্য এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণই ইহার পবিত্র দায়িত্ব। সংবাদ-পত্র জনসাধারণের বিচারশালা, নিত্য সচল লোক-সভা।

আমাদের দেশে সংবাদ-পত্রের আরও ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। লোকশিক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া আমাদের অল্পশিক্ষিতেরা যাহাতে সংবাদ-পত্রের গুরুত্ব

বিজ্ঞান আমাদের অভাব অনেকাংশে দূর করিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে, আমাদিগকে শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। বিবর্তনের পথে মানুষকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই মানুষের জীবনে বিজ্ঞান আজ বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ হইয়াছে। পৃথিবীর বিগত দুই শতাব্দীর ইতিহাস বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার ইতিহাস। বিজ্ঞান যথার্থই আমাদের নিত্যসঙ্গী।

সংবাদ-পত্রের প্রভাব

বিশ্ব-পরিচয়—আধুনিক জীবনের নিত্যসঙ্গী—সংবাদ-পত্রের ইতিবৃত্ত—লোকশিক্ষার বাহন—সংবাদ-পত্রের গুরুত্ব, বর্তমানে সংবাদ-পত্রের জনপ্রিয়তা—জন-শিক্ষা—গণতন্ত্রের নির্ভীক প্রহরী—উপসংহার।

বর্তমানে পৃথিবীতে সংবাদ-পত্র আমাদের নিত্যসঙ্গী। সমাজ-জীবনে উহার প্রভাব অপরিসীম। মানুষের ক্রমবর্ধমান বহুমুখী চেতনার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পত্রের দায়িত্বও বৃদ্ধি পাইতেছে। সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞানের যত শ্রেষ্ঠ দান আছে, সংবাদ-পত্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সংবাদ-পত্রের সাহায্যে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র ঘরে বসিয়াও বিশ্বের সহিত পরিচিত হইতেছি। সংবাদ-পত্র দূরকে নিকটে আনিয়া বিশ্বকে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্ববাসী আমাদের প্রতিবেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমরাও একাত্মতা অনুভব করি, পৃথিবীর হৃৎস্পন্দন আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি। নিমেষ-মধ্যে আমাদের বিশ্ব-দর্শন ঘটে। পৃথিবীর লোক-চরিত্র, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—সব কিছুই যেন আমাদের নিত্য-পরিচিত। বর্তমান মানব-সমাজে সংবাদ-পত্রের ইহাই শ্রেষ্ঠ দান।

প্রাচীন কালে এক ধরনের লোক থাকিত, যাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহারা স্বচক্ষে দেখা বিভিন্ন দেশের গল্প বলিত এবং কৌতূহলবশতঃ শ্রোতারা তাহা শুনিত। মধ্যযুগেও এক ধরনের রাজকীয় সংবাদ-পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার সহিত গণ-জীবনের পরিচয় ছিল না। সংবাদ-পত্রের প্রথম প্রচার হয় চীনদেশে। কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পত্রের প্রচার আরম্ভ হইল। ভারতীয় উপমহাদেশে সংবাদ-পত্রের আবির্ভাব হয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আমলে। ইহা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীদের, বাংলার নব-শিক্ষিতদের এবং শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফল। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় আট হাজার সংবাদ-পত্র প্রচারিত, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত।

সংবাদ-পত্রের আবিষ্কারের পর ইহা দীর্ঘকাল কেবল শহর অঞ্চলের মুষ্টিমেয় পাঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের ফলে সংবাদ-পত্রের চাহিদা শহর অঞ্চলের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে লোক-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন সংবাদপত্র এবং জনমত গঠনে ইহার প্রভাব অপরিসীম।

প্রতিদিন আমরা সংবাদ-পত্রের জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। সংবাদ-পত্রের অভাবে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করি এবং এক দিন সংবাদ-পত্র না পড়িলে মনে হয় বিশ্বের নিকট হইতে কতখানি পিছনে পড়িয়া রহিলাম। একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছিলেন, সংবাদ-পত্র পৃথিবীর দর্পণস্বরূপ। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমেই চলমান পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের কর্মব্যস্ততা প্রতিফলিত হয়। সংবাদ-পত্রের এই যে বিপুল জনপ্রিয়তা, ইহার কারণ সংবাদপত্র বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন পাঠকের নিকট সমভাবে আবেদন জানাইতে সক্ষম হইয়াছে। সংবাদ-পত্রে শুধু বিশ্বের সংবাদই থাকে না, সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধূলা, সবকিছুরই সমাবেশ থাকে। সংবাদ-পত্রের এক বড় অংশ জুড়িয়া আছে পণ্য, বৃত্তি, বিবাহাদির বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন সংবাদ-পত্রের অন্যতম বিশেষ প্রয়োজনীয় আকর্ষণ এবং সংবাদ-পত্রের আয়ের একটি পথ। কাজেই সকল প্রকার পাঠকের নিকটেই সংবাদ-পত্র আদরণীয়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ-পত্রের মূল্য বর্তমানে প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাতীয় জীবনে সংবাদ পত্রের প্রভাব অপরিসীম। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদের সহিত প্রধান প্রধান ঘটনার সুষ্ঠু সমালোচনা এবং ভাষ্যও প্রকাশিত হয়। এগুলিকে বলা হয় সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয় স্তম্ভের আলোচনা পাঠে জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা লাভ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ-পত্রের এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণ সংবাদ-পত্রের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতিকার করিবার পথ পায়। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমেই এখন জনমত গঠিত ও পরিচালিত হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ-পত্রের দায়িত্বও অনেকখানি। সংবাদ-পত্রকে বলা হইয়া থাকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সদাজাগ্রত নির্ভীক প্রহরী। উহা মুখ্যতঃ জন-সাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে এবং সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি প্রভৃতি সমস্যাগুলির সমাধানে জনগণকে সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ-পত্র শুধুমাত্র সংবাদই বহন করে না, জনসাধারণের মধ্যে তাহার একটা শিক্ষা-বিস্তারেরও দিক্ আছে। সংবাদ-পত্র যদি অতিমাত্রায় সরকার-ঘেঁষা হয়, অথবা বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়, তবে জনসাধারণের পক্ষে উহা অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া থাকে। ইহার ফলে স্বাধীন মত প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। স্বাধীন নাগরিকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সরকারের নির্বিচার সমর্থন ও নির্বিচার বিরুদ্ধতা, দুই-ই দেশের পক্ষে সমভাবে অহিতকর। এই জন্য সংবাদ-পত্রকে সরকারী এবং দলীয় প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা দরকার। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। নিরপেক্ষতাই সংবাদ-পত্রের চরিত্র, নির্ভীকতাই ইহার আভিজাত্য এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণই ইহার পবিত্র দায়িত্ব। সংবাদ-পত্র জনসাধারণের বিচারশালা, নিত্য সচল লোক-সভা।

আমাদের দেশে সংবাদ-পত্রের আরও ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। লোকশিক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া আমাদের অল্পশিক্ষিতেরা যাহাতে সংবাদ-পত্রের গুরুত্ব

বুঝিতে পারে, তাহার আশু ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ন্যায় সংবাদ-পত্র আমাদের দেশে যাহাতে কতিপয় ধনিক-গোষ্ঠীর কুক্ষিগত না হয়, রাষ্ট্র ও জাগ্রত জনগণের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

বৃত্তি-শিক্ষা

বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—প্রাচীন ভারতের বৃত্তিশিক্ষা—ইংরেজ আমলে বৃত্তিশিক্ষার পরিবর্তে কেরানীগিরি শিক্ষা—বৃত্তিশিক্ষায় দেশের উন্নতি, উচ্চস্তরের বৃত্তিশিক্ষা সীমাবদ্ধ—সর্বসাধারণের বৃত্তিশিক্ষা—স্বাধীন ভারতে বৃত্তিশিক্ষা-ব্যবস্থা—কারিগরি বিদ্যা সৃজনধর্মী, জীবনের মান-উন্নয়ন—কারিগরি বিদ্যার অনিষ্টকর প্রভাব—জাতির সুষম উন্নতির জন্য কারিগরি ও উচ্চশিক্ষা—উভয়েরই আবশ্যকতা।

আমাদের দেশে যে বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার অনেক কারণের মধ্যে আমাদের বৃত্তিশিক্ষার স্বল্পতাও অন্যতম। বৃত্তিশিক্ষা বলিতে বুঝায় কারিগরি শিক্ষা। বৃত্তিশিক্ষার অভাবে লক্ষ্যহীন ভাবে লোকে বেকার হইয়া ঘুরে। যে কোনও একটি বৃত্তি বা কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সে নিজের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের ঝড়-ঝাপটায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় বৃত্তি বা পেশা ছিল জাতিগত। বৃত্তি বংশানুক্রমিক ভাবে লোকে শিক্ষা করিত। এই অনুশীলনের ফলে কারিগরি বিদ্যায় অসামান্য উন্নতি ঘটিয়াছিল এবং অত্যাশ্চর্য শিল্প-সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহাতে লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইয়াছিল।

ইংরেজ আগমনের পর হইতে তাহাদের নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণের ফলে এদেশের শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় এদেশীয় হস্তশিল্প ধীরে ধীরে হটিতে লাগিল। দেড় শত বৎসর কাল আমরাও বিদেশীদের অধীনে থাকিয়া কেবল কেরানীগিরি বা দোকানদারির পন্থাই গ্রহণ করিয়াছি।

দেশের বৈষয়িক উন্নতি নির্ভর করে কারিগরি শিক্ষা-দীক্ষার উপর। সেই শিক্ষা যুগোপযোগী না হইলে দেশের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দেয় এবং দেশের উন্নতি ব্যাহত হয়। আমাদের পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি-শিক্ষার উপর অধিকতর মনোযোগ দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ডাক্তারি, মোক্তারি, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তিশিক্ষা বহু দিন হইতেই আছে, কিন্তু ইহা কেবল উচ্চ স্তরের লোকের পক্ষে গ্রহণীয়। আজকাল অনেক পলিটেকনিক স্কুল-কলেজে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহা মুষ্টিমেয় ছাত্রের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। দরিদ্র দেশের সকল ছাত্র ও সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা লাভ করা সম্ভবপর নয়।

দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে অল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিয়া কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, সেই জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

আমাদের দেশে কৃষিবিদ্যা ও কৃষিকার্যের আশানুরূপ উন্নতি এখনও সাধিত হয় নাই। ফলে কৃষকদের মধ্যেও আজকাল বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে। সেজন্য তাহাদের মধ্যে সহজসাধ্য শিল্প-শিক্ষার প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজন। ইহার ফলে তাহারা সহজেই নিজেদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করিয়া তুলিতে পারে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে তাহা মুখ্যতঃ দেশের শিল্প-সম্পদের উন্নতি সাধনের জন্য। এই শিল্প-ব্যবস্থার প্রসার হেতু দেশে দক্ষ শিল্পী ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমাদের সরকার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও দ্রুত প্রসারের জন্য বহুবিধ কারিগরি-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কারিগরি বিদ্যার প্রসার মানুষের সৃজন-ধর্মী প্রতিভার বিকাশের ও জীবনের মান উন্নয়ন করিবার পক্ষে প্রধান সহায়। ইহা জাতিকে সুস্থ, সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিবে।

কারিগরি বিদ্যা অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু ইহার ফলে দেশের লোকে অধিকতর বাস্তবতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে জাতির সাংস্কৃতিক জীবন ব্যাহত বা রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। এই কারিগরি বিদ্যালাভের ফলে যান্ত্রিকতা ও গতানুগতিকতার দ্বারা মানুষের উচ্চ চিন্তা ও সুকোমল বৃত্তির অনুশীলন স্তিমিত হয়। কাজেই কেবলমাত্র কারিগরি বিদ্যার মধ্যে শিক্ষা ও জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত নয়। সংস্কৃতির উন্নতির জন্য অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষাও আবশ্যক। জাতির সুষম অর্থকরী উন্নতির জন্য অর্থকরী কারিগরি-বিদ্যার সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিদ্যা (liberal arts) অনুশীলনেরও প্রয়োজন আছে, যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও চিত্তবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ লাভ হয়। এজন্য কতকগুলি বৃহৎ কারিগরি কলেজে (আই. আই. টি.) উহার ব্যবস্থা আছে।

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা

স্বাধীনতা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব—বর্তমান বিশ্বে শান্তি বিঘ্নিত—আণবিক অস্ত্রের প্রসার—আত্মরক্ষার জন্য সামরিক শিক্ষার একান্ত আবশ্যক—পরদেশ অধিকারের জন্য নয়—বহিঃশত্রু প্রতিরোধ ও জাতীয় সংহতি রক্ষা—সামরিক ও অসামরিক জাতি-বিভাগ—যুদ্ধরীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন—যান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক—স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর অনুপূরক সামরিক শিক্ষায় বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ জাতি গঠন—ভারতে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা—জাতীয় সমর-শিক্ষার্থী-বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা।

শতাব্দীর রক্তাপ্লুত সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পর ভারতবর্ষ পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়াছে, ভারত তাহার দীর্ঘ প্রত্যাশিত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নবলব্ধ স্বাধীনতা যেন ক্ষুণ্ণ ও বিপন্ন না হয়। নিজের মাতৃভূমিকে রক্ষা করা মানুষের জন্মগত অধিকার, পবিত্র দায়িত্ব ও মহোত্তম কর্তব্য।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সময় কূটনৈতিক চালে আমাদের দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা আবার যেন কোন ক্ষমতা-লোলুপ শক্তির কবলিত না হয়, সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি অটুট রাখার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হয়। কিন্তু বিশ্বশান্তি এখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এবং অন্যত্রও থাকিয়া থাকিয়া যুদ্ধ চলিতেছে। ভারত সীমান্তের শান্তিও প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বারা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা আছে। অনেক রাষ্ট্র বাহ্যতঃ সাধুর বেশে মুখে আণবিক বোমা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করার কথা বলিয়া ও নিরস্ত্রীকরণের সৎ সংকল্প জানাইয়া আণবিক বোমার পরীক্ষা ও অস্ত্র নির্মাণের কাজ আরও দ্রুতগতিতে চালাইতেছে।

এই অবস্থায় ভারতবর্ষ অসতর্ক থাকিলে এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত না থাকিলে তাহার স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। আত্মরক্ষার জন্যই সামরিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ অন্য দেশ আক্রমণ করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য সামরিক-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কখনও স্বীকার করে না। স্বদেশ ও বহির্বিশ্বে শান্তি বজায় রাখাই ভারতের কামনা। নবলব্ধ স্বাধীনতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে এক দিকে যেমন আভ্যন্তরীণ উন্নতি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তেমনই বহিঃশত্রু যাহাতে আমাদের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সামরিক শক্তিতে আমরা যাহাতে পিছাইয়া না পড়ি ও অন্যের আঘাত হইতে যাহাতে নিজের দেশকে রক্ষা করিতে পারি এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, এই উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। সামরিক শিক্ষা এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনেই অপরিহার্য। ১৯৬২, ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে চীন ও পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণের পরে ব্যাপক সামরিক শিক্ষার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সুদীর্ঘ সীমারেখা সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আমাদেরই।

ইংরেজ আমাদিগকে দুই শত বৎসর ধরিয়া নিরস্ত্র করিয়া শক্তিহীন ও সমরে অপটু করিয়া রাখিয়াছিল, অস্বাভাবিক অনৈতিহাসিক মিথ্যা তত্ত্ব প্রচারদ্বারা ভারতবাসীকে সামরিক ও অসামরিক জাতিতে বিভক্ত করিয়া ক্লীবত্বে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ভারতীয় জনশক্তির উত্তাল অভ্যুত্থানের এবং অসাধারণ নেতৃত্বশক্তি-সম্পন্ন রণকৌশলী সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ-হিন্দ্-বাহিনীর অসীম শৌর্য ও সাহসিকতার দুরন্ত সামরিক প্রয়াসে দুর্দান্ত ব্রিটিশ সিংহকেও পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া স্বদেশে পাড়ি দিতে হইল।

ভারতের সামরিক দক্ষতার উচ্চমান ও আত্মশক্তিতে আস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সামরিক-শিক্ষা গ্রহণ দেশের তরুণ সমাজের অবশ্য কর্তব্য। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তিতে

ভারতবাসী পৃথিবীর কোন জাতি হইতে নূান নয়। সামরিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের খ্যাতি বিগত দুই মহাযুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় সৈনিক পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের সমকক্ষ, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও করিতে পারে।

অনেকে বলেন, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক, মহাত্মা গান্ধীর দেশ ভারতবর্ষ অহিংসার বাণী পৃথিবীতে শুনাইয়াছে, সেই ভারতে সামরিক-শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন কি? কিন্তু অহিংসা দুর্বলের ধর্ম নয়, শক্তিমানের ধর্ম। বিশেষতঃ আজ পৃথিবীর সকল দেশই সামরিক ক্ষেত্রে অগ্রণী এবং আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সুসংহত। বর্তমান যুগে যুদ্ধের রীতি-নীতি ও উদ্দেশ্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানের যুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধের সম্মুখ-সমর বা পরিখা-যুদ্ধ নয় বা ব্লিৎসক্রিগও নয়। বর্তমান যুদ্ধ সম্পূর্ণ নূতন টেকনিক বা আঙ্গিকে পরিচালিত হয়। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এখনকার যুদ্ধ চলে, তন্মধ্যে বিমান-যুদ্ধের ভূমিকাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আণবিক বিজ্ঞানের অত্যুন্নতির ফলে আণবিক মারণাস্ত্র আবিষ্কার, গণিতের নির্ভুল হিসাবে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার বিস্ময়কর কৌশলে উহার নিখুঁত প্রয়োগ বর্তমান সমর-পদ্ধতির বিশেষত্ব।

এখন যুদ্ধ শুধু সৈন্যদলের লড়াই নয়, এখন যুদ্ধ জনযুদ্ধ, দেশের সমগ্র জনসাধারণও তাহাতে পরোক্ষভাবে জড়াইয়া পড়ে। এজন্য বর্তমান যুদ্ধকে সার্বিক বা সর্বগ্রাসী যুদ্ধ (total-war) বলা হয়। কাজেই দেশের সকলকেই বর্তমান যুগের যুদ্ধের রীতি-নীতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা একান্ত আবশ্যক। উপরন্তু, দেশ-রক্ষার জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন করিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশে ব্যয়বহুল বিশাল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী পোষণের চেয়ে দেশের সমস্ত যুবক-যুবতীকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে মুহূর্তের আহ্বানে বিরাট সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ-কার্যে নিয়োজিত করা চলে। এই কারণেও আমাদের দেশে সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রশ্ন উঠিয়াছে। স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের সঙ্গে যদি সামরিক শিক্ষাও লাভ করা যায়, তাহা হইলে দেশের দুর্যোগে ও বিপৎপাতের সময় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা কেবল স্বেচ্ছা-সৈনিকের দায়িত্ব পালন নয়, নিয়মিত সৈনিকের গুরুকর্তব্য ও দায়িত্ব-ভারও গ্রহণ করিয়া প্রতিরক্ষা-কার্যে অগ্রণী হইতে পারিবে।

এই সামরিক শিক্ষার দ্বারা শুধু যে দক্ষ সৈনিক হওয়া যায় তাহা নয়, ইহার দ্বারা দেহ-মনেরও অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হয়। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা লাভের সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্য-বোধ, স্বার্থত্যাগ ও পরসেবা প্রভৃতি মহৎ গুণের উৎকর্ষ হয়। পাশ্চাত্য দেশে সামরিক শক্তির প্রতীক জার্মানীর শেষ সম্রাট্ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম লিখিয়াছেন, "আমি জর্মনদের মধ্যে পৌরুষ অর্জনের উদ্দেশে সামরিক শিক্ষার উপর উচ্চ মূল্য দিয়াছি। বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি আমাদের দেশবাসীর শারীরিক ও নৈতিক উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়

(compulsory military service was the best school for physical and moral toughening for our people)। দেখ, আমাদের যুবকদের আমরা কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।" আমাদের দেশেও তেজস্বী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, "এমন মানুষ চাই যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ়, স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত হইবে, আর তাহাদের মধ্যে এমন একটি মন বাস করিবে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ। ...চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ। এই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ মানুষ গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সামরিক শিক্ষা। দেশময় বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করিলে সমগ্র জাতি এক মুহূর্তে সকল দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে।

দিল্লীতে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ, পুনার নিকটে খড়কভাসলা নামক স্থানে জাতীয় প্রতিরক্ষা আকাদেমীতে, দেরাদুন সামরিক কলেজে সামরিক শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। বিমান-বাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র আছে যোধপুর ও হায়দরাবাদে, নৌ-বাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র বোম্বাই, কোচিন ও বিশাখাপত্তনমে, যান্ত্রিক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র আছে আহ্‌মদনগরে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যে রাষ্ট্রীয় সৈনিক বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে ন্যাশনাল ক্যাডেট-কোর (N. C. C.) বা জাতীয় সমর-শিক্ষার্থী-বাহিনীতে ছেলেমেয়েরা সামরিক শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইতেছে। ইহার স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী আছে। জাতীয় সমর-শিক্ষার্থী-বাহিনী, শান্তির সময়ে জনহিতকর কার্যে ব্রতী থাকে, আবার দেশের সংকট কালে প্রতিরক্ষা-কার্যে আত্মনিয়োগ করে।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যদি নিষ্ঠার সহিত সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহা হইলে নিজেদের ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হইবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আমাদের তরুণ সমাজের অন্তরে দেশাত্মবোধ ও স্বজাতির প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত না হইলে সামরিক-শিক্ষা কখনই সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না।

বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা

(বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ/সভ্যতায় বিকাশে বিজ্ঞানের দান)

আদিম অবস্থা—আগুনের আবিষ্কার, বিজ্ঞানের জন্ম—সভ্যতার উষাকাল হইতে বিজ্ঞান মানবের সঙ্গী—বিগত দুই শতাব্দীতে বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার—বাষ্পীয় যন্ত্রযুগ, ইস্পাত, কয়লা, তেল আবিষ্কার—তড়িতের যুগে অভাবনীয় উন্নতি—রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উন্নতি—বাহ্য উন্নতির সঙ্গে মনোজগতের পরিবর্তন—পরমাণু শক্তির অধিকারী—আণবিক মারণাস্ত্র—বিজ্ঞানে সভ্যতার অত্যুন্নতি অথবা মৃত্যু-সৌধ—আশীর্বাদ না অভিশাপ।

সভ্যতার ইতিহাসে কখন হইতে বিজ্ঞানের সূত্রপাত তাহা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষ ছিল একান্ত অসহায়। এদিকে প্রকৃতির

করাল বদন, অন্য দিকে অতিকায় হিংস্র শ্বাপদকুল তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। সে যুগের মানুষের ইতিহাস, উদ্ধত প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামের ইতিহাস।

তারপরে মানুষের জীবনে এক পরম ক্ষণ দেখা দিল। মানুষ আগুনের সন্ধান পাইল। পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া মানুষ আগুন জ্বালাইতে শিখিল এবং সেই সঙ্গে সে শিখিল ধনুর্বিদ্যা ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিতে। মানুষের জীবন-ধারণের ও আত্মরক্ষার প্রথম প্রয়াস এই যুগে। মনে হয়, এই সময় হইতেই বিজ্ঞানের জন্ম এবং এই সময় হইতেই সভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ। ইহার কিছু কাল পরে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া কৃষিকার্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিল। এইভাবে মানুষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা রূপ লাভ করিল।

মানব-সভ্যতার উষাকাল হইতে বিজ্ঞান মানুষের অন্তরঙ্গ সহচর। অগ্নি আবিষ্কারের পর মানুষের সন্ধানী দৃষ্টি পড়িল প্রকৃতির বিচিত্র সম্পদের দিকে। ভূগর্ভ হইতে তামা, লোহা, টিন, সোনা, রূপা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। এইভাবে প্রস্তর-যুগ অতিক্রম করিয়া মানুষ তাম্র ও লৌহযুগে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিল। প্রাচীন ভারতের মহেন্-জো-দারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ এই যুগের সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই যুগে মানুষ নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং সুপরিকল্পিত গৃহ, নগর প্রভৃতি গড়িয়া তুলিবার কৌশলও আয়ত্ত করিয়াছে।

সভ্যতার আদিযুগে বিজ্ঞানের গতি ছিল মন্থর। কিন্তু বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর। মানব-সভ্যতাও সেই সঙ্গে দ্রুত পা ফেলিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞান মানুষকে আজ বিপুল বৈভবের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষ ইস্পাত নির্মাণের সহজ উপায় আবিষ্কার করিল। বাষ্পীয় যন্ত্র-শক্তির যুগ হইতে মানব-সভ্যতা আবার নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। রেলগাড়ী, স্টীমার প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। মানুষের মন্থরগতি জীবন দ্রুততা লাভ করিল। এই যুগে শুধু যানবাহনই নয়, তৈল ও কয়লা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অনেক নূতন বস্তুও আবিষ্কৃত হইল।

তারপর মানব-সভ্যতা ধীরে ধীরে বাষ্পীয় যুগ অতিক্রম করিয়া তড়িতের যুগে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজ্ঞানীর প্রতিভা বৈদ্যুতিক শক্তিকে করতলগত করিয়া পৃথিবীর রূপকেই পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী প্রভৃতি বৈদ্যুতিক শক্তির ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ঘরে বসিয়া আমরা দূরের মানুষের কণ্ঠস্বর টেলিফোনে শুনিতে পাই, দূরদেশের জীবন্ত দৃশ্যাবলী ও দূরের মানুষের কণ্ঠস্বর টেলিভিশনে একই সঙ্গে দেখি ও শুনি। বোতাম টিপিলেই বৈদ্যুতিক বাতিতে ঘরের অন্ধকার দূর হইয়া যায়। বৈদ্যুতিক পাখা দারুণ গ্রীষ্মের কষ্ট দূর করিতেছে।

বৈদ্যুতিক-শক্তি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মানুষকে আরাম দান করিতেছে। বর্তমান দুনিয়ায় বিদ্যুৎকে মানুষ ভৃত্যের মত খাটাইতেছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে মানব-সভ্যতা যেন কয়েক হাজার বৎসর আগাইয়া গিয়াছে।

পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের আবিষ্কারও বিস্ময়কর। আমরা ইহাদের কল্যাণে 'রঞ্জন-রশ্মি' ও 'রেডিয়াম' প্রভৃতি লাভ করিয়াছি। মানুষ এখন আর ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না। দুরারোগ্য ক্যান্সার, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা ও অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া চিকিৎসা-জগতে বিরাট বিপ্লব ঘটাইয়াছে। মৃত্যুকে মানুষ এখনও জয় করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু মৃত্যু-যন্ত্রণাকে সে বহুল পরিমাণে লাঘব করিয়াছে, জীবনী-শক্তিকে সে বহু গুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। রসায়নের উন্নতিতে নানা প্রসাধন-দ্রব্য, প্ল্যাস্টিক, নানা-রকম রঙ, নাইলন প্রভৃতি বর্তমান যুগের জীবন-যাত্রায় বিপ্লব ঘটাইয়াছে।

বিজ্ঞানের সহায়তায় কৃষি এবং শিল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ঊষর মরু শস্য শ্যামল হইয়াছে, বন্যা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, সমস্ত পৃথিবী সুন্দর ও বৃহৎ নগরীতে, সুন্দর ফুলে, ফলে, শস্যে সুগম রাজপথে শোভিত হইয়াছে। মানুষের চিন্তাধারা ও মনোজগতেও বিজ্ঞান অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কণাবাদ, পরমাণুবাদ, আপেক্ষিকত্তাবাদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক-সমাজের গতানুগতিক চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছে।

বিজ্ঞানের অতন্দ্র সাধনায় মানব-সভ্যতা আজ পারমাণবিক যুগের অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আজ তাহাকে অমিত বলের অধিকারী করিয়াছে। পরমাণু যুগের চরম ক্ষণে মানুষ মহাকাশে অভিযান শুরু করিয়া চন্দ্রলোকে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যে বিজ্ঞান মানব-কল্যাণে নব নব সৃষ্টির জন্য দায়ী, সেই বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি ভয়াবহ অস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞান আজ মানব-সভ্যতাকে এক জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। বিজ্ঞানের এই সর্বনাশা ধ্বংসশক্তি সত্ত্বেও বিজ্ঞান আমাদের জীবনে এক মহা আশীর্বাদ, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। বিজ্ঞান কল্যাণকর বা অকল্যাণকর দুই-ই হইতে পারে। এই কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভর করে বিজ্ঞান-শক্তির প্রয়োগের উপরে। সে দায়িত্ব মানুষের, বিজ্ঞানের নয়। কারণ, কল্যাণ-বোধ নিহিত আছে মানুষের মনে, বিজ্ঞানে নয়। মানুষ কল্যাণকামী হইলে বিজ্ঞানও কল্যাণপ্রদ হইবে। মানুষ বিপথগামী হইলে বিজ্ঞানই তাহাকে ধ্বংস করিবে। মানুষকেই স্থির করিতে হইবে সে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ চায়, না অভিশাপ চায়।

মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান

শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন মাতৃ-ভাষা—ইংরেজ আমলে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম—উহার কুফল—ইংরেজী অর্থোপার্জনের সহায়ক—মাতৃ-ভাষায় শিক্ষালাভের সুবিধা—মাতৃ-ভাষায় সর্বজনীন শিক্ষাদান—উচ্চতর বিজ্ঞানাদি শিক্ষাও মাতৃ-ভাষায় সম্ভব—ইংরেজীর প্রয়োজন—ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তারে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা—বাংলা ভাষার গৌরবিত মর্যাদা।

শিক্ষাই জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূল। শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন মাতৃ-ভাষা। মানুষের বোধশক্তি ও ধারণা-শক্তিকে মাতৃ-ভাষা যত সহজে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে, কোন বিদেশী ভাষা তাহা পারে না। অন্য ভাষা শিখিতে যে পরিশ্রম করিতে হয়, যে কৃত্রিম উপায়ে উহা শিখিতে হয়, মাতৃ-ভাষা শিক্ষায় তাহার প্রয়োজন হয় না। অক্ষর জ্ঞান হইবার পূর্বেই শিশুরা মাতৃ-ভাষায় কথা বলিতে পারে। এই মাতৃ-ভাষার সাহায্যেই বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়।

আমাদের মাতৃ-ভাষা বাংলা। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় আমাদের মাতৃ-ভাষায় শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইংরেজের অধীনে থাকায় আমাদের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছে। বিদেশী শাসন কায়েম রাখার অন্যতম প্রধান অস্ত্র বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

ইংরেজী লিখিতে ও পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা এদেশে খুবই কম। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সার্থক ও ব্যাপক না হওয়ার প্রধান কারণ আমরা আমাদের মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। পৃথিবীর সব সভ্য দেশেই শিক্ষার বাহন তাহাদের মাতৃ-ভাষা। এদেশে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে এখনও ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। যাঁহারা শুধু মাতৃ-ভাষায় শিক্ষিত, এমন ব্যক্তিরা সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকেন। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সঙ্গে ইংরেজী জানা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, একের সঙ্গে অপরের চিত্তের যোগ নাই, পারস্পরিক সহানুভূতি নাই।

এত দিন অর্থ-উপার্জনের প্রয়োজনেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করা হইয়াছে। রস-পিপাসার নিবৃত্তির জন্য যাঁহারা এই বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। যাঁহারা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্ত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না, যতখানি ছিল চাকুরির দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করার। ফলে সে শিক্ষায় জ্ঞানলাভের চেয়ে চাকুরী লাভের সহায়তাই হইয়াছে বেশি।

দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে এবং মনস্বী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রচেষ্টায় মাতৃ-ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা শুধু স্কুল পর্যায়ে, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়। মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানলাভের জন্য বিদেশী ভাষার চর্চা করাও অবশ্য বাঞ্ছনীয়। বিদেশী ভাষার সাহায্যে বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন

দেশ স্বাধীন হইবার পরে আমরা এখনও ইংরেজী ভাষাকেই উচ্চ শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করিতেছি। অথচ আমাদের ভাষা অত্যন্ত উন্নত এবং ইহাতে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা আছে। বর্তমানে বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল প্রকার গ্রন্থ রচিত হইতেছে। আজ জাতিকে সার্থকভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে, সর্বসাধারণ যাহাতে শিক্ষার সুফল ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে গেলে, মাতৃ-ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই একমাত্র পন্থা।

জাতিকে আত্ম-নির্ভর করিয়া তুলিতে হইলে মাতৃ-ভাষায় অনুশীলন করা একান্ত কর্তব্য। দেশের নিরক্ষরতা দূর করিতে হইলে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অবশ্য আন্তঃরাজ্য বা বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য এবং উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরেজীর মত একটি আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নিশ্চয়ই স্বীকার্য।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয় নয়। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত যে ভাষায় রচিত, সেই ভাষাকে অবহেলা করা আত্ম-অবমাননারই নামান্তর। পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরা রাজ্যে ও আসামের কাছাড় জেলায় বাংলা ভাষা সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বাংলাদেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। সেখানে আইন প্রণয়নে, শাসনকার্যে এবং মুদ্রা, নোট, ডাক-টিকিট প্রভৃতিতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে। মাতৃ-ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে দেশের সকল লোকই এই শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হইবেন এবং জাতির শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও অধিকতর উন্নতি ঘটিবে। বাংলাভাষার ন্যায় উন্নত ও শক্তিশালী ভাষাকে সে মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করা শুধু লজ্জাকর নয়, তাহা সমগ্র জাতির পক্ষে অকল্যাণকরও বটে।

খাদ্যসমস্যা ও নিয়ন্ত্রণ

(দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও উহার প্রতিকার)

খাদ্যাভাবের কারণ—কৃষির অনুন্নতি ও উহার কারণ—প্রতিকারের ব্যবস্থা—সরকারের খাদ্যনীতি—বণ্টন, রেশনিং—সমাধান—আবাদ বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির উন্নতি, জমির অধিকার, ন্যায্যমূল্যে বীজ ও সার—সেচ—সমবায় প্রথায় চাষ ও বিক্রয়।

স্বাধীনতা লাভ করিবার ত্রিশ বৎসর পরেও খাদ্য-সমস্যা আগের মতই প্রধান সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। আমাদের খাদ্য সমস্যার পশ্চাতে নানা কারণ বর্তমান। প্রথমতঃ, ইংরেজ আমলে এই সমস্যার উদ্ভবের প্রধান কারণগুলির একটি কারণ ছিল, বিদেশী শাসক-গোষ্ঠী আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শান্তি ও সুস্থিরতাকে তাহাদের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়াই মনে করিত। তাই তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের অর্ধাশনে, অনশনে ও অশিক্ষার

অন্ধকারে রাখিয়াছিল। আমাদের দেশের ধন-সম্পদ্ তাহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই ব্যবহৃত হইত।

কিন্তু স্বাধীনতার পরে এখনও আমাদের কেন খাদ্য-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই, তাহাই চিন্তার বিষয়। আমাদের আর্থিক জীবনের প্রধান ভিত্তি কৃষি। আমাদের জীবন-যাত্রা মুখ্যতঃ এই কৃষির উপরই নির্ভর করে। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতিও দ্রুত তালে না চলায় খাদ্য-সমস্যা দেখা দেয়।

আমাদের খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতা ও উৎপাদন-ব্যবস্থার ত্রুটির ফলেই আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয় নাই। দেশে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই হারে চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই এবং কৃষির উন্নতি যথোপযুক্ত হয় নাই। মান্ধাতার আমলের কৃষিপদ্ধতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ড, দুর্বল কৃষক ও হাল-বলদ, সেচ-ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য ও কৃষকের দারিদ্র্য ইত্যাদি কৃষির উন্নতির অন্তরায়। বড় বড় মুনাফা-লোভী ও কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের লোলুপতাও বর্তমান খাদ্য-সমস্যার এক প্রধান কারণ। তাহারা স্বল্পমূল্যে শস্যাদি ক্রয় ও গোলাজাত করিয়া অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করে। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির ফলেও দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বাড়িয়াছে। বড় বড় পরিকল্পনার জন্য সরকার প্রচুর কাগজের নোট বাজারে ছাড়ায় এক টাকার মূল্য ৩৫ পয়সায় নামিয়াছে। ইহা ছাড়া চাহিদা অনুযায়ী যোগান কম। বিগত পাকিস্তানের যুদ্ধে ও পরবর্তী বাংলা দেশের সাহায্যের কারণে আমাদের অনেক ঘাটতি হইয়াছে। অধুনা বিদেশ হইতে আশানুরূপ খাদ্যশস্যও আমদানী করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই দ্রব্যমূল্য এত বাড়িয়াছে। ইহার ফলে এবং সাধারণ লোকের অনুরূপ কার্য-ক্ষমতা না থাকায় অধিকাংশ লোককে অন্নকষ্টে জীবন যাপন করিতে হয়।

আশার কথা, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কয়েকটি রাজ্যে কৃষির অসামান্য উন্নতির ফলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতেছে। ফলে খাদ্য-সম্পদের ঘাটতি মিটাইবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে চাউল, গম প্রভৃতি আনিবার প্রয়োজন কমিয়াছে।

সরকার দেশের খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য কমাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ফুড কর্পোরেশনের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ক্রয় ও মজুত করিয়া এবং বণ্টন ও পরিবহণের বন্দোবস্ত করিয়া খাদ্য-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। খাদ্য-বণ্টনের অসমতা দূর করিবার জন্য তাঁহারা খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের দায়িত্বে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে যাহাতে সকলেই চাউল, গম ইত্যাদি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাকে ইংরেজীতে বলে 'রেশনিং' (Rationing)। এই ব্যবস্থার দ্বারা অসাধু ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লাভের লোভকে কিছুটা সংযত করা যায়। খাদ্যদ্রব্য ন্যায্য মূল্যে যাহাতে সকলে পাইতে পারে, তাহার জন্য কতকগুলি ন্যায্য-মূল্যের দোকান খোলা হইয়াছে। খাদ্যসঙ্কট-কালে এই ধরণের ব্যবস্থা দেশবাসীর পক্ষে হিতকর, সন্দেহ নাই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় খাদ্য-সমস্যার সমাধান বিশেষ প্রয়োজন।

এজন্য সর্বপ্রথম দেশের কৃষি-ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এজন্য সরকার 'সবুজ বিপ্লবের' উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। কাজেই যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফসল উৎপাদন বাড়ানো যায়, সেজন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ এবং সেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক। কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগও প্রয়োজন। কৃষকেরা যাহাতে ন্যায্য ভাবে জমির অধিকার পাইতে পারে, এবং যাহাতে ন্যায্য মূল্যে বীজ-ধান ও সার প্রভৃতি পাইতে পারে, সেজন্য আমাদের জাতীয় সরকারকে তৎপর হইতে হইবে। সমবায়-প্রথায় জমির চাষ ও ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া কৃষি ও কৃষকের উন্নতির সাধন করা সম্ভবপর। কৃষি-শিক্ষার মাধ্যমে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়া কোন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের দ্রুত প্রসারের প্রয়োজন আছে, তেমনিই কৃষি-ব্যবস্থায় উন্নতির প্রয়োজনও অবশ্য স্বীকার্য। কৃষির শিল্পীকরণ উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

মজুতদারি, মুনাফাবাজী ও কালোবাজারি কঠোর হস্তে দমন করিলে এই সমস্যার প্রতিকার অনেকখানি সম্ভবপর হয়। উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ এবং বণ্টন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ফলেও দ্রব্যমূল্য নিম্নগামী হয়।

বাংলার কুটীর-শিল্প

সূচনা—যন্ত্রযুগের পূর্বে বস্ত্র-শিল্পের অসাধারণ উন্নতি—ইংরেজের অত্যাচারে ধ্বংস—রেশম-শিল্প—পিতল কাঁসার বাসন ইত্যাদি—মৃৎ-শিল্প—অন্যান্য শিল্প—কুটীর-শিল্পের অবনতিতে বেকার-বৃদ্ধি—কুটীর-শিল্প প্রসারে জাপানী দৃষ্টান্ত—কুটীর-শিল্প উজ্জীবনে সরকারী প্রয়াস।

বাংলা দেশের বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। এই গ্রাম-জীবনকে কেন্দ্র করেই একদিন বাঙালীর কুটীর-শিল্প গড়ে উঠেছিল। যন্ত্র-শিল্পের আবিষ্কারের আগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কুটীর-শিল্প বর্তমান ছিল। সাধারণ পল্লীবাসী (বা নগরবাসী) নিজের হাতে যে শিল্পের চর্চা করে, সাধারণতঃ তাকেই কুটীর-শিল্প বলে।

যন্ত্রের আবির্ভাবের আগে বাংলার গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। বাংলার কুটীর-শিল্প বাংলার গ্রামবাসীদের হাতেই সার্থকতা লাভ করে। এই শিল্পজাত দ্রব্যাদি একদিন সারা বিশ্বে সমাদর লাভ করে। প্রাচীন কাল হতেই বস্ত্র-শিল্প বিখ্যাত ছিল। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুন্দর শাড়ী-কাপড় তৈরী হতো। বাংলার 'মসলিন' এক দিন বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিল। ইংরেজরাই এই বস্ত্র-শিল্পকে নির্মম অত্যাচার করে সমূলে ধ্বংস করে। কলে-তৈরি মোটা বিলাতী কাপড় চালু করার জন্য ইংরেজগণ এদেশের দক্ষ তাঁতিদের সর্বনাশ সাধন করেছে। এখনও এদেশে শান্তিপুরী, ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা, টাঙ্গাইল, ঢাকাই প্রভৃতি নানা জাতীয় সুন্দর তাঁতের শাড়ী তৈরি হয়। বর্তমানে সুরুচি ও সৌষ্ঠব-সম্মত নূতন নূতন বিচিত্র নক্সার টাঙ্গাইল ও ধনেখালি শাড়ী তৈরি হয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ

সমাদর লাভ করেছে। আগেকার দিনে বাংলা দেশের মেয়েরা চরকায় মিহি সূতো কাটতে পারতেন এবং সেই চরকা-কাটা সূতোয় কাপড় তৈরি হত। বর্তমানে খাদি আন্দোলনের দ্বারা চরকায় সূতো কাটা এবং তাঁতশিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলেছে। বহু-বিচিত্র শাড়ী ছাড়াও তাঁত-শিল্পের মধ্যে গায়ের চাদর, গামছা, তোয়ালে, লুঙ্গি, বেড-কভার, পর্দার কাপড়, ঝাড়ন, টেবিল-ক্লথ প্রভৃতি বহু প্রকার প্রয়োজনীয় সৌখিন দ্রব্য তাঁতেই এখন তৈরি হয়।

সূতোর কাপড়ের মতো রেশম-শিল্পেও মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং এখনও সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। তবে কৃত্রিম ও সস্তা রেশম বস্ত্রের আমদানী হওয়ায় বাংলার রেশম-শিল্পকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়।

পিতল ও কাঁসার বাসন-কোসনের প্রধান শিল্পকেন্দ্র বহরমপুর, খাগড়া, নবদ্বীপ, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল। এই শিল্পটি এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত না হলেও অ্যালুমিনিয়াম, এনামেল, চিনামাটির এবং স্টেনলেস স্টিলের বাসনই আজকাল ঘরে ঘরে প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলার মৃৎ-শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পের পুতুল, মূর্তি প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত। আমাদের লৌহকারেরা দা, কুড়ুল, বটি, কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, লাঙ্গলের ফলা, বল্লম বর্শা, জাঁতি প্রভৃতি তৈরি করে থাকেন। বস্ত্র-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, শঙ্খ-শিল্প, কাগজ-শিল্প, বাঁশ ও মাদুর-শিল্প, অলঙ্কার-শিল্প, চর্ম-শিল্প, সূচি-শিল্প, প্রসাধন দ্রব্য, মিষ্টান্ন-শিল্প, পুষ্প-শিল্প প্রভৃতি কুটীর-শিল্পে বাংলা বিশেষ উন্নত। বালুচরের জমকালো শাড়ী, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের তৈরি নানা সৌখীন জিনিস উল্লেখযোগ্য।

কল-কারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্প ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের কারিগর ও শিল্পীরা বেকার হয়ে পড়ছে। বাংলা দেশের তীব্র বেকার-সমস্যা যে অনেকাংশেই কুটীর-শিল্পের অবনতির ফল তাতে সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। কারণ শতকরা প্রায় সত্তর জন লোক কৃষিজীবী। তারা বছরের মধ্যে চার-ছয় মাস মাঠের কাজ করে আর বাকি মাসগুলো তারা বেকার হয়ে থাকে কুটীর-শিল্পের অবনতির ফলে। বেকার-সমস্যা দূর করতে হলে এই কৃষিজীবীদের যেমন কৃষিকর্মের সুবিধা দিতে হবে, তেমনই কুটীর-শিল্প চালু করেও তাদের জীবিকার্জনের নূতন পথ খুলে দিতে হবে। আজ যন্ত্রের যুগে আর আগের মতো হাতের কাজ দিয়েই কেবল চলতে পারে না। এ ব্যাপারে জাপানের কুটীর-শিল্পের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। জাপানে ধনী শিল্পপতিরা শিল্পীদের ঘরে ঘরে ছোট ছোট যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছেন। শিল্পীরা অল্প সময়ের মধ্যে বেশী সংখ্যায় শিল্প-দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেয় এবং তার জন্য তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পায়। এই ভাবে বড় ব্যবসায়ীরাও লাভবান হচ্ছেন, আবার ক্ষুদ্র শিল্পীদেরও অন্নের সংস্থান হচ্ছে।

আমাদের জাতীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে দেশের অনেক লুপ্তপ্রায় কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার হয়েছে। কুটীর-শিল্পীরা যাতে মূলধন ও কাঁচা মাল সহজে পেতে পারেন, সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বাজারে যাতে কুটীর-জাত পণ্যদ্রব্য ন্যায্য দামে বিক্রি হতে পারে, সেজন্য সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতির মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া সরকারের কর্তব্য।

দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটীর-শিল্পের ভূমিকা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার পর ভারতের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ-শিল্পের উন্নতির জন্য সমবায়-প্রথায় তাঁত-শিল্প, রেশম-শিল্প, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্প, নারিকেল ছোবড়া-শিল্প, হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট ও ক্ষুদ্র শিল্পাদি উন্নয়নের কার্য শুরু হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীর-শিল্পে ঋণদান প্রভৃতি প্রবর্তন করা হয়। বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণ ও রিবেট প্রথা প্রবর্তিত হয়। ক্ষুদ্র শহর ও গ্রামে কুটীর-শিল্পের প্রসার ও গ্রামীণ শিল্পীদের সমবায়-প্রথার প্রচলন করা হয়। এই পরিকল্পনার ফলে ধান ভানা, ঘানির তৈল, ইক্ষু-গুড় ও তাল-গুড় করা, হাতে কাগজ তৈরি করা, চামড়া-শোধন, মৌমাছি পালন, সাবান, সূতো তৈরি করা ইত্যাদি শিল্পগুলিকে উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো হয়। তা ছাড়া, সরকার দেশের নানা স্থানে অনেক বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করেও কুটীর-শিল্পের প্রসারে প্রেরণা দিচ্ছেন।

সরকার ও দেশবাসীর সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ লাভ করলে কুটীর-শিল্প পুনরুজ্জীবিত হতে পারে এবং তা দ্বারা বেকার-সমস্যা সমাধানের সহায়তাও হতে পারে। সৌখীন শিল্পদ্রব্যের উন্নতি সাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিদেশে রপ্তানি দ্বারা মূল্যবান্ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনও হতে পারে।

মানুষের চন্দ্রলোক (বা মহাকাশ) অভিযান

সূচনা—চন্দ্রে অবতরণ—বিরাট পরিকল্পনা—বিভিন্ন মহড়া—প্রত্যাবর্তন—সমালোচনা—প্রযুক্তি-বিদ্যায় সাফল্য—পরবর্তী অভিযান : রুশ ও মার্কিনী।

মাত্র ২২ বছর আগে মহাকাশ যুগ সুরু হয়েছিল। এই কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মহাকাশ-যুগ আরম্ভ হবার ১৫ বছর ৯ মাস ১৬ দিন পর এই ঐতিহাসিক ব্যাপারটি ঘটে। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েত রাশিয়া স্পুটনিক-১ মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে। সেদিন থেকে এক নূতন যুগের আরম্ভ। ১৯৬১র ১২ই এপ্রিল রাশিয়ার ইউরী গ্যাগারিন সর্বপ্রথম পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করে প্রথম মহাকাশচারীর গৌরব অর্জন করেন। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে মহাকাশ অভিযানের অবিরাম প্রয়াস রাশিয়া ও আমেরিকায় চলেছে। অবশেষে গত ২১শে জুলাই ১৯৬৯ সালে দু'জন মার্কিন মহাকাশযাত্রী চন্দ্রলোকে পদার্পণ করে অসাধ্য সাধন করেছেন। এই দু'জন অভিযাত্রী যে ছোট একটি মহাকাশ-যানে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন তার নাম 'ঈগল'। ২১ ঘণ্টা ৩৫ মিঃ

চন্দ্রপৃষ্ঠে অতিবাহিত করে মূল অ্যাপোলো-১১ নামে যে মহাকাশ যানে ফ্লোরিডার কেপ-কেনেডি থেকে যাত্রা করে তাঁরা চন্দ্রলোকে পৌঁছেছেন, সেই যানেই আবার উঠে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। এই মূল যানটির নাম 'কলাম্বিয়া'। যাতায়াতে লেগেছে আট দিন। নীল এ. আর্মস্ট্রং এবং এডুইন ই. অ্যালড্রিন তাঁদের 'ঈগল'-এ চেপে চাঁদের বুকে নেমে সেখানে প্রায় ১২ ঘণ্টা কাটিয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। মাইকেল কলিন্স অ্যাপোলো-১১ মহাকাশ-যান 'কলাম্বিয়া' চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। যে কয় ঘণ্টা 'ঈগল' চাঁদের বুকে নেমে 'কলাম্বিয়া' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, কলিন্স সে সময় চাঁদের চার পাশে বৃত্তাকারে ঘুরেছেন।

অ্যাপোলো ১১-র তিন বীর মহাকাশচারী ২৪শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি ৯-৫০ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরের নির্দিষ্ট অবতরণ-স্থানে মাত্র ৪০০ কিলোমিটার দূরে প্রতি সেকেণ্ডে ১০,৮৬০ মিটার বেগে চলে নিরাপদে নেমে এসে তাদের আট দিনের ঐতিহাসিক অভিযান সম্পন্ন করেন।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যে পরিমাণ ধন জন উপকরণ সংগ্রহ ও কাজে লাগানো হয়েছে, সামরিক ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রেই তা করতে হয় নি। বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, পরিচালক, শ্রমিক ও করণিক, চার লাখেরও বেশী লোক এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য খেটেছে। আর অ্যাপোলো-১১ মহাকাশ যান ও স্যাটার্ন-৫ রকেটটিতে ত্রিশ লাখেরও বেশী যন্ত্রাংশ রয়েছে।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী যাত্রীবিহীন মহাকাশ-যানও মহাশূন্যে ছেড়েছেন।

চন্দ্রাভিযানের জন্য অ্যাপোলো-জাতীয় যে-সকল মহাকাশ যান নির্মিত হয়েছিল, মহাকাশে প্রেরণ করে তাদের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা সম্পন্ন হয় চন্দ্রে পদার্পণের মহড়া।
হয়েছিল। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে

এই পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ সফলতার জন্য ২৪,০০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। এই বিপুল ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে খাস মার্কিন দেশেও মতবিরোধ হয়েছে। পদার্থবিদ্যায় নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত স্টানফোর্ড ফেলিকস্ ব্লক এই অভিযান মূল্যায়ণ করে বলেছেন,—"বিজ্ঞানের উন্নতি ডলার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। অভিযানের সুফল এমন আশাতীত হতে পারে যার তুলনায় এই ব্যয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হবে।"

১৯৬৯ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল মহাকাশ পাড়ি দিয়ে মার্কিন নভশ্চর তিন বীরের মধ্যে চার্লস্ কনরাড ও অ্যালান বিন অ্যাপোলো ১২-এর চান্দ্র ভেলা ইনট্রিপিড থেকে চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেন। চাঁদে মানুষের এই দ্বিতীয় বার পদার্পণ। অ্যাপোলো ১২-এর মূল মহাকাশ-যান ইয়াঙ্কি ক্লিপার তিন বিজয়ী নভশ্চরকে নিয়ে ২৫শে নভেম্বর যাত্রার ১১ দিন পরে পৃথিবীতে ফিরে আসে। ১৪ই নভেম্বর এই মহাকাশ-অভিযান শুরু হয়েছিল। এবারের চন্দ্র বিজয় অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যদ্বারা গবেষণায় সাহায্য করে।

এরপর ১৯৭০ সালে অ্যাপোলো ১৩-এর অভিযান চলে। কিন্তু চাঁদে পৌছেও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য একে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এদিকে এই বৎসরই রাশিয়ার যাত্রীবিহীন স্বয়ংচালিত মহাকাশ-যান লুনা-১৭ চাঁদে অবতরণ করে এবং উহা হতে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি 'লুনাখোদ' বের হয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালায় এবং চাঁদের মাটি ইত্যাদি নিয়ে ফিরে আসে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৭১ সালে লুনা-১৮ চাঁদের পাহাড়ে যেয়ে ভেঙে পড়ে।

১৯৭১ সালে অ্যাপোলো-১৫ এক বিস্ময়কর চন্দ্রাভিযানের সাফল্য লাভ করেছে। ২৬শে জুলাই কেপ কেনেডি মহাকাশ-কেন্দ্র হতে যাত্রা করে ৩০শে জুলাই স্কট্‌ ও আরউইন 'ফকন' ভেলায় চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। এবার এঁরা ৬৭ ঘণ্টা 'ফকন'-বাহিত চাঁদের মোটর গাড়িতে চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘুরে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেন। এই সময় মূল যান 'এণ্ডেভার' চন্দ্রকক্ষ প্রদক্ষিণ করে। ৩রা আগস্ট স্কট্‌ ও আরউইন মূল যানে ফিরে আসেন। এবারকার অভিযান বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ।

১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে স্কাইল্যাব-এর মহাকাশচারীরা যথাক্রমে প্রায় দুই মাস ও তিন মাস মহাকাশে অবস্থান করে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এর পরেও মহাকাশচারীদের দীর্ঘতর অবস্থিতি মহাকাশে ঘটেছে এবং কোহুতক ধূমকেতুর ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য সৌরমণ্ডলীর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সুদূরের শুক্রগ্রহেও স্বয়ংচালিত রুশ মহাকাশ-যান গবেষণা-কার্য পরিচালনা করে। সোভিয়েট মহাকাশচারী ভাডিমির লিয়াকফ ও ভ্যালেরি রুমিন প্রায় ছ'মাস মহাকাশে কাটিয়ে ১৯৭৯ সালের ১৩ই আগস্ট মহাকাশ-যান সলয়ুত-৬ ও সয়ুজ-৩৪ হতে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। মহাকাশে এটিই মানুষের দীর্ঘতম অবস্থিতি। এই অভিযানেও অনেক রকম আবিষ্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনা ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ নিচ্ছে।

স্কাইল্যাব মহাকাশে গবেষণা কার্যের জন্য একটি যান্ত্রিক লেবরেটরি। এর ওজন ছিল ৮০ টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই উপগ্রহ ১৯৭৫ সালে মহাকাশে উত্থিত হয়। ১৯৭৯ সালে এটি মানুষের বুকে আতঙ্ক জাগিয়ে ভারত মহাসাগরে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। বর্তমান পৃথিবীতে রুশিয়ার ৪৫৬৩টি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫৩৩টি এবং অন্যান্য দেশের ৭৮টি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে ভারতের 'আর্যভট্ট' ও 'ভাস্কর'ও আছে। এরা অবশেষে উল্কা-পিণ্ডের মতো পৃথিবীতে পড়তে থাকবে। মানুষের স্বস্তি ও নিরাপত্তার এ-ও এক উপদ্রব হয়ে উঠবে।

১৯৭৯ সালের আগস্টে মার্কিন মহাকাশ-যান 'পাইওনিয়র' ৬ বৎসরব্যাপী শনিগ্রহ পরিক্রমার আধা-সফলতা লাভ করে।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন

ভারতে শিল্প-বিপ্লব—শিল্পোন্নয়নের প্রথম প্রেরণা স্বদেশী আন্দোলন—স্বাধীনতার পর শিল্পোন্নয়নের দ্বিতীয় প্রেরণা ও দ্রুত অগ্রগতি—লৌহ ও ইস্পাত কারখানা—প্রধান প্রধান শিল্পোন্নয়ন—উপসংহার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে নব-আবিষ্কৃত বাষ্পশক্তির যান্ত্রিক প্রয়োগের ফলে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়। ইহার ফলে রেলগাড়ী, জাহাজ ও কারখানার কলগুলি বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত হইয়া শিল্প উৎপাদনে যুগান্তর আনে। ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রথমে বাংলাদেশে ও পরে বোম্বাই প্রদেশে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। কলিকাতার আশেপাশে চটকল স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা হইতে রেলপথ বিস্তৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দী হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর ভারতের শিল্পোন্নয়ন সাধিত হইয়াছে পরিকল্পনাহীন-ভাবে এবং বিদেশী সরকারের আওতায়, প্রধানতঃ ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের দ্বারা।

ভারতবর্ষে ভারতীয়দের শিল্পোন্নয়নের সর্বপ্রথম বড় প্রেরণা দিয়াছে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনের কালে জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯০৭) এবং বোম্বাই প্রদেশে বহু কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়া স্বদেশী বস্ত্র সরবরাহ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারত-সরকারের সংরক্ষণ নীতির ফলে বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, চিনি ও সিমেণ্টের উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা লাভের পরই ভারতের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে জোয়ার আসিল। ১৯৩৮ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট রূপে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। ইহাই পরবর্তী স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের কাঠামো।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর শিল্পোন্নয়ন জাতীয় গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। বিরাট পরিকল্পনার সহায়তায় ভারতের শিল্পোন্নয়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং এই কৃষিপ্রধান দেশে প্রকৃত শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে সরকারি ও বে-সরকারি প্রয়াসে শিল্পোন্নয়ন ব্যাপকভাবে ও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। মিলিং মেসিন, সারফেস গ্রাইণ্ডার, ক্যাপস্টান লেদের মত যন্ত্রপাতি, সেলাই কলের সূঁচ, ইন্‌জেকশনের সূঁচ, ডিজেল রোলার, মোটর-গাড়ীর ক্লাচ, ব্রেকের টুকরা অংশ, প্লাস্টিক, কৃত্রিম পাথর প্রভৃতি এবং আরও নূতন জিনিষ ভারতে প্রস্তুত হইতে থাকে। সিমেণ্ট, চিনি, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রভৃতি এই সময় হইতে দ্রুত উন্নতির পথে চলে।

উড়িষ্যার রৌরকেল্লায়, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে, মধ্যপ্রদেশের ভিলাইয়ে, বিহারের বোকারোতে ইস্পাত তৈরির বিশাল বিশাল কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। জামসেদপুরের টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী এবং কুলটির ইণ্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল

কোম্পানীকে সরকারী উদ্যোগে সম্প্রসারিত করিয়া ইস্পাত উৎপাদন দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইস্পাত দেশের এক বিশেষ প্রয়োজনীয় সম্পদ্ এবং ইহা সম্পদ্ সৃষ্টি করিবারও সম্পদ্। সেইজন্য ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি ভারতের শিল্পোন্নয়নকে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিবে।

চিত্তরঞ্জনে রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানায় এবং টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ও লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে এত রেল-ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে যে, বিদেশেও রপ্তানি সম্ভবপর হইয়াছে। বিশাখাপত্তনমে সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি এবং বাঙ্গালোর হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌টে এরোপ্লেন তৈরি হইতেছে। রাঁচির নিকটস্থ হাতিয়ায় ভারী শিল্পের যন্ত্রাদি তৈরির কারখানা, ভূপালে ভারী রাসায়নিক শিল্প কারখানা, রেণুকুটে এ্যালুমিনিয়াম কারখানা, পুনার নিকটে পিম্‌প্রিতে পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্টোমাইসিন তৈরির কারখানা, হৃষীকেশে এন্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরির কারখানা, সিন্ধ্রিতে সার তৈরির কারখানা, এদেশের শিল্পোন্নয়নের বিশেষ অগ্রগতির পরিচায়ক। ইহা ছাড়া মোটর-গাড়ী তৈরির কারখানা, বিভিন্ন স্থানের পেট্রোলিয়ম শোধন কারখানা, চিত্তরঞ্জনের হিন্দুস্থান মেসিনটুল্‌সের লৌহ ও ইস্পাতের বড় রকমের ঢালাই ছাঁচ ও তৎসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা, রেল-ওয়াগন তৈরির কারখানা উল্লেখযোগ্য। নূতন সমুদ্রবন্দর হল্‌দিয়ায় বিরাট তৈল-শোধনাগার, সার কারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় পূর্বাঞ্চলে শিল্পপ্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা বাড়িয়াছে। বস্ত্র-শিল্প, কাগজ-শিল্প ও চিনি-শিল্পে ভারতের অগ্রগতি সবচেয়ে বেশি। এই প্রসঙ্গে ট্রম্বেতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে এবং রণশিল্পের মধ্যে ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে ভারতের অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সালে ১৮ই মে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ভারত পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হইয়াছে। এই শক্তি শান্তিপূর্ণ কার্যে ভারত ব্যবহার করিবার সংকল্প করিয়াছে।

ভারী যন্ত্র-নির্মাণ পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে ভারত ইস্পাত-কারখানা ও ভারী রাসায়নিক দ্রব্য-শিল্পে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি পাইয়াছে। সূতি বস্ত্রশিল্পে, বাই-সাইকেল শিল্পে, মোটরগাড়ি শিল্পে, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতির বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, রেয়ন শিল্পে এবং সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, রসায়ন ও সিমেণ্ট শিল্পে যেরূপ উৎপাদন বাড়িয়াছে, সেইরূপ প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানও সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিদেশে রফ্‌তানি দ্বারা যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হইতেছে।

বিরাট জনশক্তি ও প্রচুর কাঁচা মালের অধিকারী হওয়ায় ভারতে শিল্প-ক্ষেত্রে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। এই কর্মচাঞ্চল্য লইয়া ভারত ধাপে ধাপে যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারত বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশরূপে পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

বাণিজ্য-শিক্ষা

সূচনা—জাতির কর্মশক্তি হ্রাস—ব্যবসা পরহস্তগত—চাকুরি সীমাবদ্ধ—বাণিজ্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—ব্যবসায়ীর গুণাবলী—ব্যবসায়ও তপস্যা।

শিল্প-বাণিজ্যে যেরূপ অর্থাগম হয়, চাকুরিতে তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যপ্রিয় জাতিরাই লক্ষ্মীর বরপুত্র। আমাদের পণ্ডিতগণ যথার্থ ই বলিয়াছেন, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস। ভারতবর্ষেও মাড়োয়ারী, গুজরাতী, সিন্ধি প্রভৃতি জাত-ব্যবসায়ীরাই এদেশের অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য কুক্ষিগত করিয়া আছেন এবং তাঁহারাই এদেশে সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী সম্প্রদায়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Business makes man—ব্যবসায়ই মানুষকে যথার্থ গড়িয়া তোলে। লক্ষ্মীলাভ ও মানুষ হওয়া—দুই কারণেই ব্যবসায় অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ইংরেজ-শাসনে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার ফলে এদেশে একদল কেরানি তৈরী হইল, স্বাবলম্বী ব্যবসায়ী হইবার ব্যবহারিক শিক্ষা হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম। সমাজে সরকারী চাকুরিয়াদের অধিকতর মর্যাদা স্বীকৃত হওয়ায় ব্যবসায়-বৃত্তিকে লোকে হেয় জ্ঞান করিতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত বাঙালী সহজলভ্য ও দায়িত্বশূন্য চাকুরির মোহে আকৃষ্ট হয়। ইহার ফলে এদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রদেশের ও বিদেশের ব্যবসায়ী জাতিরা আসিয়া অধিকার করিয়া প্রচুর অর্থাগম করিয়া জাঁকিয়া বসিল। আমরা সাধারণ শিক্ষা লাভের পর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অকর্মা হইয়া ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার ফলে সীমায়িত চাকুরি হইতেও বঞ্চিত হইলাম, ব্যবসা-ক্ষেত্রেও আমাদের প্রবেশ-দ্বার ইতিমধ্যেই প্রায় অবরুদ্ধ হইল, আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া বিষম অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হইলাম। এই দারুণ অর্থসংকটে আমাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায়—শিল্প-বাণিজ্যের পথে যে ভাবেই হোক অগ্রসর হইতে হইবে, বাঁচিবার অন্য পন্থা নাই।

মনে রাখিতে হইবে, বাঙালি এক কালে বাণিজ্যিক কৃতিত্বের জন্য দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বাঙালির বাণিজ্য-তরী সমুদ্র পাড়ি দিয়া নানা দেশের বন্দরে পণ্য বহন করিয়া লইয়া যাইত। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেও সে কৃতিত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। বাঙালির সেই বাণিজ্য-নৈপুণ্যের পুনরুজ্জীবন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই।

আমাদের মধ্যে চাকুরিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, আইনজীবী, চিকিৎসাবিদ্ প্রভৃতি অনেকে আছেন, কিন্তু কৃতী ব্যবসায়ী কম। ইহার কারণ আমাদের ব্যবসায়-তত্ত্বের শিক্ষা লাভ সেরূপ হয় নাই, উহার ব্যবহারিক শিক্ষাও পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে কঠোর জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হইলে বাণিজ্য-শিক্ষা লাভ করিতে হইবে এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর অভ্যাস ও গুণাবলী আয়ত্ত করিতে হইবে। বাণিজ্য-

শিক্ষার দুইটি অঙ্গ—একটি তত্ত্বের দিক্ (theoretical), আর একটি ব্যবহারিক দিক্ (Practical)। আমাদের স্কুল কলেজে কেবল প্রথমটি শিক্ষা দেওয়ার কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। কিন্তু শুধু উহাকে সম্বল করিয়া কেহ ব্যবসায়ে সফল হইতে পারে না। ব্যবসায় হাতে-কলমে শিক্ষা করা প্রয়োজন, এজন্য তাত্ত্বিক শিক্ষা সমাপন করিয়া কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে কিছু কাল শিক্ষানবিশি করা একান্ত আবশ্যক। এই ভাবে অর্জিত বিদ্যা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ব্যবসায়ে নামিবার আত্মবিশ্বাস আসিবে, ফলে সাফল্যের সহিত ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভবপর হইবে। এজন্য বর্তমানে সরকার নানাবিধ শিল্প-বাণিজ্যের শিক্ষাদানে ও পরিচালনায় উৎসাহ দিয়া থাকেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগের কতকগুলি অভ্যাস ও গুণাবলীর অনুশীলন করা কর্তব্য। এই সকল অভ্যাসের মধ্যে প্রথম এই কয়টি—শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলাজ্ঞান, সময়নিষ্ঠা, হিসাবী-বুদ্ধি, পরিণামদর্শিতা ও সাধুতা। এই গুণগুলির দুইটি কি একটির অনুশীলনে কার্যক্ষেত্রে সফলতা অর্জন আশা করা সমীচীন নয়, ইহাদের সবগুলির-ই যুগপৎ অনুশীলন আবশ্যক। সর্বপ্রথম গুণ সার্বক্ষণিক শ্রমশীলতা এবং সেই সঙ্গে অধ্যবসায়। কথায় বলে, "লেগে থাকলে মেগে খেতে হয় না।" ইংরেজীতে অনুরূপ কথা আছে, "Keep the shop and the shop will keep you"—"দোকান রক্ষা কর, তা হলে দোকানই তোমায় রক্ষা করবে।" ব্যবসায়ে জোঁকের মতো লাগিয়া থাকিতে হয়, ইহাতে বুলডগের মত ধৈর্য চাই। ব্যবসায়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ হিসাবীবুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতা। আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান ইত্যাদি যথাযথ পর্যালোচনা করিবার যে বিচারবুদ্ধি, তাহাকেই হিসাবীবুদ্ধি (calculation) বলে। আর ভবিষ্যতে বাধা-বিঘ্ন বা আপদ-বিপদ্ ইত্যাদি উপস্থিত হইলে সম্ভাবিত ক্ষতিপূরণ হইতে ব্যবসায়টি রক্ষা করিবার ভবিষ্যৎপন্থা নিরূপণের যে ক্ষমতা, তাহাই পরিণামদর্শিতা (prudence)। পরিণামদর্শিতার অভাবে বহু ব্যবসায় অকালে নষ্ট হয়। ব্যবসায়ের দুর্যোগে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বজ্রকঠিন সংকল্প লইয়া সুদৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে।

ব্যবসায়ীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ সাধুতা। ইংরেজ-জাতি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বণিক্ জাতি (a nation of shop-keepers) বলিয়া খ্যাত। সেই বণিক-জাতির মধ্যে প্রচলিত একটি নীতিবাক্য এই : Honesty is the best policy—সাধুতাই সাফল্য লাভের শ্রেষ্ঠ নীতি। যে অসৎ ব্যবসায়ী খরিদ্দারকে ঠকাইয়া রাতারাতি বড় হইবার চেষ্টা করে তাহার পতন অনিবার্য। মনে রাখিতে হইবে, ক্রেতা-সাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধাই ব্যবসার শ্রেষ্ঠ মূলধন, অর্থবলের চেয়েও তাহার মূল্য বেশি। অসাধু ব্যবসায়ীর প্রতি ক্রেতা-সাধারণের অর্থাৎ জনসাধারণের বিমুখতাই ব্যবসায়ে ব্যর্থতার প্রধান কারণ। গণদেবতার সেবাই ব্যবসায়ীর মুখ্য কর্তব্য। সেজন্যই জনগণের অর্থাৎ গণপতির বিমুখতাকেই বলা হয় 'গণেশ উল্টানো'। বাঙালি

যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে অসামান্য সফলতার জন্য খ্যাত হইয়াছিল, তখন বণিক্‌দের সকলেই বলিত সাধু, বণিকের নামান্তরই ছিল 'সাধু'। বস্তুতঃ, অসাধুতা অপরিণামদর্শিতারই অন্যতম লক্ষণ। অসাধুতা চারিত্রিক দুর্বলতারই পরিচায়ক, আর দুর্বলতাই ব্যবসায়ীর পতন ঘটায়।

একটি বড় ব্যবসায়কে একটি রাষ্ট্রতুল্য সংস্থা বলা যায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় যে শক্তিসাধনার প্রয়োজন, ব্যবসায়েও অল্পাধিক তার আবশ্যক। ব্যবসায়েও মানুষকে সেই শক্তির অধিকারী করে তোলে। মনুষ্যত্বের উদ্দীপনের জন্য ব্যবসায় বড় সহায়ক।

ব্যবসায় সাধারণ লেন-দেন ব্যাপার মাত্র নয়। ব্যবসায় সাধনা, মানুষের ব্যবহারিক-জীবন-ক্ষেত্রের তপস্যা। সততা ও সত্যনিষ্ঠার সহিত তপস্বীর নিষ্ঠা ও সাধনা লইয়া এই পথে অগ্রসর হইলে সফলতা আসিবেই। বর্তমানে বাঙালীর জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সাধনা তাহার বাণিজ্য-সাধনা। ইহাই তাহার দারুণ জীবন-সংগ্রামে বাঁচিবার জীয়ন-কাঠি।

চলচ্চিত্রের প্রভাব

সূচনা—আবিষ্কার-কাহিনী—চিত্ত-বিনোদনে ও শিক্ষাবিস্তারে চলচ্চিত্র সার্থক শিল্প—চলচ্চিত্রের রুচি-বিকৃতি, দেশের নৈতিক অবনতি—সরকারের গুরু-দায়িত্ব।

বর্তমান জগতে চলচ্চিত্র মানুষের চিত্ত-বিনোদনের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম। কেবল তাহাই নয়, শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারেও ইহা একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহা বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের নিকটই ইহার প্রবল প্রভাব ও দুর্বার আকর্ষণ।

চলচ্চিত্রের পূর্বে আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফির আবিষ্কার হয়। চলচ্চিত্র কতকগুলি আলোকচিত্রের সমষ্টি মাত্র। দর্শকের চোখের সম্মুখে দ্রুতগতিতে চালাইয়া লওয়া হয় বলিয়াই উহা সজীব ও সচল দেখায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলোকচিত্র তোলার কাজ শুরু হয়। প্রথমে একখানা ছবি তুলিতে অনেক সময় লাগিত, পরে উহা কয়েক সেকেণ্ডে এবং সর্বশেষে মুহূর্তমধ্যে ফটো তোলার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর চলন্ত ছবি তোলার উপায় বাহির হয়। আমেরিকার নিউইয়র্কের ফটো-ফিল্ম আবিষ্কর্তা ঈস্টম্যান এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হন। অবশেষে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস এলভা এডিসন এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন যাহাতে চলন্ত বস্তু ও প্রাণীর ছবি ধারাবাহিক ভাবে উঠিতে পারে। বস্তুতঃ, এডিসনই চলচ্চিত্রের আবিষ্কর্তা। ইহার পর সেলুলয়েড-ফিতা বা ফিল্মের উপর ছবি মুদ্রিত করিয়া চিত্র-ক্ষেপণ যন্ত্র বা প্রজেক্টর দ্বারা তীব্র আলোকের সাহায্যে শাদা পর্দার উপর ছবিগুলি বড় করিয়া প্রতিফলিত করিয়া দর্শকদিগকে দেখান হইত। সেকালে চলচ্চিত্র ছিল মূক, চল্লিশ বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে মূক চলচ্চিত্রই সিনেমা-হলে চালু ছিল। ইহার

পর সেলুলয়েড ফিতার উপর শব্দের ফটোও (Sound Photography) মুদ্রিত হইতে লাগিল এবং বর্তমান সবাক্-চিত্রের যুগ শুরু হইল। অধুনা রঙিন চিত্রও গৃহীত হইয়া চলচ্চিত্র অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

সকল শ্রেণীর মানুষের চিত্ত-বিনোদনের এত বড় আয়োজন বর্তমান যুগে আর নাই। ইহা সুলভ, সহজ ও অল্প কালের উপভোগ্য। এ কালের কর্মক্লান্ত মানুষের পক্ষে দিনশেষে সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে, আরামে অবসর যাপনের, চিত্ত-বিনোদনের, ক্লান্তি দূরীকরণের ও নূতন উৎসাহ লাভের এমন উপায় আর নাই। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব আজ সর্বব্যাপী ও ক্রমবর্ধমান। লোক-রঞ্জন ছাড়া চলচ্চিত্র শিক্ষাবিস্তারের বড় উপায়। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ও আনন্দ চলচ্চিত্রের সাহায্যে অতি সহজে ও স্বল্পব্যয়ে লাভ হয়। য়ুরোপের জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে স্কুলের শিক্ষাদান-কার্যে চলচ্চিত্রের ব্যবহার খুব বেশি। উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যেও চলচ্চিত্র অধুনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

চলচ্চিত্রের আর একটি ভূমিকা লোকশিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করা। সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের এবং নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষাদানে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশি। এদেশে কিছু সরকারী ডকুমেণ্টারি ছবি লোকশিক্ষার কাজে সামান্য সাহায্য করিতেছে।

চলচ্চিত্র একটি উচ্চ শ্রেণীর আর্ট বা শিল্পকলাও। বর্তমানে আমাদের দেশেও ইহার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। উচ্চমানের অভিনেতা-অভিনেত্রী, সঙ্গীতজ্ঞ, নির্দেশক ও অন্যান্য শিল্পজ্ঞদের সমাবেশে চলচ্চিত্র একটি জীবন্ত সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকাও নিয়োজিত হইতেছে। মার্জিত রুচিসম্পন্ন সৌষ্ঠবময় শিল্পসৃষ্টি হিসাবে বাংলা চিত্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথাও উল্লেখযোগ্য।

আনন্দ ও শিক্ষাদানের এই মহৎ শিল্পটি আমাদের দেশে কতকগুলি অর্থগৃধ্র ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়া দেশের ও সমাজের সর্বনাশের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল চলচ্চিত্রে কুরুচিপূর্ণ নীতিবিগর্হিত অতি নিম্নস্তরের ভোগ-লালসার নগ্নচিত্র প্রকটিত হয় যাহা আমাদের জাতির চিত্তকে কলুষিত এবং চরিত্রকে হীনবল ও নিম্নগামী করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ করিতেছে। যাহারা অর্থলোভে জাতির নৈতিক অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতেছে তাহারা অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী ও দণ্ডনীয়।

অন্যান্য দেশে তরুণ ছাত্রদের, শ্রমজীবীদের ও বয়স্কদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ছবি, তোলা হয় এবং দেখানো হয়। এদেশে চলচ্চিত্রের শ্রেণী-বিভাগ না থাকায় বয়স্কদের উপযোগী ছবি দ্বারা অল্পবয়স্কদের সর্বনাশ সাধিত হইতেছে।

যাহাতে এই প্রভাবশালী ও চিত্তাকর্ষক শিল্পটি জাতীয় কল্যাণে ও উন্নতিকার্যে নিয়োজিত হয়, সে বিষয়ে জাতীয় সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে। তবেই জাতি ও ব্যক্তির দ্রুত উন্নতি ঘটিবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা

পূর্ব ইতিবৃত্ত—পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিবাদীদের শোষণ-ক্ষেত্র—ভাষা-আন্দোলন—সামরিক শাসন—মুজিবরের অভ্যুদয়—নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য—ইয়াহিয়ার প্রতারণা—বর্বর নির্যাতন—মুজিবর গ্রেপ্তার, এক কোটি দেশত্যাগীর ভারতে আশ্রয়—বাংলাদেশ-সরকার গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা—ভারতবাসী ও ভারত-সরকারের সার্বিক সক্রিয় সহায়তা—সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন—মুজিব প্রধান মন্ত্রী—নব-সংবিধান—ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগেই বাংলাদেশ আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। ভারতকে দু'টুকরো করে যখন মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্তান নামক মুস্লিম-গরিষ্ঠ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্বভাবতঃই পশ্চিম পাকিস্তানীদের মত পূর্ববঙ্গের মুস্লিম অধিবাসীরা স্বাধীনতা ও ভাবী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নে ও সম্ভাবনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই পূর্ববঙ্গবাসীদের মোহ ভঙ্গ হল। তারা বুঝল যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর হতেই পূর্ববঙ্গবাসীরা পশ্চিম-পাকিস্তানের কলোনী বা শোষণ-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বিদেশী সাহায্যের বিরাট্ অর্থাগম, সমস্তই পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসক ও পুঁজিবাদীদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ল। বাঙালীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘুর মত ব্যবহার পেতে লাগল।

বাঙালীদের অধিকার দাবীর সকল প্রতিবাদ উপেক্ষিত হয়। এমন কি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে জবরদস্তি করে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হল। ফলে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের তরুণ শহীদদের আত্মদানে বাংলা ভাষা উর্দুর সঙ্গে জাতীয় ভাষারূপে মর্যাদা পেল। ভাষা-আন্দোলনে যার সূচনা, বাংলাদেশ আন্দোলন তারই পরিণতি।

ভাষার স্বীকৃতি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাংলার আর্থিক উন্নতির কোন সমাধান হল না। বরং ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল আয়ুব খাঁ সামরিক শাসন প্রবর্তন করে বাংলা দেশকে নিপেষিত করবার জবরদস্ত ব্যবস্থা করলেন। বাংলার নব নেতা শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য স্বদেশ-সেবকদের মিথ্যা মামলায় জেলে আবদ্ধ করা হল।

পরিশেষে জাগ্রত জনমতের চাপে আয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নিজে সরে পড়লেন। ইয়াহিয়া খান দেশের উত্তাল জনমতকে প্রশমিত করার জন্য দেশময় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করলেন। ১৯৭০ সালের এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের আওয়ামী দল সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। নির্বাচনের এরূপ অঘটন জেনারেল ইয়াহিয়ার কল্পনাতীত ছিল।

এ অবস্থায় জেনারেল ইয়াহিয়া (২৫শে মার্চ, ১৯৭১) দেশে সামরিক শাসন জারি করলেন। এ বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম দলনেতা মিঃ ভুট্টোর সমর্থন

পেলেন। সমস্ত পূর্ববঙ্গে প্রবল বিক্ষোভ ও স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় অভ্যুত্থান শুরু হল। মুজিবর ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হল। সমগ্র দেশময় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ধ্বংস, লুণ্ঠন, হত্যা, অমানুষিক নির্যাতন বেপরোয়াভাবে শুরু করে তাণ্ডব ও আতঙ্কের সৃষ্টি করল। এর ফলে প্রায় এক কোটি বাঙালী দলে দলে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিল।

ইতিমধ্যে শেখ মুজিবরের সহকর্মীরা মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করলেন। তাদের মুক্তিযোদ্ধারা বাংলা দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে দুর্ধর্ষ খান বাহিনীকে ঘায়েল করতে লাগল।

বাংলা দেশের মুক্তি-সংগ্রামে একমাত্র ভারতই প্রথম হ'তে সক্রিয়ভাবে সকল প্রকার সহায়তা দান করে। এরই ফলে বাংলাদেশ অতি অল্প সময়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে এ জন্য রাজনৈতিক প্রয়াস ও প্রচার চালালেন। অবশেষে ভারতই বাংলা দেশকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দান করে এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বিভাগ বাংলাদেশবাসীর সাহায্যের জন্য একযোগে পাক-বাহিনীকে ঘিরে আক্রমণ চালায়। ফলে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য-সহ পাক-সেনাপতি ভারত-বাংলা যুক্ত বাহিনীর নিকট ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) ঢাকা শহরে আত্মসমর্পণ করে।

ইতিমধ্যে শেখ মুজিবর বন্দীদশা হতে মুক্ত হয়ে ঢাকা আগমন করেন এবং নূতন রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। গণতন্ত্র, জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভিত্তির ওপর বাংলাদেশের নূতন সংবিধান রচিত হয়েছে। বাঙালীর রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পূর্ণ সুযোগের প্রতিষ্ঠাতেই এই স্বাধীন বাংলার আত্মপ্রকাশের সার্থকতা। পৃথিবীর শতাধিক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করেছে।

আধুনিক ইতিহাসে বাংলা দেশের আবির্ভাব এক আকস্মিক ঘটনা। ভারত মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে—এক কথায় সারা সত্তা দিয়ে—বাংলা দেশের স্বাধীনতা আনয়নে সহায়তা করেছে। আবার ভারতই বিপর্যস্ত বাংলা-দেশের পুনর্গঠনে ও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে, যোগাযোগ ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নে, ধনে জনে সকল রকমে সাহায্য করেছে। ইতিহাসে এ-ও এক বিস্ময়কর ঘটনা। ভারত ও বাংলাদেশের স্থায়ী মৈত্রী উভয়েরই প্রগতি ও কল্যাণের পক্ষে একান্ত কাম্য। কারণ দু'টি দেশই একই আদর্শে ও পারস্পরিক স্বার্থে মৈত্রীবদ্ধ হয়েছে।

১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশে সেনা-বিদ্রোহে শেখ মুজিবর সপরিবারে নিহত হন। ইহার পর নানা বিপর্যয়ে সেখানে আধা-সামরিক শাসন চালু হয়।

প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্ত সংকেতসহ)

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে

সবল ও ধনীর অত্যাচার—ইতিহাসের দৃষ্টান্ত—পরিণাম। বাইবেলে একটি কথা আছে, "একটি উট হয়ত একটি ক্ষুদ্র সূচের ছিদ্র দিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু একজন ধনী কখনও স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারিবে না।" দুঃখীর পরিত্রাতা যীশুখ্রীস্ট তাঁহার সময়ে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ধনীর অত্যাচার ও অবিচারই দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ। ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাজশক্তি দীর্ঘকাল প্রজাপুঞ্জকে শাসন-যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট করিতেছিল, রাজশক্তির প্রতীক সেই রাজা-রাণীকেও একদিন নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করিতে হয়। রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসও অনুরূপ। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একদিন সূর্যাস্ত যাইত না, তাহারও প্রতিটি উপনিবেশ হাত-ছাড়া হইয়াছে। **ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় বৈষম্য।** লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনগণ দীর্ঘকাল অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না, শোষক শাসকের ক্ষমতাহরণে এমন কি তাহার উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায়ও উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিভেদ, ধনী ও দরিদ্রের বিভেদ এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বিভেদ আছে। এই অবজ্ঞা ও বৈষম্য অনুন্নত সমাজের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। **প্রতিকারের প্রয়াস।** এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে যুগে যুগে অনেক মহামানব অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিভেদ ঘুচাইবার জন্য উদার কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "মুচী মেথর চণ্ডাল আমার ভাই।" মহাত্মাজীও অনুন্নত সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমাদের সরকারকেও নানা প্রকার প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার সাহায্যে এই অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। **বর্তমান যান্ত্রিক যুগে অর্থনৈতিক বিভেদ প্রবল।** বর্তমান যন্ত্র-প্রাধান্যের যুগে মানুষ একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক ও লোভাতুর হইয়া পড়িয়াছে। যান্ত্রিক-সভ্যতার ফলে মুষ্টিমেয় ধনিকের হস্তে বেশীর ভাগ জাতীয় সম্পদ্ পুঞ্জীভূত হয় এবং সমাজে ধনবৈষম্য অত্যন্ত প্রকট হইয়া ওঠে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক উপায়ে এই পার্থক্য দূরীকরণের প্রয়াস পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র করিতেছেন। **মানুষ সকলেই সমান।** আমাদের মনে রাখিতে হইবে, শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। অন্যকে অবহেলা করিয়া আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে আমরা পিছনেই পড়িয়া থাকিব। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি"

ঋষিবাণী : মানুষ অমৃতের পুত্র। প্রাচীন ভারতের ঋষি মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' (অমৃতস্য পুত্রাঃ) বলে আহ্বান করেছিলেন। ঋষির উপলব্ধিতে মানুষের যে শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তা হল মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষই অমৃতময় স্রষ্টার সন্তান, প্রত্যেকেই পরম আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। **সভ্যতার সঙ্গে মানুষে মানুষে ভেদ।** প্রাচীন যুগ হতে ক্রমে মানুষ সভ্যতার শীর্ষস্থানে এগিয়ে এসেছে, তথাপি মানুষে মানুষে প্রীতি দৃঢ় হওয়ার কথা দূরে থাক, মানুষে মানুষে বিভেদের দুস্তর ব্যবধানই প্রকট হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ঈর্ষা, দলাদলি, জাত্যভিমান মানব-সমাজকে পঙ্গু করে ফেলেছে। **সবলের অত্যাচার—বিদ্বেষ ও বৈষম্য।** বিজয়ী চিরকালই বিজিতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। আর্যরা ভারতবর্ষে এসে আধিপত্য বিস্তার করার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের আদিম অধিবাসীদের দাস, দস্যু, শূদ্র বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। মোগল পাঠান যুগ থেকে এই দলাদলির ওপর হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক পার্থক্য দেখা দিল। তারপর ইংরেজ এসে আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আমাদের অসভ্য কৃষ্ণকায় বলে ঘৃণা করেছে। আফ্রিকায় ও আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণ-বিদ্বেষ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে। বর্ণ-বিদ্বেষ, ধর্ম-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, স্বার্থ ও বিত্ত-বৈষম্য এবং শক্তিমত্ত মানুষে মানুষে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। এই বিভেদই জাতিতে জাতিতে হানাহানির সৃষ্টি করে। এ বিভেদ কখনও মানব-কল্যাণমুখী হতে পারে না। **মহাপুরুষদের ঐক্য-সাম্য-মিলনের বাণী।** আবার দেখতে পাই যে, এক দিকে ভেদ-বিভেদের কলঙ্কমাখা পরিচয় মানুষের ইতিহাসকে যেমন কলঙ্কময় করে রেখেছে, তেমনই অপর দিকে যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে মানুষকে অভেদ মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্যে। ভগবান বুদ্ধ মানব-জাতিকে প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যীশুখ্রীস্ট বলেছেন, "Love thy neighbour"—তোমার প্রতিবেশীকে তুমি ভালবাস। শ্রীচৈতন্য, রামানন্দ, কবীর, রুইদাস, নানক প্রমুখ মধ্যযুগের সাধকগণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ আধুনিক চিন্তানায়কেরা পর পর সবাইকে অভেদের বাণী শুনিয়ে গেছেন। **পৃথিবী সকলের।** পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই নিজ নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের কথা বলে থাকে। কিন্তু বিশ্ব-সভ্যতা ও বিশ্ব-সংস্কৃতির কথা কেউ ত বলেন না। **মানবতায় মানুষ এক।** এই বিভেদ-রূপ নাগিনী এখনও বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পৃথিবীকে জর্জরিত করছে। আজ এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হলে সব সময় মনে রাখতে হবে, 'জগৎ জুড়ে মানবজাতি ছাড়া আর কোনো জাতি নেই। প্রত্যেকেই আমরা মানব-বংশজাত। মানবতার পরিচয়ই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। দেশ বা ধর্মের পরিচয় মুখ্য নয়।' এই সত্যকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারলে, তবেই মানবতার সার্থক প্রকাশ ঘটতে পারে।

ভারতের নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা
(বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ)

মানব-সভ্যতা নদীর দান। মানুষের বসতি ও কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ্, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম, সব কিছুর বিকাশ হইয়াছে নদীকে আশ্রয় করিয়া। পৃথিবীর শস্য সম্পদ্ একান্তই নদীগুলির দান। **নদীর আশীর্বাদ ও অভিশাপ।** বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। নদীই বাংলার প্রাণ, বাংলার মাতা। নদীমাতৃক বাংলাকে ইহারাই গড়িয়াছে। নদীমাত্রই দেশের আশীর্বাদ। এই নদীই আবার প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও হইয়া উঠে অভিশাপ। **নদীর জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ।** দুরন্ত নদীকে শাসন করিবার জন্য, ইহার প্রচণ্ড জলস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মানুষ সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নদীর গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই সে নদী-বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইল। ইহার ফলে সেচ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হইল। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নদী-পরিকল্পনার প্রধান কার্য। **আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি পরিকল্পনা।** নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা আধুনিক যুগের দান এবং ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইল আমেরিকার সুবিদিত টেনেসি ভ্যালি পরিকল্পনা। টেনেসি ভ্যালির বহুমুখী পরিকল্পনার সাহায্যে টেনেসি উপত্যকার চাষীদের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম এই জাতীয় যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তাহার নাম দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা। **দামোদর পরিকল্পনা।** দামোদর পরিকল্পনা একটি বহুমুখী পরিকল্পনা। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, সেচ-কার্য, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও অন্যান্য কাজে নদীর জলের ব্যবহারের বহুবিধ পরিকল্পনা ইহাতে আছে। **ভারতের বৃহৎ নদী-পরিকল্পনাসমূহ।** ভারত স্বাধীন হইবার পরে সেচ ও বিদ্যুৎ-শক্তির জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কতকগুলি বড় বড় নদী-পরিকল্পনার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ভাক্রা বাঁধ, নাঙ্গাল বাঁধ, হীরাকুঁদ বাঁধ, তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা এবং নাগার্জুন-সাগর বাঁধ, গান্ধী-সাগর বাঁধ, কোটা বাঁধ, কোশী নদী পরিকল্পনা, রিহান্দ পরিকল্পনা প্রভৃতি বিখ্যাত। **পশ্চিমবঙ্গে নদী-পরিকল্পনা।** পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী নদী-পরিকল্পনায় মাসানজোড় (কানাডা বাঁধ) ও তিলপাড়া বাঁধ এবং কংসাবতী পরিকল্পনা দ্বারাও পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় অঞ্চল উপকৃত। জলসেচ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ব্যতীত নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা দ্বারা বহুবিধ লোকহিতকর কার্য সাধিত হয়।

“দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ”

সূচনা। পৃথিবীতে বিরাট্ ও মহৎ কাজ মানুষের সংঘ-শক্তির দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। দেশের উন্নতি এবং দশের উন্নতির মূলে রহিয়াছে সংঘ-শক্তি। যে কার্য এক জনের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব, দশ জনে মিলিয়া সেই কাজ করিলে

স্বল্প সময়ে সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, অথচ তাহাতে প্রত্যেকের শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমেরও লাঘব হয়। কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি ধর্মক্ষেত্রে, কি সমাজ-সংস্কারে,—সকলের উন্নতির মূলেই রহিয়াছে সংঘ-শক্তি। **প্রাচীন ভারতে সংঘ-শক্তির গুরুত্ব**। ঋগ্বেদে সর্বশেষ মন্ত্রে 'সংজ্ঞান' বা ঐকমত্য দেবতার কথা আছে। আর্যগণের মূল মন্ত্র ছিল, 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্' (ঋক্)—তোমরা সকলে একত্রে চল, সকলে এক কথা বল, তোমাদের মনকে এক বলিয়া জান। অর্থাৎ সকলে একমন হও। বৌদ্ধযুগে এক নূতন সংঘ-শক্তির বলে ধর্মের বিস্তার ঘটে। **সমাজে ও প্রকৃতিতে সংহতির প্রভাব**। কথায় বলে, "মানুষ একা না বোকা।" একার শক্তি কতটুকু। কিন্তু একতার বল অসীম। একতার বলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। প্রকৃতিতেও এই সংহত কার্যকারিতার অদ্ভুত প্রভাব। **মহাপুরুষদের কার্যে জনশক্তি**। মহাপুরুষগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের দুঃখ দূর করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও দেশের জনশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও মানব-সেবার কার্যে শক্তিশালী সংঘ গঠন করেন। **সর্বক্ষেত্রে সংঘ-শক্তির বিস্তার**। বর্তমানেও দেশের জন-নায়কগণ সংঘ-শক্তির সাহায্যে দেশ-সেবার কল্যাণ-কর্মে ব্রতী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও দরিদ্র শ্রমজীবীরা সংঘবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছুক ও শক্তিশালী ধনিক সংঘের হস্ত হইতে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করিতেছে। ছাত্রগণও সংঘবদ্ধ হইয়া বহুবিধ জনহিতকর কার্য করিতেছে। বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন স্বার্থে ও উদ্দেশে সংঘবদ্ধ। ফলে ব্যষ্টি-জীবনেরও সংঘ-শক্তির ছত্রতলে সবল আশ্রয় লাভ হয়। এই সংঘ-শক্তির বিরুদ্ধে কোন শক্তিই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। **সংহত প্রয়াসের পরাভব লজ্জার নয়, পরবর্তী বিজয়ের সোপান**। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে অসাধারণ মানুষ কখনও কখনও অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়। জন-শক্তির সাহায্যে যে সব সময়ে এবং সব বিষয়ে সফলতা অর্জন করিতে হয়, এমন কোন কথা নাই। অনেক সময়ে শুধু দুর্জয় সংকল্প ও আত্মশক্তির বলেই ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য অর্জিত হয়। মহাপুরুষদের জীবন এই ভাবেই গড়িয়া ওঠে। তবে একথা সত্য যে, সমষ্টিগত কল্যাণের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন সংঘবদ্ধতা। দেশের জনগণকে সুসংহত ও একতাবদ্ধ করিয়া আমরা যদি জাতি-সংগঠন কার্য আরম্ভ করি, তবে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। আর যদিই বা কোন কারণে বিফলকামও হই, তথাপি লজ্জার কোন কারণ নাই। একা দশ জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরাজয়ের গ্লানি বরণ করিলে লজ্জিত হইবারই কথা। কিন্তু পরাজয় যেখানে সর্বসাধারণের, দেশের সকলেই যেখানে জড়িত, সেখানে ব্যক্তিগত লজ্জা বা অপমানের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। দশের পরাজয়, পরাজয় নয়, ইহা বিজয়ের পথে একটি সোপান মাত্র।

যে শুইয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে

উদ্যোগীর সাফল্য ও আনন্দ, অলসের দুঃখময় পরিণতি। সংস্কৃতে একটি কথা আছে, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ" অর্থাৎ একমাত্র উদ্যোগী পুরুষসিংহই লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিতে থাকেন, সাফল্য ও আনন্দ লাভ করেন। **পরিশ্রমী জীবন-সংগ্রামে জয়ী।** সৎকার্যে পরিশ্রম কখনও বৃথা যায় না। জীবন-সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রমীই জয় লাভ করেন। **মানুষ স্বয়ং তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে।** অদৃষ্ট বা ভাগ্যের দোষ দেওয়া দুর্বলতারই নামান্তর। আমরা নিজেরাই আমাদের অদৃষ্ট বা ভাগ্য রচনা করিয়া থাকি। **বাল্যকাল হইতে পরিশ্রমী হওয়ার শিক্ষা।** বাল্যকাল মানুষের চরিত্র গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত সময়। এই সময় যে ছাঁচে জীবন গড়িয়া উঠে, ভবিষ্যৎ জীবনেও তাহার প্রভাব থাকিয়া যায়। কাজেই বাল্যকাল হইতেই পরিশ্রমী ও উদ্‌যোগী হওয়া একান্ত কর্তব্য। **মনীষীদের উন্নতির মূলে পরিশ্রম।** জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই অক্লান্ত পরিশ্রমী। শুধুমাত্র শুইয়া বসিয়া কেহ জীবনে বড় হইতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ্ প্রত্যেককেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই পরিশ্রমই তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধি আনিয়াছে। **সর্বদা অনলস কর্মপ্রচেষ্টা।** যাঁহারা কাজ করাকে জীবনের ব্রত বলিয়া জানেন, যাঁহারা হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করিয়া কর্তব্যের পথে আগাইয়া যান, তাঁহাদের শ্রম কখনও ব্যর্থ হয় না। কারণ তাঁহাদের কাজে কোন ফাঁক থাকে না, ফাঁকিও থাকে না। **কর্মহীন জীবন মৃত্যুর নামান্তর।** জীবনে উন্নতি লাভই যদি কাম্য হয় তাহা হইলে আমাদের অনলস ভাবে পরিশ্রম করিতে হইবে। অলস হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিয়া ফলের প্রত্যাশা করা বাতুলতামাত্র। নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম ব্যক্তির ভাগ্যে কখনও সফলতা আসিতে পারে না। কর্মহীন জীবন মৃত্যুর নামান্তর।

জন-সেবা ও ছাত্র-সমাজ

জনসেবার মূলে মানব-প্রীতি। মানুষকে যদি ভাই বলিয়া ভালবাসিয়া বুকে জড়াইতে পারি, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্রতর দুঃখও আমার প্রাণে বৃহৎ হইয়া বাজিবে। গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রীস্ট, শ্রীগৌরাঙ্গ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মানব-প্রেমিক মহাপুরুষগণ তাই মানুষকে ভালবাসিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও—অপরের সাহায্য কর। বসন্তের ন্যায় লোকের হিত আচরণ—এই আমার ধর্ম।" আত্মতুষ্টির জন্য সবাইকে ভালবাসিতে হইবে। প্রতিদানের উদ্দেশে ভালবাসা, সে তো ভিক্ষুকের ধর্ম, ব্যবসায়ীর ধর্ম। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষে মানুষে গাঁথা আমাদের জীবন-গ্রন্থি। একে অপরের উপর নির্ভরশীল। অন্তরে-বাহিরে আমাদের এই যোগসূত্র। মানব-সেবার মূল প্রেরণা এইখানে। তাই

বাংলার মহিলা কবি বলিয়াছেন—"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী 'পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" **স্রষ্টিকে অবহেলা করিয়া স্রষ্টাকে তুষ্ট করা যায় না।** সৃষ্টিকে অবহেলা করিয়া স্রষ্টাকে তুষ্ট করা যায় না, মানুষকে অবজ্ঞা করিয়া ভগবান্‌কে উপাসনা করা চলে না। **জন-সেবা ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধভাবে।** জনসেবা পূর্বকালে ব্যক্তিগত ভাবেই সাধারণতঃ করা হইত। এখন সংঘবদ্ধভাবে জনসেবার কার্য চলে, তন্মধ্যে কতক চলে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থায়ী ভাবে এবং কতক চলে অস্থায়ী ভাবে। **ছাত্রদের জনসেবা চরিত্র-গঠনের অঙ্গ।** মানব-সেবার এই মহৎ কর্মের ভার চিরদিন আমাদের ছাত্র-সমাজ ও তরুণবৃন্দই বহন করিয়া আসিয়াছে। পরসেবা তাহাদের সহজাত ধর্ম। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-গঠনের একটি প্রধান অঙ্গ জনসেবা। ইহা শুধু পরোপকার নয়, পরসেবা নয়, ইহা যথার্থই আত্মসেবা—আত্মোন্নতির শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়, পরের জন্য সহানুভূতি জাগে, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধি সঙ্কুচিত হয়, ত্যাগ শিক্ষা হয়, উদারতা বাড়ে, মহত্ত্বের পথে মন প্রসারিত হয়। ধীর অথচ নিস্তব্ধ ভাবে কাজ করিতে হইবে। মনে রাখিবে নাম যশ সেবার উদ্দেশ্য নয়। **সেবা-সংঘ।** মানুষের দুঃখকে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে। উহা দূর করিবার জন্য শহরে ও গ্রামে সেবা-সংঘ গঠন করিতে হইবে। জাতিকে সর্বপ্রকারে মানুষ করিতে হইবে—অর্থে, সামর্থ্যে, শিক্ষায়, জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে, নৈতিক আদর্শে। স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শে ছাত্র-সমাজ অগ্রণী হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সমাজ-জীবনে সাধুতারই জয়

চালাকিদ্বারা মহৎ কার্য হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। চালাকির দ্বারা প্রথম দিকে কিছুটা প্রত্যাশিত ফল দেখা দিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হয় না এবং তাহাতে যথার্থ আনন্দ নাই। **সাধুতাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি।** সাধুতাই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি। ইহা সর্বকালের ও সর্বদেশের পরীক্ষিত সত্য। সাধুতাই মানুষের জীবনের উন্নতির একমাত্র পথ। সাধুতা সত্য ও ন্যায়ের অনুগামী, কাজেই সাধুতা অবলম্বন মানুষের সর্বতোভাবে কর্তব্য। **স্বার্থপর অসাধু।** পৃথিবীতে বেশীর ভাগ লোক নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন। কি করিলে স্বার্থ সিদ্ধ হয়, সেই চিন্তাতে তাহারা বিভোর। পরের ভালোর কথা ভাবিবারও তাহাদের সময় নাই, স্বার্থপরতা তাহাদিগকে বৃহৎ মানব-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। এইরূপ মনুষ্যত্ব-বোধহীন ব্যক্তি মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত নয়। **সাধু ব্যক্তি পরার্থপর।** সাধু ব্যক্তি স্বভাবতঃ পরার্থপর।

যিনি অপরের ভালোর জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, যিনি সৎভাবে কাজ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী। পরার্থপরতাতেই যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয়। **ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে জাতির উন্নতি।** ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে জাতির উন্নতি এক সূত্রে বাঁধা। যে জাতির মধ্যে সাধু এবং সচ্চরিত্র লোক বেশী, সে জাতি তত উন্নত। সৎ ব্যক্তিরা জাতির স্তম্ভস্বরূপ, ভবিষ্যতের আলোক-বর্তিকা। সাধু ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও সাধু ব্যবসায়ীর দিন দিন প্রসার-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। **ধনতান্ত্রিক যুগে অসাধুতা বৃদ্ধি।** আমরা গণতন্ত্রের কথা মুখে বলিলেও এখনও ধনতান্ত্রিক যুগেই বাস করিতেছি। অতিরিক্ত ধন-লিপ্সা মানুষকে অসৎ হইবার প্রশ্রয় দেয়। সমাজে অসাধু ব্যক্তির প্রাধান্য দূর করিতে হইলে সাধুতার প্রসার একান্ত আবশ্যক। একমাত্র নির্লোভ সৎব্যক্তিগণই সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করিয়া উন্নত করিতে পারেন। **মহাপুরুষের আদর্শ স্মরণীয়।** সমাজে সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধু ব্যক্তির সংখ্যা বেশি নয়। পৃথিবীতে যুগে যুগে যে সকল মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহারা মুষ্টিমেয়। কিন্তু তাঁহাদের জীবনাদর্শ মানবজাতির চিরকাল অনুসরণীয় ও চিরস্মরণীয়। সাধুতাই মানুষকে অমরত্বের অধিকারী করে। সাধু ব্যক্তিদের অকলঙ্ক চরিত্রই মানুষের আদর্শ।

অস্পৃশ্যতা

অস্পৃশ্যতা নিষ্ঠুর সামাজিক ব্যাধি। ভারতবর্ষে যত পাপ ও অন্যায় আছে, তন্মধ্যে অস্পৃশ্যতা সর্বাপেক্ষা গর্হিত। এই নিষ্ঠুর ব্যাধির হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে না পারিলে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারও আমাদের থাকিবে না। **প্রতিবাদ ও দূরীকরণের প্রয়াস, সে যুগে ও এ যুগে।** ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে অস্পৃশ্যতার কম-বেশী প্রকোপ দেখা যায়। উচ্চবর্ণের লোকেরা তথাকথিত নিম্নবর্ণ সম্বন্ধে সব সময় একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বহু যুগব্যাপী। প্রাচীন কালে বুদ্ধ, অশোক প্রমুখ মানব-প্রেমিকগণ এবং মধ্যযুগে এদেশে রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষগণ অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। বল, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হ'বে তাহাদের সবার সমান।" **গান্ধীজির হরিজন আন্দোলন।** ইহার পর মহাত্মা গান্ধী আমাদের সমাজের এই ঘৃণ্য পাপ, দূর করিবার জন্য সক্রিয়ভাবে হরিজন (গান্ধীজি কর্তৃক অস্পৃশ্যদের এই নামকরণ) আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের ফলে হরিজনগণ বহু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। **অন্যান্য দেশে বর্ণ-বৈষম্য।** ভারতবর্ষের মত

না হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অস্পৃশ্যতা অন্যভাবে বর্তমান। আফ্রিকা ও আমেরিকার বর্ণ-বৈষম্য ভারতবর্ষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। **অস্পৃশ্যতা আইনতঃ নিষিদ্ধ।** অস্পৃশ্যতা নিম্নস্তরের দেশাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ও আইনে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। **উপসংহার।** আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ভগবান্ বুদ্ধ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য এবং আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষগণ মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচাইয়া বৈষম্যমুক্ত অখণ্ড সমাজ গঠনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। নব্য ভারতের মানুষ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

জাতীয় চরিত্র গঠন

মানুষ হওয়াই বড় কথা। আমাদের জীবনে আজ সব চেয়ে বড় কথা মানুষ হওয়া। মনুষ্যত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর যে জাতি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে, তাহার স্বাধীন গতি রোধ করিবার বিরুদ্ধে শক্তি জগতে নাই। মনুষ্যত্বের দৈন্য আমাদের জীবনকে ক্লিষ্ট ও পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্যত্বের মূল কথা চরিত্র। চরিত্র-শক্তির বিকাশই জাতির উন্নতি। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, "এমন উচ্চ ব্যক্তি-চরিত্র গড়া চাই যাহাতে সংসার ও সমাজ-জীবন বলিষ্ঠ হইয়া উঠে।" টাকায় কিছু হয় না। নাম-যশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না। চরিত্রই বাধা-বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিতে পারে। **প্রাচীন ভারতের অত্যুন্নতির মূলে চরিত্র-শক্তি।** প্রাচীন ভারত ধর্মে-জ্ঞানে শৌর্যে-বীর্যে অর্থে-সামর্থ্যে সকল বিষয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া বিরাট সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। এই সর্বতোমুখী প্রতিভার মূল উৎস প্রাচীন আর্যদের চরিত্র-শক্তি। **গৌরবিত ঐতিহ্য অথচ অসাফল্য।** গত দেড় শত বৎসরে বাংলাদেশে যে সকল ধর্মাচার্য, সমাজ-সংস্কারক, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনায়ক প্রমুখের আবির্ভাব হইয়াছে, অসাধারণ চরিত্র-শক্তি বলেই তাঁহারা সর্ববিষয়ে ভারতে অগ্রণী হইয়াছিলেন। অথচ সমষ্টিগতভাবে আমরা কর্ম-জীবনে অগ্রণী হইতে পারি নাই কেন? **জাতীয় চরিত্র গঠনে ৩টি অন্তরায়:— (১) কর্মশক্তি অপরিস্ফুট।** ইহার প্রধান কারণ জাতিগত ভাবে আমাদের চরিত্র-শক্তি ও কর্মশক্তি সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। কঠোর কর্তব্যজ্ঞান, বজ্রসম ইচ্ছাশক্তি, অবিচলিত অধ্যবসায়, অক্লান্ত শ্রমশীলতা প্রভৃতি যে সকল গুণ কর্মক্ষেত্রে সাফল্য-লাভে বিশেষ সহায়ক, আমাদের জীবনে তাহা সম্যক্ অনুশীলিত হয় নাই। আমাদের জীবনে ও মননে ভাবের উন্মাদনা আছে, কর্মের প্রেরণা নাই; আদর্শের কল্পনা আছে, বাস্তবের ধারণা নাই; ভাবুকের উদ্বেলতা আছে, সাধকের সহিষ্ণুতা নাই; বাক্যের আড়ম্বর আছে, কর্তব্যের জ্ঞান নাই। সেজন্য চাই, প্রাণশক্তিবর্ধক সংহত কর্মপ্রেরণা, উত্তেজনা নয়। **(২) অজ্ঞানতা।** সর্বাঙ্গীণ

জাতীয় উন্নতির দ্বিতীয় অন্তরায় আমাদের অজ্ঞানতা। জাতীয় প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সফলতা লাভের জন্য চাই—জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীনতা। (৩) **অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমের অভাব।** আমাদের জাতীয় উন্নতির তৃতীয় অন্তরায়—অকৃত্রিম স্বদেশ প্রীতির অভাব। দেশ ও ব্যক্তির মধ্যে নিবিড় স্বার্থ-সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম হইলেই লোকে স্বদেশের উন্নতিকল্পে যত্নবান হয়। বিশেষতঃ, নিজের পূর্বপুরুষগণের জন্মভূমি ও কর্ম-ভূমির প্রতি মমত্ববোধ থাকা চাই। কাজেই জাতীয় চরিত্রগঠনে তিনটি জিনিসের দরকার—কর্মের প্রেরণা, চিন্তার স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রীতি। এই তিনের সমন্বয় ও বিকাশে মানুষের মনুষ্যত্ব। সমুন্নত মনুষ্যত্বের বিকাশেই যথার্থ জাতীয় চরিত্র গঠন পূর্ণ হয় এবং জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটে।

স্বাধীনতার পরে ভারত

সূচনা। ১৯৮১ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার ৩৪ বৎসর পূর্ণ হয়। এই ৩৪ বৎসর জওহরলাল নেহেরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও মোরারজী দেশাই—এই চারি প্রধান মন্ত্রীর কার্যকাল। ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। ভারতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমন ঘটে। এই সময়ে আবার পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে। ভারত দৃঢ়তার সহিত এই উভয় বিপদের মোকাবিলা করে। এই সময় ভারতে ৫৫০টি দেশীয় রাজ্য ছিল। উহাদিগকে বিভিন্ন রাজ্যে [illegible] ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য [illegible]

গণতন্ত্রের বিকাশ। [illegible] স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দেওয়া হয়, অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হয়, অনগ্রসর সমাজকে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৫১-৫২ সালে দেশময় ১৭·৩ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণ এবং ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করা এই নবগণতান্ত্রিক-রাষ্ট্রের বলিষ্ঠ প্রতিরোধ-শক্তির পরিচায়ক। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভারতের সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৃঢ় রাজনৈতিক বুনিয়াদ ভারতের শ্রেষ্ঠ নির্ভর।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা। ১৯৫০ সাল হইতে পর পর ৫টি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ৫৫ কোটি টাকার উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়।

অর্থনৈতিক প্রগতি। জল, বিদ্যুৎ, রেল, রাস্তা, বিজ্ঞান, টেকনোলজি ইত্যাদির ছোট বড় উন্নয়ন কার্যদ্বারা দেশ স্বয়ম্ভর হইবার চেষ্টা করিয়াছে। বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরতা কমিয়াছে। **শিল্পোন্নতি।** দ্রুত শিল্পের উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু ও বিচিত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য, জটিল মেশিনারি প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ত্মযান ও রেলের যাবতীয় যন্ত্রাদি এবং কাপড়, চিনি, সিমেণ্ট তৈরির মেশিনারি উৎপাদনে দেশ স্বয়ম্ভর হইয়াছে।

কৃষির উন্নতি। সবুজ বিপ্লব খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়ক হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে খাদ্যশস্যের যেখানে উৎপাদন ছিল ৫৫ মিলিয়ন টন, ১৯৭০-৭১ সালে তাহা ১০৭৮ মিলিয়ন টন হইয়াছে। ফলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি কমিয়াছে।

গ্রামোন্নয়ন। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে গ্রামগুলির কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহ-নির্মাণ, সমবায় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উন্নতি ঘটিয়াছে।

সাংস্কৃতিক জাগরণ। সংস্কৃতিক্ষেত্রেও অগ্রসর উল্লেখযোগ্য। তিনটি জাতীয় একাডেমি বিভিন্ন শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রমুখদিগের উৎসাহ দান করিতেছে। আকাশবাণী ৬৭টি কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন ভাষায় জন-উন্নয়নের ও চিত্ত-বিনোদনের কাজ করিতেছে। টেলিভিশনও এ কাজে সহায়তা করিতেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের ডকুমেন্টারি ছবি এবং দেশের ১২০০ সংবাদপত্র দেশে আনন্দ ও জ্ঞান বিস্তার করিতেছে।

এই কয় বৎসরে ভাক্রা-নাঙ্গাল ও হীরাকুদের বিরাট জলসেচের বাঁধ, ভিলাই, রৌরকেলা ও দুর্গাপুরের বিশাল বিশাল ইস্পাত-কারখানা, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ ও নাসিকের এয়ারক্রাফ্‌ট ফ্যাক্টরি, ট্রম্বের পারমাণবিক প্রতিষ্ঠান, থুম্বার রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র, বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতির জাহাজ নির্মাণ কারখানা ইত্যাদি স্বাধীনতার ৩৪ বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট অবদান।

কিন্তু এই উন্নতির আশা ও আনন্দ অনাবিল নয়। ইহার অংশীদার তো সকল ভারতবাসী হইতে পারে নাই। ধনবৈষম্য সমাজে প্রকট।

দূরদর্শন বা টেলিভিশন

টেলিভিশন কি—প্রয়োগ ও পরিচালনা। বিদ্যুৎশক্তির এক আশ্চর্য আবিষ্কার বেতারবার্তা। বেতারের উন্নততর ও বিস্ময়কর রূপ দূরদর্শন বা টেলিভিশন (television)। *ইহার আবিষ্কর্তা স্কটল্যাণ্ডবাসী জন লোগি* বেয়ার্ড। টেলিভিশনে চলচ্চিত্র ও বেতারবার্তা এক সঙ্গে মিলিয়াছে। টেলিভিশনে গায়ক, বক্তা, বাদক, অভিনেতা প্রত্যেকের গান, কথা, বাজনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চেহারা ও প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গীও দেখা যায়। খেলা, অভিনয়, কোন ঘটনা, জনসমাবেশ, মি ছল, ডাক্তারের অস্ত্রোপচার, যুদ্ধাদি সমস্তই টেলিভিশনে দেখা যায় এবং কথা, চীৎকার প্রভৃতি শোনা যায়। যেন সবকিছু শ্রোতার সম্মুখে জীবন্ত ঘটিতেছে। চন্দ্রলোক-অভিযাত্রীদের সমস্ত দৃশ্য টেলিভিশনে পৃথিবীর মানুষের নিকট দৃষ্ট হইয়াছিল। "বিনা তারে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে, দূরের দৃশ্য বা ঘটনা যখন যেমন ঘটিতেছে ঠিক তখনই তেমনই ভাবে দেখিতে পাওয়াকে বলে টেলিভিশন। টেলিভিশনে দূরের দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধ্বনিও যাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে তখন তখনই শোনা যায় তাহারও বন্দোবস্ত থাকে।...বর্তমানকালে টেলিভিশনে বহু সুপরিকল্পিত প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার দেখা যায়। বিদ্যুৎপ্রবাহকে অনেকগুণ বাড়াইয়া বেতার প্রেরকযন্ত্রের উচ্চহার বিদ্যুৎস্পন্দনের উপর চাপাইয়া ছবি বা দৃশ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাওয়া যায়। কথা বা গান পাঠাইতে আরো একটি প্রেরক যন্ত্র, এ্যারিয়াল ও মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা দরকার। গ্রাহকযন্ত্রে ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গের স্পন্দন হয়। গ্রাহকযন্ত্র ও এ্যারিয়ালের সাহায্যে পর্দায় দৃশ্যের সঙ্গে কথা বা গান শোনা যায়।" (ভারতকোষ)

কার্যকারিতা—আনন্দ দান ও কল্যাণ সাধন। চিত্ত-বিনোদনের শ্রেষ্ঠ উপায়। নানা জ্ঞান বিস্তারে ও ছাত্রদের শিক্ষাদানে উপযোগী। **ভারতে টেলিভিশন।** ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে প্রথম স্থাপন। বর্তমানে অনেক বড় শহরে ইহা চালু হইয়াছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

আবেগ-ভরা বাণী—উদার ও প্রাণবান্ রাষ্ট্রনেতা ও কবি—শিক্ষাদীক্ষা—কর্মক্ষেত্র—শ্রীঅরবিন্দের মামলায় অসাধারণত্ব—তীক্ষ্ণবুদ্ধি আইনজ্ঞ—অসহযোগ আন্দোলনে—স্বরাজ্য দল গঠন—দার্জিলিংএ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ—দানশীলতা—কবি ও সাহিত্যিক।

"ঢাকার বুকে কি কি কলঙ্কের ধ্বজা উড়বে? তোমরা বেরিয়ে এসো।" উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করিলেন দেশবন্ধু। কথার কি তেজ, কণ্ঠে কি আকুলতা! বুড়ীগঙ্গার তীরে সন্ধ্যায় জনসভা। অসহযোগ আন্দোলনে সারা দেশ আলোড়িত হইতেছে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ। আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা শুরু। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ডাক দিলেন ছেলেদের ইংরেজদের গোলামখানা স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া আসিতে। সভায় দাঁড়াইয়া দেশনায়কের ওজস্বিনী ভাষণ শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। এমন আবেগ-ভরা ডাক তো আর কারো মুখে শুনি নাই। এই আপন-করা আহ্বান মুহূর্তমধ্যে আমায় আকুল করিয়া তুলিল। স্থির করিলাম পরীক্ষা দিব না। এই দেশবন্ধু—দেশের লোক যাঁহাকে ভালবাসিয়া এই নামে ডাকিত, এখনও ডাকে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভাশালী ব্যারিস্টার, কিন্তু অন্তরে ছিলেন তিনি ভাবালু কবি ও প্রীতির সাধক। তাই বক্তৃতা-মঞ্চে বজ্র-নির্ঘোষ ধ্বনি ও যুক্তির সঙ্গে অনুরাগ-ভরা আবেদনে তাঁহার অশ্রু গড়াইয়া পড়িত।

শ্রীঅরবিন্দ যথার্থই লিখিয়াছেন, বাঙালীর এক অমূল্য সম্পদ্ হৃদয়দ্বারা চিন্তা করা। দেশবন্ধুতে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির সহিত হৃদয়বত্তার মিলন ঘটিয়াছিল। এত বড় প্রাণবান্ নেতা এদেশে কয় জন জন্মিয়াছেন? এজন্যই তিনি এদেশের এত মানুষের ভালবাসা পাইয়াছিলেন।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে গয়ায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু যে যুক্তিপূর্ণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই মহতী সভায় উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিরূপে দেশবন্ধুর শেষ ওজস্বিনী বক্তৃতাও শুনিয়াছিলাম। পঞ্চাশ বৎসর পরেও কানে উহার স্মৃতি জাগ্রত রহিয়াছে, উহা ভোলা যায় না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক ও নিঃস্বার্থ নেতা জগতের ইতিহাসে বিরল। তিনি জীবনে যে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। শুধু রাষ্ট্রনেতা নহেন, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর আইনজ্ঞ ছিলেন। ইহা ছাড়া চিত্তরঞ্জন ছিলেন দরদী কবি।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলিকাতায় পটলডাঙ্গা অঞ্চলে চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ ও মাতা নিস্তারিণী দেবী। ভুবনমোহন এটর্নি ছিলেন। ইঁহাদের পূর্বনিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র-সমিতির সভাপতি এবং চিত্তরঞ্জন উহার

উৎসাহী সদস্য ছিলেন। বি. এ. পাশ করিয়া চিত্তরঞ্জন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যান। কিন্তু বিলাত হইতে ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। কলেজে তাঁহার বাগ্মিতার খ্যাতি ছিল। পরবর্তী কালে তিনি এক জন বিখ্যাত বক্তা হইয়াছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার উচ্চ আদালতে চিত্তরঞ্জন আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। রাজনীতির সঙ্গেও তাঁহার যোগ সেই সময় হইতেই ছিল। ব্যারিস্টার পি. মিত্র. দেশোদ্ধারের জন্য অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, উহার সহিত চিত্তরঞ্জনের যোগ ছিল। ইহার পর ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় আসিয়া যখন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় স্বাধীনতার জন্য অগ্নি-উদ্গীরণকারী লেখায় দেশে আগুন ছড়াইতেছিলেন, চিত্তরঞ্জন তাঁহার সহিতও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই সময়ে চিত্তরঞ্জন পিতার সহিত একযোগে এক পিতৃবন্ধুর ঋণের দায়িত্ব নিয়াছিলেন। ইহার ফলে উভয়কে ইনসলভেন্সি (দেউলিয়া) আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন পরে সেই বহু সহস্র টাকার ঋণ শোধ করেন এবং দেউলিয়া খাতা হইতে তাঁহার নাম অপসারিত হয়।

কয়েক বৎসর পরে অরবিন্দ ঘোষের প্রসিদ্ধ আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় চিত্তরঞ্জনের নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ৩০শে মে গভীর রাত্রিতে অরবিন্দের কলিকাতার গৃহে ইংরেজ সরকারের পুলিশ কর্মচারীরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দকে হাতে কড়া ও কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া পুলিশ আপিসে নিয়া যায়। এই মামলায় অরবিন্দ প্রমুখ সর্বশুদ্ধ উনচল্লিশ জন আসামী ছিলেন। এক বছর ধরিয়া এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন নিজের আইন ব্যবসায় বন্ধ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বন্ধু অরবিন্দের এই মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বাগ্মিতা, বুদ্ধিমত্তা, ত্যাগ ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই মামলায় দেশবন্ধুর বক্তৃতার শেষ কথাগুলি আজও যেন কানে ঝঙ্কৃত হইতেছে।—

"এই বাদবিতণ্ডা, কোলাহল, আন্দোলন শুদ্ধ হইবার পরে, অরবিন্দের তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে, মানবজাতি তাঁহাকে স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার বার্তাবহ এবং মানবপ্রেমিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে তাঁহার বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে, শুধু ভারতে নয়, সাগরপারের দূরদূরান্তের দেশ-বিদেশে।"

সেদিন বিচারের শেষ দিন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে। আদালত ঘরে লোকে ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত। বুঝি বা প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। চিত্তরঞ্জনের সেই প্রাণস্পর্শী ওজস্বিনী বক্তৃতার শক্তিতে জজ জুরী সকলকে এক মুহূর্তে ভাসাইয়া নিয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। চারিদিকে সেদিন কী উল্লাস, কী আনন্দ। চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ ও সঙ্গী দেশপ্রেমিকদের নিজের বাড়ি লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিলেন।

দেশবন্ধুর অন্তর্দৃষ্টি সেদিন যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। এই মামলার ফলে চিত্তরঞ্জনের যশ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। শীঘ্রই তিনি প্রথম শ্রেণীর ব্যারিস্টাররূপে পরিগণিত হইলেন। এক সময়ে তাঁহার বার্ষিক আয় পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা হইয়াছিল।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইল। চিত্তরঞ্জন লক্ষ লক্ষ টাকার আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। বাদশাহ্ ফকীর হইলেন। মুহূর্তমধ্যে রাজকীয় জীবন-যাত্রা ত্যাগ করিয়া তিনি সাধারণের মধ্যে নামিয়া আসিলেন। এত বড় ত্যাগ বর্তমান জগতে বিরল। চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে জাতীয় আন্দোলন প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী হইল। দেশের মানুষ এই ত্যাগী সন্ন্যাসীকে 'দেশবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করিল। যখন আইন-ভঙ্গ আন্দোলনে কারাবরণের সময় আসিল, তখন তিনি প্রথমেই সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী ও ভগ্নী উর্মিলা দেবীকে পাঠাইলেন। সেদিন এই অকল্পনীয় ঘটনায় দেশে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হইল। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আইন ভঙ্গের জন্য দেশবন্ধুরও ছয় মাস কারাদণ্ড হইল। এই সময় তিনি ছাত্রদেরও 'গোলামখানা' (বিদ্যালয়) ত্যাগ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ইহার ফলে দলে দলে ছাত্র স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া দেশের কাজে যোগদান করে।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে দেশবন্ধু কারামুক্ত হইয়া গয়া কংগ্রেসের সভাপতির পদে বৃত হন। এই অধিবেশনে তিনি 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন এবং পণ্ডিত জওহরলালের পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতাদের লইয়া আইন-সভায় প্রবেশ করেন। আইন-সভার ভিতর হইতে তাঁহারা বিরোধী দলরূপে ইংরেজ সরকারকে কাবু করিতে প্রয়াস পান।

এই সময় দেশবন্ধু 'ফরোয়ার্ড' ও পরে 'লিবার্টি' নামে ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমানের অধিকার-বিষয়ক চুক্তি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদন করেন। এই বছর স্বরাজ্য দল নির্বাচনে আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। এই বছরই দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তারকেশ্বর মোহান্তের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলে। দেশবন্ধুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি পঙ্গু করিবার জন্য ইংরেজ সরকার ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' প্রবর্তন করিয়া তাঁহার বিশিষ্ট সহযোগী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে বিনাবিচারে আটক করে। মহাত্মা গান্ধী 'স্বরাজ্য দলের' কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহার সমর্থন করেন। এই বৎসরই দেশবন্ধু ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁহার শেষ বৃহৎ অভিভাষণ প্রদান করেন। কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানে তিনি জনসাধারণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বছরই তিনি উহার প্রথম মেয়র হন।

এইরূপ অনবরত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি দার্জিলিং যান। সেখানে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন 'স্টেপ অ্যাসাইড' নামক ভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

যেদিন এই মহান্ দেশনায়কের শবদেহ কলিকাতায় আনীত হইল, সেদিনের

লক্ষ লক্ষ নরনারীর বিশাল শোকযাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এমন হৃদয়-বিদারক দৃশ্য এদেশে আর দেখা যায় নাই। সেদিন রবীন্দ্রনাথ শোকবাণী পাঠাইয়াছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করি গেল দান।"

দেশবন্ধুর দানশীলতা প্রবাদের মতো ছিল। অজস্র অর্থ যেমন তিনি উপার্জন করিতেন, তেমনি দুই হাতে দান করিতেন। কত ছাত্র ও দুঃস্থ, দেশের কত সদনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানে বাঁচিয়াছে। তাঁহার পৈতৃক ভবন দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। সেখানে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দেশবন্ধুর জীবন কেবল আইনজীবী ও রাষ্ট্রীয় নেতারূপে অতিবাহিত হয় নাই, তিনি কবি ও লেখক রূপেও যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত মালঞ্চ, সাগর-সঙ্গীত, অন্তর্যামী প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ। তিনি 'নারায়ণ' নামক সাহিত্যিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের পরিবেশে লালিত হইলেও পরবর্তী জীবনে দেশবন্ধু বৈষ্ণব মতবাদে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে সুবক্তা ও রাজনৈতিক নেতা মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছলেন।

লোক-গণনা

সূচনা। ইংরেজী সেন্সাস (census) বলিতে বাংলায় আমরা লোক-গণনা বা আদম-সুমারি বুঝিয়া থাকি। লোক-গণনায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক জাতিগত নানাবিধ পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়। আধুনিক কালে প্রতিটি রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক।

ইতিবৃত্ত। পৃথিবীতে কোন্ দেশে প্রথমে লোকগণনা শুরু হয়, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, অতি প্রাচীন কালে মিশর, ইজরায়েল, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশের লোক-গণনা করা হইত।

প্রাচীন ভারতে লোক-গণনা। আমাদের দেশেও অতি প্রাচীনকালে লোক-গণনার ব্যবস্থা ছিল। মৌর্য-রাজাদের সময় লোক-গণনার সুবন্দোবস্ত ছিল। বহু কর্মচারী নিয়োগ করিয়া এই কার্য সম্পন্ন হইত।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। বর্তমান কালে লোক-গণনা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাষ্ট্রে কত লোক আছে, শুধু তাহাই এখন গণনা করা হয় না। এখন ইহা অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত ব্যাপার। এখন জনগণের শিক্ষা, বৃত্তি, আয়, ভাষা, ধর্ম, খাদ্য, সম্পত্তি, জমির পরিমাণ, ভূমি, বৃষ্টিপাত, বসতির ঘনত্ব, গ্রাম ও শহরের সংখ্যা, গৃহের সংখ্যা, স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা, বয়স-ভেদে লোকসংখ্যা, বিবাহিত-অবিবাহিত, জন্ম-মৃত্যু-হার, উপার্জনের স্তর, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বা বসতির হার, খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক তথ্য, অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক বিভাগ, শ্রমজীবী পরিসংখ্যান, উদ্বাস্তু প্রভৃতি

বিষয়ে তথ্য গ্রহণ করা হয়। এই সংবাদাদির ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র-পরিচালনার সুব্যবস্থা করিতে পারেন, দেশের জনসাধারণের কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-কল্পে বিবিধ পরিকল্পনা ও কর্মনীতি গ্রহণ করিতে পারেন।

বর্তমান ভারতে লোক-গণনা। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে লোক-গণনা করা হয়। তখন হইতে দশ বৎসর পর পর লোক-গণনা করার প্রথা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তখন লোক-গণনা তেমন বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত না। স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রথম লোক-গণনা শুরু করা হয়।

জাতীয় সংহতি (সংক্ষিপ্ত)

বৈচিত্র্যে ঐক্য। কবি অতুলপ্রসাদ গাহিয়াছেন,

"নানা জাতি নানা ভাষা নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্।"

ইহা বিচিত্র ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। ইহা প্রাচীন কাল হইতে বহু জাতির ও বহু সভ্যতার মিলনভূমি। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মতো অধিবাসীরাও বিচিত্র। এই জন্য ভারতবর্ষকে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি বলা হয়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে তাহা ঐক্যবোধ—এক জাতি, এক দেশ, এক প্রাণ, এক স্বার্থ, এক উদ্দেশ্য। এই ঐক্যবোধ অতি প্রবল, ইহাকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না।

বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি জাতীয় সংহতি নষ্ট করিবার প্রয়াস পায় —

(১) ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—হিন্দু-মুসলমান-শিখ সংঘর্ষ ইত্যাদি। (২) প্রাদেশিকতা—রাজ্যসীমা ইত্যাদি লইয়া বিবাদ—বাঙালী-বিহারী, বিহারী-উড়িয়া, মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক, কর্ণাটক-কেরলা, পাঞ্জাব-হরিয়ানা ইত্যাদি। (৩) জাত-পাত-এর ঝগড়া বিশেষতঃ অনেক সময় হরিজনদের সঙ্গে। (৪) ধনী-দরিদ্র, মালিক-মজুর, জোতদার-বর্গাদার, মজুর-বর্গাদার ইত্যাদি দ্বন্দ্ব। (৫) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে দ্বন্দ্ব।

ধর্ম, ভাষা, জমি, জাত, রাজ্যসীমা, কারখানা ইত্যাদি লইয়া বিদ্বেষ ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়া ফেলিতে না পারে, এই দিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

সংহতি বৃদ্ধির সহায়। ইহার প্রতিকারের পন্থা—(১) সার্বজনীন জাতীয় শিক্ষার প্রসার, সকল আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি সাধন ও সম-মর্যাদা দান ; (২) সকল রাজ্যের সর্ব শ্রেণীর নাগরিকের সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ ; (৩) উৎসব অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা, রেডিও-থিয়েটার-সিনেমা-দূরদর্শন ইত্যাদি প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যবোধের প্রচার ও উহা কার্যকরী করার প্রচেষ্টা।

তবেই ভারতীয় মহাজাতি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী হইবে। এজন্য মহৎ হৃদয়বান উদার নেতৃত্ব এবং বলিষ্ঠ যুবশক্তির একান্ত প্রয়োজন।

হলদিয়া বন্দর (সংক্ষিপ্ত সূত্র)

অবস্থান। মেদিনীপুর জেলার হলদি নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরের মুখে হলদিয়া বন্দর ও শিল্প-প্রকল্প অবস্থিত। **সুবিধা।** তীরের নিকট জল গভীর থাকায় পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াতে সুবিধা। বৈদ্যুতিক রেল ও সড়কপথে কলিকাতা ও চতুর্দিকে যাতায়াতের সুযোগ—বিশাল পশ্চাদ্‌ভূমি কৃষিজ, খনিজ ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ। **প্রয়োজনীয়তা—বিভিন্ন প্রকল্প।** ইহা সমগ্র পূর্ব-ভারতের বাতায়ন—পাঁচ বার্থযুক্ত ডক—আকরিক লৌহ, কয়লা ও অন্যান্য জাহাজী মালের খনিজ তৈলের জন্য নির্দিষ্ট বার্থ—তৈল শোধনাগর ও সার তৈরির কারখানা ও বিভিন্ন শিল্প স্থাপন—আনুমানিক ব্যয় ৫০ কোটির অধিক—ভবিষ্যতে 'অবাধ বাণিজ্য-বন্দর'—সমাজবিরোধী ও চোরা কারবারী হইতে সতর্কতা। **ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।** কলিকাতার উপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে ইহা কলিকাতার সহযোগী বন্দর। বিপুল সম্ভাবনা, কিন্তু মাটির দুলালদের ইহাতে ভাগ কতটুকু ?

ভারত ও পারমাণবিক শক্তি

প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ—ধ্বংসের আতঙ্ক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ও ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা মার্কিন রণ-বিমানপোত হইতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে মুহূর্তের মধ্যে আড়াই লক্ষ অধিবাসীসহ হিরোশিমা শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নাগাসাকির অসংখ্য নরনারী নিহত ও অট্টালিকা ভূমিসাৎ হয়। সারা বিশ্ব আতঙ্কে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। এই ঘটনায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোলিও ক্যুরি বলিয়াছিলেন, "যাহারা হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া ঐ দুইটি শহর ও তাহাদের অধিবাসীদের ওপর নির্মম আঘাত হানিয়াছে, তাহারা বিজ্ঞানকে অপবিত্র করিয়াছে।" এই বোমাবর্ষণের ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দর্শনে জাপান আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধের অবসান ঘটে।

আবিষ্কারক। এই মারাত্মক আণবিক অস্ত্র পৃথিবীর পাঁচটি দেশের কুক্ষিগত। আণবিক শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটনে আইনস্টাইন, রাদারফোর্ড, টমসন, অটোহাম প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা পারমাণবিক অস্ত্র সর্বপ্রথম প্রয়োগ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার কৃতিত্ব হিটলারের জার্মান বৈজ্ঞানিকবৃন্দের বলিয়াই অনেকের ধারণা।

কল্যাণকর্মে প্রয়োগে মানুষের সমৃদ্ধি। ধ্বংসের কার্যে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগে মানুষ আতঙ্কিত, কিন্তু আবার এই শক্তি রোগনিবারণ, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি গঠনমূলক কল্যাণকর্মে ব্যবহৃত হইলে মানুষের অসামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি ঘটে।

আণবিক জালানী হইতে খুব কম খরচে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে। ইহা দ্বারা ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করিয়া কৃষির উন্নতি ঘটিবে এবং খাদ্যাভাব পৃথিবী হইতে চিরতরে দূরীভূত হইবে। মরুভূমিগুলি শস্যশ্যামল হইবে, তুষার-মণ্ডিত মেরু অঞ্চল শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইতিমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া উত্তর মেরুর তুষারাবৃত সাগরের মধ্য দিয়া পারমাণবিক শক্তি সহায়ে বরফ-ভাঙ্গা জাহাজের পেছনে পেছনে মালবাহী জাহাজ চালাইয়া প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের ব্যবধান একেবারে কমাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু শক্তিশালী দেশগুলি মারণাস্ত্র নির্মাণ ছাড়িয়া এখনও মানব-কল্যাণের কর্মে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দিতেছে না।

ভারতে কল্যাণ-কর্মে গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতে বৈজ্ঞানিক ডঃ ভাবার তত্ত্বাবধানে বোম্বের ট্রম্বেতে আণবিক শক্তির গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। দক্ষিণ ভারতের থুম্বা ও হরিপোতায় রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৭৫ সালে আর্যভট্ট নামক ভারতের এক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পরিক্রমণ করে।

ভারতে প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ। বিগত ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে রাজস্থানের মরুভূমিতে ভারতীয় আণবিক বৈজ্ঞানিকবৃন্দ মাটির নীচে ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ইহা ভারতের এক গৌরবময় অবদান। এই কৃতিত্বে ডঃ রামান্না, ডঃ শেঠনা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের সাধনা জয়যুক্ত হইল। ভারত জাতিসভায় শক্তিমানের আসন লাভ করিল। শান্তিপূর্ণ গঠন-মূলক কার্যে সমস্যা-জর্জরিত উন্নতিশীল ভারতের পক্ষে বন্ধুর মতো ইহা পরম সহায়ক। অথচ স্বার্থ-প্রণোদিত জাতিসকল শান্তি-কার্যে ভারতের এই বৈজ্ঞানিক প্রয়াসকে ব্যাহত করিতে ত্রুটি করে নাই। ভারতের এই শক্তি বিপদে রক্ষাকবচ, শান্তিতে সমৃদ্ধির উপায়। ভারতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা জোর কদমে অগ্রসর হোক্।

পর্বত অভিযান ও এভারেষ্ট বিজয়

প্রেরণা। অজানাকে জানিবার ও দুর্গমকে অধিগম্য করার দুর্দান্ত আকর্ষণ ও অসীম আনন্দ মানুষকে যুগ যুগ ধরিয়া আকৃষ্ট করিতেছে। ইহারই টানে মানুষ নদী-গিরি সাগর-মরু উত্তীর্ণ হইয়া তাহার বিজয়-ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছে। পর্বত আরোহণ এমনই একটি দুর্দান্ত প্রয়াস।

পর্বত আরোহণ শিক্ষা। পর্বত আরোহণও শিক্ষা-সাপেক্ষ। এইজন্য সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে আল্প্স্ ও অন্যান্য পর্বত আরোহণ শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবৎ আছে। সেখানকার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পৃথিবীর উচ্চতম হিমালয়-শৃঙ্গ আরোহণে বহু বার আসিয়াছেন। এজন্য দলে দলে অভিযাত্রীরা বহু বার অভিযান চালাইয়াছেন। বহু জীবন আহুতি দিতে হইয়াছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কখনও পরিত্যক্ত হয় নাই।

এভারেস্ট অভিযান। হিমালয়ের তথা পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট (৮৮৪৮ মিটার,২৯০২৮ফুট)—১৯২১ সালে ইংলণ্ডের কর্নেল হাওয়ার্ড বেরির নেতৃত্বে ১ম অভিযান, ১৯২২ সালে জেনারেল ব্রুসের নেতৃত্বে ; ২য় অভিযান, ১৯২৪ সালে ৩য় অভিযান, ১৯৩৩ সালে ৪র্থ অভিযান, ১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৮ সালের অভিযান, ১৯৫১ সালে শিপ্‌টনের অভিযান ও ১৯৫৩ সালে ডাঃ ডুনান্টের নেতৃত্বে সহযোগী তেনজিং নোরকের অভিযান—পর পর এই কয়টি অভিযানই ব্যর্থতা লইয়া ফিরিয়া আসে।

এভারেস্ট বিজয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে কর্নেল হাণ্টের অভিযাত্রী দলের হিলারী ও তেনজিং এভারেষ্টের শিখরে আরোহণ করিয়া মানুষের দীর্ঘ-কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সার্থক করেন। হিমালয় বিজয়ের গৌরবে পৃথিবীতে সাড়া পড়িয়া যায়। ইহার পর ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৭৫ সাল মধ্যে দশটি অভিযাত্রী দল এভারেস্ট-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ২টি সুইজারল্যাণ্ডের, ২টি চীনা, ১টি আমেরিকান্, ১টি ভারতীয়, ৩টি জাপানী, ১টি ইতালীয় ও নেপালী অভিযাত্রী দল।

মহিলার এভারেস্ট বিজয়। ১৯৭৫ সালের ১৬ই মে জাপানী শৃঙ্গারোহিণী শ্রীমতী জুনকো তাবির (সহযোগী শেরপা গাইড্ আং শেরিং) এভারেস্ট বিজয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নারীবর্গে এই সন্তানবতী নারীর পৃথিবীর উচ্চতম ও দুর্গম শিখর বিজয় প্রেরণাপ্রদ এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

পর্বতারোহণে বাঙালী অভিযাত্রী। পর্বতারোহণে বাঙালী ছেলেরা ও মেয়েরাও দলে দলে অগ্রসর হইয়াছেন। নন্দাঘুণ্টী, মানা, কাবরুডোম (সিকিম) প্রভৃতি হিমালয়ের দুরারোহ শৃঙ্গে তাহারা আরোহণ করিয়া পরিশ্রম কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতার পর্বত-অভিযাত্রীরা শ্রীসুকুমার রায়ের নেতৃত্বে ১৯৬০ সালে ২২শে অক্টোবর ২০,১০০ ফুট উচ্চ হিমালয়ের নন্দাঘুণ্টী শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, শৃঙ্গাভিযানে কলিকাতার শিক্ষিকা শ্রীমতী সুজয়া গুহ প্রমুখদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। ১৯৭৫ সালের ৩১শে মে দিল্লীর শ্রীমতী ভারতী ব্যানার্জী ও বোম্বের থার্টি বার্ডি কুলু-মানালীর ৬০৭০ মিটার উচ্চ ম্যাকারবা শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ইতিপূর্বে অনেক অভিজ্ঞ ইংরেজ পর্বতারোহীও ইহা বিজয়ে ব্যর্থ হন। আমাদের দেশে পর্বত অভিযান-শিক্ষাকেন্দ্র ও সংস্থা দার্জিলিং, কলিকাতা, আসানসোল, দিল্লী, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত হইয়া এদেশে পর্বতারোহণে প্রেরণা দিতেছে—দেশের তরুণ-তরুণীগণ দুর্দান্ত ও দুরন্ত জীবন-চর্চায় অগ্রণী হইতেছে।

দিল্লীতে দুর্গোৎসব

দিল্লী কালীবাড়ী। রাজধানীতে এবার পূজোয় দিন কয়েক বড় আনন্দে কেটেছে। পূজো দেখতে গেলাম নয়া দিল্লীর কালীবাড়ীতে। এটি শুধুমাত্র ধর্মস্থান নয়, এটি বাঙালীর সংস্কৃতি-নিকেতন। এর গ্রন্থশালা, পাঠাগার, অতিথিশালা, নাট্যশালা সব-কিছুই বাঙালীদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই কালীবাড়ী বাঙালীর প্রাণকেন্দ্র—এটি সবার প্রিয়। এর আকর্ষণ সবার কাছেই।

পূজোয়। অষ্টমী পূজো শেষ হয়ে এল। দেবীর সম্মুখে কাতারে কাতারে মেয়েরা অঞ্জলি দেবার জন্য দাঁড়িয়েছে, তাদেরই পেছনে সারি সারি ছেলেরা দাঁড়িয়ে। সবার হাতে পুষ্প-বিল্বপত্র। পুরোহিত মাইকে গম্ভীর ও সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পড়ছেন, সবাই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে দেবীর উদ্দেশ্যে অঞ্জলি নিবেদন করছে। সম্মুখে চালিশোভিত সুন্দর দেবীমূর্তি, বিশাল চন্দ্রাতপের তলে সুবেশ নারী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে বৃদ্ধ-তরুণ ভিড় করে আছে। সর্বত্রই গাম্ভীর্য, নিষ্ঠা ও ভক্তির ভাব। হৈ-হুল্লোড় নেই, নেই মাইকের কান ঝালাপালা-করা অশ্লীল চেঁচানি যা মনেও পীড়া দেয়। বাঙালীর এত বড় সমাবেশ, কিন্তু সবার সঙ্গেই সবার একাত্মভাব। এমন সুন্দর ভাবাঢ্য পরিবেশে প্রাণে বড়ই আনন্দ হয়।

সন্ধ্যার পর শুরু হল আরতি। তখনও প্যাণ্ডেলটি জুড়ে ভিড়। বাইরে রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে গাড়ির সারি। ফুটপাত জুড়ে দোকান বসে গেছে। আরতি দেখতে দলে দলে নারী-পুরুষ নিবিষ্ট চিত্তে মাতৃমূর্তির দিকে চেয়ে রয়েছে। উজ্জ্বল প্রদীপের আলো ও ধূপের ধোঁয়ায় স্নেহময়ী দেবীর মুখমণ্ডল স্নিগ্ধোজ্জ্বল। ঢাকীরা নেচে নেচে সজোরে ঢাকঢোল কাঁসের বাদ্যে আরতির বাজনা বাজাচ্ছে। কল্যাণময়ী জননীর আবির্ভাবে সকলের প্রাণে যেন আনন্দ ও শান্তির ছোঁয়া লেগেছে।

দিল্লীতে প্রায় ষাটটি দুর্গাপূজো হয়। শহরটি খুব ছড়ানো, উত্তর-দক্ষিণে বা পূর্ব-পশ্চিমে যমুনার পশ্চিম তীর ঘেঁষে সব দিকেই শহর ছড়িয়ে আছে। প্রায় পাড়ায় পাড়ায়ই এমনি সার্বজনীন পূজো হয়। এখানকার পূজোকে যথার্থই পূজো বলে মনে হয়। প্রত্যেকটি মণ্ডপেই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজো হয়, অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন ও প্রসাদ বিতরণ চলে, সন্ধ্যায় গান নাটক আবৃত্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালী-সুলভ সহজাত রুচি ও শ্রী মনকে সত্যই আনন্দ দেয়। এমনি পূজা-অনুষ্ঠান শুধু আনন্দ নয়, মানুষকে প্রেরণাও যোগায়।

দশমীর দিন। বিসর্জনের দৃশ্য অপূর্ব। এখানকার অধিকাংশ প্রতিমাই চালি-শোভিত। এই বেশে জগজ্জননীকে দেখতে বাঙালী মাত্রেরই বড় ভাল লাগে। দশমীর দিন মধ্যাহ্নে সমস্ত প্রতিমা কালীবাড়ীর সম্মুখে রাজপথে সমবেত হয় ট্রাকে করে। তারপর এক সঙ্গে মিছিল করে যমুনাতীরের দিকে যাত্রা করে। সঙ্গে সঙ্গে চলে অজস্র গাড়ি, ট্রাক, লরি, বাস ছেলেমেয়েদের নিয়ে। বিকালে বিশাল যমুনাতটে বিরাট সমাবেশ—যেন শহর ভেঙে বাঙালীরা মায়ের বিসর্জনে এসেছে। মনে হল এটি যেন বাঙালীরই শহর। দলে দলে ছেলেমেয়েরা, শিশুদের

কোলে কাঁখে নিয়ে গৃহস্থ বধূরা, বৃদ্ধ ও যুবকেরা, সবাই এখানে মিলিত হয়েছে। কোন প্রতিমার সামনে ধূপধুনো দিয়ে শেষ আরতি হচ্ছে, কোন প্রতিমা ছোট নৌকায় যমুনার বুকে বিসর্জনের প্রতীক্ষায় ঘুরছেন। শীর্ণকায়া যমুনার পাড়ে বিস্তীর্ণ ময়দান, সেখানে লোকারণ্য, মস্ত মেলা। দলে দলে লোক ঝুঁকে পড়ছিল নদীর ওপর, নদীতীর হতে মাকে এক বার শেষ দেখা দেখতে। বিস্তীর্ণ তীরভূমির পূর্বে ক্ষীণস্রোতা যমুনার ওপাড়ে চর ও দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যক্ষেত। আর ভাসানের ময়দানের পশ্চিমে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম যেখানে শত শত মোটর গাড়ি, বাস, ট্রাক, লরি, সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে, ওদেরই পাশ দিয়ে আরো কত যানবাহন যাতায়াত করছে। বাঙালীর এতবড় সমাবেশ দিল্লীতে আর কোন অনুষ্ঠানে হয় কিনা জানি না। এক প্রাণ এক মন নিয়ে বিশাল জনতার এ এক প্রাণবন্ত প্রকাশ। হৃদয়ে হৃদয়ে একতন্ত্রীতে এক সুরে বাঁধা। আমার মনও সেই জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। মা দুর্গাকে 'পুনরাগমনায় চ' বিদায় দিয়ে আমরাও বিসর্জনের শেষে বিষণ্ণ হৃদয়ে বাড়িমুখো হলাম। পাশ দিয়ে একটি লরি বোঝাই ছেলের দল চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা, আবার দেখা হবে।' উদয়ন গাড়ি হতে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আবার দেখা হবে।'

কিছু দূরে যেতেই আবার সেই ছেলেদের লরি। উদয়ন স্টিয়ারিংএ হাত রেখে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আবার দেখা হল।' সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

সেই হাসিতে বিসর্জনের বিষাদটুকু যেন মন থেকে সরে গেল।

স্বদেশপ্রেম

স্বদেশ সকলেরই প্রিয়। স্বদেশকে কে না ভালবাসে? যে মরুভূমিতে বাস করে, শুষ্ক অনুর্বর মরুই তার প্রিয়। যে তুষারাবৃত মেরু অঞ্চলে বাস করে, উহাই তার আদরের। দেশকে সবাই ভালবাসে। এই ভালবাসা মানুষমাত্রেরই স্বভাব। দেশ যে মানুষের কল্যাণময়ী মা, মায়ের মত সন্তানকে আঁকড়ে রাখে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই আপন দেশকে ভালবাসে, স্বদেশের গৌরবে গৌরব বোধ করে, স্বদেশকে বড় করার জন্য কত না চেষ্টা করে, স্বদেশের বিপদে প্রাণ বিসর্জন দিতে অগ্রণী হয়ে আসে।

আমরাও দেশকে ভালবাসি। আমরাও কি দেশকে ভালবাসি না? নিশ্চয়ই ভালবাসি। কিন্তু যেমনটি ও যতখানি ভালবাসতে হয়, ততখানি ভালবাসি কি? প্রাচীন কবি লিখেছেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হতেও বড়। স্বদেশপ্রেমের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে দেশকে মহাশক্তিরূপে বন্দনা করেছেন।

যথার্থ স্বদেশপ্রেম। সত্যকার স্বদেশপ্রেম তাকেই বলা যায় যেখানে নিজের স্বার্থ বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ তুচ্ছ হয়, স্বদেশের স্বার্থই সব-কিছুর উর্ধ্বে থাকে। স্বদেশকে কেন বড় বলা হয়? কারণ এখানেই মানুষ বড় হয়, স্বদেশেই তার জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। মানুষ যখন স্বদেশকে ভালবাসে, তখন সে ভুলে যায় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর প্রাত্যহিক তুচ্ছ আরাম-আয়েশ। তখন সে যথার্থ মানুষের মতো

মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাঁর প্রীতি সহানুভূতি সমবেদনা সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে যায় প্রত্যেক স্বদেশবাসীর জীবনে। যিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক, তার উদার সহৃদয়তার কাছে, তার দূরদর্শী বিচক্ষণতার নিকট কোন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা বা সাময়িক সুযোগ-সুবিধা ঠাঁই পায় না।

দেশের স্বার্থ ভুললে ব্যক্তির অবনতি। যখনই আমরা স্বদেশকে ভুলতে বসি, স্বদেশবাসীকে ভাই বলে মনে না করি, তখনই দুর্দিন আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। দুর্বুদ্ধি ও দুষ্টবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্বদেশের প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। দেশের অবনতির সঙ্গে ঘটে মানুষেরও অধোগতি।

স্বদেশপ্রেমে আত্মোন্নতি। দেশের সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। শুধু তাই নয়, এ আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ। দেশ বা জাতি বড় হলে, ঐক্যবদ্ধ হলে, স্বদেশপ্রাণ হলে, দেশের প্রতিটি মানুষও বড় হয়, মহৎ হয়, স্বদেশপ্রেমিক হয়। স্বদেশপ্রেমই সংকীর্ণ বিরোধের অবসান ঘটায়। আমরা যতই স্বদেশপ্রেমিক হব, ততই আমাদের দৃষ্টি উদার হবে, পরিচ্ছন্ন হবে, শুদ্ধ হবে।

স্বদেশকে ভালবাসা কিন্তু পরদেশকে ঘৃণা বা ছোট করা নয়। স্বদেশপ্রেম মানবপ্রেমেরই একটি প্রকাশ।

মহানায়ক আবুল কালাম আজাদ

জন্ম—পিতামাতা। মক্কানগরে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মৌলানা মোহাম্মদ খয়ের-উদ্দিন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মক্কানগরে গমন করেন এবং সেইখানেই বসবাস করেন। আজাদের মাতা মক্কার এক সম্ভ্রান্ত আরব মহিলা ছিলেন।

বাল্যজীবন। মৌলানা আজাদের বাল্যজীবন মক্কাতেই অতিবাহিত হয়। তিনি মাতার নিকট আরবি ভাষা এবং পিতার নিকট উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। আজাদের বয়স যখন দশ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার পিতা ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কলিকাতায় বাসস্থান নির্মাণ করেন।

শিক্ষা। কলিকাতায় আসিয়া আজাদ কোন স্কুলে ভর্তি হন নাই। তাঁহার পিতা এ বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। পিতার নিকটই কিশোর আজাদের শিক্ষা চলে। একে মাতৃভাষা আরবি, তাহার উপর আজাদের পিতৃবন্ধু আরবি পণ্ডিত ছিলেন, ফলে আজাদ চৌদ্দ বৎসর বয়সে আরবি ভাষায় দর্শন, ন্যায়, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্য আয়ত্ত করেন। এমন কি এই বিষয়গুলি সেই সময়ে তিনি অন্যদের পড়াতেনও।

১৯০৫ সালে পিতার আদেশে আজাদ উচ্চতর আরবি শিক্ষার জন্য কায়রো আল্-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং সেখানে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ইংরেজী শিক্ষা আজাদ পিতার মৃত্যুর পর শুরু করেন—মাত্র একখানি ডিক্সনারি ও একটি গ্রামারের সাহায্যে। তাঁহার পাঠগৃহে গেলে দেখিতে,

সেখানে ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও আধুনিকতম গ্রন্থও স্থান পাইয়াছে এবং প্রত্যেকখানি বই তাঁহার পড়া।

সাংবাদিক ও কবি। আজাদ জন্ম হইতেই যেন লেখক ও সাংবাদিক হইয়াছিলেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

আজাদ নিজে উর্দু ভাষায় চমৎকার কবিতা লিখিতেন। কলিকাতা গার্ডেন রীচের নিকট কবিতা-প্রতিযোগিতা হইত। উর্দুতে ইহাকে 'মুশায়েরা' (হিন্দীতে কবি সম্মেলন) বলে। আজাদ এই সকল প্রতিযোগিতায় সর্বদাই বিজয়ী হইয়া আসিতেন। খ্যাতনামা কবি ঘালিবের শিষ্য নাদির খান কিন্তু বালক আজাদের কবিতা রচনায় বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। একদিন তো তিনি রাস্তায় এক পুস্তকের দোকানের সামনেই তরুণ কবি আজাদকে ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার কবিতা যে তোমার নিজের রচনা তাহা এখনই হাতে হাতে পরীক্ষা করিতেছি। এই একটি তরাহ্—য়াদ না হো, শাদ না হো, আবাদ না হো। এখনই ইহা পূরণ কর।' বালক আজাদ বড়ই বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার আত্মশক্তির প্রমাণ দিবার জন্য মুখে মুখে চরণের পর চরণ রচনা করিয়া নাদির খাঁকে শুনাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নাদির খান সেই রাজপথে দাঁড়াইয়া আনন্দে বিস্ময়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন—সোব্হান্-আল্লাহ্ সোবহান্-আল্লাহ্।

কবিতা লিখিবার সময় 'আজাদ' এই ছদ্মনাম মৌলানা সাহেব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে এই ছদ্মনামেই তিনি জগদ্বিখ্যাত।

রাজনৈতিক জীবন। কিন্তু আজাদের অগ্নিগর্ভ প্রতিভা কেবলমাত্র সৌখীন কাব্যচর্চাতেই তুষ্ট রহিতে পারিল না। ১৯০৫ সাল হইতে দুই বৎসর মিশর, সিরিয়া ও ইরাকে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার চিত্তে নব প্রেরণা জাগ্রত হইল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আজাদ দেখিলেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সমগ্র দেশ সংক্ষুব্ধ। বাংলার স্বদেশ-সেবকদের সঙ্গে তিনিও একাত্মতা অনুভব করিলেন।

১৯১২ সালের ১লা জুন কলিকাতায় আজাদ 'আল্-হিলাল' নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। এই পত্রিকাটির প্রচার সমগ্র ভারতে বিপুল ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আজাদের স্বাধীন ও নির্ভীক সমালোচনায় ব্রিটিশ সরকারও বিব্রত হইয়া উঠিল। তখন য়ুরোপখণ্ডে প্রথম মহাসমরের তাণ্ডবনৃত্য শুরু হইয়া গিয়াছে। এদেশে ভারতরক্ষা আইনের প্রবল প্রতাপ—দেশের যুবকগণ কারারুদ্ধ, জনমত সঙ্কুচিত। বাংলার মুক্তিকামী প্রাণের ছোঁয়াচ আজাদের তরুণ মনের আকাশও রঙিন করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে আজাদের পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। তিনিও কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং রাঁচীতে অন্তরীন হইলেন। এইরূপে আজাদের রাজনৈতিক জীবন-প্রভাত আরম্ভ হইল।

অবশেষে ১৯২০ সালে মৌলানা আজাদ মুক্তি লাভ করিলেন। এই সময়ে আসমুদ্র হিমাচল কম্পিত করিয়া ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন শুরু

হইল। আজাদ ইহাতে একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই বছরই দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আজাদের প্রথম আলাপ হইল। এখন হইতে আজাদের সংগ্রামময় জীবনের আরম্ভ হইল। এই জন্য তাঁহাকে বহু বার নির্যাতন ও কারাবাস ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তেজীয়ান্ আজাদ কখনও তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

কনিষ্ঠ কংগ্রেস সভাপতি। ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে আজাদ ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেসের মহাসম্মানজনক সভাপতির পদে বৃত হন। ইনি কংগ্রেসের কনিষ্ঠ সভাপতি। ১৯৪০ সালে তিনি তৃতীয় বার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ ৬ বৎসর অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সতর্ক অভিভাবকের ন্যায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও সংগ্রাম পরিচালনা করেন। এই সময় হইতেই আজাদ স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন। অপর কোন মনস্বী এরূপ রাজনৈতিক সংকটপূর্ণ সময়ে দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সভাপতির দায়িত্ব বহন করেন নাই।

স্বাধীন ভারতে প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। মৌলানা আজাদ দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৪৫ সালে অন্যান্য নেতাদের সহিত মৌলানা আজাদও কারামুক্ত হইলেন। এই সময়ে সর্বগ্রাসী মহাসমর শেষ হইয়াছে। ভারতবর্ষ এক যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়।

স্বাধীন ভারতে আজাদ শিক্ষামন্ত্রীর আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন। ১৯৫৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে একজন অদ্বিতীয় মনীষীর অবসান ঘটিয়াছে।

স্বভাব ও চরিত্র। মৌলানা আজাদ স্বভাবতঃ গম্ভীর ছিলেন—তাঁহার দীর্ঘ ঋজু ও রাজোচিত গঠন ও বুদ্ধিদীপ্ত আয়ত চক্ষু দেখিলে মাথা আপনি নত হইত। জনতার চেয়ে গ্রন্থের আবেষ্টনই তাঁহার প্রিয়তর ছিল।

তিনি সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার আর একটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি আলাপ-আলোচনা কখনও ইংরেজী ভাষায় করিতেন না, সর্বদা উর্দু ভাষায় করিতেন। অথচ তাঁহার ইংরেজী জ্ঞান কাহারো চেয়ে কম ছিল না।

মৌলানা আজাদ রাজনৈতিক নেতারূপেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু তিনি বড় সাহিত্যিক এবং ততোধিক বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যশঃ-সৌরভ এশিয়াখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

রাজধানীর কথা

ভারতের নূতন রাজধানী। নয়া দিল্লী ভারতের রাজধানী। এটি ইংরেজের তৈরি। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতায়। সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশবিভাগ রদ হল, কিন্তু বাঙালীর ইংরেজ-বিরোধী রাজনৈতিক প্রভাব নষ্ট করবার প্রয়াসে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে রাজধানী দিল্লীতে অপসারিত হল।

ইতিবৃত্ত। কিংবদন্তী অনুসারে মহাভারতের পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ এখানে ছিল। লোকে বলে, যেখানে দিল্লীর 'পুরনো কেল্লা বা ইন্দ্রপত', ওখানেই

প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। ঐতিহাসিক ফেরিশতা লিখেছেন, অষ্টম শতাব্দীতে দিলু নামে কনৌজের রাজার নামানুসারে দিল্লী নাম হয়েছে। একাদশ শতাব্দী হতেই দিল্লীর প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সময় তোমর বংশের রাজাদের রাজধানী ছিল দিল্লীর নিকট সূরজকুণ্ড। ১০৫০ খ্রীস্টাব্দে অনঙ্গ পাল তোমর মেহেরৌলির নিকট লালকোটে দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরা নিজ নামে ওখানে আর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এটিই কুতব-মিনার অঞ্চল। মুহম্মদ ঘুরী ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে এখানেই মুসলমান রাজ্যের প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। এর পর হতে পর পর সুলতানী আমল ও মুঘল আমলের বহু রাজ্যের উত্থান ও পতনের রোমাঞ্চকর কাহিনী দিল্লীর প্রান্তরে অভিনীত হয়েছে। অবশেষে মারাঠা ও ইংরেজের দ্বন্দ্বে, দিল্লী ইংরেজের রাজ্যভুক্ত হয় ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে।

সাতটি দিল্লী। দিল্লীর অঙ্গে অঙ্গে বিগত আট শত বছরের ইতিহাস আজও আঁকা রয়েছে। পর পর সাতটি দিল্লীর—সাতটি রাজধানীর অজস্র অট্টালিকা, সমাধি, মস্‌জিদ, দুর্গ, ভগ্নস্তূপ ও প্রাকার, অসংখ্য কবর মাইলের পর মাইল জুড়ে রয়েছে। একাদশ শতকের রাজা অনঙ্গপালের দুর্গ লালকোট হতে শুরু করে পাঠান আমলের সিরি, তুঘলকাবাদ, জাহাঁপন্নাহ্‌, ফিরোজাবাদ, পুরনো কেল্লা (ইন্দ্রপত) ও সর্বশেষে মুঘলের শাহ্‌জাহানাবাদ (বর্তমানের পুরনো দিল্লী) একের পর এক গড়ে উঠেছে—কখনও একটির ওপরে আরেকটি, কখনও একের পাশে অন্যটি, কখনও নিকটে, কখনও দূরে। একমাত্র শাহ্‌জাহানের দিল্লী ছাড়া আর সবই এখন ইট-পাথরের ভগ্নস্তূপ—অতীতের অতুল ঐশ্বর্য, দুর্দান্ত দম্ভ ও ক্ষমতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অতীত কথা বলে। এরা যেন একসঙ্গে কথা কয়ে ওঠে—আট শত বছরের কাহিনী একে একে বলে চলে। মধ্যযুগের স্বৈরতন্ত্রী শাসনের কত উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, নিষ্ঠুরতা-নিপীড়ন, ভোগবিলাস ও ধর্মান্ধতা, উল্লাস ও বেদনার পরিচয় এরা বহন করে চলেছে। ভগ্নদূতের মতো এখনও দাঁড়িয়ে—কেউ ব্যথায় ভারাক্রান্ত করে, কেউ শিল্পের বিশালতায় ও নিপুণতায় মুগ্ধ করে।

দুই দিল্লী। দিল্লীতে অতীত ও বর্তমানের মিলন ঘটেছে—পাশাপাশি ঘিঞ্জি শহর পুরনো-দিল্লী ও পরিকল্পিত সুসজ্জিত রূপসী নয়া দিল্লী।

পুরনো দিল্লীর প্রাচীন কীর্তির মধ্যে লাল কেল্লা, জামে-মস্‌জিদ, সোনহেরি ও জিন্নাতুল মস্‌জিদ, দিল্লী গেট ও কাশ্মীরী গেট্, খুনী দর্‌ওয়াজা (রক্তদ্বার) প্রভৃতি কয়েকটি তোরণ দর্শনীয়।

ইংরেজ আমলে। ইংরেজ আমলে নয়া দিল্লী ছিল মুখ্যতঃ আমলাদের শহর। সরকারি কাজের প্রয়োজনে পরিকল্পনা অনুযায়ী সুবিন্যস্ত ভাবে শহরটি তৈরি করা হয়। এই সময়ে রাষ্ট্রপতি-ভবন, লোকসভা-ভবন, কেন্দ্রীয় দপ্তরখানার উত্তর ও দক্ষিণ ব্লক, রাজপথ ও ভারত-তোরণ, কনট প্লেস ও কনট সার্কাস নূতন রাজধানীকে শোভাময় করে তোলে।

স্বাধীনতার পর অত্যুন্নতি। দিল্লীর বর্তমান রূপ ও প্রসার ইংরেজের হাতে শুরু হলেও স্বাধীনতার পর হতেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সুপরিকল্পিত ভাবে নয়া দিল্লী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছায়াতরু ও পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত প্রশস্ত রাজপথ, বিশাল বিশাল সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিপুলকায় আকাশচুম্বী বহুতল হোটেল, রংবেরংএর ফোয়ারা ও ফুলে-ভরা সুন্দর সুন্দর বাগ-বাগিচা, বিভিন্ন রাজ্যের নবাগত অধিবাসীদের সুরম্য অট্টালিকাময় অসংখ্য উপনগরী, নানা দেশের রাষ্ট্রদূতদের বাগান-শোভিত বড় বড় আবাস—সব কিছু মিলে দিল্লীকে ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য-মণ্ডিত করে রাজধানীর গৌরব বাড়িয়ে তুলেছে। যমুনার পারে রাজঘাট, শান্তিবন ও বিজয়ঘাট মহাত্মাজী, নেহরুজী ও শাস্ত্রীজীর স্মৃতিপূত হয়ে সবুজ ঘাসে গাছে ও ফুলে ফুলে শান্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। বাবলা গাছে ভরা দিল্লীর মধ্যস্থলের পাহাড়িয়া বনাঞ্চলে সুবিস্তৃত বুদ্ধ-জয়ন্তী পার্ক ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বড়ই মনোরম।

নূতন শিল্প-নগরী। রাজধানী হতে কিছু দূরে দুটি বড় শিল্প-নগরী ফরিদাবাদ ও গাজিয়াবাদে সুপরিকল্পিত ভাবে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় দিল্লী নগরীর শুচিতা ও সৌন্দর্য অমলিন রয়েছে।

অমৃতের সন্ধানী। একদিন আত্মম্ভরী লর্ড কার্জন বলেছিলেন, দিল্লী হচ্ছে পরিত্যক্ত শহরগুলোর মলিন ও ম্রিয়মান কবরময় নগরী। স্বাধীন ভারতে সেই গোরস্তানের শহর দিল্লী আজ প্রাণপ্রাচুর্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৃতের দেশে অমৃতের সন্ধান মিলেছে।

দার্জিলিং ও হিমালয়

কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য। দার্জিলিংএর শোভা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা যারা সারা উত্তর দিকটা আলো করে রাখে। অপূর্ব সে দৃশ্য। রূপালি সূর্যালোকে পর পর সাজানো সবগুলো শিখর ঝক্ মক্ করতে থাকে। এক দৃষ্টিতে উঁচু দ্বাদশটির বেশি শৃঙ্গ দেখতে পারবে না। ভোরে এদের এক দৃশ্য, দুপুরে অন্য রূপ, আবার সূর্যাস্তের সময় মুহূর্তে মুহূর্তে সৌন্দর্যচ্ছটা ছড়িয়ে দেয়। এ দেখার শেষ নেই, যতই দেখবে ততই দেখার ইচ্ছে বাড়ে। নব নব রূপে, নব নব বেশে—কাঞ্চনের রূপমাধুরী নয়ন ও মনকে টেনে নেয়। পৃথিবীর মানুষ কাঞ্চনের রূপ দেখতে ছুটে আসে।

শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ। দার্জিলিং শহরটি একটি পর্বতের মাথায় ও পশ্চিমের ঢালে গড়ে উঠেছে। এর সর্বোচ্চ স্থান ঘুম, সর্বনিম্ন লেবং। ইংরেজি y অক্ষরটির মতো এর চেহারাকে বলা চলে। ঘুম শহর হতে শুরু হয়ে চৌরাস্তা পর্যন্ত পাহাড়টি সোজা এসেছে, তারপর ডানে ও বাঁয়ে পাহাড়ের দু বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে—একটি বার্চ হিলের দিকে, অন্যটি লেবং-এর দিকে। চৌরাস্তাকে শহরের কেন্দ্র বলা চলে।

দার্জিলিংএর প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম। এর পশ্চিম ও দক্ষিণে উচ্চ পর্বতশ্রেণীগুলো একটির পর একটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে সুদূর-প্রসারিত দৃষ্টিতে দেখা যায়—চিরসবুজ পর্বতশ্রেণীর পর পর্বতশ্রেণী তরঙ্গের মতো ক্রমোচ্চ হয়ে ঠেকেছে গিয়ে চিরতুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপালি শিখরমালায়। শহরের

চারদিকেই চিরসবুজ পর্বতমালা ঢেউয়ের মতো সাজানো রয়েছে। চাবাগানগুলো এদেরই মাথা ও গায়ে সাজানো, দূরে পাইন বার্চ ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি গাছের শোভা। উঁচু বনে রডোডেনড্রন প্রভৃতি ফুলেরও কত বাহার। টাইগার হিলের উপর হতে প্রভাত-সূর্যোদয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেস্ট শৃঙ্গের রং‌এর বিচিত্র মেলার শোভা অবর্ণনীয়। বার হাজার ফুট উচ্চে সন্দকফু ও ফালুট হতে একসঙ্গে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গগুলির দৃশ্য পৃথিবীতে অতুলনীয়। শীতকালে চারদিক শুভ্র তুষারে ঢাকা, বসন্তকালে বিচিত্র ফুলের সমারোহ। এখানকার নীরব শান্ত সুন্দর অপার্থিব দৃশ্যে প্রাণ অনাবিল আনন্দে ভরে ওঠে, মন কোন্ দূরলোকের সন্ধানে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ে।

নাম। দার্জিলিং নামের অনেক ইতিবৃত্ত আছে। কেহ বলেন, তিব্বতী দোর্‌জি অর্থ দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র, লিং অর্থ ভূমি বা স্থান। অর্থ দাঁড়ায় বজ্রভূমি। সিকিমীরা বলেন, দোরজি হল সিকিমী দেবতার নাম, লিং অর্থ শিবলিঙ্গ। মহাকাল পাহাড়ে এই দুই দেবতা প্রতিষ্ঠিত। কেহ বলেন, সংস্কৃত 'দুর্জয়লিঙ্গ' অর্থাৎ শিবের নাম হতে অথবা এখানকার দোরজি নামক প্রাচীন লামার নামে দার্জিলিং নামকরণ।

শহরের ইতিবৃত্ত। শহরটি ইংরেজ সরকার ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে সিকিমের রাজার নিকট হতে প্রাপ্ত হন। এর কয়েক বছর পর চাবাগানের পত্তন হতেই দার্জিলিংএর প্রসার শুরু হয়। ইংরেজ সৈন্যদের আবাস, ইংরেজ ছেলেমেয়েদের শিক্ষালয়, খ্রীস্টধর্ম প্রচারের গির্জা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ এখানকার স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ার জন্যই ইংরেজ সরকার শহরটির পত্তন করে।

পথে যেতে। শিলিগুড়ি হতে টয় ট্রেনে যাওয়া নূতন যাত্রীদের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। টয় ট্রেনে সমতলের কিছুদূর বিশাল এক বনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তারপর ক্রম-উচ্চ পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট গাড়িগুলো উপরের দিকে উঠতে থাকে। ট্রেনের সামনে ও পেছনে দুটো ইঞ্জিন ঝক্ ঝক্ করে কয়লার ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে গাড়ির কামরা কয়টি টেনে নিয়ে ছোটে। একপাশে উঁচু পাহাড়, মাঝে মাঝে পাইন গাছের বন, বেগবতী ঝরণা, আর অপর পাশে গভীর খাদ, দূরে শস্যশ্যামল সমতল ভূমি, রূপালি নদী—এক অপূর্ব দৃশ্য, দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন আনন্দে উছলে পড়ে।

ট্রেনটি উপরের দিকে উঠতে উঠতে সর্বোচ্চ ঘুমে (৭৪০৭ ফুট উঁচু) পৌছে। তারপর ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়ে বাতাসিয়া লুপ পার হলেই চোখের সাম্‌নে অকস্মাৎ ভেসে ওঠে বিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা, প্রাণে এক অপূর্ব শিহরণ জাগায়। এর পরেই দেখা দেয় রূপসী দার্জিলিং শহর সাজানো বাগানের মতো। আবার রাত্রি বেলায় দূর হতে ধাপে ধাপে আলোকমালায় শোভিত শহরটি দেয়ালীর আভাস জাগায়।

উপসংহার। হিমালয়ের কথায় আমাদের চোখে ভেসে ওঠে মহাপ্রস্থানের পথ—মুনি ঋষি ব্রহ্মচারী তপস্বীদের আশ্রম, দেবভূমি, শাস্ত্রচর্চা, বেদগান এই সব। হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তের দার্জিলিং কিন্তু যোগভূমি নয়, এটি ভোগভূমি।

অভ্রভেদী ধবলশৃঙ্গমালার বিশালতা, স্থিরগাম্ভীর্য, মনোমুগ্ধকর অতুলনীয় সৌন্দর্য যে আনন্দ ও প্রেরণা দেয়, তার তুলনা কোথায়?

শৃঙ্খলাজ্ঞান বা নিয়মনিষ্ঠা

প্রকৃতি ও মানব-জীবন নিয়ম বা শৃঙ্খলার অধীন—ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাজ্ঞান—ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলাজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত সময়—ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা—কর্মী ও শ্রমজীবীদের শৃঙ্খলাজ্ঞান অত্যাবশ্যক—শৃঙ্খলাজ্ঞান বর্তমানের উজ্জীবন-মন্ত্র।

কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি বৈষয়িক কর্মজীবনে, কি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, উন্নতির প্রথম সোপান শৃঙ্খলাজ্ঞান বা নিয়মানুবর্তিতা (বা নিয়মনিষ্ঠা)। যেখানে যত বেশি শৃঙ্খলাপরায়ণতা সেখানে উন্নতি তত বেশি তত দ্রুত। বিশেষতঃ বর্তমান সভ্যমানবের জটিল জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলাপরায়ণতা একান্ত অপরিহার্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা নিয়মের রাজত্বই দেখিতে পাই। প্রতিদিন যথানিয়মে সূর্য উদয় হইতেছে, সূর্য অস্ত যাইতেছে, পৃথিবীর ও গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন হইতেছে, সব-কিছুই নির্দিষ্ট নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। মানুষের জীবনও সেই নিয়মেরই শাসনে চলে। শৃঙ্খলাজ্ঞান আয়ত্ত থাকিলেই আমাদের জীবন সহজেই সুন্দর, সমৃদ্ধ ও সফল হইতে পারে।

শৃঙ্খলাজ্ঞান (বা নিয়মনিষ্ঠা) ব্যষ্টি বা সমষ্টির উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। ব্যক্তির দৈহিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার উন্নতির পথে প্রধান অবলম্বন নিয়মনিষ্ঠা। মানুষ নিয়মের দাস, আবার নিয়ম পালন করিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ, তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। দেহের উন্নতির জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, নৈতিক উন্নয়নের জন্য সংযম সাধন, বিদ্যাশিক্ষার জন্য সময়নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তদুপযোগী কঠোর অনুশাসন পালন—সকল ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলাপরায়ণতা। আবার সমষ্টির ক্ষেত্রে দেখি, ছাত্রগণ যদি স্কুল-কলেজের বিধি-নিয়ম মানিয়া না চলে তবে বিদ্যালয়ের কাজ চলিতে পারে না। স্বেচ্ছা-সেবকগণ যদি দলপতির আদেশ সর্বতোভাবে মান্য না করে, তবে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি সৈন্যগণ সেনাপতির আদেশ অমান্য করে, তবে যুদ্ধাদি ব্যাপার সম্ভবপরই হয় না। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্রের দপ্তরে, শিল্প-কারখানায়, আপিস-আদালতে বা জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে শৃঙ্খলাপরায়ণতাকে উহাদের প্রাণ বলা যাইতে পারে। ইহার অভাবে সমস্ত কাজকর্ম অচল হইয়া পড়ে এবং উহাদের ক্রমাবনতি ঘটিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। এই কারণে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য সর্বক্ষেত্রেই কঠোর দণ্ডের বিধান আছে। কিন্তু যাহারা কেবল শাস্তির ভয়ে বা অর্থলোভে শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়, তাহারা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া কাজ করিতে পারে না। প্রত্যেক কর্মীর কঠোর কর্তব্য-জ্ঞান, দায়িত্ব-জ্ঞান ও আত্ম-মর্যাদার জ্ঞান না থাকিলে সংহতভাবে কোন কার্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা যায় না। আবার দেশহিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তি দেশের কাজে ব্যক্তিগত মত-স্বাতন্ত্র্যও খর্ব করেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখ-সুবিধা বিসর্জন দেন। যে শৃঙ্খলাজ্ঞান অনুশীলন করে নাই, সে দশজনের সহিত একমত হইয়া সংহতভাবে কাজ করিতে পারে না, সে উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রশ্রয় দেয়। শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তির মিথ্যা মর্যাদাজ্ঞান অহমিকা বা ঔদ্ধত্য থাকে না, ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির আদেশ পালন ভ্রান্ত দাসমনোভাব-সূচক মনে করে না, নিয়মনিষ্ঠ ভাবে কাজ করিয়া যাওয়াই তাহার কর্তব্য।

স্মরণ রাখিবে, মুষ্টিমেয় সৈন্যদল শৃঙ্খলাপরায়ণ বলিয়া বিশাল সাম্রাজ্য বিজয় করিতে পারে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জনতা বিশাল হইলেও একেবারে অকেজো। সাম্প্রতিক কালে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর গৌরবময় অভিযান। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অসামান্য নেতৃত্বশক্তিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শত-বিচ্ছিন্ন বহু-বিচিত্র ভারতীয়দের সংহত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ এক সুগঠিত সৈন্যদলে পরিণত করিয়া যে অসাধারণ বীরত্ব ও অমানুষিক কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার মূলে কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা, ত্যাগ ও দেশপ্রেম।

দল হইলেই আবার দলাদলির সম্ভাবনাও আছে। আমাদের দেশে অনেক সময় দলাদলির হুজুগেই দলের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। আমরা ঘোরঘটা করিয়া দেশের পূজায় ব্রতী হইয়া দলের পূজায় ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। ইহার কারণ আমাদের প্রকৃত দেশাত্মবোধ এখনও পরিপূর্ণ জাগ্রত হয় নাই, আমরা দেশের পায়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মত-স্বাতন্ত্র্য বলিদান করিবার যে মহৎ শৃঙ্খলা-জ্ঞান বা নিয়মনিষ্ঠা তাহা এখনও পূর্ণরূপে শিখি নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশেও রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী দল আছে, পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদও আছে, কিন্তু দেশমাতৃকার সেবার কার্যে এবং বিপদের সময় সপ্তবীণা এক তন্ত্রীতে বাজিয়া ওঠে, এক সুরে ঝঙ্কার দেয়। ইহারা যথার্থ নিয়মনিষ্ঠ (disciplined) জাতি।

বাল্যকালই শৃঙ্খলাজ্ঞান শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। ইহা দীর্ঘকালের শিক্ষা-সাপেক্ষ। গৃহে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনে পিতামাতা ও শিক্ষকের নিকটে আদেশানুবর্তিতা ও নিয়মনিষ্ঠা শিক্ষালাভ হয়। প্রাচীন ভারতে ছাত্রগণ গুরুগৃহে কঠোর ভাবে ত্যাগ সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষালাভ করিয়া দৃঢ়চরিত্র গঠন করিত। সেকালের রাজপুত্রগণও গুরু-সকাশে বেদাভ্যাসের সঙ্গে ধনুর্বিদ্যাদি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভ করিত এবং আশ্রম-জীবনে সংযমী, ত্যাগশীল ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হইত, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারের কোন স্থান সেখানে ছিল না। আধুনিক বিদ্যালয়ে নিয়মনিষ্ঠার শিথিলতার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পাইতেছে। ইহা ছাত্রদের ব্যক্তিগত জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে, শক্তির অহেতুক অপচয় হইতেছে, তাহাদের কর্মক্ষম সুদৃঢ় জীবন গঠন ব্যাহত করিতেছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না হইলে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের তরুণদের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, ভাবী বাঙালী জাতি প্রগতির দ্রুত পরিক্রমায় উন্নতিশীল জাতিসকলের সঙ্গে সমভাবে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না। এজন্য চাই ছাত্র ও যুবকদের সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং মহৎ আদর্শ, দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা। বাংলাদেশে আদর্শবাদী একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কোন দিনই অভাব হয় নাই। আজ জাতির এই দারুণ দুর্দিনে উচ্ছৃঙ্খলতার নৈরাজ্য হইতে উদ্ধার-মানসে সমগ্র দেশ বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে। যোগ্য নেতৃত্ব পাইলে নিয়মনিষ্ঠ ছাত্রদলই দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ জীবন গড়িবে, উচ্ছৃঙ্খল জনতা সুশৃঙ্খল জনশক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। তখন আশা জাগিবে, উৎসাহ জাগিবে, শক্তি জাগিবে, জাতি জাগিবে।

বর্তমান উন্নত ও বৈজ্ঞানিক কারিগরি যুগে শৃঙ্খলা-জ্ঞানের সর্বাধিক প্রয়োজন কল-কারখানায়, সর্ববিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক বিভাগসমূহে। এজন্য কর্মী ও শ্রমজীবীদের সেবাজ্ঞান, শৃঙ্খলাজ্ঞান ও দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিবার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে নিয়মনিষ্ঠ করিতে হইবে। নতুবা বিশৃঙ্খলতা জাতীয় সংহতি ধ্বংস করিবে, জাতীয় প্রগতি ব্যাহত হইবে।

শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠাতে উত্থান, উচ্ছৃঙ্খলতায় পতন। আজকের দিনে আমাদের জীবনে মর্মান্তিক ভাবে প্রয়োজন শৃঙ্খলাজ্ঞানের, আমাদের উত্থান ও উজ্জীবনের ইহাই একমাত্র মন্ত্র, ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই।

বাঙালীর সংস্কৃতি

সংস্কৃতি জাতির ভাবনা ও কর্মের মিলিত প্রকাশ—সংস্কৃতি জাতির উন্নতির মানদণ্ড—বঙ্গ-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত—নৃতাত্ত্বিক গড়ন—মধ্যযুগে : ইসলামিক সংস্রব—ধর্ম ও দর্শনে তিনধারা—আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সংঘাত—বঙ্গ-সংস্কৃতিতে নবজাগরণ : ত্রিশক্তি ক্রিয়াশীল, সমন্বয় সাধন—স্বাদেশিকতা নব অবদান—লৌকিক ধর্ম, লৌকিক সাহিত্য—বৈষ্ণব প্লাবন, পদাবলী, কীর্তন, মৃদঙ্গ, লোকসঙ্গীত—বিবিধ শিল্পসৃষ্টি—উৎসব—স্বাধীনতার পর : সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের পরিবেশ চাই।

সংস্কৃতি সমগ্র জাতির কল্পনা ভাবনা ও কৃতিত্বের প্রাণবন্ত প্রকাশ। দীর্ঘ শতাব্দীর সুদীর্ঘ সাধনা ও তপস্যায় তিল তিল করিয়া জাতীয় সংস্কৃতি স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে। ইহা জাতির প্রাণ-প্রাচুর্যের সামগ্রিক প্রয়াসের চরম পরিণতি ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-সাহিত্যের বিচিত্র সৃষ্টি, ধর্ম ও দর্শনের ভাবনা, সাধনা ও আনুষ্ঠানিকতা, আমাদের নীতিজ্ঞান, আমাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য, আমাদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদ—বঙ্গ-সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্যময় প্রতিচ্ছবি আমাদের আত্মিক ও কর্মময় জীবনধারার সম্মিলিত প্রকাশ।

সংস্কৃতি শব্দটিকে ইংরেজী culture শব্দের প্রতিশব্দ বলা যায়। জাতির মানস-প্রকৃতি অর্থাৎ তাহার শিক্ষা সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান শিল্প রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ইতিহাস প্রভৃতির সমন্বয়ে সংস্কৃতি রূপ লাভ করে। সংস্কৃতিই জাতির পরিচয়-গৌরব বহন করে। কোন জাতির উন্নতির পরিচয়ও সংস্কৃতিতেই আমরা পাই। সংস্কৃতিই জাতির উন্নতির মানদণ্ড।

বঙ্গ-সংস্কৃতি বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির রূপভেদ হইলেও ইহা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেরূপ বহু জাতি, বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনের ফল, বঙ্গ-সংস্কৃতিও সেইরূপ বহু মিশ্রণেরই প্রকাশ। নৃতাত্ত্বিকগণের মতে বাংলাদেশে জনসমষ্টিতে কোল মুণ্ডা প্রভৃতি অষ্ট্রিক গোষ্ঠী, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল গোষ্ঠী এবং আর্যগোষ্ঠী মিলিত হইয়া বহু রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণের ওপর জৈন, বৌদ্ধ, বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল ও সর্বগ্রাসী প্রভাবে বাঙালী সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ-সংস্কৃতিকে

মধ্যযুগে প্রভাবিত করিয়াছে ইসলামের সাম্যবাদ ও সুফীমত, আধুনিক যুগে খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা। মধ্যযুগে মুসলমানী রীতিনীতি এবং পারস্য ভাষা ও সাহিত্য বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন যেরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল, আধুনিক যুগে বাঙালীকে তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশি প্রভাবিত করিয়াছে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা। দীর্ঘ শতাব্দীর বহু জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনে ও ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালীর গ্রহিষ্ণু ও সহিষ্ণু জীবনে বঙ্গ-সংস্কৃতি প্রস্ফুটিত শতদলের মতো মহামহিমায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

মোটামুটি ভাবে বলা চলে, হাজার বৎসর আগে বঙ্গ-সংস্কৃতির সূত্রপাত—পালরাজা ও সেনরাজাদের সময়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের কারণে রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দারুণ বিপর্যয় ঘটে। ইসলাম সম্পূর্ণ পৃথক্ ধর্মাদর্শ ও সভ্যতা এদেশের মাটিতে রোপণ করিল, হিন্দু-সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় চলিল আত্মরক্ষার প্রাণান্তকর প্রয়াস, স্মার্ত মহাপণ্ডিত রঘুনন্দন কমঠব্রতের বিধান দিলেন, কচ্ছপ যেরূপ বিপদের সময় হস্তপদাদি কঠিন আবরণের ভিতরে সংকুচিত করিয়া আত্মরক্ষা করে, হিন্দু সমাজকে সেইরূপ মুসলিম সংস্পর্শ হইতে সর্বপ্রকারে দূরে থাকিবার নির্দেশ দান করেন। এমন কি ভারত মহাসাগরে আরবদের আধিপত্যের জন্য হিন্দুদের সমুদ্র-যাত্রাও নিষিদ্ধ হয়। সমকালেই আবার মহাপ্রভু উদার মত ও পথের নির্দেশ দেন। বস্তুতঃ আজিকার বাঙালীর সংস্কৃতি এই সময় হইতেই ঘাত-প্রতিঘাত ও গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। ইসলামের সাম্য ভ্রাতৃত্ব অতীন্দ্রিয় সুফীবাদ প্রভৃতি বাঙালীর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, যাহার ফলে পরবর্তী কালে আউল-বাউল মুর্শিদা বা দেহতত্ত্বের গান, সত্যপীরের পূজা ইত্যাদির প্রচলন হয়।

মধ্যযুগ হইতে বাঙালীর ধর্ম ও দর্শন-চিন্তায় তিনটি বিশিষ্ট ধারা ও কর্ম-পদ্ধতি দেখিতে পাই—প্রথম, জ্ঞানমার্গের ন্যায় বেদান্ত স্মৃতি প্রভৃতি ; দ্বিতীয়, প্রেমমার্গের বৈষ্ণব দর্শন ও সাধন মহাপ্রভুর প্রভাবে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও প্রভাবশালী হয় ; তৃতীয়, তন্ত্র-সাধনা বা শক্তি-সাধনা যাহা বাংলারই বিশেষ দান। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব দর্শন, সাধন, সাহিত্য ও জীবন-দর্শন বাঙালীর জীবনকে সবচেয়ে অধিক প্রভাবিত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। বাঙালী সংস্কৃতিতে বৈষ্ণব সাধক দার্শনিক ও ভক্ত সাহিত্যিকদের দানে সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিকে ভাস্বর করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধশেষে বাংলা তথা ভারত ইংরেজ অধিকার করিবার পর হইতে বাংলার সংস্কৃতিতে দ্রুত রূপান্তর সাধিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারায় বাঙালীরা আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া পড়িল, পাশ্চাত্যের সব কিছুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পাশ্চাত্য ভাব ধর্ম আদর্শ আচার-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি গ্রহণ করিল, যাহা-কিছু ভারতীয় সমস্তই নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জিত হইল। বঙ্গ-সংস্কৃতি এত বড় সংকটের সম্মুখীন কোন দিন আর হয় নাই।

এই আঘাত-সংঘাতের ফলে আসিল বাংলা তথা ভারতে নবজাগরণ বা রেনেঁসাস। সে সময় বাংলায় পাশাপাশি তিনটি ভাব ও কর্মধারা ক্রিয়াশীল দেখিতে

পাই। প্রথম, হিন্দুকলেজ প্রভৃতির নব্যবঙ্গ দল যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী; দ্বিতীয়, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের উদার ব্রাহ্ম মতবাদ ও আন্দোলন; তৃতীয়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রক্ষণশীলদের নবহিন্দুবাদ যাহা সনাতন হিন্দুধর্মকে অধিকতর সবল ও সক্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টিত হইল। জাতীয় সংস্কৃতির এই সমস্যা-সংকুল যুগে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল যিনি জাতির সংকটে মীমাংসা দিলেন, পন্থা নির্দেশ করিলেন, তিনি যুগ-প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী—'যত মত তত পথ'—এ যুগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এক অভূতপূর্ব দান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রতিভাশালী যুগন্ধর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ নিজেদের জীবন ও ভাব দ্বারা এদেশের সংস্কৃতিকে নবজীবন দান করিলেন, বাঁচিবার পন্থা নির্দেশ করিলেন। নবযুগের নববঙ্গের জাগরণের প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দ। এই প্রসঙ্গে তাঁহার ভারতপ্রাণা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার নামও বিশেষ উল্লেখ্য।

সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, স্বাধীনতা-আন্দোলনে বঙ্গ-সংস্কৃতির দান অনন্যসাধারণ। সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ যুগান্তকারী সাহিত্যিকদের অবদান বঙ্গ-সংস্কৃতির উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা। শিল্পক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি ভারত-চিত্রকলার এক নবজাগরণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা-যজ্ঞে শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখের বিপ্লব-আদর্শ তন্ত্রোপাসক বাঙালীর শক্তি-সাধনার নব-রূপায়ণ। বাঙালীর জীবন সহজাত স্বদেশ-প্রেমে এত সমৃদ্ধ যে, সমগ্র ভারতে তাহা দুর্লভ। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-প্রেমের এত উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান এ যুগে রচিত হইয়াছে যাহা যুগ যুগ ধরিয়া আমাদিগকে মহৎ আদর্শের জন্য প্রেরণা দিবে। এই যুগেই স্বাদেশিকতার প্রকাশ বিশেষ ভাবে আমরা দেখিতে পাই। মধ্যযুগে বাংলার পরাক্রমশালী বারভূঞাগণ দিল্লীর মোগল শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রবল অভ্যুত্থানে বীর্য প্রদর্শন করিয়াছিল, বাঙালীর বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সেই যুগসঞ্চিত স্বাধীনতা-প্রয়াসের মর্মধ্বনি শুনিতে পাই।

মধ্যযুগের বঙ্গ-সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম প্রকাশ ধর্মে। এই ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে সে যুগের চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, শিব প্রমুখ লৌকিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি মূর্তি চিত্র ও মন্দির এবং মঙ্গলকাব্যের বিশাল লোকসাহিত্য। মঙ্গল-কাব্যের বেহুলা-লখীন্দর, চাঁদ সদাগর, ফুল্লরা-কালকেতু, লহনা-খুল্লনা, সকলেই বাংলার আপন জন। এই যুগেই প্রেমের অবতার মহাপ্রভু বাংলাদেশে প্রেমের প্লাবন আনিয়াছিলেন যাহার ফলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাণবন্যা প্রবাহিত হয় এবং বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে আসে বিপুল অভ্যুদয়। গীতি-কবিতাময় পদাবলী-সাহিত্য এ যুগের প্রধান অবদান এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতের নব জাগরণ—কীর্তনের প্রাণ-গলানো সুরে বাঙালী হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয়, মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনিতে বাংলা দেশ উদ্বেলিত হয়। লোকসঙ্গীতের বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, জারি, মুর্শিদা গানে মনপ্রাণ কোন্ সুদূরে উধাও হইয়া যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ মার্গ-সঙ্গীতে বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে।

শিল্প-সৃষ্টিতে বাঙালী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আজও অত্যুজ্জ্বল। বাংলার গৃহ ও দেউল নির্মাণ-পদ্ধতি, মূর্তি নির্মাণ ও মৃৎশিল্প, মেয়েদের আল্পনা, শঙ্খশিল্প, স্বর্ণশিল্প সূক্ষ্ম কারুকার্যময় সূতি ও রেশমি শাড়ী বয়ন, বাসন ও হাতীর দাঁতের শিল্প, মাদুর ও বেতশিল্প আজও সর্বত্র প্রশংসনীয়। বাংলার দোচালা গৃহের আদর্শই দিল্লী আগ্রা ও রাজস্থানের প্রাসাদ ও মন্দির গড়ায় প্রেরণা দিয়াছে। মন্দির-স্থাপত্যে বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার মন্দিরের সৌষ্ঠবময় সৌন্দর্য অতুলনীয়। মৃৎশিল্পে কলিকাতার কুমারটুলী ও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের তৈরি অনুপম দুর্গা ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি, যীশু ও মাতা মেরীর মূর্তি, মহাপুরুষদের প্রতিমূর্তি প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পকর্ম উচ্চশ্রেণীর শিল্পসৃষ্টি বলিয়া সর্বত্র প্রশংসিত। উৎসবময় বঙ্গভূমির সর্বপ্রধান উৎসব দুর্গাপূজায় সমগ্র বাঙালীজাতি প্রাণের আবেগে মাতিয়া ওঠে, সমগ্র কলিকাতা শহরটিই যেন দুর্গাপ্রতিমার বিরাট্ প্রদর্শনী হইয়া উঠে। পূজা, ধর্ম ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাঙালীর উৎসবগুলি বঙ্গসংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রকাশ। দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি, মূর্তি-গড়ন ও উৎসব বাঙালীর জীবন্ত সংস্কৃতি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বঙ্গ-সংস্কৃতির উন্নতি ও বিচিত্র প্রকাশ নিরঙ্কুশ নয়। বঙ্গ-বিচ্ছেদ বাঙালীর জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে, তাহার অখণ্ড সংস্কৃতিকেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। ছিন্নমূল মানুষের হাহাকারে সুস্থ প্রাণের সৃষ্টি ও প্রশান্ত মনের ধ্যান-ধারণা ব্যাহত হইতেছে। যন্ত্রযুগের দ্রুত আবর্তন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অবাঙালী আধিপত্য বঙ্গ-সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশে প্রবল বাধাস্বরূপ। বাঙালী সংস্কৃতি ধনিকের সৃষ্টি নয়, ধনকৌলীন্য ইহাকে কখনো প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ইহার স্রষ্টা বাংলার প্রতিভাশালী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ। যে প্রাণশক্তি স্বাচ্ছন্দ্য, অবকাশ ও মানসিকতা নব নব সংস্কৃতি-ধারা সৃষ্টির সহায়ক, তাহারই আজ আমাদের জীবনে সব চেয়ে অভাব। আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সুস্থ ও স্বাভাবিক হইলে বঙ্গ-সংস্কৃতি আবার স্বকীয় সৃজনী শক্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিবে। তবেই বাঙালীর ভাব-সাধনায় ও কর্ম-সাধনায় বাঙালী আবার ভারতের নেতৃত্বের অধিকার লাভ করিবে।

সবার উপরে মানুষ সত্য

মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, 'অমৃতের পুত্র' অথচ লাঞ্ছিত—প্রকৃতির উপর মানব-আধিপত্য, মানব-মহিমা—মানুষে মানুষে বিভেদ, অত্যাচার—মানব-প্রেম ও মানব-সেবায় জীবনের সার্থকতা।

যে বিধাতাপুরুষ এই সুন্দর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তাঁরই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অথচ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মর্যাদা মানুষ দেয় নাই, মানুষ যুগ যুগ ধরে মানুষের হাতে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

আমাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এই মহৎ ও বৃহৎ মানব-জীবনের অসম্মান ঘটিয়ে মানুষকে অপমান করছি। পৃথিবীর মহাপুরুষগণ যুগে

যুগে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। মানুষই 'অমৃতের পুত্র'। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই মানব-সেবাকে শ্রেষ্ঠ সেবা বলে ঘোষণা করেছে। অথচ মানুষই সব কিছুকে উপেক্ষা করে শক্তির দম্ভে, অর্থের গর্বে মানুষকে অবহেলা করেছে, ঘৃণ্য করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের সতর্ক-বাণী শুনি—

মানুষের ভগবানে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

আদিম যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই পৃথিবীর সর্বত্র মানব-মহিমা পরিব্যাপ্ত। সেই গুহাবাসী মানুষের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলে রয়েছে মানুষের অক্লান্ত সংগ্রাম ও অতন্দ্র সাধনা। মানুষ যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, সেদিন তার দেহ-মন ঘিরে ছিল অরণ্যের হিংস্রতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূলতা। প্রতিদিন তাকে জীব-জগৎ ও প্রকৃতি-জগতের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্লাবন, দাবানল প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে। তখন সে একা, বাইরে কোনো অলৌকিক শক্তি তাকে রক্ষা করেনি, তার মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দেয়নি। তার বুদ্ধি, তার শক্তিই তাকে আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে, তার বুদ্ধিই তাকে সাহস জুগিয়েছে। ধীরে ধীরে মানুষ প্রতিকূল প্রকৃতিকে স্ববশে এনেছে, জীব-জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় এই যে, বিশ্ব-প্রকৃতিকে বুদ্ধির বলে নিজের আয়ত্তে এনে মানুষ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়িয়ে তুলেছে। আজ মানুষ বিশ্বের ইতিহাসে নিজের পরিচয়-গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমান যুগের মানুষ আর আদিম যুগের মানুষের মতো অসহায় নয়। সে জীবনের প্রায় সমস্ত প্রতিকূলতাকেই জয় করেছে, জীবন-পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ এখনও পরস্পরকে সহজভাবে প্রীতি ও মৈত্রীবন্ধনে বেঁধে নিতে পারেনি। মানুষের প্রতি মানুষের বিরূপ মনোভাব, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতিকে জয় করতে পারেনি। মানুষ আজও ধনগর্বে মত্ত। তার ধনদম্ভ, অহংকার, জাত্যভিমান, ধর্মভেদ-বুদ্ধি, অন্ধসংস্কার প্রভৃতিতে সে আজ কূপমণ্ডুকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। এখনও মানুষে মানুষে দলাদলি, হানাহানি আজ সমগ্র বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তথাকথিত বড়োর শক্তির চাপে আজ মানবাত্মা জর্জরিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত। আজও এই পৃথিবীতে ধর্মের নামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অভিনীত হয়, শ্বেতাঙ্গের দল কৃষ্ণাঙ্গের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যায়, সবল দুর্বলকে আঘাত ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এ থেকেই আমরা বুঝিতে পারি, বর্তমান যুগে মানবতা বিপর্যস্ত ও নিষ্পিষ্ট। এখনও মানুষ মানুষ হিসাবে যথার্থ শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেনি। এখনও "ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা মাংস-গন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা শ্মশানের প্রান্তরে পৃথিবীর আবর্জনাকুণ্ড ঘিরে", বীভৎস

চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি, নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।" কবি তাদের উদ্দেশ্যেই বলেন—

দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

আজ আমরা যদি সকল প্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে, সকল প্রকার দম্ভ-অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে মানব-সমাজের রূপ লক্ষ্য করি, তাহলে সব কিছুর উর্ধ্বে আমরা মানুষকে স্থান দিতে পারি। আজ বিশ্বের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচিত মানুষকে ন্যায্য সম্মান দেওয়া। মানুষকে ভালোবাসতে হবে, মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। বাংলার প্রাচীন কবি একদিন বিশ্বের মানুষকে ডেকে বলেছিলেন—

শুনই মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

মানব-প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ মানব-প্রেম ও মানব-সেবাকেই ঈশ্বর-সেবা জ্ঞানে গ্রহণ করতে বলেছেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বার্থের বশে, আত্মদর্পে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে। কিন্তু একথা মানুষকে মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর সকল মানুষই সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের যোগসূত্রে বাঁধা। আজ পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পৃথিবী আজ কলঙ্কিত। আমরা যদি আমাদের অন্যায় অবাঞ্ছিত লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে মানুষকে ভালোবাসতে পারি, যদি আজ প্রীতি-মন্ত্রবলে জগৎকে জয় করতে পারি, তা হলেই মানব-জীবন সার্থক হবে। এই পৃথিবীতে আজ সকল জীবের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে মানুষ। প্রকৃতিকে নিজের বশে এনেছে মানুষ। মানুষ যদি আজ সকল ঈর্ষ্যা দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে পরস্পরকে প্রীতি-সূত্রে বাঁধতে পারে, তা হলে মানব-সমাজ ও সংসারের প্রশান্ত মহিমাই দিগ-দিগন্তে ঘোষিত হবে।

সংগ্রামই জীবন

জীবন-সংগ্রাম ও নদী—প্রাণশক্তির নিরন্তর সংগ্রাম—সংগ্রামে বিজয়ী ও বিজিত—যুদ্ধের মূলে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা—বাহ্য ও আন্তর সংগ্রাম—প্রাণি-জগতে সংগ্রাম—আন্তর সংগ্রাম কঠিনতর শ্রেয়তর, উভয় সংগ্রামে জয়ই জীবনের সার্থকতা।

জীবনকে অনেক সময় নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। নদী যেমন সমস্ত প্রতিবন্ধক ঠেলে সামনের পথে এগিয়ে চলে, মানব-জীবনও তেমনই নানা বাধা-বিপত্তিকে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রে গিয়ে মিশেই নদীর গতির সমাপ্তি, তার সার্থকতা। জীবনের লক্ষ্যও তাই। চলার পথে যে বাধা দেখা দেয়, তা মাঝে মাঝে জীবনের অগ্রগমনকে ব্যাহত করে। মানুষের জীবনে

পশ্চাতের আকর্ষণও তাকে টানে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে যখন মানুষ সম্মুখের পথে এগিয়ে যেতে পারে, তখনই মানব-জীবনের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়।

যেখানেই প্রাণশক্তি কাজ করতে থাকে, সেখানেই দেখা যায়, একটি জীবন প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করছে। সংগ্রাম ছাড়া জীবন নেই, যেখানেই জীবন সেখানেই সংগ্রাম। পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণ-স্পন্দন জেগে ওঠে, তাকেও প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিঁকে থাকতে হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই প্রাণ-শক্তি বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজ জগতে আপন অধিকার বিস্তার করে চলেছে। মাটির নীচে যে কীট থাকে, মাটির নানা স্তর ভেদ করে সে উপরে উঠে আসে। তার এই প্রকাশের পেছনে রয়েছে সংগ্রাম। মাটির আড়াল থেকে সে অনেক বাধা অতিক্রম করে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসেও নিস্তার নেই, সেখানেও তাকে প্রকৃতির প্রতিকূল আচরণের সম্মুখীন হতে হয়। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করতে হয়। জীব-জগতের সকলকেই বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করে যেতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করেই জীবন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অঙ্কুরিত চারা বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হয়, শিশু যৌবনের দৃপ্ত বেগে আপনাকে প্রকাশ করে।

অনুকূল প্রকৃতির সহায়তায় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে যারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পেরেছে, তারাই পৃথিবীর আনন্দ-যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে পারে। যারা পারেনি, তারা এই পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রকৃতির প্রতিকূল আচরণের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে, কতো জীব লুপ্ত হয়ে গেছে, কতো মানুষ ও কতো মানব-সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। আবার এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে, নূতন জাতি, নূতন সভ্যতাও গড়ে উঠেছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমাজ-জীবনে কেবল সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নেই। ভবিষ্যতেও যারা এই পৃথিবীর অধিকার লাভ করবে, তাদেরও সংগ্রাম করেই অধিকার ভোগ করতে হবে। জীবনের প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও এই সংগ্রাম লক্ষিত হয়। যেদিন মানুষ জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত হয়, সেদিন থেকেই তার জীবনী-শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। যেদিন এই সংগ্রামের শেষ হয়, সেদিন জীবনেরও অবসান ঘটে।

জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে যে যুদ্ধ হয় তার মূলে রয়েছে আত্ম-রক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য, নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। আদিম মানব-সমাজে বাঁচার তাগিদে ফলমূলহারী মানুষ কৃষিকার্য শুরু করেছিল, আগুন আবিষ্কার করেছিল, আজও তেমনই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের বশে এনে নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করে সমাজের নিয়ত উন্নতি সাধন করেছে। আদিম মানব হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পাথরের অস্ত্র তৈরি করেছিল। আজকের দিনের মানুষও আত্মরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলে উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করছে।

জীবন-সংগ্রামে যারা পরাজিত, এই পৃথিবীতে বাস করেও বিপুল ঐশ্বর্য-সম্পদ ভোগ করার অধিকার তাদের নেই। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই জীবন সার্থক। মানুষের জীবনে অন্তরে বাহিরে সংগ্রাম চলছে। বাহিরে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সংগ্রাম আর অন্তরে তার ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই আছে। এই দুই সংগ্রামে জয়ী হতে পারলে, তবেই মানুষ পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই জীবন আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে। জীবনের সম্ভাবনাকে সার্থক রূপদান করতে গেলেও সংগ্রামের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আদিম যুগে বিপুলকায় জীবগুলি যে প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে পারেনি, তার প্রধান কারণ প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু অনেক পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এখনও টিঁকে আছে। বড়ো জীবের চেয়ে ছোট ছোট জীবগুলি পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল।

মানুষের অন্তর্জগতে যে সংগ্রাম চলছে, তাতে দেখতে পাই আন্তর প্রবৃত্তির তাড়নায় আত্ম-রক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জৈব সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ হয়ত এক পথে চলতে চায়, কিন্তু তার বিবেক-বুদ্ধি তাকে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। বাইরের প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণের চেয়ে এই মনোজগতের সংগ্রাম আরও ভরাবহ। বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করার চেয়ে অন্তর-প্রকৃতি জয় করা অনেক কঠিন এবং ইহাই মানবের শ্রেয়। অন্তরে বাইরে যে বিভিন্ন প্রতিকূল-শক্তি জীবনী-শক্তির বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের নামই জীবন। এই সংগ্রামেই জীবনের শুরু, এই সংগ্রামেই জীবনের শেষ। জীবনের অপর নাম সংগ্রাম, এবং সংগ্রামই জীবন। বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে মানুষের মতো বাঁচিয়ে রাখাতেই মানব-জীবনের সার্থকতা। পৃথিবীর যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মধুর, তা দিয়ে মানুষ নিজের জীবনকে সার্থক করে তুলতে চায়। কিন্তু তা অনায়াস-লভ্য নয়, সংগ্রাম-সাপেক্ষ।

বাংলার লোক-সাহিত্য

লোক-সাহিত্য কি—লোক-সাহিত্যের উদ্ভব-কথা ও কাল—বর্তমান যুগের রচনা—নগর-সভ্যতা ইহার পরিপন্থী—আনন্দ ও শিক্ষা লাভ—পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ—যাত্রা, পালাগান, কথকতা উহাদের অবদান—ময়মনসিংহ-গীতিকা—মেয়েলি ব্রতকথা, ছেলে-ভুলানো ছড়া—বাউল, ভাটিয়ালী, মালসী, জারি, চণ্ডীমঙ্গল, মনসার গীত—লুপ্তির পথে—রক্ষার উপায়।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অতি প্রাচীনকাল হইতে লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজীতে এই ধরণের সাহিত্যকে Folk Literature বলা হয়। যে সাহিত্যে আপামর জনসাধারণের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়, যে সাহিত্য হইতে সকলেই অনায়াসে আনন্দ ও শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে তাহাকেই

লোক-সাহিত্য বলে। শিক্ষিত রসিক ব্যক্তিদের জন্য যে সাহিত্য রচিত হয়, শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের পক্ষে তাহার রসগ্রহণ করা সম্ভব নয়। দেশের সকলেই যদি উচ্চ-শিক্ষিত হইত তাহা হইলে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনার রস গ্রহণ সকলের পক্ষেই সম্ভব হইত। কিন্তু তা হয় না বলিয়াই সকলে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনার রস গ্রহণ করিতে পারে না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও লোক-সাহিত্য প্রাচীন কাল হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের প্রাণ-স্পন্দন এই লোক-সাহিত্যেই শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষের হৃদয়ভূমিতে লোক-সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। সাধারণ লোক যাহাতে আনন্দ পায়, তাহার জন্য যে কত কবি কত যুগ ধরিয়া কত রকমের ছড়া, গান, খণ্ডকবিতা, কাহিনী, কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার হিসাব নাই। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার মূর্তপ্রকাশ এই লোক-সাহিত্যে। এই সাহিত্য কাহারা কবে রচনা করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহারা বহু শতাব্দী যাবৎ রচিত ও পরিবেশিত হইয়াছে। বর্তমান যুগেও খ্যাত-অখ্যাত বহু কবির বহুবিধ লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি অব্যাহত রহিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঢাকার কবিওয়ালা হরি আচার্যের গান, বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান, হাল-আমলে মুর্শিদাবাদের শরৎ পণ্ডিতের ব্যঙ্গ কবিতা লোক-সাহিত্যের পর্যায়েই পড়ে। এই সকল রচনায় সমসাময়িক ঘটনাবলীর চিত্রণ পাই। বঙ্গভঙ্গ রোধের পর হরি আচার্য গাহিয়াছিলেন—'ফুলার গেল চুলার ভিতর দেশটা হল ঠাণ্ডা', (ব্যামফিল্ড ফুলার পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর ছিলেন), মুকুন্দ দাস গাহিয়াছিলেন 'ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি বঙ্গনারী, ও কলঙ্ক আর হাতে পরো না' ইত্যাদি।

বর্তমান নাগরিক সভ্যতার মোহে আমরা পল্লী-সংস্কৃতির সরল সহজ আবহাওয়া হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অন্ধ অনুসরণে আমরা নিজেদের চারি পাশে একটা কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করিয়াছি, তাই মুক্ত প্রাণের সহজ প্রকাশ এই লোক-সাহিত্যকে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি, অথচ এই লোক-সাহিত্য বাংলার জনসাধারণকে এক দিন শুধু যে আনন্দ দিয়াছিল তাহা নয়, তাহাদের ধর্ম-বোধ, নীতি-বোধ, সমাজ-চেতনা জাগাইয়া তুলিতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল। এক দিকে আনন্দ-দান, অন্য দিকে দেশের মানুষকে শিক্ষাদান, দুই উদ্দেশ্যই লোক-সাহিত্যের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-সাহিত্যের জন্ম গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের হৃদয়-ভূমিতে। বাংলার লোক-সাহিত্য বিচিত্ররূপে বিচিত্র ভঙ্গীতে আপনাকে সর্বসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে। ছেলে-ভুলানো ছড়া, মেয়েদের ব্রতকথা, যাত্রা, পাঁচালী-গান, কবি-গান, ঝুমুর-গান, বাউল-ভাটিয়ালী গান, সখী-সংবাদ, রূপকথা, জারি, সারি, গম্ভীরা, মালসী, মুর্শিদা-গান, মাণিকপীর, সত্যপীরের পাঁচালী, ময়নামতীর গান,

গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতি বিচিত্র ধারার লোক-সাহিত্য বাংলার জনসাধারণকে প্রভূত আনন্দ দান করিয়াছে এবং জীবন-যাত্রার পথে নির্দেশ দিয়াছে।

বাংলার যাত্রা ও পালা গান প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সকল গান সে যুগের মানুষকে শুধু আনন্দই দেয় নাই, তাহাদের ধর্মকথা, তত্ত্বকথা, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখের কথা শুনাইয়াছে, দেশবাসীর চরিত্র-গঠনে সাহায্য করিয়াছে। কথকতার ভিতর দিয়াও জনসাধারণ পুরাণের কাহিনীগুলির সঙ্গে পরিচিত হইত। তাই আজও অশিক্ষিত মানুষের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, ধ্রুব-প্রহ্লাদের কাহিনী, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা কাহিনী তাহাদের একান্ত ঘরের কথা। তাহারা পাশ্চাত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞানের কিছুই জানে না বটে, কিন্তু নিজের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরব তাহারা ভুলিতে পারে নাই, তাহারাই এই ঐতিহ্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, জীবন্ত রাখিয়াছে। গীত ও কথকতার ভিতর দিয়া ভারতীয় জীবন-দর্শন, ধর্মতত্ত্ব অতি সহজভাবে সাধারণ মানুষের সামনে তুলিয়া ধরা হইত। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসকল যাহা বিদগ্ধ সমাজের কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত হইত, তাহা অতি সরল ও সরস ভাষায় জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত এবং তাহাদের চিত্তভূমিতে স্থায়ী আসন লাভ করিত।

রাধা-কৃষ্ণ লীলার গোষ্ঠ বিরহ ইত্যাদি গানগুলির অপার্থিব প্রেমের সুধাধারায় মানুষের চিত্ত সিক্ত হইয়াছে, সরস হইয়াছে, পুলকিত হইয়াছে। আবার হরগৌরীর গানে বাঙালীর পারিবারিক জীবন-যাত্রার নির্দেশ ও আদর্শ পাইয়াছে।

মেয়েদের ব্রতকথাগুলিও তুলনা-রহিত, এই সকল ব্রতকথা মেয়েদের জন্যই রচিত হইয়াছিল। সেঁজুতি, মাঘমণ্ডল, তুষতুষলি, ভাদুলি ব্রত, পুণ্যপুকুর ব্রত প্রভৃতির মন্ত্র একান্তভাবে মেয়েদের জন্যই। আমাদের দেশের মেয়েরা এই সকল ব্রতকথা হইতে পারিবারিক জীবনের নানা বিধিনির্দেশ লাভ করিয়াছেন। এই ব্রতকথাগুলি তাঁহাদের স্নিগ্ধমধুর গৃহ-পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে।

ময়মনসিংহ-গীতিকার পালাগানগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। এইগুলিতে ধর্মের ছোঁয়াচ লাগে নাই। ইহারা মানবীয় প্রেম-বিরহ সুখ-দুঃখের কাহিনী, পল্লীর মানুষের ঘরোয়া জীবন-কাব্য। পল্লী-কবিদের রচিত এই গাঁথা-কাব্যগুলির সুন্দর কবিত্ব বিদগ্ধ-চিত্তেও গভীর রেখাপাত করে। এই আখ্যায়িকাগুলির মহুয়া-মলুয়া চন্দ্রাবতী কেনারাম সবই যেন পল্লীবাসীদের অতি আপনার।

বাংলাদেশের ছেলে-ভুলানো ছড়াকে অপূর্ব জাতীয় সম্পদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কখন কে বা কাহারা এই ছড়াগুলি রচনা করিয়াছিলেন জানি না—কিন্তু যাঁহারাই রচনা করিয়া থাকুন, তাঁহারা যে ক্ষুদ্র শিশু-মনের রহস্যের গভীরে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। চঞ্চল সুন্দর শিশু-মনে অসংবদ্ধ অবিন্যস্ত কল্পনাগুলি এই ছড়াগুলির মধ্য দিয়া সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে। ছড়াগুলিও সুসংহত ভাববিন্যাসে রচিত নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছড়াগুলি যেন এলোমেলো কল্পনার রঙিন ছবি। শিশুরা মায়ের মুখে আশ্চর্য হইয়া 'নোটন নোটন পায়রাগুলি'

'ঝোটন বাঁধার' কাহিনী শোনে; 'টিয়ের মার বিয়ের কাহিনী' তাহাদের কাছে চির সজীব, চির নূতন। এই ছড়াগুলি শুনিতে শুনিতে শিশু-মন কল্পনায় কতো না অজানা, অচেনা দেশে 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' পার হইয়া চলিয়া যায়। ছড়ার যাদুমন্ত্রে পরম নির্ভয়ে মায়ের কোলে সে ঘুমাইয়া পড়ে। ছড়ার কবিরা যেন শিশু-মন লইয়াই শিশুদের জন্য ছড়ার ছবি লিখিয়া গিয়াছেন।

বাংলার গ্রামের পথে ঘাটে নদীর বুকে প্রাণমাতানো ভাটিয়ালী, মালসী, সারি, জারি, বাউল গান শোনা যায়। বাউল গানগুলিতে এক অতীন্দ্রিয় জগতের সুর ধ্বনিত হইতেছে, ইহাদিগকে মরমী কবি, সুফী সাধক বা বৈদান্তিকের ভাবধারার সঙ্গে তুলনা করা চলে। গঞ্জ হইতে গঞ্জে পাড়ি দিবার সময় নৌকার মাঝিরা মুক্তকণ্ঠে ভাটিয়ালী সারি গান গাহিয়া থাকে। মাঠে মাঠে গরু চরাইবার ফাঁকে ফাঁকে গাছের ছায়ায় বসিয়া রাখাল ছেলে মেঠো সুরে গান ধরে, দুর্গাপূজার কিছু আগে হইতেই বৈরাগীর দল ঘরে ঘরে আগমনী গাহিয়া ফিরে।

মনসা চণ্ডী প্রভৃতির পালা গান, সতীমার গান প্রভৃতিও বাংলা লোক-সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। মধ্যযুগের বিভিন্ন দেব-দেবী-মঙ্গলকাব্যগুলি লোক-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। খোলা মাঠে অথবা ধনী জমিদার-গৃহে চণ্ডীর গীত বা জাগরণ গান গাওয়া হইত। শ্রাবণ মাসে এখনও মনসার গীত গাওয়া হয়। এককালে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মনসার গীত আগ্রহের সঙ্গে শুনিত। সখী-সংবাদ শুনিয়া শ্রোতারা কত না চোখের জল ফেলিয়াছে। কবির লড়াই তাহাদের কত না আনন্দ দিয়াছে।

আজ আর সে দিন নাই। এখন বাংলার এই মৌলিক সাহিত্যধারা ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ দেশের জনসাধারণের মন আজ নগরকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছে। নগরের কৃত্রিমতায়, তাহার চমক লাগানো রূপে সকলে সহজ প্রাণেই আনন্দকে ভুলিয়াছে। এই দিন যে সামাজিক পরিবেশে এই লোক-সাহিত্য সৃষ্টি লাভ করিয়াছিল, আজ সেই পরিবেশ হারাইয়া গিয়াছে। তবে সুখের কথা এই যে, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন একদল লোক এই লুপ্ত রত্ন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সত্যই আনন্দের কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, একদিন যে মনের কাছে এই লোক-সাহিত্য সাড়া জাগাইয়াছিল আজও সেই মন আছে কি? মনে হয় সেই মন, সেই প্রাণ, সেই সরলতা আর নাই। এই কৃত্রিম শহর-কেন্দ্রিক পরিবেশের মধ্যে নূতন করিয়া লোক-সাহিত্য আর হয়ত রচিত হইবে না। আজ আধুনিক শিক্ষার গর্বে আমরা আমাদের গৌরবময় এই প্রাচীন লোক-সাহিত্যকে ভুলিতে বসিয়াছি। যাহারা নিজের দেশকে, দেশবাসীকে, দেশের ঐতিহ্যকে ভালোবাসেন, তাহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, এই লোক-সাহিত্যের ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করা একান্ত দরকার। গ্রাম-বাংলার বিরাট ও উদার প্রাণের সার্থক পরিচয় এই লোক-সাহিত্যের মধ্যেই বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

ভবিষ্যৎ অধ্যয়ন ও কর্ম-জীবনের কিরূপ পরিকল্পনা করিয়া তুমি উচ্চতর মাধ্যমিকের পাঠক্রম বাছিয়া লইয়াছ

বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ—বিভিন্ন শাখা—বিজ্ঞান কেন নিলাম—জীবনে বিজ্ঞানের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা—সভ্যতার ইতিহাস বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস—চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—বর্তমান ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষাও থাকে। সকলেরই ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটি স্বপ্ন থাকে। কখনও তা সফল হয়, কখনও হয় না। আগেকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন, আই. এ., বি. এ., এম. এ. পাশ করিয়া অনেকেই লক্ষ্যহীনভাবে জীবিকার্জনের জন্য ছুটিত। যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা গেল, কর্ম-জীবনে তাহার ব্যবহারের কোনো সুযোগই দেখা দিত না। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের উন্নতি ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড স্থাপিত হইল। শিক্ষার্থীরা যাহাতে ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থা বাছিয়া লইতে পারে, তাহার জন্য স্কুলে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণী হইতে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিভাগের পাঠ্য-বিষয় পৃথক্‌ভাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহারা কলা-বিভাগে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চায়, তাহাদের জন্য কলা-বিভাগের বিভিন্ন বিষয় পাঠের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা বিজ্ঞানের মাধ্যমে ইন্‌জিনিয়ারিং, চিকিৎসা-বিদ্যা এবং বিজ্ঞানাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে চায়, তাহাদের জন্য বিজ্ঞান শাখায়, যাহারা বাণিজ্যিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে চায়, তাহাদের জন্য উক্ত শাখায় পঠন-পাঠনের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটি প্রধান শাখা ছাড়া আরও উচ্চতর শিক্ষার সহায়করূপে অনেক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন নিজ নিজ রুচি ও প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শাখায় পাঠাভ্যাস করিতে পারে।

তবে সকল সময়ে যে এই ধরণের পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করিতেছে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অনেক সময় পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হইলে শিক্ষার্থীরা এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ভীড় করিতেছে। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যে পাঠক্রম বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল, অনেক ক্ষেত্রে সেই অভীষ্ট শাখায় উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া যায় না। ফলে অনেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তবুও ইহা ঠিক যে, বিভিন্ন পথ ধরিয়া লক্ষ্যে পৌঁছাইবার এইরূপ সুযোগ-সুবিধা আগে ছিল না।

আমিও আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, উচ্চতর মাধ্যমিকের একটি পাঠক্রম বাছিয়া লইয়াছি। বিজ্ঞান শাখায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য আমি বিজ্ঞানকেই আমার অভীষ্ট শাখারূপে গ্রহণ করিয়াছি। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি মানব-সভ্যতাকে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব বিদ্যানুরাগীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সাহিত্যের দান সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইতিহাসের পাঠকেরই ইতিহাসের দান গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

দর্শন শাস্ত্রে যাহার অধিকার নাই সে দর্শনের কিছুই বুঝিবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের দান সকলেই গ্রহণ করিতে পারে।

আমরা বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে বাস করিতেছি। আজ পৃথিবীতে বিজ্ঞানের জয়ই ঘোষিত হইতেছে। সমাজ ও সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের চর্চা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে যদি আমরা জগতের অন্যান্য জাতির পিছনে পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা সকল ক্ষেত্রেই পিছাইয়া থাকিব। আমরা এখন স্বাধীন, আমাদের কৃষি-ব্যবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন একান্ত প্রয়োজন। ইহার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। আমাদের দেশে রোগ ও রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতি প্রয়োজন, যানবাহন চলাচলের ব্যাপারে বৈদ্যুতিক-শক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আজ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের শুভস্পর্শ সার্থক হইয়া উঠিতেছে, তাই বিজ্ঞানের চর্চা আজ একান্ত প্রয়োজনীয় রূপে দেখা দিয়াছে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমাদের বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান আমাদের জীবনে প্রতিদিন আপন প্রাধান্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। এই বিজ্ঞানের কল্যাণেই মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার বিশ্ব-সভ্যতাকে অনেকখানি আগাইয়া দিয়াছে।

বর্তমান যুগে আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল প্রয়োজনীয় বস্তুই বিজ্ঞানের দয়ায় লাভ করিতেছি। গ্রহ-নক্ষত্রের রহস্য জানিতে গেলে বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার শক্তিও আমরা বিজ্ঞানের কল্যাণে লাভ করিয়াছি। গত অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে প্লান্কের শক্তির কণাবাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, রাদারফোর্ডের পরমাণুবাদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমাজের গতানুগতিক চিন্তা-ধারার প্রভূত পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে মানব-সভ্যতার ইতিহাসই বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস।

বিজ্ঞানকে আমি ভালোবাসি বলিয়াই বিজ্ঞান বিষয়কে আমি আমার পাঠক্রমরূপে বাছিয়া লইয়াছি। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা, চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করা। ইহার জন্য আমি বায়োলজিকে আমার অন্যতম পাঠ্য-বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের দেশের অসহায় জনসাধারণ যে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়, তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া যদি কিছু লোকেরও প্রাণরক্ষা করা যায়, তাহা হইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। বর্তমান যুগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিরাট্ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এক দিন যে রোগকে দুরারোগ্য ও ভয়াবহ মনে হইত, এখন আর তাহা মনে হয় না। এখন প্যালুড্রিন, পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, টেরামাইসিন প্রভৃতির যুগ। ইহারা দুরারোগ্য ব্যাধির অমোঘ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কুরি-দম্পতি (ডঃ কুরি ও মাদাম কুরি) কর্তৃক আবিষ্কৃত রেডিয়াম চিকিৎসা-জগতে বিরাট্ পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা গবেষণা চলিতেছে। আগেকার দিনে অস্ত্রোপচার একটি ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। আজ আর সে ভয় নাই। মানুষ মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে জয়

করিতে না পারিলেও মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া মানুষ মানুষকে দীর্ঘ জীবন-দানের চেষ্টা করিতেছে। আমি তাই চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়িতে চাই। অনেকে হয়ত বলিবেন, শুধু আদর্শবাদ লইয়া সংসারে থাকা যায় না, নিজের ভরণ-পোষণের জন্যও চেষ্টা করিতে হয়। আমি নিজেও তাহা স্বীকার করি। তবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান্ চিকিৎসকের উপার্জন ও খ্যাতি লাভের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ইন্‌জিনিয়ার, ডাক্তার, ভূতত্ত্ববিদ্, পদার্থ ও রসায়নবিদ্ প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন- রহিয়াছে। তাই দেখা যায়, অন্যান্য শাখার চেয়ে বিজ্ঞান শাখায় সকলে ভীড় করিতেছে। আমিও বিজ্ঞানের সেবা করিবার জন্য বিজ্ঞান-বিষয়কে আমার পাঠক্রমরূপে লইয়াছি। ভবিষ্যতে আমি চিকিৎসক হইবার আশা রাখি। নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যদি সমাজের রোগ, শোক, দুঃখ কিছুমাত্রও নিবারণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। অবশ্য সমস্ত কিছুই নির্ভর করিতেছে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ভালো ফলাফলের উপর। তবে আমার বিশ্বাস, এতদিন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহারই কল্যাণে আমার পরীক্ষার ফল সন্তোষজনকই হইবে।

আধুনিক মারণাস্ত্র ও মানুষের দায়িত্ব

প্রস্তাবনা—আণবিক মারণাস্ত্র—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম ব্যবহার—আণবিক-শক্তি আবিষ্কার—আণবিক বিস্ফোরণের ফল—অপপ্রয়োগ—কল্যাণ-কর্মে অশেষ উপকার—মারণাস্ত্র মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রের কুক্ষিগত—ভারতে আণবিক-শক্তির অগ্রগতি—মারণাস্ত্র প্রতিরোধে মানুষের প্রধান দায়িত্ব।

মানব-জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য প্রকৃতিকে স্ববশে আনাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ছিল। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা অনেক কিছুই পাইয়াছি। তবে এক দিন যে শুভ উদ্দেশ্য লইয়া বিজ্ঞান দেখা দিয়াছিল, আজ সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, লোভ আজ এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে যে, মানুষ প্রতি মুহূর্তে আজানা আশঙ্কায় জীবনের সকল সুখ-শান্তি হারাইতে বসিয়াছে। যে বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যে অসংখ্য মারণাস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া আজ বিশ্ববাসীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে।

বর্তমান যুগে যে সকল মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আণবিক বা এ্যাটম-বোমা ও হাইড্রোজেন-বোমা সবচেয়ে ভয়াবহ আবিষ্কার। যাহারা আণবিক-শক্তির রহস্য অনাবৃত করিবার জন্য দীর্ঘ দিন সাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ ধনের সর্বনাশা রূপ দেখিলে শিহরিয়া উঠিতেন। যে আণবিক-শক্তির দ্বারা মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহাই স্বার্থান্বেসী দেশগুলি পৃথিবীর ধ্বংস-সাধনে প্রয়োগ করিতেছে। আণবিক বোমার সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কার বিশ্বের পক্ষে আরও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই আগস্ট ও ৯ই আগস্ট পৃথিবীর দুইটি মর্মান্তিক স্মরণীয় দিন। এই দুইটি দিনেই আমেরিকার রণ-বিমানপোত হইতে জাপানের হিরোশিমা

ও নাগাসাকির উপর এ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। হিরোশিমার উপর যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা দ্বারা আড়াই লক্ষ অধিবাসীর এই শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নাগাসাকির উপর যে বোবা নিক্ষেপ করা হয়, তাহা দ্বারা অসংখ্য নর-নারী শিশু নিহত হইয়াছিল। এই শহরের অসংখ্য অট্টালিকা ভূমিসাৎ হয়। আণবিক-বোমা নিক্ষেপের এই ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়া বিশ্ববাসী ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

আণবিক-শক্তির দ্বারা আণবিক-বোমা আবিষ্কারের পশ্চাতে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সাধনা রহিয়াছে। এই আবিষ্কারের প্রকৃত সম্মান 'অটো হান' নামে একজন জার্মান-বৈজ্ঞানিকের প্রাপ্য। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৪৪-৪৫ সালে নোবেল পুরস্কার পান। অনেকের মতে হিটলারের পৃষ্ঠপোষকতায় জার্মান-বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা নির্মিত আণবিক-বোমা আমেরিকার দ্বারা অপহৃত হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, বৃটেন, ক্যানাডা ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের সহায়তায় এই বোমা আমেরিকায় প্রথম প্রস্তুত করা হয়। আবার কাহারও মতে, ইহার প্রথম পরীক্ষা লর্ড রাদারফোর্ড এবং তাঁহার সহকর্মীদের দ্বারা শুরু হয়। তবে বেশীর ভাগ লোকের মতে, আণবিক-বোমা আবিষ্কারের সম্মান জার্মান বৈজ্ঞানিকেরই প্রাপ্য। বিংশ শতাব্দীতে এই আণবিক-শক্তির রহস্য উদ্ঘাটনে আইনস্টাইন, রাদারফোর্ড, টমসন, অটো হান প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

একটি আণবিক বোমা বিস্ফোরণে চারি বর্গমাইল জায়গা নিশ্চিহ্ন হইতে পারে এবং প্রায় আশী হাজার লোক ধ্বংস করিতে পারে। কাজেই এই ভয়াবহ মারণাস্ত্র সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক-বোমা নিক্ষিপ্ত হইবার পর যে অল্পসংখ্যক নর-নারী প্রাণে বাঁচিয়া আছে, তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া এবং বোধ-শক্তি হারাইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোলিও কুরি বলিয়াছিলেন, "যাহারা হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া ঐ দুইটি শহর ও তাহাদের অধিবাসীদের ওপর যে নির্মম আঘাত হানিয়াছে, তাহারা বিজ্ঞানকে অপবিত্র করিয়াছে।" জাপানের বিরুদ্ধে আণবিক-বোমা ব্যবহৃত হইবার পর হইতে পৃথিবীর প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শান্তিকামী মানুষ এই বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

বিশ্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পর সকলের আশা ছিল, রণক্লান্ত পৃথিবীর উপর আর শীঘ্র কোনো যুদ্ধ বাধিবে না। কিন্তু শক্তিমত্ত জাতিগুলির হিংসানল এখনও ধিকি ধিকি জলিতেছে। পৃথিবীর যুদ্ধকামী রাষ্ট্রগুলি সর্বনাশা মারণাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নিজেকে অপরের চেয়ে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পৃথিবীর বুকে শক্তির অপব্যবহার আজও সমান ভাবে চলিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাপে বাধ্য হইয়া বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করিতেছেন, আণবিক-বোমা, হাইড্রোজেন-বোমা, ম্যাগাটন-বোমা প্রভৃতি প্রস্তুত

করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। জাপানের উপর আণবিক-শক্তির অপপ্রয়োগ দেখিয়া আজ পৃথিবীতে আণবিক শক্তির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠিত হইয়াছে। মারণাস্ত্র পৃথিবীর বুকে শুধু ধ্বংস ও মৃত্যুই বহন করিয়া আনেনা, এই সুন্দর পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও বিনষ্টি ঘটায়। কাজেই মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে হইলে মারণাস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উচিত।

ইউরেনিয়ামের মতো ধাতুর পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া যে তাপ-শক্তি ও গতি-শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা মানুষের অকল্যাণে প্রয়োগ না করিয়া যদি বিশ্ব-হিতে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে বিশ্ববাসীর অশেষ উপকার সাধিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের শক্তি ১,৫৫০ টন কয়লার শক্তির সমান। কাজেই এই ইউরেনিয়ামের আণবিক-শক্তির দ্বারা কতো যে অসংখ্য সাধন হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই আণবিক-শক্তির দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসিতে পারে। এই শক্তির প্রয়োগের দ্বারা বিমান-পোত, রেলগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহনে দ্রুততম গতির সঞ্চার করা যায়। তবে সব কিছুই মানুষের শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর শয়তানের প্রাধান্য দেখা দিলে এই পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। এই পৃথিবীই যদি না রহিল, তবে মানুষের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

মারণাস্ত্রের ব্যবহার পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ভারতবর্ষে অধ্যাপক ডঃ ভাবার নেতৃত্বে আণবিক-শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হইয়া বর্তমানে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের এই প্রচেষ্টা শান্তিপূর্ণ উন্নতিমূলক কার্যের নিমিত্ত।

আণবিক-শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলি আণবিক বোমার শক্তির পরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের শান্তিকামী ব্যক্তিরা এই আণবিক-বোমা বিস্ফোরণ পরীক্ষা বন্ধ করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছে। আণবিক-শক্তির এই অপপ্রয়োগ মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী। আণবিক-শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রকেট মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হইতেছে। আবার এই শক্তিকেই যদি মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে পৃথিবী এক দিনেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তাই আজ মানুষের মধ্যে যে দানবীয় শক্তি দেখা দিয়াছে, তাহাকে আমাদের দমন করিতে হইবে। এই পৃথিবীর অধিকারী দানব নয়, মানব। আণবিক-শক্তি মানবীয় কল্যাণে ব্যবহৃত হইলেই পৃথিবীতে শান্তি সুরক্ষিত হইতে পারে। আজ এই বিশ্ব-ধ্বংসকারী মারণাস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক শান্তিকামী মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে হইবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তাহার প্রয়োগ-চেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে হইবে।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে

প্রস্তাব—দিল্লী হতে বাসে জম্মুর পথে যাত্রা—পথের দৃশ্য—কাশ্মীর উপত্যকায়—শ্রীনগর—ঝিলামনদী, ডাল হ্রদের দৃশ্য—নাগিন হ্রদ—গুলমার্গের শোভা—পহেলগামের সৌন্দর্য—তুলিয়ান হ্রদ—বাগিচাগুলোর বর্ণনা—তুলিয়ান হ্রদের নীরব সৌন্দর্য—সোনমার্গের হিমবাহ ও শোভা—ভূস্বর্গ হতে প্রত্যাবর্তন।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে যাবার ইচ্ছা বহু দিনেরই। তাই যখন বন্ধুরা এসে ধরলো যাবার জন্য তখন এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলাম। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি কাশ্মীর উপত্যকার অতি মনোরম সময়। শস্য ও ফলের প্রাচুর্য চারদিকে।

খুব ভোরে দিল্লী থেকে বাসে করে জম্মুর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। জম্মু শহর হলো জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী। পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে সারাদিন বাস হু হু করে ছুটে চলল। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ জম্মু শহরে পৌছলাম। রাতটা জম্মুতে কাটিয়ে পরের দিন ভোর সাতটায় রওনা হলাম শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। সুন্দর মসৃণ রাস্তা পেয়ে বাস ছুটে চললো কাশ্মীরের দিকে। মাঝে বাস থামিয়ে যাত্রীদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণও চলতে লাগলো। চার পাশের দৃশ্য আস্তে আস্তে বদলাতে লাগলো। প্রথমে সমতল ভূমি, পরে এলো ছোট পাহাড়; আস্তে আস্তে তারা বাড়তে লাগল উচ্চতায়। রকমারি সুন্দর সুন্দর গাছপালা নদী ঝর্ণায় ভরা দেশটি।

আমরা বাসে করে ওপরে উঠেই চলেছি। কিছুক্ষণ পরে পৌছলাম জহর টানেলে। এর একদিকে রয়ে গেল জম্মু, আর যখন অনেকক্ষণ অন্ধকারে চলবার পর আলোয় বেরোলাম তখন কাশ্মীরে পৌছে গেছি। এর পর থেকে আমরা আবার নীচে নামতে লাগলাম কাশ্মীর উপত্যকায় পৌছবার জন্য। বেশ কিছুক্ষণ নামবার পর আমরা প্রায়-সমতল ভূমিতে এসে গেলাম। চার পাশে ধানের ক্ষেত, সোনালী ধানে ভরা। মাঝে মাঝে ফলের বাগিচা লাল আপেল ফলে রয়েছে গাছ ভর্তি—সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে। শ্রীনগর পৌছবার কিছু আগেই দেখতে পেলাম ঝিলাম নদীকে। বর্ষার পর ভরা নদী—অস্তগামী সূর্যের আভায় চিক্‌চিক্ করছে। তারপরেই পৌছে গেলাম শ্রীনগরে। সন্ধ্যে হয়ে গেল হোটেলে পৌছতে। একটু বিশ্রাম করে আশ-পাশটা দেখতে গেলাম। আমাদের হোটেল একেবারেই শহরের মধ্যে, কিছু ফলের পাইকারী দোকান, তারপরেই বাজার। নানারকম ফল ও শাকসব্জীতে ভরা সব দোকান। সেদিনের মতন বেড়ানো শেষ করে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরের দিন শ্রীনগর দেখবার জন্য বেশ ভোরেই বেড়িয়ে পড়লাম। ডাল হ্রদের কথা এতো শুনেছি যে ঠিক করা হলো প্রথমে ওখানেই যাব। আমাদের হোটেল থেকে ডাল হ্রদে যেতে পথে পড়লো ঝিলাম নদী—শহরের মধ্য দিয়ে একেবেঁকে গেছে, নদীর দুপাশেই গড়ে উঠেছে শহর। আর বেশ অনেকগুলো সেতু দিয়ে সংযোগ সাধন করা হয়েছে দুকূলের সঙ্গে। নদীতে রয়েছে অসংখ্য সুসজ্জিত নৌকো যাদের বলা হয় হাউস-বোট। শহরের এ দিকটা বিশেষ পরিষ্কার নয়। কিছু পরেই বেশ পরিষ্কার রাস্তায় এসে গেলাম। তারপরেই দূরে দেখলাম ডাল হ্রদ, চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। একপাশটা বাঁধানো, তাতে লোকজন বেড়াচ্ছে আর তার পাশে

বড় রাস্তা অনেক দূর অবধি গেছে। ঐ রাস্তার পাশেই যে পাহাড় তার উপর দাঁড়িয়ে আছে শঙ্করাচার্যের মন্দির। রাস্তা ধরে কিছু এগোলে পরেই ভূতপূর্ব মহারাজার প্রাসাদ। সেটি এখন ওবেরয় প্যালেস হোটেল। তা ছাড়া আরও অনেক হোটেলই এই রাস্তায়।

হ্রদের বুকে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে এক ধরণের ছোট নৌকো—কাশ্মীরের শিকারা। নানারকম তাদের নাম, রঙ-বেরঙের তাদের সজ্জা। তা ছাড়া হ্রদের এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য হাউসবোট—কেউ বড়, কেউ ছোট, কেউ অতি সাধারণ, কেউ বা অভিজাত। কিন্তু সবারই একটা করে নাম আছে—নানা দেশের নাম, ফুলের নাম—এতো হরেকরকম নামের বাহার কোথাও দেখা যায় না। আমরাও একটা শিকারাতে চড়ে বসলাম। এক বুড়ো কাশ্মীরী আমাদের শিকারা বাইতে লাগলো। মাঝে মাঝে আমরাও একটু বাইতে লাগলাম। ডাল লেকে বেশ কিছুক্ষণ শিকারা করে ঘুরলাম। শিকারা থেকে চার পাশটা এতো সুন্দর দেখায়! হ্রদটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়—সবুজ গাছে ঢাকা। মাঝে মাঝে সুন্দর বাড়ী। জলে অসংখ্য শিকারা। শিকারাতে আবার ফুলের দোকান, ফলের দোকান ও মনোহারী দোকান। জলে বসে বসেই যা চাও পাওয়া যায়।

শিকারা করে আমরা ডাল লেক থেকে শ্রীনগরের আরেকটি বড় লেক নাগিনে যাব ঠিক করলাম। এই দুটো লেক জলপথ দিয়ে যোগ করা পরস্পরের সাথে। শহরের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে এই জলপথ। কোথাও কোথাও এতো সরু হয়ে গেছে যে দুটো শিকারা পাশাপাশি চললে প্রায় ধাক্কা লাগার অবস্থা। কিছুক্ষণ চলবার পর আমরা নাগিন লেকে পৌছলাম। এই লেকটিও খুব সুন্দর, আশেপাশের দৃশ্যও চমৎকার এবং পরিষ্কারও বেশ। এখানে আমরা কিছুক্ষণ সাঁতার কাটলাম এবং জলের স্কী করলাম। সেপ্টেম্বরেই জল বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আর কিছুদিন পরেই খুব ঠাণ্ডা পড়বে এখানে। হ্রদের জল তখন কিছুদিনের জন্য জমেও যায়। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে আসতে লাগলো, সব হাউস-বোটে আলো জলতে শুরু হল। শিকারা গুলোতেও ছোট ছোট আলো আছে, সারা হ্রদে খালি আলোর ছড়াছড়ি। আমাদের শিকারা ভ্রমণও শেষ হয়ে গেল এবং আমরা ডাল হ্রদের পারে এসে নামলাম।

কাশ্মীরের কুটীর-শিল্পের খ্যাতি জগৎজোড়া। হোটেলে ফেরবার পথে তাই একটি দোকানে ঢুকে পড়লাম। সব জিনিষই আছে। এক ধারে সাজানো রয়েছে কাশ্মীরী রঙ-বেরঙের গালিচা—ঘর একেবারে জলজল করছে। রেশমের কাপড়ে ও পশমের নক্সা করা গরম চাদরে ও কাঠের কাজ করা নানারকম জিনিষে আরেকদিক ভরা। কাশ্মীরের হস্ত-শিল্প কাশ্মীরীদের মতনই সুন্দর। চোখে পড়লে আর চোখ ফেরানো যায় না।

পরের দিন আমরা বাগিচাগুলো দেখতে বেড়োলাম। প্রথমে শালিমার বাগে গেলাম। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রায় ৩৫০ বছর আগে বানিয়েছিলেন এই সুন্দর বাগানটি। অনেকগুলো ধাপে ভাগ করা বাগান, মাঝখানে আছে শ্বেতপাথরে

তৈরী সিড়ি যার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে জলের ধারা। তারপরে নিশাতবাগে গেলাম, ডাল হ্রদ থেকে ওপরে উঠে এসেছে ধাপে ধাপে। কাশ্মীরের বিখ্যাত বিশাল চিনার গাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে। সম্রাট আকবরের তৈরী নাসিমবাগেও গেলাম। শেষে গেলাম চশমা-শাহীতে, মানে, রাজার ঝরণা, শাহ্‌জাহানের তৈরী। এই ঝরণার জল শরীরের পক্ষে নাকি খুব ভালো, তাই আমরা একটু করে জলও খেলাম। ডাল লেকের পাশেই শহরের ওপর আছে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রতিষ্ঠিত শঙ্করাচার্যের শিব-মন্দির। সেখান থেকে শ্রীনগর শহর খুব সুন্দর দেখা যায়। শ্রীনগরের মোটামুটি সবই দেখা হল। পরের দিন আমাদের গুলমার্গ যাওয়ার কথা।

শ্রীনগর থেকে গুলমার্গের দূরত্ব ৫১ কিলোমিটার, ওর উচ্চতা ২৬৫৩ মিটার। তাই সকাল সকাল আমরা বাসে করে রওনা হয়ে পড়লাম যাতে সেইদিনই সন্ধ্যেতে শ্রীনগর ফিরে আসা যায়। সুন্দর রাস্তা, দু'পাশে পপলার গাছের সারি—সান্ত্রীর মত পাহারা দিচ্ছে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। ওদের পেছনেই ধানের ক্ষেত—যত দূর চোখ যায় সোনালী ধানে ভরা। অনেক জায়গায় ব্যস্ত কৃষকেরা ধান কাটায়। তংমার্গ এসে বাস থেমে গেল। আমরা ঘোড়া নিয়ে নিলাম এবং তাতে করে চড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। পাইনগাছে ভরা পাহাড়ের গায়ে কাটা রাস্তা। পাহাড়ের মাথায় এসে দেখলাম অনেকটা প্রায়-সমতল জায়গা। এটিকেই বলে গুলমার্গ। এখন সবুজ ঘাসে ঢাকা, কিন্তু গ্রীষ্মে এখানে রকমারি ফুলের বাহার (গুল্‌=ফুল)। মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে রাস্তা। ছোট ছোট টিলার ওপর মনভোলানো সব বাড়ী। চার পাশে পাহাড়, তাদের মাথায় বরফ। নানারকম দোকানপাটও আছে, বহু-লোকের ভীড়ও। সকলেই গুলমার্গ দেখতে এসেছে। অনেকে আবার খচ্চরের পিঠে চড়ে খিলানমার্গের দিকে উঠতে শুরু করেছে। বেশির ভাগ লোকই বেশ কষ্টেস্থষ্টে ঘোড়ার পিঠে চলেছে—অনভ্যস্ততার বেদনা আমাদের সারা অঙ্গেই মালুম হচ্ছিল। গুলমার্গের গল্‌ফ খেলার মাঠটি খুব সুন্দর। এতো উঁচুতে এরকম মাঠ পৃথিবীতে আর নেই। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যেতে আবার বাসে করে ফিরে এলাম শ্রীনগরে।

পরের দিন সকালে আবার বেড়িয়ে পড়লাম। এবারের গন্তব্যস্থল পহেলগাম্‌। শ্রীনগর থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে (২১৩৩ মিটার)। এখানকার রাস্তার দৃশ্যও অতি মনোরম—জাফরানের ক্ষেতে ভরা। দৃশ্য দেখতে দেখতে ৯৬ কিলোমিটার যে কখন শেষ হলো টেরই পাওয়া গেল না। পহেলগাম শুনেছিলাম লিডার নদীর উপত্যকায়। কাজেই কিছুক্ষণ পরেই যখন লিডার নদীর গর্জন শুনতে পেলাম, তখন মনে হল পহেলগামের কাছাকাছি এসে গেছি। বর্ষার পর তীব্র স্রোতে ছুটে চলেছে নদী। নদীর পাশে এবং পাহাড়ের ওপর ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। পহেলগামে দুদিন থাকবো, তাই একটা হোটেল ঠিক করে ফেলা গেল। এই পহেলগাম থেকেই অমরনাথ ধামে যাওয়ার রাস্তা গেছে। শ্রাবণী পূর্ণিমার ক'দিন আগে শুরু হয় যাত্রা। তীর্থযাত্রীদের ভীড়ে তখন পহেলগাম সরগরম। এখনও ভীড় আছে, তবে এখন সবাই প্রায় দেশভ্রমণে এসেছে। লিডার নদীর

ধারে গিয়ে আমরা কিছুক্ষণ বসে রইলাম। চার পাশে পাহাড়। নদীর ওপরে কাঠের সাঁকো আছে। তাই দিয়ে মাঝে মাঝে লোকজন চলাফেরা করছে। আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত গেল। লিডারের জলে কালো ছায়া—ঢেউএর মাথায় ফেনাগুলো অস্তগামী সূর্যের আলোয় চিক্‌চিক্ করতে লাগলো। সূর্য ডোবার সাথে সাথেই বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু হলো। আমরা তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম।

পরের দিন ভোরে উঠে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে পড়লাম—গন্তব্যস্থল তুলিয়ান লেক। সারাদিনের জন্য যাওয়া এবং অনেকটা পথ। কাজেই দুপুরের খাওয়ার জন্য কিছু সঙ্গে নিলাম। পহেলগাম থেকে বেশ কিছু উঁচুতে তুলিয়ান লেক। ঘোড়ায় করে অর্ধেক পথ এসে তারপরে বাকি পথটা পায়ে হেঁটে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে যখন তুলিয়ান লেকে পৌছলাম, তখন সূর্যদেব মধ্যগগনে। লেকটি খুবই সুন্দর—গভীর নীল জল, তাতে চার পাশের পাহাড়ের ছায়া। উত্তর-পূব কোণে বরফে ঢাকা বিশাল পাহাড়ের সারি। পাহাড়-গুলো থেকে অনেক ঝর্ণা নীচে নেমে আসছে। ভীষণভাবে নির্জন—কোনো ধ্বনি নেই, খালি তির তির করে ঝর্ণার আওয়াজ কানে আসে। অত উঁচুতে পশুপাখী প্রায় নেই বললেই হয়। লেকের জল কনকনে ঠাণ্ডা। কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘুরে বেড়ালাম, তারপর আবার পহেলগামে ফেরার জন্য রওনা হলাম। খাড়া পাহাড়, উঠবার সময় যত কষ্ট হয়েছিল, এখন নামবার সময় অতো কষ্ট হয়নি। চার পাশের দৃশ্যও অতি মনোরম। সন্ধ্যে নাগাদ পহেলগামে পৌছলাম। এত ঘোরাঘুরিতে খুব ক্লান্ত, তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লাম। পরের দিন দোকানপাট দেখে নদীর ধারে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। এরপর গল্‌ফ খেলার মাঠ দেখলাম। দুপুর বেলা বাসে করে শ্রীনগরের পথ ধরলাম।

সন্ধ্যে ও রাতটা শ্রীনগরে কাটিয়ে পরের দিন সকালে সোনমার্গে যাবার জন্য বাসে চড়ে বসলাম। শ্রীনগর থেকে ৮৩ কিলোমিটার দূরে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় সোনমার্গ। এর উচ্চতা ২৭৪০ মিটার। পেছনে সুউচ্চ পর্বতের সারি, সামনে দিয়ে বয়ে গেছে দূরন্ত বেগশালী সিন্ধুনদ। সেখান থেকে মোটে তিন কিলোমিটার দূরে আজিয়াস্ হিমবাহ (Glacier)। খুব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য! ফুলের মরসুমে সোন্‌মার্গ সত্যই সোনার ময়দান। সোন্‌মার্গ থেকে অনেকগুলো হ্রদে যাওয়া যায়—বিসানসার, কৃষাণসার ও গঙ্গাবল। এগুলো অনেক উঁচুতে এবং খুব সুন্দর। সোন্‌মার্গ হতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শহর 'লেহ' যাবার পথ গেছে। শোনমার্গে থাকবার জন্য ভ্রমণকারীদের বাংলো আছে। আমরা অবশ্য সেদিনই বাসে করে ফিরে এলাম শ্রীনগর।

শ্রীনগরে এসে হজরতবাল মসজিদ, হরিপর্বতের দুর্গ প্রভৃতিও দেখে এলাম। পরের দিন ফিরে যাব, তাই ইয়ুসমার্গ (Yusmarg), উলার লেক (Wular lake) প্রভৃতি জায়গায় এবারে যাওয়া হ'ল না। তাই মনটা খুব খারাপ লাগছে। সৌন্দর্যের এই লীলাভূমিতে আরও কদিন থাকতে মন চায়। এতো নাম শুনেছিলাম কাশ্মীরের, এখন দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই ভূস্বর্গই বটে। (শ্রীসুভদ্রা ঘোষ)

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কতিপয় রচনা

ঐহিক অমরতা

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান! পর্বতে উচ্চতা আছে, নদীর তরঙ্গে শোভা আছে, নদী-প্রবাহসম্মিলিত সমুদ্রের বক্ষে অনির্বচনীয় বিস্তার আছে; —ফুলে মধু, ফুলভারাবনত লতাদেহে মাধুরী এবং লতার আকণ্ঠ-বিসর্পি-বেষ্টনবদ্ধ অচল-পাদপে গরিমার এক অপূর্ব বিলাস-ভঙ্গি আছে। কবি অথবা ভাবুকের চক্ষু লইয়া দেখিতে হইলে, দেখিবার এইরূপ কত বস্তুই যে চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? আবার মানুষী শক্তির জয়স্তম্ভ দেখিতে হইলে, নগর, উপনগর, দুর্গ, সেতু, জলযান, স্থলযান, ব্যোমযান, আগ্রার তাজ এবং মিশরের পিরামিড্ প্রভৃতি কতই কি না মনুষ্যচক্ষুর সন্নিহিত হইতেছে! কিন্তু দৃশ্য পদার্থের গূঢ় গৌরব ভাবিয়া দেখিলে, তথাপি ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে ইচ্ছা হয় যে, পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান। এই দুইয়ের তুলনা নাই। জলে যেমন জলবুদ্বুদের উদয় ও বিলয় হইতেছে, বসুন্ধরার বক্ষঃস্থলরূপ বিশাল নিকেতনে সূতিকা ও শ্মশানের প্রকোষ্ঠদ্বয়েও প্রতি মুহূর্তে, প্রতি নিমিষে, সেইরূপ অসংখ্য প্রাণীর উদয় ও বিলয় অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। যে ছিল না, সে আসিতেছে; যে ছিল, সে চলিয়া যাইতেছে। যাহাকে দেখি নাই, সে নয়নপথের নূতন পথিক হইয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে এবং ভালবাসার বাহু প্রসারিয়া বুকে আসিতে যত্ন পাইতেছে। যাহাকে দেখিতাম, জানিতাম, ভালবাসিতাম, সে যেন নয়নপথের অন্তরালে অনন্ত ও অতলস্পর্শ অন্ধকার-সমুদ্রে বিলীন হইতেছে।

জন্মমৃত্যুর এই আবর্তগতি গাঢ়রূপে চিন্তা করিলে মনে আপনা হইতে দুইটি গভীর প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথম প্রশ্ন এই,—যাহারা এই জগতে নূতন প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহারা কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? কে তাহাদিগকে আনিল? কে তাহাদিগকে জীবন দান করিয়া এই সংসারে সুখদুঃখের তরঙ্গে তাহাদিগের জীবনতরী ভাসাইয়া দিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে,—যাহারা যায়, তাহারা কোথায় যায়? মৃত্যু তাহাদিগের নির্বাণ, না তিরোধান? মৃত্যুর পর তাহাদিগের আর কিছু থাকে কি? যাহাদিগের সুকুমার তনু সমাধির ক্রোড়ে কিংবা শ্মশানানলে উৎসর্গ দিয়া আসিলে, এই জগতের সহিত তাহাদিগের আর কোন সম্বন্ধ রহিল কি? এত আশা, এত ভালবাসার কি শেষ? যাহাকে পলকের তরে হারাইলে প্রলয়-জ্ঞান হইত, তাহাকে কি একেবারে চিরদিনের জন্যই হারাইতে হইবে? অথচ যাঁহারা এই পৃথিবীর মঙ্গল-কামনায় প্রাণত্যাগেও কুণ্ঠিত হন নাই,—যাঁহাদিগের প্রেমাশ্রুতে স্নাত হইয়াই ইহা রমণীয় পুষ্পোদ্যান ও পূজ্যস্থান বলিয়া জগতে আদৃত হইয়াছে, পৃথিবী আর কি কখনও তাঁহাদিগকে আপনার জন বলিয়া মনে করিতে পারিবে না? সেই ত অযোধ্যা আজিও সরযূর তটে শয়ান রহিয়াছে। কিন্তু অযোধ্যার সেই রাম কৈ? সরযূর কলকলায়মান সলিলরাশি যাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্র হইত—যাঁহার স্নেহশীতল গম্ভীরমূর্তি

আপনার হৃদয়াদর্শে অঙ্কিত দেখিয়া আনন্দভাবে ফুলিয়া উঠিত, সেই রঘুকুলতিলক দয়ার অবতার কৈ? সেই ত বাল্মীকির তপোবন পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাল্মীকির সে বীণা কৈ? বীণার সে ঝঙ্কার কৈ? আর বাল্মীকি যাঁহাকে প্রীতির পুত্তলী, পবিত্রতার প্রতিকৃতি বলিয়া জানিতেন, এবং যাঁহাকে এই জন্যই জননী ও দুহিতা অপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিতেন, অবলাকুলের আভরণরূপিণী সেই অলোকসামান্যা জানকী কৈ? সেই গঙ্গা, সেই যমুনা, তেমনই মৃদু মৃদু মধুর নাদে বহিয়া যাইতেছে,—সেই কুরুক্ষেত্র, সেই উজ্জয়িনী চৈত্ররৌদ্রের খরজ্যোতিতে তেমনিই ধূ ধূ করিতেছে। কিন্তু গঙ্গার লহরী যাঁহাদিগের জলদগম্ভীর স্বরলহরীর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিত, সেই ভগবদ্ভক্ত জগদ্গুরু আর্যতাপসেরা কৈ? যমুনার শ্যাম সলিল যাঁহাদিগের শৌর্য-প্রবাহ-স্বরূপ শোণিতধারায় জবামাল্যভূষিতা রণরঙ্গিণী শ্যামার ন্যায় ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যে সুন্দর হইত, সেই পৌরব ও যাদব কৈ? উজ্জয়িনী আছে, উজ্জয়িনীর সেই বিক্রম কৈ? কালিদাস কৈ? কুরুক্ষেত্র আছে, কুরুক্ষেত্রের সেই কৌরব কৈ? যিনি বিনা যুদ্ধে অণুপরিমাণ ভূমিদানেও অসম্মত ছিলেন, সেই অভিমানদগ্ধ কুরুরাজ কৈ?

মনুষ্য সূতিকা-গৃহের আনন্দকোলাহলে অধীর ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া জন্মতত্ত্বের আদি চিন্তায় উদাসীন রহিতে পারে; এবং যাহার জীবনের স্রোত, জোয়ারের নূতন স্রোতের ন্যায়, আবিল আমোদের ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে বহিয়া যায়, সেও জীবনের উদ্দেশ্যচিন্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষা দেখাইতে পারে। দিন দিন করিয়া দিন যায়, না বর্ষ বাড়ে। তাহার আর ভাবনা কি? শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে; গ্রীষ্ম যায়, শীত আসে। তাহার আর চিন্তা কি? কিন্তু শ্মশানই যাহার শেষ গতি এবং সমাধিতেই যাহার শেষ সুপ্তি, সুখী হউক আর দুঃখী হউক, মৃত্যুচিন্তাসম্বন্ধে সে কিরূপে ঔদাস্য ও উপেক্ষা দেখাইবে? এই সংসারে কোথায় কে কবে আসিয়াছিল, যাহাকে যাইতে হয় নাই? কোথায় কে কবে জন্মিয়াছিল যে একদিন শ্মশানের সম্মুখীন হয় নাই? যে ধনী, তাঁহারও শেষ শয্যা শ্মশান; এবং যে মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করিয়া, মনুষ্যের সুখদুঃখে হর্ষবিধানে সর্বতোভাবে স্বত্ববান্ হইয়াও ধনিগৃহের মার্জ্জার-কুক্কুরের সমান বলিয়া পরিগণিত হইল না, তাহারও শেষ শয্যা শ্মশান। আজি ময়ূরসিংহাসন কি স্বর্ণপর্যঙ্কের সুকোমল আস্তরণেও যাঁহার কোমলতর শরীর ক্লিষ্ট হয়, তাঁহারও শেষ শয্যা শ্মশান, এবং যে দিনান্তের পর্যটনে মুষ্টিভিক্ষা না পাইয়া, গাছের তলায় পড়িয়া থাকে, তাহারও শেষ শয্যা শ্মশান। যেখানে আকবর সাহের সেকেন্দরা বিলুপ্ত সম্পদের স্মরণস্তম্ভ-স্বরূপ শোভা পাইতেছে, তাহারই চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য দীন-দুঃখী ও পথের ভিখারীর অস্থিস্তূপ অবনীর ক্রোড়ে পড়িয়া রহিয়াছে; যিনি জ্ঞানসমুদ্রের শেষ সীমা দর্শনের জন্য কপিল, কণাদ কিংবা নিউটন্ কি হামবোল্ডের ন্যায় অক্লান্তমনে সন্তরণ করিয়াছেন, তিনিও এইক্ষণ শ্মশানে; আর যাহারা পৃথিবীতে আসিয়া, খাইয়া, শুইয়া, হাসিয়া চলিয়া এবং দর্পণে আপনাদিগের মুখখানিমাত্র দেখিয়াই চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগেরও শেষ স্থান এইক্ষণ শ্মশান।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উপাসনার জন্য আজিকার সভা আহূত হইয়াছে; যাঁহারা এই উপাসনার আয়োজন করিয়াছেন এবং এই উপাসনা-কর্মকে সম্ভবতঃ সাংবাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কি কারণে জানি না, আজিকার অনুষ্ঠানের প্রধান ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তিপ্রকাশের অবসর লাভ করিয়া, আমি যুগপৎ গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি; কিন্তু যোগ্যতর পাত্রে এই ভার অর্পিত হইলে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বঞ্চিত হইতে হইত না। কেবল যে সময়োচিত বিনয় প্রকাশের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে, বঙ্কিমচন্দ্র যে বিস্তীর্ণ বঙ্গীয়-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সহবর্তী ও পরবর্তী অনুচরগণের পথ-প্রদর্শক হইয়া গিয়াছেন, আমিও সেই বঙ্গীয়সাহিত্য-ক্ষেত্রের এক প্রান্তে এক সঙ্কীর্ণ পথ আশ্রয় করিয়া মন্দ গতিতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছি; ইহাই আমার জীবনের কাজ ও ইহাই আমার জীবিকা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হস্তে করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রের যে যে অংশ প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সেই অংশে আমার 'প্রবেশ নিষেধ'। আমি দূর হইতে সেই আলোকের উজ্জ্বল দীপ্তিতে মুগ্ধ হইয়াছি মাত্র; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যবান্ সহচরগণের ও অনুচরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেও আমি অধিকারী নহি। আজিকার আয়োজনের অনুষ্ঠাতাদিগের অনুগ্রহ-জন্য অকপট কৃতজ্ঞতাস্বীকারে আমি বাধ্য আছি; কিন্তু আমি আশা করি যে, আপনারা তাঁহাদের পাত্রনির্বাচনে বিষয়বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না।

বাঙ্গালীর জীবনের উপর বঙ্কিমচন্দ্র কত দিকে কত উপায়ে প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি; কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গলার সার ওয়াল্টার স্কট্ মাত্র। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচয় অতি অল্প বয়সেই ঘটিয়াছিল, সে বয়সে উপন্যাসের সহিত আমার পরিচয় বড় একটা স্পৃহণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ বাহির হইতেছিল এবং আমি বঙ্গদর্শনের কয়েক সংখ্যা হইতে বিষবৃক্ষের দুই-চারিটা পরিচ্ছেদ আত্মসাৎ করিয়াছিলাম। সেই বয়সে বিষবৃক্ষের সাহিত্যরসের কিরূপ আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক মনে নাই; তবে এ কথা বেশ মনে আছে যে, পাঠশালায় গিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভূগোল বিবরণের ভারতবর্ষের অধ্যায়ে গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুর মসলিপটম মসলিপটম, আর্কট আর্কট, মদুরা মদুরা, টিনিভেলি টিনিভেলি প্রভৃতি অপরূপ সুশ্রাব্য নামাবলীর আবৃত্তির ত্রুটি ঘটিলে, পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বেত্রাঘাত উপহার পাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ দাঁড়াইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা ও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন নিতান্তই তাহার সমর্থন ও পোষণ করে নাই। আমার বেশ মনে আছে যে, 'পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে' এই পরিচ্ছেদের সহিতই আমার তৎকালিক বিষবৃক্ষ পাঠ সমাপ্ত হয় এবং ঐ পরিচ্ছেদের শীর্ষস্থিত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি মনের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া, কিছুদিনের জন্য একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। কিছুদিনের জন্য মাত্র, কেননা পরবৎসর আমি পাঠশালার পরীক্ষায় যে পুরস্কার পাইয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, তাহার রাঙা ফিতার বন্ধনের মধ্যে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষ-নামে দুইখানি পুস্তক রহিয়াছে। এই সভাস্থলে যাঁহারা পিতার বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবকের গৌরবযুক্ত পদবী গ্রহণ করেন, তাঁহারা শুনিয়া আতঙ্কিত হইবেন যে, পুরস্কার-বিতরণে গ্রন্থনির্বাচনের ভার আমার পিতৃদেবের উপর অর্পিত ছিল এবং তিনিই আমার গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুর প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভৌগোলিকতত্ত্বে পারদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ ঐ দুইখানি গ্রন্থ নির্বাচন করিয়া তাঁহার নবমবর্ষের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পুরস্কার হস্তে বাড়ী আসিয়া রাত্রিটা এক রকমে কাটাইয়াছিলাম ; পরদিনে বিষবৃক্ষ ও তার পরদিনে দুর্গেশনন্দিনী টাইটেল-পেজের হেডিং মায় মূল্য পাঁচসিকা হইতে শেষ পর্যন্ত একরকমে উদরস্থ করিয়াছিলাম। ঐ দুই গ্রন্থের কোন্ অংশ সর্বোৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা যদি এখন অকপটে বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনারা আমার কাব্যরসগ্রাহিতার প্রশংসা করিবেন না। বিষবৃক্ষের মধ্যে যেখানে ছেলের পাল "হীরা আয়ি বুড়ি হাঁটে গুড়িগুড়ি" বলিয়া সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল ও বৃদ্ধা ইষ্টিরসনামক ব্যাধির প্রতিকার-বিষয়ে কেষ্টরসনামক ঔষধের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীর সহিত আলাপ করিতেছিল, সেই স্থানটাই গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকেই দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সর্বপ্রধান পাত্র স্থির করিয়াছিলাম, ইহাও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। আশমানির ঘরে বিমলার আকস্মিক প্রবেশের সহিত বিদ্যাদিগ্‌গজ ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মগোপন করিলেন এবং তাঁহার শীর্ষরক্ষিত হাঁড়ি হইতে অড়হরের ডাল বিগলিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মন্দাকিনীর ধারা বহাইল, সেই বিবরণ যখনই পাঠ করিলাম, তখনই বুঝিলাম যে, বাঙ্গালাসাহিত্য অতি উপাদেয় পদার্থ ; এই সাহিত্যের সরোবরে বিদ্যাদিগ্‌গজের মত শতদলকমল যখন বিদ্যমান, তখন গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুরের কাঁটাবন ঠেলিয়াও সেই কমলচয়নের চেষ্টা অনুচিত নহে।

ঔপন্যাসিক-বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এত লোকে এত কথা কহিয়াছেন যে, আর সে বিষয়ে কোন কথিতব্য আছে কি না, আমি জানি না।। কথিতব্য থাকিলেও আমি কোন কথা বলিতে সাহস করিব না। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত দাবি করিবেন যে, আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধপাঠে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমি সূর্যমুখীর ও ভ্রমরের চরিত্র আর একবার সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, উভয় চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনায় বাধ্য আছি। যদি কেহ এইরূপ দাবি রাখেন, তাঁহার নিকট আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। বাঁকনল আর টেষ্ট টিউব হাতে লইয়া নানা-জাতীয় 'কিম্ভূত-কিমাকার' দ্রব্যের বিশ্লেষণ আমার ব্যবসায় বটে, কিন্তু মানব-চরিত্র বা মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণে আমার কিছুমাত্র শিক্ষা বা দক্ষতা নাই ; কেননা, নভেল-বর্ণিত মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে সল্‌ফুরেটেড্ হাইড্রোজেনের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই ; ঐ মানবচরিত্র নমনীয় নহে, দ্রবণীয় নহে এবং জলে দ্রব করিয়া উত্তাপপ্রয়োগে

উহার ভাস্বরতাপাদনও অসম্ভব। আর আমার কাব্যরসগ্রাহিতার যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতে আপনারাও আমার নিকট সে আশা রাখেন না।

আজিকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃশ্যহস্ত আমাদের জাতীয় জীবনকে যেরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যতই উচ্চস্থানে অবস্থান করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য মূর্তির পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আজ ব্যগ্র হইব, ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র কত দিক্ হইতে আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার গণনা দুষ্কর। ইংরেজীতে একটা বাক্য চলিত হইয়াছে, যাহার মূলে গ্রীক্ নাই, সে জিনিষ জগতে অচল। বলা বাহুল্য, এখানে জগৎ অর্থে কেবল পাশ্চাত্ত্যদেশ বুঝায়। আমরা যদি ঐ বাক্যকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া বলি যে, যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিষ বাঙলাদেশে অচল,—তাহা হইলে নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজী গতিবিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে,—মোমেণ্টাম। বাঙলায় উহাকে 'ঝোঁক' শব্দে অনুবাদ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটা জিনিষকে 'ঝোঁক' দিয়া ঠেলিয়া দিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিষ বাঙ্‌লাদেশে চলিতেছে। সেই জিনিষ-গুলা গতি উপার্জন করিবার জন্য যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন, আর উহা চলিতে লাগিল,—তাহার পর আর উহা থামে নাই।

লাইব্রেরী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সকলেই জানেন, যত প্রকার দান আছে, তাহার মধ্যে বিদ্যাদান সকল দানের চেয়ে বড়। সেই জন্য এখন অনেকে স্কুল করিয়া বিদ্যাদান করিতেছেন। সুসভ্য জাতি ভিন্ন এই দানের মাহাত্ম্য লোকে বুঝিতে পারে না। যাহারা সুসভ্য নয়, তাহারা অন্নদান, ভূমিদান, জলদান প্রভৃতিতেই খুসী থাকে। তাহারা বুঝে না যে এক বিদ্যাদান হইলে, তাহা হইতেই আর সব দান আপনা হইতে আসিয়া জুটে।

বিদ্যাদান অপেক্ষাও লাইব্রেরীদান আরও বড়। কেননা, লাইব্রেরী বিদ্যার মূল। বিদ্যাকে যদি গাছের সঙ্গে তুলনা কর, লাইব্রেরী তাহার ফোয়ারা, অনন্ত জলরাশির আধার। সুতরাং যাঁহারা লাইব্রেরী দান করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠদানের উপরও যদি কিছু শ্রেষ্ঠদান থাকে, তাহাই করিয়া থাকেন। লাইব্রেরীতে যে বিদ্যাদান হইয়া থাকে, সেটা ছেলেবুড়া সবারই। সেখানে যে বিদ্যাদান হয়, তাহা বার মাস তিরিশ দিন; মানুষ যত দিন বাঁচে তত দিনই মানুষ হইতে পারে। স্কুলে যে বিদ্যাদান হয় তাহার সীমা আছে, নির্দিষ্ট সময় মত দান হইয়া থাকে। এখানকার দান অনন্ত, ইহার সীমাও নাই, অন্তও নাই।

পৃথিবীতে যত কিছু দান আছে, সবই কলমবন্ধী করা—বইএ লেখা। সুতরাং লাইব্রেরীতে যখন সবরকম বই-ই থাকে, তখন যত রকম বিদ্যা, যত রকম দান আছে, সবই সেখানে দান হয়।

লাইব্রেরীর ইতিহাস খুব লম্বা। যখন হইতে মানুষ সভ্য, যখন হইতে মানুষ নিজের মনের ভাব বাহিরে **'আঁকিতে'** শিখিয়াছে, তখন হইতেই লাইব্রেরীর উৎপত্তি।

আমি এখানে **'আঁকিতে'** শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। **'লিখিতে'** শব্দ ব্যবহার করি নাই। তাহার কারণ, লিখিতে গেলেই বর্ণমালার দরকার। বর্ণমালার পূর্বেও মানুষে মনের ভাব ব্যক্ত করিত—ছবি আঁকিয়া, গাছপালা আঁকিয়া। তখন ছাপা ছিল না, কাগজ ছিল না, তালপাতার বা ভূর্জপত্রের ব্যবহার ছিল না। তখন মনের ভাব জানাইবার জন্য ছবি আঁকিতে হইত পাথরে, নয় মাটির টালিতে, তাও আবার পোড়ান টালি নয়, রৌদ্রে শুকান। পাথরের টালির একটি লাইব্রেরী মিশরের মাটির অনেক নীচে পাওয়া গিয়াছে। এই সব লাইব্রেরী মন্দিরেই থাকিত, মন্দিরের পুরোহিতেরাই পড়িত, পড়াইত ও যত্ন করিয়া রাখিত। মিশরের এই লাইব্রেরী যীশুর জন্মের প্রায় চার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। তাহার পর, বরাবরই মিশরে লাইব্রেরী হইতেছিল, পাথুরে বই যে কত হইয়াছিল ঠিকানা নাই।

গ্রীস্‌দেশে অনেক বড় বড় লাইব্রেরী ছিল। আলেক্‌জাণ্ডারের গুরু এরিস্টটলের এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল। তিনি তাহা ছাত্রকে দিয়া যান। এথেন্সে ইউক্লিডের এক লাইব্রেরী ছিল। পিসিস্ট্রেট্‌সেরও লাইব্রেরী ছিল, কিন্তু আলেকজেন্ড্রিয়ার লাইব্রেরী পৃথিবীর সব লাইব্রেরীকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

রোমে বড় বড় লাইব্রেরী ছিল। যে সকল লাইব্রেরী সর্ব্বসাধারণের হাতে থাকিত, সকলেই গিয়া পড়িতে পারিত। আগস্টস এইরূপ পাব্‌লিক লাইব্রেরী বা সাধারণ পাঠাগার সর্বপ্রথম খুলেন।

এইবার নিজের দেশের লাইব্রেরীর কথা বলিব। যখন আমাদের ব্রাহ্মণেরা বেদমাত্র লইয়া থাকিতেন, সেই প্রাচীনকালে আমাদের লাইব্রেরী দরকার হইত না। ব্রাহ্মণেরা পাঁচ বছরের ছেলে বাড়ী হইতে লইয়া গিয়া গুরুগৃহে রাখিয়া দিতেন। সেখানে তাহারা বেদ মুখস্থ করিতে থাকিত। ৯ বৎসর বা ১৮ বৎসর বা ২৭ বৎসর কেবল বেদ মুখস্থ করিতে হইত। ব্রাহ্মণেরা যখন গুরুকুল হইতে সমাবর্তন করিতেন, তখন এক একটি লাইব্রেরী হইয়া ফিরিতেন। বেদ কলমবন্ধী করিবার উপায় ছিল না, করিলে তার ঘোর নরক নিশ্চয়। আর, এই আবহমানকাল বেদ মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে।

আমাদেরও যেমন, বৌদ্ধদেরও তেমনই। ইং ৪০০ সালে ফা-হিয়ান ভারতে আসেন পুঁথি সংগ্রহের জন্য, কিন্তু কোথায়ও পুঁথি পান নাই; একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে একজন বলিয়া দিল—"এ দেশে ওরকম পুঁথি সংগ্রহ হইবে না। বুড়া বুড়া ভিক্ষুদের ধর, আর তাহাদের মুখ হইতে লিখিয়া লও।" ফা-হিয়ান এইরূপ করিয়াই বৌদ্ধদের সমস্ত পুঁথি লিখিয়া লইয়াছিলেন।

বেদ ও ধর্ম্মগ্রন্থের কথা যাই হোক, অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ লেখাই হইত, লাইব্রেরীও ছিল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণই ছোটখাট একটি লাইব্রেরী রাখিতেন। যাঁহার যত বড় লাইব্রেরী, তিনি তত বড় পণ্ডিত, কেননা "গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ।"

বৌদ্ধদের বিহারে লাইব্রেরী থাকিত, জৈনদেরও লাইব্রেরী থাকিত। মুসলমান বিজয়ের সময় বৌদ্ধদের অনেক বড় বড় লাইব্রেরী নষ্ট হইয়া যায়।

বাঙ্গালা বড় খারাপ দেশ, পুঁথি এ দেশে থাকে না—আগুন আছে, বৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, আর সকলের চেয়ে শত্রু আছে উই আর ইঁদুর—আর একটা শত্রু পণ্ডিতের মূর্খপুত্র। ইহাদের হস্তে অনেক প্রাচীন লাইব্রেরী লোপ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান বাদশাহেরা অনেকেই লাইব্রেরী রাখিতেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এখন ত চারিদিকেই লাইব্রেরী হইতেছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী সকলের চেয়ে পুরান। লর্ড-মেট্‌কাফ্ ছাপাখানাকে স্বাধীন করিয়া দিয়া বঙ্গবাসীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সেজন্যই সেকালের বাঙ্গালীরা তাঁহাদের নাম দিয়া "মেট্‌কাফ্ হল" নামে প্রথম পাব্‌লিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন। লর্ড কার্জন সেই লাইব্রেরীর মূলে কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী [ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী] করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

দুঃখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শান্তি-নিকেতন' নামক উপাদেয় গ্রন্থাবলী হইতে নিম্ন প্রবন্ধটি সঙ্কলিত। ইহা 'চলিত ভাষা'য় প্রার্থনান্তিক ভাষণের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমাদের উপাসনার মন্ত্রে আছে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—সুখকরকে নমস্কার করি, কল্যাণকরকে নমস্কার। কিন্তু আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরকে সব সময়ে নমস্কার করতে পারিনে। কল্যাণকর যে শুধু সুখকর নন, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর দান বলে জানি আর দুঃখকে কোনো কোন দুর্দৈবকৃত বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি।

এই জন্যে দুঃখভীরু বেদনাকাতর আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি, আমরা কেবলি লুকিয়ে থাক্‌তে চাই। তাতে কি হয়? তাতে সত্যের পূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ধনী বিলাসী সমস্ত আয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কেবল আরামের মধ্যে পরিবৃত হয়ে থাকে। তাতে কি হয়? তাতে সে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলে; নিজের হাত পায়ের উপর তার অধিকার থাকে না, যে সমস্ত নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছিল সেগুলি কর্ম অভাবে পরিণত হতে পারে না, মুষ্‌ড়ে যায়, বিগ্‌ড়ে যায়। স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে। কৃত্রিম জগৎ আমাদের প্রকৃতিতে কখনই তার সমস্ত স্বাভাবিক খাদ্য যোগাতে পারে না, এই জন্য সে অবস্থায় আমাদের স্বভাব একটি ঘরগড়া পুতুলের মত হয়ে ওঠে, পূর্ণতালাভ করে না।

দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলি বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয়, সুতরাং তাতে কখনই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না, সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না, তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

যাদের স্বভাব অতি বেদনাশীল, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তাদের বাঁচিয়ে চলে ;—সে ছোটকে বড় করে তোলে বলেই লোকে কেবলি বলে কাজ নেই—তার সম্বন্ধে লোকের কথাবার্তা ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক হয় না। সে, সব কথা শোনে না কিংবা ঠিক কথা শোনে না—তার যা উপযুক্ত পাওনা তা সে সবটা পায় না কিংবা ঠিকমত পায় না। এতে তার মঙ্গল হতেই পারে না। যে ব্যক্তি বন্ধুর কাছ থেকে কখনো আঘাত পায় না কেবলি প্রশ্রয় পায়, সে হতভাগ্য বন্ধুত্বের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়—বন্ধুরা তার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে বন্ধু হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

জগতে এই যে আমাদের দুঃখের পাওনা এ-যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হবেই তা নয়। যাকে আমরা অন্যায় বলি, অবিচার বলি—তাও আমাদের গ্রহণ কর্‌তে হবে, অত্যন্ত সাবধানে সূক্ষ্ম হিসাবের খাতা খুলে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকুর ভিতর দিয়েই নিজেকে মানুষ করে তোলা—সে ত হয়েও ওঠে না এবং হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। অন্যায় এবং অবিচারকেও আমরা উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারি এমন আমাদের সামর্থ্য থাকা চাই।

পৃথিবীতে আমাদের ভাগে যে সুখ পড়ে তাও কি একেবারে ঠিক হিসাব মত পড়ে, অনেক সময়েই কি আমরা গাঁঠের থেকে যা দাম দিয়েছি তার চেয়ে বেশি খরিদ করে ফেলিনে? কিন্তু কখনো ত মনে করিনে আমি তার অযোগ্য? সবটুকুই ত দিব্য অসঙ্কোচে দখল করি? দুঃখের বেলাতেই কেবল ন্যায় অন্যায়ের হিসাব মিলাতে হবে? ঠিক হিসাব মিলিয়ে কোনো জিনিস যে আমরা পাইনে।

তার একটি কারণ আছে। গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চল্‌তে থাকে—কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ এই দুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের। আমাদের প্রাণের আমাদের বুদ্ধির আমাদের সৌন্দর্যবোধের আমাদের মঙ্গল-প্রবৃত্তির, বস্তুতঃ আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূল ধর্মই এই যে, সে-যে কেবল মাত্র নেবে, তা নয়, সে ত্যাগও কর্‌বে।

এই জন্যই আমাদের আহার্য পদার্থে ঠিক হিসাবমত আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ থাকে না, তাতে যেমন খাদ্য আছে তেমনি অখাদ্য অংশও আছে। এই অখাদ্য অংশ শরীর পরিত্যাগ করে। যদি ঠিক ওজন মত নিছক খাদ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করি তা হলে আমাদের চলে না, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কারণ কেবল কি আমাদের পাকশক্তি ও পাকযন্ত্র আছে?—আমাদের ত্যাগশক্তি ও ত্যাগযন্ত্র আছে—সেই শক্তি সেই যন্ত্রকেও আমাদের কাজ দিতে হবে, তবেই গ্রহণ-বর্জনের সামঞ্জস্যে প্রাণের পূর্ণতাসাধন ঘটবে।

সংসারে তেমনি আমরা যে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকু পাব, কেউ আমাদের প্রতি কোনো অবিচার কর্‌বে না, এ-ও বিধান নয়। সংসারে এই ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায় মিশ্রিত থাকা আমাদের চরিত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মত আমাদের চরিত্রের এমন একটি সহজ ক্ষমতা থাকা চাই যাতে আমাদের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু অনায়াসে গ্রহণ করি এবং যেটুকু ত্যাজ্য সেটুকু বিনাক্ষোভে ত্যাগ কর্‌তে পারি।

অতএব দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হোক, অন্যায্য হোক বা তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চল্‌বার অতি-চেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে।

এই ভীরুতায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য জন্মে তা নয়, যে সমস্ত অতি-বেদনাশীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজকে আবৃত করে তাহাদের শুচিতা জম্‌তে থাকে ;—যতই লোকের ভয়ে তারা সেগুলা লোক-চক্ষুর সাম্‌নে বের কর্‌তে না চায় ততই সেগুলা দূষিত হয়ে ওঠে, স্বাস্থ্যকে বিকৃত কর্‌তে থাকে। পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখ-কষ্টকে যারা অবাধে অসঙ্কোচে গ্রহণ কর্‌তে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয়, তারা নির্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণসংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।

অতএব সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে প্রস্তুত হও—যিনি সুখকর তাঁকে প্রণাম কর এবং যিনি দুঃখকর তাঁকেও প্রণাম কর—তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ কর্‌বে—যিনি শিব যিনি শিবতর তাঁকেই প্রণাম করা হবে।

দেশ ও জাতীয়তা

শ্রীঅরবিন্দ

দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, জাতি নহে, ধর্ম নহে, আর কিছুই নহে, কেবল দেশ। আর সকল জাতীয়তার উপকরণ গৌণ ও উপকারী, দেশই মুখ্য ও আবশ্যক। অনেক পরস্পর-বিরোধী জাতি এক দেশে নিবাস করে, কখনও সদ্ভাব, একতা, মৈত্রী ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? যখন এক দেশ, এক মা—একদিন একতা হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বলবান অজেয় জাতিই হইবে। ধর্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চির-বিরোধ, মিল নাই, মিলের আশাও নাই, তথাপি ভয় নাই। একদিন স্বদেশমূর্তি-ধারিণী মায়ের প্রবল টানে ছলে বলে, সামে দণ্ডে দানে মিল হইবেই হইবে, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ভ্রাতৃভাবে মাতৃভাবে ডুবিয়া যাইবে। এক দেশে নানা ভাষা, ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি না, হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতি কষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই; এক দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার স্রোত সকলের মনে, প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা সৃষ্ট হইবেই হইবে, হয় বর্তমান একটি ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে, নহে ত নূতন ভাষার সৃষ্টি হইবে, মায়ের মন্দিরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার করিবে। এই সকল বাধায় চিরকাল আটকায় না. মায়ের প্রয়োজন, মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বাসনা বিফল হয় না, তাহা সকল বাধা সকল বিরোধ অতিক্রম করে, বিনষ্ট করে, জয়ী হয়। এক গর্ভে জন্ম হইয়াছে, এক মায়ের কোলে নিবাস করি, এক মায়ের পঞ্চভূতে মিশিয়া যাই, আন্তরিক সহস্র বিবাদ সত্ত্বেও মায়ের ডাকে মিলিত হইব। প্রাকৃতিক নিয়ম এই, সর্বদেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই, দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অব্যর্থ, দেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এক দেশে দুই জাতি চিরকাল থাকিতে

পারে না, মিলিত হইবেই। অপর পক্ষে এক দেশ যদি না থাকে, জাতি, ধর্ম, ভাষা এক হউক, তাহাতে কোনও ফল নাই, একদিন স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইবেই। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ সংযুক্ত করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য করা যায়, এক বৃহৎ জাতি হয় না। সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আবার স্বতন্ত্র জাতি হয়, অনেক বার সেই অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতাই সাম্রাজ্যনাশের কারণ হয়।

কিন্তু এই ফল অবশ্যম্ভাবী হইলেও মানুষের চেষ্টায়, মানুষের বুদ্ধির অভাবে সেই অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক ক্রিয়া সত্বরে বা বিলম্বে ফলবতী হয়। আমাদের দেশে কখনও একতা হয় নাই, কিন্তু চিরকাল একতার দিকে টান ছিল, স্রোত ছিল, আমাদের ইতিহাসে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ এক করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক চেষ্টার কয়েকটি প্রধান অন্তরায় ছিল—প্রথম, প্রাদেশিক বিভিন্নতা; দ্বিতীয়, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ; তৃতীয়, মাতৃদর্শনের অভাব। দেশের বৃহৎ আকার, যাতায়াতের আয়াস ও বিলম্ব, ভাষার বিভিন্নতা প্রাদেশিক অনৈক্যের মুখ্য সহায়। শেষোক্ত অন্তরায় ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সুবিধাদ্বারা আর সকল অন্তরায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সত্ত্বেও আকবর ভারতকে এক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঔরংজেব নিকৃষ্ট বুদ্ধির বশ না হইলে কালের মাহাত্ম্যে, অভ্যাসের বশে, বিদেশীর আক্রমণের ভয়ে, যেমন ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট, তেমনি ভারতের হিন্দু ও মুসলমান চিরকালের জন্য এক হইয়া যাইত। তাঁহার বুদ্ধির দোষে, বর্তমান কূটবুদ্ধি কয়েক জন ইংরেজ রাজনীতিবিদের প্ররোচনায় সেই বিরোধ প্রজ্বলিত হইয়া আর নির্বাপিত হইতে চায় না।

কিন্তু প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের অভাব। আমাদের রাজনীতিবীদ্গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ বা গুরুগোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়া পঞ্চনদমাতা দেখিয়াছিলেন। শিবাজী ও বাজীরাও ভারতমাতা না দেখিয়া হিন্দুর মাতা দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিবিদ্ মহারাষ্ট্রমাতা দেখিয়াছিলেন। আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতা দর্শনলাভ করিয়াছিলাম—সেই দর্শন অখণ্ড-দর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারতমাতার অখণ্ড মূর্তি এখনও প্রকাশ হয় নাই।

যেদিন অখণ্ড-স্বরূপ মাতৃমূর্তি দর্শন করিব, তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মত্ত হইব, সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজসাধ্য হইবে। ভাষার ভেদ আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্ব মাতৃভাষা রক্ষা করিয়াও সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া সেই অন্তরায় বিনষ্ট হইবে। হিন্দু-মুসলমান ভেদের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ভাবন করিতে পারিব। মাতৃ-দর্শনের অভাবে সেই অন্তরায় নাশের বলবতী ইচ্ছা নাই বলিয়া উপায় উদ্ভাবিত হয় না, বিরোধ তীব্র হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অখণ্ড স্বরূপ চাই, যদি হিন্দুর মাতা, হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বলিয়া মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সেই পুরাতন ভ্রমে পতিত হইয়া জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশ হইতে বঞ্চিত হইব।

কাল্পনিক কথোপকথন

(Imaginary Dialogue)

লেখার বিভিন্ন ভঙ্গী।

আমাদের চিন্তা, ভাব, বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত আমরা নানা ভাবে প্রকাশ করি। প্রাচীনকাল হইতে পদ্য বা কবিতায় মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী কালে গদ্যের প্রচলন হইয়াছে। আমরা কয়েকটি গদ্যভঙ্গীতে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি।—(১) প্রবন্ধ আকারে, (কালীপ্রসন্ন ঘোষ বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধে), (২) উচ্ছ্বাসময় রচনায় (যেমন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'), (৩) সরস সাহিত্য বা রম্যরচনারূপে (বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর, ইত্যাদি) এবং সর্বশেষ কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রচলিত (৪) কথোপকথনের ভঙ্গীতে।

কাল্পনিক কথোপকথনের ভঙ্গী সর্বাপেক্ষা প্রচলিত ও প্রয়োজনীয়

কাল্পনিক কথোপকথনের ভঙ্গী বর্তমানে সাহিত্য রচনায় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বাহন। যে সকল স্থায়ী রসসাহিত্য মানুষকে আনন্দ দান করে, তাহাদের প্রধান অবলম্বন কাল্পনিক কথোপকথন। কাল্পনিক কথোপকথন ব্যতীত নাটক ও গল্প-উপন্যাস এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে না। ইহা 'নাট্য-সাহিত্যের সর্বস্ব, উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান সম্বল, এবং কাহিনী আখ্যায়িকা ও গল্পের প্রধান উপজীব্য।'

আয়ত্ত করার উপায়

প্রবন্ধ লেখার চেয়ে ইহা লেখা অনেক কঠিন। ইহাতে চাই কল্পনা ও বিচার-শক্তির সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ ও রুচিজ্ঞানের সংযোগ। নতুবা কাল্পনিক কথোপকথন সাহায্যে সাহিত্য রচনা সম্ভবপর নয়। নিয়ত অধ্যয়ন, লেখার অভ্যাস ও বিশিষ্ট কথাবার্তা শ্রবণ ও অংশগ্রহণের সাহায্যে ইহা ক্রমশঃ আয়ত্ত করা যায়।

ব্যবহারের বৈচিত্র্য

সাহিত্য রচনার এই বিশেষ ভঙ্গীর সাহায্যে শুধু রসরচনা নয়, অনেক তত্ত্বসাহিত্যের জটিল বিষয়ও সহজ ও সরল ভাবে বুঝান যায়। অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়ও কথোপকথনের ভাষায় স্পষ্টীকৃত করা যায়। দুই মতবাদের তর্কাতর্কির জন্যই যে ইহার প্রয়োজন শুধু তাহা নয়, গুরুতর জটিল বিষয় বুঝিবার পক্ষেও ইহা উৎকৃষ্ট রীতি।

কতিপয় বিশিষ্ট রচনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অনুশীলন', 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' প্রভৃতিতে অনেক তত্ত্বকথা এই রীতিতে লেখা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' নামক গ্রন্থে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—পঞ্চভূতের পাঁচ জন কাল্পনিক নরনারী ও কবি স্বয়ং কথোপকথনের মাধ্যমে অনেক তত্ত্বের আলোচনা

করিয়াছেন। অনেক ধর্ম্ম্য ও দার্শনিক আলোচনাও এই রীতির মাধ্যমে রচিত হইয়াছে। এই ধারার বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডরের (Walter Savage Landor) 'কাল্পনিক কথোপকথন' (Imaginary Conversation) নামক গ্রন্থে কতকগুলি আদর্শ তত্ত্বালোচনা এই রীতিতে লিখিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 'মৃতের কথোপকথন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বিভিন্ন মনীষীদের কথাবার্তায় কতকগুলি জাতীয় ও সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। পরলোকে যাইয়া শিবাজী ও জয়সিংহ, ম্যাট্‌সিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডী, আকবর ও আওরঙ্গজেব, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নিজেদের আদর্শ ও কৃত কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 'শিবাজী, জয়সিংহ' শ্রীঅরবিন্দের এই রীতিতে লেখা মূল ইংরেজী রচনার শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের বঙ্গানুবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মনুষ্যত্ব কি,' শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'সত্যানন্দ, নানাসাহেব', রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' হইতে কিছু অংশ, দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক হইতে 'স্নেহের জয়'—এই রচনা কয়টি নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল।

বর্তমানে কথোপকথনের বাহন চলিত ভাষা

বর্তমানে চলিত ভাষাই কথোপকথন লেখার শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র বাহন। পূর্বে সাধুভাষাতেও নাটক উপন্যাসে বা রসরচনায় কথোপকথন লেখা হইত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এমন কি রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে সাধুভাষাতেই কথোপকথন লিখিয়াছেন। চলিত ভাষায় কথোপকথন লেখায় সফলতা অর্জনের জন্য চলিত ভাষার বিশেষত্বগুলো ভালভাবে আয়ত্ত করা আবশ্যক। শুধুমাত্র শব্দচয়নে নয়, (সাধু ও চলিত ভাষা দ্রষ্টব্য) বাগ্‌বিধি ও রচনাভঙ্গীর দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

কয়েকটি আদর্শ

মাতৃ-ভাষা

স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন কবি, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর ও রাজনারায়ণ বসু প্রধান শিক্ষক। ইঁহারা সমপাঠী ছিলেন। মাতৃ-ভাষা সম্বন্ধে ইঁহাদের বিতর্ক এখানে লিখিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহা কাল্পনিক রচনামাত্র। কর্মজীবনের প্রারম্ভেই এই কল্পালোচনার সময় ধরিয়া লইতে হইবে।

মধুসূদন। দেখ ভূদেব, তোমাদের বাংলা ভাষাটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। ওতে ভাল লেখা চলে না। এমন কটমট ভাষা আর দেখিনি। নর্মাল স্কুলে 'প্রথিবী' বানান করেছিলাম, সে কথা তোমার মনে আছে ?

ভূদেব। মধু, তোমার কথা শুনলে দুঃখ হয়। বাংলা ভাষার মত এমন সুন্দর শক্তিশালী ভাষা আর কটি আছে, বল দেখি ? কিছুকাল পরেই দেখতে পাবে বাংলা ভাষার সাহায্যে প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে পড়ানো হতেছে।

মধু। বল কি ? তবেই দেখছি আমাদের মত ছেলেদের পড়াশুনা ছাড়তে হবে। আচ্ছা জিজ্ঞেস করি, বাংলা ভাষাটা না হয় তোমরা বাংলাতেই শেখ। কিন্তু তাই বলে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল এগুলিও বাংলায় পড়ানো চলতে পারে ? অসম্ভব।

রাজনারায়ণ। (প্রবেশ করে) কি হে মধু, অসম্ভব কি বল্‌চ। তোমাদের তর্কটা কি নিয়ে?

ভূদেব। মধু বলছে, বাংলায় ভূগোল, ইতিহাস, গণিত—এসকল পড়ানো সম্ভব নয়, শেখা আরও কঠিন।

রাজ। এই কথা? দেখ মধু, আমরা যা কিছু শিখেছি তা ইংরেজীতেই শিখেছি। কাজেই আমরা এ কথাটা সহজে মাথায় আন্‌তে পারি না। কিন্তু সত্যি জেনো, শুধু স্কুলের বিদ্যাগুলো নয়, কলেজের বিজ্ঞানগুলো পর্যন্ত বাংলায় পড়া-শুনা চলবে। সেদিন আস্‌চে বলে।

মধু। রাজনারায়ণ, তুমি স্বদেশী পাণ্ডা। তুমি একথা না বললে কে বলবে?

ভূদেব। সে তো সত্যি কথা। নিজের ভাষাকে আমরা সম্মান না দিলে কে দিবে? আচ্ছা, বাংলা ভাষায় এই সকল বিদ্যা শেখালে কত কম পরিশ্রমে এবং কম সময়ে লোকে বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারবে, তাহা তো স্বীকার কর?

মধু। নিশ্চয়ই।

ভূদেব। দেখ, এরূপে বাংলা ভাষার কত প্রচার হবে। সাধারণ লোকেও সহজে বড় বড় কথা বুঝতে পারবে। ঘরে ঘরে বাংলা ভাষার চর্চা হবে। সাহিত্যের কত উন্নতি হবে।

রাজ। শুধু কি তাই? আমরা যখন এই ভাষাকে সকলে মিলে তুলে ধরব, আমাদের জাতীয় গৌরবও কত বাড়্‌বে।

ভূদেব। মাতৃ-ভাষা হিসাবে এখনও বাংলা পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে আছে। জান তো ভারতবর্ষে ইহা সবচেয়ে বেশি লোকের মাতৃ-ভাষা।

মধু। বলতে লজ্জা হয়, ভাই, এতদিন আমি আমার মাতৃ-ভাষাকে বড়ই অবজ্ঞা করে এসেছি। ইংরেজীতে কবিতা লিখেছি। মাদ্রাজে থাকতে একদিন এক সাহেব আমায় মাতৃ-ভাষায় লিখতে বলেছিলেন। এখন বুঝতে পারছি এই ভাষা কত শক্তিশালী। আজ তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, মধুসূদন বাংলাভাষায় এমন কাব্য রচনা করবে যা যুগ-যুগ ধরে লোকের মনে আনন্দ দিবে।

রাজ। এই ত চাই। তোমাদের মত প্রতিভাশালী কবি যদি আমার মাতৃ-ভাষার পূজারী হয়, তা হ'লে সুদিনের আর দেরি নেই।

ভূদেব। শুধু কি কাব্য? জগতের সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বাংলা ভাষার প্রচার-ক্ষেত্র করতে হবে। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করেছ। বহির্বঙ্গেও অনেক জায়গায় বাংলাভাষাই প্রচলিত। স্কুল পরিদর্শনের সময় এটা দেখেছি। আমাদের কর্তব্য ঐ সকল অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রসার করা। বাংলার আশে পাশে অনেক পার্বত্য জাতি আছে। তাদের মধ্যে এ ভাষা প্রচার করলে তাদেরও উন্নতি হয়।

রাজ। তা হ'লে, আজ থেকে আমাদের এই সঙ্কল্প রইল, আমরা মাতৃ-ভাষার জন্য আজীবন খেটে যাব।

মনুষ্যত্ব কি ?

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(এটি সাধু ভাষায় লেখা)

শিষ্য। কা'ল আপনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয়, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম। এ একটা কথার মারপেচ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেননা, মানুষ জন্মিলেই মানুষ, মরিলেই আর মানুষ নয়—ভস্মরাশি, ধূলারাশি মাত্র ; অতএব আমি বলিব যে জীবন থাকিলেই মানুষ মানুষ, না হ'লে মানুষ নয়। বোধ হয়, তাহা আপনার উদ্দেশ্য নহে।

গুরু। দুগ্ধপোষ্য শিশুরও জীবন আছে, সে কি মানুষ ?

শিষ্য। নয় কেন ? কেবল বয়স কম। ছোট মানুষ ?

গুরু। মানুষে যা পারে, সে সব পারে ?

শিষ্য। কেন, সব মানুষই কি তা পারে ? ঐ ভারীর কাঁধে যে জলের ভার, তাহা মানুষ বহিতেছে। উস্তলিজ বা লিউথেলের রণজয় মনুষ্যে করিয়াছিল। লিয়র বা কুমারসম্ভব মনুষ্যে প্রণীত করিয়াছে। আপনি মনুষ্য—আপনি কি এ সকল পারেন ? অথবা অন্য কোন মনুষ্যের নাম করিতে পারেন যে এই সকল কার্যই পারে ?

গুরু। আমি পারি না। আমি এমন কোন মনুষ্যের নাম করিতে পারিতেছি না যে পারে। তবে একথা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি যে, কোন মানুষ কখন জন্মিবে না, যে একা এ সকল কাজ পারিবে না, অথবা এমন কোন মনুষ্য কখন জন্মে নাই যে মনুষ্যের সাধ্য সমস্ত কাজ একা পারিত না।

শিষ্য। পারিত যদি—ত পারে নাই কেন ?

গুরু। আপনার ক্ষমতার অনুশীলনের অভাবে।

শিষ্য। ইহাতেও কিছু বুঝিলাম না, কি থাকিলে মানুষ মানুষ হয়। আপনার শক্তির অনুশীলনে ? বর্বর, যাহার কোন শক্তিই অনুশীলিত হয় নাই, তাহাকে কি মানুষ বলিবেন না ?

গুরু। এমন কোন বর্বর পাইবে না, যাহার কোন শক্তি অনুশীলিত হয় নাই। প্রস্তর-যুগের মানুষদিগের কতকগুলি শক্তি অনুশীলিত হইয়াছিল ; নহিলে তাহারা পাথরে অস্ত্র গড়িতে পারিত না। তবে কথাটা এই যে তাহাদের মনুষ্য বলিব কি না। সে কথার উত্তর দিবার আগে বৃক্ষত্ব কি, বুঝাই। মনুষ্যত্ব কি বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব কি বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বট গাছ দেখিতেছ—দুইটি কি এক জাতীয় ?

শিষ্য। হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ্।

গুরু। দুইটিকেই বৃক্ষ বলিবে ?

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব—এটি তৃণমাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন ?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল—এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এসব আছে, ঘাসের এসব নাই।

গুরু। ঘাসের সব আছে—তবে ক্ষুদ্র অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না?

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ?

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মানুষের সকল বৃত্তিই অনুশীলিত হইয়া পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ব আছে, একজন হটেণ্টট্ বা চিপেবারও সেইরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুষ্যধর্ম, হেণ্টেটট্ বা চিপেবারে সে মনুষ্যত্ব নাই।

শিষ্য। বংশ বা বীজ কি তাহার একটা প্রধান কারণ নহে?

গুরু। সে কথা এখন থাক। ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ—উহাকে বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। বোধ হয়, বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব অছে; কিন্তু কৈ? উহার ফুল ফল হয় না, উহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি নাই, উহাকে বৃক্ষ বলিব না।

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়; হইয়া ফল হয়, তাহা চা'লের মত। চা'লের মত তাহাতে ভাতও হয়।

শিষ্য। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব।

গুরু। অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। দেখ, স্ফূর্তি-গুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ অথচ বাঁশের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্য বলিতেছি।

শিষ্য। এরূপ পরিণতি কি ধর্মের আয়ত্ত?

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষের পরিণতি কতকগুলি চেষ্টার ফল, লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন যে, "বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না, হয় সব বৃক্ষ, নয় তৃণ নষ্ট করিব" তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে?

শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল-গরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁটাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইবে।

গুরু। মূর্খ! তৃণজাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে? জানন৷ যে, ধানও তৃণজাতীয়? যে ভাঁটই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া আইস, ধানের পাট হইবার পূর্বে ধানও ঐরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ঐরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও

আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য উদ্ভিদ্ ছিল। কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই, এই জন্য ইংরেজীতে উভয়ের নাম Culture. এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, "The substance of religion is culture." মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম।

শিষ্য। তাহা হউক। স্থূল কথা ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে ?

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম মহামহীরুহ। মাটি খোঁড়, হয় ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড বৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ, কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাই চাই। সরস মাটি চাই, জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণ জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতিবিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই, ঘেরা চাই ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর সুবৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মানুষেরও এইরূপ। যে শিশুর কথা বলিলে ইহা মানুষের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্বগুণযুক্ত সর্বসুখসম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন)।

শিবাজী, জয়সিংহ

জয়সিংহ। দুজনার আমাদের কারোই জয় হয় নি। দেশের উপরে তৃতীয় একটা শক্তি এসে পড়ে তোমার কর্ম্মের ফল আহরণ করেছে—আর আমার কর্ম্ম, তা ত ভেঙ্গে চুরে গেছে ; যে আদর্শ নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তা এখন ধূলির সাথে মিশে গেছে।

শিবাজী। ফলের জন্য আমি কর্ম্ম করি নি। ব্যর্থতায় তাই আমি স্তম্ভিত নই, হতাশও নই।

জয়সিংহ। আমিও ত নিজের লাভের জন্যে কর্ম্ম করি নি। আমি করেছিলাম রাজপুতের আদর্শকে তুলে ধরতে। ন্যায়যুদ্ধে অটুট সাহস, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে মর্যাদাদান, রাজা বলে আমি যাঁকে স্বীকার করে নিয়েছি তাঁর উপর নিষ্ঠা, এই ত ভারতের খাঁটি সনাতন প্রথা। হিন্দু জাতির একত্ব ও প্রভুত্বের যে আদর্শ তার চেয়েও একে আমি বড় মনে করি। তাই তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারি নি ; বরং আমার পথ অনুসরণ করতে তোমায় আমি ডেকেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম তোমার সাথে যে সত্য করা হয়েছিল, আমারও সাথে যে সত্য করা হয়েছিল তা রক্ষা করা হোল না, তখন তোমার পলায়নে সাহায্য করে আমি আমার আত্মসম্মানকে বাঁচাতে চেষ্টা করলাম।

শিবাজী। ভগবান তাঁর অভয় হস্ত আমার উপর প্রসারিত করে দিয়েছিলেন. তাই একটি নারীর হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠলো ; সে এসে আমায় ভালবাসা দিল, সাহায্য দিল। প্রথার পরিবর্তন হয়। রাজপুতের আদর্শ ভবিষ্যতে কাজে আসবে,

কিন্তু এর কাঠামটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে, এর ভিতর যা কেবল সাময়িক সেটা যাতে দূর হয়ে যায়। আমি যাঁকে রাজা বলে স্বীকার করে নিয়েছি তাঁর উপর নিষ্ঠা, ভাল কথা; কিন্তু আরও ভাল আমার দেশ যাঁকে রাজা বলে স্বীকার করে নিয়েছে তাঁর উপর নিষ্ঠা। রাজা দেবতা, কিন্তু ভগবানের যে শক্তি তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে তারই বলে। রাজা এই শক্তি ধারণ করেন, যখন প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়। দেশের অন্তরে যে ভগবান, তিনিই ইষ্ট; রাজা তাঁর সেবক মাত্র। বিঠোবা, মারাঠার বিরাট প্রাণরূপিণী ভবানী, এঁদের শক্তিতে আমি বিজয়ী হয়েছি।

জয়সিংহ। তোমার রাষ্ট্রের আদর্শ খুব মহৎ, কিন্তু উপায় তোমার যে ধরণের তা আমাদের সকল নীতি ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদকারী। চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা, লুঠ, খুন—এ সব ত তোমার কাজের বাইরে ছিল না।

শিবাজী। আমি ভগবানের জন্য, মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের জন্য, রামদাস যে ধর্ম দিয়েছিলেন সেই হিন্দুরাষ্ট্রের ধর্ম্মের জন্য অসি ধরেছিলাম, শাসনদণ্ড ধরেছিলাম—নিজের জন্য নয়। আমি আমার মস্তক ভবানীর কাছে উৎসর্গ করে দিই। মা তা আমাকেই রাখতে বললেন, তা দিয়ে জাতির কল্যাণের জন্যে মন্ত্রণা করতে কৌশল উদ্ভাবন করতে। আমার রাজ্য আমি রামদাসকে দিয়ে দিই, তিনি ভগবানের, মারাঠার দানরূপে তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এই দুই আদর্শই আমি পালন করেছি। আমি হত্যা করেছি ভগবানের আজ্ঞায়। আমি লুঠ করেছি যখন ঐটিকেই উপায় বলে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতক আমি কখনও ছিলাম না। কিন্তু লোকসংখ্যা ও উপকরণের অভাব আমায় মিটিয়ে নিতে হয়েছে—ছলের ও কৌশলের সহায়ে; শারীরিক বলকে আমি হটিয়েছি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মস্তিষ্কের জোর দিয়ে। যুদ্ধে ও রাষ্ট্রনীতিতে ছলের স্থান জগৎ স্বীকার করে নিয়েছে। রাজপুতের সম্মুখযুদ্ধ ঔদার্য্যের চিহ্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু পাশ্চাত্যের কি প্রাচ্যের কোন জাতিই তা মেনে চলে নি।

জয়সিংহ। আমি ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে জানতাম। তাই ভগবানের আদেশ পর্যন্ত তা হ'তে আমাকে বিচ্যুত করতে পারত না।

শিবাজী। আমি আমার সবই ভগবানকে দিয়ে দিয়েছিলাম। ধর্মকে পর্যন্ত রাখিনি। তাঁর ইচ্ছাই আমার ধর্ম। তিনি আমার সেনানী, আমি তাঁর অধীনে সৈনিক মাত্র। আমার নিষ্ঠা এইখানে। ঔরঙ্গজেবের উপর নয়, কোন নীতি-শাস্ত্রের উপর নয়, আমার নিষ্ঠা যে ভগবান আমাকে এ মর্ত্যলোক পাঠিয়েছেন তাঁর উপরে।

জয়সিংহ। ভগবান আমাদের সবাইকেই পাঠিয়েছেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য। আর সে উদ্দেশ্যের মত করেই তিনি প্রত্যেকের আদর্শকে স্বভাবকে গড়েন। মোগলের পতনে আমি দুঃখ করি না। নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখবার যোগ্যতা তার যদি থাকত, তবে সে বস্তু কখনই সে হারাত না। কিন্তু অযোগ্য হয়ে পড়লেও, আমার প্রতিশ্রুতি আমার নিষ্ঠা আমার সেবাকে অটুট রেখেছি। আমার সম্রাটের

অনুজ্ঞার সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক তোলা আমার কাজ নয়। ভগবান তাঁকে মনোনীত করেছেন, তিনিই তাঁর বিচার করতে পারেন। আমার কর্তব্য তা নয়।

শিবাজী। যে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ায়, অন্যায় প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে তার আয়ু বাড়িয়ে দিতে চায় না তাকেও ভগবানই মনোনীত করেন। ভগবান সব সময়েই শক্তিশালীর পক্ষ নেন না, কখনও তিনি পরিত্রাতা হয়ে থাকেন।

জয়সিংহ। তবে তাঁর কথামত তিনি স্বয়ং নেমে আসুন। বিদ্রোহের ন্যায্যতা তবেই প্রতিপন্ন হবে।

শিবাজী। কোথা থেকে তিনি নেমে আসবেন ? তিনি যে এইখানেই রয়েছেন, আমাদের অন্তরের মধ্যে। আমি তাঁকে এই এখানে দেখছি, তাই ত আমার ব্রত সাধন করবার শক্তি আমি পেয়েছিলাম।

জয়সিংহ। কিন্তু তোমার কাজে তাঁর পাঞ্জা, তাঁর হুকুমনামা কই ?

শিবাজী। একটা সাম্রাজ্যকে আমি টলিয়ে দিয়েছি—আর তা গড়ে ওঠেনি। একটা জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি, এখনও তা ধ্বংস হয় নি।

—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দের মূল রচনার অনুবাদ (মৃতের কথোপকথন)

[মুঘল-মারাঠা যুদ্ধকালে মুঘল সেনাপতি রাজপুতরাজ জয়সিংহের অনুরোধে মারাঠা-নায়ক শিবাজী আওরংজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী যান। সেখানে তাঁহাকে সতর্ক প্রহরাধীন রাখা হয়। শিবাজী কৌশলে মুক্তি লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান এবং স্বাধীন মারাঠা রাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই কথোপকথনে জয়সিংহ ও শিবাজীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কৃতকর্মের সাফল্য ও অসাফল্য বর্ণিত হইয়াছে।]

সত্যানন্দ, নানাসাহেব

সত্যানন্দ। নানা ! মহাপ্রাণ তুমি, অভাগা দেশের জন্য তোমার অন্তর কেঁদে উঠেছিল ; জীবন তুচ্ছ করে, সুখস্বস্তি জলাঞ্জলি দিয়ে, দুঃখ দৈন্য বিপদ আপদ তুমি নিত্যকার সঙ্গী করে নিয়েছিলে, এতটুকু দৃকপাত তুমি কর নি—তোমার নিষ্ঠা, তোমার উৎসাহ, তোমার অক্লান্ত পরিশ্রম আদর্শস্থানীয়। কিন্তু তবুও তোমাকে বলতে হচ্ছে, যে পথটি তুমি ধরেছিলে, যে যন্ত্র হাতে নিয়েছিলে, তাতে ছিল অনেকখানি ভুল, অনেকখানি ত্রুটি, অনেকখানি অভাব—কেবল সেনাবল দিয়ে কেবল বিপ্লব ঘটিয়ে দেশ উদ্ধার হয় না।

নানাসাহেব। দণ্ডবৎ হই, মহারাজ ! আমার পরাজয় কেন হ'ল তা আমি জানি, সে কথা বোঝা খুব কঠিন হয়। কিন্তু আপনার মনোভাব আমি কোনদিন ধরতে পারি নি। বিপ্লব আপনিও ঘটিয়েছিলেন, সেনাবল আপনিও প্রয়োগ করেছিলেন—তবে আপনার সৈন্য ছিল সন্ন্যাসীর দল, যুদ্ধবিগ্রহ যাদের পক্ষে পরধর্ম্ম, আর আমার সৈন্য ছিল সত্য সত্যই সৈন্য। আমার মত আপনারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি।

আপনি আগে হতেই, আরব্ধ-কর্ম্ম শেষ না হতেই সরে দাঁড়ালেন, পরিণামে ব্যর্থতার সম্ভাবনা দেখেই কি বলছেন বাহুবলের প্রয়োজন নাই, বিপ্লবের প্রয়োজন নাই ?

সত্যানন্দ। সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলছি, বাহুবলের বিপ্লবের আগে চাই আর একটা জিনিস—এমন একটা বৃহত্তর গভীরতর জিনিস, যার উপরে বাহুবল বিপ্লব নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে; এমন কি, হয়ত বা যা অধিকার করলে বাহুবল বা বিপ্লবের প্রয়োজনও না হতে পারে।

নানাসাহেব। প্রহেলিকা! আমি বুঝেছি আমার সেনাবল হটে যে গেল তার প্রথম কারণ, বিপক্ষ ছিল অত্যন্ত প্রবল—তারা রাজা, তারা কর্তা, তারা যুদ্ধবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষিত, লোকলস্কর ও হাতিয়ার যথেচ্ছ সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে কিছুই কষ্টকর নয়; এতেও হয়ত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আসল কারণ, দেশের কাছ থেকে যে সাহায্য আমি আশা করেছিলাম তা পেলাম না শুধু তাই নয়; দেশের লোক বেশীর ভাগই ভয়ে বা লোভে বিদেশীর পক্ষ অবলম্বন করল। দেশের লোকই হ'ল বিশ্বাসঘাতক, অথচ আমার নাম রয়ে গেল 'বিদ্রোহী'। হায়! অভাগা দেশ।

সত্যানন্দ। এ কথার অর্থ কি, বুঝেছ, নানা! অর্থ এই, দেশকে আগে মুক্তিকামী সত্যসত্যই হওয়া দরকার। দেশ যদি না চায়, তবে তোমার বা আমার জবরদস্তি করে কিছু করবার—তা হাজার মঙ্গলেরই হোক না কেন—কি অধিকার, কি সামর্থ্য আছে? মুষ্টিমেয় আমরা কজন জোর করে যদি দেশের ভার নিজেদের স্কন্ধে বহন করতে চাই, তবে আমরাই তার তলায় দলিত পিষ্ট হয়ে যাব—দেশ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকবে। তোমারও সেই ভুল হয়েছিল, আমারও একই ভুল হয়েছিল। আবহাওয়া, সর্ব্বসাধারণ তৈরী না হলে ক্ষুদ্র একটা দলের সাধ্য কি এত বড় বিরাট জগদ্দল পাথরকে টলাতে পারি? সারা দেশকে আমরা ত জাগাই নি, সমস্ত জাতটাকে ত নবজীবনে সঞ্জীবিত প্রবুদ্ধ করে তুলি নি।

নানাসাহেব। আপনি ত সে ভার বিদেশীরই উপর অর্পণ করে নিশ্চিত হয়েছেন। ...কিন্তু এ কি অসাধ্যসাধনা নয়? সমস্ত দেশকে কে কবে জাগাতে পেরেছে? দেশ যে মৃত তার কারণই ত পরাধীনতা। দেশ আগে স্বাধীন হোক, দেখবেন দেশ আপনা থেকেই জেগে ওঠে কি না। পরাধীনতায় অভ্যস্ত যে তার স্বভাবই এই, স্বাধীনতা সে চায় না, স্বাধীনতা তার উপর জোর করেই চাপিয়ে দিতে হয়—আর সে কাজ করে দুচার জন লোকই। স্বাধীনতার মূল্য যদি দেশ বুঝত, তবে সে কখন পরাধীন হবে কেন? দেশের জীবন হচ্ছে স্বাধীনতার ফল, স্বাধীনতার কারণ তা নয়।

সত্যানন্দ। না ধুন্দুপন্থ, স্বাধীনতা জীবনের সৃষ্টি করে না, জীবনই জীবন সৃষ্টি করতে পারে। স্বাধীনতা জীবনের বিকাশের সমৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল অবস্থা মাত্র। স্বাধীনতার পরে দেশ তার সামর্থ্যের তার শিক্ষাদীক্ষার চরম উৎকর্ষ দেখাতে পারে, কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জন করতে হলেও দেশের মধ্যে চাই একটা জীবনীশক্তির প্রতাপ, জাতির মধ্যে একটা জ্ঞানের প্রসার। স্বাধীনতা পেলেই, স্বাধীনতা রক্ষা করবারও শক্তি হয় না। সজ্ঞান সুসংহত সামর্থ্য দিয়ে যদি দেশ স্বাধীনতা অধিকার

করে, তবেই দেশ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ ফলভোগ করতে পারবে। তুমি অজ্ঞান দিয়ে, অশক্তি দিয়ে, স্বাধীনতা অর্জন করতে চাও?

নানাসাহেব। আমি স্বাধীনতা-পিপাসী, তত্ত্বকথা আমি বুঝি না। আমার পথ ছিল সহজ, সরল। অজ্ঞান যারা, অশক্ত যারা তাদের অজ্ঞান অশক্তিকেও আমি কার্যোপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলাম—তাদের স্বার্থ, তাদের কুসংস্কার, তাদের ভয়ই ছিল তাদের অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত করে তুলবার পক্ষে আমার প্রকৃষ্ট উপায়। আপনি বলছেন সারা দেশকে আগে সজীব করে তোল, জীবন দিয়ে জীবনকে জাগাও—আমিও তা যথাসাধ্য করেছি। মুষ্টিমেয়ের প্রাণই ত দশের মধ্যে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রাণবন্ত করে তোলে। আমার ঝান্সীর, তান্তিয়ার ঝড়ের প্রাণ কি যথেষ্ট ছিল না?

সত্যানন্দ। ফলে পরিচয় পেয়েছ। কোন জীবন তোমাদের ছিল, কোন জীবন তোমরা বাস্তবিক সৃষ্টি করতে পেরেছিলে? তোমরা জাগিয়ে তুলেছিলে ক্ষুদ্রতার স্বার্থপরতার, অন্ধক্ষোভের, প্রতিহিংসার জীবন, বিশৃঙ্খলতা উচ্ছৃঙ্খলতা একটা বিপুল উন্মাদকতা, একটা বিরাট অরাজকতা—

নানাসাহেব। অরাজকতাই যে আমার উদ্দেশ্য ছিল। একটা না একটা বিশাল ওলটপালটের ভিতর দিয়ে না গিয়ে কোন পরাধীন জাতি স্বাধীন হয়েছে? পরাধীনতায় যে স্বস্তি, যে সুশৃঙ্খলা তাকে আগে ভেঙ্গেচুরে না ফেলে স্বাধীনতার স্বস্তি ও শৃঙ্খলা আসবে কি করে? অরাজকতা বিশৃঙ্খলতাকে আপনি এত ভয় করছেন কেন? জগতের ব্যবস্থার মধ্যে, মানুষের উন্নতির পথে অরাজকতার বিশৃঙ্খলতার কি ঠাঁই নাই? ফরাসী বিপ্লবে কি হয়েছিল? আধুনিক রুশে, আয়র্লণ্ডে কি দেখলাম?

সত্যানন্দ। তুমি বিপ্লবের বাহিরের দিকটাই কেবল দেখছ। ফলটাই তোমার সমস্ত দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে, কারণের দিকে তুমি নজর দাও নি। ফরাসী দেশে হোক, রুশে হোক, আয়র্লণ্ডে হোক—স্বাধীনতার যুদ্ধ কেবল অরাজকতা ঘাঁটিয়ে হয় নি, এক দিনে বা মুষ্টিমেয়ের দ্বারা তা সাধিত হয় নি। বহু লোকের বহু বৎসরের সুশৃঙ্খল সাধনায় প্রথমে অন্তরের জগৎ তৈরী হয়ে এসেছে—অন্তরে প্রথমে দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল কেটে ফেলেছে, শুধু তাই নয় স্বাধীনতার একটা মূল কাঠাম গড়ে ধরেছে, তার পরে সেই ভিতরের সত্যের চাপে বাহিরের বাঁধন টুটতে, ছিঁড়িতে সুরু করেছে। অরাজকতা আমি ভয় করি না কিন্তু দেখতে হবে, তার ভিতরে রয়েছে কোন প্রেরণা, কোথায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ—কোন জ্ঞান, কোন শক্তি তার সহায়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে।

নানাসাহেব। আপনার বিপ্লব-চেষ্টার মধ্যে ছিল কোন্ জ্ঞান কোন্ শক্তি? তাও বিফল হয়ে গেল কেন? সাধু-সন্ন্যাসীর জ্ঞান নিয়ে শক্তি নিয়ে রাষ্ট্র-বিপ্লবের সাধনা কি বিড়ম্বনা নয়?

সত্যানন্দ। নয় যে তা আমার সন্তানেরা কাজেই পরিচয় দিয়েছে। আমার সন্তান-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ছিল দেশে নবজীবনের একটা কেন্দ্র হয়ে ওঠা, নূতন

শিক্ষা নূতন দীক্ষা নূতন মস্তিষ্ক নূতন প্রাণ যাতে করে ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে তারই একটা বীজক্ষেত্র রচনা করা। আমি কেবল পরাধীনতার বাঁধনটুকুই কাটতে চাই নি, আমি কেবল ধ্বংসেরই বল চাই নি—আমি চেয়েছিলাম এমন একটা সৃষ্টির বল যা একদিকে যেমন অক্লেশে ভেঙ্গে ফেলতে থাকবে, আর একদিকে তেমনি অব্যর্থভাবে গড়ে তুলতে থাকবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তা হয়ে উঠলো না কেন? প্রথমতঃ ধ্বংস-কাজের উপরই আমারও জোর বেশী পড়ে গিয়েছিল, দেশের অবস্থা দেখে আমারও ত্বর সয় নি, অসময়ে আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম, দেশ প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, এই আশু কাজের তাড়নায় আমার সম্প্রদায় একটা সম্প্রদায়মাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল : একটা শক্তিমান দল খাড়া হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল না, দেশের মন প্রাণের মধ্যে আপনাকে চালিয়ে দিয়ে তাকে তৈরী করে তুলবার চেষ্টা সে করে নি।

নানাসাহেব। কিন্তু ওভাবে দেশকে তৈরী করে তোলা ত সময়সাপেক্ষ—তৈরী হতে হতে ইতিমধ্যে যদি সে লোপ পেয়ে বসে? আর দেখছি ত দিন দিনই দেশের শৃঙ্খল দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হয়ে চলেছে। প্রত্যেক মুহূর্তই যে নূতন করে একটা বেড়ি এঁটে দিচ্ছে। আপনার সময়ে যতখানি সুবিধা ছিল, প্রায় শত বৎসর পরে এসে আমি ততখানি সুবিধা পাই নি ; আমার পরে আর এক শত বৎসর হতে চলেছে, দেখুন দেশের কি দারুণ অবস্থা, অভিনব শৃঙ্খলে দেশের প্রতি অঙ্গ ঢেকে গিয়েছে, এতটুকু ফাঁক কোথাও নাই—এখন কি মনে হয় ভারতের স্বাধীনতার কোন সম্ভাবনাই আছে?

সত্যানন্দ। একান্ত স্থূল দৃষ্টিতে তাই হয়ত বোধ হয়। কিন্তু দেশের অবস্থা কি এতই খারাপ? আমি ত দেখছি ভারতের অন্তর-জগৎ যেমন তৈরী হয়েছে, এমন আর কোন দিন হয় নি। বাহিরের অবস্থা যেমন কঠিন হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই অনুপাতে ভারতের ভিতরের শক্তিও তেমনি জাগ্রত, পুষ্ট হয়ে চলেছে। স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য. অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য, স্বাধীনতাকে মহত্ত্বের গরিমার পদে তুলে ধরবার জন্য যে শক্তি, যে প্রতিভা ভারতের জীবনধারায় ফুটে উঠেছে, তা দেখে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নাই। তাছাড়া, স্বাধীনতার অধিকারী হওয়ার চেষ্টায় ভারত যদি লোপই পায়, তার অর্থ ভারতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, লোপ পাওয়ার উপযুক্তই সে।

নানাসাহেব। কিন্তু ভারতের কপালেই শুধু এত দুর্ভাগ্য কেন? পৃথিবীর সব দেশই দেখুন কেমন স্বাধীন হয়েছে বা স্বাধীন হয়ে গেল বলে ; আমাদের পরে যারা পরাধীন হয়েছিল, আমাদের আগেই তারা স্বাধীন হয়ে পড়ল। ভারত কেবল পিছনে পড়ে রইল?

সত্যানন্দ। তার কারণ, ভারতের ভবিষ্যতের বিপুলত্ব, মহত্ত্ব। ভারতে যে পরীক্ষা চলেছে তা বিশ্বের মানবজাতির সমস্যা নিয়ে। ভারতের গর্ভে যে সন্তান আজ বেড়ে উঠছে, তা হচ্ছে ভবিষ্যতের 'মহামানব', তার সকল অঙ্গ পরিণত হতে

সময়ের প্রয়োজন, ভূমিষ্ঠ হ'তে তাই তার এত বিলম্ব। এ শুধু স্বাধীনতার কথা নয়, স্বাধীনতার চেয়েও একটা বড় জিনিস নিয়ে এখানে প্রশ্ন—সে প্রশ্নের মীমাংসা হলেই স্বাধীনতাও অনিবার্য। ভারতের অন্তরপুরুষ বাধ্য হয়ে পরাধীন হয় নি, পরাধীনতাকে সে বরণ করে নিয়েছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের সাধনার জন্য। সে সাধনাও শেষ হল, কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে।

নানাসাহেব। আশীর্বাদ করুন ঠাকুর, কাল যেন পূর্ণ হয়েই থাকে। স্বাধীনতার চেয়ে বড় জিনিস কি, তা আমি জানি না, তার অধিকারী হয়ত আমি নই। দেশ মুক্ত ও স্বাধীন হলেই নানার তৃষিত প্রাণ তৃপ্ত হবে।

—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত (মৃতের কথোপকথন)

[(স্বামী) সত্যানন্দ আনন্দমঠের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা, মারাঠা বীর নানাসাহেব সিপাহী যুদ্ধের অন্যতম শক্তিশালী নায়ক। সত্যানন্দ কাল্পনিক ব্যক্তি, নানাসাহেব ঐতিহাসিক পুরুষ। উভয়ের কর্ম, উদ্দেশ্য ও আদর্শ এখানে অলোচিত হইয়াছে।]

পঞ্চভূত

(প্রথম প্রবন্ধের কিয়দংশ)

রচনার সুবিধার জন্য আমার পাঁচটি পারিপার্শ্বিককে পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক্। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

একটা গড়া নাম দিতে গেলেই মানুষকে বদল করিতে হয়। তলোয়ারের যেমন খাপ, মানুষের তেমন নামটি ভাষায় পাওয়া অসম্ভব। বিশেষত ঠিক পাঁচ ভূতের সহিত পাঁচটা মানুষ অবিকল মিলাইব কী করিয়া।

আমি ঠিক মিলাইতেও চাহি না। আমি তো আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্ম শপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।

এই তো আমি এবং আমার পঞ্চভূত সম্প্রদায়। ইহার মধ্যে শ্রীমতী দীপ্তি (তেজ) একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন, 'তুমি তোমার ডায়ারি রাখ না কেন?'

মেয়েদের মাথায় অনেকগুলি অন্ধ সংস্কার থাকে, শ্রীমতী দীপ্তির মাথায় তন্মধ্যে এই একটি সংস্কার ছিল যে, আমি নিতান্ত যে-সে লোক নহি। বলা বাহুল্য, এই সংস্কার দূর করিবার জন্য আমি অত্যধিক প্রয়াস পাই নাই।

সমীর (মরুৎ) উদার চঞ্চল ভাবে আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, 'লেখো না হে।'

ক্ষিতি এবং ব্যোম চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, 'ডায়ারি লিখিবার একটি মহদ্দোষ আছে।'

দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তা থাক্, তুমি লেখো।'

স্রোতস্বিনী (অপ) মৃদুস্বরে কহিলেন, 'কী দোষ শুনি।'

আমি কহিলাম, 'ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখনি উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়, তখনি ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। একটা মানুষের মধ্যেই সহস্র ভাগ আছে, সব কটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম আপদ ; আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।'

কোথাও কিছুই নাই, ব্যোম বলিয়া উঠিলেন, 'সেই জন্যই তো তত্ত্বজ্ঞানীরা সকল কর্মই নিষেধ করেন। কারণ, কর্মমাত্রই এক একটি সৃষ্টি। যখনি তুমি একটা কর্ম সৃজন করিলে তখনি সে অমরত্ব লাভ করিয়া তোমার সহিত লাগিয়া রহিল। আমরা যতই ভাবিতেছি, ভোগ করিতেছি, ততই আপনাকে নানা-খানা করিয়া তুলিতেছি। অতএব বিশুদ্ধ আত্মাটিকে যদি চাও, তবে সমস্ত ভাবনা, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দাও।'

আমি ব্যোমের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, 'আমি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সংগে সংগে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।'

ক্ষিতি হাসিয়া কহিল, 'ডায়ারিকে কেন যে দ্বিতীয় জীবন বলিতেছ আমি তো এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।'

আমি কহিলাম, 'আমার কথা এই, জীবন এক দিকে একটা পথ আঁকিয়া চলিতেছে, তুমি যদি ঠিক তার পাশে কলম হস্তে তাহার অনুরূপ আর একটা রেখা কাটিয়া যাও, তবে ক্রমে এমন অবস্থা আসিবার সম্ভাবনা, যখন বোঝা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, তোমার কলম তোমার জীবনের সমপাতে লাইন কাটিয়া যায়, না তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে। দুটি রেখার মধ্যে কে আসল কে নকল, ক্রমে স্থির করা কঠিন হয়। জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া, কেবল একটা মোটামুটি রেখা টানিতে পারে। সে একটা ঘটনা দেখিলে তাহার যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার রেখাটা সহজেই তাহার নিজের গড়া সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্তী করিতে চাহে।'

কথাটা ভালো করিয়া বুঝাইবার জন্য আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া স্রোতস্বিনী দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল, 'বুঝিয়াছি তুমি কী বলিতে চাও। স্বভাবত আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতিগোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন, কিন্তু ডায়ারি লিখিতে গেলে দুই ব্যক্তির উপর জীবন গড়িবার ভার

দেওয়া হয়। কতকটা জীবন অনুসারে ডায়ারি হয়, কতকটা ডায়ারি অনুসারে জীবন হয়।'

স্রোতস্বিনী এমনি সহিষ্ণু ভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা শুনিয়া যায় যে, মনে হয় যেন বহু যত্নে সে আমার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় যে, বহু পূর্বেই সে আমার কথাটা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছে।

আমি কহিলাম, 'সেই বটে।'

দীপ্তি কহিল, 'তাহাতে ক্ষতি কী।'

আমি কহিলাম, 'যে ভুক্তভোগী সেই জানে। যে লোক সাহিত্যব্যবসায়ী সে আমার কথা বুঝিবে। সাহিত্যব্যবসায়ীকে নিজের অন্তরের মধ্য হইতে নানা ভাব এবং নানা চরিত্র বাহির করিতে হয়। যেমন ভালো মালী ফরমাশ অনুসারে নানারূপ সংগঠন এবং বিশেষরূপ চাষের দ্বারা একজাতীয় ফুল হইতে নানাপ্রকার ফুল বাহির করে—কোনোটার বা পাতা বড়ো, কোনোটার বা রঙ বিচিত্র, কোনোটার বা গন্ধ সুন্দর, কোনোটার বা ফল সুমিষ্ট,—তেমনি সাহিত্যব্যবসায়ী আপনার একটি মন হইতে নানাবিধ ফলন বাহির করে। মনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের উপর কল্পনার উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করে। যে-সকল ভাব, যে-সকল স্মৃতি, মনোবৃত্তির যে-সকল উচ্ছ্বাস সাধারণ লোকের মনে আপন আপন যথানির্দিষ্ট কাজ করিয়া যথাকালে ঝড়িয়া পড়ে অথবা রূপান্তরিত হইয়া যায়, সাহিত্যব্যবসায়ী সেগুলিকে ভিন্ন করিয়া লইয়া তাহাদিগকে স্থায়ী ভাবে রূপবান করিয়া তোলে। যখনি তাহাদিগকে ভালোরূপে মূর্তিমান করিয়া প্রকাশ করে তখনি তাহারা অমর হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমশ সাহিত্যব্যবসায়ীর মনে এক দল স্ব-স্ব প্রধান লোকের পল্লী বসিয়া যায়। তাহার জীবনের একটা ঐক্য থাকে না। সে দেখিতে দেখিতে একেবারে শতধা হইয়া পড়ে। তাহার চিরজীবনপ্রাপ্ত ক্ষুধিত মনোভাবের দলগুলি বিশ্বজগতের সর্বত্র আপন হস্ত প্রসারণ করিতে থাকে। সকল বিষয়েই তাহাদের কৌতূহল। বিশ্বরহস্য তাহাদিগকে দশ দিকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য তাহাদিগকে বাঁশি বাজাইয়া বেদনাপাশে বদ্ধ করে। দুঃখকেও তাহারা ক্রীড়ার সঙ্গী করে, মৃত্যুকেও তাহারা পরখ করিয়া দেখিতে চায়। নবকৌতূহলী শিশুদের মতো সকল জিনিসই তাহারা স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, কোনো শাসন মানিতে চাহে না। একটা দীপে একেবারে অনেকগুলা পলিতা জ্বালাইয়া দিয়া সমস্ত জীবনটা হু হুঃ শব্দে দগ্ধ করিয়া ফেলা হয়। একটা প্রকৃতির মধ্যে এতগুলা জীবন্ত বিকাশ বিষম বিরোধ-বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।'

স্রোতস্বিনী ঈষৎ ম্লান ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে এইরূপ বিচিত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্যক্ত করিয়া তাহার কি কোনো সুখ নাই।'

আমি কহিলাম, 'সৃজনের একটি বিপুল আনন্দ আছে। কিন্তু কোনো মানুষ তো সমস্ত সময় সৃজনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না—তাহার শক্তির সীমা আছে, এবং সংসারে লিপ্ত থাকিয়া তাহাকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেও হয়। এই জীবনযাত্রায়

তাহার বড়ো অসুবিধা। মনটির উপর অবিশ্রাম কল্পনার তা দিয়া সে এমনি করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহার গায়ে কিছুই সয় না। সাত-ফুটা-ওয়ালা বাঁশি বাদ্যযন্ত্রের হিসাবে ভালো, ফুৎকারমাত্রে বাজিয়া ওঠে, কিন্তু ছিদ্রহীন পাকা বাঁশের লাঠি সংসারপথের পক্ষে ভালো, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়।'

সমীর কহিল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে বংশখণ্ডের মতো মানুষের কার্যবিভাগ নাই। মানুষ-বাঁশিকে বাজিবার সময় বাঁশি হইতে হইবে, আবার পথ চলিবার সময় লাঠি না হইলে চলিবে না। কিন্তু ভাই, তোমাদের তো অবস্থা ভালো, তোমরা কেহ বা বাঁশি, কেহ বা লাঠি—আর আমি যে কেবল মাত্র ফুৎকার। আমার মধ্যে সংগীতের সমস্ত আভ্যন্তরিক উপকরণই আছে, কেবল যে একটা বাহ্য আকারের মধ্য দিয়া তাহাকে বিশেষ রাগিণীরূপে ধ্বনিত করিয়া তোলা যায়, সেই যন্ত্রটা নাই।'

দীপ্তি কহিলেন, 'মানবজন্মে আমাদের অনেক জিনিস অনর্থক লোকসান হইয়া যায়। কত চিন্তা, কত ভাব, কত ঘটনা প্রবল সুখদুঃখের ঢেউ তুলিয়া আমাকে প্রতিদিন নানারূপে বিচলিত করিয়া যায়; তাহাদিগকে যদি লেখায় বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি তাহা হইলে মনে হয় যেন আমার জীবনের অনেকখানি হাতে রহিল। সুখই হউক, দুঃখই হউক, কাহারও প্রতি একেবারে সম্পূর্ণ দখল ছাড়িতে আমার মন চায় না।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আংশিক)

স্নেহের জয়

(চন্দ্রগুপ্ত নাটক হইতে)

স্থান—চাণক্যের বাটি। কাল—প্রভাত

চাণক্য একাকী

চাণক্য—একটা সমুদ্র—তরঙ্গহীন, শব্দহীন, অন্তহীন। যতদূর দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর মত স্থির। (ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন)—ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ ক'র্‌তে পারে না। হৃদয়ের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা, গৈরিক নিঃস্রাবের মত উঠে, ভস্ম হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্নেহের উৎস হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর থেকে উঠে মস্তিষ্কের তীব্র জালাস্পর্শে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়। (পরে স্থির-নেত্রে দূরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কহিলেন)—এই সুন্দর প্রভাত, ঐ গাঢ় নীলিমা,—একদিন ছিল—কে ?

(প্রহরীবেষ্টিত কাত্যায়নের প্রবেশ)

চাণক্য—এই যে, এসেছ ? এস বন্ধু।

কাত্যায়ন—ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি, চাণক্য ? আমি তোমার বন্দী। অন্যায় করেছি, শাস্তি দাও।

চাণক্য—বন্ধন উন্মোচন ক'রে দাও প্রহরী।

(প্রহরী বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল)

চাণক্য—এখন আর তুমি আমার বন্দী নও। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নেই।

কাত্যায়ন—প্রভেদ নাইই বটে ! আমার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী !

চাণক্য—তোমরা বাহিরে যাও।

(প্রহরিগণ চলিয়া গেল)

চাণক্য—আর আমাদের প্রভেদ নেই, বন্ধু।

কাত্যায়ন—প্রভেদ নেই !—তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্তই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত হ'তে পারে ! আমি বন্দী—আর তুমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা।

চাণক্য—এই ছোরা নাও। আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দাও, তোমার মন্ত্রিত্বের পথ পরিষ্কার কর। (ছোরা দিলেন)

কাত্যায়ন—তোমার অভিপ্রায় কি, চাণক্য ?

চাণক্য—আমি সাম্রাজ্যের জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে দিয়েছি। এক ঊষর প্রান্তরকে উর্বরক্ষেত্রে পরিণত ক'রেছি।—তুমি যা পারো নি। এই বিশাল সাম্রাজ্যে একটা ত্রস্ত শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে। বাহিরে শত্রুগণ ত্রস্ত। রাজপথপার্শ্বে সম্পত্তি রেখে পথিক নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারে। কিন্তু এই বিরাট্ শান্তি পর্বতের মত স্থির নিষ্প্রাণ ! না, আমি পারি নি। তুমি হয়তো পার্‌বে।—মন্ত্রিত্ব চাও, ছেড়ে দিচ্ছি।

কাত্যায়ন—তুমি কূট। তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য।

চাণক্য—আমি এই পৈতা ছুঁয়ে বলছি—আমি এই মুহূর্তে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করছি—তুমি যদি চাও।—তুমি মূর্খ, কিন্তু তোমার হৃদয় আছে। তুমি পার্‌বে, আমি পারি নি।

কাত্যায়ন—সে কি ! ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠিয়ে—

চাণক্য—সব ভ্রম। হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না। আমি বুঝেছি যে, আমার কঠোর শাসনে যে ক্ষমতা স্বপ্নের প্রাসাদের মত অভ্রভেদ ক'রে উঠ্‌ছে তা' স্বপ্নের প্রাসাদের ন্যায় আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে। এ বাড়ী নয়, ইটের পাঁজা ! এ বৃক্ষ নয়, এ শুষ্ক কাঠের গুচ্ছ। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়ে আন্‌তে পারি না। শূদ্রকে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসাতে পারি, কিন্তু তার হৃদয়ে আবার ভক্তির স্রোত বহাতে পারি না। রাক্ষসি, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্ ? আমি কি করেছি—কি করেছি !

কাত্যায়ন—কি করেছো ?

চাণক্য—ঐ বৌদ্ধধর্মের বন্যা আস্‌ছে।—আমি দূর-ভবিষ্যতে কি দেখ্‌ছি জানো ?

কাত্যায়ন—কি ?

চাণক্য—এই পুনরায় বিখণ্ডিত সাম্রাজ্যের উপরে প্রেতের ভৈরব নৃত্য ! তারপর এক মহাশক্তি এসে গলিত শবের উপর তার যাদুদণ্ড বুলিয়ে সেই খণ্ডিত মাংসপিণ্ড-গুলিকে এক ক'রে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত কর্‌বে ; আর তার ন্যায়শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চ'ষে সমভূমি কর্‌বে !—নাও এই মন্ত্রিত্ব।

কাত্যায়ন—কি দামে বিকাচ্ছো ?

চাণক্য—তোমার বন্ধুত্ব চাই, এইমাত্র।

কাত্যায়ন—উত্তম অভিনয়।

চাণক্য—অভিনয় নয়, বিশ্বাস কর বন্ধু। আজ আমি বড় দীন। চাণক্য কূট-কৌশলী বিচক্ষণ। চাণক্য ভারতে জীবিত জাতির সমবায়ে এক মহাসঙ্গীত রচনা ক'রেছে। আকাশে যদি ঈশ্বর থাকেন, তা হ'লে তিনি চাণক্যের এই মহাসৃষ্টি মুগ্ধ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর্‌ছেন। সব ক'রেছি, কিন্তু তা'তে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পার্‌লাম না। পার্‌ব কোথা থেকে? বাহিরে এই মনীষা দেখ্‌ছো, কিন্তু আমার হৃদয় চিরে দেখ বন্ধু! এ শুষ্ক মরুভূমি—এক কণা করুণা নেই, স্নেহ নেই, বিশ্বাস নেই। শাঁস নেই, খোসা নিয়ে কি কর্‌ব? ভেঙ্গে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেই।

(বক্ষে করাঘাত)

কাত্যায়ন—আশ্চর্য! তুমি অধীর, চাণক্য! এই দুর্দম তেজ, এই অটল প্রতিজ্ঞা, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—

চাণক্য—বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি! শুন্‌তে শুন্‌তে অধীর হ'য়ে গেছি। পথে, ঘাটে প্রান্তরে বিশ্বশুদ্ধ ঐ এক কথা—চাণক্যের কি বুদ্ধি! সমস্ত জগৎ নির্নিমেষ বিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে দেখ্‌ছে—যেমন লোকে বিভীষিকা দেখে, ধূমকেতু দেখে! যে বুদ্ধিকে এতদিন আমি দৈববাণীর মত অনুসরণ ক'রে এসেছি—সে বর নয়, সে অভিশাপ। এখন সে ফিরে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ দেখ্‌তে পেয়েছি; সে সজীব মূর্তি নয়, সে কঙ্কাল। সে এতদিন আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—এখন তাড়া ক'রেছে—ভয়ঙ্কর!

(শিহরিয়া উঠিলেন)

কাত্যায়ন—তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ, চাণক্য।

চাণক্য—(ক্ষণেক নীরব থাকিয়া)—এই সুন্দর প্রভাত—ধরণী বিবাহের কন্যার মত সেজেছে। তার মুখের উপর সূর্যের স্বর্ণরশ্মি ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত এসে প'ড়েছে। আর সৃষ্টিছাড়া আমিই দ্বারস্থ ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছি।

কাত্যায়ন—চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য—এই সুন্দর হাস্যময় জগৎ—আর আমি তার কেউ নই। একা আমি অসীম সৌন্দর্য-রাজ্য থেকে নির্বাসিত। বিশ্বে অমৃতের সমুদ্রের ঢেউ ব'হে যাচ্ছে—আর পঙ্গু আমি তাপিত তৃষিত হৃদয়ে তীরে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছি—তপোবনের প্রান্তে শূকরের মত পল্বলপঙ্কে প'ড়ে আছি।

কাত্যায়ন—আশ্চর্য! এরূপ কখনও দেখি নি!

চাণক্য—তবু একদিন ছিল—

(দূরে সঙ্গীত)

চাণক্য—তবু একদিন ছিল, যেদিন সংসার আমার কাছে উৎসব-মন্দির ব'লে বোধ হ'ত। পৃথিবীর উপর দিয়ে সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত হয়ে যেত, আকাশ ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত বোধ হ'ত। তারপর—

(সঙ্গীত নিকটবর্তী হইল)

চাণক্য—(উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া) সেই স্বর! কাত্যায়ন! বন্ধু! ডেকে আন।

কাত্যায়ন—কা'কে ?

চাণক্য—ঐ ভিক্ষুককে আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন—সেকি !—তুমি কি—

চাণক্য—(সান্থনয়ে) যাও ভাই—(কাত্যায়নের প্রস্থান)

চাণক্য—কেন এমন হয় ! এই বালিকার স্বর শুনে কেন এমন হয় ! (ঘর্ম মুছিলেন)

(গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ। সঙ্গে কাত্যায়ন।)

গীত

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ঐ ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে "আয় চলে আয়,
ওরে, আয় চ'লে আয় আমার পাশে।"
বলে "আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চির স্নিগ্ধ মধুমাসে ;
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥

কাত্যায়ন—এমন দার্শনিক ভিক্ষুক ত পূর্বে কখন দেখি নি। "তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণপদঃ কর্মধারয়ঃ"—অর্থাৎ কিনা—সেই এক পুরুষ প্রকৃতির সহিত সমগুণান্বিত হইলে—অর্থাৎ জীবভাবে জন্মগ্রহণ করিলে, কর্ম ধারণ করায়—আর কাজেই কর্মফল ভোগ করে—ওঃ ! ভিক্ষুক, তুমি পাণিনি প'ড়েছো নিশ্চয়।

ভিক্ষুক—আজ্ঞে না।

কাত্যায়ন—কিন্তু তোমার গানের প্রতি ছত্রে পাণিনি। এ সব গান শিখ্‌লে কার কাছে ?

ভিক্ষুক—এক ব্রাহ্মণের কাছে বাবা।

কাত্যায়ন—হ'তেই হবে।

চাণক্য—(বালিকাকে) এই দিকে এস ত মা।

(বালিকা দৌড়িয়া চাণক্যের কাছে আসিল)

চাণক্য—(তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) একেবারে সেই মুখ ! সেই চক্ষু দুটি ? একেবারে অথচ—ভিক্ষুক ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।—এ তোমার কন্যা ! সত্য বল।

ভিক্ষুক—আমার বৈ কি ? আর কার ?

চাণক্য—সত্য বল। তোমায় প্রচুর অর্থ দিব। সত্য বল।

ভিক্ষুক—না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি। তবে সেই অবধি তাকে নিজের মেয়ের মতই মানুষ করেছি বাবা।

চাণক্য—(সাগ্রহে) তবে তোমার মেয়ে নয় ?

ভিক্ষুক—না বাবা ! কুড়িয়ে পেয়েছি।

চাণক্য—কোথায় পেলে।

ভিক্ষুক—ভগবান্ দিয়েছেন। নইলে এই অন্ধ বুড়োকে কে হাত ধরে নিয়ে বেড়াত? কি পুণ্যে মাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি ক'রে খেতাম, এখন সেই পাপে চক্ষু দু'টি হারিয়েছি।

চাণক্য—(সমধিক আগ্রহে) দস্যু ছিলে।—ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ?

ভিক্ষুক—দিইছি বৈ কি, বাবা! কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে?

চাণক্য—মেয়ে কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক—অবন্তীপুরে, বাবা!

চাণক্য—(উত্তেজিত ভাবে) অবন্তীপুরে? কোন্ জায়গায়?

ভিক্ষুক—পথে।

চাণক্য—না, এক ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চুরি ক'রে এনেছিলে? সত্য বল—কোন ভয় নেই, চুরি করেছিলে?

ভিক্ষুক—না বাবা!

চাণক্য—হত্যা ক'র্‌ব!—সত্য বল! ডাকাতি ক'রে এনেছিলে?

ভিক্ষুক—হাঁ, বাবা!

চাণক্য—নদীর ধারে বাড়ী?

ভিক্ষুক—আজ্ঞে হাঁ।

চাণক্য—(বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া) হৃদয়, উদ্বেলিত হ'য়ো না।—তখন এর বয়স?

ভিক্ষুক—তিন চারি বৎসর বাবা!

চাণক্য—এর নাম কি বলেছিল?

ভিক্ষুক—আত্তিরি!

চাণক্য—আত্রেয়ী! শুন্‌ছো কাত্যায়ন? বল্‌ছে আত্রেয়ী! এর বাপের নাম?

ভিক্ষুক—চাণক্য।

চাণক্য—(লাফাইয়া উঠিয়া, উচ্চৈঃস্বরে) দস্যু!—না, তোমায় মার্‌বো না। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ ক'র্‌বো না। কোন ভয় নেই। কাত্যায়ন—না, রক্ষি!

(রক্ষিগণের প্রবেশ)

চাণক্য—না যাও!—ভিক্ষুক! আমিই সেই ব্রাহ্মণ। এ কন্যা আমার।

[রক্ষিগণের প্রস্থান]

ভিক্ষুক—আমার মেয়েটি কেড়ে নিও না, বাবা! এ আমার অন্ধের নড়ি। খেতে পাবো না।

চাণক্য—তোমায় এক রাজ্য-খণ্ড দিব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছো। তুমি আমায় সম্রাট্ করেছো। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ ক'রে আবার স্বর্গে উঠিয়েছো। আমি তোমায় বধ ক'রে তোমার মূর্তি গড়িয়ে পূজা কর্‌ব। না, না—একি! এ আনন্দ, না দুঃখ? এ যে—এ যে—না, একটা কিছু কর্‌তে হবে; যাতে বুঝ্‌তে পারি যে আমি বে'চে আছি। (হাস্য)

কাত্যায়ন—চাণক্য ! চাণক্য !

চাণক্য—কাত্যায়ন ! নাড়ী দেখ্‌তে জানো ? দেখ ত (হাত বাড়াইলেন) আমি বেঁচে আছি কি না ? দেখ ত এ ইহকাল না পরকাল ?—এ স্বপ্ন না সত্য ? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা ? এ সৃষ্টির সঙ্গীত, না প্রলয়-কল্লোল ?—দেখ ত !—নহিলে—একি সম্ভব ! এতদিন পরে আমারই কন্যা—ভারত-শাসনকর্তার কন্যা তারই দ্বারে এসেছে ভিক্ষা করতে !—কাত্যায়ন। কাত্যায়ন ! (ক্রন্দন)।

কাত্যায়ন—চাণক্য, প্রকৃতিস্থ হও।

চাণক্য—না, এ সম্ভবে না। এ ছলনা, প্রতারণা,—ষড়্‌যন্ত্র। তোমার ষড়্‌যন্ত্র কাত্যায়ন ! না, এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি। আত্রেয়ি—মা আমার ? এতদিন সন্তানকে ভুলে ছিলি। কোথায় ছিলি পাষাণি মা ! (কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন) —কাত্যায়ন ! শোন, কুঞ্জবনে একটা সামস্তোত্র উঠ্‌ছে না ? দেখ ঐ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। আকাশ থেকে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ -হিল্লোল ভেসে আস্‌ছে। শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে, আমাকে কুটীরে নিয়ে চল কাত্যায়ন !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (চন্দ্রগুপ্ত নাটক)

[গল্প বা উপন্যাস রচনায় কথোপকথনের নমুনা "গল্প রচনা" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

অনুশীলন

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে কাল্পনিক কথোপকথন লিখ :—

২। অসি ও লেখনী—কোন্‌টির অধিক প্রভাব এবং কেন ? এ বিষয়ে উভয় পক্ষের যুক্তিসহ একটি কাল্পনিক কথোপকথন লিখ।

৩। বর্ণবিদ্বেষ ও অস্পৃশ্যতা দূর হওয়া উচিত কেন, এ বিষয়ে একজন বিরুদ্ধবাদীর সহিত আলোচনা কথোপকথনে লিখ।

৪। (১) স্ত্রীশিক্ষা ও (২) জাতিভেদ—বিষয়ে দুইটি কথোপকথন দুই পক্ষের আলোচনা সহ লিখ।

৫। নগরবাসী ও গ্রামবাসীর পরস্পর সুবিধা-অসুবিধার আলোচনা লিখ।

৬। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিষ দফা কর্মসূচী সম্বন্ধে দুই বন্ধুর আলাপ লিখ।

৭। সামাজিক অনুন্নতি রাজনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী কিনা এ বিষয়ে উভয় পক্ষের আলোচনা নিজ ভাষায় লিখ।

৮। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতা চলিত গদ্যে নিজ ভাষায় কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখ।

৯। অর্জুন যুদ্ধে অনিচ্ছুক, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিতেছেন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে। [গীতা]

১০। দূরদর্শনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও কৃষিবিষয়ক আলোচনা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথোপকথন শোনা যায়। উহা অবলম্বনে একটি কথোপকথন নিজ ভাষায় লিখ।

পত্র-রচনা

বিজ্ঞানের অসাধারণ বিকাশের সঙ্গে পৃথিবীতে যোগাযোগ-ব্যবস্থার অসামান্য উন্নতি ঘটিয়াছে। কেবল আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে নয়, বাণিজ্যিক কারণে ও নানা প্রয়োজনে, নানা লোকের সঙ্গে আমাদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিতে হয়। পত্র দূতের কার্য করে। এজন্য বর্তমানে সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় পত্র-লিখন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। সুলিখিত পত্রে শৃঙ্খলা ও পূর্বাপর সম্বন্ধ যেমন থাকিবে, সেইরূপ উহাতে ভব্যতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য ও মার্জিত রুচিরও পরিচয় থাকা চাই।

আমরা তিন প্রকার পত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছি—(১) ব্যক্তিগত পত্র, (২) সামাজিক পত্র, ও (৩) বাণিজ্যিক পত্র।

ব্যক্তিগত পত্র তথ্যমূলক বা ভাব-বিনিময়মূলক এবং তাহা বহু-বিচিত্র রকমের। সামাজিক পত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট ছকে ও ভাষায় লিখিত হয়।

বাণিজ্যিক পত্র অন্যান্য পত্রের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরণের। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সংক্ষিপ্ত অথচ অনাড়ম্বর, ইহার ভাষা সরল ও স্পষ্ট। সর্বোপরি ইহার রচনায় সৌজন্যবোধ, যুক্তিপূর্ণ আবেদন ও চিত্তাকর্ষক লিখন-ভঙ্গি গ্রাহককে স্বতঃই আকৃষ্ট করে।

পত্র-রচনাও সাহিত্যের একটি অঙ্গ। লেখার গুণে পত্রসাহিত্যও সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করে। পৃথিবীর বিখ্যাত সাহিত্যিকদের পত্র স্থায়ী সাহিত্যরূপে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের মনে আনন্দ ও জ্ঞান দান করিতেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পত্রাকারে কাব্যও লিখিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অজস্র বিচিত্র পত্রসমূহ ভাষা ও ভাবে অপূর্ব সুন্দর সাহিত্য-সৃষ্টি। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী মানুষকে উৎসাহে উদ্দীপিত করে।

পত্রে যেমন হাল্‌কা বিষয়ের লেখা চলে তেমনি গভীর ভাবের বা গুরুতর সমস্যার আলোচনাও চলে। সাধারণতঃ চলিত ভাষাতে পত্র লেখা হয়। অনেক সময় সাধু ভাষায়ও পত্র লেখা চলে। চিন্তা-ভাবনা করিয়া শৃঙ্খলার সহিত লেখা, সুন্দর মার্জিত ভাষায় সাবলীল গতিতে লেখা, সাধারণতঃ চলিত ভাষায় অনেকটা কথা বলার ভঙ্গিতে লেখা এবং সর্বশেষে উপসংহারটি যেন মনে দাগ কাটে এমন ভাবে লেখা—ব্যক্তিগত ও সামাজিক পত্র-রচনায় এই সব দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ব্যক্তিগত পত্রের ভাষাও যাহাতে সাহিত্যিক ভাষার মতো হয়, সেজন্য যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক। (লিখন ভঙ্গির) (Style) দিকেও দৃষ্টি রাখিবে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, লিখন-ভঙ্গির দ্বারা মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। (Style is the man.)

বিবিধ প্রকারের কতকগুলি পত্রের আদর্শ এই অধ্যায়ে দেওয়া হইল। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনীষীদের কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রও সংকলিত হইল।

বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Letters)

বাণিজ্যক্ষেত্রে পত্র-বিনিময়ের গুরুত্ব বর্তমানে খুবই বেশি। ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিসর কেবল বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ নয়, ইহা বহির্বঙ্গেও বিস্তীর্ণ। অধুনা কেবলমাত্র পত্রের মাধ্যমেও অনেক ব্যবসায় চলিতেছে। বাণিজ্যিক পত্র রচনায় বর্তমানে আধুনিক বা পাশ্চাত্য রীতিই অনুসৃত হইতেছে, কেবল ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায়। স্বদেশে বাংলা ভাষাতেই বাণিজ্যিক পত্র লেখা চলে। বহির্বাণিজ্যে পত্রবিনিময় অবশ্য ইংরেজীতেই করিতে হয়।

একটি বাণিজ্যিক পত্র নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়।—

(১) **শিরোনামা** (Letter-head)—ইহা চিঠির কাগজের ঠিক মাথায় মধ্যস্থলে ছাপানো থাকে। ইহাতে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নাম, ব্যবসায়ের পরিচয়জ্ঞাপক লেখা, ঠিকানা, তারিখ, টেলিফোন নম্বর, টেলিগ্রামের ঠিকানা, পত্র-সংখ্যা, পূর্বসূত্র ও বিষয় ইত্যাদি লেখা থাকিবে।

বাণিজ্যিক পত্রে শ্রীহরিশরণং ইত্যাদি ঈশ্বরের নাম লেখা হয় না। ইহাতে ইংরেজী সাল তারিখ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্য রাখিবে, শিরোনামার প্রত্যেকটি বিষয়ই যেন যথাযথ লিখিত হয়।

(২) **অন্তর্বর্তী ঠিকানা** (Inner address)—শিরোনামার নীচে বামদিকে লিখিবে।

(৩) **অভিবাদন বা সম্ভাষণ** (Address)—'সবিনয় নিবেদন,' দিয়া পত্র শুরু করিবে।

(৪) **বিষয়বস্তু** (Contents or Body of the letter)—ইহাই বাণিজ্যিক পত্রের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মূল বক্তব্য বিষয় সুলিখিত, বাহুল্যবর্জিত, সংক্ষিপ্ত ও সৌজন্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

(৫) সমাপ্তির **শেষ পাঠ ও স্বাক্ষর**—পত্রশেষে 'ইতি' লেখা হয়।

তারপর উহার নীচের ছত্রে ডান দিকে 'বিনীত', 'নিবেদক', 'ভবদীয়', 'বশংবদ', 'আপনাদের বিশ্বস্ত' (ইংরেজীর অনুকরণে)—ইহাদের যে-কোন একটি লেখা হয়। উহার নীচেই স্বাক্ষর। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্বাক্ষরকারীর পদমর্যাদার সিল দিয়া পুরো নাম সই করিতে হয়।

পত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত কাগজপত্রাদি পাঠাইতে হইলে পত্রের নীচে বামদিকে তাহার উল্লেখ করা হয়।

বাণিজ্যিক পত্র সাধু ভাষাতে লেখা বাঞ্ছনীয়। পরিচ্ছন্ন লেখা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সমাদৃত।

একটি বিতর্ক-সভার বিবরণ

কুচবিহার
৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪

প্রিয় অশোক,

আশা করি তোমার দিদির বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করেছ। কিন্তু ভাই তুমি একটা জিনিস দেখতে এবং শুনতে পেলে না। আমাদের শিক্ষালয়ে খুব ভাল একটা বিতর্ক-সভা হয়ে গেল।

বিতর্ক-সভায় একটি নির্দিষ্ট বিষয় বিতর্কের জন্য ঠিক করা হয়। এই সভায় বিতর্কের বিষয়টি ছিল 'মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা হওয়া উচিত'। পক্ষে এবং বিপক্ষে বলবার জন্য দুটি দল গঠন করা হয়েছিল। প্রত্যেক পক্ষে ৬ জন ছাত্র ছিল। এই সভা পরিচালনার জন্য আমাদের বাংলার অধ্যাপক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার আদেশ ও নির্দেশে সভাটি পরিচালিত হয়। শিক্ষকগণ ও অধিকাংশ ছাত্র এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যাহারা এই বিষয়ের পক্ষে ছিল, তাহারা নানা প্রকার যুক্তিতর্ক উদাহরণ দেখিয়ে বলছিল যে, মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না দিলে সে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। অবিলম্বে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু করা উচিত। আর যারা বিপক্ষে বলছিল, তারা বলতে চাচ্ছিল বিস্তৃত জ্ঞানলাভের জন্য একমাত্র মাতৃ-ভাষাই যথেষ্ট নয়। ইংরেজীর শিক্ষা গ্রহণ না করলে দেশ-বিদেশের জ্ঞানলাভ করা যায় না। প্রত্যেকেই স্বপক্ষে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছিল। কখনও কখনও দু' পক্ষের মধ্যে শ্লেষাত্মক কথাবার্তা হচ্ছিল। সভাপতির টেবিলে একটি ঘণ্টা ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজিয়ে উভয় পক্ষকে শান্ত করছিলেন। শশধরকে দেখলে শান্ত মুখচোরা মনে হয়। কিন্তু শশধরই মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষে খুব সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছে। ওর শান্ত এবং জোরালো যুক্তি শুনে প্রত্যেক শিক্ষক খুব প্রশংসা করেছেন। এই বিষয়ে তিন জন অধ্যাপক বিচারক ছিলেন। তাদের মতে মাতৃ-ভাষার পক্ষে যারা বলেছে তারাই ভাল বলে বিবেচিত হয়েছে।

এই বিতর্ক-সভায় আমার নূতন অভিজ্ঞতা হোল। যাদের জানতাম মুখচোরা এবং কারও সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার ক্ষমতা নেই, তারাই সবাইকে অবাক করে দিয়ে খুব চমৎকার বলেছে। আমার মনে হয় এরা ভাল ভাবে পড়াশুনা করে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। যুক্তিযুক্তভাবে গুছিয়ে কথা বলার অভ্যাস করেছে। তর্কের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে চটপট ঠিকমত জবাব দেওয়া কম কথা নয়, তার উপর আবার এতগুলি ছাত্র ও শিক্ষকের সাম্‌নে। মাঝে মাঝে এরকম বিতর্ক-সভা হলে আমাদের অশেষ কল্যাণ হবে। আমাদের জ্ঞান ও কথা বলবার ক্ষমতা বাড়বে। আমরা যুক্তিপূর্ণভাবে এবং বিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে শিখবো।

আশা করি, আগামী বিতর্ক-সভায় উপস্থিত থাকতে পারবে। মাসীমা, মেসো-মশাইকে প্রণাম দিও। দিদি ও দাদাদের প্রণাম দিও। তুমি আমার ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমার—পবিত্র

কলিকাতার পরিবহণ

কলিকাতা
৩০শে বৈশাখ, ১৩৮১

শ্রীচরণেষু

বাবা, তোমার চিঠি পেয়েছি। আশা করি আমার গত সপ্তাহের চিঠি পেয়েছ। মার শরীর খারাপ লিখেছিলে, এখন কেমন আছেন জানাইও।

আমার লেখাপড়া একরকম চলছে। প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াতে এত সময় ও শক্তি যায় যে, বাড়ী ফিরে আর কিছু করবার উৎসাহ পাই না। এখানকার পরিবহণ-সমস্যা এমন উৎকট যে, তুমি কল্পনা করতে পারবে না। ভোর হতেই ভাবতে থাকি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌছতে পারবো কিনা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে বাস-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াই। সেখানে মেলার মতন লোক দাঁড়িয়ে থাকে। প্রত্যেকে যাবার জন্য ব্যাকুল। সে কি দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি করতে থাকে সবাই। একটি বাস এসে দাঁড়ায় লোক ভর্ত্তি হয়ে, তাতেই উঠবার জন্য চেষ্টা করতে হয়। পা-দানিতে একটি পা রাখবার জায়গা পেলেই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। পর পর কয়েকটা বাস ছেড়ে দিয়ে কোন রকমে উঠে যেতে পারলে স্কুলে সময় মত পৌছান যায়।

এই ভীড়ে পকেটমার ও চোরেরা তৎপর হয়ে ওঠে। একদিন এক ভদ্রমহিলা বাসে ছিলেন জানালার পাশে। জানালা ধরে ধরে সব ঝুলে যাচ্ছে। এমন সময় ভদ্রমহিলা চীৎকার করে উঠলেন, 'আমার হার নিয়ে গেল।' এতগুলো লোক বাসে থাকতে, রাস্তায় জনারণ্য থাকতে, সেই হারচোরের কোন হদিস হোল না। বাস থেকে নেমে চোরটি নিশ্চিন্ত মনে জনারণ্যে মিশে গেল। বাইরে জানালা ধরে যারা ঝুলছিলো তাদের মধ্যেই এক জন এ হারটি নিয়ে গেল।

বাস-যাত্রীদের মধ্যে যে নানারকম কথোপকথন হয় তা অনেক সময় হাসির খোরাক যোগায়। এক ভদ্রলোক ছুটে এসে কোন রকমে পা-দানিতে পা রেখে বলছে—পাখানি রাখতে দিন ভাই। যেতে যেতে পা ফসকে পড়ে যদি মরি তাহলে আবার জন্ম হবে। কিন্তু চাকুরি যদি যায় আর চাকুরি পাব না। কেউ হয়ত কারও পা মারিয়ে দিল। তা নিয়ে বচসা। বাস থেকে নামতে গিয়ে কারও জামা ছিঁড়ে যায়। চশমা ছুটে পড়ে। হাতের ব্যাগ ছিটকে রাস্তায় পড়ে।

এই দুর্দশা আরও চরমে উঠে যে দিন সামান্য কারণে বাস বন্ধ হয়ে যায়। জানান্ না দিয়ে এ রকম বাস বন্ধ হলে অপরিসীম কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এতগুলি লোক বাড়ী থেকে বেড়িয়েছে, তাদের ফিরবার পথ নেই। হেঁটে, রিকসা, টেম্পো ও লরি ধরে কোন রকমে বাড়ী ফিরতে হয়। সব চেয়ে বেশী কষ্ট হয় মেয়েদের। কলকাতায় অল্প জল হলে রাস্তায় জল জমে যায়। এমনি দিনে বাস পেতে হলে অনেক কষ্ট করতে হয়।

তুমি আমার জন্য চিন্তা করো না। দাদু-দিদিমা ভাল আছেন। মামা-মাসীরাও ভাল। তুমি ও মা আমার প্রণাম নিও। বাচ্চু ও নোটনকে ভালবাসা দিও। ইতি

স্নেহের—খোকন

একটি মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী

বাঁকুড়া
৭ই পৌষ, ১৩৮১

প্রিয় বন্ধু অনিমা,

তোমার চিঠিখানা পেয়েছি কিছুদিন আগে। চিঠির জবাব দিতে অনেকটা দেরি করে ফেলেছি। আমাদের বিদ্যাভবন-প্রাঙ্গণে একটি মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী হচ্ছে। এই নিয়ে কয়েকদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। এই প্রদর্শনীটি এত সুন্দর যে, সব সময় তোমার কথা মনে হচ্ছে। তুমি থাকলে দেখতে পেতে। তুমি দেখতে পেলে না বলে তোমাকে এই প্রদর্শনী সম্পর্কে কিছু লিখছি।

প্রদর্শনীর দ্বারদেশটি ফুল লতাপাতা দিয়ে অতি সুন্দর করে সাজান হয়েছে। গেটের পাশে টিকিটঘর, সেখান থেকে টিকিট করে তারপর ভিতরে ঢুকতে হবে। ভিতরে মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করছে। তারাই সবাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদর্শনী দেখিয়ে দিচ্ছে। দূর থেকে প্রদর্শনী-মণ্ডপটি খুব সুন্দর দেখায়। এত অনাড়ম্বর অথচ সুসজ্জিত প্রদর্শনী বড় দেখা যায় না। সুসজ্জিত দোকানগুলি ঝকঝক করছে। প্রত্যেকটি দোকান রুচিসম্মতভাবে সাজান হয়েছে। প্রত্যেকটি দোকানে মেয়েরা বেচাকেনা করছে। মেয়েদের হাতের তৈরী নানারকম সেলাই দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় সব কিনে ফেলি। প্রত্যেকটি দোকান-ঘরের সামনে অতি সুন্দর আলপনা দেওয়া হয়েছে। সূচের কাজ, উলের কাজ, ক্রুশের কাজ চামড়ার কাজ, সব আছে। চামড়ার কাজগুলো এত সুন্দর যে, আমার মনে হয় বিদেশে এসব যথেষ্ট সমাদর পাবে। কাঠের ও মাটির পুতুলের আলাদা আলাদা দোকান আছে। একটি ঘরে মেয়েদের আঁকা অতি সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে সাজান। একটি ঘরে আচার বড়ি মোরব্বা জ্যাম জেলি প্রভৃতির দোকান। খাবারের ঘরগুলিতে সব চেয়ে ভীড় বেশী। সবই খাঁটি জিনিস। মেয়েদের হাতের তৈরী। চপ্, কাটলেট, পেয়াজি, বড়া, সিঙ্গারা ইত্যাদি নোনতা খাবার গরম গরম ভেজে দিতে দিতে মেয়েরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। প্রদর্শনী শেষ হবার আগেই এসব দোকানের জিনিস ফুরিয়ে যায়। চা ও কফির দোকানেও খুব ভীড়।

প্রদর্শনী উপলক্ষে বড় হলঘরটিতে রোজই একটা-না-একটা অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। কোন দিন আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, কোন দিন নাচগানের আসর, কোন দিন নাটক, কোন দিন সাহিত্যিক-সম্মেলন—এরকম নানা প্রকার অনুষ্ঠান।

এই প্রদর্শনীর ফলে মেয়েদের মধ্যে নানা রকম কাজ করবার ইচ্ছা হবে। অনেক দুঃস্থ মহিলা এই প্রদর্শনী উপলক্ষে কিছু টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারলেন। মেয়েরাও নানাভাবে আনন্দ পেলো, সবার সাথে মিশবার সুযোগ পেলো। সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে শিখলো।

আজ এখানে শেষ করছি। তোমার বাবা-মাকে আমার প্রণাম জানাইও। ছোটদের ভালবাসা দিও। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমার—সুজাতা

কেন যান্ত্রিক কৃষিবিদ্ হইব

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করিয়া চাকুরীর সন্ধানে না ঘুরিয়া তুমি একজন শিক্ষিত যন্ত্রবিদ্ কৃষক হইতে চাও, এই মর্মে কারণ দেখাইয়া তোমার কোন বন্ধুর নিকট চিঠি লিখ।

কৃষ্ণপুর, ২০শে মে, ১৯৭৬

প্রিয় বুল্‌বুল্, তোমার ১২ই মে তারিখের পত্র পাইলাম। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করিবার পর আমি কি করিব। চাকুরী করিব না আরো পড়িব। দুইয়ের কোনটাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা তোমাদের মতো সঙ্গতিসম্পন্ন নই, কাজেই ইচ্ছা থাকিলেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ নাই। তাঁহার উপর সংসারের আমি বড় ছেলে। আমার বাবা ক্রমেই কাজকর্মে অশক্ত হইয়া পড়িতেছেন। এমন অবস্থায় কাজকর্মেই মন দিতে হইবে। তবে চাকুরীর প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। না থাকিবার কারণ এই যে, সামান্য পরীক্ষা পাশ করা লোকের পক্ষে সামান্য কেরানিগিরি ভিন্ন আর কোন ভাল চাকুরী করিবার সম্ভাবনা নাই। কেরানির জীবনে উন্নতি নাই।

আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, যতটুকু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছি, তাহার অন্যভাবে সদ্ব্যবহার করিব। আমরা চাষীর ছেলে। কৃষিকার্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিলে আমি যে উন্নতি করিতে পারিব, সে বিষয়ে আমি একরূপ নিঃসন্দেহ। বর্তমানে আমি তাই আধুনিক কৃষি-কার্য-পদ্ধতি বিষয়ক কিছু বই আনাইয়া পড়িতেছি। তুমি জানো বর্তমানে আমাদের দেশের লোকেরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কৃষিকার্য করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। অনেক রাজ্যে যান্ত্রিক কৃষি-খামারের বা mechanised farm-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ইহার ফলে বহু অনুর্বর জমি উর্বর জমিতে পরিণত হইয়াছে। লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহারের ফলে কৃষিকার্যের বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অনেক অঞ্চলে সমবায় পদ্ধতিতে ও যৌথ উপায়ে কৃষির উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। কোন কোন স্থানে কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আজকাল কৃষি-বিদ্যালয়ে অনেকে পড়াশুনা করিয়া কৃষিকার্যে যোগ দিতেছে।

এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, কৃষিকার্যকেই আমার জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিব। প্রাচীন-প্রথায় হাল-বলদ দিয়া চাষাবাদ করিবার পরিবর্তে ট্রাক্টর দ্বারা চাষ করিব এবং সমবায়-প্রথায় কাজ করিব। এ বিষয়ে আমাদের বর্তমান সরকার হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে আশা করি। সেদিন এরফান আলির মুখে শুনিলাম যে, আমাদের সরকার উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য প্রবর্তনের জন্য নাকি দেশের শিক্ষিতদের আহ্বান করিয়াছেন এবং যে কেহ এ বিষয়ে অগ্রসর হইবে, তাহাকে সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য পরামর্শও দেওয়া হইবে। আমি তাই একজন শিক্ষিত কৃষক হইতে চলিয়াছি। আশা করি, কৃষক বলিয়া তোমার বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত হইব না। ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমার
ভীমচন্দ্র

দূরদর্শনে একটি ছায়াচিত্রের ছবি

কলিকাতা, ১১ই জুন, ১৩৭৬

প্রিয় অনির্বাণ,

আশা করি মামাবাড়ীতে খুব আনন্দে আছ। গ্রামের পরিবেশ তোমাকে নিশ্চয়ই অভিভূত করেছে। গ্রামের উদার প্রান্তর, নির্মল নীল আকাশ, শ্যামল শোভা, তদুপরি ওখানকার মানুষের সহজ জীবনযাত্রা আশা করি তোমার খুব ভাল লাগছে।

কাল টি. ভি.-তে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' দেখলাম। বইখানি দেখতে দেখতে কেবলি তোমার কথা ভাবছিলাম। আমি যা কিছু ছবিতে দেখছি তুমি বোধ হয় সবই প্রত্যক্ষ কোরছ। পথের পাঁচালীর অপু, দুর্গা তোমার চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে। দরিদ্রতার আগুনে পুড়ে পুড়ে সর্বজয়া তোমার সামনে মাতৃত্বের অপূর্ব সুষমা নিয়ে কলসি কাঁখে জল আনতে যায়, তাকে কি তুমি খুঁজে বের করতে পেরেছ? আর হরিহরের দুর্বার সংসার-যুদ্ধ, তাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ।

বইখানি দেখতে দেখতে অভিভূত হয়েছি। চোখের জল? তার কথা কি বলবো—বাড়ীর সবার অগোচরে সেই ব্যথার ধারাকে মুছতে চেষ্টা করেছি, পারিনি লুকোতে। এত কষ্ট এত ব্যথা এত সহানুভূতি কি লুকান যায়?

বইখানি তুমি পড়েছ কিনা জানি না। যদি না পড়ে থাক, পড়ে নিও। ছোট একটি গ্রাম মাত্র কয়েকটি অতি সাধারণ চরিত্র। কিন্তু এর মধ্যেই তুমি অপূর্ব করুণ রসাস্বাদন করতে পারবে। হরিহরের একটি ছোট সংসার, স্ত্রী সর্বজয়া, মেয়ে দুর্গা, ছেলে অপু এবং হরিহরের এক বৃদ্ধা দিদি। এই বৃদ্ধা এ সংসারে একেবারেই অবাঞ্ছিত। তবু তাকে থাকতে হয়, কারণ চলে যাবার আর যায়গা নেই। বারে বারে রাগ করে চলে গিয়েছে, আবার ফিরে এসেছে, অসহায়তার চরম গ্লানি নিয়ে। সংসারের জটিলতার কিছু জানে না দুর্গা, তাই সে পিসিকে হাত ধরে ফিরিয়ে এনেছে সংসারে। দুর্গার দুরন্তপনা দেখে দুঃখও হয় আবার হাসিও পায়। দুর্গা তার মার কাছে কত মার খেয়েছে, কত বকুনি খেয়েছে, কিন্তু তার দুরন্তপনার কোন সংশোধন হয় নাই। এক দিনের জন্যও সে চুপচাপ বসে থাকে নাই। রোগ তাকে বিছানায় শোয়াইয়া কাবু করেছিল। শুয়ে শুয়ে সে কত কথা ভাবত। আদরের ছোট ভাই অপুকে বলেছিল, সে যেন বড় হয়ে তার দিদিকে গাড়ী দেখায়। এমন দুরন্ত প্রাণবন্ত মেয়ে দুর্গা একদিন বিনাচিকিৎসায় ম্যালেরিয়ায় ভুগে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল। সাথীহীন অপুর দুঃখের অবধি রইল না। অপুর ছিল কল্পনাপ্রবণ মন। কল্পনার উপর ভর করে সে নানা যায়গায় ঘুরে বেড়াত। দুর্গাকে হারিয়ে হরিহর স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেল। অপু যখন রেলগাড়ী করে যাচ্ছিল, তখন কেবলই ওর দুর্গার কথা মনে হচ্ছিল। দুর্গাকে রেলগাড়ী দেখান হোল না।

বইখানি যে এত ভাল লেগেছে তার কারণ বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব লেখনী-শক্তি আর পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞান ও সার্থক পরিচালনা শক্তি।

আশা করি তুমি আমার চিঠির জবাব দেবে তাড়াতাড়ি। কবে কোলকাতা ফিরছ জানাইও। তুমি আমার ভালবাসা জেনো। দাদু, দিদিমা, মামা, মামীমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইও। ছোট ভাই বোনদের আশীর্বাদ দিও। ইতি

তোমার বন্ধু বিমল

বিশ দফা কর্মসূচী

কলিকাতা
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

প্রিয় বন্ধু অশোক,

আশা করি মঙ্গলমত পৌছেছ। তোমার কোন চিঠি না পেয়ে চিন্তায় আছি। সে দিন পথে যেতে যেতে তোমার সাথে অনেক কথা হোল। তুমি বার বারই বলছিলে 'কি যে বিশ দফা কর্মসূচী বলে তোমরা হৈ চৈ কর আমি কিন্তু এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি না।' সে দিন তোমার যাবার তাড়া ছিল, তাই এ বিষয়ে আর তোমার সাথে কথা হোল না। কিন্তু বন্ধু, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির এই প্রচেষ্টাকে কেন তুমি বুঝতে পার না? একটু গভীর ভাবে চিন্তা কর, তাহলেই বুঝতে পারবে।

দীর্ঘকাল আমরা বিদেশী শাসনের যাতাকলে পিষ্ট হয়েছি। স্বাধীনতার পর কয়েকটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে, কিন্তু তা পুরোপুরি সার্থক হতে পারেনি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রচনা করলেন এই বিশ দফা কর্মসূচী। তাঁর এই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচী সমস্ত ভারতবাসীর অভিনন্দন লাভ করলো।

ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশই দরিদ্র। আমাদের সকল কর্মসূচী বিফল হয়ে যাবে যদি না এই দরিদ্র ভারতবাসীর অবস্থার যথার্থ উন্নতি না হয়। এই বিশদফা কর্মসূচীর সাফল্যের উপর দৃষ্টি রেখে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হোল। অবহেলিত এবং অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির উপর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে সর্বক্ষণ। ধনীর যাতে ধনস্ফীতি না হয় এবং দরিদ্র যাতে আর্থিক উন্নতি লাভ করে, তাহা এই কর্মসূচীর একটি বিশেষ প্রয়াস। অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দাম কমাবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকারের অনাবশ্যক ব্যয় কমানো হয়েছে। ভূমিহীন চাষীদের জমি দেওয়া হয়েছে। গৃহহীনদের গৃহ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। শহরের জমির উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কর ফাঁকি রোধ এবং চোরাকারবারি বন্ধের জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা করা হয়েছে। চাষী, কারিগর এবং ক্ষুদ্রশিল্পীর যাতে উন্নতি হয় তার জন্য ঋণ দানের ব্যবস্থা আছে। মধ্যবিত্তের আয়করের কিছুটা লাঘব করা হয়েছে। এমন কি ছাত্রদের সুখ-সুবিধার উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ছাত্রাবাসের জন্য কম দামে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ, কাগজ খাতা-পত্র সরবরাহ করা হয়। এ রকম বহু জনহিতকর দেশহিতকর কর্মধারা এই বিশ দফা কর্মসূচীতে রয়েছে।

আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র চিঠিখানা পড়ে এই কর্মসূচী সম্পর্কে তোমার খানিকটা ধারণা হবে।

আমরা এখানে সবাই ভাল আছি। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। গুরুজনদের প্রণাম দিও। ছোটদের ভালবাসা দিও। তুমি আমার ভালবাসা জেনো।

তোমার—কল্যাণ

দিল্লীর একটি পুরাকীর্তি দর্শন

ওঁ

স্নেহের তপন, ২২ রাজপুর রোড, দিল্লী-৫৪

তুমি আমায় দিল্লীর কথা লিখতে বলেছ। সে কি চিঠিতে লিখে শেষ করা যায়? এই শহরের বুক জুড়ে সাতটি দিল্লীর আট শ' বছরের কত কাহিনী ঘুমিয়ে আছে। তারা জাগ্‌লে কি আমার এই কাগজে কুলোবে? না, তা লিখবার শক্তি আমার আছে? যাক্ সে কথা।

আজ আমরা দিল্লীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তি কুতবমিনার দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। দিদি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দিল্লীর সমস্ত রাস্তাঘাট দিদি চমৎকার ভাবে চিনে নিয়েছে। অভিজ্ঞ মোটর-চালকের মতো গাড়ি চালাচ্ছিল। আমাদের মনে একটুও ভয় করেনি।

কুতবমিনার দিল্লীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তে। দিল্লী শহর এখানেও এগিয়ে এসেছে। কুতবমিনারের ছবি কত দেখেছি। কিন্তু এর সামনে এসে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। শুনলাম, এটি ২৮০ ফুট উচু, এর পাদদেশের ঘেড় ৪৭´ ৩´´, উর্ধ্বের ঘেড় ৯´। এটি নাকি দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের তৈরি বিজয়স্তম্ভ। ভারতের প্রথম মুসলিম শাসক কুতবউদ্দীন ও অন্যান্যদের হাতে এর নবীকরণ হয়। কুতবমিনারের পাশেই একটি প্রকাণ্ড মস্‌জিদের বিরাট ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ওখানে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে লেখা রয়েছে, ২৭টি হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করে এটি তৈরি হয়েছিল। এখনও মন্দিরের পাথরের স্তম্ভ, মূর্তি, নানা কারুকার্য ওতে বসানো রয়েছে। এই মস্‌জিদের চত্বরে দেড় হাজার বছর আগেকার হিন্দু রাজাদের একটি প্রকাণ্ড লৌহস্তম্ভ অক্ষত ভাবে দাঁড়ানো রয়েছে। এটির গায়ে সংস্কৃত শ্লোক খোদাই দেখতে পেলাম। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এত দিনেও এতে একটু মরচে ধরেনি বা কোন ভাঙাচোরা হয়নি।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আজ এখানেই শেষ করি। ইতি ১৮।১০।৭৫॥

তোমার
সুদত্তাদি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দুইটি চিঠি

(১) তাঁহার একান্ত সহকারী শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

বর্ষার মেঘ শান্তিনিকেতনের দিগন্তে নেমে এল, তোমার দেখা নেই কেন? শীঘ্রই আসবে আশা করে তোমার দু'খানা চিঠির জবাব দিই নি। তার উপর একখানা নাটক লেখায় ও আর একখানা নাটক অভিনয় ব্যাপারে ঘোরতর ব্যস্ত ছিলুম। তার উপরে চিঠি লেখা সম্বন্ধে আমার আলস্য প্রতি দিনই আমার প্রাপ্ত চিঠিপত্রের মতই আয়তনে বৃহৎ হয়ে উঠ্‌ছে। আশ্রমে দুই একটি বিদেশী অতিথি আসচেন, তুমি থাকলে তাদের জন্য ভাবতেই হ'ত না। আমার নূতন নাটকটি পড়া হয়ে গেল। ক্ষিতীশের তর্জমাগুলি বেশ হচ্চে। সমস্ত বলাকাটাই দেখচি এক রকম হয়ে এল। যাই হোক ওখানকার জলসমুদ্রের ধার থেকে এখানকার মৃৎসমুদ্রের ধারে আসবার জন্যে একবার পাড়ি দাও দেখি। এই বর্ষার সময়ে পুরী কি ভালো? ইতি

১৯ আষাঢ়, ১৩৩০। স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২) বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

বন্ধু,

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং। তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার চরণে হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভা-মণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে—'বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর। তোমার জয় হউক। নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোক-শিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর।'

তোমাকে বার বার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।

বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকি আছে। তোমার জয় সংবাদে আমার সেই উৎসব দ্বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ। অনেক ঝঞ্চাটের মধ্যে পড়িয়াছিলাম, আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত দুঃখ রহিল তোমার জয়ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকিতে এবং তোমার জয়লাভের পরে তোমার হস্ত স্পর্শ করিতে পারিলাম না।

তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরাকে তোমার জয় সংবাদ দিলাম। সে কিছুই বুঝিল না। যখন বুঝিবার বয়স হইবে তখন স্মরণ করিয়া খুসী হইবে।

এইবার বিবাহের আয়োজনে মন দেইগে। ইতি ২১শে জৈষ্ঠ (১৩০৮)

তোমার—রবীন্দ্রনাথ

স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের নিকট লিখিত

এলাহাবাদ
৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৪

প্রিয় ফকির,

একটি কথা তোমাকে বলি, উহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে, আমার সহিত তোমাদের আর দেখা না হইতে পারে—নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্যন্ত রাখিও না। ধর্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্যন্ত পাপচিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকেই ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে। নিজে মানুষ হও, আর রাম প্রভৃতি যাহারা সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকেও সাহসী, নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম নাই, ইহা ব্যতীত ধর্মের আর কোন মতামত তোমাদের জন্য নহে। যেন কাপুরুষতা, পাপ, অসদাচরণ বা দুর্বলতা একদম না থাকে। বাকি আপনা-আপনি আসিবে।

তোমার
নরেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন-পত্র

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত
১৩৩৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবসে
কলিকাতা টাউন হলের সভায় পঠিত।

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি, জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন, আজিকার এই জয়ন্তী তিথির স্মৃতি জাতীয় জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত সেবক না ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, ধ্যান ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্যপরিচয়ে কৃতার্থ হইয়াছি। হাত পাতিয়া আমরা জগতের কাছে নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে প্রশান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারংবার নমস্কার করি।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

রামেন্দ্রসুন্দরের অভিনন্দন-পত্র

১৩২১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য এক সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত এই প্রশস্তি পাঠ করেন।

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র,

পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি, তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি।

অজর, যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব-দিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতের উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশ-মাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি, এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়-পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমা দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধিনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে—

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘ জীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুগণের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

৫ই ভাদ্র, ১৩৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুভাষচন্দ্রের অভিনন্দন-পত্র

দেশ-গৌরব শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের করকমলে

হে দেশগৌরব, দেশবন্ধুর পবিত্র পিতৃভূমিতে আমরা তোমায় সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি। দেশবন্ধুর তুমি ছিলে দক্ষিণবাহু। দেশবন্ধুর বাংলার আজ সমস্যা-সংকুল সংকটকালে তুমিই সেই জননায়কের যোগ্যতম পতাকা-বাহী। আমরা তোমায় অভিনন্দিত করি।

হে ইতিহাস-স্রষ্টা, ইতিহাসের এক উজ্জ্বল বিকাশ-ভূমি এই ঐতিহাসিক জনপদ। অতীশ দীপঙ্করের জন্মপীঠ, চাঁদ-কেদার-ঈশাখাঁর কীর্তিভূমি, জগদীশ-মেঘনাদের জন্মভূমি, গোবিন্দদাস-দীনেশচরণের কাব্য-নিকেতন—ঢাকার অধিবাসী আমরা তোমায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

হে রাষ্ট্রপতি, তোমার সংগ্রামশীল নেতৃত্ব ভারতবর্ষের সমগ্র প্রাগ্রসর শক্তিকে প্রবল ও সংহত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। এই মহৎ প্রয়াসে অবাঞ্ছিত তিক্ততা ও বিরুদ্ধতা তোমার গতিরোধ করিয়াছে, তথাপি মুক্তি-সংগ্রামের শঙ্খ-ধ্বনি রুগ্নশয্যায়ও তোমায় কর্তব্য-পথে পরিচালিত করিয়াছে। হে নিষ্ঠাবান্ নায়ক, তোমায় অভিনন্দিত করি।

হে স্বপ্নদ্রষ্টা কর্মবীর, তোমার দার্শনিক চিত্ত একদিন 'তরুণের স্বপ্ন' দেখিয়াছিল। আজিকার অনিশ্চিত অনির্দেশ্য দুর্বল মুহূর্তে পশ্চিমের দুরন্ত হাওয়া যে সংস্কৃতি-সংকটের উদ্ভব করিয়াছে, এই আত্মিক মরণ হইতে তুমি স্বদেশকে রক্ষা কর। বিংশ শতাব্দীর মানুষ তোমার নিকট সমাধান ও সামঞ্জস্য দাবি করিতেছে।

হে মহানায়ক, নির্যাতন আর লাঞ্ছনা তোমার মুক্তিব্রতকে অনবনমিত রাখিয়াছে, তোমার অপরাজেয় কর্মশক্তি আজ যে 'ফরোয়ার্ড ব্লকের' পরিকল্পনা করিয়াছে, তাহা সাম্রাজ্যবাদের তীব্রতম প্রতিরোধ। আমাদের এই বহু-লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত জনপদ তোমার নায়কত্বের জয়ধ্বনি করিতেছে।

হে বাঙালী-শ্রেষ্ঠ, আজ বাংলার সমস্যার অন্ত নাই। ভিতরে ও বাহিরে, কার্যে ও কল্পনায়, মতে ও পথে, আমরা আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যাকুল। সীমাবদ্ধ আমাদের চেতনালোক। বাংলার রাজনৈতিক জীবন অস্বাভাবিক লঘিষ্ঠ-ও-গরিষ্ঠ ভাগে বিভক্ত হইয়া জাতীয় সংজ্ঞানকে সঙ্কুচিত করিতেছে। সকল ক্ষুদ্রতা হইতে তুমি আমাদের মুক্ত কর—দ্রঢ়িষ্ঠ ও পৌরুষ দীক্ষা দাও।

আজ অভিনন্দন লও বাঙালীর বাংলার—যে বাংলা পুষ্ট হইয়াছে ভীষণা পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর দুর্দান্ত প্রবাহ-ধারায়। হিন্দু-মুসলমানের দ্বৈত অবদানে গৌরবিত ঢাকা তোমায় অভিনন্দিত করিতেছে, জাহাঙ্গীরনগর তোমায় কুর্নিশ করিতেছে।

হে বীর, হে নেতা, শতায়ু হও। স্বদেশকে গৌরবের পথে পরিচালিত কর। আমরা তোমার পতাকাবাহী হইয়া ধন্য হই।

বন্দে মাতরম্

বুড়ীগঙ্গা-তীরে
৫ই জুন, ১৯৩৯

তোমার নেতৃত্ব-প্রতীক্ষায়
ঢাকার অধিবাসিবৃন্দ

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক লিখিত ও শ্রীনলিনীকিশোর গুহ কর্তৃক পরিদৃষ্ট।

কাজী নজরুলের একটি চিঠি

[হবীবুল্লাহ্ বাহার ও বেগম শামসুন্নাহার দুই ভাই-বোন 'বুলবুল' পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া এবং ছোটদের জন্য কতকগুলি বই লিখিয়া সে সময় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন।]

কৃষ্ণনগর
১১-৮-২৬ সকাল

স্নেহের নাহার,

কাল রাত্তিরে ফিরেছি কলকাতা হতে। চট্টগ্রাম হতে এসেই কলকাতা গেছলাম। এসেই পড়লাম তোমার দ্বিতীয় চিঠি—অবশ্য তোমার ভাবীকে লেখা। আমি তোমার প্রথম চিঠি পাই, সেদিনই—তখনই কলকাতায় যেতে হয়। মনে করেছিলাম কলকাতায় গিয়ে উত্তর দেবো। কিন্তু কলকাতার কোলাহলের মধ্যে এমনই বিস্মৃত হয়েছিলাম নিজেকে যে, কিছুতেই উত্তর দেবার অবসর ক'রে নিতে পারিনি। তা' ছাড়া ভাই, তুমি অত কথা জানতে চেয়েছ যে, কলকাতার হট্টগোলের মধ্যে সে বলা যেন কিছুতেই আসত না। আমার বাণী হট্টগোলকে এখন রীতিমত ভয় করে, মূক হয়ে যায় ভীরু বাণী আমার—ঐ কোলাহলের অনবকাশের মাঝে।...

কী যে করেছ তোমরা দুটি ভাই-বোনে যে, এসে অবধি মনে হচ্ছে যেন কোথায় কোন্ নিকটতম আত্মীয়কে আমি ছেড়ে এসেছি। মনে সদাসর্বদা একটা বেদনার উদ্বেগ লেগেই রয়েছে। অদ্ভুত রহস্যভরা এই মানুষের মন। রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যার, সে-ই কখন পথের সম্বন্ধকে সকল হৃদয় দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার ক'রে নেয়। ঘরের সম্বন্ধটা রক্তমাংসের, দেহের, কিন্তু পথের সম্বন্ধটা অন্তরতম-জনার। তাই ঘরের যারা, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, মেনে চলি, কিন্তু বাইরের আমার-জনকে ভালবাসি? তাকে না-মানার দুঃখ দিই। ঘরের টান কর্তব্যের, বাইরের টান প্রীতির—মাধুর্যের। সকল মানুষের মনে সকল কালে এই বাঁধনহারা মানুষটি ঘরের আঙিনা পেরিয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। যে-নীড়ে জন্মেছে এই পলাতক, সে নীড়কেই সে অস্বীকার করেছে সর্বপ্রথম উড়তে শিখেই! আকাশ আলো কানন ফুল, এমনি সব না-চেনা জনেরা হয়ে ওঠে তার অন্তরতম। বিশেষ ক'রে গানের পাখী যারা, তারা চিরকেলে নিরুদ্দেশ দেশের পথিক।...

এত কথা বললাম কেন, জান? তোমাদের যে পেয়েছি এই আনন্দটাই আমার এই কথা কওয়াচ্ছে, গান গাওয়াচ্ছে। বাইরের পাওয়া নয়, অন্তরের পাওয়া।...

সত্যি নাহার, আমায় তোমরা আদর-যত্ন করতে পারনি বলে যদি সত্যই কোনো সঙ্কোচের কাঁটা থাকে, 'তোমাদের মনে তবে তা' অসঙ্কোচে তুলে ফেলবে মন থেকে।

...লক্ষ্মীর ঝাঁপির কড়ি দিয়ে কবিকে অভি-বন্দনা করলে কবি তাতে অখুশী হয়ে ওঠে। কবিকে খুশী করতে হলে দিতে হয় অমূল্য ফুলের সওগাত। সে সওগাত তোমরা দিয়েছ আমার অঞ্জলি পুরে'। কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি, কবি চায় প্রীতি, কবি চায় পূজা। কবিত্ব আর দেবত্ব এইখানে এক। কবিতা আর দেবতা—সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় সুন্দর যা তাই দিয়ে।

... ...

আর কিছু লিখবার অবসর নেই আজ। মানসকমলে গন্ধ পাচ্ছি যেন, বোধ হয় বীণাপাণি তার চরণ রেখেছেন এসে আমার অন্তর শতদলে। এখন চললাম ভাই। চিঠি দিও শিগ্‌গীর। আমার আশিস নাও। ইতি

(সংক্ষিপ্ত)

তোমার—'নুরুদা'

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার আমাদের ছাত্রাবাসে শ্রীশ্রীবাগ্‌দেবীর অর্চনা করিতে মানস করিয়াছি। উক্ত দিবস আপনি সবান্ধব ছাত্রাবাসে আগমন করিয়া প্রতিমা দর্শন ও আমাদের আনন্দ বর্ধন করিবেন। নিবেদন ইতি ১৫ই মাঘ, ১৩৮১।

বাঘাযতীন ছাত্রাবাস

বিনীত
ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থিগণ

বিবাহের পত্র

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং

আগামী ২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার মালখাঁনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু ঠাকুরের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অনুপমার সহিত আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ অমলের শুভপরিণয় সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস মমালয়ে আগমন করিয়া বরযাত্রী অনুগমন ও বিবাহোৎসবে যোগদান করিলে একান্ত বাধিত হইব। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটী মার্জনীয়। নিবেদন ইতি ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২

দাশরা, কুচবিহার

বশংবদ
শ্রীযুগলকিশোর ঘোষ

বিবাহের দাওয়াত

বিস্‌মিল্লাহির রহমানর রাহীম
(সমস্ত প্রশংসা আল্লার)

জনাব,

তসলীম বাদ আরজ, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আজীজ আবদুর রহমানের সহিত ইছাপুর গ্রাম নিবাসী মৌলভী হাবিবুর রহমান সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা আজীজা শরীফা আখতারের শাদী মোবারক ধার্য করিয়াছি। আগামী ১১ই শাওয়াল, বাংলা ২৪শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, বাদ মঘরেব সময় মোতাবেক ওয়ালেদানসহ উক্ত বিবাহ-মজলিসে শরীক হইয়া আমাকে সরফরাজ করিবেন। আমার মুর্শিদাবাদস্থ ১১নং জরিয়াটুলীর বাসা হইতে সোমবার বেলা ছয় ঘটিকায় রওয়ানা হইয়া বরাত যথাসময়ে স্টেশনে পৌছিবে।

আয়ামে ওলীমা
নিজবাটিতে
বাদ মঘরেব আগামী বৃহস্পতিবার

আরজ-গুজার
খাকছার
আমীনুর রশীদ

কাজী নজরুলের একটি চিঠি

[হবীবুল্লাহ্ বাহার ও বেগম শামসুন্নাহার দুই ভাই-বোন 'বুলবুল' পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া এবং ছোটদের জন্য কতকগুলি বই লিখিয়া সে সময় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন।]

কৃষ্ণনগর
১১-৮-২৬ সকাল

স্নেহের নাহার,

কাল রাত্তিরে ফিরেছি কলকাতা হতে। চট্টগ্রাম হতে এসেই কলকাতা গেছলাম। এসেই পড়লাম তোমার দ্বিতীয় চিঠি—অবশ্য তোমার ভাবীকে লেখা। আমি তোমার প্রথম চিঠি পাই, সেদিনই—তখনই কলকাতায় যেতে হয়। মনে করেছিলাম কলকাতায় গিয়ে উত্তর দেবো। কিন্তু কলকাতার কোলাহলের মধ্যে এমনই বিস্মৃত হয়েছিলাম নিজেকে যে, কিছুতেই উত্তর দেবার অবসর ক'রে নিতে পারিনি। তা' ছাড়া ভাই, তুমি অত কথা জানতে চেয়েছ যে, কলকাতার হট্টগোলের মধ্যে সে বলা যেন কিছুতেই আসত না। আমার বাণী হট্টগোলকে এখন রীতিমত ভয় করে, মূক হয়ে যায় ভীরু বাণী আমার—ঐ কোলাহলের অনবকাশের মাঝে।…

কী যে করেছ তোমরা দুটি ভাই-বোনে যে, এসে অবধি মনে হচ্ছে যেন কোথায় কোন্ নিকটতম আত্মীয়কে আমি ছেড়ে এসেছি। মনে সদাসর্বদা একটা বেদনার উদ্বেগ লেগেই রয়েছে। অদ্ভুত রহস্যভরা এই মানুষের মন। রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যার, সে-ই কখন পথের সম্বন্ধকে সকল হৃদয় দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার ক'রে নেয়। ঘরের সম্বন্ধটা রক্তমাংসের, দেহের, কিন্তু পথের সম্বন্ধটা অন্তরতম-জনার। তাই ঘরের যারা, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, মেনে চলি, কিন্তু বাইরের আমার-জনকে ভালবাসি? তাকে না-মানার দুঃখ দিই। ঘরের টান কর্তব্যের, বাইরের টান প্রীতির—মাধুর্যের। সকল মানুষের মনে সকল কালে এই বাঁধনহারা মানুষটি ঘরের আঙিনা পেরিয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। যে-নীড়ে জন্মেছে এই পলাতক, সে নীড়কেই সে অস্বীকার করেছে সর্বপ্রথম উড়তে শিখেই! আকাশ আলো কানন ফুল, এমনি সব না-চেনা জনেরা হয়ে ওঠে তার অন্তরতম। বিশেষ ক'রে গানের পাখী যারা, তারা চিরকেলে নিরুদ্দেশ দেশের পথিক।…

এত কথা বললাম কেন, জান? তোমাদের যে পেয়েছি এই আনন্দটাই আমার এই কথা কওয়াচ্ছে, গান গাওয়াচ্ছে। বাইরের পাওয়া নয়, অন্তরের পাওয়া।…

সত্যি নাহার, আমায় তোমরা আদর-যত্ন করতে পারনি বলে যদি সত্যই কোনো সঙ্কোচের কাঁটা থাকে, 'তোমাদের মনে তবে তা' অসঙ্কোচে তুলে ফেলবে মন থেকে।

…লক্ষ্মীর ঝাঁপির কড়ি দিয়ে কবিকে অভি-বন্দনা করলে কবি তাতে অখুশী হয়ে ওঠে। কবিকে খুশী করতে হলে দিতে হয় অমূল্য ফুলের সওগাত। সে সওগাত তোমরা দিয়েছ আমার অঞ্জলি পুরে'। কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি, কবি চায় প্রীতি, কবি চায় পূজা। কবিত্ব আর দেবত্ব এইখানে এক। কবিতা আর দেবতা—সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় সুন্দর যা তাই দিয়ে।

… … …

আর কিছু লিখবার অবসর নেই আজ। মানসকমলে গন্ধ পাচ্ছি যেন, বোধ হয় বীণাপাণি তার চরণ রেখেছেন এসে আমার অন্তর শতদলে। এখন চললাম ভাই। চিঠি দিও শিগ্‌গীর। আমার আশিস নাও। ইতি

তোমার—'নুরুদা'

(সংক্ষিপ্ত)

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার আমাদের ছাত্রাবাসে শ্রীশ্রীবাগ্‌দেবীর অর্চনা করিতে মানস করিয়াছি। উক্ত দিবস আপনি সবান্ধব ছাত্রাবাসে আগমন করিয়া প্রতিমা দর্শন ও আমাদের আনন্দ বর্ধন করিবেন। নিবেদন ইতি ১৫ই মাঘ, ১৩৮১।

বাঘাযতীন ছাত্রাবাস

বিনীত
ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থিগণ

বিবাহের পত্র

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং

আগামী ২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার মালখাঁনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু ঠাকুরের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অনুপমার সহিত আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ অমলের শুভপরিণয় সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস মমালয়ে আগমন করিয়া বরযাত্রী অনুগমন ও বিবাহোৎসবে যোগদান করিলে একান্ত বাধিত হইব। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটী মার্জনীয়। নিবেদন ইতি ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২

দাশরা, কুচবিহার

বশংবদ
শ্রীযুগলকিশোর ঘোষ

বিবাহের দাওয়াত

বিস্‌মিল্লাহির রহমানর রাহীম
(সমস্ত প্রশংসা আল্লার)

জনাব,

তসলীম বাদ আরজ, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আজীজ আবদুর রহমানের সহিত ইছাপুর গ্রাম নিবাসী মৌলভী হাবিবুর রহমান সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা আজীজা শরীফা আখতারের শাদী মোবারক ধার্য করিয়াছি। আগামী ১১ই শাওয়াল, বাংলা ২৪শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, বাদ মঘরেব সময় মোতাবেক ওয়ালেদানসহ উক্ত বিবাহ-মজলিসে শরীক হইয়া আমাকে সরফরাজ করিবেন। আমার মুর্শিদাবাদস্থ ১১নং জরিয়াটুলীর বাসা হইতে সোমবার বেলা ছয় ঘটিকায় রওয়ানা হইয়া বরাত যথাসময়ে স্টেশনে পৌছিবে।

আয়ামে ওলীমা
নিজবাটিতে
বাদ মঘরেব আগামী বৃহস্পতিবার

আরজ-গুজার
খাকছার
আমীনুর রশীদ

সভা-সমিতির আমন্ত্রণ-পত্র

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আগামী ৯ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় শ্রীচৈতন্য-লাইব্রেরী-গৃহে সাহিত্য-পরিষদের এক সাধারণ সভা হইবে। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক সভাপতির আসন অলংকৃত করিবেন। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় 'শিশুর কবিতা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ইতি

ভবদীয়
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ
সম্পাদক, সাহিত্য-পরিষদ

কৃষ্ণনগর
৫ই বৈশাখ, ১৩৭৫

ওঁ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী রবিবার ৩রা চৈত্র (ইং ১৭ মার্চ ১৯৭৫) সন্ধ্যা ৬-৩০ সাড়ে ছয়টায় আমার পিতা পুণ্যপুরুষ গীতাশাস্ত্রী স্বর্গত জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার বাস-ভবনে পরম ভাগবত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীগীতা সম্বন্ধে ভাষণ দিবেন। আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব। নিবেদন ইতি ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৬৯ সাল।

৪১ গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা-১৯

বিনীত
শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

পর্বীয় সম্মেলন

আল্লাহু আকবর

ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নবি

বেরাদারানে ইস্‌লাম,

আগামী ১২ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক সোমবার দিন ঈদগাহের ময়দানে বেলা ৪ ঘটিকার সময় ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম উপলক্ষে এক বিরাট মহ্‌ফিলের আঞ্জাম করা হইয়াছে। উক্ত মহ্‌ফিলে সবান্ধব উপস্থিত হইয়া অশেষ সওয়াব হাসেল করিবেন।

আঞ্জুমান-তরক্কিয়ে-ইসলামের তরফ হইতে
খাদেমে-কওম
খাকছার গোলাম কিবরিয়া

বশীরহাট
২৪।৫।৭৬ ইং

সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ-পত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদা

শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহোদয়া

শ্রদ্ধাস্পদাসু

শ্রদ্ধাস্পদাসু

আমাদের ছাত্রী-সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব আগামী ২০শে অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহ এবার আপনি আমাদের উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। সংঘের পক্ষ হইতে আপনাকে আমরা এই নিবেদন জানাইতেছি। অনুগ্রহপূর্বক, আপনি স্বীকৃত হইলে একান্ত বাধিত হইব। পত্রোত্তরে আপনার সম্মতি জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বিনীতা

শ্রীসুরবালা গুপ্তা

সম্পাদিকা, ছাত্রী-সঙ্ঘ

বাঁকুড়া

২রা বৈশাখ, ১৩৮২

ঈদ-উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-পত্র

সুহৃদ্বর,

আকাশে ছোট্ট এক ফালি চাঁদ—কণ্ঠে তার

"ঈদ মোবারক"

স্মরণ করিয়ে দেয় দীর্ঘ এক মাসের সংযম সাধনা,

কৃচ্ছ্রতা ও ত্যাগ। মিলনের অগ্রদূত সে—ওর মত

সুন্দর, নির্মল ও নিরংকুশ যদি মানুষের মন হ'তো

তাহ'লে হয়ত এত হানাহানি, রক্তক্ষয় হ'তো না।

ঐটুকু চাঁদ যেন হাতছানি দিয়ে বলছে—

মনকে পবিত্র করো, মানুষে মানুষে মিলন হোক,

মানবতার জয় হোক! ঐ দিন আমার আলয়ে

আপনার দাওয়াত রহিল।

প্রীতি-মুগ্ধ

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

৫ পার্ক লেন, কলিকাতা-১৭

ডাকঘরের অভাব

তোমাদের গ্রামে একটি পোস্ট-আপিস স্থাপন করিবার আবেদন জানাইয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখ।

আনন্দবাজার পত্রিকা-সম্পাদক মহোদয়
সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকা মারফৎ আমরা মাণিকনগর গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ আমাদের এই অঞ্চলে একটি ডাকঘরের অভাব সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্তমানে সরকার পল্লীগ্রামের বিবিধ উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং অর্থব্যয়ও করিতেছেন—ইহা খুবই আশার কথা। বহুকাল হইতেই আমরা এখানে একটি পোস্ট-আপিসের অভাব বোধ করিয়া আসিতেছি এবং এই বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া কোন ফল হয় নাই। অঞ্চল-পঞ্চায়েতের পক্ষ হইতে আমরা ইতিপূর্বে সদরে জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদনও করিয়াছিলাম। তখন একবার ডাক ও তার বিভাগের একজন কর্মচারী এখানে আসিয়া তদন্তও করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত ইহার কোন সুরাহা হইল না এবং আমাদের আবেদন ও প্রয়োজন সম্পর্কে সরকার পূর্ববৎ নীরব রহিয়াছেন।

আমাদের এই অঞ্চল হইতে সদরের দূরত্ব যেরূপ তাহাতে এই গ্রামে একটি পোস্ট-আপিস স্থাপিত না হওয়ার জন্য এখানকার অধিবাসীদের দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন কর্মব্যপদেশে দূরদেশে রহিয়াছেন, তাঁহাদের খবরাখবর লইতে বা পাইতে আমাদের খুবই বিলম্ব হয়, ফলে অনেকেই মানসিক উদ্বেগ ভোগ করিয়া থাকেন। বাহির হইতে অনেকে তাঁহাদের পরিবারের পোষ্যবর্গের জন্য প্রতি মাসে মনি-অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়া থাকেন এবং ঐ টাকার উপর এই গ্রামের অনেকেরই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু একটি ডাকঘর না থাকার দরুণ ঐ টাকা বিলি হইতে অসম্ভব বিলম্ব হয় এবং সেই হেতু গ্রামবাসীদের বহুবিধ অসুবিধাও ভোগ করিতে হয়। এমন কি, বাহির হইতে কাহারও আত্মীয়-স্বজন টেলিগ্রাম পাঠাইলে, কিংবা এখানে হইতে বাহিরে কাহাকেও টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইলে উহা সাধারণ চিঠি-পত্রের ন্যায়ই ডেলিভারি দেওয়া হয়।

এই সব বিবিধ কারণে এবং এই গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা বিবেচনা করিয়া এইখানে অবিলম্বে একটি ডাকঘর স্থাপিত হওয়া দরকার। আমাদের বিনীত প্রার্থনা সরকার যেন বিষয়টি আর উপেক্ষা না করেন এবং আমাদের গ্রামের এই গুরুতর অভাবটি অবিলম্বে দূর করিতে সচেষ্ট হন। ইতি

মাণিকনগর
পোঃ কোদালিয়া, ২৪ পরগণা
১২।২।৭৬

মাণিকনগর গ্রামবাসীদের পক্ষে

তোমাদের গ্রামে শিক্ষামন্ত্রী আসিয়াছেন। তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য গ্রামের অভাব-অভিযোগের বর্ণনাসহ একটি অভিনন্দন-পত্র লিখ।

মাননীয়

শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সম্মানাস্পদেষু

হে সহৃদয় শিক্ষা-প্রেমিক,

আজ আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা যে কতদূর আনন্দিত, তাহা ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করা অসম্ভব। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামবাসীর সঙ্গতিও ক্ষুদ্র, তাই স্বভাবতঃই আপনার যোগ্য অভিনন্দনের অর্ঘ্য প্রস্তুত করিতে আমরা নিতান্তই অসমর্থ। আমাদের প্রয়োজনে যদি কোন ত্রুটি থাকে, আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন। আমাদের আন্তরিকতা ও সরলতা দিয়াই আপনাকে তাই স্বাগত জানাই।

শহর হইতে দূর গ্রামে আমরা বাস করি; তাই আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা বাহিরে বড় একটা প্রচারিত হইবার অবকাশ নাই। শুনিবার জন্য দরদী লোকও আমরা বড় বেশী পাই না। আজ তাই আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া দুই-একটি সুখদুঃখের কথা শুনাইব। আপনার সহৃদয়তাই এই বিষয়ে আমাদের উৎসাহ দিয়াছে।

আমাদের গ্রামের অভাব অনেক, গ্রামবাসীদের দুঃখও অনেক, কিন্তু তাহাদের অভিযোগের কণ্ঠ নীরব। বলিবার লোক নাই, শুনিবারও লোক নাই। সদরের সহিত এই গ্রামের সংযোগস্বরূপ একটি পাকা রাস্তার অভাবে আমরা যে কত অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকি, তাহা বলিবার নহে। বর্ষাকালে ইহার জন্যও আমাদের অবস্থা অবর্ণনীয় হইয়া উঠে। আমাদের গ্রামটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার লোকসংখ্যা সামান্য নহে—প্রায় পনর হাজার হইবে। অথচ এই বিরাট জনসমষ্টির প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় সাধারণ সুখ-সুবিধার কোন ব্যবস্থাই এখানে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি; প্রথমতঃ, আমাদের গ্রামে শিক্ষার জন্য উন্নত ব্যবস্থা হওয়া দরকার; একটি প্রাইমারি স্কুল এখন এই গ্রামের পক্ষে যথেষ্ট নহে; একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের গ্রামে একটি সাব-পোস্ট অফিসের বিশেষ অভাব রহিয়াছে—ইহা না থাকার দরুন গ্রামবাসীর বহু অসুবিধা। তৃতীয়তঃ, উপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকার দরুণ, এই গ্রামে মৃত্যুহার বাড়িতেছে। এজন্য কয়েকটি টিউবওয়েল দরকার।

আপাততঃ এই অভাবগুলি মোচন হইলে গ্রামবাসীর দুঃখকষ্টের কিছুটা লাঘব হইবে। আমাদের এমন সঙ্গতি নাই যে, নিজেদের চেষ্টায় আমরা ইহা সম্পন্ন করি। এক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য ভিন্ন কোন পথ নাই। আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মধ্যে পাইয়া নিজেদের দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া আপনার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিলাম; ইহার জন্য আপনি আমাদের ক্ষমা করিবেন। ইতি

আপনার গুণমুগ্ধ

১২।২।৭৬ মাণিকগঞ্জের অধিবাসিবৃন্দ

বাণিজ্যিক পত্রের একটি ছক

ফোন—৩৪-৪১৩৫ (১) প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

পত্রসংখ্যা

১৫ কলেজ স্কয়ার

পূর্বসূত্র ঃ

কলিকাতা-১২

(২) শ্রীঅশোকচন্দ্র রায়
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

(৩) সবিনয় নিবেদন,

বিষয় ঃ পুস্তক সরবরাহ

(৪)

নমস্কারান্তে। ইতি

(৫) বিনীতা
শ্রীসুদত্তা ঘোষ

ক্রোড়পত্র ঃ ১

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর পক্ষে

পোঃ রমনা

অমলচন্দ্র চৌধুরী

পত্রিকা-সম্পাদককে লিখিত চিঠি

মাননীয়,
'নবভারতী' সম্পাদক মহোদয়
মান্যবরেষু

সবিনয় নিবেদন,

এই সঙ্গে আমার লিখিত একটি প্রবন্ধ 'নবভারতী'তে প্রকাশার্থ পাঠাইলাম। যদি আপনাদের মনোনীত হয় তবে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। যদি প্রকাশযোগ্য মনে না করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় ফেরৎ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এই সঙ্গে ০.২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলাম। ইতি ৮ই মাঘ, ১৩৭৬

৪৯ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-২৯

বিনীত
শ্রীসুকুমার রায়

বই ছাপিবার জন্য প্রেসের নিকট চিঠি

মাননীয়

'প্রাচ্য মুদ্রণালয়ের' কর্মকর্তা মহোদয়

সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার মুদ্রণালয়ে আমি একখানি পুস্তিকা ছাপাইতে ইচ্ছা করি। উহা ডবল ক্রাউন সাইজের অন্যূন ৬ ফর্মা হইবে। ১১১০ কপি পাইকা অক্ষরে ছাপা হইবে। কাগজ, বাঁধাই ও ছাপা খরচ বাবদ মোট কত খরচ পড়িবে, অনুগ্রহপূর্বক জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

মালদহ

২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৫

বিনীত

মোঃ ফজলুর রহমান

উত্তর

প্রাচ্য মুদ্রণালয়

ফোন ৩৪-৪৭৩৫

৬৪, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-১২

২৮শে বৈশাখ, ১৩৭৫

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২৩শে বৈশাখের অনুগ্রহ-লিপি পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। আপনার পুস্তক আমরা আনন্দের সহিত যথাসময়ে পরিপাটীরূপে ছাপিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। এই সঙ্গে খরচের একটি হিসাব পাঠাইলাম।

আশা করি, আপনার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না। আমাদের ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিবেন। ইতি

বশংবদ

শ্রীসুশীলকুমার দাস

ক্রোড়পত্র—১

ম্যানেজার

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপিবার চিঠি

মাননীয়,

'বিশ্ববাণী'র কর্মকর্তা মহাশয়

মান্যবরেষু

সবিনয় নিবেদন,

সঙ্গের বিজ্ঞাপনখানি আপনার দেশখ্যাত পত্রিকায় আগামী মাস হইতে নিয়মিত ভাবে ছাপাইয়া বাধিত করিবেন। উহা সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা হইবে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞাপনের বিল পাঠাইলেই টাকা পরিশোধ করিয়া দিব। ইতি

ক্রোড়পত্র—১

১০ই মাঘ, ১৩৭৫

ভবদীয়

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভিঃ পিঃ যোগে পুস্তক পাঠাইবার অনুরোধ

মাননীয়,

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর

ম্যানেজার মহোদয় মান্যবরেষু

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ভিঃ পিঃ ডাকে অতি সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি ১৪ই আশ্বিন, ১৩৪৮

পোঃ ধামরাই

কুচবিহার

বিনীতা

শ্রীকিরণময়ী দেবী

পুস্তকের নাম

১। শ্রীগীতা—গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

২। ব্যায়ামে বাঙালী—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

৩। বিজ্ঞানে বাঙালী— ঐ

চাকুরীর বিজ্ঞাপন ও আবেদন

কর্মখালি

আমাদের পুস্তকসমূহ পাঠ্য ও বিক্রয় করিবার জন্য কয়েকজন সুদক্ষ ও কর্মপটু যুবক অবিলম্বে আবশ্যক। নির্দিষ্ট বেতন অথবা কমিশন হিসাবে কার্য করিতে পারিবেন। কর্মেচ্ছুকগণ প্রশংসাপত্র সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত সাক্ষাৎ করুন বা আবেদন করুন।

ম্যানেজার

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

আবেদন

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর ম্যানেজার

মহোদয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা চৈত্রের 'নব-ভারতী'তে দেখিলাম, আপনি কয়েকজন প্রতিনিধি চাহিয়াছেন। আমি উক্ত কর্মের জন্য একজন প্রার্থী। আমি গত ১৯৬৮ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়াছি। ক্যান্‌ভাসিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা এই বলিতে পারি যে, আমি কোন জীবনবীমা কোম্পানীর কার্য প্রশংসার সহিত করিয়াছি। এই সঙ্গে আমার কয়েকখানি প্রশংসা-পত্র পাঠাইলাম।

অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে আমাকে কার্যে নিযুক্ত করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব। পরিশেষে নিবেদন এই, আমাদ্বারা আপনাদের ব্যবসায়ের যাহাতে বিশেষ সুবিধা হয় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টার কোন ত্রুটি হইবে না। দয়া করিয়া পত্রোত্তরে আপনাদের সম্মতি জানাইলে আমি যাইয়া সাক্ষাৎ ভাবে আলাপ করিব।

পোঃ পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি

৭ই চৈত্র, ১৩৬৫

বশংবদ

শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর গুপ্ত

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞাপন

আগামী ২৯শে চৈত্র বারুণীমেলা ও স্নান উপলক্ষে তিন শত স্বেচ্ছাসেবক আবশ্যক। যাহারা স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিতে সম্মত আছেন, তাঁহারা ১৬ই চৈত্র মধ্যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্ব স্ব নাম তালিকাভুক্ত করিবেন। ইতি

মিউনিসিপ্যাল অফিস, হুগলী — শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৬২ — সম্পাদক, সেবক-সম্মেলনী

হারানো জিনিসের বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞাপন

গতকল্য সন্ধ্যার সময় গড়িয়াহাটের মোড়ে আমি একটি সোনার আংটি কুড়াইয়া পাইয়াছি। যিনি উহার প্রকৃত মালিক তিনি উপযুক্ত নিদর্শন দেখাইয়া আমার নিকট হইতে লইয়া যাইবেন। ইতি

৩৭ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯ — শ্রীমনোজ বসু

উত্তর

'বাংলার বাণীতে' দেখিলাম আপনি একটি আংটি পাইয়াছেন। আংটি আমারই, গতকল্য বই কিনিয়া কলেজ স্ট্রীট্ হইতে ফিরিতেছিলাম, সেই সময়ে উহা হারাইয়া গিয়াছে। আমার নিদর্শনস্বরূপ জানাইতেছি যে, উহাতে একটি A অক্ষর চিহ্নিত আছে এবং দুই পাশে দুইটি লাল রংএর পাথর বসান আছে। বলা বাহুল্য, উহা সোনার তৈরি। পত্রবাহকের নিকট উক্ত আংটি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। ইতি

শান্তিনগর — বিনীত
১০ই পৌষ, ১৩৮২ — শ্রীঅশোকচন্দ্র রায়

সভা-সমিতির বিজ্ঞাপন

সাধারণ সভা

বিষয়—পুরাণের শিক্ষা

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য এম. এ., পি. আর. এস্.

স্থান—আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ কলেজ

তারিখ—২০শে মার্চ, রবিবার

সময়—বৈকাল ৪ ঘটিকা

সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়

বিনীত
কুচবিহার — শ্রীউষারাণী রায়
১০ই মার্চ, ১৯৭৫ — সম্পাদিকা, সাহিত্য-সভা

চাকুরির দরখাস্ত

মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের সচিব মহোদয়ের বরাবরেষু—

সবিনয় নিবেদন,

অদ্যকার 'যুগান্তর' পত্রিকায় দেখিলাম যে, মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের আপিসের জন্য একজন ভালো বাংলা টাইপিস্ট আবশ্যক। উক্ত বিজ্ঞাপনে আরো জানিতে পারিলাম যে, উক্ত পদের জন্য মাসিক ২৫০·০০ টাকা হারে বেতন দেওয়া হইবে ও তৎসহ মাগ্‌গি ভাতা ৫০·০০। আমি এই পদের জন্য একজন প্রার্থীরূপে এই আবেদন করিতেছি।

আমার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার বিষয়ে শুধু এইটুকু নিবেদন করিতে চাই যে, আমি ১৯৫০ সালে মাধ্যমিক বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই ও তাহার পর ছয় মাস জুবিলি কমার্সিয়াল কলেজে টাইপিস্ট-এর কাজ শিক্ষা করি। আমি ইংরেজী ও বাংলা দুই রকম টাইপের কাজই জানি। বাংলায় আমি প্রতি মিনিটে ৩০।৪০টি শব্দ টাইপ করিতে সক্ষম।

কমার্সিয়াল কলেজ হইতে যথারীতি টাইপিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আমি গত পাঁচ বৎসর কাল বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরে বাংলা টাইপিস্টের কাজ করিয়া আসিতেছি। সর্বশেষ চাকুরী করি দায়রা জজের আদালতে। আমার যোগ্যতা সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সুপারিশ-পত্রগুলির নকল হইতে আপনি উহা অবগত হইতে পারিবেন।

বর্তমানে আমার বয়স চব্বিশ বৎসর তিন মাস। আমি একজন কর্মঠ ও স্বাস্থ্যবান্ যুবক। যদি আপনি আমাকে প্রার্থিত পদের জন্য মনোনীত করেন, তাহা হইলে আমি দায়িত্ব লইয়া বিশ্বস্তভাবেই আমার উপর ন্যস্ত কার্য সম্পাদন করিব, সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হইবে না। ইতি

২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৭

ঠিকানা—

ভবদীয় বিশ্বস্ত
শ্রীঅনল কুমার রায়

জ্ঞাতব্য তথ্য :

নাম : শ্রীঅনলকুমার রায়

ঠিকানা : নেতাজী সুভাষ রোড, বর্ধমান

শিক্ষা : উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ টাইপ জানা—ইংরেজী-বাংলা দুই প্রকার

অভিজ্ঞতা : ৫ বৎসর বিভিন্ন সরকারি ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং সর্বশেষ দায়রা জজ আদালতে টাইপিস্ট

বয়স ও স্বাস্থ্য : ২৪ বৎসর ৩ মাস। স্বাস্থ্যবান্, কর্মঠ

প্রশংসাপত্রাদির প্রতিলিপি (১)
(২)
(৩)

স্বাক্ষর ও তারিখ শ্রীঅনলকুমার রায়
২৫।৪।৫৭

বাকি টাকা আদায়ের তাগিদ চিঠি

শিবচরণ গঙ্গাচরণ দাস

২১৪ মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার), কলিকাতা-৭

পত্র নং ১০২ তাং ৯।৫।৭৬

ম্যানেজার, কমলা ভাণ্ডার

শিবতলা, চুঁচুড়া

সবিনয় নিবেদন,

আশা করি আপনারা কুশলে আছেন। বহুদিন হইল আপনাদের নিকট আমাদের অনেকগুলি টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে। পুনঃ পুনঃ পত্র দিয়া কোন উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি। বেশি দিন এইরূপ টাকা ফেলিয়া রাখা আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাদের নিকট মোট দুই হাজার পাঁচ শত পঁচিশ টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে। অবিলম্বে একাউণ্ট পেয়িং চেক-যোগে উহা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বর্তমানে আমাদের টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

আশা করি যথাসময়ে চেকটি পাঠাইয়া আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক সুদৃঢ় করিবেন। ইতি নমস্কারান্তে

বিনীত

শ্রীগঙ্গাচরণ দাস

ম্যানেজার

নূতন ব্যবসায়ের জন্য ঋণের আবেদন

অধিকর্তা, ক্ষুদ্রশিল্প
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
কলিকাতা

নেতাজী সুভাষ রোড
নাকতলা, কলিকাতা
৫।৭।৭৫

সবিনয় নিবেদন,

আমি ছোট মেশিনের ক্ষুদ্র অংশ তৈরীর একটি কারখানা খুলিতে চাই। আমার একার এরূপ সঙ্গতি নাই যে, নিজের অর্থে এই কারখানাটি খুলি। সেই জন্য আপনার নিকট আর্থিক সাহায্য ঋণ হিসাবে প্রার্থনা করি। আমার একটি বন্ধু আমার এই ব্যবসায়ে অংশীদার হিসাবে থাকিবে। বন্ধুটি যাদবপুর পলিটেকনিক হইতে বিশেষ যোগ্যতার সহিত ১৯৭৪ সালে পাশ করিয়াছে। তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং কুশলতা ও আমার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ব্যবসায়-বুদ্ধিতে আশা করি আমাদের এই ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিবে। সরকারের নিকট হইতে যে ঋণ লইব তাহা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শোধ করিতে পারিব বলিয়া ভরসা রাখি। বিশ দফা কর্মসূচীর অন্তর্গত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের পন্থাহিসাবে আমার এই আবেদন-পত্র আশা করি সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হইবে।

আপনার এই সহায়তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ রহিব। ইতি বিনীত

শ্রীঅভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬।৯।৭৬ ২ ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯

ক্ষতিপূরণের দাবি

কর্মাধ্যক্ষ,
বালুরঘাট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি
১১৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

২২ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
১৫।১।৭৬

সবিনয় নিবেদন,

গত ৬।১।৭৬ তারিখে আপনার কোম্পানীর মারফৎ আমরা তিন বাণ্ডিল পুস্তক আমাদের দার্জিলিং শাখায় পাঠাইয়াছিলাম।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ঐ তিন বাণ্ডিল মালই জলে ভিজিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহা আর বিক্রয়-যোগ্য নাই। আমাদের ঐ শাখার ম্যানেজার আপনাদের দার্জিলিং অফিসের কর্মকর্তার সহিত দেখা করিয়া চালানপত্রে ক্ষতির সম্পূর্ণ বিবরণ লেখাইয়া লইয়াছেন। প্রত্যেকটি বাণ্ডিলের গায়ে 'Books' লেখা ছিল। একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলে এইরূপ হইতে পারিত না।

যাহা হউক, এই মালের ইনসিওরকৃত মূল্য ৫,৫০০ টাকা ধার্য করা হইয়াছিল। উক্ত টাকা ইনসিওর কোম্পানী হইতে অতি সত্বর আদায় করিয়া আমাদিগকে প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। আশা করি, বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বিনীত
শ্রীবিভূতি রায়
কেম্‌ব্রিজ বুক এণ্ড ষ্টেশনারী কোং-র পক্ষে

টিকিটের মূল্য ফেরৎ

স্টেশন মাস্টার,
হাওড়া স্টেশন
পূর্ব রেলপথ, হাওড়া

৬৪ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
১০।৯।৭৬

সবিনয় নিবেদন,

আমি হাওড়া হইতে দিল্লীগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের চেয়ার-কারে ১২।৯।৭৬ তারিখের একটি অগ্রিম টিকিট আপনার ফেয়ারলি প্লেস অফিস হইতে ক্রয় করিয়াছি। আমার টিকিটের নম্বর…………।

কিন্তু ঐ তারিখে ব্যবসা-সংক্রান্ত একটি জরুরি মিটিংএ আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। সুতরাং ঐ নির্দিষ্ট দিনে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হইতেছে না।

আশা করি, আপনি আমার এই অসুবিধার কথা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন। এই দরখাস্তের সহিত টিকিটটি ফেরৎ পাঠাইলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভবপর আপনি আমার টিকিটের মূল্য ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

নমস্কার জানিবেন। ইতি

বিনীত
শ্রীঅশোক রায়

বই-এর এজেন্সীর জন্য

জগদীশ প্রকাশন
১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২

তাং ২৮।৬।৭৬

ম্যানেজার, মডার্ন পাব্লিশার্স
কনট প্লেস, নয়াদিল্লী-১ বিষয় : এজেন্সী

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা পাইয়াছি। তালিকাটি দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে, আপনাদের বইর বাজারে যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম হয়ত জানেন। আমরা ষাট বছরের উপর এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছি এবং আমাদের কাজ প্রতি বছরই বাড়িয়া চলিয়াছে।

আমরা আপনাদের পুস্তকের এজেন্সী প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের নিকট হইতে অন্ততঃ ২৫% কমিশন পাইব আশা করি। মাল প্রেরণ ও অন্যান্য ব্যয় অবশ্য আপনারা বহন করিবেন, তাহা লেখা নিষ্প্রয়োজন।

আশা করি আমাদের ব্যবসায়ের সমস্ত খবরাখবর লইয়া আপনি আমাদের এই এজেন্সীটি দিতে দ্বিধা করিবেন না। ইহাতে আপনার এবং আমাদের উভয়ের ব্যবসার উন্নতি হইবে। নমস্কার জানিবেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীঅনুপম রায়, ম্যানেজার

ব্যাঙ্ক হইতে ওভারড্রাফ্‌ট

এজেন্ট
ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
ধনেখালি ব্রাঞ্চ, হুগলি

সবিনয় নিবেদন

কুটির-শিল্প-জাত দ্রব্যের চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের 'তাঁতশিল্প সমবায়' গত দুই বৎসর যাবৎ ধনেখালি ও টাঙ্গাইল শাড়ীর ব্যবসায় আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ব্যবসা বাড়াইতে হইলে আমাদের আরো বেশী মূলধনের দরকার।

এজন্য আপনাদের অনুরোধ করিতেছি যে, আমাদের তৈরী পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের টাঙ্গাইল শাড়ী আপনাদের নিকট গচ্ছিত রাখিব। ইহার পরিবর্তে আমাদের পনের হাজার টাকা ওভারড্রাফ্‌ট দিবার ব্যবস্থা করিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

পত্রে আপনাদের মতামত জানিতে পারিলে আমরা সেই অনুসারে কাজে অগ্রসর হইব। আশা করি আপনাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না। আমাদের কুটীর-শিল্পকে সাহায্য করিলে প্রকৃত পক্ষে ভারত-সরকারের ২০ দফা কার্যসূচীকে উৎসাহিত করা হইবে। নমস্কার জানিবেন। ইতি ২৫।৮।৭৬ ইং

নিবেদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বসাক
তাঁতশিল্প সমবায়ের পক্ষে

অনুশীলন

১। তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়া কোন বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

২। চাকুরি বা ব্যবসা কোন্‌টি তুমি পছন্দ কর তাহার সপক্ষে যুক্তি দিয়া একটি চিঠি তোমার পিতাকে লিখ।

৩। তোমাদের পল্লীতে একটি অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে, উহার কথা, দূরের বন্ধুকে চিঠিতে লিখ।

৪। সম্প্রতি যে সিনেমা দেখিয়াছ সে সম্বন্ধে মতামত তোমার বন্ধুকে লিখ।

৫। বন্যায় তোমাদের গ্রামাঞ্চলের অবস্থার কথা কোন বন্ধুকে চিঠিতে লিখ।

৬। তোমাদের বোনের নিকট একটি পত্র লিখ, কেন তাহার উচ্চশিক্ষা লাভ করা উচিত।

৭। ছুটিতে যেখানে বেড়াইতে গিয়াছিলে, তাহার বিবরণ একখানি চিঠিতে তোমার কোন আত্মীয়কে লিখ।

৮। তোমাদের গ্রন্থাগারের চাঁদার জন্য আবেদন লিখ।

৯। রেল স্টেশনের কোন কর্মচারীর দুর্ব্যবহারের কথা জানাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখ।

১০। কোন পত্রিকার আপিসে সহকারী সম্পাদক আবশ্যক লিখ। বিজ্ঞাপন লিখ। দরখাস্ত লিখ।

১১। মেলায় ভাই হারাইয়াছে। ভাই-এর বর্ণনা দিয়া সন্ধানের জন্য পত্রিকায় প্রকাশার্থ বিজ্ঞাপন ও তৎসহ পত্র লিখ।

১২। ব্যাঙ্কের করণিকের জন্য দরখাস্ত লিখ।

১৩। টাইপিস্ট পদের জন্য কোন সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে দরখাস্ত লিখ।

১৪। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-সংগঠকের (Sales organiser) পদের জন্য দরখাস্ত লিখ।

১৫। কোন সেলাই কল বা কোন বেবিফুডের প্রস্তুতকারকের নিকট তোমার শহর বা জেলার এজেন্সীর জন্য দরখাস্ত লিখ।

১৬। ডুয়ার্স অঞ্চলের আনারসের উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য ও কর্জের জন্য আবেদন-পত্র লিখ।

১৭। কাজু বাদামে যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার হয়, এবং কাঁথির সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল ইহার চাষের বিশেষ উপযোগী—এই যুক্তি দেখাইয়া তোমাদের যৌথ কারবার মারফত কাজু বাদাম আবাদ বাড়াইবার নিমিত্ত বা ঋণের জন্য সাহায্যার্থে কোন ব্যাঙ্কের নিকট আবেদনপত্র লিখ।

১৮। সাইকেল পার্টস তৈরির একটি কারখানা প্রতিষ্ঠাকল্পে ঋণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন-পত্র লিখ।

গল্প লেখা

প্রস্তাবনা। গল্প শুনিবার আগ্রহ মানুষের মধ্যে শিশুকাল হইতে দেখা যায়। শিশুরা গল্প শুনিতে ভালবাসে। গল্প শুনিতে কে না ভালবাসে? তবে গল্প বলিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। কেহ কেহ সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া সুন্দর একটি গল্প বলিতে বা লিখিতে পারেন। ছোট গল্প লিখিতে হইলে কেবলমাত্র কতকগুলি ঘটনার সন্নিবেশ করিলেই গল্প লেখা হয় না। গল্প লিখিবার সময় কতকগুলি স্থূল বিষয় মনে রাখিতে হইবে।

কাহিনী বা প্লট। প্রথমে গল্পের কাহিনীটি বা প্লট মনে মনে ঠিক করিতে হইবে। বাস্তব ঘটনার সহিত কল্পনার মিশ্রণে গল্পের মনোহারিত্ব বাড়িবে। কাহিনীটি গতিশীল হইবে। কোন ঘটনা অহেতুক দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা না করাই ভাল। গল্পটি পড়িতে পড়িতে যেন পাঠক ক্লান্ত হইয়া না পড়ে। ঘটনাগুলি পর পর এক একটি অনুচ্ছেদে সাজাইয়া লিখিতে হইবে। যাহাতে পাঠকের কৌতূহল বা ঔৎসুক্য ক্রমবর্ধমান হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

চরিত্র, নায়ক, পরিবেশ। গল্পের চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। নায়কের চরিত্র ঘিরিয়া অন্য চরিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিবে। গল্পের প্রধান ব্যক্তি বা নায়কের চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেন হয়।

পরিবেশ বর্ণনার সময় খুব সাবধানে ও দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিতে হইবে। বর্ণনার ছবিটি পাঠকের মনে যেন সুন্দরভাবে ফুটিয়া ওঠে। ছোট গল্প আয়তনে ছোট হইলেই সার্থক ছোট গল্প হইবে না। কাহিনীটি যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং চরিত্রগুলি এরূপ জীবন্ত হইবে যাহাতে পাঠক পড়িতে পড়িতে উহাদিগকে আশেপাশের মানুষ বলিয়া চিনিতে পারে। গল্পটি যেন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুসংবদ্ধ হয়।

গল্পের একটি বক্তব্য বা শিক্ষা থাকে। গল্প মানুষকে আনন্দ দান করে, নীতি শিখায়।

ভাষা ও শব্দ। গল্পের ভাষা সহজ সরল ও শুদ্ধ হওয়া দরকার। ভাষার সরলতা ও ভাব প্রকাশের সুন্দর ভঙ্গি পাঠকের হৃদয় হরণ করে। যথাযথ শব্দ সংযোজন অর্থাৎ যেখানে যে শব্দটি দিলে সবচেয়ে বেশি মানায় সেই শব্দটি দিতে পারিলে গল্পটির সাহিত্যিক মূল্য অনেক বাড়িবে।

মাত্রাজ্ঞান। গল্পটি লিখিবার সময় মাত্রাজ্ঞান থাকা দরকার। যতটুকু বলিলে ভাল হয় এবং যতটুকু উহ্য রাখিলে শোভন হয়, তাহাই করা দরকার।

ছোট গল্প। গল্প বলিতে আমরা ছোট গল্প বুঝি, ইংরেজীতে যাহাকে বলে Short story। ছোট গল্প উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয়। সংক্ষিপ্ততাও ইহার মূল লক্ষণ নয়। ছোট গল্প অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হইবে না, আবার অতিরিক্ত দীর্ঘও

হইবে না। মোট কথা, ইহা নাতিসংক্ষিপ্ত, নাতিদীর্ঘ। কাহিনী, চরিত্রায়ণ ও পরিবেশে ইহা জমাট-বাঁধা বা ঐক্যবদ্ধ (organic unity) হইবে এবং ইহাতে সামগ্রিকতার ভাব (totality, organic whole) পরিস্ফুট হইবে।*

গল্প লেখার সাধনা। কি ভাবে গল্প লিখিতে পারা যায়, সে বিষয়ে মোটামুটি উপদেশ অনুসরণ করা যায় মাত্র, কিন্তু উহার ছক্-কাটা সুনির্দিষ্ট রাজপথ নাই। বিভিন্ন লেখকের বিচিত্র মনন, ভাব, আদর্শ, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ, জ্ঞান, কল্পনাশক্তি ইত্যাদি গল্প লেখাকে প্রভাবিত করে। গল্প রচনায় বাস্তব ও কল্পনার সমাবেশে উহার ঔৎকর্ষ ঘটে। আধুনিক খ্যাতনামা গল্প-লেখকদের আত্মকথা হইতেও আমরা তাহাদের প্রেরণা ও পদ্ধতির বৈচিত্র্য জানিতে পারি (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২, ১৩৮৩ সাল দ্রষ্টব্য)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি অভিনন্দন-সভায় বলিয়াছিলেন, তিনি যখন প্রথম জীবনে ব্রহ্মদেশে ছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বহুবার নকল করিতেন।

গল্প লেখাও পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-সাপেক্ষ। প্রতিভাশালী লেখককেও অশেষ শ্রম করিতে হয়। অবশ্য প্রতিভাবান্ লেখকের লেখার স্বাভাবিক প্রবণতা তাহাদিগের দ্রুত উন্নতির সহায়ক হয়। জনপ্রিয় ইংরেজ গল্পলেখিকা এনিড ব্লাইটন অজস্র গল্পের বই লিখিয়াছেন। এত লেখা কি করিয়া সম্ভবপর হইল, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, সমগ্র গল্পটি ছবির মতো তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে এবং তিনি টাইপ মেশিনে টক্‌টক্ করিয়া অঙ্গুলি চালাইয়া যান।

নব্য লেখকদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নব্য লেখকদের প্রতি যে অমূল্য উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুসরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন—"যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন, তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না।"

"অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে ; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে

---

*A true short-story is something other and something more than a mere story which is short.

A true short-story differs from the novel chiefly in its essential unity of impression.

In a far more exact and precise use of the word, a short-story has a unity as a novel cannot have it.

(*Brander Mathews—The Philosophy of the Short-story*)

আপনিই আসিয়া পৌছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই।"

"সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা, যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।"

প্রাচীন কালের গল্পকথা। গল্প বলা ও গল্প লেখার রেওয়াজ প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। ভারতবর্ষে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, কাশ্মীরী কবি সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর' প্রাচীন ও বিরাট্ গল্প-সংগ্রহ। একাদশ শতকে কাশ্মীর-রাজ অনন্তের মহিষী সূর্যমতীর চিত্তবিনোদনের জন্য কবি সোমদেব-কর্তৃক পৈশাচী ভাষায় রচিত 'বৃহৎকথা' গ্রন্থের সার-সংকলন করিয়া ২১৩৮৮ শ্লোকে 'কথাসরিৎ-সাগর' রচিত হয়। বৃহৎকথা বহুদিন পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছে। উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র ও বেতালপঞ্চবিংশতির বহু কাহিনী ইহার অন্তর্ভুক্ত। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা, বৌদ্ধ জাতকের গল্প, হিতোপদেশ, পৌরাণিক কাহিনীগুলি, কাদম্বরী (শুকপাখীর মুখে গল্পের ভিতর গল্পের লহরী) প্রভৃতি অজস্র কাহিনীর গ্রন্থ এদেশে শিক্ষিত ও সম্পন্ন লোকদের যুগ যুগ ধরিয়া আনন্দ ও শিক্ষা দান করিয়াছে। পরবর্তী কালে গোপীচন্দ্রের গান, মৈমনসিংহ-গীতিকা, ঠাকুরমার ঝুলি প্রভৃতি এদেশে ছোট-বড় সকলেরই আনন্দ যোগাইয়াছে। মনোরঞ্জনের সব চেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ আরব্য রজনীর অপূর্ব কাহিনীমালা বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই প্রচারিত। উহাতে সেকালের গল্প-বলিয়েদের যে উচ্চ মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা ছিল, তাহারই একটি গল্প এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

একজন গল্প-বলিয়ের কাহিনী

শাহরাজাদী সুলতান শাহরিয়ার নির্দেশে তার গল্প শুরু করল বটে, কিন্তু সে রাত্রে কাহিনী আরম্ভ করার আগেই ভূমিকা করে নিল,—জাহাঁপনা, আজ যে তাজ্জব গল্প আপনাকে শুনাতে যাচ্ছি দুনিয়ায় তার আর জুড়ি নাই। মূল কাহিনী শুরু করবার আগে এটা কেমন করে আমি জানলাম সেই কথাটাই বলে নিই।

বহু যুগ আগে খোরাশান আর পারশ্যের অশেষ গুণের অধিকারী এক সুলতান ছিলেন, নাম ছিল কিন্দামির।

সব চেয়ে বেশি ভালবাসতেন তিনি গল্প শুনতে—নিত্য নতুন গল্প। আল্লাহ্ তাঁর স্মৃতিশক্তিও দিয়েছিলেন অদ্ভুত। বহু দিন আগে শোনা গল্পও তিনি একটুও ভুলতেন না। সুতরাং এমন দিন একদিন এসে গেল যে তাঁর দরবারে অনেক কথক থাকলেও—তাদের ঝুলিতে আরব, পারশ্য, ভারতের যত গল্প ছিল সব তাঁর শোনা হয়ে গেল।—এখন উপায়?—নতুন গল্প, ভাল গল্প না শুনতে পারলে যে তাঁর কোন কিছুই ভাল লাগে না।

একদিন সুলতান তাঁর দরবারের সেরা কথক, গল্পের যাদুকর, সবচেয়ে বেশি পেয়ারের আবু আলিকে ডেকে পাঠালেন।

সে সুলতানের সামনে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। সুলতান বললেন—শোন ওস্তাদ, কেন তোমায় আমি ডেকেছিঃ তুমি একদিন তোমার গল্পের যাদু দিয়ে আমায় মুগ্ধ করে রাখতে। কিন্তু এখন আর তা তুমি পার না। তোমার থলি শূন্য। যাহোক রোমাঞ্চকর কাহিনী না শুনে জীবনের দিনগুলি আর আমার কাটতে চাইছে না। তাই তোমার মুখে এখন আমি একটা নিখুঁত নিটোল গল্প শুনতে চাই। যদি শোনাতে পার তা হলে—বলে রাখছি তোমায় আমি অনেক ধন-দৌলত দেব। শুধু তাই নয়, তোমাকে আমি আমার প্রধান উজীর করে আমার ডাইনে বসাব।

আর তোমার নসিব যদি মন্দ হয়, আমার এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা মেটাবার রসদ যদি তুমি না জোগাড় করতে পার তা হলে আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেও বলতে বাধ্য হচ্ছি—তোমার আপনজনের কাছ থেকে তোমায় বিদায় নিয়ে আসতে হবে, তোমায় শূলে চড়াব আমি।

সুলতানের কথা শুনে আবু আলির বুকে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল, তবু সে কোন রকমে একটু সাহস সঞ্চয় করে হাত জোড় করে বললে—যো হুকুম, খোদাবন্দ, অনেক নিমক খেয়েছি আপনার। আপনার এ হুকুম তামিল করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্যই করব, শুধু একটি জিনিস ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।

কি ?

একটি বছর সময় চাইছি, জাহাঁপনা, এই এক বছর পরে যদি আপনাকে নতুন গল্প শুনাতে না পারি, আর শুধু তাই নয়, সে গল্প যদি তাজ্জব না হয়, আপনার মনোরঞ্জন করতে না পারে—তা হলে আমায় যে শাস্তি হয় দেবেন।

সুলতান কিন্দামির বললেন, বেশ তাই হবে। তবে একটি শর্ত আছে আমার, এই এক বছর তুমি বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না। আবু আলি শুনে সুলতানের দুই হাতের সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আবু আলি বাড়ি এসে অনেক ভেবে ভেবে শেষে তার পাঁচটি বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গোরা বান্দাকে ডেকে প্রত্যেকের হাতে পাঁচ হাজার দিনারের এক একটা থলি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, বসোরার হাসানের কাহিনী এক বছরের মধ্যে সংগ্রহ করে আনতে। এদের মধ্যে চার জনই শূন্য হাতে ফিরে এল। কিন্তু মোবারক এখনও ফেরেনি। এই একটু ক্ষীণ আশা।

ওদিকে মোবারক দামস্কাসে এসে শহরের গল্পদাদু শেখ ইশাকের সন্ধান পেল।

শেখ ইশাকের বাড়ীতে এসে মোবারক দেখে তাঁর বাইরের যে মস্ত বড় ঘরটায় বসে তিনি গল্প বলেন সেটা লোকে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। দীপ্ত-চক্ষু সৌম্য মূর্তি, শেখ ঘরের ঠিক মধ্যিখানে একটা উঁচু বেদীতে বসে অনেক আগেই তাঁর কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন—এ গল্প অবশ্য আরম্ভ হয়েছে কয়েক মাস আগে। তার গুণমুগ্ধ ভক্ত শ্রোতারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এ গল্পের পরবর্তী অংশ শুনতে ছুটে আসে। মোবারক এসেই লক্ষ্য করেছে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর অতীব মধুর, উদাত্ত, গম্ভীর—ভাবাবেশে পরিবর্তনশীলও বটে। মোবারক যখন ঘরে ঢুকল তখন গল্প প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

শ্রোতারা সব উঠে শেখ ইশাককে সেলাম করে একে একে সরে পড়তে লাগল। আর সবাই চলে গেলে মোবারক উঠে শেখের কাছে গিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর কর চুম্বন করে বললে, ওস্তাদ, আমি বিদেশী, অনেক দূর দেশ থেকে আপনার কাছে এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

শেখ ইশাক অতি মধুর স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, বল কি তোমার উদ্দেশ্য—তুমি কি চাও? মোবারক বললে, সুদূর খোরাসনের কথক আবু আলি আমার মনিব, তিনি আমার হাত দিয়ে এক হাজার দিনারের একটি থলি আপনাকে উপহার পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে হাল দুনিয়ার সেরা কথক বলে জানেন, তারই মান্য দিতে তাঁর এ প্রচেষ্টা।

প্রসন্ন মুখে শেখ বললেন—আবু আলির গল্প বলার খ্যাতি আমারও কানে এসেছে—সুতরাং তাঁর এ উপহার বন্ধুর উপহার মনে করে আমি সাদরে গ্রহণ করলাম, কিন্তু প্রতিদানে আমিও যে তোমার হাতেই কিছু পাঠাতে চাই তাঁকে, বল দুনিয়ার কোন জিনিস তোমার মনিবের বেশি পেয়ারের, কি পেলে তিনি খুশী হন, তাই বলো তুমি, আমি তাই পাঠাব।

শুনে মনে মনে খুশী হল মোবারক, তার উদ্দেশ্য তা হলে সিদ্ধ হবে, মুখে বললে, হুজুর, খোদার দোয়া আসমানের পানির মত ঝরে পড়ুক আপনার শিরে। আমার মনিব আলি আপনার কাছ থেকে একটু নূতন গল্প পেলে সুলতানকে শুনিয়ে খুশী করতে পারেন, এই জন্যই তিনি আমায় পাঠিয়েছেন। বসোরার হাসানের কাহিনীটা যদি আপনার জানা থাকে—তা হলে সেইটা পেলে তাঁর দিলটা জবর খুশী হয়।

শেখ প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে বললেন, বহুৎখুব, পাবে তুমি সে গল্প আমার কাছে থেকে। আমি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ সে গল্প জানে না। তোমার মনিবের সশ্রদ্ধ উপহারে আমি এত খুশী হয়েছি যে, এ গল্প তোমায় আমি দেব—শুধু দেব না—এর ভাব ভঙ্গী ঘটনার প্রতিটি কথা যথাযথ ভাবে লিখিত অবস্থায় তোমায় দেব—কিন্তু একটি শর্তে: সে শর্তটা হচ্ছে কোন অরসিক জনকে যেন এ গল্প শোনানো না হয়।

মোবারক খোদার কসম নিয়ে শর্তটা মেনে নিলে শেখ ইশা তাকে কালি কলম কাগজ দিয়ে বললেন, আমি বলে যাচ্ছি, তুমি লেখ।

মোবারক শেখের হুকুমে খুশী মনে লেখা শুরু করল। তার পুরো সাত দিন সাত রাত্রি লাগল বসোরার হাসানের কাহিনী লিখে নিতে। মোবারেক মনে মনে আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ওস্তাদ শেখের কর চুম্বন করে সেলাম জানিয়ে গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে খোরাসানের দিকে ছুটল।

এদিকে সুলতানের দেওয়া এক বছর মেয়াদের দশ দিন মাত্র বাকী আছে অথচ মোবারক এখনও ফিরে এল না দেখে আবু আলি তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আপনজনের কাছে থেকে বিদায় নিচ্ছেন। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এমন সময় ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ কানে যেতে সবাই তাকিয়ে দেখে পাণ্ডুলিপির

খাতাটা ডান হাতে উঁচিয়ে ধরে মোবারক ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। মোবারক এসে ঘোড়া থেকে নেমে মনিবের কর চুম্বন করে তার হাতে পাণ্ডুলিপির খাতাটা দিলে, ওর প্রথম পৃষ্ঠায়ই বড় বড় হরফে লেখা—বসোরার হাসানের কাহিনী।

এই অমূল্য সম্পদ হাতে পেয়ে আবু আলি তখনই উঠে মোবারককে আলিঙ্গন করে তাঁর নিজের আচকান তাঁর গায়ে পরিয়ে দিলেন, তা ছাড়া তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাকে বান্দাগিরি থেকে মুক্তি দিলেন। এরপর তিনি ঐ পাণ্ডুলিপি নিজের হাতে সুন্দর করে স্পষ্ট করে নকল করলেন। বছর যেদিন শেষ হতে যাচ্ছে সেদিন তিনি পাণ্ডুলিপিটি এক সোনার পেটরায় পুরে নিয়ে সুলতানের সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

আবু আলি গল্প এনেছে, সুলতান তাঁর উজির আমীর ওমরাহ কঞ্চুকী আর শহরের সব কবি জ্ঞানী গুণীজনদের ডাকলেন। সভা জমজমাট হলে সুলতান আবু আলিকে বললেন, ওস্তাদ, তুমি তোমার গল্প শুরু করো।

আবু আলি তখন তার সোনার পেটরা খুলে পাণ্ডুলিপি বের করে তার প্রথম পৃষ্ঠা পড়লে—দ্বিতীয়, তৃতীয়, সুলতান আর অন্যান্য শ্রোতাদের মাঝে তখন বিপুল হর্ষে জয়ধ্বনি শুরু হয়ে গেছে—আবু কাহিনী বর্ণনায় যত এগুচ্ছেন ততই তাঁদের আনন্দ ঘনীভূত হচ্ছে—সবাইর দিলে নেশা লেগে গেছে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়ার পর গল্প যখন শেষ হল তখন সুলতান আনন্দে একেবারে দিশেহারা। এমন গল্প হাতে থাকলে মনে আর তাঁর কোন ব্যাজার ভাব থাকবে না, মন মিইয়ে পড়লেই গল্পটা আবার পড়িয়ে শুনবেন, সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তাঁর চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আবু আলির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে তিনি তখনই উঠে সকলের সামনে তাঁকে প্রধান উজির করে নিজের আচকান খুলে তাঁর গায়ে পরিয়ে দিলেন। আর এই গল্পের পাণ্ডুলিপিটা তিনি নিজের কুতুবখানায় বন্ধ করে রাখলেন। এটা হয়ে রইল তাঁর মন খারাপের মোক্ষম দাওয়াই।

শাহরাজাদী বললেন, জাহাঁপনা, বসোরার হাসানের এই তাজ্জব গল্পটাই যথাযথ আপনাকে আজ শোনাতে যাচ্ছি। যথাযথ বলছি এই জন্য যে সুলতান কিন্দামিরের কুতুবখানায় রাখা সেই গল্পের হুবহু নকল আমার কাছে আছে।

এবার আরম্ভ করছি, জাহাঁপনা—শুনুন—দুনিয়া শোন।

আরব্য রজনী—শ্রীতারাপদ রাহা (সংক্ষেপিত)

ভিতর ও বাহির

আমাদের মন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহিরের—অন্য ভাগ ভিতরের। মনের যে দিক্‌টা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক, তাহা সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সব সময়ে সামাজিক এবং সভ্য নয়—তাহার চাল-চলন চিন্তা-প্রণালী বিচিত্র। বাহিরের মনের কার্যকলাপ দেখিয়া, ভিতরের মন কখনো হাসে, কখনো কাঁদে—এবং কচিৎ সায় দেয়। দুই ভাগের কলহও নিত্য নৈমিত্তিক।

রামকিশোর বাবুর ভিতরের মনটা বহুকাল অবধি মৃতপ্রায়। বাহিরের মনের অত্যাচারে সেটাকে জর জর করিয়া তুলিয়াছিল। রামকিশোর বাবু উকিল। খুনীকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-সাক্ষী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হইয়া গরীব প্রজার সর্বনাশ সাধন, জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শ দান ইত্যাদি সর্বপ্রকার কার্যেই তিনি বাহিরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য লইয়াছিলেন। ভিতরের মনটা প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল—আজকাল সে কিছু করে না।

সেদিন সকালে রামকিশোর বাবু তাঁহার কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একজন বিধবার সম্পত্তি-ঘটিত মামলায় তাঁহাকে কিছু কাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে। আজ সেটা কোর্টে উঠিবে—সেজন্য তিনি একটু যেন উদ্বিগ্ন আছেন—অন্যমনস্ক ত বটেই।

এমন সময় আর একজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ের পরামর্শ লইতে চাহেন। রামকিশোর বাবু ভদ্রলোককে চিনিতেন না। সুতরাং অসঙ্কোচে বলিলেন, "আইন সক্রান্ত কোন পরামর্শ দিতে হলে আমি 'ফী' নিয়ে থাকি, জানেন তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কত দিতে হবে আপনাকে?"

"বত্রিশ টাকা।"

"আচ্ছা বেশ।"

উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন—"আমার একজন বন্ধু আছেন—তাঁর একমাত্র ছেলের বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বছর। সন্তানাদি আজও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ—তাদেরও মত, ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।"

"ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান তো?"

"হ্যাঁ, ছেলের কোন রোগ নাই।"

"আমার কাছে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান?" বলিয়া রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানী হইতে এক টিপ নস্য গ্রহণ করিলেন।

"এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জান্‌তে আসা যে যদি বংশ লোপই পায়, তা'হলে শেষ পর্যন্ত সম্পত্তিটা কা'রা পাবে?"

নস্যের টিপটা নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোর বাবু বলিলেন, ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান্ তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। 'হিন্দু ল' অনুসারে তা'তে কোন বাধা নেই।"

"তা তো নেই! কিন্তু আইনের বাধা না থাকলেও সব সময় কি সব জিনিস করা সম্ভব?"

রামকিশোর বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেন্টিমেণ্ট অনুসারে চল্‌লে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই? ঐ সব বাজে সেন্টিমেণ্ট নিয়েই তো আমরা ডুবতে বসেছি।"

রামকিশোর বাবু সেন্টিমেন্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা জোগাইল। ভিতরের মন নির্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন, "ধরুন, যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তা হ'লে সম্পত্তিটা কা'রা পাবে?"

আইন অনুযায়ী যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে, রামকিশোর বাবু তাহা গড়্ গড়্ করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলিতে ছাড়িলেন না। "ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার তো শ্মশান। আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাকে বল্‌লাম—আপনার সেন্টিমেন্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাফ করবেন।"

আগন্তুক বলিলেন, "না—না—কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি বলেই ত আপনার কাছে আসা।"

বত্রিশ টাকা 'ফী' দিয়া ভদ্রলোক বিদায় হইলেন।

চার পাঁচ দিন পরে একদিন একটি গাড়ী আসিয়া রামকিশোর বাবুর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে একটি অল্প-বয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোর বাবু বিপত্নীক। বাড়ীতে ঠাকুর চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোড়া চাকর মাত্র আছে। রামকিশোর বাবু কোর্টে। ছোড়া চাকরটা ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপর নাম লেখা 'সরোজিনী দেবী'।

ব্যবহারে বুঝা গেল, ছোড়া চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তা' ছাড়া তরুণীটির ব্যবহারেও সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরে বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায়?"

"বাবু কাছারীতে।"

"কখন আসবেন?"

"জানি না।"

তাহার পর তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

রামকিশোর বাবু, কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, একি সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে?"

"ও বাড়ীতে থাকা আমার পোষাবে না।"

"কেন, ব্যাপার কি?"

রামকিশোর বাবু, কন্যার ব্যবহারে ক্রমশঃই বিস্মিত হইতেছিলেন।

"পোষাবে না মানে?"

"ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে। তুমি ত মত দিয়েছ।"

"আমি মত দিয়েছি, মানে ?"

"ওরা একজন অচেনা লোক—তোমার কাছে পাঠিয়ে তোমার ঠিক মতটা জেনে নিয়ে গেছে। অন্ততঃ তাই ত শুন্‌লাম। তুমি নাকি বলেছ, ছেলের বিয়ে দেওয়াই ভাল ?"

রামকিশোর বাবুর নেপথ্যবাদী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে। হতবাক্ রামকিশোর তাঁহার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুমি বলেছ বাবা ?"

—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় [বনফুল]

রামকানাইর নির্বুদ্ধিতা

এদিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল, তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজ লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন—কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতে ছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভায়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই। এবং সকাল সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন। এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ বিফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। নির্জীব হস্তে গুরুচরণ যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলো কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পান্তাভাত খাইয়া স্ত্রী যখন আসিলেন, তখন গুরুচরণের বাক্‌রোধ হইয়াছে দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাঁহারা বলিল, "মায়াকান্না।" কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল, বলিল, "মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার চাঁদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন—এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজবউ, তোমার ত বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন ? দাদা গেলেন, এখন আমিতো রহিয়া গেলাম, তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে, অবসর মতো আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল, তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব, মুখাগ্নি কে করে—এবং শ্রাদ্ধ-শান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়। গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেটাতে তার বিশেষ

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড় হস্তে কহিলেন, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে-উইল আমি নিজ হস্তে লিখিয়াছি, এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে-উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আংশিক)

শুকপক্ষীর আত্মকথা

[বাণভট্টের সংস্কৃত গদ্য গল্পগ্রন্থ 'কাদম্বরী'র তারাশঙ্কর তর্করত্ন কর্তৃক বাংলা সংস্করণ হইতে ইহা সংকলিত। শুকপক্ষী কিরূপে দুরন্ত ব্যাধের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া ঋষিকুমার হারীতের আশ্রয়ে নব জীবন পাইল, শুক স্বমুখে বলিতেছে।]

গোদাবরী নদীর তীরে ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমের অনতিদূরে পম্পা নামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকাতে, বোধ হয় যেন আলবাল রহিয়াছে। ঐ তরুর কোটরে, শাখাগ্রে ও বল্কল-বিবরে কুলায় নির্মাণ করিয়া শুক-শারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ সুখে বাস করে।

সেই মহীরুহের এক জীর্ণ কোটরে আমার পিতামাতা বাস করিতেন। মাতা আমাকে প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তথাপি স্নেহ-বশতঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমন করিবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না; তথাপি আস্তে আস্তে সেই তরুতলে নামিয়া পক্ষিকুলায়ভ্রষ্ট যে যৎকিঞ্চিৎ আহার-দ্রব্য পাইতেন, তাহাই আমাকে আনিয়া দিতেন। আমার আহারাবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহাই আপনি ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।

একদা নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে শাল্মলী বৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কোটরে রহিয়াছে ও আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ভয়াবহ মৃগয়া-কোলাহল শুনিতে পাইলাম। আমি সেই কোলাহল শ্রবণে ভয়-বিহ্বল ও কম্পিত-কলেবর হইয়া পিতার জীর্ণ পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম।

মৃগয়া-কোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায় বিকটমূর্তি এক সেনাপতি-সমভিব্যাহারে কতকগুলি কুরূপ ও কদাকার শবর সৈন্য আসিতেছে। মৃগয়া-জনিত শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আমাদিগের আবাসতরুতলের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল, অনতিদূরস্থিত সরোবর হইতে জল ও মৃণাল আনিয়া পিপাসা ও ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল। শ্রান্তি দূর করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

শবর সৈন্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ সেদিন কিছুই শিকার করিতে পারে নাই ও মাংস প্রভৃতি কিছুই পায় নাই। সে উহাদিগের সঙ্গে না গিয়া তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলে দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে, রক্তবর্ণ দুই চক্ষু দ্বারা সেই তরুর মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত একবার নিরীক্ষণ করিল। তাহার নেত্রপাত মাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষিশাবকদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। হায়, নৃশংসের অসাধ্য কি আছে। সেই কণ্টকাকীর্ণ দুরারোহ মহীরুহে সে অবলীলাক্রমে আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষিশাবকদিগকে ধরিয়া একে একে প্রাণ-সংহারপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে অকস্মাৎ এই বিষম সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে পিতা নিতান্ত ভীত হইলেন। প্রতিকারের কোনো উপায় না দেখিয়া তিনি আমাকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিলেন ও আপন বক্ষঃস্থলের নিম্নে লুকাইয়া রাখিলেন। আমাকে যখন পক্ষ-পুটে আচ্ছাদন করেন, তখন দেখিলাম, তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে জলধারা পড়িতেছে। নৃশংস ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কুলালয়ের সমীপবর্তী হইল, এবং কালসর্পাকার বাম কর কোটরে প্রবিষ্ট করিয়া পিতাকে ধরিল। তিনি চঞ্চুপুট দ্বারা যথাশক্তি আঘাত করিলেন; কিন্তু কিছুতেই সে ছাড়িল না, তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিম্নে নিক্ষেপ করিল। পিতার পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলাম বলিয়া সে আমাকে দেখিতে পাইল না। ঐ তরুতলে শুষ্ক পর্ণরাশি একত্রিত ছিল, আমি তাহারই উপর পতিত হইলাম,—অধিক আঘাত লাগিল না।

অধিক বয়স না হইলে অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হয় না। কিন্তু ভয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া থাকে। শৈশব-প্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে স্নেহসঞ্চার না হওয়াতে কেবল ভয়েরই পরতন্ত্র হইলাম। প্রাণ পরিত্যাগের কালেও মৃত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মন্দ মন্দ গমন করিয়া নিকটস্থ এক তমাল তরুর মূলদেশে লুকাইলাম। এমন সময়ে সেই নৃশংস চণ্ডাল শাল্মলী বৃক্ষ হইতে নামিয়া পক্ষীশাবকদিগকে একত্রিত ও লতাপাশে বদ্ধ করিল এবং যে-পথে শবর সৈন্যেরা গিয়াছিল, সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল।

দূর হইতে পতিত ও ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে আমার কলেবর কম্পিত হইতেছিল। আবার বলবতী পিপাসা কণ্ঠশোষ করিল। এতক্ষণে পিশাচ অনেক দূর গিয়া থাকিবে এই সম্ভাবনা মনে করিয়া তমাল-মূল হইতে নির্গত হইলাম ও আস্তে আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম: কি আশ্চর্য্য! যত দুর্দশা ও যত কষ্ট সহ্য করিতে হউক না কেন, তথাপি কেহ জীবনতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমার সমক্ষে পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বচক্ষে দেখিলাম। আমিও বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায় হইয়াছি; তথাপি বাঁচিবার বিলক্ষণ বাসনা আছে। সেইরূপ অবস্থাতেও আমার জল পান করিবার অভিলাষ হইল। দূর হইতে সারস ও কলহংসের অনতি-পরিস্ফুট কলরব শুনিয়া অনুমান করিলাম, সরোবর দূরে আছে। কিরূপে সরোবরে যাইব, কিরূপে জল পান করিয়া প্রাণ বাঁচাইব, তাহাই আমি ভাবিতে লাগিলাম।

সেই স্থানের অনতিদূরে জাবালি নামে মহাতপা মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র হারীত সেই দিক্ দিয়া সরোবরে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। সাধুদিগের চিত্ত স্বভাবতঃই দয়ার্দ্র। আমার সেইরূপ দুর্দশা ও যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে করুণার উদয় হইল; তিনি আমাকে ভূতল হইতে তুলিলেন। তাঁহার করস্পর্শে আমার উত্তপ্ত গাত্র কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। অনন্তর সরোবরে লইয়া গিয়া তিনি আমার মুখ উন্নত ও চঞ্চুপুট বিস্তৃত করিয়া বিন্দু বিন্দু বারি প্রদান করিলেন। পরে আমাকে স্নান করাইয়া নলিনী-পত্রের শীতল ছায়ায় বসাইয়া রাখিলেন।

সীমা

সীমাকে নিয়ে অসীম দুঃখের মধ্যে পড়লাম। যখন আমার স্ত্রী সুজাতা ছিলো, তখন সীমার জন্য এতটুকুও চিন্তা করতাম না। শ্বাস-প্রশ্বাসের মত সংসারের কাজকর্ম নিখুঁত ভাবে চলতো। এর জন্য যে কেউ পরিশ্রম করছে অথবা কষ্ট করছে, তা একবারও ভাবিনি।

সীমাকে নিয়ে কত খেলা করেছি, কত আদর করেছি। পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসিয়েছি। হাত থেকে জিনিষ কেড়ে নিয়ে কাঁদিয়েছি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, যেই সে কেঁদেছে, তাকে মায়ের কোলে ফেলে পালিয়ে গেছি। সীমার অসুখ হ'লে, রাত জেগে পাহারা দিতে চেষ্টা করতাম। হাসিমুখে সুজাতা হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে বলতো, 'যাও ঘুমোও গিয়ে, দরকার হলে ঠিক তোমাকে ডেকে দেব।'

কিন্তু কোন দিনই সে ডেকে দেয় নি। জেগে দেখতাম ভোর হয়ে গিয়েছে। চার দিক আলোয় ঝলমল করছে। সীমা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। বোধ হয় জ্বর কমেছে। সুজাতা নিয়মিত কাজ করছে।

সীমার বয়স যখন ছয়, তখন অকালে সুজাতা আমাদের ছেড়ে চলে গেল। সীমা মাকে হারিয়ে আমার বুকে এসে পড়লো। তাকে বুকে টেনে নিলাম। আমার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখলাম। যেমন স্নেহ ছাড়া শিশু মানুষ করা যায় না, শুধু স্নেহ দিয়েও তো শিশুকে বড় করা যায় না। সংসারে শত সহস্র কাজ আছে। সে সব কাজ করতে পারলে তবে আমি সীমার মায়ের স্থান নিতে পারবো। সব করবো ভাবি, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারি না। ভোরে উঠে ভাবি, আজ এমন করে সব কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে করবো যে সীমাকে কোন জিনিষ চাইতে দেব না। সব না চাইতে ওর হাতের কাছে এনে দেবো।

ভোরে উঠে কাগজ পড়তে বসেছি। খানিকটা কাগজ পড়া হতে সীমা এসে বল্লে, 'বাবা, ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' তাড়াতাড়ি উঠে খেতে দিতে গিয়ে দেখি কিছুই এনে রাখিনি। দুধটা ষ্টোভে জ্বাল দিয়ে ওকে বাটিতে ঢেলে খেতে দিলাম।

সীমা মুখ নীচু করে রইল। টপ্ টপ্ করে চোখ দিয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়তে লাগলো। আমি হক্‌চকিয়ে গেলাম, বুকে টেনে নিয়ে বললাম, 'কি হয়েছে মা, বল দেখিনি। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

অনেক সাধ্য-সাধনার পর সীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, 'শুধু দুধ, আমি খাই না। বাটিতে দুধ খাই না। অমনি বাজে করে খেতে দিলে আমি খাই না।'

সীমাকে বুকে চেপে ধরে পিঠে হাত বুলাতে লাগলাম, অবাধ্য চোখের জলকে আর ধরে রাখতে পারলাম না।

প্রায় প্রতিদিনই আমি সীমার কাছে হেরে যেতে লাগলাম। মাতৃহারা সীমার মাতা হ'তে পারলাম না। পত্নীহীন স্বামীর অভিভাবক সীমাই হয়ে উঠতে লাগলো। যে সীমা নিজের কোন কাজ করতে পারতো না; সেই সীমা ধীরে ধীরে আমার খবরদারি করতে লাগলো।

স্কুলে শিক্ষকতা করি। গরীব শিক্ষক, মেয়ের জন্য অথবা সংসারের সকল কাজ করবার জন্য ঝি রাখতে পারি না। ঠিকে ঝি এসে দু'বেলা কাজ করে দিয়ে যায়। আর আমি অপটু হাতে কোন রকমে সংসারের বাকি কাজ ক'রে নি। ধীরে ধীরে সীমা যেন তার অবস্থাটুকু বুঝে নিল। এখন আর 'বাজে' করে খেতে দিলে কাঁদে না, উপরন্তু আমাকে কাজে সাহায্য করে।

এমনি করে আমার দিনগুলি মন্থর গতিতে চলতে লাগলো। স্কুলে গিয়ে এক দিন শুনলাম, আমাকে বি. টি. পড়তে যেতে হবে। হেড্ মাস্টার মহাশয়ের কাছে গিয়ে বললাম, 'মেয়েটা আছে, আমার বড় অসুবিধা।' 'চান্স পেয়েছেন যখন তখন পড়াই উচিত' বলে তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন।

পড়া আরম্ভ করলাম। বহু দিন পর নূতন করে ছাত্র-জীবনের আস্বাদ ভালই লাগল। অনেক দিনের পর যেন রস জমিতে বর্ষণ হোল। কাজে অকাজে হৈ চৈ করতে আরম্ভ করলাম। যে কাজের জন্য ছাত্রদের তিরস্কার করি, প্রায় সে রকম কাজই অনেক সময় করে বসতাম। কিসের জন্য জানি না আমাকে জেনারেল সেক্রেটারী করে দিল। নিজের পড়াশুনা বাদে বহু রকম কাজ বাড়ীতে জুটিয়ে নিয়ে আসতাম। সন্ধ্যা থেকে বন্ধু-বান্ধব আসতো। গল্প-গুজব করে যখন চলে যেত, তখন আমিও অবসন্ন আর সীমাও ঘুমে ঢুলুঢুলু। অনেক দিন রাতে সীমার খাওয়া হোত না। দেরী করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে অনেক টানাটানি করেও সীমাকে খাওয়াতে পারতাম না।

মেগাজিনে লেখা দিয়ে আমার বেশ প্রশংসা হোল। লেখায় উৎসাহ পেলাম। নানা রকম প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলাম। কলেজে আমার নাম-যশ হোল।

সকাল বেলা বারান্দায় বসে একটা লেখা লেখছি, হঠাৎ সীমার দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা কেমন করে উঠলো। সীমাকে বড় অসহায় ও মলিন দেখাচ্ছিল। কাছে ডেকে বললাম, 'তোর কি হয়েছে রে? এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'কিছু হয়নি বাবা। আমি ভাল আছি।'

সীমা, সেও আমার কাছে গোপন করছে। সীমা আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে! না না, আমি সীমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। সীমার পড়াশুনার খবর করি না, সে কি খাচ্ছে কি করছে, কিছু খবর রাখি না। কলেজ আর নাম-যশ নিয়ে একেবারে মগ্ন হয়ে আছি। এক এক বার মনে হয়, সীমার প্রতি যথেষ্ট নজর দিচ্ছি না। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আবার ভুলে যাই। যেমন ভাবে চলছিলাম, তেমনি করে চলতে থাকি।

অসোয়াস্তিকর অবস্থা কাটিলে মিসেস্ ল্যাংগলি স্বামীর নিকট আগাইয়া আসিলেন, তখন তিনি কথা শুরু করেন।

আত্মবিশ্বাস অর্জনের পন্থা। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে হইলে আত্মবিশ্বাস চাই। তাহা কিরূপে অর্জন করা যায়? প্রথমতঃ, যত বেশি সম্ভব সভা-সমিতেতে নিয়মিত যাইতে হয় এবং অংশ গ্রহণ করিতে হয়। হয়ত একদিন সভায় দাঁড়াইয়া বলিলে, "সভাপতি মহোদয়, আমি সানন্দে প্রস্তাবটি সমর্থন করছি।" এই সামান্য কথায় তোমার ভয় ভাঙ্গিল। তোমার নিজের কথা প্রকাশ্যে জনসভায় শুনিলে। ইহার পরের সভায় দুই মিনিট বলিবার সুযোগ পাইলে। ইহার পর হইতে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে তোমার বক্তৃতার উন্নতি হইতে থাকিবে। আর একটি কাজ করিবে। তোমার বক্তৃতার ত্রুটি তুমি নিজে ধরিতে না পারিলে তোমার কোন বিশ্বাসী বন্ধুকে সভায় নিবে। তোমার বলার ত্রুটিগুলি তাহাকে লক্ষ্য করিতে বলিবে। তোমার কথা হলের সর্বত্র শোনা গিয়াছে কিনা, তুমি কি মৃদুভাবে বলিয়াছ, অথবা বেশি জোরে বলিয়াছ, তোমার অঙ্গভঙ্গি কিংবা ত্রুটি ইত্যাদির সমালোচনা শুনিবে। প্রথম প্রথম তৈয়ারি বক্তৃতা দ্বারা অথবা স্লাইডের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করা ভাল।

বক্তৃতা শিক্ষা। জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে অভ্যস্ত হইবার পর বক্তৃতার টেকনিক আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহা বাড়িতে করিতে হইবে। একটি ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া কোন ভাল গদ্য রচনা উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে থাক। আয়নার সামনে দাঁড়াইবে, বইটি বাঁ হাতে ধরিবে, ডান হাত ঘুরানো-ফেরানোর জন্য মুক্ত রাখিবে। বক্তৃতার সময় ডান হাতটি কর্মরত থাকিবে, কিন্তু উহার গতি যাহাতে অতিরিক্ত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকিবে।

কোন গদ্য রচনা পড়ার পর, তোমার নিজের তৈয়ারি একটি ভাষণ পড়িবে। মনে রাখিবে, যেন শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা দিতেছ। ৫।৭ বার বলার পর তোমার উন্নতিতে নিজেই অবাক্ হইবে। এইরূপ নানা বিষয়ে নিজের তৈয়ারি ভাষণ পড়ার অভ্যাস করিতে করিতে তোমার বলিবার ভঙ্গী আকর্ষণীয় হইবে, উচ্চারণ স্পষ্ট হইবে এবং তোমার কণ্ঠস্বরে কোন জড়তা থাকিবে না।

গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত বাগ্মী ডিমস্থিনিস প্রথম বয়সে তোতলা ছিলেন। তিনি পর্বত বেষ্টিত নির্জন প্রান্তরে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা অভ্যাস করিতেন। দীর্ঘকাল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে তিনি পৃথিবীর খ্যাতনামা বাগ্মী হন।

উচ্চারণ ও শব্দ-সম্পদ্। তোমার উচ্চারণ ও শব্দ-সম্পদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সাধারণ কথাবার্তায় আমরা যে সকল শব্দ বলি এবং যে ভাবে উচ্চারণ করি, বহুজনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেগুলি সব সময় সে ভাবে বলা চলে না। শ্রোতাদের মধ্যেও সমালোচক থাকেন। শব্দ ব্যবহার যথাযোগ্য হইলে তোমার বক্তৃতাও আকর্ষণীয় হইবে। এজন্য তোমার বলাও যেরূপ ভাল হইবে, শব্দ-ব্যবহারও যথাযোগ্য হইবে। ভাল বক্তা হইতে হইলে ক্রমশঃ শব্দসম্পদ্ বাড়াইতে হইবে। এজন্য যথেষ্ট পড়াশুনা করা প্রয়োজন। ইহাতে জ্ঞানের পরিধিও বাড়িবে যাহা বক্তার একটি বিশেষ সম্পদ। কঠিন

ও আভিধানিক শব্দের পরিবর্তে সহজ শব্দ ব্যবহার করিবে। অনেকের শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকে বলিয়া ঠিকশব্দ ব্যবহারে ভুল হয়। যেমন, সদৃশার্থক শব্দের বেলায় হয় (ক্ষমতা প্রভাব শক্তি ; অপরাধ দোষ পাপ ; অর্থী অর্থবান ; শরীরী শারীরিক ; নিদ্রিত নিদ্রালু ; উপকরণ উপাদান ইত্যাদি)। বিশিষ্টার্থক শব্দ বা বাক্যাংশ এবং প্রবাদ বা প্রবচন ব্যবহারে, বাংলা কবিতার ছত্র বা সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি স্থলে বক্তৃতার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য যেন থাকে। মহাপ্রাণ বর্ণ, শিশ্‌ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, র ড় প্রভৃতি স্থলে উচ্চারণে সতর্ক থাকিবে। স্পষ্ট উচ্চারণ বক্তৃতায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। উচ্চারণে প্রাদেশিক টান যেন না থাকে।

ভাল কণ্ঠস্বর ও বাগ্মিতাশক্তি ভাল বক্তৃতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই দুইটি শিক্ষার জন্য রেডিও বা টেলিভিশনে স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিবে এবং তাহা নিজে অভ্যাস করিবে। শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ভাষা অনুকরণ করিবে।

বক্তৃতা তৈয়ারি করা। বক্তৃতা তৈয়ারি তিন ভাবে করা যায়। প্রথম, বক্তব্য বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া ঠিক করা এবং বক্তৃতার সময় হইলে বলিয়া যাওয়া। এটি অভিজ্ঞ বক্তারা অনুসরণ করেন। কিন্তু নূতনদের পক্ষে ইহা গ্রহণীয় নয়। কেননা তাহারা যাহা কিছুই চিন্তা-ভাবনা করিয়া প্রস্তুত হোন না কেন, বলিতে উঠিলেই সব তালগোল পাকাইয়া যায় এবং নিজেদের সম্মুখে শতসহস্র শ্রোতার মুখ দেখিয়া মস্তিষ্ক একেবারে শূন্য হইয়া যায়। এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পন্থাটি হইল, বক্তব্য বিষয়ে কি কি বলিতে হইবে তাহা চিন্তা করিয়া এক খণ্ড কাগজে শিরোনামা দিয়া পর পর সংকেত-সূত্রগুলি লেখা। এই কাগজখণ্ড বক্তৃতার সময় অত্যন্ত কাজের হয়। বক্তৃতা লাইনচ্যুত হয় না, শিরোনামাগুলি উহা ঠিকপথে চালাইয়া লইয়া যায়। এই পন্থাই সর্বোৎকৃষ্ট।

তৃতীয় পন্থায় সমগ্র বক্তৃতাটি লিখিয়া তৈয়ারি করা এবং নিজে ঘরে বসিয়া বারংবার জোরে জোরে পড়া, যাহাতে উহা প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। বক্তৃতা শুরু করার কিছু আগে উহা পড়িয়া নিলে বলার সময় বক্তব্য বিষয় পর পর মনে পড়িবে এবং বক্তৃতাশক্তিও জাগিয়া উঠিবে। ভাষণটি সুলিখিত হইলে শ্রোতাদের মনে ভাল প্রতিক্রিয়া হইবে।

ভাষণের বিভিন্ন অংশের শিরোনামা। নিম্নলিখিত কয়টি ভাগে ভাষণটিকে ভাগ করা যায়।—(১) সাধারণ উপক্রমণিকা, (২) বক্তব্যের বিশেষ বিবৃতি, (৩) যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, (৪) উহার সার-সংক্ষেপ (৫) এই সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ (evidence) হইতে যে সিদ্ধান্তে (conclusion) উপনীত হওয়া গেল তাহার ব্যাখ্যা, (৬) সমর্থনের জন্য শ্রোতাদের নিকট আবেদন।

বক্তৃতার উপক্রমণিকা যেরূপ চিত্তাকর্ষক হইবে, বক্তার উপসংহার বা শেষ আবেদন ততোধিক আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বক্তার প্রস্তাবের সমর্থনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের উপর না রাখিয়া খানিকটা শ্রোতাদের ওপরও ছাড়িয়া দিতে হয়, যাহাতে বাড়ি যাইয়াও শ্রোতারা বিষয়টি ভাবিতে থাকে। সবশেষে একটি সুন্দর উদ্ধৃতি (কবিতাংশ, উক্তি ইত্যাদি) বলিয়া বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করিলে ভাল হয়।

বক্তৃতা দেওয়া। বক্তৃতা দিবার সময় প্রথম কথাই হইল দাঁড়াইবার ভঙ্গি বা pose। ঠিক সোজা হইয়া সহজ ভাবে দাঁড়াইবে, শক্ত হইয়া নয়, টেবিলে ঝুঁকিয়া নয়, চেয়ারের পেছনটাও আঁকড়িয়া ধরিয়া নয়। হাত দুইটি তোমার পেছনে থাকিতে পারে অথবা সম্মুখে ধরা চলে। পকেটে হাত না ঢুকানোই ভাল। হাত দুইটি দিয়া কোন কিছু নাড়াচাড়া করিবে না। অঙ্গভঙ্গী বা কথা বলায় কোন প্রকার মুদ্রাদোষ (চশমাজোড়া বার বার খুলিয়া লওয়া, 'ইয়ে' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করা) যেন না থাকে।

বক্তৃতা করিতে উঠিয়াই সাধারণতঃ আরম্ভে বলিতে হয়—শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, বা বন্ধুগণ ইত্যাদি। এইটুকু বলার ফলে বক্তার ভয় ভয় ভাব কাটিয়া যায়, আরম্ভ সহজতর হয়। যদি সভাটি ব্যবসায়ী সমিতির বা সাহিত্য পরিষদ, ছাত্রসমিতি, ক্রীড়াসমিতি ইত্যাদির হয়, তবে প্রথমেই কতকগুলি হিসাবপত্র বা কাগজপত্র ইত্যাদি অবলম্বন হাতের সামনে থাকায় মনে সাহস জাগে এবং প্রারম্ভিক বাঁধা দূর হওয়ায় বক্তৃতা চালাইতে সুবিধা হয়। ইহা ছাড়া বক্তার ওপরে ন্যস্ত সম্মানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াও কিছু বলা চলে। চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য বক্তৃতায় কোন হাসির কথার অবতারণা করা যায়, তবে উহা শিষ্টরুচি-বিরুদ্ধ বা অপ্রাসঙ্গিক হইলে রসভঙ্গ হইবে। সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বক্তৃতা করিবে। বরং কিছু কম সময় বলিলে লোকে খুশিই হয়। ধীরে ধীরে বলিবার অভ্যাস করিবে। বলার সময় অনর্গল বলিয়া যাবে, কখনও দ্বিধা বা ইতস্ততঃ করিবে না, থামিয়া থামিয়া বলিবে না। প্রত্যেকটি শব্দ সুস্পষ্ট ও জোরালো ভাবে বলিবে।

তোমার সমস্ত যুক্তি বা সূত্রগুলির ব্যাখ্যান শেষ হইলে সময়োপযোগী ছোট উদ্ধৃতি দ্বারা উপসংহার টানিয়া আসন গ্রহণ করিবে।

লেখার যেমন স্টাইল আছে, বক্তৃতারও **স্টাইল** বা বাক্-শৈলী আছে। স্বর, ভাষার গড়ন, বলিবার ভঙ্গি, মুখমণ্ডলের ভাব, মুদ্রাদোষ, গাম্ভীর্য বা হাস্য-মুখরতা ইত্যাদি দ্বারা বক্তা ও বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে। শোকসভার গম্ভীর ভাবোদ্দীপক বক্তৃতায় শ্রোতাদের চক্ষু সজল হয়। আনন্দ-উৎসবে হাস্যরসিকের সাংস্কৃতিক বক্তৃতায় শ্রোতাদের হর্ষ ও করতালি-ধ্বনিতে সভাগৃহ-মুখরিত হইয়া ওঠে।

শ্রোতা অনুযায়ী বক্তৃতা। শ্রোতা অনুযায়ী বক্তৃতা তৈয়ারি করা ও বলা উচিত। দেখিবে, শ্রোতৃমণ্ডলী বন্ধু বা শত্রুভাবাপন্ন কিনা? পুরুষ অথবা মহিলা? বয়স্ক অথবা অল্পবয়স্ক? শহুরে অথবা গ্রামের?

তাহারা কি জানিতে চায়? তাহাদের কি জানা উচিত? কিসে তাহাদের আকৃষ্ট করিবে? কিসে তাহাদের আনন্দ দিবে? কিসে তাহাদের অসন্তোষ উৎপাদন করিবে? এগুলি জানিয়া তদনুযায়ী বক্তৃতা প্রস্তুত করিবে।

Visual aids সাহায্যে বক্তৃতা। Visual aids সাহায্যে বক্তৃতা করা অনেকটা সহজ। তবে লক্ষ্য রাখিতে হয়, ছবি, বস্তু, মানচিত্র, স্লাইড ইত্যাদি যাহা বক্তৃতা-গৃহে সজ্জিত থাকিবে, তাহা প্রত্যেকটি যেন হলের সব প্রান্ত হইতে শ্রোতারা স্পষ্ট দেখিতে পায়। বক্তা এইগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার করিবেন।

বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ভাষণ। সভা পরিচালনায়, বক্তাকে পরিচয় করানোতে, বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদানে, নিমন্ত্রিতদের সম্বর্ধনা-জ্ঞাপনে, বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে নানা প্রকার ভাষণ ও পদ্ধতি আছে। সর্বত্রই প্রীতি ও বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা ও সহযোগিতার আবহাওয়া অবশ্য থাকে। খোলা জায়গায়, প্ল্যাটফর্মে, হট্টগোলের ভিতর বক্তৃতার সময় আত্মবিশ্বাস রাখিবে। সভাস্থলে তোমার কোন প্রকার অস্থিরতা যেন প্রকাশ না পায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ও কণ্ঠস্বর যেন স্বাভাবিক থাকে। স্বাভাবিক ভাবে বলিবে এবং শ্রোতাদের দিকে তাকাইয়া বলিবে। মুখের সুন্দর প্রকাশভঙ্গী সুন্দর বক্তৃতার সহায়ক।

ভাষণের আরও কয়েকটি পাঠ

প্রারম্ভে সভাপতি নির্বাচনে—

প্রস্তাবক—সমবেত ভদ্রমণ্ডলী (উপস্থিত মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ) আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রস্তাব করি, আমাদের আজকের এই সভায় দেশবরেণ্য…………শিক্ষাবিদ…………সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

সমর্থক—আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনে—

আমাদের অদ্যকার এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব বা পৌরোহিত্য করবার জন্য শ্রদ্ধেয়……………… ………যে ধৈর্য ও কষ্ট স্বীকার করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন এবং যে আশার বাণী শুনিয়েছেন, সেজন্য আমি পর্ষদের পক্ষ হতে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সমবেত সহৃদয় শ্রোতৃমণ্ডলী ও শিল্পিবৃন্দকেও আমাদের অন্তরের প্রীতি জ্ঞাপন করি।

বক্তাকে পরিচয় করানো—

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, আজ আমাদের অত্যন্ত আনন্দের দিন। জনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রী………………আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে পেয়ে আমরা ধন্য, কৃতার্থ। তাঁকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি নিজেকেও ধন্য মনে করি। আশা করি তাঁর সুলিখিত অভিভাষণ আপনাদিগকে তুষ্ট ও তৃপ্তি দিবে।

মাইকের সামনে বলা। মাইকে ভয় পাইবে না। উহা ঠিকমত কাজ করিতেছে কিনা আগেই দেখিয়া নিবে। বাজে কাগজে বক্তৃতার নোট লিখিয়া নিবে না। একই স্থানে দাঁড়াইয়া বলিবে। মনে রাখিবে, তুমি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলিতেছ, মাইককে নয়। মাইকে খুব জোরে বলিবে না। আগে যখন মাইক ছিল না, তখনকার বক্তাদের খুব গলা ফাটাইয়া বলিতে হইত।

রেডিও এবং টি.-ভি-তে বলা। প্রথমেই ঠিকমত জানিয়া নিবে, তোমাকে কি বিষয়ে বলিতে হইবে এবং সময় কতক্ষণ। ইহা কি আলোচনা, না ইণ্টারভিউ। কে সভাপতি, বা ইণ্টারভিউয়ার? ইহা কি সঙ্গে সঙ্গেই প্রচারিত হইবে অথবা এখন রেকর্ড করিয়া পরে চালু হইবে? মিকানিকদের দ্বারা ভীত হইও না। মনে রাখিও, তুমি এক লক্ষ লোকের সামনে বলিতেছ না, বলিতেছ একটি লোকের সামনে।

কয়েক জন বিখ্যাত বক্তা (orator)। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এদেশে

একদল বাগ্মী নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েক জন এই।—**সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**। ইঁহার বক্তৃতা গুরুগম্ভীর ও উদ্দীপনাময় ছিল। **বিপিনচন্দ্র পাল**—ইঁহার রাজনৈতিক বক্তৃতায় স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গদেশে উন্মাদনা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইনি অগাধ পণ্ডিত ছিলেন এবং বক্তৃতায় ইঁহার অসাধারণ বাগ্‌বিভূতি ছিল। ইনি রাজনীতি, ব্রাহ্ম আন্দোলন, বৈষ্ণব মতবাদ প্রভৃতি নানাবিষয়ে সমভাবে বক্তৃতা দিতেন। ইঁহার স্বর ও কণ্ঠ যেন বক্তৃতার জন্যই সুগঠিত ছিল। **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ**—ইনি হাইকোর্টেও যেরূপ বাগ্মী ব্যারিস্টার ছিলেন, আবার রাজনৈতিক মঞ্চেও ততোধিক সুবক্তা ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুল-কলেজ ছাড়ার জন্য তাঁহার ভাবাকুল বক্তৃতার আবেদন, "ঢাকার বুকে কি কলঙ্কের ধ্বজা উড়বে? তোমরা বেড়িয়ে এসো"—ইহার রেশ ৫০ বছর পরেও যেন কানে লাগিয়া রহিয়াছে। ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতায় সুবক্তা ছিলেন **ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি, স্বামী বিবেকানন্দ** প্রমুখ। ইঁহাদের পূর্বে বা সমসাময়িক কালে ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ কতিপয় বঙ্গমনীষী ইংরেজী ভাষার সুবক্তারূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় 'ভারতের বুলবুল' কোকিলকণ্ঠী কবি সরোজিনী নাইডু বড় বড় বক্তৃতা অপূর্ব কাব্যিক ভাষায় ঝড়ের মত বলিয়া যাইতেন। একবার ঢাকায় যাইয়া তাঁহার পিতৃভূমির বর্ণনায় সরোজিনী দেবী যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, শুনিয়া আমরাও রোমাঞ্চিত হইয়াছিলাম। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে একবার তিনি তাঁহার সমগ্র ভাষণটি মুখে মুখে (extempore) বলিয়াছিলেন।

অনুশীলন

১। বক্তৃতার উদ্দেশ্য কি?

২। বক্তৃতা তৈয়ারি কি ভাবে করিবে?

৩। প্রকাশ্যে দশ জনের সাম্‌নে বক্তৃতা দিবার বাধা কি, এবং তাহা কি ভাবে দূর করা যায়?

৪। বক্তৃতায় আত্মবিশ্বাস অর্জনের পন্থা কি?

৫। বক্তৃতা শিক্ষা কি ভাবে করিবে?

৬। আমাদের দেশের কয়েক জন খ্যাতনামা বাগ্মীর নাম বল।

৭। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন সভায় তোমাকে কিছু বলিতে হইবে। একটি ভাষণ লিখ।

৮। তোমাদের কলেজের ফুটবল টিম বিজয়ী হইয়াছে। তাহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া একটি ভাষণ তৈয়ারি কর।

৯। তোমাদের প্রিন্সিপালের রাজ্যসভার সদস্য পদ-প্রাপ্তিতে সম্বর্ধনা সভায় তাঁহার বিদ্যা ও কৃতিত্ব উল্লেখ করিয়া তোমাকে ভাষণ দিতে হইবে, উহা লিখ।

১০। নিম্নলিখিত ভাষণ লিখ।—

জন্মদিনের ভাষণ, নববর্ষ উৎসবে ভাষণ, বিজয়া-সম্মেলনের ভাষণ, মিলাদুন্-নবী (নবীদিবস) উপলক্ষে ভাষণ, ঈশা-আবির্ভাব বা বড়দিনের ভাষণ।

ছাত্রীসমিতি প্রতিষ্ঠায় সম্পাদিকার ভাষণ

প্রিয় বোনেরা,

আজ যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি সে বিষয়ে তোমরা জান। আজই সকালের প্রার্থনার সময় বড়দি তোমাদের বলে দিয়েছেন। আমাদের সমিতি ছোট হলেও এই শুভ কাজটি রূপায়িত করতে হলে তোমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।

প্রতি সপ্তাহে আমাদের সকলের একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়, এ জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়েছে। তারাই প্রতি সপ্তাহে একদিন একত্রিত হয়ে কি ভাবে কাজ করতে হবে এবং কি কি কাজ করতে হবে তা ঠিক করবে। কে কে এই কার্যনির্বাহক সভায় আছে তা তোমরা জান। আমি সম্পাদিকা হিসাবে তোমাদের সাথে কয়েকটি কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি।

আমাদের স্কুলে যে কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রী আছে তাদের কল্যাণের জন্য এই সমিতি গঠিত হচ্ছে। আশা করি এই কল্যাণকর্মে ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন। এই সব দরিদ্র ছাত্রীদের আমরা বিনামূল্যে বই, খাতা, পেন্সিল, কালি, কলম, ঔষধ, পরীক্ষার ফি, এমন কি স্কুলের পোশাকও সরবরাহ করব। প্রতি শনিবার স্কুল ছুটির পর আমরা একটি ছোট স্টল খুলবো। সেই স্টল থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খাতাপত্র কাগজ পেন্সিল বই ম্যাগাজিন ইত্যাদি কিনবো। এই স্টলটির বিক্রীত জিনিস হতে যে লাভ হবে তা এই ছাত্রীসমিতির একাউণ্টে জমা হবে। আমরা সকলে মাসে ·৫০ পয়সা চাঁদা দিয়ে এই সমিতির সভ্য হব। যে দিতে পারবে না তাকে দিতে হবে না। এ ছাড়া প্রতি মাসে আমরা একদিন টিফিন না খেয়ে সেই পয়সা এই সমিতিকে দিব।··· তোমাদের এই হর্ষধ্বনিতে তোমাদের সকলের সম্মতিরই ইঙ্গিত পেলাম। তোমাদের উৎসাহেই আমার মনে দ্বিগুণ বল ও অপূর্ব আনন্দ সঞ্চারিত হোল। যাহোক আমাদের এই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে আমরা স্টলটি আরম্ভ করব। প্রথমে স্টলটি ছোটই থাকবে, তাতে ক্ষতি নাই।

এছাড়া আমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু সেলাই করতে হবে। যে সময় আমরা গল্প করে নষ্ট করি সেই সময়টা আমরা সেলাই করব। উল বোনা, সূচের সেলাই করা জামা বানান ইত্যাদি আমাদের এই সেলাই বিভাগের কাজ হবে। প্রত্যেককে এই স্টলে বিক্রির জন্য কিছু সেলাই প্রতি মাসে দিতে হবে। এ ভাবে অগ্রসর হলে আমরা আশা করি দিন দিন উন্নতি করতে পারব।

আমাদের এটি শুভ প্রচেষ্টা। সুতরাং এর উন্নতি নিশ্চিত বলে আমরা মনে সাহস রাখতে পারি যদি এর সাথে আমাদের সকলের অক্লান্ত ও দ্ব্যর্থহীন উদ্যোগ থাকে।

অভ্যর্থনার উত্তর
স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার চিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভাপতি কার্ডিন্যাল গিবন্‌স শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করাইয়া দিলে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন ঃ

হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য উঠিতে গিয়া আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতিস্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই সভামঞ্চে সেই কয়েক জন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাঁহারা প্রাচ্য-দেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি দূরদেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য হইতে যাঁহারা এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতার ভাব প্রচারের গৌরব দাবী করিতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।

আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লু্শন' (ভাবার্থ ঃ বহিষ্করণ পরিবর্জন) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী, জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদের এ-কথা বলিতে গর্ব বোধ করিতেছি যে, আমরাই ইহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের অবশিষ্ট অংশকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি ; যে বৎসর রোমানদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে তাহাদের পবিত্র মন্দির বিধ্বস্ত হয়, সেই বৎসরই তাহারা দক্ষিণ-ভারতে আমাদের মধ্যে আশ্রয়লাভের জন্য আসিয়াছিল।

জরথুষ্ট্রের অনুগামী মহান্ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্মাবলম্বিগণ আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যাহারা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

কোটি কোটি নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, যে স্তবটি আমি শৈশব হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহারই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলিতেছি ঃ "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়া মিলাইয়া দেয়, তেমনি যে ভগবান্,

নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে যাহারা চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

এই ধর্ম-মহাসভা গীতাপ্রচারিত সেই অপূর্ব শ্রেষ্ঠ মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে, সেই বাণীই ঘোষণা করিতেছে : 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥'—যে যে-ভাব আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি, হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা, গোড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বার বার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই-সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত তাহা হইলে মানব-সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত; এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।

প্রতিভাষণ

কাজী নজরুল ইসলাম

[১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে বিপুল সমারোহে ও আন্তরিকতা সহকারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনা-সভার সভাপতি ছিলেন বিজ্ঞানাচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। অভিনন্দনের উত্তরে কবি নিম্নলিখিত প্রতিভাষণ দান করেন। কবির প্রত্যুত্তরের পর শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু আবেগোচ্ছল কণ্ঠে কবির স্বদেশী গান ও দেশাত্মবোধমূলক কবিতার প্রশংসা ক'রে এক বক্তৃতা দেন।]

বন্ধুগণ,

আপনারা যে সওগাত আজ হাত তুলে দিলেন, আমি তা' মাথায় তুলে' নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে উঠলো। নদীর জল মঙ্গল-অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি, আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে নদীর জলধারা, সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুনতে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তা ছাড়া, আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্ততঃ আজকের দিন যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা

আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভ-দৃষ্টির বধূর মত লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে মেয়েই হয়, অন্ততঃ আজকের দিন তাকে নাচতে বল্‌বেন না।...

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে'-টাকে ভালো করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ ক'রে মুক্তি দিন, আমাকে বড়-বলার বড়-বলি করবেন না। সভায় যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তা' হলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।...

আমাকে 'বিদ্রোহী' ব'লে খামখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে; কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি, আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরিশিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরিশিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি। যেন মরুপথে পথ না হারাই।—এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ-শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে বাঁকে-বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ প্রখর-দর্শন শার্দূল পশুরাজের ভ্রূকুটি। এবং তাদের নখর দংশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে', নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পূর্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্যে সারা শীতকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে—তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের ক'রে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি ব'লেই শুধু এই দেশেরই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব-গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই কবি। বনের পাখী নীড়ের ঊর্ধ্বে উঠে গান করে ব'লে বন তাকে কোন দিন অনুযোগ

করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে ব'লে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবে না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আম গাছকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টো এ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।……

যৌবনের রক্তশিখা মশাল ধ'রে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই ব'লে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না—আমিও আছি তাদের দলে ; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদদার রূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যান-মূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে, সেদিন আমিও আসব ঐ মেলায় শাহ্‌জাদা খুর্‌রমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপ্ন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসীর মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি, ও-দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত-মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তা হলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।……

বর্তমান সাহিত্য নিয়ে ধূলো বালি, এত ধোঁওয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপ-বর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে, আমিও মরব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর-মন্থনের হলাহলই হয় তা হলে ঐ সমুদ্র-মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়া ত এ সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপার সহজ হ'ত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা—রসে খান, অমৃত আছে, সে উঠল বলে'।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ।

ভাব-সম্প্রসারণ

সুকৌশলী লেখকের দুই-একটি বাক্যে অনেক সময় গভীর তত্ত্বকথা প্রচ্ছন্ন থাকে। দুই পংক্তি কবিতায়, একটি বাক্যে বা প্রবচনবাক্যে অনেক বিস্তৃত ভাব সূত্রাকারে ব্যক্ত হয়। এইরূপ সংক্ষিপ্ত বাক্যাদির মর্ম বিস্তারিত ভাবে বিশদ করিয়া প্রকাশ করার নামই **ভাব-সম্প্রসারণ বা ভাব-ব্যাখ্যান**। ইহা ইংরেজী amplification-এর বাংলা প্রতিশব্দ।

ভাবটিকে নানা উপায়ে সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে। ভাব-সম্প্রসারণ কালে মনে রাখিবে—(১) ভাব সাধারণতঃ একটি মাত্রই থকে, শুধু সেই ভাবটিরই সম্প্রসারণ করিতে হইবে। (২) উদ্ধৃতি, উদাহরণ, অনুকূল যুক্তি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি দ্বারা কিংবা নিজের অভিজ্ঞতা যোগ করিয়া ভাবটিকে পরিস্ফুট করা যায়। (৩) অন্য কোনও নূতন ভাব, কিংবা বিরুদ্ধ কোনও ভাব বা উদাহরণ ইত্যাদির এবং অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিবে না। (৪) মূল ভাবটির পরিপোষক কথা লিখিবে, বিরুদ্ধ আলোচনা করিবে না। (৫) আগাগোড়া সামঞ্জস্য রাখিয়া লিখিতে হয়। (৬) লেখকের বা রচনার নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। (৭) একই কথা বার বার লিখিবে না। পুনরুক্তি বড় দোষ। (৮) মোট কথা, ভাবটিকে লইয়া একটি অনুচ্ছেদ বা নিবন্ধ লিখিবে।

১। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। —চারিত্রপূজা

ভাব-সম্প্রসারণ। বাংলা ভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের কীর্তি অতুলনীয়। সাহিত্য-সম্পদে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করিয়া তিনি তাঁহার মাতৃভাষাকে যথার্থ ঐশ্বর্যশালিনী মনোহারিণী মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপূর্ব কলানৈপুণ্যর পরিচয় দিয়াছেন। এ ভাব, এ মমতা, এ শিল্পজ্ঞান কেবলমাত্র মাতৃগতপ্রাণ পুত্রের মধ্যেই দেখা যায়। ভাষা যে কেবল কতকগুলি বক্তব্যের সমষ্টি নয়, তাহা তিনি সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। শিল্পীর তুলির টানটুকু যেমন তাহার শিল্পকে অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মর্যাদা দান করে, বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেও তাহার সরল, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল বাক্য-বিন্যাস তাঁহাকে যথার্থ শিল্পীর আসনে উন্নীত করিয়াছে। এ শিল্পজ্ঞান ছাড়া ভাষাকে সম্পদশালিনী করা যায় না, সুষম ভাষা-সংযমের দ্বারা তাহাকে সংহত না করিলে যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। কথাটি অতি খাঁটি। পিতা কি কেবল সন্তান জন্মের পর সন্তান লাভের আনন্দে নিঃশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন, না তাহাকে লালন পালন করিয়া সুস্থ, সবল, সুন্দর মানুষ করিয়া তোলেন? বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যকে লালন পালন করিয়া তাহাকে সুশৃঙ্খল, সংযত, ও সুপরিচ্ছন্ন করিয়াছেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নতির মূলে বিদ্যাসাগর। শুধু পিতার মতো নয়, প্রকৃত শিল্পীর মতো বাংলা ভাষাকে রুচি, শুচি ও সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়া সাহিত্যের আসনে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন।

২। বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। —চারিত্রপূজা

ভাব-সম্প্রসারণ। বিদ্যাসাগর যে উন্নতমন, অজেয় পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন তুলনা ছিল না। তাঁহার অতুলনীয়

চরিত্র লইয়া তিনি অনেক উর্ধ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মহত্ত্বের সুযোগ লইয়া বহু লোক তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ছিল দয়ার সমুদ্র, সেখানে আর্তি নিবেদন করিয়া শত শত লোক তাঁহার হৃদয়ে করুণার ঝড় তুলিয়াছে। তিনি উপকার করিয়া আঘাত পাইয়াছেন। যোগ্য সহযোগীর অভাবে তিনি এই জনারণ্যে একক ছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব ছিল উহার বিন্দুমাত্রও তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে দেখিতে পান নাই। বাঙালীর কাছে তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহার কণামাত্র না পাইয়া তিনি মনে মনে বড় যাতনা ভোগ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, বাঙালী কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু শেষ করে না, যথার্থ কাজ না করিয়া কেবল আড়ম্বর করে। নিজের বিশ্বাসের উপর শ্রদ্ধা নাই। বাক্‌সর্বস্ব বাঙালী আত্মত্যাগ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। যোগ্যতা লাভ না করিয়াই অহঙ্কার করিতে থাকে। তাঁহার চরিত্রের সহিত ইহাদের চরিত্রের কোন মিল ছিল না। তাই তিনি সকলের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে সম্পূর্ণ একা মনে করিতেন।

৩। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ-পুরুষোচিত। —চারিত্রপূজা

ভাব-সম্প্রসারণ। বিদ্যাসাগরের দয়ার মধ্যে পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা ছিল, কাহারও প্রতি দয়া প্রদর্শনের সময় তিনি কোনরূপ দ্বিধা করিতেন না। তিনি যাহা করিবেন স্থির করিতেন, তাহার মনুষ্যত্ব যাহা নির্দেশ দিত, তিনি তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত হইতেন না। কাহারও দুঃখ দেখিলে তিনি করুণায় বিগলিত হইতেন। তখন তিনি নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃশব্দে নিজের কাজে ব্রতী হইতেন। কোন বাঁধা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। তাঁহার দয়ায়-বিগলিত হৃদয় কোন সূক্ষ্মতর্ক জাল বিস্তার করিয়া কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হইত না। দুঃস্থের আবেদনে তিনি সাড়া না দিয়া পারিতেন না। সাহায্য-প্রার্থীর অসহায়তা ও দুর্দশাই তাঁহার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ছিল। তিনি অন্য কোন কথা চিন্তা করিতেন না। নীচ জাতি, মারাত্মক রোগাক্রান্ত, সমাজ-পরিত্যক্ত অথবা সামাজিক নিয়মদ্বারা নিপীড়িত, শত্রু, মিত্র, বৃদ্ধ, শিশু, অবলা নারী প্রভৃতি সব প্রার্থীর আবেদনই তাঁহাকে সমানভাবে বিচলিত করিত। কারুণ্যে বিগলিত হৃদয়ে কোন দুর্বলতা ছিল না। তাঁহার চরিত্রের এই বলিষ্ঠতা তাঁহাকে সকল কাজে শক্তি ও উৎসাহ যোগাইয়াছে।

৪। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে।

ভাব-সম্প্রসারণ। রামমোহন যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ছিল ভারতের বড় দুর্দিন। ভারতের চিন্তার মহানদী তখন শুকাইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক নদীগর্ভে যেমন আগাছা জন্মায় ভারতবর্ষের চিন্তাধারার মধ্যে তেমন অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান সংকীর্ণতা স্থবিরতা আসিয়া জমিয়াছিল—ভারত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। এমন সময় রামমোহন জন্মগ্রহণ করিলেন সত্য উদ্ঘাটনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া। তিনি সকল প্রকার বাঁধা দূর করিয়া, সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ছিন্ন করিয়া, মনুষ্যত্বের দাবি লইয়া তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যে যুগ তাঁহার

কাছে মৃত, যে ইতিহাস তাঁহার কাছে প্রাণহীন, তাহা লইয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হৃদয় চারিদিকের ক্ষুদ্রতা সহ্য করিতে পারিল না। তিনি সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। চারিদিকের সঙ্কীর্ণতা মিথ্যা আচরণ দেখিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যাইত। তিনি সত্যের ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। তাই তিনি সারাজীবন সত্যের জন্য মোহ-মুক্তির সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন।

৫। মানব সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য।

—চারিত্রপূজা (রামমোহন, পৃঃ ৬৪)

ভাব-সম্প্রসারণ। ঐক্যবদ্ধ হইয়া চলার সাধনাই হইল মানুষের প্রধান সাধনা। ভারত বহু প্রাচীন কাল হইতে এই সাধনা করিয়া আসিতেছে। এই সুপ্রাচীন সাধনার বিরাম নাই। যখনই আমরা এই সাধনায় দুর্বল হইয়া পড়িব, তখনই নানা সমস্যা জড়িয়ে ব্যাধির আকারে আমাদের আক্রমণ করিয়া আমাদের দেশকে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও রোগাক্রান্ত করিয়া ফেলিবে। সভ্যতার অর্থই হইল মানুষকে এক হইয়া চলার ক্ষমতা। এই এক হওয়া শুধু সামাজিক এবং বাহ্যিক ব্যবস্থায় শেষ হইয়া যাইবে না। এক হইতে হইবে অন্তরে। আন্তরিকতায় আত্মীয়তায় যেন আমরা মানুষকে আপন জনের মত ভালবাসিতে পারি। ভারতেও নানা দেশের লোক আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। তাই একত্রিত হইবার সাধনা ভারতের বড় সাধনা, সমস্যাও সুকঠিন। যতই দুরূহ হউক, যতই কঠিন হউক, একত্র আমাদের হইতেই হইবে। ঐক্যই আমাদের প্রাণ। এই প্রাণশক্তিতে যাহারা যত বলীয়ান, তাহাদের আর ভয় কিসের ? তাহারা সদর্পে দাঁড়াইয়া থাকিবে যুগ যুগ ধরিয়া। যখনই এই ঐক্যের বাঁধনে চিড় ধরিবে তখনই তাহারা হইবে দুর্বল। উন্নতশির মানবগোষ্ঠী নতমস্তক হইয়া যাইবে। চারিদিক হইতে নানা কঠিন সমস্যা আসিয়া দুর্বল করিয়া ফেলিবে। ভারতেও নানা জাতির বাস, তবু বিবিধের মাঝে মহামিলনের সুর চিরদিন ধ্বনিত হইতেছে। ভারতও মহামানবের ঐক্য সাধনার পথেই চলিয়াছে।

৬। অগ্নি যেমন একখণ্ড চকমকিতে নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনি মনের মধ্যেই রহিয়াছে।

—কর্মযোগ, পৃঃ ৮

ভাব-সম্প্রসারণ। মানুষের মনের মধ্যেই জ্ঞান থাকে। বাহিরের জগৎ হইতে আমাদের জ্ঞান উন্মোচিত হইবার সাহায্য পাই। আমাদের হৃদয়ে সকল প্রকার জ্ঞান আবৃত অবস্থায় থাকে। অধ্যবসায় ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই আবরণ ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে থাকে। যার আবরণ যত উঠিতে থাকে সে তত জ্ঞানী হইতে থাকে। যাহার আবরণ খুব বেশী, সে অজ্ঞানতা হইতে মুক্তি পায় না। বাহিরের আঘাত দ্বারা আমাদের ভিতরের সকল জ্ঞান ও মনের সম্পদ প্রকাশিত হয়। কর্মই সব। কর্ম দ্বারা আমরা আমাদের নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশ করি। কর্মের স্পর্শে হৃদয়ের অগ্নি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়। আমাদের যে আবৃত জ্ঞান হৃদয়ে লুকায়িত

থাকে, কর্মের দ্বারা সেই জ্ঞানরূপ পদ্মকোরক ধীরে ধীরে শতদল বিস্তার করিয়া প্রস্ফুটিত হয়। হৃদয়ে অগাধ জ্ঞান-ভাণ্ডার লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি। সেই জ্ঞান-ভাণ্ডার সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দিবার জন্য কর্ম আসিয়া আমাদের বন্ধুর মত হাত ধরিয়া লইয়া যায়। কর্মদ্বারাই আমরা অন্তরের আবৃত জ্ঞানকে বিকশিত করিতে পারি।

৭। **অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়।**

—চারিত্রপূজা (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ)

ভাব-সম্প্রসারণ। ঈশ্বরের জন্য প্রেম ভালবাসা, ঈশ্বরকে জানিবার জন্য আকুলতার প্রধান বাধা ঐশ্বর্য। রাজার দুলাল তাই ধন, দৌলত, ঐশ্বর্য, মান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল প্রকার পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরের সন্ধানে বাহির হয়। ঐশ্বর্যের বাধা কড় কঠিন। তাহা ছিন্ন করিয়া অথবা ঐশ্বর্যের আকর্ষণ হইতে উর্ধ্বে থাকিয়া আমাদের ঈশ্বর-প্রেমে হৃদয়কে শুচি করিতে হইবে। সোনার প্রাচীর আসিয়া যেন আমাদের হৃদয়ে যে ভগবৎ-প্রেম রহিয়াছে তাহাকে আড়াল করিয়া না দেয়। ধন-সম্পদ হৃদয়কে বড় দীন করিয়া ফেলে। দীন হৃদয় লইয়া ধনী ব্যক্তি ধন-সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। নিশ্চিন্ত আরাম, অভ্রভেদী যশঃ-চূড়া, প্রভূত ধন-সম্পদ তাহাকে মোহগ্রস্ত করে। সে ভুলিয়া যায় সেই প্রাচীন ভারতের বাণী—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম।' যাহাতে আমি অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব? সে ভাবে, যে ঈশ্বর-প্রেম আমাকে ধনী করিবে না তাহা লইয়া আমি কি করিব? সে ভাবিতে থাকে—এই পৃথিবীতে যতদিন বাস করিব ততদিন আমার পার্থিব সুখ-সম্পদ চাই। সে ভাবিয়া সুখী হয়—আমার ঐশ্বর্য আছে, আমার প্রতিষ্ঠা আছে, আমার আরাম আছে। আমি কত লোকের প্রভু, আমার আর কি চাই! দীনাত্মাই ঐশ্বর্যকে জীবনের পরম সার্থকতা বলিয়া ভুল করে। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে পারে না—আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও।

৮। **দুঃখ ও সুখ উভয়েই মানুষের মহান্ শিক্ষক। দুই-ই সমভাবে চরিত্র গঠনের উপাদান।**

—কর্মযোগ

ভাব-সম্প্রসারণ। আপাতদৃষ্টিতে মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সুখ। সুখকে জীবনের চরম লক্ষ্য ভাবিয়াই আমরা দুঃখের সম্মুখীন হই। সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া চলে। সুখের সময় আমরা আনন্দ করি। দুঃখের সম্মুখীন হইলে আমরা যন্ত্রণায় অধীর হই, ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকি। সুখ-দুঃখ কেহই জীবনে চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু সুখ ও দুঃখ আমাদের জীবনের বড় জ্ঞানদাতা, মহান্ শিক্ষক। সুখদুঃখের ভিতর হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহাই জীবনের স্থায়ী সম্পদ হইয়া থাকে। সুখ আসিয়া জীবন কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিয়া ভাটার টানে চলিয়া যায়। রাখিয়া যায় কতকগুলি সুখ-স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা। এই স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা আমাদের চরিত্রকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করিতে থাকে।

দুঃখের ঝড় আসিয়া আমাদের জীবনকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যায়। আমরা আকুল হইয়া কাঁদিতে থাকি। কিন্তু আমাদের এই চোখের জল বৃথা হয় না। সোনা আগুনে পুড়িয়া যেমন খাঁটি হয়, মানুষও তেমনি দুঃখের আগুনে জলিয়া জলিয়া খাঁটি হয়। এই দুঃখলব্ধ শিক্ষা মানুষকে সংসার-পথে চলিতে বন্ধুর মত সাহায্য করে। সুখ ও দুঃখ মানুষের জীবনের চিরসাথী হইয়া সংসার-সংগ্রামে তাহার চরিত্রকে দৃঢ়রূপে যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলে।

৯। **ইচ্ছামাত্রেই চরিত্র সংশোধন ঘটে না এবং প্রস্তাব দ্বারাও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই।** —চরিতকথা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভাব-সম্প্রসারণ। আমাদের জাতীয় চরিত্রে কতকগুলি মহৎ দোষ আছে। দৃঢ়তার অভাব তাহার মধ্যে একটি। বাঙালী জাতি অতিরিক্ত কোমল, নানাদিক দিক দিয়া প্রশ্রয় পাইয়া সেই কোমলতা বাড়িয়াই গিয়াছে। কোনও কিছুতে দৃঢ়তা নাই। ইহা আমাদের জাতীয় অবনতির একটি কারণ। অনেকে বলেন যে, সকলের আগে আমাদের চরিত্র সংশোধন করা দরকার। কিন্তু তাহা করিবার উপায় কী; সে পথ কেহ দেখাইয়া দেন না। শুধু ইচ্ছা করিলেই কি চরিত্র শুধরাইয়া যায়? না, সভায় প্রস্তাব করিলেই জাতীয় উন্নতি ঘটে? চরিত্র সংশোধন, জাতীয় উন্নতি কোনটিই সহজে হয় না। কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না ম'লে।' স্বভাবের দোষ আমরণ থাকিয়া যায়। তবে, স্বভাবের পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহার জন্য সৎ সঙ্কল্প ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী অবিরত চেষ্টার প্রয়োজন। বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন, অতি ক্ষুদ্র জলজ কীট ক্রমে তাহার স্বরূপ ও স্বভাব পরিবর্তনের ফলে আধুনিক বৃহৎ জীবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উহা অল্প সময়ে বা বিনা চেষ্টায় হয় নাই, তাহা বহু কোটি বৎসরের জীবন-দ্বন্দ্বের ফল। মানুষের চরিত্রের এবং জাতির উন্নতি উভয়ই দীর্ঘকালের সংগ্রাম ও অধ্যবসায়-সাপেক্ষ।

১০। **তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ, দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বোঝে না।** —বঙ্কিমচন্দ্র (কমলাকান্তে দপ্তর—বিড়াল)

উঃ। ক্ষুধা মানবের প্রধান জৈবিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি সকলেরই সমান—দরিদ্রের ক্ষুধা ধনী অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। ধনী ব্যক্তি অত্যন্ত স্বার্থপর, প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করিয়া দরিদ্রকে বঞ্চিত করে। কিন্তু দরিদ্রের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। তাহারা দরিদ্রের ক্ষুধা বোঝে না। যাহার প্রচুর আছে, তাহাকেই তাহারা সাহায্য করে, যাহার ক্ষুধা নাই, তাহাকেই বিবিধ আহার্যে পরিতৃপ্ত করে। অর্থাৎ তাহার সমশ্রেণীর কোন ব্যক্তি ছাড়া অপর কাহারও প্রতি তাহার কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় না। কারণ সে জানে তাহার স্বার্থসিদ্ধির পথে সমশ্রেণীর লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, দরিদ্র তাহার উপকার করিবে না। সেই কারণে সে স্বশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিকেই তুষ্ট করে। ইহাই জগতের নিয়ম। যাহার অনেক আছে, তাহাকেই সকলে তুষ্ট করিতে ব্যগ্র; কি উপায়ে তাহার মনোরঞ্জন করা যাইবে এই ভাবিয়া তাহারা অস্থির। কিন্তু যাহারা বঞ্চিত, সর্বহারা, ক্ষুধার্ত, তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইবার, ক্ষুধা মিটাইবার কেহ নাই।

১১। অপমানে নতশির ভয়ে ভীত জন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন।—রবীন্দ্রনাথ (স্বদেশ ও সংকল্প, পৃঃ ৭)

ভাব-সম্প্রসারণ। মানুষের অন্তর পরম করুণাময় ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। কিন্তু সকল মানুষ এ সম্বন্ধে সচেতন নয়। এইরূপ ব্যক্তি প্রতিদিন সকল মানুষের কাছে সহস্র অপমান সহ্য করে, কারণ সে আত্মার মহত্ত্ব জানে না। প্রতিদিন অপমান সহ্য করিতে করিতে সে ঈশ্বরের অমোঘ প্রতাপের কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়, নিজে অপমানিত হইয়া পরোক্ষে ঈশ্বরকে অপমান করে। এই দীন ব্যক্তি প্রকৃত সত্য কি তাহা জানে না। পদে পদে সে মিথ্যাকে আশ্রয় করে। সমগ্র অন্তর তাহার মিথ্যার পঙ্কিলতায় ভরিয়া ওঠে। যে হৃদয় ভগবানের পীঠস্থান, সেই হৃদয় ভগবান্‌কে অপসারিত করিয়া মিথ্যাকে স্থান দেয়। কাজেই মিথ্যাই তখন তাহার কাছে প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, ঈশ্বরের পরিবর্তে সে মিথ্যার উপাসনা করে।

১২। বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর। —রবীন্দ্রনাথ

ভাব-সম্প্রসারণ। একজন সংস্কৃত পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "এই ব্যক্তি আমার নিজ, ঐ ব্যক্তি আমার পর, ক্ষুদ্রমনা লোকেরাই এ রকম বিচার করে; কিন্তু উদারচরিত ব্যক্তিদিগের সমস্ত বসুন্ধরাই আত্মীয়।" অর্থাৎ মনকে ছোট করিয়া রাখিলেই আপন-পরে তফাৎ দেখা যায়। মাটিতে দাঁড়াইয়া চারিপাশে দেখিলে আল দিয়া ঘেরা আলাদা আলাদা চাষের জমি দেখা যায়; কিন্তু পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে সমস্ত সীমারেখা লুপ্ত হইয়া ক্ষেতগুলিকে এক বলিয়া মনে হয়। সেই রকম, মনটা একটু উঁচুতে উঠিলে, মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিলে, দেখা যায় যে, সমস্ত জগতের সঙ্গেই আমার অচ্ছেদ্য একটা বন্ধন আছে—বিশ্বজগৎ আমার আপন, আমি বিশ্বজগতের আপন। উদার মনে বিশ্বজগতের এই আপন-করা ডাক আসিয়া পৌঁছায়, সেই মনও তখন তাহাতে সাড়া দেয়। অন্তরদেবতা জাগিয়া উঠিলে ভেদবুদ্ধি লোপ পায়, সকল মানুষকে আপন এবং সমস্ত পৃথিবীকে নিজের দেশ বলিয়া মনে হয়।

১৩। আত্মসুখ অন্বেষণে আনন্দ নাহিরে
বারে বারে আসে অবসাদ,
পরার্থে যে করে কর্ম তিতি ঘর্মনীরে
সেই লভে স্বর্গের প্রসাদ। —পূঃ বঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা

ভাব-সম্প্রসারণ। নিজের জন্য বাঁচাই আমাদের জীবনের সব নহে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সকল প্রাণীই নিজের জন্য নিজে বাঁচিবার ও নিজের সুখ-সুবিধার জন্য জীবন-যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু মানুষের বাঁচা শুধু নিজের জন্য এবং নিজের স্বার্থের জন্য এ কথা যাহার মনুষ্যত্ব-জ্ঞান আছে সে কখনও ভাবিতে পারে না। তাহাকে সকল ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকিয়া আত্মসুখ ও আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়া সংসার-

তখন সে দানের অধিকার পায়। ত্যাগের ক্ষমতা না পাওয়া পর্যন্ত সেও যেন যথার্থ সম্পত্তির অধিকারী বলে ভাবতে পারে না। ত্যাগ ছাড়া অধিকারের পূর্ণতা আসে না। যখন আমরা কেবল জমাতে থাকি খরচ করতে পারি না, তখন আমরা সেই সঞ্চিত সামগ্রীর যথার্থ অধিকারী হতে পারি না। সঞ্চিত ধন আমাদের বেঁধে রাখে। এই ধনের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য বুড়া বৈষ্ণব প্রফুল্লকে (দেবী চৌধুরাণী) নানা রত্ন ও স্বর্ণে পরিপূর্ণ কুড়ি ঘড়া সঞ্চিত ধন দান করে মুক্তি চেয়েছিল। ত্যাগ যদি আমরা না করি, সব কিছু প্রবল আকর্ষণের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রাখি, তবে ঈশ্বরের বিধান এসে আমাদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে। তখন নিজের কাছে অপরাধের সীমা থাকবে না। দেবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে কেড়ে নেবার দুঃখ পেতে হবে। 'আমি ত্যাগ করব' এই কথা বলে প্রতিদিন মনকে প্রস্তুত করতে হবে। নতুবা দুঃখের দিনে হারাবার ব্যথায় আমরা অধীর হব, আমরা পরাস্ত হব।

১৭। বিপৎকালে সকলেই ধর্মচিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে।

ভাব-সম্প্রসারণ। যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম। অথবা বলা যায়, ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে মানব যাহাকে অবলম্বনস্বরূপে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, তাহাই ধর্ম। ধর্ম আমাদের শাশ্বত আশ্রয়, এ কথাটি সাধারণ মানুষ হৃদয়ঙ্গম করে না। তাহাদের কাছে ধর্মের উপযোগিতা নিত্য নয়, নৈমিত্তিক মাত্র। তাই সে সম্পৎকালে যখন ধনমদে মত্ত হইয়া নিজেকে বড় বলিয়া জানে, নিজেকেই নিজের ভাগ্যবিধাতা বলিয়া মনে করে, তখন তাহার মন কোনও আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন অনুভব করে না, তাই ধর্মের কথা তাহার মনে আসে না। পরকালে সদ্গতির পথ বন্ধ হইয়া যাইতেছে, এ কথা তখন ভাবিবার অবকাশ তাহার থাকে না।

কিন্তু মানুষের দিন কখনও একভাবে যায় না। সুখের পর দুঃখ, সম্পদের পর বিপদ, মানুষের জীবনে প্রায় সর্বদাই আসে। সেই বিপদ যখন আসিয়া পড়ে, মানুষ তখন দিশেহারা হইয়া যায়, নিজের উপর সে আর নির্ভর করিতে পারে না—সে তখন চায় একটা অবলম্বন, একটা আশ্রয়। ধর্ম তাহার কাছে তখন সেই আকাঙ্ক্ষিত অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়, ভগবানের শরণ লয়—শুধু বিপদে পড়িয়াই। অথচ, তিনিই মানুষের চির-শরণ। যিনি সৎ ও বুদ্ধিমান তিনি এ কথা জানেন, এবং সম্পদে হউক, বিপদে হউক, তিনি কখনও ধর্মের ও ভগবানের অবলম্বন ত্যাগ করেন না।

১৮। বিজ্ঞানে ও সাহিত্যের দৃষ্টি একই দিকে। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাব-সম্প্রসারণ। অধিকাংশ মানুষের জীবনই বিশেষত্বহীন। গতানুগতিক ভাবে কোনও রকমে দিনগুলি কাটাইয়া দেওয়ার চেয়ে বেশী আকাঙ্ক্ষা বা শক্তি খুব কম লোকেরই আছে। দৈনন্দিন জীবন যাপনের উপকরণ সংগ্রহ করিতেই মানুষ ব্যস্ত। অন্যদিকে দৃষ্টিপাতের সময় বা সামর্থ্য তাহার প্রায়ই থাকে না। এই জগৎ-ব্যাপারের মধ্যে অফুরন্ত জানিবার কথা আছে, অফুরন্ত সৌন্দর্য আছে, তাহার খোঁজ সে রাখে না। বিজ্ঞান ও সাহিত্য তাহাকে সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারের খোঁজ দেয়, তাহার সম্মুখে সেই সৌন্দর্যের উৎস খুলিয়া দেয়। কারণ বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য, সত্যের

আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানলাভের সহায়তা করা। আর, সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। অজ্ঞান ও কুশ্রীতা সমগোত্রীয় বস্তু। তাহা নষ্ট করিয়া মানুষের চিত্তের উন্নতিসাধন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যুগ্মকর্ম। আবার বিজ্ঞান যখন চরম সত্যের সন্ধান লাভ করে এবং সাহিত্য যখন পরম সৌন্দর্যে উপনীত হয়, তখন তাহারা একই বস্তুতে আসিয়া মিলিত হয়—কেননা এক ভগবান সকল সত্যের ও সকল সৌন্দর্যের আশ্রয়স্থল। তিনিই সত্যস্বরূপ; আবার তিনিই সৌন্দর্যস্বরূপ। (সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্)

১৯। যে ব্যক্তি কাজ করে তাহারই ভ্রান্তি ঘটে, যে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়, তাহার ভ্রান্তির আবিষ্কার বিধাতারও অসাধ্য।—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ভাব-সম্প্রসারণ। ভগবান মানুষকে কর্মক্ষমতা দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। মানুষ দেবতা নয়। তাহার কর্মের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানুষ বার বার আবৃত্তির দ্বারা এই ত্রুটি সংশোধন করে। কিন্তু যাহারা কাজ করে না, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের কোন ভ্রান্তি ঘটিবার সুযোগ কোথায়? নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় লোকের ভ্রান্তি আবিষ্কার করা বিধাতারও অসাধ্য, কারণ সে অলস হইয়া বসিয়া থাকে এবং অপরের ত্রুটি আবিষ্কার করিতে তৎপর হয়। যাহারা প্রকৃত মানুষ তাহারা নিরলস ভাবে কার্য করিয়া যায়। স্বভাবতঃই তাহারা ভুল-ভ্রান্তি করে, কিন্তু সেজন্য তাহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে না।

২০। বনে কি একটা মানুষ গড়া যায়? বনে কেবল একটা উদ্ভিদ্ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্য-সমাজেই গঠিত হয়।—রবীন্দ্রনাথ

ভাব-সম্প্রসারণ। মানুষ গড়িতে হইলে মনুষ্য-সমাজেরই প্রয়োজন হয়। জীবনে পরিবেশের প্রভাব অসাধারণ। মানুষ যে পরিবেশে বর্ধিত হয়, তাহার হৃদয়-বৃত্তির বিকাশও সেই পরিবেশ অনুযায়ীই হইবে। বনে উদ্ভিদ্ পালন সম্ভব, কিন্তু মনুষ্য-সমাজই মানুষের চরিত্র গঠনের উপযুক্ত স্থান। বন্য পরিবেশে মানুষ গড়িয়া তোলা যায় না। মানুষ নানা প্রবৃত্তির সমবায়ে গঠিত,—সেই প্রবৃত্তিগুলির উপযুক্ত বিকাশ সাধনের জন্য মনুষ্য-সমাজ প্রয়োজন। বনের পরিবেশে একটি গাছ সহজেই পুষ্টিলাভ করে, বর্ধিত হয় এবং যথাসময়ে ফলফুল দান করে। কিন্তু মানুষের হৃদয়-বৃত্তি বিকাশ ও তাহার সদ্গুণের স্ফুরণ বনে সম্ভব নয়। হৃদয়-প্রবৃত্তির আদান-প্রদানের মধ্যেই মানব-চরিত্রের সম্যক্ বিকাশ হয়। বনে এই আদান-প্রদানের সুযোগ নাই। তাই বন নয়, লোকালয়ই মনুষ্য-চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট স্থান।

২১। পক্ব শস্যের যেরূপ পতনের ভয় নাই, সেইরূপ মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত—কারণ উহা অবধারিত। —দীনেশ সেন

ভাব-সম্প্রসারণ। মৃত্যুই জগতে একমাত্র সত্য বস্তু। জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যু। শস্য পাকিলে তাহা ভূমিতে পড়িবেই—কারণ তাহা অবধারিত। সেইরূপ জন্মিলে মরিতে হইবে, কারণ উহা নিশ্চিত সত্য। বিজ্ঞান, দর্শন—সব কিছুই মৃত্যুর কাছে হার মানিয়াছে। মানুষ জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধি পায়—এক একটি দিনের অবসান অর্থ আয়ু হইতে এক একটি দিনের ক্ষয়। মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা

পাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু মানুষ এই চরম সত্যকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। প্রতিনিয়ত সে মানুষের মৃত্যু দেখিতেছে, তবুও সে নিজের মৃত্যুকে, নিজ জীবনের অবসানকে অস্বীকার করিতে চায়, মৃত্যুকে ভুলিতে চায়। কিন্তু যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা জীবনের এই পরম সত্যকে সহজ মনে গ্রহণ করেন। তাঁহারা এই চরম সত্যকে অবিচলিত চিত্তে গ্রহণ করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করেন। যে মৃত্যু জীবনে অবশ্য আসিবে, তাহাকে স্থির চিত্তে গ্রহণ করিবার জন্য সকলেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া পক্ব শস্য যেরূপ অবিচলিত থাকে, তেমনি মানুষেরও স্থিরচিত্তে অবধারিত মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত।

২২। হাটে হাটে আমি ঘুরে বেড়াই
সে নহে করিতে হাট,
হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ। —যতীন্দ্রমোহন বাগচী (হাটে)

ভাব-সম্প্রসারণ। কৃষক সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সোনার ফসলে মাটি-মায়ের কোলকে ভরিয়া তোলে। বুকের রস সিঞ্চন করিয়া বসুমতী তাহার সেই সন্তানকে লালন করেন, কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। জীবধাত্রী ও জীবপালিনী বসুন্ধরা প্রাণজুড়ানো শ্যামলিমায় স্নিগ্ধ হইয়া ওঠেন। কিন্তু নিষ্ঠুর মানব-নির্যাতনে এক দিন এই ঐশ্বর্যহারা হইয়া মা বসুমতী অশ্রুমোচন করেন। মাঠকে রিক্ত করিয়া হাট-বাজার বিক্রয়ের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। হাটের সমৃদ্ধির পশ্চাতে মাঠের দীর্ঘশ্বাস এবং হাহাকার অনুক্ষণ স্পন্দিত হয়। একের শূন্যতার বিনিময়ে অপরে পূর্ণতা লাভ করে। কবির ভাবপ্রবণ মনে মাঠের এই হাহাকার সাড়া জাগাইয়াছে। তিনি মানস-নেত্রে মাঠের এই অশ্রুমোচন দেখিতে পান, হাটের ক্রন্দন তাঁহার হৃদয়কে মথিত করিয়া তোলে। তিনি দেখেন মাঠের রিক্ততা যেন হাটের ঐশ্বর্য-সমারোহের মাঝে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে।

২৩। সংশয়ই তো সত্যের জনক। সংশয় না হইলে জিজ্ঞাসা আসে না, জিজ্ঞাসা না আসিলে সত্য লাভ হয় না, তাই এ সংশয় বরণীয়
—গল্পে উপনিষদ্

ভাব-সম্প্রসারণ। আদিম মানবের বিচারবুদ্ধির যখন উন্মেষ হয় নাই, তখন তাহার মনে কোনও বিষয়ে সংশয় জাগিত না। সে যাহা দেখিত, যাহা শুনিত, তাহাই মানিয়া লইত। তাহার পর একদিন তাহার বিচারবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল, তাহার মনে সংশয় দেখা দিল। মানব-জাতির জীবনে সে এক শুভদিন। সে এতদিন যাহা জানিয়া আসিয়াছে, যাহা বুঝিয়া আসিয়াছে, তাহা ঠিক কি না, এ বিষয়ে বিচার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল। সেই সংশয়ের আকুলতার ফলে তাহার মনে নানা প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, তাহার সত্যকে জানিবার ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সে নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার ফলে সে একদিন সত্যের সন্ধান পাইল।

যে সকল সত্য আজ পর্যন্ত মানুষের অধিগত হইয়াছে, সবগুলি লাভেরই এই এক ইতিহাস—প্রথমে সংশয়, তাহা হইতে জিজ্ঞাসা, তাহার ফলে সত্যের সন্ধান লাভ। বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে কিছু মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে মানুষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধর্মে কোনও সত্য নির্ণয় করিতে পারিত না। তাই সত্য-সন্ধানীদের মনে সংশয় জাগা নিন্দার বিষয় নয়, বরং সত্যসন্ধানের প্রথম সোপান বলিয়া একান্ত কাম্য।

২৪। কীর্তিনাশা! বৃথা নাম! বৃথা অভিমান!
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্তি নাশিতে তোমার?
নাশিতে নরের সৃষ্টি সর্বশক্তিমান,
মানস-সৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার। —কীর্তিনাশা

ভাব-সম্প্রসারণ। পদ্মা নদীর আর এক নাম কীর্তিনাশা। বিক্রমপুরের চাঁদরায় কেদাররায়ের প্রাসাদ ও মঠ-মন্দিরাদি-শোভিত রাজধানী শ্রীপুর এবং রাজনগরের রাজা রাজবল্লভের নবরত্ন প্রভৃতি কীর্তি ধ্বংস করায় পদ্মার নাম কীর্তিনাশা হইয়াছে। এই পদ্মার তীরে মানুষ কতো সাধ করিয়া সৌধ নির্মাণ করিয়া সুখে বাস করিবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসের মতো এই নদী মানুষের স্বপ্ন-সৌধ গ্রাস করিয়া লয়। এমন করিয়া কতো ঐশ্বর্য সম্পদ যে কীর্তিনাশা পদ্মা গ্রাস করিয়াছে, তাহার আর হিসাব নাই। মানুষ যেখানে ঐশ্বর্য সম্পদের স্থায়ী স্তম্ভ গড়িতে চাহিয়াছে, সেখানেই কীর্তিনাশা তাহার কীর্তিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। মানুষের ঐশ্বর্যের দম্ভ কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না, এই শিক্ষাই আমরা কীর্তিনাশার ধ্বংসের রূপের মধ্যে পাই।

কিন্তু কীর্তিনাশা মানুষের লৌকিক ঐশ্বর্যের দর্প চূর্ণ করিলেও তাহার মানস-সৃষ্টিকে কখনও নষ্ট করিতে পারে না। যে মানুষ বাহিরের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের মধ্যে নিজের স্থায়িত্ব না চায়, তাহার বাহ্য ঐশ্বর্যের দম্ভ বিনষ্ট করিলেও অন্তর-ঐশ্বর্যকে কীর্তিনাশা কখনও বিনষ্ট করিতে পারে না। কীর্তি—সু-কীর্তি, কু-কীর্তি দুই প্রকারের হইতে পারে। লৌকিক ঐশ্বর্যের কীর্তি কখনও যে চিরস্থায়ী হইতে পারে না, কীর্তিনাশার ধ্বংসলীলা তাহাই প্রমাণ করে। কিন্তু মানস সৃষ্টিকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির কীর্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। কালিদাস নাই, সেকস্‌পীয়র নাই, রবীন্দ্রনাথ নাই, নিউটন, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি কেহই আজ নাই, কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টি আজও অম্লান দীপশিখার মতো উজ্জ্বল রহিয়াছে। কীর্তিনাশা অস্থায়ী কীর্তিই নাশ করিতে পারে, কিন্তু স্থায়ী কীর্তি, মহৎ কীর্তি নাশ করিবার শক্তি তাহার নাই। অস্থায়ী ঐশ্বর্য আড়ম্বরের মধ্যে মানুষের নিজেকে স্থায়ী করিবার চেষ্টাকে সে ব্যর্থ করিতে পারে, কিন্তু যে কীর্তি অবিনশ্বর, যে কীর্তি কল্যাণমুখী তাহার বিনষ্টি সাধনের ক্ষমতা তাহার নাই।

২৫। বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। —চরিতকথা (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

ভাব-সম্প্রসারণ। অনুবীক্ষণ নামক যন্ত্র বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় দান। এই যন্ত্রের দ্বারা ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখা যায়। বড় জিনিসকে ছোট করিয়া

দেখিবার কোন যন্ত্র এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমুন্নত মহিমার নিকট অপর সকলকেই নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়। ধবলগিরির স্পর্ধিত শিখরের পার্শ্বে ক্ষুদ্র অন্যান্য পর্বতশিখরের ক্ষুদ্রতা যেমন অতিমাত্রায় প্রকট, তেমনি বিদ্যাসাগরের মহৎ চরিত্রের তুলনায় অপর ব্যক্তিগণ একান্তই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে।

বিদ্যাসাগরের অত্যুজ্জ্বল চরিত্র-মাহাত্ম্যের নিকট অন্য সকল চরিত্রই প্রভাহীন হইয়া পড়ে। দুর্দমনীয় চরিত্রবল, উগ্র পুরুষকার, দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম, সমাজ-হিতৈষণা তাঁহার চরিত্রকে অন্য সকলের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের চরিত্র কোমলতা ও কঠোরতার সমন্বয়ে অপূর্ব। বিদ্যাসাগর বঙ্গারণ্যে বনস্পতি, বিদ্যাসাগরের চরিত্র স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত, সেই কারণেই তিনি অনন্যসাধারণ।

২৬। ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কর্তব্যের একটি সংজ্ঞা দেওয়া একবারে অসম্ভব, এটি কর্তব্য, এটি অকর্তব্য—এরূপ নির্দেশ করিয়া কিছু বলা যায় না।
—কর্মযোগ

ভাব-সম্প্রসারণ। কর্তব্যের একটি সংজ্ঞা দেওয়া মুস্কিল। অবস্থাবিশেষে মানুষবিশেষে কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। একজনের কাছে যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, অন্যের কাছে তাহা কর্তব্য নাও হইতে পারে। আবার একই ব্যক্তির পক্ষেও সময়বিশেষে কর্তব্য ভিন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ একজন লোক যদি পথে বাহির হইয়া এক জনকে গুলি করিয়া হত্যা করে, তবে সে হত্যাকারী বলিয়া শাস্তি পাইবে। মানুষ হিসাবে সে চরম কর্তব্য-জ্ঞানহীন বলিয়া আমরা মনে করিব। সেই লোকই যদি আবার সৈন্যদলে ভর্তি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ জনকে গুলি করিয়া হত্যা করে, তবে তাহাকে আমরা বলিব যে, সে তাহার যথার্থ কর্তব্য পালন করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক জাতির যাহা কর্তব্য, অপর জাতির তাহা কর্তব্য নহে। এক জন মার্কিন যাহা ভাবেন, যাহা তাহার দেশের রীতি অনুসারে করা ঠিক মনে করেন, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। একজন হিন্দু যাহা তাহার রীতিনীতি অনুসারে ঠিক মনে করেন তাহা করাই তাঁহার কর্তব্য। এই জন্য আমাদের কর্তব্য, যে সমাজে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহার আদর্শ অনুসারে এমন কাজ করা যাহাদ্বারা আমাদের জীবন মহৎ হয় এবং আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি। সকল যুগের, সকল দেশের, সকল সম্প্রদায়ের লোকের একটি মাত্র কর্তব্যই ঠিক যে, পরের উপকার করিতে হইবে। পরের পীড়নের কারণ হওয়াই পাপ অর্থাৎ অকর্তব্য।

২৭। অন্ন-বস্ত্র দান অপেক্ষা জ্ঞান দান উচ্চতর—প্রাণদান অপেক্ষাও উহা মহৎ, কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন। —কর্মযোগ, পৃঃ ৩৭

ভাব-সম্প্রসারণ। অজ্ঞানতা মানুষের নিকট মৃত্যুতুল্য। অজ্ঞানতা মানুষকে চিরতরে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। সংসার-পথে চলিবার সময় সে বন্ধুহীন হইয়া পড়ে। জ্ঞানই মানুষকে সৎ ও সুন্দর পথে বন্ধুর মত লইয়া যায়। অন্ন-বস্ত্র দান অপেক্ষা জ্ঞানদান তাই উচ্চতর। অন্ন-বস্ত্র দান করিলে মানুষের দৈহিক অভাব পূরণ

হয় মাত্র। তাই দান করিবার সময় আমরা যেন মনে না করি যে দান দৈহিক অভাব পূরণ করে সেই দানই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারে না। ক্ষুধার্ত হইলে দেহের যে কষ্ট হয় তাহা খাইলেই চলিয়া যায়। কিন্তু ক্ষুধা আবার আসিবে, আবার আমাদের কষ্ট দিবে। বস্ত্র দান করিলে, তাহা ছিঁড়িয়া গেলে আবার বস্ত্রের প্রয়োজন হইবে। বস্ত্র না পাইলে আমরা কষ্ট পাইব। শারীরিক অভাব পূরণ করে এইরূপ সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। কারণ শারীরিক অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং দুঃখ দিবে। এই দুঃখকে দূর করিবার জন্য মানুষকে জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ ও পবিত্র হইতে হইবে। মানুষকে জ্ঞান দিলে সেশিক্ষিত হইবে, আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইবে। তাহার মন হইতে অজ্ঞানতার কালিমা দূরীভূত হইলে, সে পবিত্র হইবে। জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন। কারণ জ্ঞানের আলোকে আলোকিত যে জীবন সে জীবনই আদর্শ জীবন। সংসারের দুঃখ-কষ্ট-ঝঞ্ঝা হইতে এ জীবনের কোন ভয় নাই। আধ্যাত্মিক বল-সম্পন্ন জীবন সংসারের বন্ধুর পথকে ভয় করে না।

অনুশীলন

১। মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। (চরিতকথা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

২। যে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না নেয়, সে পৌরুষশূন্য, কৃপার্হ। (রামায়ণী-কথা)

৩। মিত্রত্ব সর্বত্রই সুলভ, কিন্তু মিত্রত্ব রক্ষা করা কঠিন। (রামায়ণী-কথা)

৪। সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয় ; সংযোগ হইলে বিয়োগ ঘটে ; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। (বিদ্যাসাগর)

৫। আপনার জাতীয় অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশ-প্রিয়তার স্পর্ধা না করে ; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে। (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

৬। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে,
সে কখনও শেখেনি বাঁচিতে। (রবীন্দ্রনাথ)

৭। স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ তথা ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চারিত্রপূজা)

৮। 'তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশু-পক্ষীও জীবন ধারণ করে ; কিন্তু সে-ই প্রকৃতরূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।'
[মনের জীবন মনন-ক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব।]—রবীন্দ্রনাথ (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৫০)

৯। আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল। তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ-জীবিত ছিলেন। —রবীন্দ্রনাথ (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৫১)

১০। বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন, গতানুগতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না তাহার প্রধান কারণ, মানবজীবনই তাঁহার মুখ্যজীবন ছিল। (ঐ, চারিত্রপূজা, পৃঃ ৫৩)

১১। বিদ্যাসাগরের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি

রীতিমত হিন্দু ছিলেন, তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ১৫)

১২। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্র-মাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত-কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে। (ঐ)

১৩। দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৪৯)

১৪। পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দান-প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদান প্রত্যাশার অতীত। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৮৯)

১৫। রাষ্ট্র-ব্যবস্থটা দেহ মাত্র,—সেই দেহ নিরর্থক, যদি তার প্রাণ না থাকে। সেই প্রাণই জাতিগত ঐক্য। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৬২)

১৬। হেথা একদিন বিরামবিহীন···মহামানবের সাগরতীরে। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৭৮)

১৭। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। স্বামী বিবেকানন্দ (কর্মযোগ, পৃঃ ১৬)

১৮। পরোপকারে নিজেরই উপকার। —স্বামী বিবেকানন্দ (ঐ পৃঃ ৬০)

১৯। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবন যাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ। —স্বামী বিবেকানন্দ (কর্মযোগ)

২০। এই শিক্ষার (অনাসক্ত যোগের) সারমর্ম এই, প্রভুর মত কার্য করিতে হইবে, ক্রীতদাসের মত নয়। —স্বামী বিবেকানন্দ (কর্মযোগ)

২১। চার্চ ও স্টেট এদেশের (ইংলণ্ডের) সমাজের এপিঠ ওপিঠ। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ৮৭)

২২। ইংলণ্ড দিনকে দিন যতই গণতান্ত্রিক হচ্ছে ততই তার মহাপুরুষ-ভীতি বাড়ছে। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ৯৬)

২৩। মহাপুরুষেরা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৯৭)

২৪। তাঁর (রাজা রামমোহনের) হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৭৮)

২৫। সুপ্তি যখন আবিষ্ট করে, তখনই চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিপদ তখনই প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই, বাইরের দিক থেকে সে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। (চারিত্রপূজা [রামমোহন], পৃঃ ৭৪)

২৬। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। (চারিত্রপূজা [রামমোহন], পৃঃ ৬৩)

২৭। রামমোহন যথার্থ ই ভারত-পথিক ছিলেন। (রবীন্দ্রনাথ)

২৮। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। (রবীন্দ্রনাথ)

২৯। নিম্নলিখিত প্রবচনের ভাব-সম্প্রসারণ কর :—

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। কীর্তির্যস্য স জীবতি। দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।

ভাবার্থ (Substance)

কোন পদ্যাংশ বা গদ্যাংশের মূল ভাব বা বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া প্রকাশ করার নাম **ভাবার্থ-লিখন**। ভাবার্থ লিখনে নিম্নলিখিত কথা কয়টি মনে রাখিবে।

১। উদ্ধৃতিটি কয়েক বার পড়িয়া উহার মূল ভাব কি তাহা বুঝিবে। যেখানে যেখানে একটি বা একাধিক মূল ভাব আছে, তাহা চিহ্নিত কর।

২। অপ্রয়োজনীয় অপ্রধান ভাবের ভাবার্থ লেখার দরকার নাই। তবে প্রধান ভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যুক্তিমূলক কোনও কথা লেখা যাইতে পারে।

৩। বর্ণনা, অলঙ্কার, উপমা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি যথাসম্ভব বর্জন করিবে।

৪। আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করিবে না।

৫। কোন বিষয়ের বা কথার পুনরুক্তি যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে।

৬। উদ্ধৃতাংশে কোন উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকিলে তাহা পরোক্ষ উক্তিতে নিজের ভাষায় লিখিবে।

৭। উহাতে কোন কাহিনী থাকিলে তাঁহার মূলভাব সংক্ষেপে লিখিবে।

৮। ভাবার্থ যথাসম্ভব নিজ ভাষায় লিখিবে।

৯। উহার আয়তনের কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই।

১০। সাধারণতঃ উদ্ধৃতাংশের অর্ধেকের মতো হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

১। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র ··············· শিক্ষালাভ করিয়া যাইব।

—বিদ্যাসাগর-চরিত (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৪৮)

ভাবার্থ। বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় চরিত্র বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সকল নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও মনুষ্যহীনতার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিল। সেই ঊর্ধ্বে থাকিয়া তিনি দরিদ্র নিপীড়িত দুর্বল ও অসহায় দেশবাসীকে সকল প্রকার সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি নীরবে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের শত শত সাময়িক সভা-সমিতির চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক্। যদিও তিনি আমাদের মধ্যে নাই, তথাপি তিনি যে পৌরুষ ও মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রেরণার উৎস হইয়া আছে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মাহাত্ম্যের কথা মনে রাখিয়া আমরা সকল তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা ও আড়ম্বর ভুলিয়া ক্ষুধিত, নিপীড়িত ও অনাথদের কল্যাণের জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করিব।

২। অথচ তখন বিধবা বিবাহের আন্দোলনে············উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে।

—চারিত্রপূজা, পৃঃ ২৮-২৯

ভাবার্থ। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে দেশে অনেক আন্দোলন হয়। দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ বহু শাস্ত্র মন্থন করিয়া কিছুতেই বিধবা বিবাহ সমর্থন করিতে পারেন নাই। এমন কি দেশের পুরুষগণ বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াই স্বাভাবিক ঔদার্যবশতঃ বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। এই অসামান্যা রমণীর

হৃদয় ঈশ্বরদত্ত সৎগুণে বিভূষিত ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁহার অতুলনীয় চরিত্র মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার জননীর চরিত্র আলোচনা না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মাতা ভগবতী দেবীর চরিত্রের সমস্ত সৎগুণ বিদ্যাসাগর পাইয়াছিলেন। মাতা ভগবতী দেবী উদার ও উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার যোগ্য পুত্র তাঁহার সকল সৎগুণের অধিকারী বিদ্যাসাগরের মধ্যে তিনি অমর হইয়া আছেন। উভয়ে যেন একে অপরের অনুকৃতি।

৩। প্রতিদিন কি এরা স্খলিত হয়ে পড়ছে না দলে দলে······জীর্ণ ভাগ্যের তরী বাওয়া ? —চারিত্রপূজা (ভারতপথিক রামমোহন, পৃঃ ৬৯)

ভাবার্থ। আমরা যদি সকল ভারতবাসীকে এক করিয়া না লই, তাহা হইলে আমরা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইব। আমরা নিজের দেশবাসীকে যদি সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীদ্বারা ছিন্ন করি, তবে আমরা অনাত্মীয় দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িব। আপন জন যখন পর হয়, সে হয় অসম্ভব শত্রু। নিজের জনকে দুহাতে অবজ্ঞা ও ঘৃণা সহকারে দূরে সরাইয়া রাখিলে আমরা স্বজন-শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইব। আমাদের এই বিভেদের ফাঁক দিয়া একদা দেশে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। উচ্চ নীচ এবং সম্প্রদায়-বিশেষের ভেদজ্ঞান যদি আমরা ভুলিতে না পারি, তবে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব।

৪। তেমনি একদা·········ভারতের মহা অতিথিশালায়।

—চারিত্রপূজা (ভারতপথিক রামমোহন রায়, পৃঃ ৭১)

ভাবার্থ। রামমোহন রায়ের জন্মসময় ভারত সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা, কৃত্রিমতা ও অন্ধতা দ্বারা মোহাচ্ছন্ন ছিল। তিনি একাই দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের শাশ্বত রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্য। তাঁর হৃদয় দেশবাসীর ঐক্যের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো। ভারত চিরদিনই পৃথিবীর সবাইকে অবাধে স্থান দিয়েছে। রামমোহন তখনকার আচারবাদী সঙ্কীর্ণমনা দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করতে পারেন নাই, তিনি তিরস্কৃত হয়েছেন। কিন্তু তিনি কোন বাধা মানেন নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান প্রভৃতি সকল ভারতবাসীকে তিনি এই মিলন-ক্ষেত্রে মহামিলনের জন্য আহ্বান করেছেন।

৫। অন্য কোন দেশের··· ·· বাহ্য ব্যবস্থায় বিপদ নিবারণ হবে না।

—চারিত্রপূজা (ভারতপথিক রামমোহন রায়, পৃঃ ৬৫)

ভাবার্থ। জাতিগত ঐক্যই জাতির প্রাণ। অন্য দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখে আমরা মুগ্ধ হই। তাদের শ্রী দেখে আমরা লুব্ধ হই। কিন্তু তাদের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য তারা কত যে সাধনা করেছে সে কথা আমরা ভাবি না। তাদের বাহ্য রূপটি আমরা অনুকরণ করতে যাই। উন্নতির প্রাণশক্তি ঐক্য, যেখানে ঐক্যের অভাব হয়··· সেইখানেই সমস্যা। জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে পার্থক্য তার সামঞ্জস্য করতে না পারলে উন্নতির পথে বহু বাধা এসে দেখা দিবে।

৬। আবার যে দিন এই প্রভূত ....ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন।

—চারিত্রপূজা (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৮২)

ভাবার্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর চতুর্দিক হতে বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পৈতৃক ঐশ্বর্য ঋণের দায়ে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। মহর্ষির অপূর্ব হৃদয়-সম্পদ তাঁকে সকল বিপদ হতে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। সমৃদ্ধি ও সুখের দিনে তিনি যেমন ঈশ্বরগত-প্রাণ ছিলেন; তেমনি দুঃখ ঝঞ্ঝার দিনে তিনি তাঁর পরম নির্ভরস্থল হতে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। মহর্ষি অন্তরের জ্যোতি দিয়ে দুঃসময়ের অন্ধকার দূর করেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি সকল ঐশ্বর্যাভিমান ত্যাগ করেছিলেন। আর বিপদের দিনে তিনি হৃদয়ের ঐশ্বর্য সকলকে বিতরণ করবার জন্য সারা দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন।

৭। যাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের...... ...সহিত তুলনীয় ছিলেন।

—চারিত্রপূজা (বিদ্যাসাগর-চরিত, পৃঃ ১৯-২০)

ভাবার্থ। অধিকাংশ লোকই নিয়মবাধা পথে চলতে অভ্যস্ত। সেজন্য তাদের ভিতরকার মানুষটি চিরদিনই সুপ্ত থাকে। যাঁরা যথার্থ মানুষ, যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রকাশ বেশি, তাঁরা এই গতানুগতিক পথে চলতে চান না। প্রাচীন প্রথা ও অভ্যাসের দাসত্ব তারা সইতে পারেন না। যাঁদের হৃদয় মনুষ্যত্বের বলে বলীয়ান তারা কখনও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। এই সকল মহৎ ব্যক্তি যেমন নিজেদের বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তেমনি আবার সমগ্র মানবজাতির সঙ্গেও তাদের ভাই ভাই সম্বন্ধ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই এই দুইটি ভাব আমরা দেখতে পাই। একদিকে যেমন তারা ভারতবর্ষীয়, অন্য দিকে তেমন য়ুরোপীয় প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের চরিত্রের অনেক মিল আছে। এ সাদৃশ্য অনুকরণগত নয়। বেশভূষা আচার-ব্যবহার, শাস্ত্রজ্ঞান, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা খাঁটি বাঙালী ছিলেন। অথচ তাঁদের মধ্যে আমরা এমন কতকগুলি গুণ দেখতে পাই যা বাঙালী-চরিত্রে দুর্লভ। নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষণা ও আত্মনির্ভরতায় তাঁরা য়ুরোপীয় বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে তুলনীয়।

৮। সেই আমার বালক বয়সে তার সত্তার যে মূর্তি·· ......আকাশের বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন। —চারিত্রপূজা (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১০৫)

ভাবার্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত ছিল। তিনি পৃথিবীর সকল নীচতার ঊর্ধ্বে থেকে একাই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই তিনি ছিলেন একা। তাঁর বহু আত্মীয় ছিল, পরিবারে অনেক লোক ছিল, তথাপি তিনি সবার কাছে থেকেও দূরে থাকতেন তাঁর অনন্যসাধারণ মনোবৃত্তি নিয়ে। তাঁকে সাংসারিক কাজে লিপ্ত থাকতে হত, কিন্তু সে সব কাজের অনেক উপরে তাঁর মন থাকত। তিনি সকল বিষয়ে নিরাসক্ত ছিলেন। মহর্ষির ছেলেরা তাঁর কাছ থেকে যেটুকু উপদেশ ও আদেশ দরকার, তা পেতেন। তিনি তাঁর নিরাসক্ত মন নিয়ে উপনিষদের পুরুষের মত বৃক্ষের স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা রক্ষা করে চলতেন।

৯। আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নির্জনতা………কর্মের রহস্য অবগত হইবেন। —কর্মযোগ (পৃঃ ১৪-১৫)

ভাবার্থ। যিনি আদর্শ পুরুষ তিনি যথার্থ আত্মসংযম করিতে পারেন। গভীর নিঃস্তব্ধতার মধ্যে তীব্রভাবে কাজ করিতে পারেন আবার বিপুল কর্মযজ্ঞের মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ অনুভব করেন। যিনি কর্মের রহস্য জানেন, তিনি সর্বপ্রকার কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিজের মনকে শান্ত রাখিতে পারেন। আমাদের সম্মুখে যে কাজই আসুক তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রথমে আমরা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কাজ করিব, কিন্তু চেষ্টার দ্বারা ধীরে ধীরে আমাদের স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। যে দিন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে পারিব, সেইদিন আমাদের অন্তরে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইবে। আমরা তখন নিঃস্বার্থ কর্মী হইতে পারিব।

১০। আমরা সকলেই শুধু তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী………অমনি তাহার জন্য প্রশংসা চাহিতে আরম্ভ করি। — কর্মযোগ (পৃঃ ৯৭)

ভাবার্থ। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা কাজ করি। ইহার সহিত পুরস্কার কিংবা শাস্তির কোন সম্পর্ক নাই। পুরস্কারের আশা করিলে শাস্তি মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। সুখের জন্য লালায়িত হইলে দুঃখকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। পুরস্কার-শাস্তি, সুখ-দুঃখ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া চলে। জীবন ও মৃত্যুও তাই। জন্ম হইলেই মরিতে হইবে। জীবনের প্রতি অনুরাগ কমাইতে পারিলেই মৃত্যুভয় থাকিবে না। নিন্দা ও প্রশংসার ঊর্ধ্বে থাকিয়া কাজ করিতে পারিলে তবেই শান্তি। প্রকৃত মহাপুরুষগণ নাম ও যশের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কাজ করিয়া যান।

১১। আমরা জানি, কর্ম আমাদিগকে আঘাত দিতেছে,………প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। — কর্মযোগ (পৃঃ ১১৪)

ভাবার্থ। আমরা যখন সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজে বিফল হই তখন নিতান্ত আসক্তিবশতঃ সেই কাজ পরিত্যাগ করিতে পারি না। যতই আঘাত পাই না কেন, কর্মে আমাদের আসক্তি কমে না। তাই বারে বারে আমরা দুঃখ পাই। পৃথিবীতে আসিয়া আমরা এমন ভাবে সংসারে আকৃষ্ট হই যে, আসক্তির মধ্যে আমরা নিমজ্জিত হইয়া পড়ি। ভোগ করিতে আসিয়া ভুক্ত হই। শাসন করিতে না পারিয়া শাসিত হই। নিজের বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত না হইয়া অপরের বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হই। আমরা এইরূপে রিক্ত হইয়া পড়ি।

১২। ইংলণ্ড দেশটা যে কি সাংঘাতিক ছোট………অস্থির করে রাখে। —পথে প্রবাসে (পৃঃ ১২৬-২৭)

ভাবার্থ। ইংলণ্ড দেশটা বড় ছোট। প্রকৃতি এ দেশটাকে বড় ছোট করে গড়েছে। চারিদিকে সমুদ্র। মাথার উপর ছোট আকাশ। ইংলণ্ডের লোকেরা বড়কাছাকাছি থাকে, তাই এখানে যে আসে সেও বড় তাড়াতাড়ি সে দেশের সব কিছু

আয়ত্ত করে ফেলে। আমাদের ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এখানে আমরা অসীম আকাশে মনকে মুক্ত করে দিয়ে হাল্কা হতে দিতে পারি। কোটি কোটি তারা-খচিত আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমরা অসীমকে অনুভব করি। শত সহস্র তুচ্ছতাকে দূরে সরিয়ে ফেলে আমরা সীমাহীন বিপুলতা অনুভব করি। ইংলণ্ডের লোকের সময় নাই তুচ্ছ জীর্ণ প্রাত্যহিক ঘাত-প্রতিঘাতকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেবার। এদের যতিহীন জীবন অবিরত চলতে থাকে। মুহূর্তের জন্য অসীমকে অনুভব করবার সময় নাই। তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এতটুকু বিশ্রাম করবার সময় নাই। তাহলেই পিছিয়ে পড়তে হবে। বৃদ্ধ বয়সেও এদের অন্নচিন্তা ঘোচে না।

১৩। ভোগের আড়ম্বর ও ত্যাগের আড়ম্বর·········কচ্ছপ এগিয়ে যায়।

—পথে প্রবাসে (পৃঃ ১২১)

ভাবার্থ। ত্যাগের ও ভোগের আড়ম্বর যে সব দেশ সমান ভাবে ভোগ করে তাদের দেশে দুর্ভাগ্য সহজেই নেমে আসে। অতটা চরমপন্থা প্রকৃতি সহ্য করে না। অত্যাচারিত দাস ও অত্যাচারী রাজা উভয়ের মৃত্যু হয়েছে ইজিপ্ট ও গ্রীসে। ভারতবর্ষের এক একটি রাজবংশ কয়েক পুরুষ পর লোপ পেয়েছে। যারা বাইরে থেকে এসে ভারত জয় করেছে, তারাই আবার দুই চার পুরুষ পর অন্যের দ্বারা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ জাত মধ্যপন্থী। তাদের মেজাজ খুব গরম নয়, আবার নরমও নয়। তারা ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত। চরমপন্থী ফরাসী জাতি অগ্ন্যুৎপাতের মতন প্রবলভাবে নিজেকে প্রকাশ করে আবার নির্জীব হয়ে পড়ে। কচ্ছপ-গতি ইংরেজের কাছে এদের পরাজয় ঘটে।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিস বাঙ্‌লাদেশে চলে না। রামমোহন রায় বাঙলা ভাষার সাহায্যে বাঙ্‌লা-সাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই; তাঁহার পরবর্তী শিক্ষিত বাঙালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুণ্যতোয়ে বাঙলা ভাষাকে স্নান করাইয়া, তাহার দীপ্তকলেবর শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষিত সমাজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্তব্য বোধ করেন নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য-সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল। —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৩৫)

ভাবার্থ। রাজা রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টা বাঙ্‌লা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে পথ দেখাইলেন, বাঙ্‌লা সাহিত্যের সৃষ্টি সেই পথ ধরিল। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্ব বাঙ্‌লাদেশ স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

১৫। যাহার নাম ধর্ম তাহাই স্বভাব এবং স্বভাবের নামান্তরই স্বাস্থ্য। স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি এবং আমার বিবেচনায় আমাদের বর্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণ আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতা-রূপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জাবোধ করি না; আমরা স্বদেশীকে বিদেশীয় ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না। এই সকল অস্বাভাবিক আচরণ আমাদিগকে সর্বত্র অশোভন ও অসামঞ্জস্য করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজ জীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। যাহারা তাঁহার জীবনের আখ্যান জানেন, তাহারাই বলিবেন, এই অস্বাভাবিকতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি উৎকট ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সে দিন সঞ্জীবনী পত্রিকায় পড়িতেছিলাম, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মপ্রচার কালে ইংরেজী বাগ্মিতার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না।' এই একটি আচরণেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার বিরোধীরূপে দেখিতে পাই, অন্য উদাহরণের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।
—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ)

ভাবার্থ। যাহা ধর্ম তাহাই স্বভাব, তাহাই স্বাস্থ্য। যাহা উহার বিরোধী তাহাই ব্যাধি। বিদেশীয় অনুকরণ সব চেয়ে বড় ব্যাধি। বর্তমানে এ দেশের সমাজ পাশ্চাত্য অনুকরণরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত। বিদেশী বসন, বিদেশী ভাষা ব্যবহারে আমাদের কুণ্ঠা নাই। এই সকল অস্বাভাবিক আচরণ আমাদের পক্ষে অশোভন ও সামঞ্জস্যহীন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজ জীবনে ও কর্মে এই অকারণ অনুকরণকে প্রশ্রয় দেন নাই।

১৬। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সংগীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, তখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্র-মর্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য-মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সংগীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সংগীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভব করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ, মনে পড়িল। মুহূর্তের জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এই সংগীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সংগীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের প্রফুল্লতার

জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবন-সুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সে সময়ে এই পূর্ব-স্মৃতিসূচক সংগীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

—বঙ্কিমচন্দ্র (কমলাকান্তের দপ্তর, একা, পৃঃ ৪-৫)

ভাবার্থ। পৃথিবী, সংসার ও মনুষ্য-চরিত্র একই ভাবে থাকিলেও মানুষের হৃদয় পরিবর্তিত হয়। তাই কাল যাহা ভাল লাগিত, আজ আর তাহাতে আনন্দ হয় না। কিন্তু অতীতের কথা ভাবিলে মানুষের হৃদয় অতীত কালের অবস্থা ফিরিয়া পায়। তখন আগে যাহাতে আনন্দ হইত তাহাতে আবার আনন্দ পাওয়া যায়। যৌবনকালে শোনা গান বৃদ্ধ বয়সে শুনিলে যৌবনস্মৃতি জাগরিত হয়, সেই জন্য সে গান তখন এত মধুর মনে হয়।

১৭। "তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান-ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান-ঘ্যান করি না—মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান-ঘ্যান পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্র ঘ্যান-ঘ্যান। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে—মধু করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্তে ইংরেজের কামান, আকাশ-মার্গে আমাদের হুল। সে যাক, মধুকর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকণ্ডুয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না—জিবে কাষ্ঠকি দিয়া ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান-ঘ্যান ভাল লাগে না। এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল।

—বঙ্কিমচন্দ্র (কমলাকান্তের দপ্তর—বাঙালীর মনুষ্যত্ব, পৃঃ ৬০-৬১)

ভাবার্থ। তোমরা (বাঙালীরা) বড় বেশি কথা বল। তোমাদের কাজের ঠিক নাই, কিন্তু কথা বলা অবিরাম চলে। কথা একটু কম বল, কাজ বেশি কর। তাহা হইলেই শ্রীবৃদ্ধি হইবে, শক্তি বাড়িবে, বাধার সম্মুখীন হইতে পারিবে, লোকে তোমাদের সমীহ করিবে। চেষ্টা কর, তবেই কাজে মন বসিবে। আমরা ভ্রমরেরা কাজের সময় যেমন মধু সংগ্রহ করি, আবার প্রতিরোধের সময় হুলও ফুটাই। ভয়ে লোকে শঙ্কিত থাকে।

১৮। তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে অন্তরের অন্তর হইতে,
... ...
বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির। —রবীন্দ্রনাথ (সংকল্প, পৃঃ ৪৭)

ভাবার্থ। ভগবানের কাছে কবি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন, কবি যেন সকল দুর্বলতা পরিহার করিয়া সংসারের সব কাজে, সুখে-দুঃখে বীরের মত চলিতে

পারেন। ছোটকে যেন তুচ্ছ জ্ঞান না করেন, বলবানের নিকট যেন মাথা না নোয়ান। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেন প্রাত্যহিক তুচ্ছতা ও সকল হীনতার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন।

অনুশীলন

১। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ······সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ১৬)

২। ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে······জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ২৪)

৩। ঘুমের অবস্থায় মনের জানালা······যুগের মন্ত্র জপ করছে। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৬২)

৪। ধর্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা······পরিতৃপ্ত করিতে পারে। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৯৮)

৫। মহর্ষি একদিন······শেষ হইবে না। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৯৯)

৬। কিন্তু ওকথা আমরা······থেকে একই। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ৭৬-৭৭)

৭। ইংলণ্ড দিনকে দিন······অসমান করতে চায় না। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ৯৬)

৮। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য······করো জাগরিত। —রবীন্দ্রনাথ (সংকল্প ও স্বদেশ)

৯। প্রত্যেক ধর্মেই······সকল নীতি শিক্ষা ও দর্শনের লক্ষ্য। (কর্মযোগ, পৃঃ ১০২)

১০। দুঃখের ইহাই একটি বড় কারণ যে······দুর্বলতাই মৃত্যু। (কর্মযোগ, পৃঃ ১১৫)

১১। তারপরে আর একদিন তাঁহাদিগকে······কোন লাভে আমাদের সকল অন্বেষণ শান্ত হইয়া যাইবে। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ১১০)

১২। লড়াই যারা করে তারা প্রাণের দায়ে করে·····ভারতবর্ষকেও ঘুমাতে দিল না। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ৯৪-৯৫)

১৩। এখনকার ইংলণ্ডকে দেখে দুঃখিত হবার কারণ আছে······তাই এখন সে নিরাপদে ভোগ করতে চায়। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ১৩৭-১৩৮)

১৪। প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন······অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন। (আরণ্যক, পৃঃ ৮৯)

১৫। যদি সত্য কথা বলিতে হয়······না আমাকে কেউ চেনে, না আমি কাউকে চিনি। কি হইবে গিয়া? (আরণ্যক, পৃঃ ৩০)

১৬। যখনই আমরা কর্মের সহিত······আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর দাস হইয়া যাই। (কর্মযোগ, পৃঃ ৯২)

১৭। কর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন সমস্যা আসিয়া পড়ে······সে কি কোন নিভৃত স্থানে স্বস্তিতে বাস করিতে পারে? (কর্মযোগ, পৃঃ ১৪)

১৮। ধর্মান্ধ ব্যক্তি শুধু জানে না যে······তবে সে প্রচণ্ডভাবে সংসারে মগ্ন। (কর্মযোগ, পৃঃ ৭৮)

১৯। কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইউরোপ······বিধাতার অভিপ্রায়কে সফল করে তুলি। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ১৭০)

২০। এখন মনে হয়, তাঁর সেই নিঃসঙ্গতার অর্থ যেন কিছু কিছু······অনাসক্তি দেখে পিতামহ ক্ষুণ্ণ হতেন। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ১০৫-১০৬)

সার-সংক্ষেপ বা সংক্ষেপকরণ (Pre´cis)

সার-সংক্ষেপ বা সংক্ষেপকরণে বক্তব্য বিষয়টি কোন প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ না দিয়া অল্পকথায় লিখিতে হয়।

ভাবার্থ-লিখনের সঙ্গে ইহার প্রভেদ এই যে, ভাবার্থে মূল ভাবটির উপরে জোর দিতে হয়। আর, সংক্ষেপকরণে মূল বক্তব্যসহ কথাগুলি **সংক্ষেপে** লিখিতে হয়। আখ্যানমূলক তথ্যমূলক বা বর্ণনামূলক অনুচ্ছেদের সংক্ষিপ্তীকরণকে সাধারণতঃ সার-সংক্ষেপ বলা যায়। ভাবমূলক বা কল্পনামূলক রচনাংশের সংক্ষিপ্তীকরণকে ভাবার্থ বলা যায়। কখনও একই রচনাংশে তত্ত্ব ও তথ্য মিশ্রিত ভাবে থাকে, উহার ভাবার্থ বা সার-সংক্ষেপ দুই-ই করা যায়।

সংক্ষেপকরণে একটি **শিরোনামা** দিয়া মূল বিষয়-বস্তু নির্দেশ করিতে হয়। শিরোনামাটি এক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ, উহা দেখিলে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। শিরোনামাটি ছোট একটি বাক্যাংশ হইবে যাহাতে ক্রিয়াপদ থাকিবে না।

অতীত কাল ও প্রথম পুরুষ ব্যবহার করিয়া সার-সংক্ষেপ করিতে হয়। ভাবার্থ-লিখনে যেমন, সার-সংক্ষেপে তেমনই—(১) নিজের ভাষায় লিখিবে ; (২) না বলিলেও চলে এমন শব্দ ও অংশ বাদ দিবে ; (৩) বাহির হইতে কোনও নূতন ভাব বা বিষয় আনিবে না ; (৪) ব্যাখ্যা বা আলোচনা করিবে না ; (৫) শুধু প্রদত্ত শব্দ বা বাক্যগুলির হেরফের করিয়া দিলেই হইবে না ; (৬) পুনরুক্তি দোষ পরিহার করিবে।

সংক্ষেপকরণের দৈর্ঘ্য প্রশ্নপত্রের নির্দেশের উপর নির্ভর করে। কোন নির্দেশ না থাকিলে সংক্ষেপকরণের দৈর্ঘ্য মূল উদ্ধৃতিটির দৈর্ঘ্যের এক-তৃতীয়াংশ বা কমও করা চলে।

দৃষ্টান্ত

১। সোমবারে প্রাতঃসূর্যপ্রভাসিত······অন্য ডাকাইতি নাই।

—দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ

সার-সংক্ষেপ। **দেবীরাণীর দরবার ঃ** নিবিড় জঙ্গলে তিন শত বিঘা জমি সাফ করিয়া সামিয়ানার নীচে দেবীরাণীর দরবার বসিল সকাল বেলায়। গাছের ছায়ায় দশ হাজার লোক, মাঝে রত্নভূষিতা সুসজ্জিতা দেবীরাণী রূপার সিংহাসনে বসিয়া আছেন। দুই পাশে স্বর্ণদণ্ড চামর লইয়া বাতাস করিতেছে চারজন যুবতী। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবরদার। পাঁচশত সুসজ্জিত অস্ত্রশোভিত সশস্ত্র বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে, চারিদিকে লাল নিশান। দেবী সিংহাসনে বসিবার পর জয়ধ্বনি ও স্তুতিগান হইল, তারপর একে একে ভিক্ষার্থিগণকে রঙ্গরাজ দেবীর সম্মুখে আনিতে লাগিলেন। দেবী ভগবতীর অংশ বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তাই সকলে প্রণাম করিল। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া প্রত্যেককে প্রয়োজন অনুরূপ দান করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত দেবী অভুক্ত অবস্থায় দান করিলেন। দেবীর ডাকাইতি এইরকম ছিল।

২। প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল……শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

—দেবী চৌধুরাণী, ১ম খণ্ড, ১৫শ পরিঃ

সংক্ষেপকরণ। প্রফুল্লের শিক্ষা: প্রফুল্ল প্রথমে নিশিঠাকুরাণী ও পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিল। প্রফুল্লের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শিখিবার প্রবল ইচ্ছা, তদুপরি সে পরিশ্রমী। তাই প্রফুল্ল বর্ণশিক্ষা ইত্যাদি শীঘ্র শিখিয়া ফেলিল। তারপর একে একে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, সাংখ্য, বেদান্ত, যোগশাস্ত্র এবং সর্বশেষে গীতা অধ্যয়ন করিয়া পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিল।

৩। এমন বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধন হীন……কি করিয়াই আমার মন ভুলাইয়াছে চতুরা সুন্দরী। —আরণ্যক, পৃঃ ১০৮-১০৯

সার-সংক্ষেপ। সৌন্দর্যময়ী অরণ্যভূমির দুর্নিবার আকর্ষণ: লেখক একটি জঙ্গলে প্রজাদের মধ্যে জমি বিলি করিবার ভার লইয়া গিয়াছিলেন। কর্মক্লান্ত শহর হইতে যাইয়া অপূর্ব শোভামণ্ডিত নির্জন অরণ্যভূমি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রকৃতির এই শোভা ধ্বংস করিতে তাহার মন চাহিত না, তাই তিনি কেবলই প্রজা বসাইবার দিন পিছাইয়া দিতেছিলেন।

৪। গাছের নীচে ক্যাম্প-চেয়ার……সে মুক্ত জীবনের উল্লাস।

—আরণ্যক, পৃঃ ১৪৯

সার-সংক্ষেপ। মুক্ত জীবনের আনন্দ: চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা লেখককে মুগ্ধ করিয়াছে। বন্য ফুলের শোভা, মাটির ও ফুলের গন্ধ লেখকের মনে বহু স্মৃতি আনিয়া দিয়াছে। জনমানবশূন্য নির্জন প্রান্তরে আসিয়া লেখক মুক্ত জীবনের আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

৫। যথার্থ ভক্তির উপর……লজ্জাকর এবং নিষ্ফল।—চারিত্রপূজা, পৃঃ ১৩

সার-সংক্ষেপ। ভক্তির পাত্রকে জাঁকজমকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন লজ্জাকর: ভক্তির পূজা বারোয়ারিতলায় ঠিক ভক্তের মর্যাদা রাখে না। সে পূজা অনেকটা উত্তেজনা প্রকাশের মাধ্যম বলিয়া মনে হয়। ইষ্টদেবতার পূজার জন্য নিভৃত গৃহকোণই ভাল। আজকাল আমরা কোন মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য বিরাট সভা ডাকিয়া মহাসমারোহের সহিত শোক প্রকাশ করি। অনেক জাঁকজমক করিয়া ভক্তির পাত্রকে সভা ডাকিয়া সম্মান দেখান বড় লজ্জাকর।

৬। প্রতিভা মানুষের……সংশয় থাকিতে পারে না।

—চারিত্রপূজা, বিদ্যাসাগর-চরিত, পৃঃ ১৭-১৮

সার-সংক্ষেপ। প্রতিভা হইতে মনুষ্যত্বই শ্রেষ্ঠ: প্রতিভা মানুষের চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। কিন্তু মনুষ্যত্ব চরিত্রের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে। প্রতিভাধর ব্যক্তিকে দেখিয়া আমরা সহজে আকৃষ্ট হই, কিন্তু তাহার মধ্যে যদি আমরা কোনরূপ মহত্ত্ব না দেখি তবে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। মনুষ্যত্বই মানুষকে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

৭। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে·····পর্বতপ্রমাণ চরিত্র-মাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে। —চারিত্রপূজা, বিদ্যাসাগর, পৃঃ ১৫

সার-সংক্ষেপ। বিদ্যাসাগর যথার্থ মানুষ ছিলেনঃ বিদ্যাসাগর তখনকার পল্লী আচারের সঙ্কীর্ণতা ও বাঙালী জীবনের জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একাকী দৃঢ় পদক্ষেপে জীবন-তীর্থে যাত্রা করিয়াছেন। বড়লোক এবং নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগর আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র নহেন, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্বই তাঁহাকে চরিত্র-মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল করিয়াছে। করুণায় বিগলিত অপার মনুষ্যত্বই ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। তাঁহার কীর্তির চেয়েও তিনি মহৎ ছিলেন।

৮। দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়······সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। —চারিত্রপূজা, বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২৬-২৭

সার-সংক্ষেপ। ভগবতী দেবীর দয়া সংস্কারশূন্য ও অসাধারণঃ সাধারণতঃ মেয়েদের হৃদয়ে দয়া থাকে। কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়া ছিল অসাধারণ। তাঁহার দয়া প্রাচীন সংস্কারের মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাঁহার হৃদয় প্রদীপ্ত ও বুদ্ধি উজ্জ্বল ছিল। পুরাতন প্রথা ও শাস্ত্রের অনুশাসন তাঁহার দয়াবৃত্তিকে ম্লান করিতে পারিত না।

৯। বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার······তাহা পৌরুষ মহত্ত্ব লাভ করে না। —চারিত্রপূজা, বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৩৭-৩৮

সার-সংক্ষেপ। কারুণ্যে পৌরুষঃ বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর বলিয়া বিদিত। তাঁহার দয়ায় কেবলমাত্র কোমলতা প্রকাশ পাইত না। বিদ্যাসাগরের দয়া প্রকাশের মধ্যে চরিত্রের অপূর্ব বল প্রকাশ পাইত। অন্যের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি যে কোন কষ্ট সহজে বরণ করিয়া লইতেন। অপরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় এতই বিচলিত হইত যে, তিনি তাহা মোচনের জন্য জিদ করিয়া বসিতেন এবং দুঃখীর দুঃখ দূর না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁহার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিয়া যাইতেন।

১০। শত শত বৎসর চলে গেল······মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে। —চারিত্রপূজা, রামমোহন পৃঃ ৬২

সার-সংক্ষেপ। মননশীল ভারতের দুর্দিন। এমন একদিন ছিল যখন ভারত নিজের মননধারার অপূর্ব সম্পদ সমস্ত জগতের মধ্যে বিলাইয়া দিত। তারপর ধীরে ধীরে ভারতের দুর্দিন নামিয়া আসিল। তাহার চিন্তার মহানদী শুকাইয়া গেল। আমরা নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিতে ভুলিয়া গেলাম। আমাদের হৃদয় নিরর্থক অনুষ্ঠান, আচার, সঙ্কীর্ণতা ও স্থবিরতায় পূর্ণ হইয়া গেল। জগতের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

১১। **ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন……নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।** —চারিত্রপূজা, রামমোহন, পৃঃ ৬১

সার-সংক্ষেপ। গতিশীল নদীর তুল্য নিত্যপ্রবাহিত মননশীল জাতি। যে দেশের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হয়, সে দেশ শুধু উর্বরাই হয় না. সে দেশ পায় গতি। দূরের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। কিন্তু সেই নদী যদি শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অন্নপ্রাচুর্য কমিয়া যায় এবং বাহিরের সহিত তাহার যোগসূত্র নষ্ট হইয়া যায়। যে দেশের মননধারা নদীর মত সদা প্রবাহিত, সে দেশ নিজেদের ভেদাভেদ ভুলিয়া সকল দেশকে আপন করিয়া লয়, নব নব চিন্তাধারায় সার্থক হয়, অন্নদানে সকলকে পুষ্ট করে।

১২। পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরকে আর কাহারো……আমাদের সার্থকতা নাই। **—চরিত্রপূজা, পৃঃ ১০০**

সার-সংক্ষেপ। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণেই সার্থকতা ঃ ঈশ্বরকে অন্যের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যের উপদেশ শুনিয়া বা সম্প্রদায়ের বিধি বা অনুষ্ঠান পালন করিয়া যথার্থ চরিতার্থতা লাভ হয় না। ঈশ্বর অমৃত উৎস। সেখানে নিজে যাইয়া তৃপ্তি পাইতে হইবে। সে কাজ প্রতিনিধিদ্বারা হয় না। তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণেই সার্থকতা লাভ হয়।

১৩। তবে ধর্মসম্প্রদায় ব্যাপারটা ·····জলে কাটানো শক্ত।

—চারিত্রপূজা, পৃঃ ৯৮

সার-সংক্ষেপ। ধর্ম-পিপাসার জল, সম্প্রদায় জলপাত্র ঃ এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্মসম্প্রদায় তৃষ্ণা মিটাইবার জল নয়, উহা জল খাইবার পাত্র। যে ব্যাকুল হইয়া জলের জন্য তৃষিত, সে হাত পাতিয়াই জল পান করে। যার তীব্র তৃষ্ণা নাই, সে পাত্রটাকে দামী মনে করে। ফলে পাত্র লইয়া (অর্থাৎ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে) বিষম ঝগড়া শুরু হয়। ধর্ম বৈষয়িকতায় আবদ্ধ হইয়া দূরে সরিয়া যায়।

১৪। **প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে…………অধিকতর প্রেম-সম্পন্ন হইব এবং আরও ভালরূপে কর্ম করিতে সমর্থ হইব।**

—কর্মযোগ, পৃঃ ৭০-৭১

সার-সংক্ষেপ। পরোপকারে আত্মোপকার—অনুশীলনদ্বারা গোড়ামি ও ঘৃণা বর্জন, পরপ্রীতি সাধন ঃ জগৎকে সাহায্য করিলে আমরা নিজেরাই উপকৃত হইব। ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন, পৃথিবীর যাহা কিছু পরিবর্তন ও বিকাশের মূলে তিনিই। কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে এবং অনিষ্টকারীকেও ভালবাসিবে। কাহারও উপকার করিতে হইলে আগে গোড়ামি ত্যাগ করিতে হইবে, তারপর তাহাকে ভালবাসিতে হইবে। গোড়ামি থাকিলে প্রেম আসিতে পারে না। প্রেমও অনুশীলন-সাপেক্ষ। এই জগৎ একটি নৈতিক ব্যায়ামশালা, অনুশীলন সহায়ে আমরা অধিকতর আত্মিক শক্তিসম্পন্ন ও প্রেমবান্ হইব।

১৫। মৃত্যু শূন্যজীবন……তদনুযায়ী সুখবাদী বা দুঃখবাদী হয়।

—কর্মযোগ পৃঃ ১০৫-১০৬

সার-সংক্ষেপ। মৃত্যুশূন্য জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন ঃ জীবন ও মৃত্যু একটি সম্পূর্ণ জীবনের দুই দিক। অখণ্ড ভাবে জীবনকে দেখিলে মৃত্যুতে কোন দুঃখ নাই। জীবনের মধ্যেই মৃত্যু নিহিত আছে। বালক যখন মৃত্যু কি জানে না, সে তখন অতিমাত্রায় সুখী। কিন্তু বৃদ্ধ জীবন-মৃত্যু দুই-ই জানে, তাই সে বালকের মত সুখী হইতে পারে না। দেশের সভ্যতারও জীবন-মৃত্যুর ন্যায় উত্থান ও পতন আছে। যাহা আজ শহর আছে, তাহা হাজার বছর পর জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে বনে পরিণত হয়। মানুষ খণ্ডিতভাবে উত্থান-পতন দেখিলে সুখী ও দুঃখিত হয়।

১৬। এই সংসার চক্রের ভিতর চক্র……এই যন্ত্রের মধ্য দিয়াই ইহার বাহিরে যাইবার পথ।

—কর্মযোগ, পৃঃ ১০৮

সার-সংক্ষেপ। কর্ম করিয়াই কর্মের রহস্য জানা, কর্মত্যাগে নয় ঃ সংসারে আমাদের কর্তব্যের শেষ নাই। এক কর্তব্য শেষ করিলে আরেক কর্তব্য আসিয়া পরে। হয় এই কর্মযজ্ঞ হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে, সকল প্রকার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে, কর্ম করিয়াই কর্মের রহস্য জানিতে হইবে। ইহাই কর্মযোগ। কর্মের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলে তবেই কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে। কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মের মধ্য দিয়াই মুক্তির সহজ পথ।

১৭। আমাদের জীবনের বড় ত্রুটি……করিতে সমর্থ হই।

—কর্মযোগ, পৃঃ ১১৩-১৪

সার-সংক্ষেপ। উদ্দেশ্য ও উপায় বিষয়ে তুল্য যত্নে কার্যে সফলতা ঃ উদ্দেশ্য বা আদর্শ আমাদের চোখে বড় বেশি লোভনীয়। সেজন্য উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা দৃষ্টি দেই, সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়গুলির দিকে তেমন মনোযোগ দেই না। এই জন্য বিফলতা আসে। উপায়গুলিকে নিখুঁত ও দৃঢ় করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। উপায় বা কারণ শক্তিশালী হইলে সকল কার্য উৎপন্ন হইবে। আদর্শের উপলব্ধিই কার্য। উপায়গুলি কারণ। জীবন-সমস্যার সমাধানেরও ইহাই মূলকথা। গীতায়ও নিয়ত কার্য করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা অনাসক্ত ভাবে।

১৮। এ দেশে স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু সেই ……হায় হায় করে উঠল পৃথিবীর জননী-হৃদয়টা।

—পথে প্রবাসে, পৃঃ ৬২-৬৩

সার-সংক্ষেপ। ইংলণ্ডে প্রত্যেক ঋতুই অংশতঃ বর্ষাঋতু ঃ ইংলণ্ডে কম-বেশী সব ঋতুতেই বর্ষা হয়। সেখানকার আবহাওয়া বড় অনিশ্চিত। কখনও উজ্জল আলোকে চারিদিক ঝলমল করিতে থাকে। পাখীর কাকলি। গাছে গাছে

নূতন সবুজ পাতা, দূরন্ত বালকের মত বাতাস আসিয়া কচি পাতাদের ওলট-পালট করিয়া দিতেছে। লেখক মনে মনে ভাবিতেছেন, এমন আলো, এত ফুল, এত সুন্দর শ্যামল পৃথিবী, এমন ঈষৎ উষ্ণ হাওয়া, এত প্রাণবন্ত পাখী—এর মাঝে তিনি প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া লইবেন। কিন্তু হায়, অবিশ্বাসিনী (অবিশ্বাসী) প্রকৃতি—দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ ছাইয়া মেঘ আসিল। প্রকৃতির এমন শোভা নষ্ট করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

১৯। এটা পুনর্যাযাবরতার যুগ……আর পথে থামাই হচ্ছে পথিকের মৃত্যু। —পথে প্রবাসে, পৃঃ ৭৩

সার-সংক্ষেপ। এ যুগের মানুষ পথিক ঃ এ যুগের মানুষ ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। চলিতে চলিতে পথে অনেক বন্ধু মিলে। বিশ্বের খবর থাকে তাহাদের নখদর্পণে। কিন্তু তাহারা কাছের লোককে চেনে না। নিকটতম প্রতিবেশীর খবর রাখিতেও তাহাদের ইচ্ছা হয় না। কাছের লোকদের এরা দূরে সরাইয়া দেয়। লেখক আবার বলিতেছেন, বন্ধুত্বের বোঝা হালকা করা মন্দ নয়। প্রেম প্রীতির জালে জড়াইয়া পড়িলে ভ্রমণে বিঘ্ন হইতে পারে। চলার প্রেম আমাদের ঘরছাড়া করিয়াছে।

২০। চার্চ ও স্টেট এদেশের সমাজের এপিঠ ওপিঠ……যাই হোক না কেন তার ধর্মমত বা রিলিজন। —পথে প্রবাসে, পৃঃ ৮৭

সার-সংক্ষেপ। ইংলণ্ডের চার্চ সমাজের, হিন্দুর ধর্মমত ব্যক্তিগত ঃ ইংলণ্ডে চার্চ ও স্টেট একই সমাজের দুই দিক। সমাজপতিরা পার্লামেণ্টের কর্মকর্তা। চার্চ ওদের দেশে একটি সঙ্ঘ। চার্চ মানে শুধু গির্জা নয়। হিন্দু সমাজকে চার্চ বলা যায় না। হিন্দু কোন কঠিন নিয়মে আবদ্ধ নহে। স্বামী শাক্ত, স্ত্রী বৈষ্ণব ও সন্তান নাস্তিক হইতে পারে, তাহাতে হিন্দুসমাজের কিছু যায় আসে না। হিন্দুধর্ম ছিল একটা গোটা দেশের ধর্ম। পেশার দ্বারা জাতি নির্ণীত হইত।

২১। একদিন মানুষ প্রাণপণে যা চায় আরেক দিন……তাতে মানুষের লাভ বেশী না ক্ষতি বেশী? —পথে প্রবাসে, পৃঃ ৯৯

সার-সংক্ষেপ। গণতন্ত্র না অভিজাত-তন্ত্র? ইউরোপের মানুষ গণতন্ত্র হাতের মুঠায় পাইয়া এখন ভাবিতেছে যে, অভিজাত-তন্ত্রের কি কোন মূল্য নাই? খাওয়া-পরার দুঃখ ও পরাধীনতার কষ্ট দূর হইলেও যেন কোথায় ফাঁক থাকিয়া যায়। সারা দেশে কেবল লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক—কোথাও কোন মহাপুরুষ অথবা অসাধারণ কর্মযোগী নাই। ইহা ভাবিলেও যেন দেশটাকে রিক্ত মনে হয়। কালের গতিতে ক্যাপিটালিজম্ চলিয়া যাইবে। কিন্তু বুদ্ধির আভিজাত্য যদি থাকে তাতে দেশের ক্ষতি না লাভ বেশি?

অনুশীলন

১। যে দিকে চোখ যায়···শুধু বন্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতার জগৎ। (আরণ্যক, পৃঃ ১৪০)

২। চারিদিক নির্জন······ঐ তো কাছেই বন, রাত বেরাতের ব্যাপার। (আরণ্যক, পৃঃ ১২৮)

৩। জঙ্গলের মধ্যে ইহারা এত দূর কেন······বন্দুকের গুলি খাইবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। (আরণ্যক, ১৭৮-৭৯)

৪। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে······প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৪৮)

৫। এই জন্য বলিতেছিলাম······জাত নিয়াছে। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৯৭)

৬। এই গোঁড়ামি সম্বন্ধে আমার···হয়ত আত্মহত্যা করিতে। (কর্মযোগ, পৃঃ ৬৯-৭০)

৭। ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে······এ জ্ঞান জন্মিয়াছে। (কর্মযোগ, পৃঃ ৫৭)

৮। প্রত্যেক কর্মের ফলই······এই রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন। (কর্মযোগ, পৃঃ ১৩০)

৯। কিন্তু একটা না একটা দাসত্ব······চরকা কাটিয়ো না। (দেশে বিদেশে, পৃঃ ৪৮)

১০। ফরাসীদের প্যারিনগরীর······জীবিকাও যোগায়। (দেশে বিদেশে, পৃঃ ৫১)

১১। মহাযুদ্ধের অশেষ ক্ষতিকে স্বপ্ন ক'রে ····ইংলণ্ডের জনসাধারণ এমন সর্বজ্ঞ নয়। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ১০৯-১১০)

১২। কিন্তু এটা মিথ্যা নয়······না নিজের ছেলের মাতৃভূমি—কার প্রতি? (পথে প্রবাসে, পৃঃ ৭৭)

১৩। বসন্তকে যেমন কুঁড়ি ঝরাতে হয় সাথে···· স্বতরাং বাল্যকাল থেকেই বার্ধক্য চর্চা করতে হয়। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ১০৭-১০৮)

১৪। অধিকাংশের মন সজীব নয়······মননক্রিয়াকে সতেজ করিয়া তোলে। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৫২-৫৩)

১৫। ধন-সম্পদের স্বর্ণস্তূপ রচিত······বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৮৬)

১৬। শরীরগত অভাব পূরণ করিয়া······অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন। (কর্মযোগ, পৃঃ ৩৭)

১৭। কতকগুলি কার্য আছে, সেগুলি যেন······সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি একই প্রকার। (কর্মযোগ, পৃঃ ৯)

১৮। কর্মের জন্যই কর্ম কর······মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। (কর্মযোগ, পৃঃ ১২-১৩)

১৯। রাত্রি গভীর। একা প্রান্তর বাহিয়া আসিতেছি······সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই। (আরণ্যক, পৃঃ ১৫৮)

২০। নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন গড়ন······সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই। (আরণ্যক, পৃঃ ১০১)

সারাংশ (Summary)

সারাংশ (Summary) উদ্ধৃত অংশের এক বিশেষ ধরণের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইহাতে মূল উদ্ধৃতির ভাব, চিন্তা বা তথ্য যে ভাবে পরম্পর লিখিত আছে, সেই ক্রম অনুসারে সেগুলিকে **সংক্ষেপে** সাজাইয়া লিখিতে হয়। উদাহরণ ইত্যাদি যাহা থাকে তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হয়। এই কারণে সারাংশ আকারে সার-সংক্ষেপ বা ভাবার্থ হইতে কিছু বড় হইতে পারে। সারাংশে তোমার নিজস্ব ভাব বা উচ্ছ্বাস যেন না থাকে। প্রদত্ত অনুচ্ছেদের বক্তব্যই শুধু সংক্ষিপ্ত করিতে হয়। অনুচ্ছেদের বহির্ভূত কোন বিষয়ের অবতারণা করিবে না। একই ভাবের যেন পুনরুক্তি না হয়।

সারাংশ, ভাবার্থ, সংক্ষেপকরণ

ভাবার্থ (Substance), **সংক্ষেপকরণ** (Prec´ies) ও **সারাংশ** (Summary)—শব্দগুলি প্রায় সমার্থক। ইংরেজীতে যদি বা কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়, বাংলায় ব্যবহারে সাধারণতঃ উহা উল্লেখযোগ্য নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মূল উদ্ধৃতিটি (passage) সংক্ষেপ করিয়া উহার সার অর্থ, ভাব, বিষয় বা তথ্য পরিষ্কার ভাষায় লিখিতে হয়। ইহাদের প্রত্যেকটির বিশেষত্ব যথাস্থানে লেখা হইয়াছে।

ভাবার্থ বা সংক্ষেপকরণে প্রধান বা মূল ভাব বা তথ্য প্রথমে লিখিতে হয়। পরে গুরুত্ব অনুসারে অন্যান্য গৌণ বিষয় পর পর লেখা হয়। মূল ভাবটি অনেক সময় অনুচ্ছেদের মাঝখানে এমন কি শেষেও থাকিতে পারে। উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

প্রত্যেকটির অনুচ্ছেদ প্রথমে বার বার পড়িয়া বিষয়বস্তু স্থির করিবে। তারপর আবশ্যকীয় অংশ চিহ্নিত করিবে। চিহ্নিত অংশগুলি যথাসম্ভব নিজ ভাষায় গুছাইয়া লিখিলেই দেখিবে সংক্ষিপ্ত আকার আপনা হইতেই তৈরী হইয়া গিয়াছে।

দৃষ্টান্ত

১। গোটা দুই প্রকাণ্ড খাট জোড়া.........সিদ্ধেশ্বরীর রাত্রি পোহাইত।

—নিষ্কৃতি

ভাবার্থ। [একটি যৌথ পরিবারের অপূর্ব চিত্র এইখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্নেহ-মমতায় মাতৃত্বে সিদ্ধেশ্বরী ছিলেন আদর্শ গৃহকর্ত্রী।] দুইখানি বড় খাট জোড়া দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানা ছিল। এই প্রকাণ্ড বিছানাতেও সিদ্ধেশ্বরীর যায়গার অভাব হইত। কোন প্রকারে সঙ্কুচিত হইয়া শুইয়া তিনি রাত্রি কাটাইতেন। সারারাত্রি তিনি ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিতেন না। রাত্রি ভরিয়া তিনি বাড়ীর সকল ছেলের তদারক করিতেন। এমন কি তাহার অসুখের সময়ও কোন ছেলে তাঁহাকে ছাড়া তাহাদের বাবা-মার কাছে ঘুমাইতে যাইতে চাহিত না, তিনিও এক রাত্রির জন্যও কাহাকেও অন্য ঘরে শুইতে দিয়া শান্তি পাইতেন না। তাহার দুই ছোট জা'র এ বিষয়ে কোন কথা বলিবার সাহস ছিল না। প্রত্যেক ছেলের জন্য সিদ্ধেশ্বরীর ভাবনার অন্ত ছিল না। যাহার শোয়া খারাপ তাহার জন্য বেশী যায়গা রাখিতেন। যে ছেলে সারারাত্রি ঘুমের ঘোরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুইত তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। কে কাহার গায়ে পা তুলিয়া দিল, কে কাহাকে চাপা

দিল, সারারাত্রি ধরিয়া উঠিয়া উঠিয়া দেখিতেন। যাহার মাঝ রাত্রিতে ক্ষুধা পায় তাহার জন্য খাবার রাখিতেন। বাড়ীর সকল ছেলেকে তিনি সমভাবে আদর-যত্ন করিতেন।

২। দিন কাটিতে লাগিল······মেজবৌকেও ঠিক সেই মুহূর্তে অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিল। —নিষ্কৃতি

সারাংশ। নয়নতারা নানারকম কৌশল করিয়াও সিদ্ধেশ্বরীর নিকট হইতে সিন্ধুকের চাবিটি আঁচলে বাধিতে পারিল না। নয়নতারা অত্যন্ত চতুর ও কৌশলী ছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিত। কিন্তু প্রথমেই সে মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ। তাঁহার সরল হৃদয়ে নয়নতারা অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ছোটবৌ শৈলর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, তেমনি নয়নতারাকেও অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিলেন।

৩। অতুল ভিতরে ঢুকিয়া······বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল। —নিষ্কৃতি

সারাংশ। অতুল তাহার ছোট খুড়িমা শৈলকে ঠিক চিনিত না। শৈল স্ত্রীলোক হইলেও তাহার চরিত্র ইস্পাতের মত শক্ত ও মজবুত ছিল। যাহা তিনি সত্য বা ন্যায় বলিয়া জানিতেন তাহার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে কোন দিন দ্বিধা করিতেন না। অতুল শৈলকে চিনিত না বলিয়াই অন্যায় করিয়াও বুক ফুলাইয়া শৈলর নিকট গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শৈলকে চিনিবার অবকাশ অতুল পায় নাই। সে জন্মাবধি গুরুজনদের নিকট প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে বলিয়া মা, খুড়িমা ও জ্যাঠাইমা সম্পর্কে তাহার অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল, গুরুজনদের মুখের উপড় কড়া জবাব দিতে পারিলেই তাহারা জব্দ হইবে। নিজের ইচ্ছাটা খুব জোরের সহিত প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহা গুরুজন মানিয়া লইবে। হরিচরণকেও সে এইরূপ বুদ্ধি দিয়াছিল। কিন্তু শৈলর সম্মুখে যাইয়া অতুলের সকল বুদ্ধি লোপ পাইল। খুড়ীমার তাড়া খাইয়া কড়া কথার বদলে কোন প্রকার জবাবই তাহার মুখে আসিল না।

৪। একদিন দুপুরের পরে কাছারির পিছনে·········সেই হরিতকী তলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম কতক্ষণ। —আরণ্যক, পৃঃ ৩২

সারাংশ। বইহার ও শোধাইটোলার গ্রীষ্মের দুপুরের বর্ণনা পড়িয়া আমরা বুঝিতে পারি কি প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ সেখানে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশের গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ দুপুরের সহিত এখানকার গ্রীষ্মের রুদ্র মূর্তির তুলনা হয় না। সূর্যের তাপ যেন সমস্ত অরণ্য ও তৃণভূমিতে আগুন ঢালিয়া দিতেছে। সে তাপে বিস্তৃত অরণ্য শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। সুদূর-প্রসারী শ্যামল তৃণভূমির সমস্ত রসটুকু শুকাইয়া লইয়া তাহাকে পোড়াইয়া ফেলিতেছে। চারিদিক প্রচণ্ড তাপে অস্পষ্ট কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আকাশ মেঘশূন্য হইলেও নীল নহে—তাম্রাভ। কোথাও একটি পাখীও দেখা যায় না। প্রবল তাপদগ্ধ পৃথিবীর এই ধ্বংসলীলা দেখিতে ভাল লাগে।

৫। এই মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র বন প্রান্তরের……বিনিময় করিতে চাই না।
—আরণ্যক, পৃঃ ৫৮

সারাংশ। লেখক সংসারে আবদ্ধ জীবন পছন্দ করেন না। সহরের আবহাওয়া-মুক্ত উন্মুক্ত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনপ্রান্তর লেখককে আকর্ষণ করে। তিনি প্রকৃতির রুক্ষ শোভার মাঝে মুক্তির আনন্দ অনুভব করেন। জ্যোৎস্নালোকিত উন্মুক্ত আকাশের তলে পাহাড়ে রাস্তার দুই পাশে পলাশ বনের মধ্যে দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিতে পারিলে লেখকের আর কোন সম্পদের দরকার হয় না।

৬। একদিন এই ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিনে………দাবানল তো আসিয়া পড়িল।
—আরণ্যক, পৃঃ ৩৬

সারাংশ। প্রবল জলকষ্ট ও প্রচণ্ড উত্তাপের সময় একদিন দুপুরবেলা খবর আসিল, ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে। আগুন কাছারি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে নৈঋর্ত কোণ হইতে। আগুন মাত্র মাইলখানেক দূরে আছে। ঘাস, ঝাউবন জঙ্গল সমস্ত রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া বারুদের মত হইয়া আছে। লাল অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া আকাশে উঠিয়াছে। স্ফুলিঙ্গ পড়িবামাত্র শুষ্ক গাছপালা জ্বলিয়া উঠিতেছে। ঝড়ের বেগে আগুন কাছারী বাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সকলে মিলিয়া দাবানলে পুড়িয়া মরার উপক্রম হইল।

৭। সন্ধ্যায় দুজনে ঘোড়া ছাড়িলাম……দুটি মাত্র প্রাণী আমরা।
—আরণ্যক, পৃঃ ৯১

সারাংশ। লেখক ও সুজন সিং দুজনে ঘোড়া চড়িয়া জঙ্গলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আকাশে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ। সমস্ত বনপ্রান্তর জুড়িয়া অস্পষ্ট চন্দ্রালোক—লেখককে অভিভূত করিয়াছিল। উঁচু, নীচু রাস্তার উপর দিয়া তাহারা চলিতেছিলেন। চারিদিকে কাশ ও ঝাউবন মাঝে মাঝে ঝোঁপঝাপ। সাদা বালির উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছিল। তাহারা যতই চলিতেছিলেন ততই চারিদিকের দৃশ্য স্পষ্টতর হইতেছিল। এক দিকে প্রান্তর, অন্য দিকে জঙ্গল। বাঁ দিকে নীচু পাহাড়ের শ্রেণী। চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে, লেখকের মনে হইতেছিল তাহারা অজানা গ্রহে চলিয়া গিয়াছেন।

৮। সে দিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল …..পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে।
—আরণ্যক, পৃঃ ১০২

সারাংশ। লেখক জোৎস্নাপ্লাবিত হ্রদের জল দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন এই অপূর্ব হ্রদের শোভার মাঝে নিশ্চয়ই বনদেবীরা আসিয়া জলকেলি করে। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল। দূরে বন ও পাহাড় দেখা যাইতেছিল। রাতে-ফোটা ফুলের গন্ধ আসিতেছিল। বন ও পাহাড় বেষ্টিত হ্রদের জল হৈমন্তী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছোট ছোট ঢেউ-এর মাথায় পড়িয়া অপার্থিব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বড় বড় গাছের মাথা ভোমরা লতার সাদা ফুলে ঢাকা

ছিল। তাহাতে চাঁদের আলো পড়িয়া মনে হইতেছিল পরীদের সাদা কাপড় উড়িতেছে।

৯। কি সুন্দর রৌদ্র······শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে জুড়াইয়া দিবে।

—আরণ্যক, পৃঃ ২০৭

সারাংশ। অদ্ভুত সুন্দর নীল আকাশ ও রৌদ্রের অপূর্ব সোনাগলা রং লেখকের মনকে অভিভূত করিয়াছিল। কচি পাতা ও পল্লবের উপর রোদ পড়িয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছিল। নাড়া বইহার ও লবটুলিয়ার জঙ্গলের পাখীর বাসা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় পাখীরা অন্যত্র নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের অবিশ্রান্ত ডাক শোনা যাইতেছে। লেখক ঘন বনে প্রবেশ করিয়া শান্তি ও অবাধ মুক্তির স্বাদ পাইলেন। কত গাছ, কত বনফুল, কত বড় বড় পাথর, যেখানে ইচ্ছা শুইয়া পড়িয়া নির্জন প্রকৃতি হইতে শান্তির প্রলেপ লইয়া শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে জুড়াইয়া দেওয়া যায়।

১০। তেমনি একদা যে দিন বাংলাদেশে······এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহাঅতিথিশালায়।

—চারিত্রপূজা, পৃঃ ৭

সারাংশ। রামমোহন যে সময় বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বাংলাদেশ ঘোর সাম্প্রদায়িকতায় ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সেই দুর্দিনে তিনি ভারতের নিত্য পরিচয় বহনকারী সাম্যের পতাকা লইয়া একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন তাঁহার চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থা। আচারবাদী দেশবাসী তাহাকে ধিক্কার দিতেছে। ভারতের শাশ্বত ঐক্যের বাণী লইয়া তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান প্রভৃতি সকল জাতিকে এক আসনে বসিবার আহ্বান জানাইলেন। তাঁহার হৃদয় সকলের জন্য প্রসারিত ছিল। তাঁহার বুদ্ধি সর্বতোমুখী ছিল।

১১। যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক······জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল।

—চারিত্রপূজা, পৃঃ ৭৫

সারাংশ। রামমোহন রায় যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময় আমাদের চরম দুরাবস্থা। তখন আমরা মোহাবৃত ছিলাম, আমাদের কোন স্বাধীন বুদ্ধি ছিল না। যুগোপযোগী কোন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে জানিতাম না। সনাতন নিয়ম বলিয়া যাহা আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম তাহা আমাদের চিরদিনের নয়, তাহা আগন্তুক। রোগ দেহে দীর্ঘ দিন বাস করিলেই তাহা দেহের অঙ্গ হয় না, তাহা মাত্র বাহিরের জিনিষ। সেইরূপ ভারতের চিরপুরাতন চিরনূতন জ্ঞানভাণ্ডার যাহা একান্ত ভারতের সাধনার ধন তাহা রামমোহন সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দেশবাসী তাঁহাকে তখন ভাল চোখে দেখে নাই।

১২। আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে······কারণ জনতাকে বন্দী করার দুর্গ প্রতিষ্ঠা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

—চারিত্রপূজা, পৃঃ ১০৯

সারাংশ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংসারে অত্যন্ত নিরাসক্ত ছিলেন, তাই তিনি আত্মীয়-পরিজন পরিবৃত হইয়াও নিঃসঙ্গ ছিলেন। তিনি সর্বদা আত্মসমাহিত

থাকিতেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সকলের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া এই আশ্রমের মাধ্যমে জনসাধারণের সহিত মঙ্গল-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই আশ্রমটি যেমন ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতীক, তেমনি ইহা ছিল তাঁহার আত্মার আনন্দের প্রতীক। উপনিষদের মহামন্ত্র তিনি উপলব্ধি করিতেন। কিন্তু তাহা জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য এই উপলব্ধির আনন্দকে ছোট অথবা বিকৃত করিয়া দেখান নাই। তাই তিনি বিশেষ সম্প্রদায় গড়েন নাই। কারণ তিনি মানুষকে সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ করিবার বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজের জীবন দিয়া জ্ঞান ও প্রেমের আদর্শ শিখাইয়া গিয়াছেন।

১৩। বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে……সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। —চারিত্রপূজা, পৃঃ ৪২

সারাংশ। বিদ্যাসাগরের হৃদয় যেমন বলিষ্ঠ ছিল, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও তেমনি সবল ছিল। বাঙালীর বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, তাহার দ্বারা সে সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারে; কিন্তু সে বুদ্ধিতে বলিষ্ঠতা নাই। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ এবং ন্যায়-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তথাপি তাহার কাণ্ডজ্ঞান প্রবল ছিল। যদিও তিনি শৈশবে বহু দারিদ্রতা-জনিত কষ্ট পাইয়াছেন তথাপি তাঁহার চাকুরীর মোহ ছিল না। তিনি অনায়াসে চাকুরী ছাড়িয়া মধ্য বয়সে স্বাধীন জীবিকার দ্বারা অবস্থা স্বচ্ছল করিয়াছিলেন। কাহাকেও দয়া করিতে হইলে তিনি নিজের স্বার্থ বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করিতেন। আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য তিনি কাহারও বুদ্ধিতে এক চুলও নিজের সংকল্প হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেন না। বিদ্যাসাগর নিজের বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও দৃঢ়তার দ্বারা সংগতিশালী হইয়াছিলেন এবং নিজে বাল্যে দরিদ্রতায় কষ্ট পাইয়াও সহস্র সহস্র সাহায্য প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিয়াছিলেন।

১৪। দূর থেকে শুনতুম অস্ট্রিয়ানদের মরো মরো অবস্থা……তোমার তেলা মাথায় তেল ঢালবেন। —পথে প্রবাসে, পৃঃ ১১৭

সারাংশ। লেখক যখন দূরে ছিলেন তখন শুনতেন অস্ট্রিয়ানদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু কাছে যাইয়া দেখিলেন আমাদের তুলনায় তাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। তারা সামান্য অসুবিধা সহ্য করিতে পারে না। লণ্ডনে যদি কেউ যুদ্ধে মরে তার জন্য কারও ভাবনা থাকে না, কিন্তু অনশনে মরিলে দেশে প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ হয়। আমাদের দেশের মেয়েরা কুড়িতে বুড়ী, ওদের দেশের মেয়েরা পঁয়ত্রিশে বুড়ি হইলেও দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। আমাদের গোটা দেশটাই যেন আত্মহন্তা। আমরা পরম সহিষ্ণু। আমরা বলি নিজের উপকার হইতে পরের উপকার করাই শ্রেয়। ওরা বলে নিজের উপকার কর, তবে ভগবান তোমাকে সাহায্য করিবেন।

১৫। শীতকালের ইংলণ্ড যদি নরকের মত……কিন্তু বর্ষার জল দাঁড়াবার মতো একটু সমতল খুঁজে পায় না। —পথে প্রবাসে, পৃঃ ১৩৩

সারাংশ। ইংলণ্ডের আবহাওয়া শীতকালে খুব খারাপ থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে আবার চমৎকার হয়। যদিও সে সময় রোজই সূর্য ওঠে না, তথাপি ফুল ও পাতার

শোভা ও পাখির কাকলিতে মন ভরিয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক গঠনও খুব সুন্দর। কোন যায়গাই সমতল নয়। যেখানে সমতল দেখা যাবে তাহা মানুষের তৈয়ারী। ইংলণ্ডের সমাজে যে সরলতা আছে ইংলণ্ডের ভূমি গড়নে সে সরলতা নাই। ইংলণ্ডে শীতকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে বর্ষা থাকে, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর হয় না। কারণ সেখানে জল জমে না।

১৬। তবু ভারতবর্ষের লোকের সব দেশের চেয়ে······কারণ অন্য দেশকে ভারতবর্ষের দরকার ছিল না। —পথে প্রবাসে, পৃঃ ১৪২

সারাংশ। ভারতীয়দের উচিত ইংলণ্ডে যাওয়া, কারণ ইংলণ্ড হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। ইংলণ্ডের যে গুণ আছে ভারতের সে গুণ নাই, আবার ভারতের যে গুণ আছে ইংলণ্ডের সে গুণ নাই। এজন্যই ভারতের সাথে বিধাতার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডের যোগাযোগ ঘটিয়াছে। ফ্রান্স জার্মানি রাশিয়া হইতে লোক আসিয়াছে, আবার তারা দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। আমরা স্বাধীন হইবার পর ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে পারি নাই। ফ্রান্স জার্মাণী রাশিয়ার সহিত আমাদের চরিত্রের মিল আছে, তাহাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষের আয়ত্ত করিবার বিশেষ কিছু নাই, ইহারা আমাদের স্বগোত্র। কিন্তু ইংলণ্ডের গোত্র আলাদা। ভারতবর্ষ সবাইকে আহ্বান করে, ইংলণ্ড সবাইকে পথে বাহির করে। ইংলণ্ড খুঁজিয়া বেড়ায় আর ভারত খোঁজার শেষ কোথায় বলিয়া দেয়। ভারতবর্ষ ত্যাগের মাঝেই ভোগের সুখ অনুভব করে। ঋষি হইয়াও গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে। ইংলণ্ড বিপদকে বরণ করিতে এতটুকু দ্বিধা করে না, আর ভারত শান্তির প্রয়াসী।

১৭। পাঁচে পাঁচে দশ বৎসর······তখন সব বে-আইন।

—দেবী চৌধুরাণী, ২য় খণ্ড, ১ম পরিঃ

সারাংশ। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর দশ বৎসর গিয়াছে। হরবল্লভ রায়ের পক্ষে সময়টা খারাপ কাটিয়াছে। ইজারাদার দেবী সিংহের খাজনা দিতে গিয়া হরবল্লভ সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। কিন্তু জমিদারী চাল না কমায় হরবল্লভের অনেক খাজনা বাকী পড়িল। তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা বাহির হইল।

১৮। ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া······ছিপ খোল।

—দেবী চৌধুরাণী, ২য় খণ্ড, ৩য় পরিঃ।

সারাংশ। বজরার ছাদে গালিচায় বসিয়া এক রূপবতী বীণা বাজাইতেছিল। নানা রকম ভাবে, নানা রাগ-রাগিণীতে বাজনা হইতেছিল। হঠাৎ বীণায় নতুন সুর বাজিতেই রঙ্গরাজ নিঃশব্দে দেবীর কাছে আসিল। দেবী দুরবীন দিয়া দূরে একটি বজরা দেখাইলেন এবং ছিপ খুলিয়া নিঃশব্দে উহার দিকে যাইতে বলিলেন।

১৯। সন্ন্যাসিনী রমণীকে······মত কেহ না।

—দেবী চৌধুরাণী, ৩য় খণ্ড, ১ম পরিঃ

সারাংশ। **লাঠির প্রতাপ:** সন্ন্যাসিনী দেবীকে ধরিবার জন্য আয়োজন হইল প্রচুর। কারণ হাজার লাঠিয়াল বরকন্দাজ দেবীর আজ্ঞাধীন। তাহাদের লাঠিতে জোর

ছিল। তখন লাঠির চোটে তরবারি দুই টুকরা হইয়াছে, ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, হাত ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুক ও সঙ্গীন হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি বাংলার মান ধান ধন জন মন সবই রাখিয়াছে। লাঠি ছিল তখনকার পীনাল কোড। কিন্তু পীনাল কোডের চেয়েও লাঠির ক্ষমতা বেশি ছিল—লাঠির ওপর আপীল চলিত না। এখন লাঠি শুধু বংশখণ্ড মাত্র, তাহার সে প্রতাপ আর নাই। লাঠি এখন ছড়ি হইয়া ফুলবাবুদের হাতে শোভা পাইতেছে।

সার-সংক্ষেপ। লাঠির প্রতাপ ঃ সন্ন্যাসিনী দেবীকে ধরিবার জন্য প্রচুর আয়োজন হইল। দেবীর লাঠির জোর ছিল। তাঁহার হাজার লাঠিয়াল বরকন্দাজ ছিল। তখন লাঠিই ছিল শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। বাংলার ধন মান সব কিছু লাঠিই রক্ষা করিত। লাঠি ছিল তখনকার পীনাল কোড, বরং তাহার চেয়েও শক্তিশালী। এখন লাঠির সে মান নাই।

[একই অনুচ্ছেদের দুই প্রকার সংক্ষিপ্ত রূপ]

অনুশীলন

১। ব্রজেশ্বর নামিয়া কামরার ভিতর······সিপাই পরাস্ত হইল। (দেবী চৌধুরাণী, ৩য় খণ্ড, ৭ম পরিঃ)

২। দেবী। সে বিষয়ে আমার······এ কি অধর্ম। (দেবী চৌধুরাণী, ২য় খণ্ড, ১০ম পরিঃ)

৩। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী···পুরস্কার দিবেন বলুন। (দেবী চৌধুরাণী, ৩য় খণ্ড,১ম পরিঃ)

৪। এতক্ষণে হরিশ মুখ ফিরাইয়া······এমন কোন দিন নয়। (নিষ্কৃতি, ৯)

৫। এদিকে তর্কভূষণ মহাশয়ের বান······সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ২২)

৬। নিজের অশন-বসনেও বিদ্যাসাগরের······মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৪৬)

৭। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন······অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন। (চারিত্রপূজা, পৃঃ ৯২)

৮। তারপর হিমালয়ের কথা। তীব্র শীতের প্রত্যূষে······ (চারিত্রপূজা, পৃঃ ১০৮)

৯। আমায় বিস্মিত করেছে।

১০। প্রত্যেকের কর্তব্য নিজ নিজ আদর্শ···বিচার করা আবশ্যক। (কর্মযোগ, পৃঃ ২১)

১১। হিন্দুশাস্ত্রমতে······ধর্মশিক্ষা দিবেন। (কর্মযোগ, পৃঃ ২২)

১২। ছোট খুড়িমার তাড়া খাইয়া······দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (নিষ্কৃতি, পৃঃ ৩)

১৩। কাছেই হাইকোর্ট। হাইকোর্টটি······ক্যাথিড্রালকে হার মানায়। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ১৪১)

১৪। সে যাই হোক, ইংলণ্ডের······ছেলেরা বাইরের কাজে ব্যস্ত। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ৬৭)

১৫। এতক্ষণ (রলাঁ) সহজভাবে কথা······যুদ্ধের প্রতিষেধ শিক্ষা। (পথে প্রবাসে, পৃঃ ৪৪)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

আদিযুগ

প্রথম অধ্যায়

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্‌ভব, বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন ও যুগবিভাগ

১. বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্‌ভব :

সাহিত্যের সঙ্গে জনজীবনের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক থাকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাঙালী জাতির দীর্ঘকালের ধ্যানধারণা ও চিৎপ্রকর্ষের পরিচয়টি সাহিত্যের মধ্যে উজ্জল বর্ণে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাই বাংলা সাহিত্য আলোচনার পূর্বে বাঙালী জাতির পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

'জাতি' এই শব্দটা বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন ইংরেজ জাতি ও ভারতীয় জাতি, হিন্দু জাতি ও মুসলমান জাতি, ব্রাহ্মণ জাতি ও কায়স্থ জাতি, আবার বাঙালী জাতি ও অসমীয়া জাতি। এই শেষোক্ত জাতি প্রাদেশিক মানুষের পরিচয় জ্ঞাপক।

ভারতবর্ষ বহু প্রদেশের সমষ্টি একটি ক্ষুদ্র মহাদেশ স্বরূপ। ভারতীয়তা বলতে একটি ভাবগত আদর্শ। ভারতীয় সভ্যতা বলতে এক মিশ্র সভ্যতা। ভারতবর্ষে জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে বহু ভাষাভাষী মানুষের বাস। এখানে বিভিন্নতার অন্ত নেই। কিন্তু ভারত সভ্যতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে একটা নিগূঢ় ঐক্য বর্তমান। ঐতিহাসিক **Smith** সাহেব তাই বলেছেন—**"India offers Unity in Diversity."**

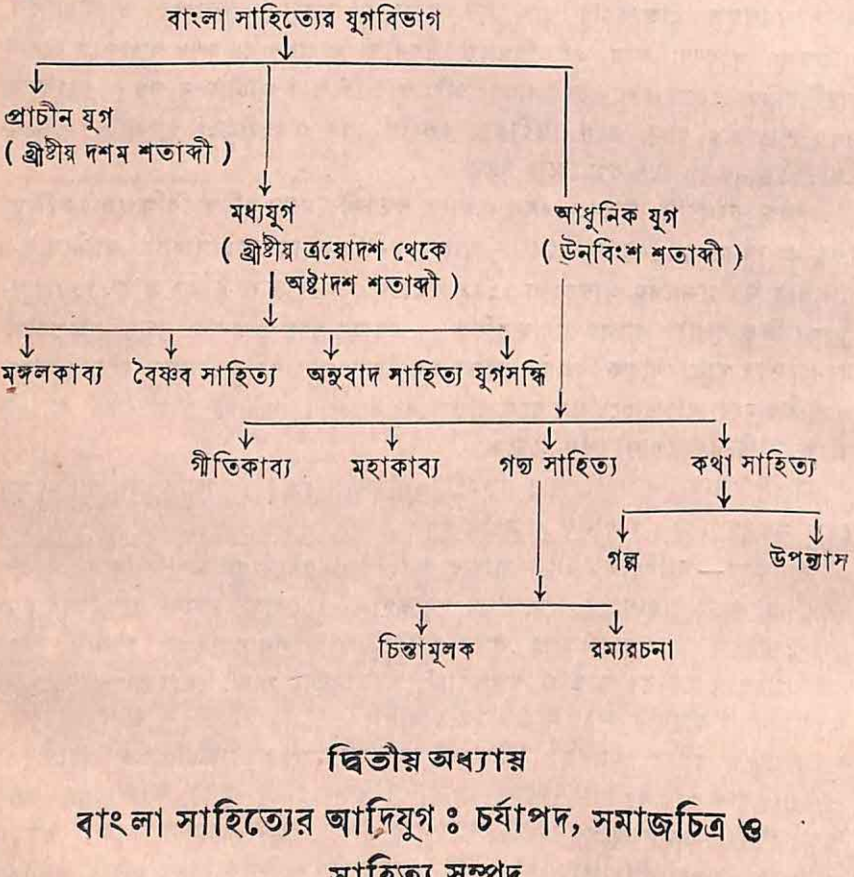
এক মহাজাতি প্রতিষ্ঠা ভারতের লক্ষ্য হলেও প্রাদেশিক স্বরূপতাকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। বাঙালী জাতি বলতে বাংলাদেশের অধিবাসী বাংলাভাষী মানুষের কথাই বোঝায়।

বর্তমান বাংলাদেশের নাম পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে উত্তরে হিমালয় পর্বত থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর নিম্নাঞ্চল নিয়ে বিরাট ভূখণ্ডের নামই ছিল বাংলাদেশ। বর্তমানে মুস্লিমপ্রধান বাংলাদেশের মানুষও বাঙালী, তাদের ভাষাও আমাদেরই বাংলা ভাষা। রাজনৈতিক কারণে প্রাচীন বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও এপার বাংলা ও ও-পার বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্য অব্যাহত।

এই দেশের নাম 'বাংলাদেশ' কবে থেকে, এবং কখন বাঙালী ঐক্যবদ্ধ এক অখণ্ড বাঙালী জাতি হিসাবে গড়ে উঠল— তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বাংলাদেশে আর্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর্যরা এ দেশকে অনার্যের দেশ বলে অতিশয় অবজ্ঞা ও ঘৃণা পোষণ করতেন।

আধুনিক যুগ—বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ স্থরু উনবিংশ শতাব্দী থেকে। ভারতচন্দ্র নূতন ও পুরাতন যুগের সন্ধিস্থলের কবি। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে আধুনিকতার স্থরু। আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি ও ইংরেজ শাসনকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্ত্য-ভাবাদর্শে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি। আধুনিক বাংলা সাহিত্য মহাকাব্য, গীতিকাব্য, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় নিত্যনূতনভাবে পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্যের বাহন ছিল পদ্য, আধুনিক যুগে সাহিত্যের বাহন পদ্য ও গদ্য দুটি। নিম্নে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগের একটি ছক তৈরী করা হল—



দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ : চর্যাপদ, সমাজচিত্র ও সাহিত্য সম্পদ

১. চর্যাপদের সাধারণ আলোচনা :

চর্যাগীতি পদাবলী বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ সালে তালপাতায় লেখা একটি পুঁথি নেপাল রাজদরবার থেকে সংগ্রহ করেন। তাঁরই সম্পাদনায় গ্রন্থটি 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও

দোঁহা'–এই নামে গ্রন্থটি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মুদ্রিত হয়। চর্যাগীতি ছাড়া সরহ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও ডাকার্ণবও একই সঙ্গে মুদ্রিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় সবগুলিকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করেন। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় স্থির হয় যে কেবলমাত্র চর্যাগীতিকাই বাংলা সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত। অন্যগুলিতে পশ্চিমা হিন্দীর প্রভাব বেশি। গ্রন্থখানির মূল নাম 'চর্যাগীতিকোষ'।

চর্যাগীতিকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, চর্যাগীতিকোষ নামেও অভিহিত করা হয়। চর্যাগীতির সঙ্গে মুণিদত্তের একটি সংস্কৃত টীকা ছিল। পরে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এর একটি তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন। মুণিদত্তের টীকা ও তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ চর্যার ধর্মতত্ত্ব, সমাজ দর্শন ও কাব্যমূল্য বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ পান।

চর্যাগীতিতে মোট সাড়ে ছিচল্লিশটি পদ আছে। পুঁথির মধ্যে কয়েকটি পাতা না থাকায় সব পদ পাওয়া যায় নি। অনুমান, এতে সর্বমোট একান্নটি পদ ছিল। খুব সম্ভব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি এটি নকল হয়ে থাকবে। চব্বিশজন পদকর্তা এই পদগুলি রচনা করেন। প্রধান পদকর্তাদের মধ্যে লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ ও শবরপাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের একাধিক পদ গ্রন্থে সংকলিত। এই কবিদের সম্পর্কে তিব্বতী অনুবাদ থেকে কিছু কিছু জানা যায়। এঁরা বাংলা, মিথিলা, কামরূপ ও উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন। তাই চর্যাগীতিতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কিছু কিছু ভাষা প্রবেশ করেছে।

কবিদের এই সমস্ত নাম ছদ্মনাম। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে কবিরা নিজ নিজ কুল পরিচয় নামধাম পরিত্যাগ করে ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। মনে হয় 'পাদ' শব্দ হচ্ছে সম্ভ্রমসূচক উপাধি।

চর্যাগীতিতে সহজযান বৌদ্ধপন্থীদের আধ্যাত্মিক সাধন প্রণালী ও গূঢ় তত্ত্ব-উপদেশ স্থান পেয়েছে। বাস্তব-জীবনের আধিব্যাধি, জন্মমৃত্যু ও সুখদুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ ও সহজ অবস্থারূপ মহাসুখ লাভের কথাই চর্যার উপজীব্য। বৌদ্ধসাধকদের সিদ্ধাচার্য বলা হয়। তাঁদের মতে মানুষের শরীরে অজস্র শিরা উপশিরা বর্তমান। সেগুলির মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না প্রধান। ইড়া-পিঙ্গলার গতি নিম্নাভিমুখে। জগতের সমস্ত প্রকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থাৎ সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু, ও ইহকাল পরকালের প্রতীক এই দুটি নাড়ী। আর নাভিদেশ থেকে সুষুম্নার গতি ঊর্ধ্বমুখে। ইড়া ও পিঙ্গলা সর্বদা সুষুম্নাকে নিম্নাভিমুখে নিয়ন্ত্রিত করে। সাধক অতি সন্তর্পণে ইড়া-পিঙ্গলার প্রভাব থেকে সুষুম্নার গতিকে মুক্ত রেখে মস্তিষ্কের শীর্ষদেশে নিয়ে যান। তখন তিনি এক অনির্বচনীয় সুখ লাভ করেন। একেই বলা হয়েছে 'মহাসুখসার', বাকপথাতীত আনন্দ, সহজগৃহিণী, নৈরাত্মাযোগিনী ও কমলরস ইত্যাদি। তন্ত্রমন্ত্র পূজার্চনা ব্যতিরেকে এই সাধনা সহজ দেহমার্গের সাধনা বলে সাধকরা সহজপন্থী। কিন্তু এ সাধনা সহজ বলে কথিত হলেও আদৌ সহজ নয়।

সাধকদের মতে, মূর্খরা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, এক কোটি লোকের মধ্যে একজন হয়তো এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।—'কোড়ি মাঝে একাহি হিআহি পইসই।'

চর্যার ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'সন্ধ্যাভাষা' নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে—"সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' কিন্তু এই ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। সন্ধ্যাভাষা মানে যে ভাষার অর্থ অনুধাবন করে অর্থাৎ বিশেষভাবে চিন্তা করে বোঝা যায়। যে ভাষার বাহিরের আক্ষরিক অর্থ এক—কিন্তু ভিতরের গূঢ়ার্থ অন্য তাহাই সন্ধ্যা-ভাষা। যেমন—

"ভবনঈ গহন গম্ভীর বেগে বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥"

বাহিরের অর্থ পৃথিবীর নদী গভীর, প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। দুই তীর কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল—মাঝখানের কোনো কুল কিনারা নেই। ভিতরের অর্থ মানুষের জীবন ভোগ বাসনায় নিমগ্ন—সুখদুঃখের চিন্তায় ইড়া-পিঙ্গলার প্রভাবে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত। পরমার্থ সাধনা স্বরূপ সুষুম্নার কোনো অস্তিত্ব চেতনা তার মধ্যে নেই।

যাহক, চর্যার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। এই গ্রন্থ আবিষ্কারের পূর্বে নাথগীতিকা, ডাক খনার বচন ও শূন্যপুরাণ ইত্যাদিকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলে ধরা হত। কিন্তু চর্যার পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায় এটিকে বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

২. সমাজচিত্র ও সাহিত্যসম্পদ :

চর্যার বিষয়বস্তু বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীদের আধ্যাত্মিক সাধন প্রক্রিয়া। ধর্ম জিনিসটি নিরবয়ব,—অন্তরের ধ্যানধারণা ও অনুভূতিগম্য ব্যাপার। চর্যার সাধকরা সেই ধর্ম্মতত্ত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে নিরাকার তত্ত্বকে রূপাবয়ব দান করেছেন। অন্তরের উপলব্ধ বিষয়কে প্রকাশ করতে গিয়ে বহির্জগতের সমাজের থেকে রূপক, উপমা ও চিত্রকল্প ইত্যাদি গ্রহণ করে বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন। আর সাধক যখন কবি হন, তখন তিনি যে যুগে ও যে সমাজে বসবাস করেন—সেই সমাজের কিছু না কিছু প্রভাব তার রচনায় পড়বেই।

চর্যার কাল দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিধৃত। এই সময়টা পাল বংশের রাজত্বের কাল এবং শেষে শুর ও সেন বংশের আধিপত্য। পাল রাজারা বৌদ্ধপন্থী ছিলেন—কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামে সেন বংশ জয়ী হলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য বিস্তৃত হয়—বৌদ্ধ সম্প্রদায়রা অবজ্ঞাত অন্ত্যজ শ্রেণীতে পরিণত হয়। শবর, ডোম, জেলে, চণ্ডাল প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় নেয়। চর্যাগীতিতে এইসব অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকের পরিচয় মিলে। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরা ডোম শবরদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। চর্যাগীতিতে আছে—

"নগর বাহিরি ডোম্বী তোহারি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাঅ ব্রাহ্মণ নাড়িয়া॥"
(হে ডোম্বী নগরের এক প্রান্তে তোমার কুঁড়ে ঘর।
নেড়ে ব্রাহ্মণরা তোমার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে।)

তখন সমাজে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ধনের প্রাচুর্য ছিল। মরাই ভর্তি ধান থাকত। রাত্রে ইঁদুর সব খেয়ে তছনছ করে ফেলত। মাঠে মাঠে প্রচুর সোনার ধান ফলত। নৌকা বোঝাই করে সেই সব ধান নিয়ে আসা হত :—

"সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥"

ধনী গৃহস্থ বাড়ীতে স্বচ্ছলতা ও অর্থের প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু দরিদ্র মানুষের দুঃখের অবধি ছিল না তখন। অতিথি এলে দরিদ্র গৃহস্থের চিন্তা—কি করে অতিথি সৎকার হবে—হাঁড়িতে এক কণা চাল নেই।

ব্রাহ্মণেতর নিম্নজাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধন শিথিল ছিল। যেকোনো জাতির কন্যাকে তারা বিবাহ করত। চর্যাগানে দেখা যায় ভুসুকু এক চণ্ডালিনীকে বিয়ে করে বাঙালী পদবাচ্য হলেন—'ভুসুসু তু আজ বঙালী ভৈলী'। বাদ্যযন্ত্র সহকারে খুব ঘটা করেই বিবাহ সম্পন্ন হত।

শবর জাতীয় ব্যাধেরা পাহাড়ের উঁচুতে বসবাস করত—'উঁচা উঁচা পাবত তাঁহি বসই শবরী বালী'। এবং তারা পশুপক্ষী শিকার করে খেত—"অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী / খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু আহেরী।"

পারাপারের জন্য সাঁকো ও খেয়ানৌকার ব্যবস্থা ছিল। নারীরা অলঙ্কারে নিজেদের ভূষিত করতেন। গৃহস্থের বাড়ীতে নানা ধরনের আসবাবপত্র ও বাসন কোসন ছিল। তখন সমাজে এক প্রকার যোগী সম্প্রদায় ছিলেন তারা ঔষধ তৈরী করত। ধুনুরীরা লেপ বালিশ ইত্যাদি তৈরী করত। চাঁছারীরা কুলা ধামা ইত্যাদি বুনত। চর্যাগীতিতে বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়, তাদের পেশা ও জীবনযাত্রা—আমোদ প্রমোদ, পোষাকপরিচ্ছদ, নৃত্যগীত নাটকাভিনয়, এমনকি শুঁড়িখানায় মদ্যপানের বিচিত্র সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। এককথায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের জনপদ-জীবনের এক উজ্জল চিত্র চর্যাপদে অংকিত। বাংলাদেশের খালবিখাল, নদনদী, পাহাড়পর্বত ও মানুষের সুখদুঃখের জীবনকথায় চর্যাগীতি পরিপূর্ণ। চর্যাগীতিকারেরা সাধক হলেও জীবন রসিক ছিলেন—তাই ধর্মকথাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সমাজের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। তৎকালীন সমাজের মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্না ও আশানিরাশার কাহিনীর প্রেক্ষাপটে ধর্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

চর্যাগীতির সাহিত্য মূল্যও যথেষ্ট। অনেকের মতে চর্যার বিষয় ধর্মতত্ত্ব বলে তা কাব্যের রসবস্তুর উপযোগী নয়। কিন্তু এই ধরনের মন্তব্য একান্ত একপেশে। পৃথিবীর সব প্রাচীন সাহিত্যই ধর্মকেন্দ্রিক। আমাদের বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের সাহিত্য মূলতঃ ধর্মাশ্রিত। ধর্মকে বা তত্ত্বকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হলে তা যে রসমূল্য পাবে না তা নয়। বিষয়বস্তু যাহাই হোক না কেন, দেখতে হবে তা জীবনরসে উজ্জল হয়ে উঠেছে কিনা।

চর্যাগীতি পদাবলী বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থীদের গূহ্য ধর্মতত্ত্বকে কেন্দ্র করে রচিত। কিন্তু সেই তত্ত্বকথাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তারা সমাজ জীবন থেকে কাহিনী ও

রূপক চিত্রকল্পাদি গ্রহণ করে নিরবয়ব তত্ত্বকথাকে রূপশ্রী মণ্ডিত করে তুলেছেন। জীবনের সুখদুঃখ ও বিচিত্র অনুভূতির সংস্পর্শে তত্ত্বকথা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। অবশ্য সকল কবির ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। কোনো কোনো সাধক কেবল নির্ভেজাল তত্ত্বকথাকেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু অনেক কবি রূপজগৎকেই তত্ত্বপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন।' এককথায় বাঙালীর জীবন রসে অধিকাংশ চর্যাগীতি' পরিপূর্ণ।

কোনো রচনার সাহিত্যমূল্য বিচারের আর একটি দিক্ হল প্রকাশরীতি। চর্যাগীতিতে নাতিদ্রুত ও নাতিমন্থর ছন্দ, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, অলঙ্কার ও চিত্রকল্প—সব মিলে রসসৌকর্যলাভ করেছে।

চর্যাগীতিতে সেকালের অখ্যাত অবজ্ঞাত অতিসাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার করুণ মধুর জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। চর্যা যদিও সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মসংগীত, তবুও এর মধ্যে বাংলাদেশের রাঙামাটির নিবিড় স্পর্শ রয়েছে। বাংলাদেশের সজলশ্যামল প্রকৃতি, নদনদী, পাহাড়পর্বত, গাছপালা ও পশুপাখী কবিদের রূপমুগ্ধ চোখে অপূর্ব মায়া বিস্তার করেছে। তত্ত্বকথা বলে—The world is rational. কিন্তু কাব্য বলে—The world is beautiful. চর্যাকারের বহু কবি জগৎকে সৌন্দর্য বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। বাংলাদেশের অরণ্য প্রকৃতি, জনপদপ্রান্তর, শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রি, খরস্রোতা নদী, পত্র-পুষ্পশোভিত বসন্ত প্রকৃতি—সবকিছুই অপূর্ব রোমান্টিক সৌন্দর্যে চর্যাগানে উদ্ভাসিত। কবিরা প্রাণ খুলে যেন বলতে চেয়েছেন—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

মানুষের দেহ ও পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে তরু ও তার শাখা-প্রশাখার সঙ্গে তুলনা করে কবি চমৎকার রসসৃষ্টি করেছেন—

'কা আ তরুবর পঞ্চ বি-ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥'

খরস্রোতা নদীর সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুলনাও চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। জগৎসংসারে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র ও প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহকে কবি ক্রান্তদর্শীর মতো সামান্য কথায় পরিস্ফুট করেছেন—

'ভবনঈ গহন গম্ভীর বেগে বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥"

ধান বোঝাই তরীর চিত্রটি গভীর ভাবব্যঞ্জনাদ্যোতক—

"সোনে ভারতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।"

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী / আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'—কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শবরপাদের একটি পদে প্রাকৃতিক রম্যতায় শবর শবরীর মোহময় মিলনাবেশ ও

মিলনের দিক্‌টি রোমান্টিক সৌন্দর্যব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। প্রেম ও প্রকৃতিকে কবি মিলনের মধ্যে শাশ্বত মূল্য দান করেছেন। প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পর আকর্ষণ ও মিলনের মধ্যে জৈবধর্মের চরিতার্থতাকে কবি প্রকৃতির মোহময় পরিবেশে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। মানুষ, প্রেম ও প্রকৃতি কবির কাছে একাকার হয়ে গেছে এবং ভোগের মধ্যেও প্রেম তার স্থূলতা পরিত্যাগ করে সুন্দর হয়ে উঠেছে।—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।…
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেহ্মা রাতি পোহাইলী।।

অর্থাৎ উঁচু পাহাড়ে শবরী কন্যা বাস করে। প্রেমিক শবর সেখানে হাজির। নানা ফুল ফুটেছে, আকাশে তার রঙ্ লেগেছে। খাট পড়ল, শয্যা বিছানো হল। প্রেমিক শবর ও প্রেমিকা শবরী প্রেমে রাত পোহাল।

শবরীর সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি উচ্চাঙ্গ কবি কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। যৌবনবতী রূপলাবণ্যময়ী শবরী বালিকার মূর্তিটি যেন এক বর্ণাঢ্য চিত্রশিল্প। মিতভাষণে সহজ কথায় শবরী বালিকা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছে শবরী বালিকা—তার মনে দোলা লেগেছে, রঙ লেগেছে—তাই সে ময়ূর পুচ্ছ পরেছে মাথায়, গলায় পরেছে লাল গুঞ্জা ফুলের মালা।

বাংলাদেশের মাঝি মাল্লারা নৌকায় নদীপথে ভেসে চলে দূরদূরান্তে জিনিস পত্র নিয়ে। চর্যাগানে নৌকা বেয়ে নিয়ে যাওয়ার চিত্রটি অপূর্ব। একান্ত একটি পরিচিত দৃশ্যের মধ্যেই কবি অভিনব অনুভূতির সঞ্চার করেছেন। ভবসমুদ্রে জীবনতরী নিয়ে যেতে যেতে হয়তো একদিন পরমার্থের সন্ধান মিলবে। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত চর্যার নৌকাচালানো গানগুলি সম্পর্কে যথার্থ উক্তি করেছেন—"নদীমাতৃক বাংলাদেশের মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিয়া আপন মনে উধাও শূন্য পানে চাহিয়া কোথায় চলিয়াছে কে জানে। নদীপথে চলার এই আনন্দ আর কোথাও মিলিবার নহে।"

বাংলা কাব্য মূলতঃ গীতিপ্রধান। অর্থাৎ বাংলাকবিতায় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। চর্যাগীতিতে সেই ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। যদিও চর্যার ধর্মগত বিষয়বস্তু একই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার কথা; তবুও সেই ধর্মতত্ত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিদের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা ও ভাবানুভূতিই প্রাধান্য পেয়েছে। কবিদের স্ব স্ব অনুভূতির সুরমূর্চ্ছনা চর্যাগীতিগুলিকে অসামান্য মর্যাদা দিয়েছে।

মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়

তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি, সামাজিক অবস্থা

১. তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি ঃ

পণ্ডিতেরা চর্যার রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই স্থির করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ ঘটে। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলজী বাংলাদেশ জয় করেন। তাঁর অতর্কিত আক্রমণে তৎকালীন বাংলার সম্রাট লক্ষ্মণ সেন তাঁর আবাসিক রাজধানী নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে পালিয়ে যান। তুর্কীরা বিনা প্রতিরোধে লুণ্ঠন কার্য চালাতে থাকে। বাংলার বুকের উপর অবাধে লুণ্ঠন, ধ্বংস ও অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে এক শতাব্দীর মধ্যেই সমস্ত বাংলাদেশ অধিকার করে নেয়। হিন্দুর মন্দির চতুষ্পাঠী, বৌদ্ধদের মঠ বিহার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়। দেশব্যাপী এই অরাজকতা ও অত্যাচারের মুখে কেউ প্রাণ দিয়েছেন, কেউ বিজাতীয় ধর্ম গ্রহণ করেছেন প্রাণের তাগিদে, কেউবা পালিয়ে গেছেন অন্যত্র।

শুধু এই নয়, রাজশক্তির মধ্যে ষড়যন্ত্র, পদচ্যুতি, গৃহবিবাদ ও হত্যা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী অসুস্থ অবস্থায় এক বিশ্বাস-ঘাতক ওমরাহের দ্বারা নিহত হন। অতঃপর খিলজী ওমরাহেরা বেশ কিছুকাল বাংলায় রাজত্ব করেন। এরপর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে পাঠান সুলতানদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা সুরু হলে, সেই সুযোগে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশে ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৪২—১৪১৩)। ইনি অরাজক গৌড়বঙ্গে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন। রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃংখলা দূর হওয়ায় সাহিত্য রচনার অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়। তখন থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি নূতন পথ ধরে এগোবার সুযোগ পায়।

কিন্তু তার পূর্বে দেখা যায় তুর্কীবিধ্বস্ত বাংলাদেশে প্রায় দুই শতাব্দীকাল কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তুর্কীদের ব্যাপক চণ্ডনীতি—খুন, জখম, নারী নির্যাতন, নরহত্যা, মঠমন্দির ধ্বংস এবং তুর্কীশাসক ও ওমরাহদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের ফলে রাজশক্তির ঘন ঘন উত্থান-পতনে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল একান্ত বিপন্ন। সমগ্র দেশের জীবন যেখানে বিপন্ন—সেখানে মানুষ কি করে আগে বাঁচবে সেটাই প্রধান চিন্তা—সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা তখন সুদূর পরাহত। তাই তুর্কীবিজয়ের দুশ বছরের সময়কে বলা হয়েছে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ।

তুর্কী আক্রমণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তুর্কীরা ধনরত্ন লুণ্ঠনের সঙ্গে দেশের ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর প্রচণ্ড আঘাত করেছে। এককথায় গোটা দেশটাকে মুসলমান বানাবার দিকে তাদের লক্ষ্য ছিল। সেই ঘনঘোর দুর্যোগের

দিনে সর্বব্যাপী ধ্বংসের মধ্যে বাংলার কবি-কণ্ঠ রুদ্ধ, বাঁশী সংগীত-হারা। তাই কোনো প্রতিভা থাকলেও তা দুশ বছরের ব্যবধানে বিকাশের সুযোগ পায়নি। একটা দেশের সুদীর্ঘ দুশ বছর কাল ঐতিহাসিক উপপ্লবে নিষ্ফলা থেকে গেছে। ইতিহাস দেবতার অভিশাপে বাংলা সাহিত্য শূন্যতায় মরুগ্রস্ত হয়েছে দীর্ঘকাল। ১২০২ সাল থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ।

অতঃপর ১৩৪২ সালে ইলিয়াসশাহী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বাংলায় শান্তি-শৃংখলা স্থাপিত হওয়ায় পাঠান সুলতানদের আনুকূল্যে সুস্থ অনুকূল পরিবেশে আবার সাহিত্যচর্চা সুরু হয়। বাঙালী নূতন করে ঘর বাঁধল, নূতন সুরে গান ধরল। অন্ধকারের অবসানে নূতন ভোরের আলোয় বাঙালীর নূতন সংগীত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। পূর্ববর্তী চর্যাগীতি থেকে এর বিষয় নূতন, ভাষাও বাঙালী জীবনের মাটির ভাষা। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত বাঙালী কবির কাব্য।

২. সামাজিক অবস্থা ঃ

তুর্কী আক্রমণের সময় বাংলাদেশে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব চলছিল। বাংলাদেশে তাঁর সময় কৌলিন্য প্রথার প্রচলন ঘটে। তখন সমাজে অভিজাত বর্ণহিন্দু ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ বসবাস করত। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও আর্য শাস্ত্র সংহিতা পুরাণ মহাকাব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আর লক্ষ্মণ সেনের সময়ে জাতিভেদ প্রথা জোরদার হওয়ায় অভিজাত শ্রেণীরা সংস্কৃত ভাষা ও কাব্যাদির চর্চা করতেন। নিম্নশ্রেণীরা কৃষি কর্মাদি কায়িক শ্রমে জীবন কাটাতেন। তাদের আচার অনুষ্ঠান পূজাপার্বন মূলতঃ অষ্ট্রিকশ্রেণীর ধর্ম বিশ্বাস কেন্দ্রিক ছিল। উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সমাজের এই উচ্চনীচ, ধনী দরিদ্র ভেদাভেদের সময়ে তুর্কী আক্রমণ ঘটে।

তুর্কীর আক্রমণে হিন্দুরা রাজত্ব হারায়—দেশের শাসন অধিকার মুসলমানের হাতে চলে যায়। বিধর্মী মুসলমানরা রাজশক্তিতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশে ইসলাম ধর্ম আত্মবিস্তার করতে থাকে। নিপীড়নে অত্যাচারে প্রাণভয়ে অনেকে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরে অনেক হিন্দু বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ও সামাজিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সাম্যবাদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। তখন হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হওয়ার ভয়ে হিন্দু সমাজের টনক নড়ল। অভিজাত হিন্দুরা তুর্কীর প্রচণ্ড আঘাতে উপলব্ধি করলেন হিন্দু জাতি ও ধর্ম সংস্কৃতিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভেদনীতির অবসান ঘটিয়ে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর নিগূঢ় হৃদয় বন্ধন। যাঁরা উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা ও অবহেলার দায় এড়াবার জন্য মুস্লিম ধর্ম গ্রহণ করছে—তাদের কোলে টেনে নিতে হবে। হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অভিজাতেরা সংস্কৃত পুরাণাদির বিষয়বস্তুকে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শিক্ষাদীক্ষাকে অনুবাদের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে সমাজে পরিব্যাপ্ত করে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। শুধু এই নয়, লোক সাধারণের ধর্মবিশ্বাস, পূজাপার্বণ

ও ব্রতকথাকে পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করতে প্রয়াসী হলেন। এইভাবে সংস্কৃতি বিনিময়ের সাহায্যে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। এই সময়ে রামায়ণ মহাভারতের ভাগবতের অনুবাদের লক্ষ্য ছিল 'লোকনিস্তার' অর্থাৎ লোকসাধারণকে বিধর্মী হওয়া থেকে রক্ষা করা। অন্যদিকে মঙ্গল কাব্যাদিতেও দেখা যায় পৌরাণিক দেবতা ও লৌকিক দেবতা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে এবং অনেক ব্রাহ্মণ ব্যক্তিও মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এইভাবে তুর্কী আক্রমণের ফলে সমাজের মানুষ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ এক জাতি হিসাবে গড়ে উঠার সুযোগ পায় এবং বাঙালীর সাহিত্যিক প্রতিভা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে নানা শাখায় বিকশিত হয়ে উঠে।

ইলিয়াসশাহী নৃপতিদের সময়ে বাংলার অরাজক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। হিন্দু ব্যক্তি অনেকে রাজসভায় সম্মানীয় পদমর্যাদায় ভূষিত হন। মুসলমান রাজারা অনেকে উদারচেতা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সেইসব সংস্কৃতিমনা নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য ষোলকলায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কাহিনী কাব্য, গীতিকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ও চরিত সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। তুর্কী আক্রমণের প্রথম দুই শতক বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে ঘোর অন্ধকার—কিন্তু সেই আঘাতেই সমাজ জীবনের সর্বতোমুখী জাগরণ ঘটেছে। সমাজে যেমন মানবিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে—তেমনি সাহিত্যেও ফলেছে সোনার ফসল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে তার উজ্জ্বল প্রমাণ মিলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন :

চর্যাগীতির পর বাংলাসাহিত্য প্রায় দুশ বছর কাল নিষ্ফলা রয়েছে। তুর্কী-আক্রমণে দীর্ঘকাল ব্যাপক বিশৃংখলা ও অরাজকতার জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। তারপর দেশে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপিত হলে তুর্কীআক্রমণোত্তর বিধ্বস্ত বাঙালীর ভাঙাচোরা জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। এই কাব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইদিক থেকে যে এটাই প্রথম খাঁটি বাংলাভাষায় বাঙালী কবি রচিত কাহিনী কাব্য।

চর্যার ভাষা প্রাচীনতম বাংলাভাষার নিদর্শন হলেও তার মধ্যে অনেক প্রতিবেশী ভাষা ও অপভ্রংশের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং চর্যাগীতির ভাষা সর্বাংশে

বাংলা ভাষা নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতি ও বাগ্‌বিধি আপন গৌরবে উজ্জল হয়ে উঠেছে। বিষয়বস্তুর দিক্ থেকেও, যে বৈষ্ণবপদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তারই পথিকৃৎ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খাঁটি বাঙালী প্রাণের রসে সঞ্জীবিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটি প্রখ্যাত গবেষক শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বল্লভ ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার এক গৃহস্থ পরিবারের গোয়াল ঘর থেকে আবিষ্কার করেন। এবং তাঁরই সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মুদ্রিত হয়। পুঁথিটির প্রথম পৃষ্ঠা, মধ্য ও শেষভাগের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ফলে কাব্যের নাম ও কবির পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। গ্রন্থের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বর্ণিত বলে আবিষ্কর্তা মহাশয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দেন। পুঁথিটির মধ্যে একটি চিরকুটে "শ্রীকৃষ্ণ সন্দভ' নামটি পাওয়া যায়। এ জন্য অনেকে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ নাম রাখার পক্ষপাতী। তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটাই বহুল প্রচলিত।

গ্রন্থটির মধ্যে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় কিছুই নেই। ভনিতায় কবি নিজেকে "বড়ু চণ্ডীদাস' ও 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' নামে অভিহিত করেছেন। আরো জানা যায় তিনি বাসুলী বা চণ্ডীদেবীর উপাসক ছিলেন। গবেষকদের মতে চণ্ডীদাস নামধারী একাধিক কবি মধ্যযুগে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসের বাড়ী ছিল বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। যাহক, পণ্ডিতরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও লিপি বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে গ্রন্থটি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পূর্বে রচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য। কাব্যটিতে মোট তেরোটি খণ্ড আছে—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড ও ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালীয়দমনখণ্ড, বস্ত্রহরণখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ। শেষের অংশটি রাধাবিরহ বলে অনেকের মতে এটি প্রক্ষিপ্ত, মূল রচনা নয়। কিন্তু বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের বিষয়বস্তু বিচারে এটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় না।

জন্মখণ্ডে পৌরাণিক কাহিনীর সূত্রপাত। দুরাচারী কংসের অত্যাচারে জর্জরিত ধরিত্রীকে রক্ষা করার জন্য বিষ্ণুর মর্ত্যে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ এবং তাঁর লীলার সহচরী রূপে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর রাধা রূপে আবির্ভাব কাহিনীর বর্ণনা এতে।

কিন্তু মর্ত্যে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে চিনতে পারলেও রাধা কৃষ্ণকে চিনতে পারেন নি—পূর্ব পরিচয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি এখন নপুংসক আইহনের স্ত্রী। মাকে বলে আইহন রাধার মায়ের পিসী বড়াইকে তার মথুরায় দধি বেচতে যাওয়ার সঙ্গিনী নিযুক্ত করল।

'তাম্বুলখণ্ডে' রাধা পৌরাণিক পরিধি ছেড়ে লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে উপনীত। রাধার রূপগুণের কথা শুনে কৃষ্ণ প্রেমমুগ্ধ ও আকৃষ্ট। বড়াইর সহায়তায় কৃষ্ণ রাধার কাছে পান ও ফুল পাঠিয়ে প্রণয়জ্ঞাপন করায় রাধা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং বড়াইকে ভৎর্সনা ও প্রহার করে।

'দানখণ্ডে' অপমানিতা বড়াই ক্রুদ্ধা হয়ে কৃষ্ণের কাছে এসে এর প্রতিবিধান দাবি করল। দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করল—কৃষ্ণ 'দানী' সেজে মথুরার পথে বসবেন এবং বড়াই রাধাকে ভুলিয়ে সেখানে নিয়ে আসবে। যুক্তি মত কাজ করা হ'ল। সখী-গণ পরিবৃতা রাধাকে ভুলিয়ে এনে বড়াই উপস্থিত করল সেখানে। 'দান' হিসেবে কৃষ্ণ রাধার যৌবনের ডালি দাবি করলেন। অনেক বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর কৃষ্ণ রাধার প্রতিরোধ চূর্ণ করে তার সঙ্গে মিলিত হলেন। বড়াই পরোক্ষে থেকে কৌশলে কৃষ্ণের সহযোগিতা করল।

এবার 'নৌকাখণ্ড'। যমুনার ঘাটের পারাপারের রসিক নেয়ে সেজে কৃষ্ণ বড়াই কর্তৃক কৌশলে আনীতা রাধার সঙ্গে জলবিহারে মিলিত হলেন। নৌকাখণ্ডে রাধার প্রতিরোধের তীব্রতা কমে এসেছে। ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠেছে রাধার কৃষ্ণ-অনু-রাগিণী মূর্তি।

'ভারখণ্ডে' রাধা 'জ্ঞাতযৌবনা'। রাধা চাতুর্য অবলম্বন করে প্রণয়-ছলনায় কৃষ্ণকে দিয়ে দধি-দুগ্ধের ভাণ্ড বহন করাতে বাধ্য করেছে। প্রতিদানে তাদের মিলনের আশ্বাস দিয়েছে। প্রত্যাবর্তনের পথে কৃষ্ণ রাধাকে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে বার-বার পীড়াপীড়ি করেছেন। উভয়ের বাদানুবাদে 'ভারখণ্ড'-এর সমাপ্তি।

এরপর 'ছত্রখণ্ড'। মথুরার পথে রৌদ্রতাপে ক্লিষ্টা রাধার মাথায় ছত্র ধরেছেন কৃষ্ণ—প্রতিশ্রুতি মিলেছে রাধা-মিলনের। কিন্তু রাধার প্রতিশ্রুতি রক্ষার পূর্বেই এ খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটেছে—কারণ পুঁথিখানি এখানে খণ্ডিত।

'বৃন্দাবনখণ্ডে' রাধা প্রণয়-কলায় নিপুণা হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ তার সঙ্গে মিলন-কামনায় বৃন্দাবনে এক অনুপম পুষ্পকুঞ্জ রচনা করেছেন। রাধা শাশুড়ীর শাসন-পাশ ছিন্ন করার কৌশল বড়াইকে বলে দিয়েছে। অবশেষে মথুরার হাটে পসরা সাজিয়ে নিয়ে যাবার অছিলায় বৃন্দাবনের পুষ্পকুঞ্জে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ কাহিনী ভাগবতের রাসলীলার মত।

'যমুনাখণ্ডে' কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয় নাগ দমন, জলকেলি, গোপীগণের বস্ত্রহরণ প্রভৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'হারখণ্ডে' কৃষ্ণ রাধার হার অপহরণ করলে ক্রুদ্ধা রাধা জননী যশোদার কাছে কৃষ্ণের কুকীর্তির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে। ফলে 'বাণখণ্ডে' কৃষ্ণ প্রতিশোধ নেবার জন্যে রাধার প্রতি দুঃসহ মদনবাণ নিক্ষেপ করেছেন। বাণাহতা রাধা মূর্ছিতা হয়েছে। ফলে বড়াই কৃষ্ণকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছে। উভয়ের চেষ্টায় রাধার মূর্ছাভঙ্গ হয়। রাধাকে সঞ্জীবিত করেই কৃষ্ণ আত্মগোপন করেন। এবারে রাধার অন্য রূপ। কৃষ্ণপ্রেমে পাগলপারা হয়ে রাধা তাকে খুঁজে বেড়ায়। অবশেষে রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলনে 'বাণখণ্ডের' সমাপ্তি।

এবার 'বংশীখণ্ড'। এই খণ্ডে দেখা যায় কৃষ্ণ এক অপূর্ব বংশী নির্মাণ করেছেন। বংশীর পুলকিত ধ্বনিতে রাধার গার্হস্থ্য-জীবন বিপর্যস্ত হয়। কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাধা সমাজ-ভয় ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কৃষ্ণকে খুঁজে পাওয়া

যায় না। অবশেষে বড়াই র পরামর্শে রাধা নিদ্রিত কৃষ্ণের মোহন বংশী হরণ করে। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পরে কৃষ্ণের অনুরোধে রাধা বাঁশী ফিরিয়ে দেয়।

সর্বশেষ খণ্ডের নাম 'রাধাবিরহ'। বহু অন্বেষণে কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাধা তার দয়িতকে খুঁজে পায়। রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটে। মিলন-তৃপ্তা রাধা অবসন্ন হয়ে কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই অবসরে কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করে কংসবধের জন্য মথুরায় চলে যান। যাবার আগে রাধাকে বড়াইর কাছে রেখে যান—'তাক রাখিহ যতনে আপন অন্তরে।'

নিদ্রাভঙ্গে কৃষ্ণবিরহে রাধা হাহাকার করে উঠে। রাধার আকুল অনুনয়ে কৃষ্ণকে আনার জন্য বড়াই মথুরায় গিয়ে অনুরোধ জানান। কিন্তু কৃষ্ণ কংসবধের জন্য মথুরায় গেছেন তিনি আর ফিরবেন না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী বিচার করলে দেখা যাবে যে পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণে এই কাব্য গড়ে উঠেছে। প্রথমে কবি যে পৌরাণিক ভাবাদর্শের উপস্থাপনে কাব্যসুরু করেছিলেন—তা অব্যাহত রাখতে পারেন নি। সংস্কৃত পুরাণাদিতে বড়ু চণ্ডীদাসের গভীর অধিকার ছিল। কিন্তু পুরাণের অনুসরণ দুটি একটি মাত্র ঘটনায় দেখা যায়। বাদবাকী তিনি পুরাণ বহির্ভূত ঘটনাকে আশ্রয় করেছেন। কবি সম্ভবতঃ গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কোনো লৌকিক রাধাকৃষ্ণ প্রণয়কাহিনীর উপর নির্ভর করে থাকবেন। তাই গ্রামীণ স্থূলতা এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। প্রায় সর্বত্র ভ্রষ্ট জীবনের হাহাকার ও ছন্দোহীনতা। সেজন্য অনেকে বড়ুর কাব্যকে অশ্লীলতা দোষযুক্ত করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার এর জন্য কবি দায়ী নন। সেই যুগ ও সেই সমাজই দায়ী। তুর্কী আক্রমণোত্তর সমাজ জীবনে যে নৈতিক অবনতি কবি লক্ষ্য করেছেন—তারই প্রভাব পড়েছে কাব্যে।

কাহিনী যাহাই হক—তার মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের জীবন অভিজ্ঞতা ও কবিত্ব-শক্তির নিপুণ পরিচয় ফুটে উঠেছে। কাব্য শরীরের প্রসাধনে উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষা অলংকারাদির প্রয়োগ ও ছন্দোবৈচিত্র্যে কবির শিল্পীপ্রতিভার নিদর্শন মিলে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই—তিনটি চরিত্রের কথপোকথন। এই তিনটি চরিত্র স্বাতন্ত্র্যধর্মী।

কাব্যের প্রধান চরিত্র রাধা খুবই আকর্ষণীয়। অপূর্ব রূপবতী সে। দুঃখের বিষয় সে ক্লীব আইহনের পত্নী। রূপমুগ্ধ কৃষ্ণ রাধাকে পাওয়ার জন্য নানা ছলনা-কপটতার আশ্রয় নেন। কিন্তু রাধা নিস্পৃহ। কারণ, তাঁর অন্তরে প্রেম জাগেনি। শেষে কামার্ত কৃষ্ণ বড়াইর সহযোগে রাধাকে অধিকার ও ভোগ করলে রাধা গভীর আক্ষেপে নিজের দৈহিক সৌন্দর্যকে তার দুর্দশার জন্য দায়ী করেছে—

"কি কৈলী কি কৈলী বিধি নিরমিআঁ নারী
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥"

শ্রীকৃষ্ণের করায়ত্ত হয়ে রাধা ক্রমশঃ প্রেমময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বার বার তাঁর দেবীসত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তিনি মর্ত্যসংস্কার বিসর্জন দিতে পারেন নি। ধুলির সংসারে থেকেই তার প্রেমের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে। বংশীখণ্ডে ও রাধাবিরহে দেখা যায় রাধা একান্ত কৃষ্ণগত প্রাণা হয়ে উঠেছেন—

'কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পদে নিশিবোঁ আপনা ॥'

রাগে অভিমানে তিরস্কারে ও প্রেমের সুতীব্র আর্তিতে রাধা একান্ত রক্তমাংসের মানবী ও প্রাণোত্তাপে সঞ্জীবিতা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাধাকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস এক প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্যময়ী ও তেজস্বিনী নারী হিসাবে গড়ে তুলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রটি দেবচরিত্র হলেও কাব্যে সাধারণ লৌকিক মানুষ হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণ আদৌ বিস্মৃত হন নি যে তিনি বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু। কিন্তু মর্তে তাঁর আচরণে ধুলি কাদামাটির সংস্পর্শ বেশি। প্রথমাবধি কৃষ্ণ নিতান্ত নিম্নরুচির মানুষের পর্যায়েই থেকে গেছেন। তাঁর দৈবীসত্তা ও মানবসত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নি। তাঁর দৈবী চেতনা ও মানবিক আচরণের মধ্যে অসংগতি অত্যন্ত প্রকট। যেভাবে তিনি জোর জবরদস্তিতে রাধাকে ভোগ করে মথুরায় চলে গেলেন—তাতে তাঁকে এক ধূর্ত লম্পট ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। তবে রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের জন্য তাঁর বিপরীতধর্মী কৃষ্ণচরিত্রের প্রয়োজন ছিল।

বড়াই চরিত্রটি কুট্টনী জাতীয়। সে রাধার মায়ের পিসী। রাধা কৃষ্ণের মিলনের জন্য সে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণ যে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু—এ পরিচয় বড়াই জানে। বোধ হয় সেজন্যই কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনের জন্য সে সচেষ্ট। এ ব্যাপারে তার নিজের কোনো স্বার্থ কামনা নেই। নিতান্ত স্নেহবশেই সে মিলনের ব্যাপারে দূতীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আইহন নপুংসক বলেই এবং কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের দেবতা জেনে দুর্ভাগিনী রাধার জন্য সে অবৈধ প্রেমের ব্যাপারে অগ্রণী। হয়তো তখন এরূপ অসামাজিক প্রেমের ঘটনা বর্তমান ছিল। যাহক, পরিহাস নিপুণা স্নেহশীলা গ্রাম্য মাতামহী রূপেই তিনি যথার্থ আন্তরিকতাসহ রাধাকৃষ্ণের মিলনে দায়িত্ব পালন করেছেন।

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে আধ্যাত্মিক মহিমা নেই। কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রথম কাহিনী কাব্য এবং এই কাব্য বাংলা দেশে কৃষ্ণকথা প্রচারের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে তুলে ধরেছে। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে কৃষ্ণলীলার কবি হিসাবে চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করেছেন—

"জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণচরিত্রে স্থূলতা ও গ্রাম্য রুচির প্রভাব খুব বেশী থাকা সত্ত্বেও

কৃষ্ণ প্রেমিক ও ঐশ্বর্যময় পুরুষ হিসাবে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। ভূভার হরণের নিমিত্ত তাঁর জন্ম এবং প্রেমকেলির পর কংস নিধনে তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গেছেন। সমকালীন সমাজের নৈতিক অবনতির জন্য কৃষ্ণচরিত্র অসংগতি দোষদুষ্ট। কিন্তু পরবর্তীকালে বাঙালীর কৃষ্ণভক্তি সাধনায় কৃষ্ণের যে অখিল রসামৃত প্রেমিক শেখরের চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তারই পূর্বাভাস মিলে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি আখ্যায়িকা, গীতিকাব্য ও নাট্য রসের এক মিশ্র সৃষ্টি। সাধারণভাবে এই কাব্য আখ্যানকাব্যের রীতিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে নাট্যরস ও গীতিকাব্যের স্বরমূর্চ্ছনা। তিনটি চরিত্রের কথপোকথনে বা সংলাপের মধ্যে স্থানকাল পাত্রগত বিশেষ মুহূর্তটি দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে ঘটনা সংস্থান ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য—এই দুয়ে মিলে নাটকীয়তার এক একটি ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ অংশে রাধার অন্তর্বেদনার মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তির মধ্যে গীতিকাব্যজনোচিত শিল্পসৌন্দর্য পরিস্ফুট। আর জন্মখণ্ড থেকে রাধাবিরহ পর্যন্ত বিভিন্ন কাহিনীর সংযোগে গড়ে উঠেছে একটা অখণ্ড জীবন চিত্র।

চণ্ডীদাস সুপণ্ডিত বিদগ্ধ কবি। নানা পুরাণ শাস্ত্রসংহিতা বিষয়ে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। চরিত্র চিত্রণে ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে, ভাবের রূপনির্মিতিতে তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বড়ুর কাব্যে কোনো উত্তরণ নেই। এ কাব্য কোনো সমে এসে দাঁড়ায় নি। ব্যতিক্রম 'বংশীখণ্ড' ও 'রাধাবিরহ অংশ'— যেখানে প্রেমময়ী রাধার বিরহ বেদনার আকুলতা প্রেমের নিবিড়তাকে সুরে মাধুর্যে কমনীয় করে তুলেছে—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বাড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥"

কালিন্দী নদীর কূলে কে বাঁশী বাজাচ্ছে তা রাধা জানতেন না, জানতেন না বড়ু চণ্ডীদাস। কিন্তু এর উত্তর আছে পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যে। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে শেষ—সেখানেই পদাবলী সাহিত্যের সুরু। বড়ু চণ্ডীদাস পদাবলী সাহিত্যের ভিত্তিভূমি রচয়িতা। আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

"কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের মাঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলকের অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন।"

এইখানেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঐতিহাসিক মূল্য।

২. বিদ্যাপতির পদাবলী ঃ

পদাবলী শব্দের অর্থ পদের সমষ্টি। দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব এই অর্থেই 'পদাবলী' শব্দটি গ্রহণ করেন। তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কোমল কান্ত পদাবলী হিসাবে খ্যাত। যাহক, ছোট ছোট কবিতাগুলিকে পদাবলী নামে চিহ্নিত করা হয়। যেমন বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলিকে বৈষ্ণব পদাবলী বলা হয়।

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে দুজন বৈষ্ণব পদকর্তা আছেন—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি বাংলার লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গানে সমস্ত আর্যাবর্ত মুগ্ধ হয়েছিল। বাঙালীর তো কথাই ছিল না। স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর গান খুব ভালবাসতেন।

বিদ্যাপতি বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার সীতামারী মহকুমার বিসফী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে বিদ্যাপতি মিথিলার একাধিক রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পণ্ডিতদের মতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁর জন্ম এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিদ্যাপতি বহুভাষাবিদ ও সুপণ্ডিত কবি। বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া অবহট্ট ও সংস্কৃত ভাষায়ও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বিদ্যাপতির খ্যাতি পদাবলী সাহিত্যের জন্য। ধর্মমতে তিনি শৈব ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেবতার মহিমা বিষয়ক অনেক পদও লিখেছেন। আসলে বিদ্যাপতি ছিলেন মনে প্রাণে কবি। তাই সকল ধর্মসংস্কারের উর্ধ্বে তাঁর কবিমন বিচরণ করত জীবনের লীলাভূমিতে। বিদ্যাপতি ছিলেন জীবনরসিক সৌন্দর্যপ্রিয় কবি।

বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত পদাবলীতে মৈথিলী, ব্রজবুলি ও বাংলা—এই তিন প্রকার ভাষারীতি লক্ষ্য করা যায়। তবে পরবর্তী গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলি আসলে সপ্তদশ শতাব্দীর এক বাঙালী কবির রচনা। ইনি 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে বিদ্যাপতির ঢঙে কিছু পদ লিখেছিলেন। 'বিদ্যাপতি' ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলি এই বাঙালী কবিরই রচনা। বাকি থাকছে বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত মৈথিল ও ব্রজবুলি পদ। সমস্যা এদের নিয়েই। মৈথিল পদগুলি পাওয়া গিয়েছে মিথিলা এবং তার আশপাশের অঞ্চল থেকে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এই পদগুলির ভাষা বিশুদ্ধ মৈথিলী। কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যাপতির যতগুলি পদ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির ভাষা বিশুদ্ধ মৈথিলী নয়। তাতে অনেক বাংলাশব্দ অনুপ্রবেশ করেছে, মৈথিল শব্দরূপের ব্যাকরণেও অনেক বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে বিদ্যাপতির পদ অবিকৃত থাকে নি, দেশান্তরে ও কালান্তরে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্যাপতি নিজে কোন্ ভাষায় লিখেছিলেন তার পরিচয় পেতে হলে তাঁর মৈথিল পদ ও রূপান্তরিত পদগুলির ভাষার তুলনা করা দরকার। তুলনায় দেখা যায়, বিদ্যাপতির গানে অবহট্ট ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং গানগুলি লেখা হয়েছে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মৈথিলী ভাষায়। এই মৈথিলী ভাষা বিদ্যাপতির সম-

সাময়িক মিথিলার কথ্য ভাষা নয়, তার চেয়ে প্রাচীনতর মৈথিল যার সঙ্গে অবহট্‌ঠের যোগ ছিল। কাজেই বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা প্রাচীন মৈথিলী। পরবর্তী কালে বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে এই পদগুলি প্রচারিত হলে এতে স্থানীয় ভাষার অনুপ্রবেশের ফলে একটা কৃত্রিম কবিভাষা প্রচলিত হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'ব্রজবুলি' অর্থাৎ ব্রজ বা বৃন্দাবনলীলাবিষয়ক বুলি বা ভাষা। অনেকের ধারণা বৃন্দাবনের লোকেরা ব্রজবুলি ভাষাতেই কথা বলতেন, কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে মথুরা বৃন্দাবনে যে কথ্য ভাষা প্রচলিত ছিল তা পশ্চিমা হিন্দীর শাখা-বিশেষ। তার নাম 'ব্রজভাষা'। 'ব্রজবুলি'র সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এক সময়ে মিথিলা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের পীঠস্থান ছিল। বাংলাদেশ থেকে ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রেরা মিথিলায় যেত। পাঠ শেষ করে তারা যখন বাংলা দেশে ফিরে আসত তখন তাদের মুখে মুখে বিদ্যাপতির গান বাংলাদেশে চলে এসেছে। তাছাড়া, বিদ্যাপতির পদ সংগীতচর্চার উপযোগী করে রচিত হয়েছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীতের গায়কেরা এই সব পদ অবলম্বন করে বিভিন্ন রাগরাগিণীর অনুশীলন করতেন। সেইজন্য সেকালের বিভিন্ন রাজসভার গুণী গায়কদের কাছে বিদ্যাপতির পদের বিশেষ আদর ছিল। এইভাবে কালক্রমে বাঙালী ও অন্যান্য আঞ্চলিক গায়কের মুখে বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়, অনেক আঞ্চলিক শব্দও মৈথিলী ভাষায় স্থান করে নেয়। এই ভাবেই কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই 'ব্রজবুলি' কথ্য ভাষা নয়, কৃত্রিম কাব্য ভাষা। ব্রজবুলি ভাষার ধ্বনি সৌন্দর্য ও শ্রুতি-মাধুর্যের জন্য বিদ্যাপতি 'মৈথিল কোকিল' নামে অভিহিত।

বিদ্যাপতি ন্যায়-শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র এবং ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করলেও তাঁর প্রধান পরিচয় রাধাকৃষ্ণ পদাবলী রচনার মধ্যেই নিহিত আছে। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাপতির আগে জয়দেব প্রমুখ কবি রাধাকৃষ্ণ-লীলা নিয়ে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় কাব্য রচনা করলেও বিদ্যাপতিই সর্বপ্রথম সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রকরণ অনুসারে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, মিলন, বাসকসজ্জা, অভিসার বিপ্রলব্ধ, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মান, বিরহ, পুনর্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন লীলা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের বিরহ ও মিলন লীলার বর্ণনা করে বৈষ্ণব পদাবলীর রূপাদর্শ রচনা করেন। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিদ্যাপতিই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম রূপনির্মাতা।

অলংকারশাস্ত্রের বিচারে বিদ্যাপতি শৃঙ্গার রসের কবি। এই শৃঙ্গার রস বিস্তারের জন্য তিনি রাধা চরিত্রকে বেছে নিয়েছেন। কিশোরী রাধা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করে কিভাবে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর পদাবলীতে তার ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিদ্যাপতির "রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢলঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে।...যৌবন সেও সবে আরম্ভ হইয়াছে, তখন সকলই রহস্য-পরিপূর্ণ। সদ্যবিকচ হৃদয় সহসা

আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে ; আপনার সম্বন্ধে আপনি সচেতন হইয়া উঠিতেছে ; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না—

কবহু বাঁধয়ে কুচ কবহুঁ বিথারী।
কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি।"

বয়ঃসন্ধিতে উপনীত রাধার নিজের অঙ্গ সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই। বিদ্যাপতি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে এই বয়ঃসন্ধির মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী রাধার মনে জেগেছে পূর্বরাগ ঃ

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ
বারল লোচনচোর।
পিয়ামুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥

ক্রমে রাধার সমস্ত চেতনা জুড়ে বিরাজ করেন কৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণের বাঁশি শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না ঃ

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশি-নিশাস-গরলে তনু ভোর॥
হঠসঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলক পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥

কৃষ্ণের বাঁশি শুনলেই রাধার তনুমন বিগলিত হয় এবং তিনি ব্যাকুল হন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার আকূতিতে। এই জন্য তিনি অভিসারের প্রস্তুতি নেন। পূর্বরাগ ও অনুরাগের বর্ণনায় বিদ্যাপতি ততটা স্বতঃস্ফূর্ত নন। বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় তাঁর যে নিপুণতা সেই নিপুণতার পুনঃ প্রকাশ দেখা যায় অভিসারের বর্ণনায়। অভিসারের পদে বিদ্যাপতি রাধা ও কৃষ্ণ দুজনকেই দুজনের জন্য উৎসুক করে এঁকেছেন। তাই তাঁর রচনায় রাধার অভিসার ও কৃষ্ণের অভিসার—এই দুই রকম পদই পাওয়া যায় ঃ

রাধার অভিসার ঃ

নব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়লি পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥

নব অনুরাগিণী রাধা কোন বাধা মানে না। পথ-বিপথ মানে না, একলা ছুটে চলে।

কৃষ্ণের অভিসার :

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতিখনে আওব কুঞ্জরগমনী ॥
ভীম ভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমলচরণা ॥
বিহি পায়ে করোঁ পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার ॥

রাত্রি গভীর, রাধা ভীরু রমণী। কতক্ষণে সেই কুঞ্জরগামিনী রাধা আসবে? পথে কত সঙ্কট, সেখানে কোমলচরণা রাধা কি করে আসবে? বিধি, তোমার চরণে মিনতি, রাধা যেন নির্বিঘ্নে অভিসার করতে পারে।

অভিসারের পর মিলন। মিলনের বর্ণনাতে বিদ্যাপতি চাতুর্য ও মনোহারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তবে তাঁর কবিদৃষ্টির মৌলিকতা এখানে তেমন পরিস্ফুট নয়। তাঁর কবিকল্পনার মৌলিকতা বিরহের বর্ণনায়। সংস্কৃত কাব্যে সাধারণত নায়িকার মান ও মানভঞ্জনের পর মিলনের বর্ণনা দিয়ে কাব্য শেষ হয়। বিদ্যাপতি যাঁর দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত সেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ-ও শেষ হয়েছে অভিসার, মান, মানভঞ্জন ও মিলনের বর্ণনা দিয়ে। কিন্তু বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনায় আরো অগ্রসর হয়েছেন। কারণ তিনি জানেন প্রেমে মিলনের চেয়ে বিচ্ছেদই সর্বব্যাপী। মিলনের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনা দীর্ঘস্থায়ী। প্রকৃতপক্ষে প্রেমে মিলনের চেয়ে বিরহের অংশই বেশি। এই জন্য তিনি মিলনের বর্ণনাতেই কাব্য শেষ করেন নি, রাধার বিরহের বর্ণনা করে পদাবলীতে নূতন রসের সঞ্চার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিরহের বর্ণনায় বিদ্যাপতি প্রেমিকা হিসাবে রাধা চরিত্রে এক আশ্চর্য পরিণতি দান করেছেন। দিনের পর দিন রাধা বিরহের আগুনে পুড়ে ক্রমশঃ শুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। দেহকামনা এখন আর নেই, রতি এখন আরতিতে রূপান্তরিত। কৃষ্ণ রাধাকে বৃন্দাবনে রেখে মথুরা চলে গিয়েছেন। বৃন্দাবন শূন্য, মিলনমন্দির শূন্য, কাজেই সমস্তই শূন্য :

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুলমাণিক কো হরি নেল ॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়ন জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী ॥
কৈছনে যায়ব যামুন তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর ॥
সহচরী সঞে যাহাঁ করল ফুলখেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥

মিলনের স্মৃতিবিজড়িত যমুনার তীরে কুঞ্জকুটীরে রাধা আর কী করে যাবেন ? কাজেই দিনের পর দিন রাধা কৃষ্ণের আগমনপ্রতীক্ষা করেন। কিন্তু কৃষ্ণ আসেন না। সখীরা প্রবোধ দেন, কিন্তু রাধা প্রবোধ মানেন না। তিনি সখীদের বলেন : তোমরা আর কত প্রবোধ দেবে, এই বিরহের সাগর যে কোনদিন পার হতে পারব এমন মনে হয় না :

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়লুঁ
খোয়লুঁ এ তনু-আশে।
হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবী মাসে॥

কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বিরহ যন্ত্রণায় রাধা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন :

হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জিউ করব সমাধা।
ধরণী ধরিয়া ধনি যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগ মাহা তাপিনী
বৈরী মদনশরধারা॥
অরুণ-নয়ন-লোরে তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরি গণতহি শেষা॥

এই ভাবে দীর্ঘ বিরহযাপনের পর রাধা শেষ পর্যন্ত এক নিশ্চিত প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে বাহ্য মিলনই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় নয়, তাঁকে পাওয়া যায় মনের মধ্যেও। প্রকৃত পক্ষে মানসবৃন্দাবনে তাঁকে পাওয়া গেলে আর বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার এই মানস-মিলনই ভাবসম্মিলন নামে পরিচিত। ভাবসম্মিলনের পদে বিদ্যাপতি রাধাকে শান্ত ও সমাহিত চিত্তের অধিকারিণী করে এঁকেছেন। এখন তাঁর মনে কোন স্থূল কামনা নেই, মনে নেই কোন উদ্বেগ বা ব্যাকুলতা। চিরমিলনের আনন্দে তাঁর মন সদানন্দ :

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥

'ভাবসম্মিলন' ছাড়াও বিদ্যাপতি 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। তাঁর 'প্রার্থনা' পদে এক সার্বভৌম আবেদন লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরের অসীম সত্তায় নিজের সংকীর্ণ সত্তাকে বিলীন করার আকূতি এই সব পদে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়ঃ

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরি সমানা॥

বিদ্যাপতি আজীবন রাজসভার কবি ছিলেন। তাই তাঁর রচনায় রাজসভার কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজসভার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরলতার পরিবর্তে আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য, ঐকান্তিকতার পরিবর্তে কৃত্রিম পারিপাট্য, সহজ বাচনভঙ্গীর পরিবর্তে চতুর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। বিদ্যাপতির রচনায় এ সমস্তই লক্ষ্য করা যায়। রাজসভার বিলাসিতা, কৃত্রিম জীবনাদর্শ, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের চাতুরী বিদ্যাপতিকে প্রভাবিত করেছে। কারণ, প্রধানতঃ রাজা ও রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষকতাতেই তিনি কাব্যচর্চা করেন। তাই রাজা ও সভাসদবর্গের মনোরঞ্জনের জন্যেই বিদ্যাপতিকে কৃত্রিম মণ্ডনকলার আশ্রয় নিতে হয়েছে। এ সম্পর্কে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "বিদ্যাপতির কবিতায় যে মণ্ডনকলাসিদ্ধ সৌকুমার্য ও বাঙ্-নির্মিতির বিস্ময়কর পরিমার্জনা লক্ষ্য করা যায় তাহা সম্ভবতঃ রসজ্ঞ রাজন্যবর্গ ও রাজসেবক কর্মচারিগণের রসতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল। তাঁহার মার্জিত ছন্দ, রুচির নাগরিকতা, আদিরসের বাহুল্য ইত্যাদি প্রধানতঃ দরবারী আদর্শে পরিচালিত।"

বস্তুত বিদ্যাপতির কাব্যের ছন্দঃস্পন্দ ও শব্দঝঙ্কার অপূর্ব। পণ্ডিত কবির বিদগ্ধতায় এবং মণ্ডনশিল্পের অপূর্ব কুশলতায় তাঁর পদাবলী ঝলমল করে। অন্যদিকে শৃঙ্গার রসকেই তিনি যে তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় করেছেন তার সঙ্গে রাজসভার ভোগবিলাসিতার বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাই চণ্ডীদাসের সহজ ভাবগভীরতা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। বর্ণনার পারিপাট্য ও অলংকরণের বিচিত্র প্রয়োগ তাঁর কাব্যকে ইন্দ্রিয়চেতন রাজসভাসদবর্গের মনোরঞ্জনের সামগ্রী করে তুলেছে। এই জন্য বিদ্যাপতির প্রতিটি পদের পদলালিত্য ও ঝঙ্কার আমাদের কানকে তৃপ্ত করলেও তাঁর প্রতিটি পদই মনকে নাড়া দিতে পারে না। এই দিক্ থেকে বিদ্যাপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের উত্তরসূরী। তাই তাঁকে 'অভিনব জয়দেব' বা 'নব জয়দেব' নামে আখ্যাত করা হয়েছে।

বিদ্যাপতি যদিও মিথিলাবাসী তবুও তাঁকে বাঙালির কবি বলে দাবী করা যেতে পারে। মিথিলা পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত ও মৈথিল রাজসভায় লক্ষণাব্দ প্রচলিত ছিল—এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেও আমরা বলতে পারি যে বিদ্যাপতির কবিতা বাংলার নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত থেকে পাঁচ শ বছর ধরে ভক্তচিত্তকে উদ্বেলিত করেছে, অগণিত নরনারীকে আনন্দ বিতরণ করেছে। তাই তিনি

বাংলার কবি না হলেও বিশেষ করে বাঙালির কবি। সেকালে মিথিলা সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলা থেকে ছাত্রগণ সেখানে পড়তে যেতেন। সম্ভবতঃ তাঁরাই বিদ্যাপতির কবিতা গান করতেন, তাঁরাই দেশের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে চৈতন্যদেবের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে গানগুলি নতুন তাৎপর্য লাভ করেছিল। বাংলার বহু বৈষ্ণব পদকর্তাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ভাবশিষ্য হচ্ছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। তাই তাঁকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হয়। বাঙালি কবিসমাজে এত ব্যাপক প্রভাবের জন্যই বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হয়েও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। বাঙালী না হয়েও বিদ্যাপতি বাঙালী রসিকের পরমপ্রিয় কবি।

৩. চণ্ডীদাসের পদাবলী :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস নিয়ে সমস্যার শেষ নেই; আজও এ সমস্যার মীমাংসা হয় নি। তবুও আমরা প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের সুললিত পদাবলী আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করি। মহাপ্রভু 'স্বরূপ রামানন্দ সনে' রাত্রি-দিন পরম আনন্দে যে চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করতেন তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের চণ্ডীদাস নন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চণ্ডীদাসের পদগুলি ভাবগভীরতার দিক থেকে অতুলনীয়। রাধিকার অপূর্ব চিত্রাঙ্কনে, প্রেমানুভূতির বিচিত্র ব্যঞ্জনায়, সহজ-সরল সুরঝঙ্কারে এই কবি সুদীর্ঘ পাঁচ শ' বছরেরও বেশী সময় ধরে রসিক বাঙালীর মনোহরণ করে এসেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।"

বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে পদাবলীর চণ্ডীদাসের বাস ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। তাঁর ইষ্টদেবী বাশুলীর মন্দির ঐ গ্রামে এখনও আছে। অবশ্য সহজিয়া মতাবলম্বী চণ্ডীদাস, যিনি রামী বা রামমণি নাম্নী এক রজককন্যাকে সাধনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সহজিয়া পদ লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনিও নাকি ঐ নান্নুর গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। এ বিষয়ে জনশ্রুতি ছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। যাই হোক, পদাবলীর চণ্ডীদাস যাঁর গান সপার্ষদ মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন এবং সারা বাংলাদেশের জনগণ আজও বিমোহিত চিত্তে যাঁর গান শ্রবণ করে থাকে, তিনি যে চৈতন্যপূর্ব যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

পদাবলীর চণ্ডীদাসের জনপ্রিয়তার মূল কারণ এই যে তিনি সহজ, সরল, সুমধুর সুরে শ্রীরাধার অলৌকিক প্রেমমহিমার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর পদাবলীর সুমধুর সুর কেবল মাত্র পাঠকের কানেই প্রবেশ করে না, পাঠকের হৃদয়েও সৃষ্টি করে এক অনবদ্য সুরঝঙ্কার। শ্রীরাধাকে কবি অপার্থিব আবরণে আচ্ছাদন করে মর্ত্য থেকে বহুদূরে অধ্যাত্মতীর্থে স্থাপন করেছেন। রাধাকে তিনি দুঃখের মধ্য দিয়েই

সার্থক করে তুলেছেন। প্রেম রাধার কাছে ভাবাবেগ মাত্র নয়, তা' দুশ্চর তপস্যারই অঙ্গ। তাই পূর্বরাগে উৎকণ্ঠিতা রাধার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

আলো রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

—'যেমতি যোগিনী পারা'—এই একটি মাত্র উপমার মধ্য দিয়েই শ্রীরাধিকার তপস্যার মহিমাটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করে রাধিকার আকুলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

চণ্ডীদাসের 'আক্ষেপানুরাগের' পদগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। দুঃখের কবি চণ্ডীদাস তাঁর নায়িকার দুঃখের কথা বলেই পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন। প্রেমের দুঃখ চিরন্তন—শত চেষ্টা করেও এর নিবারণ করা যায় না—

"যত নিবারিয়ে চিত নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে।।"

প্রেমের রহস্য যে অতলস্পর্শ—অনির্বচনীয় উপলব্ধির অতল গভীরতাই এর মূল কথা—এ প্রেম একটা গভীর জীবন দর্শন—

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পীরিতি॥

কানু-প্রেমেই শ্রীরাধিকার জীবনেব সর্বস্ব হয়ে উঠেছে—সমাজ, সংসার সব মিথ্যে হয়ে গেছে,—রাধা অকপট চিত্তে বলেছে—

'তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।'

মাথুর-পর্বে বিরহী রাধিকা যখন কৃষ্ণকে অতুলনীয় বলে মনে করেছেন, তখন চণ্ডীদাসের রচনায় যেন আধুনিক গীতি-কবিতার সুর শোনা যায়—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি॥

ভাব-সম্মিলনের (বিরহের পর রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মানস মিলন) পদগুলিতেও চণ্ডীদাসের তন্ময়তা এবং ভাবগভীরতা তুলনাহীন ঃ—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥

এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে রাধা-চরিত্রে প্রেমের আর্তির বিভিন্ন পরিস্থিতির বর্ণনায় কবি চণ্ডীদাস নিপুণ মনস্তত্ত্ব এবং রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

চণ্ডীদাসের ভাষাভঙ্গিমা, ছন্দপ্রকরণ, বাক্ রীতি সহজ, সরল ও জীবন্ত—বড়ই প্রাঞ্জল। ভাষার সরলতা, উপমা-রূপকের ব্যঞ্জনাধর্মিতা, ভাবের অকৃত্রিমতায় চণ্ডীদাস অদ্বিতীয় শিল্পী। এখানে তাঁর বাক্‌শিল্পের কতকগুলো দৃষ্টান্ত দেওয়া হল ঃ—

১। শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।
২। 'এতেক সহিল অবলা বলে,
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে।
৩। কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
৪। বণিক জনার করাত যেমন
দুদিকে কাটিয়ে যায়।

এমন নিরাভরণ সহজ সুন্দর পদগুলিতে বাঙালীর কোমল হৃদয়ের প্রতিধ্বনি আছে। ভক্তির আবেগ, বেদনাবোধের মাধুর্য চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোন বৈষ্ণব কবি প্রকাশ করতে পারেন নি। তাই সহজ সুরে, উপলব্ধি সারল্যে, সুগভীর ভাবব্যঞ্জনায় আজও চণ্ডীদাস বাঙালীর একান্ত প্রাণের কবি। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কানুদাসের সংক্ষিপ্ত অথচ সার্থক উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'সরল তরল অতীব প্রাঞ্জল
প্রসাদগুণেতে ভরা।'

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা ঃ

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী, উভয়ই সমসাময়িক, দুজনের পদাবলীই ভাষাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা। তবে কবিদ্বয়ের জন্মভূমি স্বতন্ত্র, জীবন-পরিবেশও বিভিন্ন। বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি, চণ্ডীদাস ছিলেন বাংলাদেশের কোন এক গ্রামের বাশুলী মন্দিরের দরিদ্র সেবক। এই পার্থক্যের জন্যই বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস উচ্চতম কবিপ্রতিভার

অধিকারী হয়েও কবিধর্মে এবং কবিকর্মে স্বতন্ত্র। রাজসভার কবি হওয়ায় বিদ্যাপতির পদাবলীতে আছে ভাষার সৌন্দর্য, উপমার ঐশ্বর্য, অলঙ্কার ও শব্দচাতুর্যের রমণীয় বিলাস, এক কথায় নাগরিক জৌলুস ও মণ্ডনকলার বিচিত্র ঐশ্বর্য। কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যে দেখতে পাওয়া যায় গ্রামীণ সুরের সহজ মাধুর্য। বৈষ্ণব গাঢ়তায়, আবেগের গভীরতায় ও উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় চণ্ডীদাসের পদাবলী বৈষ্ণব ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন।

রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় রাজসভার কবি বিদ্যাপতি রূপ-বর্ণনা ও যুবতী জনোচিত কৌতুকে ব্যাপৃত হয়েছেন। তাই আমরা দেখি, বিদ্যাপতির রাধা—

'খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরই।
খনে খনে বসন ধূলি তণু ভরই॥
খনে খনে দশন ছটাছট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগে আমরা দেখি—

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

ভক্তপ্রাণের অপূর্ব আত্মনিবেদনের সুর কানের ভিতর দিয়ে মর্মকে স্পর্শ করে—দেহের সম্পর্ক ত্যাগ করে এ সুর যেন দেহাতীতকে খুঁজে বেড়ায়।

মিলনের সুর বর্ণনায় বিদ্যাপতির কবিতায় সুখের উল্লাস, চণ্ডীদাসের কবিতায় সুখের উৎকণ্ঠা। মিলনে বিদ্যাপতির রাধা বলে—

'দারুণ ঋতুপতি যত দুঃখ দেল।
পিয়ামুখ হেরইতে সব দূর গেল॥'

কিন্তু প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন-সুখে বিভোর থেকেও চণ্ডীদাসের রাধার আক্ষেপ মেটে না,—সে বলে—

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পীরিতি॥

বিদ্যাপতির পদ উপমাশোভিত, শব্দের চাতুর্যে এবং ভাষার সৌন্দর্যে অনুপম, আর চণ্ডীদাসের পদ ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ গভীর অনুভূতি-প্রকাশক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমভাবের প্রকাশক। বিদ্যাপতির কাব্যে আদিরসের পরিবেশন কোথাও কোথাও সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করেছে, পক্ষান্তরে চণ্ডীদাসের পদে ইন্দ্রিয়-ভোগের কথা থাকলেও, তাঁর তাৎপর্য ইন্দ্রিয়াতীত।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখ করেই আমরা বক্তব্য শেষ করব—

"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া

পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে। চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল ; বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।"

তৃতীয় অধ্যায়

কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়

১. কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ ঃ

বাংলা ভাষায় প্রথম সংস্কৃত রামায়ণ অনুবাদ করেন কবি কৃত্তিবাস। কবির আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। সেস্থান ছেড়ে কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা রাণাঘাটের নিকটে ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই ফুলিয়া গ্রামে কবি কৃত্তিবাসের জন্ম। মাতার নাম মেনকা, পিতার নাম বনমালী। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে তাঁর জন্ম। কবি আত্মবিবরণীতে লিখেছেন—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

এই বিবৃতি অনুসারে পণ্ডিতরা কবির জন্ম সন ও তারিখ সম্পর্কে একমত হতে পারেন নি। যাহক, বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা হয় তিনি ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। এবং গৌড়েশ্বরের রাজসভায় বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হন। রাজার অনুরোধেই তিনি অনুবাদ রচনায় ব্রতী হন।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ অনুসরণে বাংলা রামায়ণ পাঁচালী অনুবাদ করেন। বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়া অদ্ভুত রামায়ণ, জৈমিনী ভারত, বিভিন্ন পুরাণ থেকেও তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন।

প্রকৃতপক্ষে কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। আপামর জনসাধারণের নিকট সরল ভাষায়, পয়ার ত্রিপদী ছন্দে গল্পরস পরিবেশনই ছিল কৃত্তিবাসের লক্ষ্য। তাই তিনি বাঙালীর প্রাণের মত মনের মত করে রামায়ণের অনুবাদ করেন। বিশ্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্পরসের প্রতি প্রবণতা থাকায় অনেক নূতন সরস উপাখ্যানও সংযোগ করেছেন। এসব উপাখ্যানের মধ্যে বীরবাহুর যুদ্ধ, তরণী সেন বধ, মহীরাবণ-অহিরাবণের কাহিনী, রাবণের নিকট রামের রাজনীতি শিক্ষা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কৃত্তিবাস অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের উপযোগী করে রামায়ণ অনুবাদ করেন। আসলে তাঁর রচনা ভাবানুবাদ। বাঙালী প্রাণের রসে তাঁর রামায়ণ সিক্ত। তিনি উপমাঅলংকারাদি গ্রামীণ জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন। গ্রামের জনসাধারণের দিকে

তাকিয়েই তিনি নীতি কথা ও তত্ত্বোপদেশ প্রয়োগ করেছেন। বাঙালী জীবনের সুখ দুঃখের সুরে তাঁর রামায়ণ পাঁচালী ঝংকৃত বলেই তিনি কালজয়ী প্রতিভার অক্ষয় সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কৃত্তিবাসের চরিত্রগুলি সবই বাঙালী চরিত্রাদর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রামচন্দ্র একান্নবর্তী পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ অগ্রজানুগত দেবর, সীতা সতীসাধ্বী বাঙালী বধূ—আর হনুমান তো আমাদের বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য। রাম রাবণের লড়াইতে বাল্মীকী বর্ণিত সে সমুন্নতি নেই। রাম-রাবণের সংঘর্ষ গ্রাম বাংলার জমিদারের লড়াইর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হনুমানের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে বাঙালীর রঙ্গ কৌতুক ঠাট্টা তামাসা ফুটে উঠেছে। অযোধ্যানগরী ও ভরদ্বাজের আশ্রম বর্ণনায় তিনি গাছপালা শোভিত ও পশুপক্ষীর কলরবে মুখরিত বঙ্গদেশকেই জীবন্ত করে তুলেছেন। এক কথায় তিনি বাঙালীর জীবন প্রকৃতিকেই রামায়ণ কাহিনীর প্রেক্ষাপটে স্থান দিয়েছেন।

কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদ করলেও তার মধ্যে তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে। রামায়ণের কাহিনী, চরিত্র ও বিষয়বস্তুর মধ্যে বাঙালী জাতির চরিত্রধর্ম দীপ্যমান। স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত দেশবাসীর জন্যই তাঁর সাহিত্য সাধনা। বাঙলীর মনের দিকে তাকিয়ে তিনি সহজ সরল ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। বাল্মীকির চরিত্রগুলিকে তিনি দেশকাল ও পাত্রের প্রয়োজনে বাঙালী চরিত্রের সাধর্ম্যে রূপান্তরিত করেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ তাই পুরাতন পাত্রে নূতন রস পরিবেশনের মতো। মধ্যযুগীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ও লোকচরিত্রের প্রভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলা ও বাঙালীর জাতীয় কাব্যে পরিণত হয়েছে। বাঙালীর যে জীবন ধর্ম ও চিত্তভাবনাকে কবি রামায়ণে তুলে ধরেন তা পাঁচশত বছরের ব্যবধানেও পুরাতন হয়ে যায় নি। কৃত্তিবাসের হাতে বাল্মীকির চরিত্রগুলির বাঙালী প্রাণের রসে জন্মান্তর রূপান্তর ঘটেছে। ভক্তিপ্রেম, ভোগবিলাসিতা, আলস্য-পরায়ণতা, ও কলহ প্রবণতা নিয়ে দোষে গুণে বাঙালী স্বভাবের নিপুণ ছবি কৃত্তিবাসের রামায়ণে পরিস্ফুট। বাঙালী যাহা চায়, কৃত্তিবাস রামায়ণে তাহাই তুলে ধরেছেন। কৃত্তিবাস এ বঙ্গের অলঙ্কার। তিনি যে মধুচক্র রচনা করেন—অদ্যাবধি আপামর বাঙালী 'আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি'।

২. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ঃ

হিন্দুধর্মের তত্ত্ব ও উপদেশ নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলি সাধারণভাবে পুরাণ নামে অভিহিত। পুরাণের সংখ্যা আঠারোটি। 'ভাগবত' আঠারোটি পুরাণের অন্যতম। ভাগবতের মোট বারোটি স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক কাহিনী বর্ণিত। মালাধর বসু ভাগবতের মাত্র দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুবাদ করেন। তাঁর এই অনুবাদ কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়। গোবিন্দবিজয় ও গোবিন্দমঙ্গল নামেও এটি পরিচিত।

বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে এক উচ্চ কায়স্থ পরিবারে মালাধর বসুর জন্ম। ভাগবত অনুবাদের জন্য মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে একটি শ্লোক পাওয়া যায় —

'তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন ;
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥'

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় লেখা সুরু হয় ১৩৯৫ শকে অর্থাৎ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, আর গ্রন্থ রচনা শেষ হয় ১৪০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে। এই সব তারিখের মধ্যে বাংলার সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ ও তৎপুত্র সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ। এঁদের কেউ কবিকে উপরোক্ত উপাধি দিয়ে থাকবেন। মনে হয় শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। অনুমান করা যেতে পারে, কবি মালাধর ১৪২০-২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

স্বয়ং শ্রীচৈতন্য এই গ্রন্থের রস আস্বাদন করতেন। 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'—এই কাব্যাংশটি মহাপ্রভুর খুব প্রিয় ছিল। কৃষ্ণকে প্রেমের মধ্য দিয়ে ভজনা করার রীতি প্রকাশ করে মালাধর বাংলার বৈষ্ণব সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেন। চৈতন্যদেবের রাগানুগা সাধন প্রণালী শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পাঁচালীর রীতি অনুসারে জনসাধারণের জন্য মালাধর এই কাব্য রচনা করেন।—

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে নাই পাঁচালি রচিয়া ॥"

মালাধরের গ্রন্থে দশম স্কন্ধের কৃষ্ণ জন্ম থেকে দ্বারকা লীলা পর্যন্ত ঘটনা এবং একাদশ স্কন্দের কৃষ্ণের অনুতাপ ও যদু বংশ ধ্বংসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদ্য কাহিনী বা বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, নানা অসুর বধ, গোপীলীলা ও কংস বধের জন্য মথুরা যাত্রা বর্ণিত। মধ্য কাহিনী বা মথুরা লীলায় মথুরায় কংস বধ, উগ্রসেনকে উদ্ধার ও সিংহাসন প্রদান, জরাসন্ধ বধ এবং দ্বারকাপুরী স্থাপনের জন্য মথুরাপুরী ত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা সন্নিবেশিত। অন্ত্যকাহিনী বা দ্বারকালীলায় দ্বারকাপুরী নির্মাণ, শিশুপাল বধ, রুক্মিনী, জাম্ববতী ও সত্যভামাকে বিবাহ, ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ, সুভদ্রাহরণ, ঋষির অভিশাপে দ্বারকাপুরী ধ্বংস এবং ব্যাধের হাতে কৃষ্ণের প্রাণত্যাগ স্থান পেয়েছে।

সুতরাং কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মালাধর ভাগবতের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থে ভাগবত বহির্ভূত নৌকাবিলাস, দানলীলা ও রাধা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। বোধহয় জনসাধারণের প্রীতির জন্য তৎকালে প্রচলিত লৌকিক কাহিনী কবি জুড়ে দেন।

যাহক, মালাধর ভাগবতকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদ করেন। তবে প্রয়োজনবোধে তিনি মূল অংশের কিছু কিছু পরিবর্তন করেন এবং নূতন কিছু কাহিনীও যোগ করেন। তিনি ভাগবতের তত্ত্বকথাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে আখ্যান বস্তুকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কাহিনীর রস সৃষ্টির দিকেই কবির লক্ষ্য ছিল। মূলতঃ মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের বীর্যবত্তার বা তাঁর বীরত্বের দিকটি তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য কাহিনী তাকে পরিপুষ্টি দান করেছে।

অনুবাদ কখনোই আক্ষরিক নয়। অনুবাদের মন মেজাজের ছায়াপাত ঘটে তার মধ্যে। মালাধরের অনুবাদও আক্ষরিক নয়, ভাবানুসারী। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা বর্ণনায় বাঙালী বালকের জীবনলীলার প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া বৃন্দাবনের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচিত হয়েছে তা পল্লবঘন বঙ্গপল্লীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মালাধর বসু, অনুবাদ সাহিত্যে নিজস্ব কবি কল্পনা প্রকাশের সুযোগ পাননি। কিন্তু বৃন্দাবনলীলা বর্ণনায় তাঁর প্রতিভার কিছু পরিচয় মিলে। কৃষ্ণ বিরহে গোপীদের বিলাপ ও শোকপ্রকাশের মধ্যে ভক্তি ভাবুকতার অনাড়ম্বর নিদর্শন মিলে।

"আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে॥
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন॥
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মেলে কৃষ্ণ পাপে লাজ॥"

এই আন্তরিক ভক্তিভাবুকতার জন্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' চৈতন্যদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য সাধনার উৎস এই গ্রন্থটি। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে অনুরাগ মূলক গৌড়ীয় প্রেমভক্তির প্রকাশ এতে নাই। ভাগবতের ভক্তিকেই মালাধর সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ করেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তুলনা করেন অনেকে। দুটি গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় মূর্তিই অংকিত হয়েছে। ভূভার হরণের নিমিত্ত দুটি গ্রন্থেই কৃষ্ণের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ রাধাকে বৃন্দাবনে ত্যাগ করে কংসবধের জন্য মথুরায় গেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণ কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি দোর্দণ্ড প্রতাপশালীদের নিধন করে নিজে মর্ত্যলীলা পরিহার করেছেন।

যাহক, মালাধর বসু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি আপামর জনসাধারণের হৃদয় দ্বারে ভাগবতের কাহিনীকে সরস সুন্দর করে পৌঁছে দেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজ জীবন

১. মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ :

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্যসূচক বহু কাহিনী কাব্য গড়ে ওঠে। সেগুলি মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালীর সাহিত্যিক প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও রায়মঙ্গলই প্রধান।

প্রথমে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী মেয়েলি ব্রত কথা, ছড়া ও পাঁচালি আকারে বর্তমান ছিল। পরে তা কাব্যের রূপ লাভ করে। মঙ্গলকাব্যের উদ্‌ভবের পিছনে রয়েছে বাংলাদেশের আদিম অনার্য জাতির আধিভৌতিক ভয় ভাবনা। এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সূচনা।

বাংলাদেশ নদীনালা পাহাড় পর্বত ও অরণ্য জলাভূমিতে আকীর্ণ দেশ। ঝড় ঝঞ্ঝা বন্যা দুর্যোগ, হিংস্র জন্তু জানোয়ার ও ওলাওঠা-বসন্ত প্রভৃতি ভয়ংকর ব্যাধির কবলে এদেশের অধিবাসী সর্বদাই বিপর্যস্ত থাকত। বাস্তবের এইসব উপদ্রব থেকে নিজেদের রক্ষা করার কোনো উপায় না থাকায় এ দেশের প্রাচীন মানুষ কল্পনায় এক **illusion**-এর জগৎ তৈরী করল। তারা মনে করল সমস্ত উপদ্রবের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো শক্তিধরের হাত আছে। তাই তারা সাপের ক্ষেত্রে মনসা, ঝড়ঝঞ্ঝার ক্ষেত্রে চণ্ডী, ব্যাঘ্রের স্থলে দক্ষিণরায় প্রভৃতি দেবদেবীর কল্পনা করল। ক্রমে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠল যে এইসব দেবদেবীর আরাধনা করলে বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং সংসারে মঙ্গল সাধিত হবে। তারপর সেইসব দেবতার মাহাত্ম্যকথা ছড়া ও ব্রত কথার আকারে মুখে মুখে প্রচলিত হল। এই সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণ মঙ্গলকথাগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের পটভূমিতে সংহত কাব্যরূপে গড়ে উঠার সুযোগ পেল।

এস্থলে বলা দরকার যে বাংলাদেশে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আর্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়! আর্য অনার্য জাতির সংমিশ্রণ ঘটলেও অনার্যদের ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবীর পূজার্চনা স্বতন্ত্রধারায় চলতে থাকে। ফলে বাংলাদেশে আর্যসংস্কৃতি ও অনার্যসংস্কৃতি—এই দুটি জীবনস্রোত সমান্তরাল ভাবে বইতে থাকে। ড. সুকুমার সেনের মতে—'আভিজাত্যে, সমৃদ্ধিতে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এই দুই স্তরের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল।' অভিজাত হিন্দুরা লৌকিক স্তরের দেবদেবীকে অবজ্ঞার চোখে দেখত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে ধর্মকলহ ও সংঘর্ষ লেগেই থাকত।

এরপর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী বিনা প্রতিরোধেই

বাংলাদেশ জয় করেন। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নিপীড়নে ও সামাজিক অত্যাচারে বাঙালী জাতি বহুধা বিচ্ছিন্ন থাকায় তুর্কীদের পক্ষে বাংলাদেশ জয় করা একান্ত সহজ হয়ে পড়েছিল। তুর্কীরা দেশ জয় করেই ক্ষান্ত হয়নি। বাংলার ধর্ম ও সমাজ জীবনে প্রচণ্ড আঘাত হানে। হিন্দুর মন্দির দেববিগ্রহ ভাঙতে থাকে। নিম্নশ্রেণীর মানুষরা উচ্চশ্রেণীর অকথ্য অত্যাচার ও অবজ্ঞার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এই সর্বব্যাপী বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে অভিজাত হিন্দুসমাজের চৈতন্যোদয় ঘটে। তারা ভাবলেন হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হৃদয়ের বন্ধন। নতুবা—'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে টানিবে যে নীচে।'

বিপর্যস্ত হিন্দুসমাজ মুসলমান শাসক জাতির ধর্মীয় প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনার প্রয়োজন অনুভব করলেন। এর ফলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দীর্ঘকালের ব্যবধান ঘুচে গেল—পরস্পর কাছাকাছি এলেন—ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ এলো। তখন উপরতলার হিন্দুরা নীচের তলার হিন্দু জনসাধারণের লৌকিক ধর্ম ও পূজিত দেবদেবীকে স্বীকৃতি জানাল। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পৌরাণিক দেবদেবী ও পৌরাণিক সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করার সুযোগ পেল। এ ভাবেই বহু অনার্য দেবতা আর্যদেবদেবীর পাশে স্থান করে নিল। আদিতে চণ্ডী ছিলেন অনার্য জাতির উপাস্য দেবতা। ক্রমে তিনি শিবপত্নী উমার সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। অনার্য দেবতা ধর্মঠাকুর পৌরাণিক বিষ্ণুর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। নিম্নবর্ণের পূজিত দেবতারা উচ্চবর্ণের শ্রদ্ধা লাভ করল। ড. সুকুমার সেনের মতে—

"দুই স্তরের দেবতা যখন এক হইয়া আসিয়াছে তখনও সেই দেবচরিত্রে নবীন প্রবীন বিশিষ্ট ভাবধারা দুইটি পাশাপাশি বহিয়া গিয়াছে। শিব যখন শাস্ত্রপন্থী নবীনের দেবতা তখন তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ সতীপতি উমাধর, আর যখন তিনি ভাববিলাসী প্রবীনের দেবতা তখন তিনি ভোলানাথ গঞ্জিকা ধুস্তুরসেবী নীচ, পরনারীর লোভে হীন কর্মে রত।...চণ্ডী যখন প্রথমস্তরের দেবতা, তখন তিনি চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী মহিষাসুরমর্দিনী, আর যখন তিনি দ্বিতীয় স্তরের দেবতা তখন তিনি বন্যপশু পালিনী মুখরা শিবপত্নী।"

তুর্কীদের আক্রমণে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দুর্দশা ঘটে বেশী। টোল পাঠশালা প্রভৃতি শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থানগুলি সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। দেশে তখন কোনো প্রবল হিন্দু রাজশক্তি ছিল না যার কাছে আশ্রয় মিলে। ভীত সন্ত্রস্ত উচ্চশ্রেণীর সমাজ এমন এক শক্তিধরকে পেতে চাইলেন যার কাছে বরাভয় পাওয়া যায়। এই বরাভয় দাতা দেবতা ছাড়া আর কেইবা হতে পারে। অনার্যদের মঙ্গল গাথাগুলির মধ্যে সেই দেবতার সন্ধান মিলল। সেইসব দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সব বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় ও ঐহিক সমৃদ্ধি ঘটবে—এই ধারণা থেকেই শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর কবিগণ তৎকাল প্রচলিত অপূর্ণ অপরিণত মঙ্গল কাহিনীগুলিকে

মঙ্গলকাব্যের সুসংহত ও পরিণত শিল্পরূপ দান করলেন। তুর্কী আক্রমণে অসহায় দেশের মানুষ অনার্য দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়ে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলি নিঃসন্দেহে তুর্কী আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী আর্য ও অনার্য—এই দুই সংস্কৃতির ঐতিহাসিক সমন্বয়। তুর্কী আক্রমণে বিপন্ন হিন্দু সমাজের প্রবল প্রতিক্রিয়াই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। পরাজিত অসহায় মানুষ স্বৈরাচারী শক্তিকে দেবতা কল্পনা করে তার কাছে বরাভয় প্রার্থনা করেছে। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এস্থলে প্রণিধানযোগ্য—

"সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী, নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে—এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।"

২. মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজ জীবন ঃ

কবি একজন সামাজিক জীব। তাই তিনি যে দেশে যে কাল ও পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন মূলতঃ সেই জীবন্ত পটভূমি থেকেই জীবন সম্পর্কিত তাঁর সমস্ত ধ্যানধারণার উদ্‌ভব ঘটে। তাই সাহিত্য যে যুগেই হক না কেন তার মধ্যে সমকালীন সমাজ জীবনের অল্প-বিস্তর পরিচয় ফুটে উঠবেই। আর কবি যদি কাহিনী কাব্য রচনা করেন—তা বস্তুনিষ্ঠ বলেই প্রধানতঃ সমাজ জীবনের কাহিনী তাতে প্রাধান্য পাবেই।

মঙ্গলকাব্যের কবিরা বিশুদ্ধ রসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্য রচনা করেন নি। 'তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে ছিল সমকালীন জীবনের প্রেরণা। তাই মঙ্গলকাব্য গুলিতে তৎকালীন সমাজের চিত্র হুবহু ফুট উঠেছে। মঙ্গলকাব্যগুলি সে সময়কার সমাজের দর্পণ স্বরূপ। বাঙালীর ধর্মকর্ম, আচার ব্যবহার, পালপার্বন, সামাজিক রীতিনীতি, আমোদ উৎসব, বিবাহ অনুষ্ঠান, নরনারীর বেশভূষা, সাধ-ভক্ষণ, অন্নপ্রাশন ও দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় মঙ্গলকাব্যে ভীড় করে এসেছে।

তখনকার যুগে মানুষরা বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করত। বণিক শ্রেণীর মানুষেরা সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। ধনের প্রাচুর্য হেতু অভিজাত সমাজে অমিতাচার ও ভোগবিলাস প্রশ্রয় পেয়েছিল। অভিজাত পরিবারে নারীর অবরোধ প্রথা ছিল। এবং অনূঢ়া কন্যাদের নৃত্যগীত শিক্ষা দেওয়া হত। ক্ষেত্র বিশেষে নারী নিগ্রহ কঠোর ভাবে চলত। নারীকে সতীত্ব পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অগ্নিপরীক্ষায় বসতে হত—এমন কি তাদের সাপের মুখে ফেলে দেওয়া হত। সহমরণ প্রথা বর্তমান ছিল। বাঙালী যে ভোজন রসিক ছিলেন তার পরিচয়ও মিলে। এক কথায় মঙ্গলকাব্যের কবিরা বাঙালীর আহারবিহার, হাটবাজার, পোষাক অলঙ্কার, শিক্ষাদীক্ষা—জন্ম থেকে মৃত্যু প্রতিটি সামাজিক আচার আচরণের

বিস্তৃত পরিচয় মিলে। শুধু এই নয়, বাঙালীর শৌর্যবীর্য ও ব্যবসাবাণিজ্যে পারদর্শিতার পরিচয়ও মিলে।

সমাজে সাধারণতঃ অভিজাত ধনিক শ্রেণী ও দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সরল ও সৎপ্রকৃতির ছিল এবং ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু ধূর্ত প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী বা ঠগ ব্যক্তিরা এদের নানা ভাবে প্রবঞ্চিত করত।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। সমাজ জীবনের দ্রষ্টা মুকুন্দরাম নীচ জাতি ব্যাধ থেকে সুরু করে ভণ্ড ব্যবসায়ী, ঠগ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শিক্ষক শিক্ষার্থী, বৈদ্য, পাইক পেয়াদা, ধনী দরিদ্র, স্বামী-স্ত্রী পরিবার ও সতীন সম্পর্ক,—ধনীগৃহের পরিচারিকা দাসী—এমনি বহু বিচিত্র চলমান জীবনের ছবি এঁকেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ড ও মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কাহিনীতে বিধৃত হয়েছে প্রাচীন বাংলার নৌবাণিজ্যের ঐতিহ্যের স্মৃতি। সমাজের গণ্যমান্যদের জীবনযাত্রায় কঠোর অনুশাসন ছিল। খুল্লনার ছাগল চরানোর জন্য ধনপতিকে জরিমানা দিতে হয়।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে মল্লবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধনিপুণ লাউসেনের চরিত্রে তথাকথিত নিম্নজাতীয় ডোম শ্রেণীর বীর্যবত্তার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত। প্রাচীন যুগে বন কেটে বসতি স্থাপনের দৃষ্টান্ত রয়েছে চণ্ডীমঙ্গলের গুজরাট নগর পত্তনে। গুজরাট নগর পত্তনে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার পরিচয় মিলে। ধনিক শ্রেণীরা ভয়ঙ্কর ভোগ বিলাসী ছিলেন—তাঁরা বহুবিবাহ করতেন।

বস্তুতঃ মঙ্গলকাব্যে বাংলার লোকচরিত্র, লোকজীবন ও লোক সংস্কৃতির বৈচিত্র্য-বাহী বিভিন্ন রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিবিধ প্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্যে স্থান পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে মঙ্গলকাব্যগুলি তৎকালীন সামাজিক ইতিহাস রচনার অভিধান স্বরূপ।

পঞ্চম অধ্যায়

মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা

১. মনসামঙ্গলের কাহিনী ঃ

মনসা শিবের মানস কন্যা। তাই নাম মনসা। কেয়া পাতায় তার জন্ম হয়েছিল বলে কেতকা। আবার ভিন্নমতে পদ্মপত্রে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বলে তিনি পদ্মাবতী। সর্পবিষ হরণ করতে পারেন বলে তিনি বিষহরি। মনসার মহিমা-বিষয়ক কাব্যকে মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ বলা হয়ে থাকে।

জন্মের পর কৈলাসপুরীতে বিমাতা চণ্ডীর সঙ্গে কলহে মনসার এক চক্ষু কানা হয়ে গেল। মনসা জন্ম থেকে বিষাক্ত, কোপ দৃষ্টিতে কারুর দিকে তাকালে সে মূর্চ্ছা যায়, মৃত্যুও হতে পারে। বিমাতা চণ্ডীও মনসার কোপকটাক্ষে একবার চেতনা হারান। যাহক, সেই মনসার বিয়ে হয় জরৎকারু মুনির সঙ্গে। কিন্তু পুত্র আস্তীকের জন্মের আগেই মুনি তাঁকে ছেড়ে তপস্যায় চলে গেলেন। স্বামী পরিত্যক্তা মনসার দুঃখের অবধি রইল না।

মনসার সহচরী নেতা উপদেশ দিলেন মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচারিত হলে তাঁর দুঃখ ঘুচবে। পূজা প্রচারের জন্য মনসা মর্ত্যে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। প্রথমে নীচুতলার রাখাল বালকেরা তাঁর পূজা করল। ধীরে ধীরে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সমাজের সাধারণ স্তরে তাঁর পূজার প্রচলন ঘটল। কিন্তু এতে মনসা পরিতৃপ্ত নন। ভদ্রসমাজে তাঁর পূজা প্রচারিত না হলে বৃহত্তর সমাজ থেকে তিনি দূরে থাকবেন।

সমাজে তখন গণ্যমান্য বণিকনেতা ছিলেন চাঁদসদাগর। তিনি মনসার পূজা করলে ভদ্র ও অভিজাত সমাজে মনসা পূজ্য দেবী হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন। কিন্তু চাঁদসদাগর শৈবভক্ত। কিছুতেই তিনি স্ত্রী দেবতার পূজা করবেন না। মনসার নির্দেশে নেতা ছদ্মবেশে চাঁদের অন্তঃপুরে গিয়ে চাঁদের স্ত্রী সনকাকে মনসা পূজার দীক্ষা দিয়ে এলেন। চাঁদসদাগর পদাঘাতে পূজার ঘট ভেঙ্গে দিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। এতে মনসার ক্রোধ দ্বিগুণিত হল। তিনি চাঁদকে নানাভাবে উৎপীড়ন করতে লাগলেন। চাঁদের সাধের বাগান বাড়ীটি তিনি ভেঙ্গে দিলেন, চাঁদের পরম বন্ধু ওঝা ধন্বন্তরীও মনসার কোপে মারা গেল। খাদ্যে বিষপ্রয়োগে চাঁদের ছয় পুত্র মারা গেল। তবুও চাঁদ অটল। বাণিজ্য যাত্রায় চাঁদের চৌদ্দটি ডিঙা সমুদ্রে ডুবল। সাতদিন জলমগ্ন থেকে চাঁদ অর্ধচৈতন্য অবস্থায় কূলে উঠলেন। অশেষ লাঞ্ছনা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর চাঁদ দেশে ফিরলেন। তখন তাঁর এক পুত্র হয়েছে। নাম লখিন্দর। চাঁদ পুত্র মুখ দেখে সব দুঃখ ভুলে গেলেন।

'দেখি পুত্র মুখ সাধুর কৌতুক
সব শোক পাসরিল।'

পুত্র বড় হল। সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে দিলেন। বিবাহবাসরে লখিন্দরের সর্পদর্শনে মৃত্যু হবে জেনে সাঁতালি পর্বতে এক নিশ্ছিদ্র লোহার বাসর ঘর তৈরী করলেন। কিন্তু পুত্রকে রক্ষা করতে পারলেন না। এক সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে রাত্রির অন্তিম প্রহরে কালনাগিনীর দংশনে লখিন্দর মারা গেলেন। নববধূর জীবনের স্বপ্ন ফুরোল।

সাপে কাটা মৃতদেহ জলে ভাসানো রীতি। তাই লখিন্দরকে কলার মান্দাসে নিয়ে বেহুলা ভেসে চললেন। তাঁর কঠিন জেদ সে যদি সতী হয় তবে স্বামীর জীবন ফিরে আসবে। মৃতদেহ সহ বেহুলা ভেসে চললেন। অনেক প্রলোভন, অনেক দুর্যোগ অতিক্রম করে স্বামীর দেহাবশেষ নিয়ে বেহুলা স্বর্গে পৌছুলেন।

বেহুলা নৃত্যগীতে অতিশয় দক্ষ ছিল। দেবসভায় নৃত্যগীত পরিবেশন করে

মহাদেব ও অন্যান্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করলেন। বেহুলার দুর্ভাগ্যের কথা দেবতারা শুনলেন। তখন মহাদেবের নির্দেশে মনসা লখিন্দরকে বাঁচিয়ে দিলেন। তবে সর্বসমক্ষে বেহুলাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে বেহুলা পৃথিবীতে গিয়ে শ্বশুরকে দিয়ে যেমন করেই হক মনসার পূজা প্রচার করবে। তখন মনসার ক্রোধ প্রশমিত হল। চাঁদসদাগরের ছয় পুত্র বেঁচে উঠল—সমুদ্রবক্ষে নৌকাগুলি ভেসে উঠল। স্বামী, ছয় ভাশুর ও বাণিজ্য তরী নিয়ে বেহুলা দেশে ফিরলেন। মহা আনন্দ পড়ে গেল। বেহুলা চাঁদকে যে মনসার কৃপায় সব ফিরে পেয়েছেন, তার পূজা ও মহিমা প্রচার করতে বললেন। চাঁদ বেঁকে বসলেন—এ অসম্ভব। স্ত্রী দেবতার পূজা?

"যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পূজিব পুনি চেংমুড়ি কাণি॥"

শেষ পর্যন্ত বেহুলার কাকুতি মিনতিতে চাঁদ বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্যে ফুল ফেলে দিলেন। ডান হাতে শিবের পূজা করেন—তাই ঐ হাতে মনসার পূজা করলেন না। এতেই দেবী সন্তুষ্ট হলেন। ক্রমে বণিক ও অন্যান্য অভিজাত সমাজে মনসার পূজা প্রচারিত হল। আর বেহুলা ও লখিন্দর (শাপভ্রষ্ট উষা ও অনিরুদ্ধ) মনসার পূজা প্রচার করে সশরীরে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

২. বিজয় গুপ্ত ঃ

বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল কবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের বৈদ্য বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ। কবির কাব্যের আত্মপরিচয় থেকে পিতা মাতার নাম ও বাসস্থানাদির পরিচয় জানা যায়। তাঁর পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিনী।

গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সময়ে তিনি কাব্য রচনা করেন। কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে বিজয় গুপ্ত হেঁয়ালি ভাষায় যে দুটি বক্তব্য রেখেছেন তার অর্থ দাঁড়ায় দুরকম। একটি পুঁথিতে আছে—

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক॥"

অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। আর একটি পুঁথিতে পাওয়া গেছে—

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক;
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক॥

এখানে ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কিন্তু ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার অধিপতি হন। সুতরাং প্রথম শ্লোকের গণনানুযায়ী বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। শোনা যায় কবি নিজ গ্রামে মনসাদেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। সেই মূর্তি এখনো বর্তমান।

বিজয় গুপ্ত বিদগ্ধ কবি। হাস্য ও কৌতুক রস সৃষ্টিতে তিনি অসামান্য দক্ষতার

পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দ, অলঙ্কার ও ভাষার পারিপাট্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশী। ভাবের গভীরতা অপেক্ষা মণ্ডন কলার দিকে তাঁর সচেতন প্রয়াস কাব্যের সর্বত্র লক্ষণীয়। বিজয় গুপ্ত কাহিনীর সামগ্রিকতার পরিবর্তে কাহিনীর বৈচিত্র্য সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বেশি।

কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্ত বিশেষ কোনো প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। আদর্শগত দিক থেকে মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা বিজয় গুপ্তকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। মনসার দৈবী মহিমাকে তিনি আমল দেন নি। তাঁর কোপন স্বভাব ও ক্রূরতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে—'পাপিষ্ঠ মনসা পাষাণ তার হিয়া।' কিন্তু এস্থলে মনসা চরিত্রের কার্যকারণ সম্পর্কটি কবি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে যথার্থ সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কবি দেখিয়েছেন বাল্যে স্নেহহীনতা ও বিমাতার অত্যাচার ও যৌবনে স্বামী প্রেমের অভাবই মনসাকে ক্ষিপ্ত, ন্যায় অন্যায় স্নেহ দয়া মায়াহীন হিংস্র নিষ্ঠুর করে তুলেছে—

"জনম দুখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্ম ফল।
দেব কন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥"

তাছাড়া চাঁদের বলিষ্ঠ পৌরুষ, সনকার মাতৃহৃদয়ের বেদনা, বেহুলার পাতিব্রত্য ও পবিত্রতা বিজয় গুপ্তের লেখনীতে উজ্জল হয়ে উঠেছে। শিবকে তিনি শিথিল চরিত্রের গৃহস্থ ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলেছেন। এক কথায় বিজয় গুপ্ত উচ্চাঙ্গ কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাংশে প্রশংসনীয়। সুখে দুঃখে, ক্রোধে অভিমানে, হাস্য পরিহাসে ও নৈতিক শৈথিল্যে জাগ্রত মনুষ্যত্বের তিনি রূপকার।

ভাষা, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্যে মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে বিজয় গুপ্ত স্বনামধন্য কবি। ছন্দাচার্য প্রবোধ সেনের মতে পয়ার ত্রিপদীর একঘেয়েমির যুগে তিনি নূতন ছন্দের প্রবর্তন করে কাব্যের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছেন।

৩. নারায়ণ দেব :

নারায়ণ দেব মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি। অনেকের মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। নারায়ণ দেবের পুরো নাম 'সুকবি বল্লভ' নারায়ণ দেব। নারায়ণ দেবের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারুর কারুর মতে নারায়ণ দেব চৈতন্য পূর্ববর্তী। তাঁর প্রত্যেক পুঁথির প্রারম্ভে সংক্ষেপে নিজ পরিচয় ব্যক্ত। সে সব থেকে ধরা হয় যে তিনি কায়স্থবংশীয় এবং ময়মনসিংহ জেলার বোর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। কেহ কেহ মনে করেন শ্রীহট্টে তাঁর আদিনিবাস। নানা গণনা ও বিচারের পর মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরা করেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর

একেবারে শেষে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে নারায়ণ দেব 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেন।

নারায়ণ দেব মনসামঙ্গলের একজন শক্তিশালী কবি। লৌকিক মনসা অপেক্ষা পৌরাণিক দেব মহিমাই তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। মহাভারত, শৈবপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি থেকে দেবখণ্ডের কাহিনী সংগৃহীত। হাস্য ও করুণ রসসৃষ্টিতে তিনি অতুলনীয়। তাঁর কাব্যে লৌকিক শব্দ ও ভাষার প্রভাব পড়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিভিন্ন জায়গা থেকে শব্দ গ্রহণ করলেও কবির রচনা সরস, সাবলীল ও লালিত্যময়। নারায়ণ দেবের পাণ্ডিত্য তাঁর কবিত্বকে আড়ষ্ট করে ফেলেনি। নারায়ণ দেব সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবকল্পনার অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচনার বাঁধুনিও চমৎকার।

সমালোচকের মতে নারায়ণ দেব আদিম মানবতার কবি। সুখে দুঃখে হাসি-কান্নায় ভরা মানব জীবনের স্বাভাবিক রূপটি তাঁর কাব্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবনের উপর তিনি কাব্যকলার ভার চাপিয়ে দেন নি।

সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যুযন্ত্রণা ও বেহুলার আসন্ন সর্বনাশ কবির সহানুভূতির সংস্পর্শে উজ্জ্বল বাণীরূপ লাভ করেছে।—

'ওঠ ওঠ প্রাণপ্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগ খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ডব্রত ফলে॥'

রঙ্গব্যঙ্গ কৌতুক রস পরিবেশনে কবির বক্রোক্তি ও বাক্‌চাতুর্যের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। বণিকী বুদ্ধির স্বরূপ দুই এক ছত্রে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন—

'কাক হন্তে সেয়ানা জে বাণিআ ছাওয়াল।
বাণিআ হন্তে ধুত্ত যেই তারে দেই পান॥'

কোনো কোনো জায়গায় নারায়ণ দেবের কবি-কল্পনা ও কাব্যোৎকর্ষের সুন্দর পরিচয় মিলে। মদন ভস্মের পর রতিবিলাপ অংশে স্বামীহারা রতির মর্মযন্ত্রণা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে—

"দেবের দেবতা তুমি ভুবনের পতি।
স্ত্রী বধ দিব আজি গলায় দিব কাতি॥
সংসারেতে যত পুরুষ সব হৈল নাশ।
স্ত্রীপুরুষে আর না পুরিব আশ॥
দক্ষিণ সমীর আর না বহিব মন্দ।
পঙ্কজ ছাড়িয়া যাইব মকরন্দ॥
কোকিল মধুর ধ্বনি না পুরিব হৃদয়।
মোর প্রভু বিনে নাহি বসন্ত সময়॥"

চরিত্ররূপায়ণে, কবিত্বশক্তিতে ও কাহিনী গ্রন্থনে নারায়ণ দেব বিশেষ প্রতিভার

স্বাক্ষর রেখে গেছেন। মধ্যযুগে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে অন্যান্য কবিদের তুলনায় নারায়ণ দেবকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে হয়। প্রকাশভঙ্গি, কাহিনী রচনা ও চরিত্রসৃষ্টি—সর্বোপরি বিচিত্র জীবনলীলার অভিব্যক্তি ও রসসৃষ্টিতে নারায়ণ দেব নিঃসন্দেহে প্রথমশ্রেণীর কবিদের সগোত্রীয়।

৪. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ :

চৈতন্য পরবর্তী যুগে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গলের জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের কাব্যটি সম্পাদনা করেছেন।

ক্ষেমানন্দ কাব্যের সুরুতে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আত্ম-পরিচয় দেননি। ভনিতা থেকে জানা যায় তিনি বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ একই ব্যক্তি। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের উপাধি। কেয়াপাতায় জন্ম হয়েছিল বলে মনসার এক নাম কেতকা। কবি মনসার ভক্ত বা দাস বলে কেতকাদাস। মনসাদেবীর জন্ম সম্বন্ধে ক্ষেমানন্দ লিখেছেন—

'বনের ভিতর নাম মনসা সুন্দরী
কেয়াপাতে জন্ম হৈল কেতকাসুন্দরী।'

সমালোচকেরা ক্ষেমানন্দের কাব্য বিচার করে তাঁকে দ্বিতীয়শ্রেণীর কবির পর্যায়ে ফেলেছেন। কাহিনী গ্রন্থনে ও চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি বিশিষ্ট কোনো পরিচয় দিতে পারেননি। তবে কবির বাস্তবজ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ শক্তির অভাব ছিল না। গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে তিনি যথাসাধ্য চরিত্র চিত্রণে প্রয়াসী হন। সহজ ভাষায়, ছোট ছোট শব্দ প্রয়োগ করে তিনি স্বাভাবিক কবিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ভাষার লালিত্য তার কাব্যটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। চাঁদসদাগরের বাণিজ্যপথ বর্ণনায় তিনি বাস্তব ভৌগোলিক তথ্যের—নদ-নদী, পথ-ঘাট, বহু গঞ্জ ও বন্দরের বর্ণনা দিয়েছেন। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তার প্রমাণ রয়েছে কাব্যে।

চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষতঃ, নারী চরিত্র চিত্রনে তিনি মোটামুটি সফল। তাঁর বেহুলা চরিত্রটি কোমলে কঠোরে, পাতিব্রত্যে ও ভক্তিমত্তায় এক দীপ্তিময়ী মানবিক। যাহক, স্বল্প প্রতিভার অধিকারী হয়েও ক্ষেমানন্দ চরিত্র সৃষ্টিতে কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে চৈতন্যদেব

১. সাহিত্যে ঃ

বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই লোকোত্তর মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে বাঙালী জীবনের অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। মহাপ্রভুর মানবতাবাদী প্রেমধর্মের প্রচারে বাঙালী জাতির দ্বিজত্ব ঘটে। শতাব্দীর তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতি নূতন জীবনাবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। সেই নবপ্রবুদ্ধ জীবনের অভিব্যক্তি চলে দীর্ঘকাল সাহিত্যে, সমাজে ও সংস্কৃতিতে। এক কথায় চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের পালা বদল সুরু হল।

বাংলাসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের দান অসামান্য। এই দেবপ্রতিম মানুষকে মর্মকেন্দ্রে স্থাপন করে গোটা জাতি আত্মার মহোৎসবে মেতে উঠল। দুশ বছর ধরে বাঙালীর সৃষ্টি প্রতিভা নানা শাখাপ্রশাখায় পরিব্যাপ্ত হল। প্রেমাবতার মহাপ্রভু বাঙালীর আত্মপ্রকাশের রুদ্ধদ্বারগুলি একে একে উন্মুক্ত করে দিলেন। বাংলার সাহিত্য অঙ্গন বিচিত্র সংগীতে মুখরিত হয়ে উঠল। সৃষ্ট হল পদাবলী সাহিত্য, চৈতন্য জীবনী কাব্য ও অলঙ্কার দর্শনাদি বিষয়ক গ্রন্থ। ভাবে ভাষায় ও রচনারীতিতে বাংলা সাহিত্য নূতন সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

বাংলাসাহিত্যে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেন। কিন্তু এইসব কবির রচনায় গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আদর্শ নেই। পরন্তু কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বররূপে দেখা হয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে প্রেমধর্মের প্রচার করলেন তা রাগানুগাভক্তি। 'রাগ' অর্থাৎ প্রেমই তাঁর ধর্ম দর্শনের মূল কথা। মানবিক প্রীতি সম্পর্কের মধ্যেই তিনি ভগবানকে স্থাপন করলেন। মানবপ্রীতিই ঈশ্বর আরাধনার শ্রেষ্ঠ বস্তু। চৈতন্যদেব জাতিবর্ণ ভেদাভেদহীন মানুষকে গুরুত্ব দিলেন—মানুষে মানুষে হৃদয় বন্ধনে মনুষ্যত্বের গৌরব। বর্তমান কালকে তিনি মূল্য দিলেন—ধুলিশায়ী মানুষের ললাটে পরিয়ে দিলেন জয়তিলক—'চণ্ডালহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।"

বাস্তব জীবনের মধ্যে নরনারীর প্রেম ভালবাসার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার তিনি মন্ত্র দীক্ষা দিলেন জাতিকে। তার প্রভাবে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ঘটল। পদাবলী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে বৈষ্ণব কবি বাসু ঘোষ বলেছেন—

> "যদি গৌরাঙ্গ না হত কি মানে হইত কেমন ধরিতাম দে,
> রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে ॥
> মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
> বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ॥"

বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস ও নরহরি কবিরাজ প্রমুখ কবিরা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটালেন। পদাবলী সাহিত্যের অলঙ্কার রীতি সম্মত পূর্বরাগ, মান অভিমান, অভিসার ও ভাব সম্মিলন প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্যে একটি বৈষ্ণবীয় কাব্য ঐতিহ্য গড়ে উঠল। বাংলা সংস্কৃত ও ব্রজবুলির সংমিশ্রণে বাংলা কবিতা বিচিত্র সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশে বিচিত্র রসে সমৃদ্ধ হল।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে নূতন একটি ধারার সৃষ্টি হল তা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা। শ্রীচৈতন্য বহিরঙ্গে রাধা ও অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে ঢলঢল এই দিব্যকান্তি তরুণ সন্ন্যাসীর রাধাভাবে ভাবিত ভাব-মূর্তিকে নিয়ে লেখা হল বহু পদ। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ বা গৌর পদাবলীতে শ্রীচৈতন্যের কৈশোর, বাল্য ও সন্ন্যাস জীবনের ঘটনা স্থান পেয়েছে। সমসাময়িক মানুষের জীবন নিয়ে এই যে কবিতা লেখা হল—তা বাংলা সাহিত্যে দৈবী প্রাধান্যের যুগে অভিনব। তখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ আসে নি। কিন্তু সে যুগে কবিরা ব্যক্তির মহিমাকে মূল্য দিয়ে কবিতা লিখলেন।

চৈতন্য জীবনী লীলা বিষয়ক কিছু পদ 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে অভিহিত। চৈতন্য প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে এ এক নূতন ঐতিহ্য। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের গানের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম ভক্ত ও ভগবানের লীলা স্বরূপ। পাঠক ও শ্রোতা রাধাকৃষ্ণের গানকে লৌকিক প্রেমের কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। তাই পদাবলী কীর্তনের পূর্বে শ্রীচৈতন্য বিষয়ক পদ আগে গান করে নেওয়ার রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় কীর্তনীয়া সমাজে। রাধাকৃষ্ণের ভাবের প্রবেশক গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদই গৌরচন্দ্রিকা। গৌরচন্দ্রিকা মানে ভূমিকা।

শ্রীচৈতন্য সর্বজীবে দয়া ও হরিনাম সংকীর্তনকে ঈশ্বর আরাধনার সর্বোত্তম বস্তু বলে গ্রহণ করেন। এর ফলে নাম সংকীর্তন পদ গানের মধ্য দিয়েই বাংলার কীর্তন সংগীতের বিকাশ ঘটে।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠল। চৈতন্য-পূর্ব যুগে মানুষকে মর্যাদা দিয়ে কাব্য রচিত হয় নি। দেবতা কিংবা দেবকল্প চরিত্রই সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনী নিয়ে এবার উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মহাপ্রভুর সামগ্রিক জীবনচরিত ধরা পড়েছে। শুধু এই নয়—চৈতন্যের ভক্ত অনুচর পরিকর বৃন্দের জীবনী রচনার সূত্রপাত ঘটল। রচিত হল 'অদ্বৈত প্রকাশ', 'নিত্যানন্দ বিলাস'।

শ্রীচৈতন্যের পবিত্র মহাজীবনের সান্নিধ্যে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এসেছিলেন। তাঁদের রচিত সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বাংলাদেশে আনীত হয়। বাংলায় এগুলির সারসংকলন করা হয়। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রেমাদর্শে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।

মহাপ্রভুর প্রভাব কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যে আলো তিনি

বিকীর্ণ করে দিয়েছিলেন—তার ঝরণা ধারায় বাংলার সকল কবি পরিস্নাত হন। চৈতন্যপূর্ব মঙ্গলকাব্যে দেবতা নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসকের প্রতিমূর্তি। মানুষ তখন অসহায়, পদদলিত, লাঞ্ছিত বঞ্চিত ও অপমানিত। চৈতন্যের প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের মধ্যে হিংস্রতা ক্রূরতা অনেকটা হ্রাস পেল। অসাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেক কবির মধ্যে দেখা গেল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল তার প্রমাণ। এ ছাড়া, মঙ্গলকাব্যের অনেক কবি বন্দনা অংশে চৈত্যদেবেরও বন্দনা করলেন।

প্রেমধর্ম ও ভক্তি ভাবের প্রভাব অনুবাদ কাব্যেও এসে সঞ্চারিত হল। ভাগবতে ছিল বীররস ও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার প্রকাশ—তার পরিবর্তে দেখা দিল প্রেমমূলক কৃষ্ণ লীলা কাব্য। রামায়ণের রাম চরিত্র নিমাইর প্রভাবে কোমল মধুর হয়ে উঠলেন। কৌশল্যার চরিত্রে যশোদা ও শচীদেবীর ছায়া পড়ল। কাশীরাম দাসের মহাভারত মূল গ্রন্থের শৌর্য, বীর্য ও গাম্ভীর্যের পরিবর্তে ভক্তি রসেরই আধিক্যে বাঙালীর জীবন কাব্য হয়ে উঠল।

এইভাবে শ্রীচৈতন্য নিজে সাহিত্যিক না হয়েও বাংলা সাহিত্যকে সৃষ্টির প্রাচুর্যে ও অভিনব ভাব সম্পদে পরিপুষ্ট করে তুললেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী শাখায় যে বিচিত্র উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তার মূলে তিনি। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে স্বর্ণযুগ নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ সেই গৌরবময় স্বর্ণ যুগ রচনার জ্যোতির্ময় পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব।

২. সমাজে ঃ

বাঙালী জীবনের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই মহামানবকে কেন্দ্র করে বাঙালী জীবনের অভিনব রূপান্তর ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেব যে প্রেমধর্ম প্রচার করলেন, সুপ্ত প্রায় জাতির প্রাণের গভীরে স্বকীয় দিব্য জীবনের যে জ্যোতি বিকীর্ণ করলেন তাতে তার আত্মার জাগরণ ঘটল। শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্মের প্রেরণায় বাঙালী জাতি নূতন ভাবে সমাজ গঠনে সচেষ্ট হল। বাঙালীর চিন্তায় কল্পনায় ও বহু বিচিত্র কর্ম সাধনার ক্ষেত্রে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এলেন। বাঙালী জীবনে একটি মানুষের এই যে সর্বাত্মক প্রভাবে পরিবর্তনের নব দিগন্ত উন্মোচিত হল—একে চৈতন্য রেঁনেসা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশ আড়াইশ বছরের মুসলমান শাসনের ফলে বিপর্যস্ত ও বিশৃংখল অবস্থায় ছিল। হিন্দু সমাজ স্বধর্ম রক্ষার জন্য পৌরাণিক স্মৃতিসংহিতা শাস্ত্রাদিকে বেশী করে আঁকড়ে ছিল। এর ফলে সমাজে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র নানারকম অধিকার ভেদের বিচ্ছিন্নতায় মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছিল। ধনীরা বিলাস ব্যসনের মধ্যে দিন কাটাত, ধর্মের নামে ভক্তি বর্জিত বাহ্য আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান ছিল তাদের কাছে প্রিয়। অন্যদিকে বিধর্মীর রাজশাসনে দরিদ্ররা ছিল নির্যাতিত নিপীড়িত—নানা কুসংস্কারে বদ্ধ। এইভাবে সমাজ বন্ধন একান্ত শিথিল হতে বাধ্য। নানা

অনাচার অধর্মে বাহ্যাড়ম্বরে ভেদাভেদে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙালী জাতি যখন একান্ত পঙ্গু, দুর্বল ও ঐক্যহীন—সেই হতাশা নিরাশা অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথভ্রষ্ট মৃতকল্প জাতির সম্মুখে শ্রীচৈতন্য নিয়ে এলেন পথ চলার আলোকবর্তিকা, শোনালেন তিমির হননের মন্ত্র।

প্রেমিক সন্ন্যাসী কৃষ্ণ নামে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। তিনি প্রচার করলেন মানুষের মধ্যেই দেবতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ। সেক্ষেত্রে পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধনী, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ম্লেচ্ছ চণ্ডাল কোনো ভেদাভেদ নেই। সকল মানুষই সমান—কৃত্রিম ভেদাভেদে দেবতার অসম্মান। চণ্ডাল ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ সে যদি হরিভক্তিপরায়ণ হয়। শ্রীচৈতন্যের এই প্রেমধর্ম বা উদার মানবতাবাদ সমাজের অসাম্য ও ভেদাভেদের সমূলে কুঠারাঘাত করল। হরিনাম সংকীর্তনই ধর্ম সাধনার সহজ পন্থা হওয়ায় ধনী নির্ধনের বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথার কৃত্রিম বন্ধন আল্‌গা হয়ে যেতে লাগল। মানুষের মূল্যবোধের এই নূতন মন্ত্রে জাতি নূতন শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ ও উদ্দীপিত হল। বিজয়ী মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে হিন্দু সমাজের অভিজাত বর্গ ধীরে ধীরে ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। মহাপ্রভুর ভক্তি ধর্মে এই বিধর্মীয়তা বোধ হল। কাউকে গ্রাস করে নয়, পীড়ন করে নয়—সকলকে নিয়ে সকলের স্বধর্ম বজায় রেখেই মানবতার আদর্শচর্চার দীক্ষা দিলেন শ্রীচৈতন্য। উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি আত্মীয়তার সমসূত্রে বাঁধলেন। এর ফলে হিন্দুর সংস্কৃতি চেতনাকে তিনি প্রবুদ্ধ করলেন। মনুষ্যত্বের সম্মান ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি নূতন হিন্দু সমাজ গড়ে উঠতে লাগল।

সপ্তম অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

প্রধান কয়েকজন কবি

১. চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ঃ

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও তাঁর পূজা প্রচারের কাহিনী বর্ণিত। পণ্ডিতগবেষকদের মতে এই চণ্ডী অনার্য দেবী—পরে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেব কল্পনার সঙ্গে মিশে গিয়ে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানে একাকার হয়ে গেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুটি কাহিনী—(১) 'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী – (২). 'বণিক খণ্ডে' ধনপতি ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান।

কালকেতু ও ফুল্লরা—

ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর অপরাধের জন্য মর্ত্যে ব্যাধের ঘরে কালকেতু নামে জন্মগ্রহণ করেন—তার স্ত্রী ছায়াও স্বামীর অনুমৃতা হয়ে ব্যাধকন্যা ফুল্লরা নামে জন্মগ্রহণ

করেন। কালক্রমে উভয়ে পরিণয় সূত্রে বাঁধা পড়ে। দেবী চণ্ডী এই ব্যাধদম্পতির দ্বারা পৃথিবীতে পূজা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হলেন।

কালকেতু বনে জঙ্গলে কাঠ কাটে—পশুপক্ষী শিকার করে। এর দ্বারাই তারা জীবন নির্বাহ করে। একদিন পথে একটি গোসাপ দেখলেন। সেদিন শিকার জুটল না। কালকেতু মনে করলেন অশুভ গোসাপ দর্শনেই তার এই দুর্দশা। ফেরার পথে রেগে গোসাপকে বেঁধে নিয়ে এলেন। তার ইচ্ছা—এটিকে পুড়িয়ে খাবে। আসলে গোসাপটি ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডী। কালকেতু বাহিরে যেতেই সে অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে সেজে ঘর আলো করে বসল। কালকেতুর অবর্তমানে সে ফুল্লরাকে জানায় যে সতীনের জালায় সে পথে বেরিয়েছে। কালকেতু তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে ডেকে এনেছে—'এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে।' কালকেতুর বাড়ীতেই সে থাকবে। এতে প্রমাদ গণলেন ফুল্লরা। বারমাসিয়া দুঃখের কথা জানিয়েও মেয়েটিকে ফুল্লরা ঘরের বাহির করতে পারল না। ইতিমধ্যে কালকেতু ফিরে এসে সব বৃত্তান্ত শুনে অপরিচিতার উপর খুব চটে গেলেন। তখন দেবী নিজ পরিচয় দিয়ে কালকেতুকে একটি আংটি ও সাত ঘড়া ধন উপহার দিলেন। এবং নির্দেশ দিলেন—এই অর্থের দ্বারা গুজরাট নগর পত্তন করে নিয়মিত মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করে তার মাহাত্ম্য প্রচার করবে। কালকেতু আংটিটি মুরারি শীল নামক স্বর্ণকারের কাছে বেচতে গেল। ধূর্ত বণিক সরল কালকেতুকে নামমাত্র মূল্য দিয়ে আংটিটি আত্মসাৎ করতে চাইল। সে বলল—

'সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপা কর‍্যাছ উজ্জ্বল॥'

মুরারী শীল কালকেতুকে প্রবঞ্চিত করতে পারল না। দেবী দৈববাণীতে তাকে সাবধান করে দিলেন। কালকেতু আংটি বাবদ সাতকোটি টাকা পেল।

তারপর কালকেতু গুজরাট বন কেটে নগর পত্তন করল। সে রাজা হল। তার রাজ্যে বহু প্রজা সুখে বসবাস করতে লাগল—কালকেতু মহানন্দে দেবীর পূজা করল সেখানে ভাঁড়ুদত্ত নামে এক ধূর্ত লোক ছিল। সে মিথ্যা কাহিনী বলে কালকেতুর মন্ত্রী হতে চাইল। কালকেতু এ ব্যাপারে রাজী না হওয়ায় অসাধু খল ভাঁড়ু পাশের কলিঙ্গ রাজার কাছে নালিশ করল। কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমণ করে কালকেতুকে বন্দী করে কারারুদ্ধ করলেন। কারাকক্ষে কালকেতু দেবী চণ্ডীর স্তবস্তুতি করলেন। দেবী তাকে সান্ত্বনা দিলেন। এদিকে কলিঙ্গ রাজকে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখালেন—তাঁর সেবক কালকেতুকে অচিরে মুক্তি না দিলে তার রক্ষা নেই।

কলিঙ্গরাজ বুঝতে পারলেন কালকেতু দেবীর পরমভক্ত। তিনি সসম্মানে কালকেতুকে মুক্তি দিয়ে গুজরাট নগর ফিরিয়ে দিলেন। কালকেতু ও ফুল্লরা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে লাগলেন। সুখে রাজত্ব চালাতে লাগলেন। ক্রমে কাল পূর্ণ হলে পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে রাজ্যভার দিয়ে কালকেতু ও ফুল্লরা মর্ত্যকায়া পরিত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

ধনপতি ও শ্রীমন্তের কাহিনী ঃ ব্যাধের দ্বারা দেবীর পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হল। কিন্তু সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজা প্রচার দরকার। সেদিকে দেবীর দৃষ্টি পড়ল। তখন সমাজে শীর্ষস্থানে রয়েছে বণিক জাতি। তাদের নেতা ধনপতি সদাগর। এবার তাকে দিয়ে পূজা প্রচার করতে হবে।

উজানী নগরে ধনপতি সদাগরের বাস। তিনি শিবের উপাসক। তার দুই পত্নী—লহনা ও খুল্লনা। একবার কিছুকালের জন্য সদাগরকে গৌড়ে যেতে হয়। সেই সুযোগে লহনা দাসী দুর্বলার প্ররোচনায় খুল্লনার উপর অকথ্য অত্যাচার সুরু করল। খুল্লনাকে বনে ছাগল চরাতে হল, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট, ঢেঁকিশালে রাত কাটে। একদিন বনের মধ্যে চণ্ডীপূজা দেখে খুল্লনা চণ্ডী পূজা করল। চণ্ডীর দয়ায় তার দুঃখের দিন অবসান হল। লহনা নিজ কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খুল্লনাকে ঘরে ঠাঁই দিল। ধনপতি ফিরে এসে সব শুনে লহনাকে খুব ভৎর্সনা করলেন। খুল্লনার আদর বেড়ে গেল।

কিছুকাল পরে গৌড়েশ্বরের আদেশে মণিমুক্তা আনার জন্য ধনপতিকে সিংহল যাত্রা করতে হল। স্বামীর মঙ্গল কামনায় খুল্লনা একদিন ঘট পেতে মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করছিল। সংবাদ পেয়ে শৈব সাধক ধনপতি লাথি মেরে পূজার ঘট ভেঙে দিলেন। খুল্লনাকে তিরস্কার করলেন। খুল্লনা তখন সন্তান-সম্ভবা।

সিংহল যাত্রায় বহু নদ-নদী অতিক্রম করে ধনপতি মাঝ সমুদ্রে পৌছুলেন। প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা ঘনিয়ে এলো। ধনপতির ছয়টি ডিঙ্গা দেবী সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেন। থাকল মাত্র মধুকর ডিঙ্গাটি। সেটিকে সম্বল করে তিনি সিংহল অভিমুখে অগ্রসর হলেন। সিংহলের নিকটবর্তী কালীদহে দেবী চণ্ডী এক মায়া পেতে বসলেন। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য—পদ্মফুলের উপর এক সুন্দরী এক হাতীকে একবার গিলছেন আর তাকে উদগীরণ করে দিচ্ছেন। এই মূর্তির নাম কমলে কামিনী।

সিংহল রাজার কাছে ধনপতি এই অদ্ভুত দৃশ্যের কথা বললে তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। ধনপতির রোখ চেপে গেল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে সিংহল রাজকে কমলে কামিনী দেখাতে না পারলে সারাজীবন সিংহলের কারাগারে বন্দী থাকবেন। ধনপতি দম্ভভরে সে দৃশ্য দেখাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন—মিথ্যাবাদীর শাস্তি স্বরূপ তাকে কারাগারে বন্দী করা হল।

এদিকে খুল্লনার পুত্র হয়েছে—নাম শ্রীমন্ত। সে বড় হল—মাতার কাছে সব শুনে পিতার অনুসন্ধানে সিংহল যাত্রা করল। পথিমধ্যে শ্রীমন্ত ধনপতির মতো কমলে কামিনীর দৃশ্য দেখলো। সিংহলে গিয়ে রাজার কাছে সেই দৃশ্যের গল্প করলো। রাজাকে তা দেখাতে গিয়ে পিতার মতো তিনিও বন্দী হলেন। রাজা তাকে শূলে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। কিন্তু দেবী চণ্ডীর অনুগৃহীত এবং স্নেহের পাত্র শ্রীমন্ত দেবীর কৃপায় রক্ষা পেলেন। তিনি সিংহলরাজকে স্বপ্নে বললেন, যদি ভালো চাও তো—

'শ্রীমন্তরে করি মান সুশীলা করহ দান
শ্রীমন্ত আমার নিজদাস।'

সিংহলরাজ নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুব অনুতপ্ত হলেন। পিতা-পুত্র ছাড়া পেলেন। শ্রীমন্তের সঙ্গে সিংহল রাজকন্যা সুশীলার মহাধূমধামে বিয়ে হল। তারপর কিছুদিন পর পিতাপুত্র ও পুত্রবধূ দেশে ফিরে এলেন। এবার পরম ভক্তিভরে ধনপতি দেবীর পূজার্চনা করল—মর্ত্যে উচ্চঅভিজাত সম্প্রদায়ের সমাজে চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হল।

২. দ্বিজ মাধব ঃ

দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য চণ্ডীমঙ্গলের একজন খ্যাতিমান কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল' বা 'সারদাচরিত'। দ্বিজমাধবের বাসস্থান নিয়ে গোলমাল যথেষ্ট। গ্রন্থারম্ভের আত্মকথা অনুসরণে বলা যেতে পারে তিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন—'সপ্তগ্রাম বা নবদ্বীপের কোনো একস্থানে তার জন্ম। মুঘল পাঠানের বিরোধের সময় সম্ভবতঃ তিনি চট্টগ্রামে চলে যান। তাঁর পিতার নাম পরাশর।

দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভনিতায় কাব্যের রচনাকাল হিসাবে ১৫০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। দ্বিজমাধবের কাব্যের প্রাপ্ত সব পুঁথিতে নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

'ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজমাধব গায় সারদাচরিত।'

কবি হিসাবে দ্বিজমাধবের প্রধান বৈশিষ্ট্য তথ্যনিষ্ঠা। তাঁর রচনার স্বাভাবিক বর্ণনারীতি ও সহজ বাস্তবতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তিনি যাহা দেখেছেন তাকে যথাযথভাবে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা সজীব বাস্তব ধর্ম ফুটে উঠেছে। অলংকার বর্জিত সরল অনাড়ম্বর ভাষায় পথ ঘাট, মানুষ, ঘর বাড়ী সবই জীবন্ত, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ খুঁটি-নাটি সমস্ত ঘটনা তাঁর কবিদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এক কথায় বাস্তব বর্ণনায় তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতা অর্জন করেছেন। নিবিড় বাস্তব নিষ্ঠা ও সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি তাঁর কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কালকেতুর ভাঙা কুটীর, ভেরেণ্ডার থাম, ব্যাধ দম্পতির ছেঁড়া কাঁথা, বাসি মাংসের পসরা, ব্যাধবালাদের দুর্গন্ধযুক্ত পরিধান, প্রভৃতির সবকিছুর আলেখ্য অত্যন্ত বাস্তবধর্মী।

শুধু কাহিনী বর্ণনা নয়, চরিত্র সৃষ্টিতে দ্বিজমাধব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি ও খল ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রগুলিকে তিনি তাদের স্বভাব-ধর্মের পরিধির মধ্যেই উজ্জ্বল করে তুলেছেন। অহেতুক মহিমা আরোপ করে তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন বা অস্বাভাবিক করে তোলেন নি। অনার্য ব্যাধ কালকেতুর রিক্ত জীবন ও তার বলিষ্ঠ প্রাণ ধর্ম এবং ধনপতির স্বচ্ছল গার্হস্থ্য জীবন স্ব স্ব ক্ষেত্রেই দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন—'মধুর কালকেতু মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী; মধুর ভাঁড়ু দত্ত কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্ত হইতে শঠতায় প্রবীন।'

দ্বিজমাধবের কাব্যের প্রধান গুণ অনাড়ম্বর বর্ণনা ও সহজ সাবলীলতা। কিন্তু এ স্থলে বলা দরকার যে দ্বিজমাধব কবি কল্পনার অধিকারী ছিলেন না। তিনি 'ব্রত পাঁচালীর কৃতি কবি—এই টুকুই তাঁর গৌরব।'

৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী শুধু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি নন—সমস্ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো শক্তিমান কবি আর কেউ আবির্ভূত হননি একথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। প্রচলিত দেবী মাহাত্ম্যবিষয়ক কাহিনীর মধ্যে তিনি যে অভিনব সৃজনশীল কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর কবিকৃতি। কাহিনী দৈবায়ত বটে, কিন্তু মুকুন্দরাম তাঁর দৃষ্টিকে এই পরিচিত লৌকিক সংসারের কান্নাহাসির তরঙ্গলীলার মধ্যে স্থিরবদ্ধ রেখেছেন। তিনি মানুষের কবি—তাঁর কাব্যের রস জীবন রস। এই মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি আধুনিক কালের কবিসমাজের নিকট আত্মীয় হিসাবে গণ্য। কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ, রচনারীতি ও মানবজীবন সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রসন্ন মনোভাব মুকুন্দরামকে কালজয়ী প্রতিভার গৌরব টীকা পরিয়ে দিয়েছে।

মুকুন্দরামের কাব্যের নাম অভয়ামঙ্গল। কবি এর প্রথমে নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু গ্রন্থরচনা সংক্রান্ত তথ্যাদি খুব বেশি তাতে নেই। তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না। মোটামুটি ষোড়শ শতকের শেষের দিকেই তাঁর গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল বলা যায়।

আত্মপরিচয়ে জানা যায় কবির জন্ম বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। দামুন্যা ছিল এক সহৃদয় জমিদারের তালুক। এই গ্রামে ছিল কবির ছ' সাত পুরুষের বাস। বেশ সুখে শান্তিতে দিন কাটছিল। কিন্তু মানসিংহের সুবাদারীর (১৫৯৪ খ্রী.) কালে মামুদ শরীফ নামে এক ডিহিদারের (পরগণার শাসক) অত্যাচারে দেশবাসী অন্যত্র পালিয়ে যেতে লাগল। এহেন সমাজবিপর্যয়ের দিনে কবি স্ত্রী, শিশুপুত্র, ভাই ও একজন অনুচর নিয়ে সামান্য সম্বল সহ দেশত্যাগ করলেন। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার কুচট্যা গ্রামের এক পুকুরপাড়ে এসে বিশ্রাম নিলেন। ক্ষুধায় শিশু কাঁদছে, বড়রা জলপান করলেন—

"তৈল বিনা কৈঁনু স্নান উদক করিনু পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।"

পথশ্রমে ক্লান্ত কবি পুকুরপাড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নের মধ্যে চণ্ডীদেবী আবির্ভূতা হয়ে কবির কানে মন্ত্র দিলেন। দেবীর মন্ত্রে দীক্ষিত কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখতে সংকল্প করলেন। তারপর তিনি এসে পৌছুলেন আড়রা গ্রামে। স্থানীয় জমিদার বাঁকুড়া রায় কবিকে আশ্রয় দিলেন। মুকুন্দরামকে তিনি পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করলেন। অনেককাল পরে ছাত্র ও জমিদার রঘুনাথ রায়ের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। রঘুনাথই

তাঁকে উপাধি দেন 'কবিকঙ্কন'। মুকুন্দরামের আত্মকথা তথ্যপূর্ণ, বাস্তব ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে অর্থবহ এবং কাব্যগুণান্বিত।

মুকুন্দরামের কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। পূর্ব প্রচলিত দুটি কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সেই কাহিনীর প্রেক্ষাপটে সমকালীন বঙ্গসমাজের জীবনলীলা পরিব্যাপ্ত। মুকুন্দরাম কেবল তথ্য পরিবেশন করেননি—সুখে দুঃখে আনন্দে বেদনায় জীবনের সচল উষ্ণ প্রবাহ এখানে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। মুকুন্দরাম পল্লীসভ্যতার কবি। মানুষকে তিনি যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন, এবং এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি আধুনিকতারও পথিকৃৎ। গ্রামবাংলার সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর কাব্যে ভীড় করে এসেছে। অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি অভিনিবেশ সহকারে জীবনের পাঠশালায় মানবচরিত্রকে অধ্যয়ন করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে সব চরিত্রই জীবন্ত—চিরকালই আমরা তাদের আমাদের আশেপাশে প্রত্যক্ষ করি। শুধু এই নয়, পল্লীসমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার এমন সুস্পষ্ট ছবি মধ্যযুগে মুকুন্দরামের মত আর কেউ অাঁকতে পারেননি। মুসলমান ও হিন্দু সম্পর্কে সমদৃষ্টি ও সম্প্রতির মনোভাব মুকুন্দরামকে যথার্থ ই মানবপ্রীতি মন্ত্রের সাধক হিসাবে চিহ্নিত করে রেখেছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি একটি চরিত্র চিত্রশালা। নীচজাতি ব্যাধ থেকে শুরু করে ভণ্ড ব্যবসায়ী, ঠগ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বৈদ্য, পাইকপেয়াদা, ধনী-দরিদ্র, স্বামী স্ত্রী পরিবার, দাসদাসী—বহু বিচিত্র চরিত্রের চলমান প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়েছে কবির নিপুণ তুলিতে। চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আরোপ করেছেন—তা আধুনিক কালের উপন্যাসের ধর্ম। তাই ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, আধুনিক কালে জন্মালে মুকুন্দরাম উপন্যাস লিখতেন তাছাড়া রাজশাসন, জমিজমা, বেশবাস, পাঠশালা, মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, স্তবশান্তি, বিবাহশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, প্রভৃতি বহু বিষয় তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে।

তথ্যের সমাহার ঘটলেই কোনো রচনা কাব্যপদবাচ্য হয় না। কবির শিল্পী প্রতিভাই তথ্যের উপর রসবস্তুকে সৃষ্টি করে। মুকুন্দরাম ছিলেন জীবনরসের ভাণ্ডারী। মুকুন্দরাম মানবিক সহানুভূতিতে মুক্তমনের কবি। কান্নাহাসির দোল দোলানো জীবনের মধ্যেই তিনি বাস্তবরসের শিল্পসৃষ্টি করেছেন। মুকুন্দরাম দুঃখের কবি নন, সুখের কবি নন। অখণ্ড মানবতার তিনি সংগীত রচয়িতা।

মুকুন্দরাম জীবনরসরসিক সার্থক শিল্পী। কাহিনী পরিকল্পনায় তিনি পূর্বসূরীদের কাছে ঋণী। কিন্তু কবিকল্পনা ও রচনাশক্তির অভিনবত্বে তিনি পুরাতন কাহিনীর মধ্যে মৌলিক সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যকে নূতন মঙ্গল বলতে চেয়েছেন। বাস্তবিকই, মুকুন্দরাম পুরাতন পাত্রে নূতন রস পরিবেশন করেছেন। তাঁর সৃষ্ট ধূর্ত বেনে মুরারী শীল, প্রবঞ্চক ভাঁড়ু দত্ত, স্বার্থপরায়ণা দুর্বলা দাসী, ব্যাধ কালকেতু ও তার স্ত্রী ফুল্লরা—চিরন্তন মানবতার জাগ্রত প্রতিচ্ছবি। সুখে দুঃখে হাস্যে পরিহাসে নীচতায় শঠতায় ও মহত্ত্বে কলরব মুখরিত

অখণ্ড মানবতার রূপকার মুকুন্দরাম। কালচেতনার ভূমিতে তাঁর পদাচারণা—কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সম্প্রসারিত সর্বকালের লোক হৃদয়ের বিস্তৃত সাম্রাজ্যে।

অষ্টম অধ্যায়

চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয়

১. ভূমিকা ঃ

ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। দৈব বিশ্বাস প্রভাবিত বাঙালী সমাজে তিনি নূতন মানুষের জয়গান ধ্বনিত করলেন। মানুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার পথ প্রদর্শক। মানুষের মধ্যেই ভগবানের সর্বোত্তম প্রকাশ—'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার প্রকাশ।' তিনি বললেন বর্তমান যুগকে অবহেলা করার কোনো কারণ নেই—'প্রণমহ কলিযুগ, সর্বযুগ সার।' মানুষের বড় পরিচয় মানবতার আদর্শ চর্চায়। ধনী-নির্ধন, উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র—এইসব কৃত্রিম ভেদাভেদে মানুষের অন্তরস্থিত দেবতার অসম্মান ঘটে। সব মানুষই এক পরিবারের সন্তান। তিনি শেখালেন মানব জন্মের সার্থকতা জাতি গুণে বা জন্ম গুণে নয়—হৃদয়ের পরম ব্যাকুলতায় সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি বন্ধনে। 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ' 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'—তাঁর এই মানবতন্ত্রী বাণীতে জাতির নবজাগরণ ঘটল। তাঁরই প্রেরণায় বাংলা সাহিত্যের পালা বদল সুরু হল।

চৈতন্য পূর্ব বাংলা সাহিত্যে দেবমাহাত্ম্যই বিঘোষিত। কবিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আকাশের দিকে। মহাপ্রভু দেবতাকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনলেন আমাদের কুটির প্রাঙ্গণে। কবিদের দৃষ্টি পড়ল মানুষের দিকে। মানুষের জীবন কথা নিয়ে সাহিত্য রচিত হল। যে মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য এই মর্ত্যধামেই আমাদের পরমাত্মীয়রূপে রাঙা মাটির পথ দিয়েই যাত্রা করেছেন—তাঁকে নিয়েই গড়ে উঠল জীবনী কাব্য। মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা অভিনব বস্তু। তখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগ আসেনি—অথচ একজন ঐতিহাসিক জীবন কাহিনীকেই তাঁরা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অবশ্য আধুনিক দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ চরিত কাব্য নয় চৈতন্য জীবনী কাব্য। অবশ্য ভক্তির আতিশয্য, অনেক অলৌকিকতা ও অবিশ্বাস্য অসম্ভব ঘটনা তাতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা মাটির মানুষের জীবনালেখ্যই সেখানে উপজীব্য।

শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর মুরারি গুপ্ত ও তাঁর পার্ষদ স্বরূপ দামোদর সংক্ষিপ্ত কড়চা আকারে চৈতন্য জীবন কথা সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। মহা-প্রভুর তিরোধানের পর কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন চৈতন্য জীবনী বিষয়ে সংস্কৃতে দুখানি গ্রন্থ লেখেন। বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যচরিত কাব্যের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের

'চৈতন্য ভাগবত', লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' সুবিখ্যাত।

২. বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত :

বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী কাব্য 'চৈতন্য ভাগবত'। ইনি বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ নিতানন্দ প্রভুর উৎসাহে এই গ্রন্থ রচনা করেন। খুব সম্ভব কাব্যটি ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের পর ও ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এই গ্রন্থ রচনাকালে মহাপ্রভুর পারিষদের মধ্যে অনেকে জীবিত ছিলেন। বৃন্দাবনদাস তাঁদের কাছ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন।

চৈতন্য ভাগবত একটি বৃহৎ গ্রন্থ। আদি, মধ্য ও অন্ত্য—তিন খণ্ডে বিভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা যেরূপ বর্ণিত—এই গ্রন্থ অনেকটা সেইরূপ। অনেকের মতে এই গ্রন্থের প্রথমে নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। ভাগবত অনুসরণে লেখা বলে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্য ভাগবত নামকরণ করেন।—

'চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনে মহান্তরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥'

অন্য মতে গ্রন্থের নামকরণ নিয়ে লোচনদাসের সঙ্গে বৃন্দাবনদাসের বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন বৃন্দাবনের মা নারায়ণী দেবী নাম পাল্টিয়ে 'চৈতন্য ভাগবত' রাখেন।

সম্ভবতঃ নবদ্বীপে বৃন্দাবনের জন্ম হয়। পিতার নাম জানা যায় নি। মাতা নারায়ণী দেবী ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শেষ বয়সে তিনি বর্ধমানের দেনুড় গ্রামে এসে বাস করেন। একটি মন্দির ও শ্রীবিগ্রহের তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের অনুগত শিষ্য ছিলেন। তিনি আজীবন চিরকুমার ছিলেন। খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁর মৃত্যু হয়।

বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের অবতার রূপেই দেখেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য অভিন্ন হয়ে পড়েছে। মহাপ্রভুর লীলা প্রচার উদ্দেশ্যেই বইটি লিখিত বলে বহু প্রচলিত অলৌকিক কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে।

সহজ ভাষায়, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সঙ্গে, ভক্তিবিগলিত চিত্তে বইটি লিখিত। কাব্যটি প্রাঞ্জল ভাষায়, প্রসাদ গুণে সুখপাঠ্য, কবিত্বের স্পর্শে মনোজ্ঞ। বইটি পড়লে মনে হয় গ্রন্থকার ভাবে আবিষ্ট হয়েই লেখনী ধারণ করে। এ স্থলে বলা দরকার যে অলৌকিকতা মুক্ত না হলেও এতে প্রচুর মানবীয় আবেদন আছে। বাস্তব বর্ণনায় কবির নিপুণতা প্রশংসনীয়। মহাপ্রভুর বাল্যলীলার টুকরো টুকরো চিত্র চমৎকার ভাবে কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবন খুবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রঙ্গ ব্যঙ্গ প্রিয়, ক্রুদ্ধ অসংযত নিমাই চরিত্র মানবোচিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সতীর্থ বৈদ্য মুরারি গুপ্তের সঙ্গে চৈতন্যের হাস্য পরিহাস একজন বিদ্যাগর্বী যুবকের—

'প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা দিয়া গিয়া নাড়ী কর দঢ় ॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥'

ঐতিহাসিকের কাছে এই গ্রন্থের মূল্য অনেক। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও লৌকিক ইতিহাসের অনেক তথ্য এতে সন্নিবেশিত। নবদ্বীপের সমৃদ্ধি, বিদ্যাচর্চা, অন্ধ সংস্কার, লোকাচার এবং আমোদ প্রমোদ ইত্যাদির নিখুঁত বর্ণনা এতে পাওয়া যায়। কবি লিখেছেন—

"নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায় ॥
ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥"

চৈতন্য ভাগবত সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। ঘটনার ক্রম সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। মহাপ্রভুর জীবনের শেষ দিকের পরিচয় এতে নেই। কাব্যের সমাপ্তি আকস্মিক। এজন্য কারো কারো ধারণা কাব্য রচনা কালেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাছাড়া এখানে ওখানে গোঁড়া বিরুদ্ধবাদী বৈষ্ণবদের প্রতি তিনি কটাক্ষ বর্ষণ করেছেন। তাসত্ত্বেও প্রাঞ্জল ভাষা, সহজ কবিত্ব, প্রসাদ গুণ, মানবরস ও ভক্তিরসের প্রগাঢ়তার জন্য গ্রন্থটি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রদ্ধা সহকারে বৃন্দাবন দাসের কবি কৃতিকে গৌরব মণ্ডিত করেছেন এই বলে—

'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার দাস বৃন্দাবন দাস ॥'

বড় বড় কাব্যেও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। সেদিক থেকে অল্প স্বল্প ত্রুটি সত্ত্বেও চৈতন্য ভাগবত নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্য। বাংলা ভাষায় চরিত সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ বৃন্দাবন দাস।

৩. জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল :

চৈতন্য জীবনী নিয়ে জয়ানন্দের রচিত কাব্যের নাম চৈতন্যমঙ্গল। এই কাব্য মধ্যযুগে বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত ছিল না। এটি এ যুগে আবিষ্কৃত। কাব্যের মধ্যে কবি বিচ্ছিন্নভাবে যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে জানা যায় বর্ধমানে আমাইপুরা গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনী দেবী। জয়ানন্দের বাল্য নাম ছিল 'গুইঞা'। তাঁর পিতা চৈতন্য-ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে ফেরার সময় তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু তাঁর নাম পরিবর্তন করে জয়ানন্দ রাখেন।

গুইঞা নাম ছিল মায়ের মড়াছিয়া বাদে।
জয়ানন্দ নাম চৈতন্য গোসাঞি প্রসাদে ॥

জয়ানন্দ চৈতন্যানুচর গদাধর মিশ্রের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাব্যটি রচনার মূলে গুরুর প্রেরণা ছিল। পণ্ডিতদের মতে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কাব্যটি রচিত হয়।

এই কাব্যটি জনসাধারণের জন্য রচিত চৈতন্য জীবনীকে কেন্দ্র করে।

কাব্যটি মোট আদি, নদীয়া, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উৎকল, প্রকাশ, তীর্থ, বিজয় ও উত্তর—এই নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, তীর্থ ভ্রমণ ও মৃত্যু কাহিনী এই সমস্ত খণ্ডে বিধৃত।

জয়ানন্দ কাব্য রচনায় পুরোপুরি বৈষ্ণব আদর্শ গ্রহণ করেন নি। চৈতন্য জীবনী রচনায় তিনি পূর্বাপর সঙ্গতিও রাখতে পারেন নি।

চৈতন্যমঙ্গলের রচনারীতি অনেকটা মঙ্গলকাব্যের মতো। পৌরাণিক কাহিনী ও অনেক গাল গল্প এতে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক চৈতন্য জীবনী রচনার প্রতি জয়ানন্দের আগ্রহ ছিল না। কবির লক্ষ্য ছিল চৈতন্য জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র করে সর্বজনপ্রিয় একটি কাব্য রচনা। তাই এই কাব্যে চৈতন্য জীবনীর সঙ্গে লৌকিক ও পৌরাণিক অনেক কাহিনী স্থান পেয়েছে। সে সবের যাথার্থ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে দু' একটি তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। নবদ্বীপে রাজঅত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যথার্থ—

'আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥
নবদ্বীপে শংখ ধ্বনি শুনি ঘরে ঘরে।
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞ সূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাপ বান্ধে ॥
দেউল দেহড়া ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥'

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে জয়ানন্দ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পণ্ডিতেরা সত্য ঘটনা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। পুরীতে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভু নৃত্যে মাতোয়ারা হয়ে রথের আগে আগে চলছিলেন। হঠাৎ তাঁর পায়ে ইটের টুকরো বিঁধে যায়। ক্রমে পায়ের যন্ত্রণা বাড়তে থাকে, ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে যায় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ইহ ধাম পরিত্যাগ করেন—

'আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজল বাম পাত্র আচম্বিতে ॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥

মায়া শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বু দ্বীপ ছাড়ি ॥'

চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব আদর্শ রক্ষা করেন নি। বৈষ্ণব ঐতিহ্যের অনুবর্তী না হওয়ায় কাব্যটি বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হয়নি।

জয়ানন্দের কাব্যে অনেক নূতন তথ্য আছে। ঐতিহাসিকেরা তা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন নি। মোট কথা ঐতিহাসিক ঘটনা, পৌরাণিক কাহিনী ও লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণে জয়ানন্দ সর্বসাধারণের উপভোগ্য একটি কাব্য রচনা করতে চেষ্টিত হন। সেদিক থেকে তিনি সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। কারণ মূল কাহিনী অহেতুক তথ্য-ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। তবুও কাব্য পাঠে মোটামুটি শ্রীচৈতন্যের লীলামাধুর্য আস্বাদন করা যায়।

৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত :

চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের মধ্যমণি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত। সমালোচকদের মতে শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এমন অসাধারণ মূল্যবান জীবনীগ্রন্থ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই গ্রন্থে অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাসের গভীর মনীষা, দার্শনিকতা ও কবি-প্রতিভার সম্যক প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীচৈতন্যের বৈচিত্র্যময় জীবনকথাকে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

কাব্যে বর্ণিত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্রামের বৈদ্য বংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কবির পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। ইনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। বাড়ীতে প্রায়ই সংকীর্তন হত। অনেক বৈষ্ণব ভক্ত সমবেত হতেন। একবার কীর্তনের সময় নিত্যানন্দের শিষ্য রামদাসের সঙ্গে তাঁর ভাইর বচসা সুরু হয়। নিত্যানন্দের প্রতি কটূক্তি বর্ষিত হলে কৃষ্ণদাস খুবই ব্যথিত হন। রাত্রে নিত্যানন্দ স্বপ্নে কৃষ্ণদাসকে বৃন্দাবন যাত্রার আদেশ দেন। পরদিন প্রভাতেই বৃন্দাবনে চলে যান। বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ প্রভৃতি আচার্যদের কাছে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃতে দুইখানি গ্রন্থ এবং বাংলায় আলোচ্য গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্য-চরিতামৃত তার শেষ বয়সের রচনা। এ সময় কবি বার্ধক্যে ও রোগে অপটু হয়ে পড়েন—

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি ॥

পণ্ডিতেরা মনে করেন ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে চরিতামৃত লেখা শেষ হয় এবং কবি এই সময়ের কাছাকাছি মরদেহ ত্যাগ করেন।

চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা—এই তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। আদিলীলার বারোটি পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। তারপর মহাপ্রভুর জন্ম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনী। মধ্যলীলায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেবের ছয় বৎসর কাল বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন বর্ণিত। তবে প্রসঙ্গতঃ চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। অন্ত্যলীলায় শেষ আঠারো বছরের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। শ্রীচৈতন্যের শেষ ভাগের বাহ্য-জ্ঞানহীন দিব্যোন্মাদ অবস্থা এতে খুবই জীবন্ত করে তুলেছেন কৃষ্ণদাস।

চৈতন্য চরিতামৃতে চৈতন্য জীবনী বর্ণনার সঙ্গে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। বাংলা ভাষায় চৈতন্য জীবনের মূল তাৎপর্য তুলে ধরা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করাই ছিল এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সে ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস সেই মতাদর্শ পরিস্ফুট করতে অনেক তথ্য বাদ দিয়েছেন, আবার অনেক নূতন কথা যোগ করেছেন। যাজক, ভক্তিপ্রাণতা, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও কবিত্বের একটি দুর্লভ গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত। চৈতন্যচরিতের অমৃতাদর্শই কবি ব্যাখ্যা করেছেন। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ, সাধ্যসাধন তত্ত্ব, রাগানুগা ভক্তি, সখী-সাধনা প্রভৃতি দুরূহ জটিল বৈষ্ণব তত্ত্বকে কবি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটি তত্ত্বের কাব্যিক প্রকাশের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

* আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
* অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥
* অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥

রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় কান্তাপ্রেমের স্বরূপকে কৃষ্ণদাস অতি সুন্দর ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। কান্তাপ্রেমে পঞ্চরসের পূর্ণ প্রকাশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবের মধ্যেই নিজেকে নবরূপে দর্শন করেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরম রসস্বরূপিণী মহাভাব।—

প্রেমের পরম রস মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

কৃষ্ণদাসের চরিতামৃত পাঠ্য কাব্য। সরস ভাষা, সহজ অলংকার ও পয়ার ত্রিপদী ছন্দে তাঁর রচনা কাব্যগুণান্বিত। কয়েকটি রচনায় গীতিধর্ম খুবই প্রশংসনীয়।—

'কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥'

চৈতন্য চরিতামৃত সবটাই সরস ও সুখপাঠ্য নয়, ছন্দও সর্বত্র ত্রুটিমুক্ত নয়।

দীর্ঘদিন বৃন্দাবনে থাকার জন্য হিন্দী ফারসী শব্দও অনেক প্রবেশ করেছে। বহুস্থলে ভাষা নীরস, দুরূহ ও গদ্যধর্মী। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের তুলনায় এগুলি তেমন কিছু নয়। বৈষ্ণবতত্ত্বে কেবল পাণ্ডিত্য অর্জন নয়—কৃষ্ণদাসের গভীর উপলব্ধি (Realisation) ঘটেছিল বলে বক্তব্য বিষয় এত সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের সর্বজয়ী ভূমিকাটি ভক্তকবি কৃষ্ণদাস নিজের অনুভূতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করে গেছেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে চৈতন্য চরিতামৃত অতুলনীয় একটি মহাগ্রন্থ। বৈষ্ণব সমাজের কাছে এখনো এটি বেদতুল্য প্রিয়গ্রন্থ।

নবম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদকর্তা বলরামদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস

১. বলরামদাস ঃ

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদসাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি বলরামদাস। একাধিক বলরামদাসের সন্ধান পাওয়া গেলেও মোটামুটি দুজন প্রধান ছিলেন। এঁদের মধ্যে নিত্যানন্দশিষ্য বলরামদাসই শ্রেষ্ঠ। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর কবি। এঁর পূর্বনিবাস ছিল শ্রীহট্টে। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি কৃষ্ণনগরের নিকট দোগাছিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এখানে বলরাম বালগোপাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন।

বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই বলরাম দাস পদ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলিই সমধিক কবিত্বপূর্ণ। রাধাকৃষ্ণ লীলার অন্তর্গত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পদ রচনায় ইনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তবে সখ্য ও বাৎসল্য রসের কবি হিসাবেই বলরাম শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ও নিত্যানন্দ-বিষয়ক পদ ইনি রচনা করেন।

বাৎসল্য রসের পদ রচনায় বলরামের কবিপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। কৃষ্ণের রক্তমাংসের মানবিক শিশুরূপটি তাঁর লেখনীতে একান্ত স্বাভাবিক ও জীবন্ত। শিশুকৃষ্ণের ক্ষুধা, ননীভক্ষণ, মা যশোদা কর্তৃক আদর আব্দার ও ভর্ৎসনা, মান অভিমান ও গোষ্ঠাচারণ প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণের শিশুসুলভ চরিত্রমাধুর্য সুপরিস্ফুট।

দধি মন্থনের ধ্বনি শুনে কৃষ্ণ মায়ের কাছে এলেন—

“দধিমন্থধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ বয়ান ॥
কহে শূন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর-ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে ॥”

কখন মাকে সাজিয়ে দিতে বলেন কৃষ্ণ—অন্য শিশুদের সঙ্গে গোষ্ঠে যাবেন।—

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়াবান্ধি দেগো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রাজপথে॥

বালক কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবেন, যশোদা পুত্রের জন্য ভেবে ব্যাকুল। মাতৃহৃদয়ের স্নেহ ব্যাকুলতা, শঙ্কা, উদ্বেগ ও বেদনা এর জন্য স্বাভাবিক। কি জানি কোনো বিপদ ঘটতে পারে। তাই কৃষ্ণ সখাদের তিনি অনুরোধ করেন—

'শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সবারে।
বন কত অতিদূর নবতৃণ-কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে।
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গাপায়ে জমি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন।'

বলরামের বাৎসল্য রসের বর্ণনা খুবই স্নিগ্ধ ও মধুর। শিশুকৃষ্ণের চাপল্য, দুষ্টুমি ও অভিমান একান্ত মানবিক ও বাস্তব। শিশুকৃষ্ণ ননী চুরি করে খায়। মা তিরস্কার করলে গোপাল কৃষ্ণের অভিমান—

'দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননীচোরা॥'

শুধু বাৎসল্য নয়, রূপানুরাগ ও রসোদ্গারের পদেও বলরামের কৃতিত্ব কম নয়। অনুভূতির গভীরতা, প্রকাশের সরলতা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতায় তিনি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের সমগোত্রীয়। রবীন্দ্রনাথ বলরামের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে 'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির' ও 'দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়'—বার বার উদ্ধৃত। বলরামদাস রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। ধ্বনিঝংকারময় কিছু কিছু কবিতাও বলরামের আছে—

কুঞ্জচরণ খঞ্জন গঞ্জন
মঞ্জু মঞ্জরী ভাস।
ইন্দুনিন্দন নখর চন্দন
বণি বলরাম দাস॥

সহজ জীবন রস প্রীতি বলরামের রচনার পরম সম্পদ। পূর্বেই বলা হয়েছে

বাল্যরসের বর্ণনায় তিনি রাজাধিরাজ। এ স্থলে তিনি সকলকে ম্লান করে দিয়েছেন। জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

"ঠোঁট ফুলাইয়া কান্নার সহিত পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজে সাধু সাজিবার চেষ্টা, মাতা যশোমতীর নামে অনুযোগ করিয়া একটু বেশী আদর আদায়ের সুমধুর কৌশল কবির লেখনী মুখে যে অভিনব ভঙ্গীতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে, যে কোনও যুগের শিশুকাব্য রচয়িতার পক্ষে তা গৌরবের।"

২. জ্ঞানদাস :

চৈতন্যোত্তর যুগের আর একজন প্রসিদ্ধ কবি জ্ঞানদাস। তাঁর ব্যক্তি পরিচয় খুব বেশি জানা যায় নি। বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এর জন্ম (১৫৩০ খ্রী:)।

'রাঢ় দেশে কাঁদরা নামে গ্রাম হয়।
যথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আশ্রয়॥'

জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে তিনি বৃন্দাবন যান এবং শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যদের সান্নিধ্যে আসেন। খেতুরী গ্রামে নরোত্তম দাসের মহোৎসবে এক কবিসম্মেলন হয়। সেখানে জ্ঞানদাস, বলরামদাস ও গোবিন্দদাসের সঙ্গে মিলিত হন।

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেন। ব্রজবুলির পদগুলি বাংলা পদগুলির কাছে নিষ্প্রভ। জ্ঞানদাস বৈষ্ণবরীতি অনুসারে সমস্ত পর্যায়ের পদ রচনা করলেও সর্বত্র সমান কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি। রূপানুরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদে তিনি কবিপ্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই সমস্ত পদে জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের উত্তরসূরী বা ভাবশিষ্য বলা হয়। চণ্ডীদাসের মতই তিনি উপরোক্ত পদগুলিতে সহজ সরল অলংকারহীন ভাষায় নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনা, প্রেমানুভবের তীব্র আকুতি, মিলন ব্যাকুলতা ও বিরহের মর্মন্তুদ জ্বালা অপূর্ব কাব্যোৎকর্ষ লাভ করেছে। ভাবগভীরতা ও প্রকাশ-ভঙ্গির সাধর্মহেতু চণ্ডীদাসের পদ থেকে জ্ঞানদাসের পদকে অনেক সময় পৃথক করা যায় না। যেমন—

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

তাসত্ত্বেও জ্ঞানদাসের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যদ্যোতক। চণ্ডীদাস কোনো বৈষ্ণবতত্ত্ব অনুসরণ করেননি,—ভাবের একমুখীনতা, অতলস্পর্শী গভীরতা ও তন্ময়তাই চণ্ডীদাসের কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ। চণ্ডীদাসের রাধা সর্বত্র বিরহদহনখিন্ন সাধিকা। পক্ষান্তরে জ্ঞানদাস বৈষ্ণব তত্ত্বের আধারে পদরচনা করেছেন। তাঁর

রাধা আনন্দে বিষাদে বৈচিত্র্যময়ী। জ্ঞানদাসের পদে ভাবতন্ময়তার সঙ্গে রূপমুগ্ধতা ও রূপবর্ণনাও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। জ্ঞানদাস ভাব ও রূপের মিলনকর্তা শিল্পী কবি। ভাব ও রূপের সার্থক যুগল মিলন ঘটেছে তাঁর কাব্যে। সর্বোপরি জ্ঞানদাস বৈষ্ণবতত্ত্বের সাধক বলে ভাবাবেগকে মননশীলতার দ্বারা পরিশীলিত করে নিয়েছেন। ভাবতন্ময়তা ও রূপচেতনার সমন্বয় সাধক কবি জ্ঞানদাস। চণ্ডীদাস মূলতঃ ভাবুক ও সাধক। জ্ঞানদাস বৈষ্ণব ভাবরসিক, প্রধানতঃ শিল্পী ও রূপস্রষ্টা।

প্রেমবেদনার মধুময় সরল প্রকাশে জ্ঞানদাসের অধিকাংশ কবিতা চমৎকার।

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘর যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরে পরাণ ॥

জ্ঞানদাস বৈষ্ণবতত্ত্বের সাধক হলেও প্রেমের রহস্য চিত্রণে চিরকালের মানবহৃদয়ের আর্তিকে জয়যুক্ত করেছেন। প্রাণের আবেগ ও শিলরিক মূর্চ্ছনায় তাঁর কবিতাগুলি কালোত্তীর্ণ। জ্ঞানদাসের পদ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। শ্রাবণরাত্রিতে বর্ষণমুখর পরিবেশে স্বপ্নদর্শন বিষয়ক শ্রীরাধার পূর্বরাগের কবিতাটি কবিগুরু ভুলতে পারেন নি। কবির মতে যে শব্দচিত্রের সাহায্যে বৈষ্ণব কবি রাধার মনের ভাবটি সুরের মূর্চ্ছনায় তুলে ধরলেন—সেই সুর বেজেই চলেছে অনন্তের দিকে—

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দযাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ডরোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেনকালে ॥"

৩. গোবিন্দদাস কবিরাজ :

পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। তিনি ব্রজবুলি ভাষাতেই বেশী পদ রচনা করেছেন। পদরচনায় বিদ্যাপতির অনুগামী বলে তাঁকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে অভিহিত করেছেন বল্লভদাস।

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।

গোবিন্দদাসের জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। ইনি কাটোয়ার

অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামের সুবিখ্যাত বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। ষোড়শ শতাব্দীর তিন চার দশকের মধ্যে তাঁর জন্ম। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। ইনি প্রথমে শক্তিপন্থী ছিলেন, পরে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। গবেষকদের মতে খুব সম্ভব বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুরা তাঁকে কবিরাজ উপাধি দেন। জীবগোস্বামীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতেই বেশী পদ রচনা করেছেন। এত বেশী ব্রজবুলি পদ অন্য কেউ রচনা করেননি। গোবিন্দদাসের পদরচনায় বিদ্যাপতির অনুরূপ ভাষাভঙ্গী, ছন্দোলালিত্য ও আলঙ্কারিক মাধুর্য ও গঠনগত কারুকার্য লক্ষ্যণীয়। এককথায় কবিতার রূপনির্মিতিতে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও গোবিন্দদাসের মৌলিকতা অনেক বেশী। বিদ্যাপতি প্রথমে কবি তারপর ভক্ত। বিদ্যাপতির কবিতায় ভক্তির আকুতি অপেক্ষা কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টিই প্রধান প্রেরণা—তাঁর পদে কাব্যরসই আসল বস্তু—প্রসঙ্গক্রমে সেখানে ভক্তিরস উৎসারিত হয়েছে। কিন্তু গোবিন্দদাস ভক্ত ও কবি। গোবিন্দদাসের পদে ভক্তিসাধনার পরিপূরক হিসাবেই কাব্যরস উৎসারিত। তাসত্ত্বেও গোবিন্দদাস প্রতিভাবান কবি। গোবিন্দদাস সচেতনভাবে বৈষ্ণবভক্ত কিন্তু যখন লেখনী ধরেন তখন তিনি শিল্পী কবি। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, ঝঙ্কার ও লালিত্যে তাঁর সমস্ত পদ অপূর্ব রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণের লীলাকে নানা পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। সেগুলির মধ্যে গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, অভিসার ও মাথুর পর্যায়ের পদ অধিকতর কবিত্বগুণ সম্পন্ন।

অভিসারের পদে গোবিন্দদাস কবি সম্রাট। পদাবলী সাহিত্যে তাঁর মতো কেউ উৎকৃষ্ট অভিসারের পদ লিখতে পারেন নি। অভিসারের অর্থ প্রিয়ের উদ্দেশ্যে চলা—আর এই চলা নানা বাধা প্রতিবন্ধকতা ও দুর্যোগের মধ্য দিয়ে বলেই এখানে দুর্মর প্রাণশক্তি ও চলমানতার সুর বেজে উঠে। কবে প্রিয়ের সঙ্গে মিলন হবে তার ঠিক নেই—চলতে হবে—চলাটাই জীবন—চলাটাই ছন্দ। গোবিন্দদাস দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, বর্ষাভিসার—প্রভৃতি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে অভিসারিকা শ্রীরাধিকার কত বিচিত্র ছবি এঁকেছেন। কুলখোয়ানো তাঁর অভিসার যাত্রা—ঝড় জলে অন্ধকারে কর্দমাক্ত কণ্টকাকীর্ণ পথে সবার অলক্ষ্যে তাঁর অভিসার—

"মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তাই অতি দূরতর বাদর-দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥"

অভিসারের পথে পায়ে পায়ে রক্তের পদচিহ্ন এঁকে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। কিন্তু এই মিলনেও চলা থামে নি—পা থামলেও মন চলেছে যাত্রাপথের দুঃখ বর্ণনায়—

"মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ।...
তোহারি মুরলীযব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্দুক দুখ তৃণ হুঁ করি নাগণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস॥"

শুধু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ নয়, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদেও তিনি অসাধারণ কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ভাবাবেশবিহ্বল শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় মনোজ্ঞ চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন দু একটি কবিতায়।

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব॥
কি পেঁখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম-কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধনী তীরে উজোর॥

মিলনের পদেও গোবিন্দদাস প্রথম শ্রেণীর শিল্পী কবি। শব্দ ও ছন্দের ঝংকারে জ্যোৎস্না রাতে ফুল বনে মিলনের যে পরিবেশ চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অপূর্ব কবিত্বগুণমণ্ডিত। শব্দ চিত্রে ধ্বনিগুণে কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

'শারদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরনি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি শ্যামর মোহন মদন মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত চোরনি॥'

আর দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। অলঙ্কার শাস্ত্র, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে বিদগ্ধ কবি গোবিন্দদাস ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্যে অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় তাঁর রচনাগুলিকে উচ্চশ্রেণীর গীতিকবিতার উৎকর্ষ দান করেছেন। সেদিক থেকে গোবিন্দদাস শুধু দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নন—তার থেকে বড়ো। ভাব বৈচিত্র্যে, অলংকার প্রয়োগে, বাগ্‌বিন্যাসের গাঢ়বদ্ধতায়, দার্শনিক প্রতীতিতে, পদলালিত্যে ও ছন্দের ঝংকারে গোবিন্দদাস প্রথম শ্রেণীর কবি ও শিল্পী।

দশম অধ্যায়

ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কয়েকজন কবি

১. ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঃ

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের পর ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্থান। এই কাব্যে ধর্মঠাকুরের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ধর্মঠাকুর বিকৃত বৌদ্ধধর্মের দেবতা। বাংলাদেশে বৌদ্ধ-ধর্মের অবনতি ঘটলে তা হিন্দুধর্মের আড়ালে নানা ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করে। স্বয়ং বুদ্ধদেব হয়ে উঠেন ধর্মঠাকুর এবং ধর্মঠাকুর কখনো শিব, কখনো বিষ্ণু, কখনো বা সূর্য, কখনো বা কোনো গ্রাম্য দেবতার সঙ্গে একান্ত।

ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে 'ধর্মের গাজন' উৎসব হয়। ধর্মঠাকুরকে তুষ্ট করার জন্য শালে ভর দেওয়া, কাঁটা ফোড়ানো, আগুনে অঙ্গ পোড়ানো প্রভৃতি কঠিন কঠোর আত্মপীড়নের বিধি প্রচলিত। একাধিক আকৃতির শিলাখণ্ডকে ধর্মঠাকুর নামে পূজা করা হয়। ধর্মঠাকুরের পূজারী হয় ডোম পণ্ডিত, ভক্তরাও প্রধানত ডোমজাতীয়। ধর্মঠাকুরের পূজা প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম ভাগের রাঢ়ভূমিতে সীমাবদ্ধ। রাঢ়ভূমি ছিল বীরভূমি—ধর্মমঙ্গলে বীরত্বের কাহিনী।

ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের জন্ম থেকে স্বর্গগমন পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত।

মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা কর্ণসেন। এই কর্ণসেনের সঙ্গে ঘোর বিবাদে লিপ্ত অজয় নদের তীরবর্তী নূতন গড়া নগরের অধিপতি ইছাই ঘোষ। ইছাই ঘোষ প্রবল হয়ে কর্ণসেনের রাজ্য আক্রমণ করে। ইছাই ঘোষ চণ্ডীর বরে মহাবীর। গৌড়েশ্বরকে সে তোয়াক্কা করে না—গৌড়েশ্বরের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে গৌড়বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। গৌড়েশ্বরের পরামর্শে কর্ণসেন যুদ্ধে নামেন ইছাইকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু যুদ্ধে ইছাই তাঁর ছয় ছয়টি ছেলেকে হত্যা করল। সেই সংবাদে পত্নী আত্মহত্যা করল। কর্ণসেন তখন গৌড়েশ্বরের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন—তাঁর 'গৃহশূন্য বিধাতা করিল এতদিনে', এবং 'পুত্রশোকে পাটরাণী লীলাবতী মল।' তখন দয়াপরবশ হয়ে গৌড়েশ্বর নিজের কিশোরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিয়ে দিয়ে আবার তাঁকে সংসারী করলেন। কিন্তু এই বিবাহে ঘোর বিরোধী ছিল রঞ্জাবতীরই ভাই মহাপাত্র মহামদ। সে প্রতিজ্ঞা করল কর্ণসেনকে সবংশে ধ্বংস করবে।

> এত বলি মহাপাত্র মুচড়িছে দাড়ি।
> রায় কর্ণসেনে বড়ো বেড়ে গেলে আড়ি॥

তারপর ধর্মঠাকুরের ভক্ত রঞ্জাবতী তপস্যার জোরে পেল এক ছেলে। নাম লাউসেন। এই নবজাত শিশুটিকে হত্যা করবার কতই না চক্রান্ত করল মামা মহামদ, কিন্তু রাখে 'ধর্ম' মারে কে? লাউসেনই হয়ে উঠল বীর যুবক। এবারে সে চলল গৌড়ে। পথে পথে কত তার বীরত্ব কাহিনী—বাঘকে দমন করল, কুমীরকে হত্যা

করল,—কেউই তাকে ঠেকাতে পারল না! তারপর গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে বহু পুরস্কার পেয়ে সে ফিরে এল স্বদেশে। লাউসেন এবার তার অনুচর কালু ডোম ও কালু-পত্নী লখ্যা, এবং কালু-সহচর তেরো দলুইকে নিয়ে রাজ্য পত্তন করল ময়নাগড়ে।

মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর এবার লাউসেনকে পাঠালেন কামরূপের রাজাকে পরাস্ত করতে। সেখানেও জয়ী হল লাউসেন। তার পর লাউসেন লোহার গণ্ডার খড়্গে কেটে লাভ করল হরিপালের রাজকন্যা কানাড়াকে। এবার ইছাই ঘোষকে দমন করবার পালা। যুদ্ধ হল ভয়ঙ্কর। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম যুদ্ধে মরেও বেঁচে উঠল ধর্মঠাকুরের বরে। যুদ্ধের শেষ দৃশ্যে

গোয়ালা হানিল চোট—সামলিয়া বীর।
অমনি উলটি হানে ইছাইয়ের শির॥

এর পর লাউসেনের পরীক্ষা চলল সম্ভবের রাজ্য থেকে অসম্ভবের রাজ্যে। লাউসেনকে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় করাতে হবে। তপস্যায় ধর্মঠাকুরকে তুষ্ট করে লাউসেন এই অসম্ভবকেও সম্ভব করল। দৃশ্যের একমাত্র সাক্ষী রইল লাউসেনের ভক্ত হরিহর।

ওদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদ আক্রমণ করেছে ময়নাগড়। ভিতর ও বাহির থেকে ময়নাগড় রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টায় একে একে প্রাণ দিল কালুর ছেলে, কালু এবং বারো দলুই।

মহামদ তখনও ছাড়বার পাত্র নয়। লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয়কে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে আগেভাগেই সে শূলে চড়াল হরিহরকে। ধর্মের বলে লাউসেন এবার স্বদেশে ফিরে এসে দেখে ময়নাগড় নষ্ট, বিধ্বস্ত—অনুচরগণ মৃত। ধর্মঠাকুরের ইচ্ছায় ধনে-প্রাণে সকলই সে আবার ফিরে পেয়ে রাজত্ব করতে লাগল। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ঘোষিত হল। এরপর ধর্মঠাকুরের কৃপায় মহামদের কুষ্ঠরোগের নিরাময় ও লাউসেনের সশরীরে স্বর্গারোহণ।

২. রূপরাম চক্রবর্তী ঃ

ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন খ্যাতিসম্পন্ন কবি রূপরাম চক্রবর্তী। রূপরাম বর্ধমান জেলার কাইতি—শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র তিনি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বরের সঙ্গে মনান্তরে কবি গৃহচ্যুত হন। এর পিছনের কারণটি হল পড়াশুনার সময় এক হাড়ির কন্যার সঙ্গে কবির প্রণয়। যাহক, রূপরাম সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরূপতায় কবি পথে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পালাসন বিলের নিকট ভর দুপুরে ধর্মঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে ধর্মমঙ্গল রচনার নির্দেশ দেন। তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

রূপরামের পুঁথি পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে পাওয়া গেছে। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় মিলে। সহজ ভঙ্গিতে, প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি কাব্য লিখে গেছেন। মঙ্গলকাব্যে অলৌকিকের সমাবেশ অত্যন্ত বেশি। দৈবীলীলা সেখানে মানুষের

কাহিনীকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সুখের বিষয় রূপরাম দেবতার দিকে তাকিয়েও বাস্তব দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন নি। মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যথোচিত বাণীবদ্ধ করেছেন। রূপরাম বাস্তবতা ও অলৌকিকতার যথাযোগ্য পরিবেশন করেছেন। এই দুটো দিক স্ব স্ব ক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত, কেউ কাউকে আচ্ছন্ন করে নি। মহামদের প্রতিক্রিয়া, পুত্রহারা রঞ্জাবতীর হাহাকার, মদমত্ত কালু, বাঘ ও কুমীরের লড়াই, বীরমাতা লখ্যা—এ সবই জলজ্যান্ত, বাস্তব রসে পুষ্ট।

চরিত্র সৃষ্টিতে রূপরাম যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী। প্রত্যেক চরিত্রই কবির লেখনীতে স্বধর্মে ব্যক্তিত্বে আত্মস্বাতন্ত্র্যের জীবন্ত মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। বীরনারী লখ্যা স্ত্রীরূপে ও মাতারূপে, মহামদ ঈর্ষ্যাহিংসা দুষ্ট চক্রান্তকারীরূপে, ভালো মন্দের সংমিশ্রণে কালু ডোম চরিত্ররূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপরাম নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যেকটি চরিত্রকে ব্যক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্যে স্বকীয়তায় প্রদীপ্ত করে তুলেছেন।

রূপরামের ভাষা অনাড়ম্বর, স্বচ্ছ সুন্দর ও বাহুল্য বর্জিত—অথচ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাহা বিশদ বক্তব্যের দ্যোতনাবাহী। ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে কবি পণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে বাংলা ও সংস্কৃত দুই ভাষারীতির প্রয়োগ দেখা যায়। কোনো ভাষাভঙ্গীই আড়ষ্ট নয়—সাবলীল গতিবাহী।

ধর্মঠাকুরেরর দর্শন চিত্র বর্ণনায় ভাষা তৎসম অনুসারী—

স্বর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল॥

যাহক, রূপরাম তাঁর ভাষায় কোনো কাব্য স্বাদ পরিবেশন করতে পারেন নি। সরল জীবন রস, যুগপৎ অলৌকিক ও বাস্তব চিত্রাঙ্কণে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

৩. ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যটি বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। ভনিতা থেকে জানা যায় কবির পিতা ছিলেন গৌরীকান্ত এবং মাতা মহাদেবী। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। তাঁর কাব্যের সমাপ্তি কাল হচ্ছে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের কোনো শুক্রবার। কবির টোলে বিদ্যাশিক্ষা সুরু। তাঁর শিক্ষা গুরু তাঁকে কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। সমালোচকের মতে, বিভিন্ন ভাব, বিচিত্র কাহিনী ও বিবিধ রসের সমন্বয়ে ঘনরামের রচনা মহাকাব্যধর্মী। এরূপ ঘটনা বহুল কাব্য বাংলা ভাষায় নিতান্ত দুর্লভ।

ঘনরামের কাব্য চব্বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কবি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁর কবিত্ব শক্তি সর্বজন স্বীকৃত। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর

কাব্যে। তাঁর রচনা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, অনুপ্রাসাদি অলংকার প্রয়োগে তিনি নিপুণ—

বিপক্ষ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুল কুল কুরব কমল কানে কান ॥

কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রগাঢ়, পর্যবেক্ষণ শক্তি তীক্ষ্ণ, রুচি বেশ মার্জিত। কবির কাব্যরীতি অনেক ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের বাগ্‌ভঙ্গীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন—

'করয়ে তর্জন ঘোরতর গর্জন
দুর্জন দশানন দর্পে।
সমরে সেনাগণ সংহারে যৈছন
ক্ষুধিত ঘনপতি সর্পে ॥'

পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র ঘনরামের কাছে কিছুটা যে ঋণী—এ সত্যটি অস্বীকার করা যায় না।

ছোট ছোট চরিত্র চিত্রণে ঘনরাম বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষতঃ নারী চরিত্র সৃষ্টিতে কবি বিশেষ পারদর্শী। কোমল হৃদয় বঙ্গনারীর বীরত্ব সাহসিকতার উপর তিনি উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন। বীরত্বে স্বদেশ প্রেমে বঙ্গললনাকে কবি ঐতিহাসিক গৌরবের জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছেন। লাউসেনের এক পত্নী কলিঙ্গ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে—তার মৃতদেহ কোলে নিয়ে অশ্রুপাত করছে অপর স্ত্রী কানাড়া। সে-সময় দাসী দুর্মুখা উপস্থিত হয়ে বলছে :—

কেঁদ না সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথা কারে প্রাণ দিল কেঁদে ॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে ॥

একাদশ অধ্যায়

কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী ও কাশীরাম দাস

১. কবীন্দ্র পরমেশ্বর :

বাংলায় প্রথম অনূদিত হয় রামায়ণ, তারপর মহাভারত। ষোড়শ শতকের একেবারে প্রথমের দিকে মহাভারতের অনুবাদ সুরু হয়েছিল। মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কে এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যাহক, এখন পর্যন্ত মেনে নেওয়া হয়েছে বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর। ষোড়শ শতকে হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) আমলে মহাভারতের অনুবাদ সুরু হয়। হোসেন শাহ হিন্দু সংস্কৃতির অনুরাগী নৃপতি ছিলেন। মুসলমান শাসকগণ হিন্দুর পুরাণ কথা ও কাব্যাদি আগ্রহ সহকারে শুনতেন,—দেশের জ্ঞানীগুণীরা তাঁদের রাজসভায়

সমাদৃত হতেন। সুলতান হোসেন শাহের লস্কর (প্রধান সেনাপতি) পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁরই আদেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত লেখেন। পরাগল পরমেশ্বরকে সংক্ষেপে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করতে নির্দেশ দেন। পরাগলের আদেশে ও উৎসাহে গ্রন্থটি রচিত বলে এর সাধারণ পরিচয় 'পরাগলী মহাভারত'। গ্রন্থখানি 'পাণ্ডববিজয়' বা 'বিজয়পাণ্ডব' নামেও খ্যাত।

সংস্কৃত ভাষায় কবির খুব দখল ছিল। তাই গ্রন্থে তৎসম শব্দের প্রাধান্য—কিন্তু তাতে ভাষার প্রাঞ্জলতার হানি ঘটে নি। একটি নমুনা—শ্রীহরির রূপ বর্ণনা—

'পরিধান পীত বাস কুসুম বসন।
নবমেঘশ্যামঅঙ্গ কমল লোচন ॥
মেঘের বিদ্যুৎতুল্য হসিত মুখেত।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম এ চারি করেত ॥'

সম্রাট হোসেন শাহের রাজত্বের শেষদিকে পরাগলী মহাভারতের অনুবাদ সুরু হয়। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে এর রচনা সমাপ্ত হয়। যাহক, পরাগলী মহাভারতের ভাষা সরল। রচনা মোটামুটি কবিত্ব মণ্ডিত।

২. শ্রীকর নন্দী ঃ

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও পিতার মতো কাব্য রসিক ছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণাত্মক কাহিনীর প্রতি, বোধহয় সেনাপতি বলেই, তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁর সভাসদ শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বটি বাংলায় লিখতে বলেন। জৈমিনী ভারতের অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে শ্রীকর নন্দী বাংলায় নতুন অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন।

শ্রীকর নন্দী ভারত কাহিনী যখন অনুবাদ করেন তখন গৌড়ের রাজা ছিলেন হোসেন শাহের পুত্র নুসরৎশাহ (১৫১৯-১৫৩২)। সুতরাং বলা যেতে পারে ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে কবি গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। শ্রীকর নন্দীর রচনার একটি নিদর্শন এই—

'কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল ॥
তোহ্মার উদরে যত বসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন ॥
সংসার উপালম্ভ সব খাইলা তুমি।
তাহা হইতে বহু ভয়ংকর বোলে আহ্মি ॥''

ব্যঙ্গ রস সৃষ্টিতে কবি কিরূপ পটু ছিলেন এটাই তার প্রমাণ।

৩. কাশীরাম দাস ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাস। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো কাশীরামের মহাভারতের জনপ্রিয়তা বহু ব্যাপ্ত। এই দুই কবি বাংলা কাব্যের অঙ্গনে দুই বিশাল বনস্পতির মতো দণ্ডায়মান। উভয়েই বাংলাদেশের লোককান্ত কবি। বাঙালী জনসাধারণের কাছে এরা সর্বকালের কবি।

বর্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার সিদ্ধি বা সিঙ্গি গ্রামে কবির জন্মস্থান। পিতার নাম কমলাকান্ত। কমলাকান্তের তিন পুত্র কৃষ্ণদাস, কাশীরাম দাস ও গদাধর। জাতিতে এঁরা কায়স্থ। কথিত আছে, কাশীরাম মেদিনীপুরের অন্তর্গত আওসগড়ের জমিদারের আশ্রয়ে থেকে সেখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। জমিদার বাড়ীতে অনেক কথক ও পণ্ডিতের সমাগম হত—তাঁদের কাছে পুরাণাদির কথকতা শুনে কাশীরাম ভারত-কাহিনীর অনুরাগী হয়ে ওঠেন। এই অনুরক্তিই তাকে মহাভারতের অনুবাদ কর্মে অনুপ্রাণিত করে। কাশীরাম দাস আপামর জনসাধারণের জন্য সরল প্রাঞ্জল ভাষায় পয়ার ত্রিপদীছন্দে সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করেন।

পণ্ডিতদের মতে কাশীরাম মাত্র আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের অনুবাদ শেষ করেন। তারপর তিনি মারা যান।—

'আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
ইহা রচি কাশী দাস গেলা স্বর্গপুর॥'

বাকি পর্বগুলি তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস সমাপ্ত করেন। পণ্ডিতেরা বলেন, কাশীদাসী মহাভারতে কৃষ্ণানন্দ বসু নামে এক ব্যক্তিরও হাত আছে। যাহক, সমগ্র মহাভারতই কাশীরামের নামে চলে আসছে। এ একটা tradition হয়ে গেছে।

গ্রন্থ সূচনায় কাশীরাম বেদব্যাসের বন্দনা করে অনুবাদ কর্মে ব্রতী হন। কবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের রস তৃষ্ণা চরিতার্থের জন্য তাঁর লেখনী ধারণ—

'অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারতকাহিনী॥
শ্লোক ছন্দে সংস্কৃত বিরচিলা ব্যাসে।
গীতিছন্দে কহি তাহা শূণ অনায়াসে॥'

অখ্যাত জনের অশিক্ষিত জনের মনের মতো করে কাশীরাম গ্রন্থ রচনা করে বাঙালীর হৃদয় রাজ্যে অমরত্বের আসন করে নিয়েছেন। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের ঘরেই মহাভারত একটি পবিত্র গ্রন্থ—বাঙালীর জীবন গীতা হিসাবে স্বীকৃত।

কাশীদাসী মহাভারত সংস্কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়—একে ছায়ানুসারী ভাবানুবাদ বলা চলে। তাছাড়া, নানা পুরাণ উপপুরাণের আখ্যান এতে স্থান পেয়েছে। কবির নিজ কল্পনার সৃষ্টিও এই গ্রন্থে লক্ষ্যণীয়। যেমন—শ্রীবৎসচিন্তা ও সুভদ্রা হরণের উপাখ্যান।

কাশীরামের গ্রন্থে বীর, হাস্য ও করুণ রসের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। কবি যে উন্নত মানের লেখক ছিলেন তা গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। সংস্কৃত ও দেশী বাংলা শব্দ সবই তিনি ব্যবহার করেছেন—ভাষা পরিচ্ছন্ন, প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের মধ্যে বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি খুবই স্বতঃস্ফূর্ত ও রসসৌকর্যপূর্ণ।

কাশীরাম বাঙালীকে শুধু গল্পরস পরিবেশন করেননি, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক আদর্শ তুলে ধরে জাতিকে তিনি কর্মক্ষেত্রের বৃহৎ ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পাথেয় দিয়ে গেছেন।

তিনশ বছরের আগে কাশীদাস জন্মেছিলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গালীর জীবনচর্যার সঙ্গে তাঁর মহাভারত একাঙ্গ হয়ে গেছে। বাঙালীর ধ্যানধারণা, চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত হয়ে গেছে কাশীরামের মহাভারত। কাশীরাম আমাদের মানসপ্রকৃতিকে গঠন করেছেন, আবার, আমাদের ভাবকল্পনা, ধ্যানধারণা যুক্ত হয়ে তাঁর কাব্যকে বাঙালী জীবনের মহাকাব্য করে তুলেছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আমাদের করুণ রসে আপ্লুত করে—কাশীরামের মহাভারত আমাদের কর্মক্ষেত্রে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা জোগায়। কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙালীর জীবনগীতা। মহাভারতের অমৃত সমান কাহিনী ও আদর্শকে কবি বাঙালীর হৃদয়দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। বাঙালী জাতি কাশীরামের নিকট অশেষ ঋণে আবদ্ধ। মধুসূদন যথার্থই বলেছেন—

> "নারিবে শোধিতে তার কভু গৌড়ভূমি,
> মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
> হে কাশী কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান॥"

দ্বাদশ অধ্যায়

আরাকান রাজসভার প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা
দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল

১. ভূমিকা ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভায় সম্বর্ধিত কয়েকজন মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় যে কয়েকটি কাব্য রচনা করেছেন তা ঐতিহাসিক দিক্ থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তখনো আধুনিক যুগ আসেনি, কিন্তু আরাকান রাজসভার কবিরা মানবীয় প্রণয় কাহিনীর যে কাব্য রচনা করেছেন, তাতে আধুনিক সাহিত্যের ব্রাহ্মমুহূর্ত সূচিত হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম প্রায় দেড়শত বৎসর আরাকানের বৌদ্ধ রাজার শাসনাধীন ছিল। রাজারা বৌদ্ধ হলেও অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবাপন্ন

ছিলেন। রাজসভায় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের অধিষ্ঠান ছিল। মোগল, পাঠান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র. ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—সবাই রাজসভার শোভা বর্ধন করত।

আরাকান নিজে বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁর রাজকর্মচারী ও প্রজাবৃন্দ বাঙালী মুসলমান রূপেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রাণের যোগ অনুভব করতেন। তাই আরাকান রাজসভায়ই গড়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের এক নূতন মিলন কেন্দ্র। এই মিলনের অভিনবত্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নূতন প্রাণধারা সদৃশ। আরাকানের কবিদের হাতেই বাংলা কাব্য সাহিত্যের যুগান্তরের প্রাক্-সূচনা দেখা দিয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু আরাকানের মুসলিম কবিদের রচনায় দেখা গেল নতুন আলোর ঝলকানি—নরনারীর প্রণয় কাহিনী। আধুনিক কালে যাকে Secular বা ধর্মনিরপেক্ষ মানবীয়তার কাহিনী বলা হয়—সেই মৃত্তিকাতলচারী মানব-মানবীর জীবন চরিত্র রূপায়ণে আরাকানের কবিরা আধুনিকতার পথের প্রথম অতিযাত্রী।

২. দৌলত কাজীঃ

আরাকান রাজসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দৌলত কাজী। কবি কাব্যমধ্যে নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। আরাকান রাজের সেনাপতি ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি আসরাফ খাঁর অনুরোধে দৌলত কাজী 'সতী ময়নামতী বা লোরচন্দ্রাণী' নামে কাব্য রচনা করেন। আসরাফ খাঁর নির্দেশ ছিল, পতিব্রতা সতী ময়নার চরিত্র কাহিনী সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে হবে—যাতে 'সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় আনন্দে।' কবির বাসস্থান চট্টগ্রামের সুলতানপুরে।

হিন্দীভাষার কবি সাধন 'মেনা শর্ত' নামে কাহিনী কাব্য রচনা করেন। দৌলত কাজী আসরাফ খাঁর নির্দেশে সেই কাব্যের ভাবানুবাদ করেন। অনুবাদের কাল ১৬২২—৩৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

দৌলত কাজীর কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই ঃ গোহারী দেশের রাজা মোহরার সুন্দরী কন্যা চন্দ্রাণীর সঙ্গে এক নপুংসক বামনের বিয়ে হয়। ফলে চন্দ্রাণীর জীবন হয়ে ওঠে খুবই বিষাদময়। একসময় রাজা লোরকের সঙ্গে চন্দ্রাণীর দেখা হয়। দুজনের প্রতি দুজনেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। লোরকের পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর নাম ময়নামতী। লোরক গৃহত্যাগ করে চন্দ্রাণীকে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে বামন তাকে আক্রমণ করে। কিন্তু লোরকের হাতে বামন নিহত হয়। অবশেষে মোহরার অনুরোধে লোরক গোহারির রাজা হয়ে চন্দ্রাণীকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে থাকে। এদিকে সতী ময়নামতী স্বামী বিরহে নিঃসঙ্গ বেদনাবিধুর জীবন কাটাতে থাকে। আর সেই সময়ে ছাতন নামে এক লম্পট রাজকুমার ময়নাকে পাওয়ার জন্য রত্তনা নামে এক কুট্টনীকে পাঠায়। সতী ময়না রত্তনার সব প্রলোভন ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করে। শেষকালে রত্তনা যৌবনকালে নারীর নানা মাসে নানা দুঃখের কথা বর্ণনা করে। এক আষাঢ় থেকে সুরু করে পরের জ্যৈষ্ঠের বর্ণনা সুরু করার আগেই দৌলত

কাজীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বছর পরে সৈয়দ আলাওল অসমাপ্ত কাব্য শেষ করেন এক বিরহমূলক উপকাহিনী স্থরু করে। সেই বিরহের কাহিনী শুনে ময়না আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। এক দূতীর মারফত স্বামী লোরকের কাছে সংবাদ পাঠায়। আবার স্বামী স্ত্রীর মিলন ঘটে। লোরক দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে দিন যাপন করতে থাকে।

আলাওলের সংযুক্ত কাহিনীটি কাব্যাংশে তেমন উৎকৃষ্ট হয়—পরন্তু পূর্বাপর সংগতিবিহীন।

যাহক, দৌলত কাজীর রচনায় মর্ত্যপ্রীতি প্রশংসনীয়। চরিত্রসৃষ্টিতে ও কাহিনী গ্রন্থনে তিনি বাস্তবতার অকৃত্রিম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কবি মাটি ও মানুষের জয়সংগীত শুনিয়েছেন আমাদের। রোমান্টিক প্রণয় কাহিনীর মধ্যে কবি অসাধারণ জীবনরসের পরিচয় দিয়েছেন। প্রণয় চঞ্চল চন্দ্রাণী, একনিষ্ঠ প্রেমের সতী ময়না, লম্পট রাজকুমার, ভ্রষ্ট চরিত্রা রওনা ও আত্মদম্ভী বামন—এই সমস্ত চরিত্রগুলি একান্তই বাস্তব সম্মত—ধূলির গেরুয়া রঙে রাঙা।

দৌলত কাজী ছিলেন কবি ও ভাষাবিদ্। তদ্ভব, তৎসম ও দেশী ভাষার ব্যবহার তাঁর কাব্যে সাবলীল গতি পেয়েছে। অনেক স্থলে তাঁর রচনা গভীরতর অর্থের ব্যঞ্জনাবাহী। যেমন—

> 'যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।
> তস্করেতে ধর্ম কথা, বেশ্যাকে ভর্ৎসনা ॥'

৩. সৈয়দ আলাওল ঃ

বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগে সবচেয়ে বেশী প্রচারিত ও পরিচিত কবি সৈয়দ আলাওল। ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যে, বহুবিষয়ে পাণ্ডিত্যে ও নানা গ্রন্থ রচনায় তিনি ছিলেন মুসলিম কবিদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কবির পৈতৃক নিবাস ছিল 'মুল্লুক ফতেহাবাদের' অন্তর্গত জালালপুরে। কবির জীবনকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শেষ সময় পর্যন্ত।

কবি তাঁর ঘটনাবহুল সংঘাতময় জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। কবির পিতা ছিলেন নবাব কুতুবের অমাত্য। একদা জলপথে পিতাপুত্র পর্তুগীজ জলদস্যুদের হাতে বন্দী হন। পিতা যুদ্ধে মারা যান, কবি কোনোক্রমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। বহু দুঃখকষ্ট ভোগের পর আরাকান রাজসভায় আশ্রয় পান। প্রথমে তিনি অশ্বারোহী বাহিনীতে কাজ পান। রাজমন্ত্রী সোলেমানের আগ্রহে কবি সভাসদ্ নিযুক্ত হন। এরপর মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল 'পদ্মাবতী' ও 'সয়ফুলমূলক বাদউজ্জমাল' রচনা করেন। অতঃপর মুখ্য সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের অনুরোধে লেখেন 'তোহফা'। এরপর এক কুচক্রীর চক্রান্তে কবি কারারুদ্ধ হন পঞ্চাশ দিন। মুক্তির পর কবির দিন কাটতে থাকে খুবই কষ্টে। এরপর সুফী পীর মসুদ শাহার সুনজরে পড়ে কবি হৃত গৌরব ফিরে পান। তারপর রাজা মজলিস সবরাজের আদেশে লেখেন 'সেকেন্দর নামা'।

আলাওলের সব কাব্যই অনুবাদমূলক। তবে কাহিনী বিন্যাস, রচনারীতি ও ভাষাভঙ্গীতে কবি কিছু নূতনত্ব সৃষ্টি করেছেন।

সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল ঃ এই কাব্যের কাহিনী আর্বী ভাষায় লেখা আরব্যোপন্যাস থেকে গৃহীত। নায়ক বদিউজ্জমাল মানুষ, আর নায়িকা সয়ফুল মুলুক পরী। মিলন মূলক এই প্রেমকাহিনীতে মানুষ ও পরী, মর্ত্যলোক ও স্বপ্নলোকের সেতু বন্ধন ঘটেছে।

সপ্তপয়কর ঃ ইরানী কবি নেজামির 'হস্তপয়কর' এই কাব্যের আশ্রয়। রাজপুত্র বাহরামের সাত রাজকন্যার কাছ থেকে গল্প শোনার কাহিনী,—রাজকন্যাদের নিয়ে রাজার রাজকার্যে অমনোযোগ,—সেই সুযোগে শত্রুপক্ষের আক্রমণ ও শত্রুদমনের কাহিনী এর বিষয়বস্তু। এই কাব্য শুধুমাত্র অনুবাদ নয়। আলাওল এখানে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

'তোহ্ফা'—মুসলিম নীতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ। আর 'সেকেন্দার নামা'—আলেকজাণ্ডারের বিজয় কাহিনী মূলক কাব্য।

আনুমানিক ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'পদ্মাবতী' আলাওলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্য। এটি হিন্দী কবি মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবধ' কাব্যের অনুবাদ। কাব্যকাহিনী সিংহল রাজকন্যা ও মেবারের রাণী পদ্মাবতীকে নিয়ে লেখা। পদ্মাবতী বা পদ্মিনীর কাহিনী ঐতিহাসিক ও সর্বজন পরিচিত।

আলাওল মূলতঃ অনুবাদক কবি। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব বাস্তব জীবন রসের পরিবেশনে। মূল কাহিনীর যেখানে অলৌকিকতা ও দেবতার ব্যাপার সম্পৃক্ত—তাকে তিনি বাস্তবমুখী রূপান্তর ঘটিয়েছেন। আর নারীচরিত্র সৃষ্টিতে তিনি বাঙালী নারীর স্বভাবধর্মকেই সুপরিস্ফুট করেছেন। বাংলার সরস মৃত্তিকার উপর দিয়েই কবির পদচারণা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

১. ভূমিকা ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তখন সমাজে পুরাতন ও নূতনের এক ক্রান্তিকাল। ভারতচন্দ্র সেই যুগসন্ধিক্ষণের কেন্দ্রে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনাগত নূতনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল সাম্রাজ্যের সে সময় নাভিশ্বাস অবস্থা। বাংলার ইতিহাসে তখন নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়,—নবাবী বিলাসের বহিঃরঙ্গ জৌলুসবিলাস, বিদেশী বণিক শাসনের সুচতুর সূচনা, বর্গীর হাঙ্গামায় যুদ্ধহত্যা লুণ্ঠনে গ্রামবাংলার জীবন বিধ্বস্ত—সর্বহারা মানুষের হা-অন্ন, হা-অন্ন চীৎকার। এরূপ এদিকে ঐশ্বর্যবিলাস, নৈতিক অবনতি ও আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে—বহুমুখী সংঘাতের

আলোড়নে জীবনের স্থির গভীর মূল্যবোধ ও সমুচ্চ আদর্শ রক্ষা করা খুবই কঠিন ছিল। ভারতচন্দ্র সমাজের এই সর্বব্যাপী ভাঙন ও বিপর্যয়ের মধ্যে থেকে জীবনের সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থাকেই উচ্চহাস্য ও ব্যঙ্গ পরিহাসের মাধ্যমে জয় করেছেন। মুক্তদৃষ্টি ও শিল্পসচেতন মন নিয়ে কবি জীবনের ভালোমন্দ, সুরুচি-কুরুচি সমস্ত কিছুকেই নিরপেক্ষভাবেই আশ্চর্য রসরূপ দান করেছেন। আর তারই মধ্যে মানবতার নূতন বাণী ধ্বনিত করেছেন। মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত দেবভক্তির আবেশ কাটিয়ে যুগধর্ম ও যুগচরিত্রকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর জীর্ণ জীবনের প্রাঙ্গণে বসে ভারতচন্দ্র রচনা করেছেন কালজয়ী কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'। যুগধর্মের স্বচ্ছন্দ রূপায়ণে ও আধুনিক মানবতন্ত্রী মনোভাবের আভাস ব্যঞ্জনায় তিনি সমগ্র প্রাচীন কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

২. অন্নদামঙ্গল :

ভারতচন্দ্রের জীবন দুঃখ দারিদ্র্যের সংঘাতে উত্থান-পতনের বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। অধুনা হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জী ছিলেন ভুরশুট পরগণার জমিদার। জমিদারী হাত ছাড়া হয়ে গেলে তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তখন ভারতচন্দ্র চব্বিশ পরগণার নওয়া পাড়ায় মাতুলালয়ে থেকে সংস্কৃত ভাষা শিখেন। সে সময় বাড়ীর কারুর মত না নিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দমত এক বালিকাকে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি দেবানন্দপুরের জমিদারের মুন্‌সী রামচন্দ্রের কাছে ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। এরপর পিতার সম্পত্তি উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। কারাগার থেকে পালিয়ে কটকে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে বৈষ্ণবাচার্যদের কাছে বৈষ্ণবতত্ত্ব ও ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। সেখান থেকে ফিরে শ্বশুর বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন। এবং চন্দননগরের ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে কবিকে আশ্রয় দেন। এই দেওয়ানের আনুকূল্যে ভারতচন্দ্র মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তিতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিতের পদে বৃত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে ভারতচন্দ্র ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। এই কাব্যের রসানন্দে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র মূল জোড়ে গ্রাম ইজারা দেন। নিজের গ্রামে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে কবি মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

'অন্নদামঙ্গল' ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার সার্থক ও শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। কাব্যটি তিনখণ্ডে বিভক্ত—(১) শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল—এতে নবাব আলিবর্দী কর্তৃক কৃষ্ণচন্দ্রের কারাদণ্ড, কৃষ্ণচন্দ্রকে পূজার্চনা করার জন্য অন্নদার স্বপ্নাদেশ ; সতীর দেহত্যাগ, উমার জন্ম ও শিবের সহিত বিবাহ, দেবীর কৃপাপুষ্ট হরিহোড়ের কাহিনী বর্ণিত। (২) বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল —এতে পূর্ব প্রচলিত বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় কাহিনী স্থান পেয়েছে। (৩) মানসিংহ-অন্নদামঙ্গল—এতে মোগল সেনাপতি মানসিংহের

হাতে সামন্তরাজ প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও দিল্লীর পথে তার মৃত্যু ও দেবী অন্নদার রোষে দিল্লীতে নানা বিপর্যয়ের ইতিহাস-বিকৃত কাহিনী স্থান পেয়েছে।

ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কাঠামো ও দেবদেবীর কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ মানবিক। ভারতচন্দ্র যুগসন্ধিক্ষণের কবি। তাঁর অন্নদামঙ্গলে বিলীয়মান পুরাতন যুগ ও আগমন আসন্ন নূতন যুগ পরস্পর মুখ দেখাদেখি করেছে। ভারতচন্দ্র পুরাতন যুগের শেষ কবি ও নূতন যুগের প্রথম কবি। ইংরেজী সাহিত্যের টমাস হার্ডির মতো তিনি—'Last of the ancient and first of the modern'. তাঁর অন্নদামঙ্গল পুরাতন পাত্রে নূতন রস পরিবেশনের মতো। ভারতচন্দ্রের এই কাব্যে রয়েছে একটা হাসি—যাকে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন বীরের হাসি। বাস্তবিকই শতাব্দীব্যাপী দেবতার ভণ্ডামি ও একাধিপত্য ভারতচন্দ্রের হাসির কাছে কোথায় উড়ে চলে গেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখি শিবকে ঘিরে শিশুদের কলকোলাহল—

'কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ধূলামাটি গায় তার দেয় ফেলাইয়া॥'

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে এই যে মানবশিশু নির্ভয়ে দেবতার গায়ে ধূলি ফেলতে সুরু করল—এখান থেকেই বাংলাকাব্যে আধুনিকতার সুরু। শুধু এই নয়, স্বর্গের তথা কৈলাসের দেবতাদের—স্বামী স্ত্রী পুত্রদের কবি একেবারে মাটির ঘরের দরিদ্র মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। ব্যাসদেবের চরিত্রটিকে কবি মানবধর্মে উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করে তুলেছেন। ব্যাসদেবের সাধনার মন্ত্র—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—বাস্তবজীবনে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠারই আদর্শ। দেবী অন্নদা ছলনায় ব্যাসদেবের সাধনায় বিঘ্ন ঘটালে ব্যাসদেবের উক্তি—'শরীর করিনু ক্ষয় তোমার লাগিয়া / কি ফল লভিলে বল আমারে ছলিয়া'—দেবতার ছলনা চতুরীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মানুষের প্রতিবাদ। এখানে দেবতার হীনমন্যতার উর্ধ্বে মানুষের সাধ্যসাধনার মূল্যবত্তাই প্রকারান্তরে ঘোষিত। ঈশ্বরী পাটনীর কণ্ঠেও নূতন মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' দেবতা যদি থাকে তবে আত্ম-মর্যাদাশীল তাঁর কাছে ধন দৌলত মোক্ষ মুক্তি চাইবে না—চাইবে আত্মনির্ভরশীলতার কর্মময় প্রেরণা—'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ সে নহে মোর প্রার্থনা / তরিতে পারি শকতি যেন রয়'।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অবৈধ প্রণয়ের প্রশ্রয় রয়েছে—আদি রসের বাড়াবাড়ি আছে বলে অনেকে অশ্লীলতার অভিযোগ আনেন। বস্তুতঃ এরূপ বক্তব্য সংকীর্ণতা দোষযুক্ত। আদিরসের বর্ণনায় কিছুটা নগ্নতা আছে এই যা। কিন্তু মুক্ত প্রেমের মানবিক দিকটি আধুনিকোচিত। বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় ব্যভিচার কেলেঙ্কারীর বস্তু নয়—তা প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পর অন্তরিকতার সুরে বাঁধা—সমস্ত সামাজিক বিধিবিধানের উর্ধ্বে জীবনের স্বভাবধর্ম সম্মত।

ভারতচন্দ্র ছন্দশিল্পী ও শব্দকুশলী কবি। তিনি জানতেন বিষয়বস্তু যাহাই হোক কাব্যের প্রতিষ্ঠা রসে। তাই তিনি রসসৃষ্টিতে আর্বী ফার্সী তদ্ভব ও তৎসম শব্দ ভাব অনুযায়ী যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করেন। বাংলায় সংস্কৃত ভুজঙ্গ প্রয়াত, তোটক ও তোণক প্রভৃতি ছন্দের সুনিপুণ প্রয়োগে তিনি অপূর্ব মণ্ডনকলার পরিচয় রেখেছেন কাব্যে। হাস্যরস ও ব্যঙ্গরস সৃষ্টিতে, ছন্দে, অলংকারে, ভাষায়, চিত্র সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র অসাধারণ কবি-শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠে মণিমালার মতো, যেমন তার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার কারুকার্য।'

তবে ভারতচন্দ্রের কবিখ্যাতি সত্ত্বেও, একথা স্বীকার্য যে তাঁর গান রাজকণ্ঠের মণিমালা—পুষ্পমালিকার অপার্থিব সৌরভ তাতে নেই বললে চলে। জীবনের বহিরঙ্গলীলার চাকচিক্য ও ব্যঙ্গকৌতুকই প্রধান তাঁর কাব্যে।

চতুর্দশ অধ্যায়

সামাজিক পটভূমিতে শাক্ত পদাবলী : রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত এবং বাউল (লালন ফকির)

১. শাক্ত পদাবলী : সামাজিক পটভূমি :

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম গীতিসাহিত্য শাক্ত পদাবলী। বৈষ্ণব-পদাবলীর পর এর স্থান। প্রথমটিতে শ্রীরাধিকার প্রেয়সী—প্রেয়সীমূর্তি—দ্বিতীয়টিতে শ্যামার জননীমূর্তি। রাধার অভিসার লোকালয়ের বাহিরে—কালীর অধিষ্ঠান আমাদের কুটীরের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—বাঙালী কুলত্যাগিনী রাধা ও গৃহচারিণী উমা—এই দুই নারীর সাধনা করেছে।

শাক্ত পদকর্তারা আদ্যাশক্তি দেবীর পূজারী। শক্তি অর্থাৎ শিব-গৃহিণী—কখনো চণ্ডী, কখনো দুর্গা বা উমা, কখনো কালী। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শক্তি দেবতা কালীর সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই কালী বা শ্যামা বাঙালীর পূজিতা প্রাচীন দেবতা। তন্ত্রে শক্তি স্বরূপা মহাকালী সৃষ্টি ও সংহারের দেবতা—একদিকে তিনি ঘোর করালবদনী, খণ্ডাখর্পর ধারিণী, অন্যদিকে কল্যাণদাত্রী, মমতাময়ী বিশ্বজননী।

শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব অষ্টাদশ শতকে। এর পিছনে সামাজিক পটভূমি কম দায়ী নয়। এ সময় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম দশা, ইংরেজ কোম্পানী আমলের সূত্রপাত—রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনে ভোগবিলাস ও ব্যভিচারে অন্তঃসার শূন্য। আর বর্গীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত বাঙালীর জাতীয় জীবন নৈরাশ্যে মুহ্যমান। এইরূপ সর্বব্যাপী অবক্ষয় ও তামসিকতার মধ্যে কঠিন বাস্তবকে স্বীকার করে শাক্ত

কবিরা ভক্তির মধ্যেই শক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—আশা ভরসার বাণী শোনালেন। শাক্ত পদাবলীতে শ্যামামায়ের যে ভয়ংকর রূপের বর্ণনা—তার মধ্যে সমকালীন অন্নাভাবক্লিষ্ট ও নৈতিক অধঃপতিত সমাজেরই প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু সবকিছু হতাশা-দুর্দশা জড়তাতামসের উর্ধ্বে অমৃতলোকে উত্তরণের সংগীতও রচনা করেছেন কবিরা।—'মা কি আমার কালো রে। কালরূপা দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলোরে।'

শাক্ত পদাবলীর একটি বড়ো অধ্যায় জুড়ে রয়েছে উমাসংগীত—আগমনী ও বিজয়া গান। উমাসংগীত উদ্ভবের পিছনে তৎকালীন বাঙালী সমাজের নিগূঢ় যোগ রয়েছে। বাল্য-বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা বাঙালী সমাজে নিদারুণ মনোব্যথার কারণ ছিল। আট নয় বছরের কন্যাকে বিয়ে না দিলে পিতামাতা জাতি কৌলীন্য থেকে পতিত হতেন। তাই, কুলরক্ষা করতে গিয়ে, প্রায়ই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ কিংবা দারিদ্র্যগ্রস্ত কুলীন অপাত্রের হাতে কন্যাকে সঁপে দিতে হত। বহুসন্তানের সতীনের ঘরে বহুকষ্টে জীবন-যাপন করতে হত হতভাগ্য তরুণ কন্যাকে। স্বামীগৃহে কন্যাকে পাঠিয়ে মন্দভাগ্য মেয়ের জন্য মায়েরা নীরবে অশ্রুপাত করতেন সারাটি বছর। রীতি ছিল বছরে দুর্গোৎসবের তিনদিন পিতার বাড়ীতে ঘুরে যাবে নববিবাহিতা কন্যা। আবেগ উৎকণ্ঠায় অধীর আগ্রহে মায়েরা অপেক্ষা করতেন সেই দিনটির জন্য। কন্যা পিতৃগৃহে আসে, তিনদিনের পর আবার চলে যায়। ক্ষণমিলনের পর আবার নিদারুণ বিচ্ছেদ। আগমনীতে কন্যার আগমণ প্রতীক্ষায় মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা আর বিজয়ায় বিচ্ছেদের দুঃখবেদনা কান্নার স্বর—ব্যথাদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি। সামাজিক প্রথার নির্দেশে যে দেশের শিশুকন্যাকে অপাত্রের হাতে সমর্পণ করতে হত—আগমনী ও বিজয়ার গানে সেই দেশের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যত পার্বতীর দুঃখের কথা স্মরণ করে যত মেনকা সমস্ত জীবন ভর কেঁদেছেন—তাঁদের সমস্ত কান্নার জলে সিক্ত আগমনী ও বিজয়া সংগীতগুলি।

২. রামপ্রসাদ সেন ঃ

শাক্ত পদাবলীর আদি কবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে তিনি ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামরাম সেন ও মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেবী। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে গতানুগতিক কৃত্রিমতার যুগে রামপ্রসাদ ভক্তিভাবের গান লিখে একটি নূতন রসের উৎস খুলে দিয়েছেন।

কলকাতার ধনী জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করার সময়ই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। হিসাবের খাতায় রামপ্রসাদ একদিন লিখলেন—'আমায় দে মা তহবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই, মা শংকরী'। জমিদার কবির প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ভক্তিভাবের সাধনপথে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিলেন। বিষয়কর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি ধার্য করলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গিয়ে পৌছাল রামপ্রসাদের কবিখ্যাতি। তিনি কবিকে সভাসদরূপে

পেতে চাইলেন। কিন্তু বিষয়বিমুখ কবি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তথাপি কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন—কবিকে ভূষিত করেছেন 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে—আর দিয়েছেন স্বগ্রামে নিষ্কর জমি। তা সত্ত্বেও রামপ্রসাদের সুখেদুঃখে দিন কেটেছে। খুব সম্ভব ষাট বছর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে।

রামপ্রসাদের গানে লক্ষিতব্য বিষয় গভীর ভাবানুভূতি ও আন্তরিক ভক্তিমত্তা। আরাধ্যা দেবীকে মহাশক্তিরূপা জেনেও অকৃত্রিম ভক্তি ও আন্তরিকতার টানে একান্ত আপনার করে নিয়েছেন। রামপ্রসাদ ধর্মের কৃত্রিম আচার অনুষ্ঠানকে লোক-দেখানো ভড়ং মাত্র বলেছেন। ভক্তিসুধা দিয়েই শ্যামা মাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে,—

'প্রসাদ বলে ভক্তিমাত্র কেবল রে তার উপাসনা
তুমি লোক দেখানো করবে পূজা, মাতো আমার ঘুষ খাবে না।'

তাঁর গানে বাৎসল্য রসের ধারা প্রবাহিত। জগৎজননী শ্যামা মায়ের সঙ্গে তাঁর মাতাপুত্রের সম্পর্ক, তাই আবদার অভিমান অনুযোগ তিরস্কার প্রভৃতি বহু বিচিত্র ভাবের দোলায় তাঁর কাব্য তরঙ্গমুখর।

ছেলের ডাকে মা সাড়া দেন না, তাই সন্তানের চিত্ত অভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে—

'মা মা বলে আর ডাকব না।
ও মা, দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা'

কখন রেগে মেগে তিনি বলেন—

'এবার কালী তোমায় খাব
তুমি খাও না হয় আমি খাই,
দুয়ের একটা করে যাব।'

মাকে গালি গালাজ করতে তিনি ছাড়েননি—

জন্মজন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে।
প্রসাদ বলে, এবার মলে ডাকব সর্বনাশী বলে॥

কিন্তু এ সবই অভিমানের ছদ্মবেশ—রামপ্রসাদ জেনেছেন জীবনে দুঃখ যন্ত্রণা যাই আসুক একমাত্র আশ্রয় স্থল শ্যামা মায়ের কোল—

'আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
তবে দাও দুঃখ, মা, আর কত চাই।
দেখো সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই।'

রামপ্রসাদের 'গিরি, এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না', ও 'ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে'—এই আগমনী ও বিজয়া শীর্ষক গান দুটি সুবিখ্যাত। সংগীতের মাধ্যমে রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর নীতিভ্রষ্ট মানুষের বিবেক চেতনা জাগ্রত করতে প্রয়াসী হন। তার পরিচয় মিলে অনেক গানের মধ্যে—

'ডুব দেরে মন কালী বলে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

কামাদি ছয় রিপু আছে
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে নাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।'

এমনিতর বহু গান আছে। রামপ্রসাদের গানে তত্ত্বকথা আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে ও জীবন রসও রয়েছে। সবকিছুকেই তিনি প্রকাশ করেছেন সর্বজনবোধ্য লৌকিক বাংলা ভাষায়। রামপ্রসাদের ছন্দও লৌকিক ছন্দ (দলবৃত্ত ছন্দ)। রবীন্দ্রনাথ রামপ্রসাদের ছন্দকে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ বলেছেন। এবং ভবিষ্যতে বাংলা কবিতার ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দ অনুযায়ী হবে—এও কবির বক্তব্য ছিল। বাস্তবিকই লৌকিক ভাষা ও লৌকিক ছন্দকে কবি স্মরণীয় কাব্যোৎকর্ষের মর্যাদা দিয়ে গেছেন। তাছাড়া হৃদয় গলানো রামপ্রসাদী সুরও বঙ্গসংস্কৃতির একটি অন্যতম ঐতিহ্য।

৩. কমলাকান্ত চক্রবর্তী :

রামপ্রসাদের পর শাক্তপদকর্তাদের মধ্যে কমলাকান্ত চক্রবর্তী একজন বিখ্যাত কবি। কমলাকান্ত বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। পঞ্চমুণ্ডির আসন করে তিনি কালীসাধনা করতেন। বাংলা ১২১৬ সালে তিনি অম্বিকা কালনা থেকে বর্ধমানে আসেন। বর্ধমানাধিপতি তেজেশচন্দ্র কবির নিষ্ঠা ও কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তেজেশচন্দ্র কমলাকান্তকে গুরুরূপে বরণ করেন। রাজাকে শিষ্যরূপে পেয়ে কমলাকান্তের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটেনি। কিন্তু কমলাকান্ত বিষয়নিস্পৃহ ছিলেন, আরাধ্য দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করে পার্থিব ভোগের উর্ধ্বে এক পরাশান্তির জগতে বিরাজ করতেন তিনি।

কমলাকান্তের গানে ভক্তিরসের সঙ্গে মানবিক সুখদুঃখের কাহিনীও প্রকাশ পেয়েছে। আগমনী ও বিজয়ার গানে গার্হস্থ্য জীবনে কন্যা বিরহে মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণা খুবই সহমর্মিতার সঙ্গে চিত্রিত। অবশ্য রামপ্রসাদের মতো ভাবের বৈচিত্র্য তাঁর রচনায় নেই—কিন্তু ভক্তির আন্তরিকতা অনবদ্য। কমলাকান্তের পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনার ভাবদ্যোতনা। কমলাকান্ত সাধক কবি ও শিল্পী। তাঁর রচনায় একজন শিল্পী মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পদাবলীতে অলঙ্করণ সজ্জার প্রতি কবির সচেতন প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। অধ্যাত্মসাধনার আদর্শ ও আকুতিকে কবি দক্ষ শিল্পীর মতো রূপসৃষ্টিতে যত্নবান হয়েছেন। 'শুক্‌নাতরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে', 'জানি গো জানি জননী, কেমন পাষাণের মেয়ে' এবং 'সদানন্দময়ী কালী'—প্রভৃতি গানগুলিতে ভক্তমনের অকপট প্রকাশ ঘটেছে। কবিত্বে ও চিত্ররূপে নীচের সাধন সংগীতটি অতুলনীয়। অনুভূতির প্রগাঢ়তাকে কবি রূপ ও রসের স্থির-স্বচ্ছ-প্রদীপ্ত যুগলমূর্তি দান করেছেন—

'সাজিল মনভ্রমরা কালীপদ-নীল কমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল।
দেখ, সুখ দুঃখ সমান হল আনন্দসাগর উথল ॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এত দিনে।
পঞ্চতত্ত্ব, প্রধান, সত্ত্ব, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল ॥'

৪. বাউল গান ঃ

বাউল সাধকদের রচিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাউলগানগুলি নূতনত্বের পরিচয়বাহী। বাংলাদেশের বাউল সম্প্রদায় মরমীয়া সাধক। বাংলার বাউল বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ঈশ্বরপ্রেমে যারা পাগল তারাই বাউল। এরা যাযাবর শ্রেণীর মানুষ। আধ্যাত্মিক আকুলতা ও চলমানতার ধর্ম এদের গানে প্রকাশ পেয়েছে। বাউল সাধকরা গানের ভিতর দিয়েই নিজেদের সাধনার কথা প্রকাশ করেছেন। সমালোচকদের মতে অতীত বাংলার সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বাউল ধর্মে পড়েছে—পরবর্তীকালের ইসলামীয় সূফী সাধনতত্ত্বও এতে এসে মিলেছে।

যাহক, বাউলরা সহজিয়া জীবন সাধক—মানুষকে জানাই এদের প্রধান সাধনা। মানুষের অন্তর্লোকবাসী প্রেমিক পুরুষ 'মনের মানুষে'র সন্ধানে এরা পথ হেঁটে চলেছে। একতারা এদের গানের সহচর। জীবনের নানা বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে এরা একের সন্ধানী। সীমাবদ্ধ জড়সত্তাকে বিনাশ করে দেহে ও মনে মুমুক্ষু হয়ে ওঠার জন্যই বাউলদের সাধনা।

বাউলরা বৈরাগী—এদের প্রধান ধর্ম উদাসীনতা। সংসার, জীবন, কর্ম ও ভোগ বাসনা কোনোকিছুকেই এরা অস্বীকার করেনি। সমস্ত কিছুরই সঙ্গে এদের সহজ সম্পর্ক—সমস্ত জিনিসের মধ্যে থেকে, সবকিছুকে গ্রহণ করে এরা আশ্চর্যভাবে উদাসীন ও নির্লিপ্ত পুরুষ—একের সন্ধানে নিবদ্ধ এদের অন্তর্দৃষ্টি।

বাউলদের ধর্মসাধনায় পৌত্তলিকতার কোনো স্থান নেই। সমাজজীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে এরা আবদ্ধ নয়। আচার সংস্কার, শাস্ত্র সংহিতা, তন্ত্র মন্ত্র এরা অগ্রাহ্য করেছে। বাউলরা আত্মিক লোকের অধিবাসী—মন এদের উপাসনার মন্দির—মনের মানুষ সেই মন্দিরের দেবতা। অন্তরের মধ্যে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে,—দেহের পথ ধরে অমৃতলোকে যাত্রা করতে হবে—এটাই বাউল সাধনার তাত্ত্বিক অর্থ। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের সম্পর্কে লিখেছেন—

'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্র বর্জিত।…
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তার আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,

নক্ষত্র খচিত আকাশে
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে
দোসর জনার মিলন বিরহের
গহন বেদনায়।'

বাউলরা মানুষকে মানুষ হিসাবে স্বীকার করে, একে অপরের শিষ্য হয়, ধর্ম ও জাতিভেদ উপেক্ষা করে। এদের কাছে হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদ নেই। বাউল সাধনায় জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়, উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। তাই হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়েছে বাউল সাধনার পতাকাতলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে,…হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয়।'

বাউলদের সাধনা সহজিয়া সাধনা। কিন্তু এই সহজিয়া সাধনায় পরমার্থ লাভ সহজ ব্যাপার নয়। এই সাধনার অভীষ্ট লাভ সময়সাপেক্ষ—পরিশুদ্ধচিত্তে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সাধনায় নিমগ্ন থাকতে হয়। বাউল বলেছে—

'নিঠুর গরজি, তুই মানস মুকুল ভাজবি আগুনে,
তুই ফুল ফোটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?'

৫. লালন ফকির:

বাউল সাধকদের মধ্যে লালন ফকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার অখ্যাত এক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং সুদীর্ঘ ১১৬ বছরের জীবনে হাজার হাজার বাউল সংগীত রচনা করেন।

কথিত আছে, লালন পূর্বে হিন্দু ছিলেন, জাতিতে কায়স্থ। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত কুষ্টিয়ায় তাঁর বাসস্থান ছিল। তীর্থ যাত্রাকালে ইনি মহামারীতে আক্রান্ত হলে সঙ্গীগণ কর্তৃক পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় সিরাজ সাঁই নামে জনৈক মুসলিম দরবেশের কৃপায় তিনি জীবন লাভ করেন। গৃহে ফিরে এলে তিনি হিন্দু সমাজ কর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন। তাঁর গৃহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। লালন এক মুসলিম কন্যাকে বিবাহ করে ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করেন। তদবধি লালন ফকির নামে পরিচিত হন। লালন নিজেকে সিরাজের শিষ্য বলে ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ার সন্নিকটে সেওরিয়া গ্রামে তাঁর প্রধান আখড়া ছিল। এখানে তিনি সস্ত্রীক বাস করতেন। তিনি বিশেষ কোনো ধর্ম মানতেন না। হিন্দু মুসলমান সকল ধর্মের লোক তাঁর শিষ্য ছিল। সকল মানুষই তাঁকে আপন বলে মনে করতেন। মৃত্যুর পরে তাঁকে আখড়ার মধ্যেই সমাধিস্থ করা হয়।

ঠাকুর বাড়ীর ভারতী পত্রিকায় ১৩০২ সালে লালন সম্পর্কে রচনা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালীন লালন ফকিরের সান্নিধ্যে আসেন। কবি লিখেছেন—

'কতদিন, দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে এই পদ্মানদীর ধারে'

১৩২২ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী পত্রিকায় লালন ফকিরের কুড়িটি গান প্রকাশ করেন। তখন থেকে শিক্ষিত বাঙালীর মনে বাউল গান সম্পর্কে একটা কৌতূহল, শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য দেখা যায়।

লালনের গানে আধ্যাত্মিকতা, গূঢ়তত্ত্ব ও মানবিকতার ত্রিবেণী সংগম ঘটেছে। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী, কেমনে আসে যায় / ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতাম তার পায়।'; 'আছে যার মনের মানুষ আপন মনে, / সেকি আর জপে মালা'; 'আমি কোথায় পাব তারে/ আমার মনের মানুষ যেরে'—এই পদগুলি বাউল সাধন-তত্ত্বের ব্যঞ্জনাবাহী।

লালনের কাছে সর্ব মানবের মিলন ও ঐক্যটাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। নিজের মধ্যে ও সর্ব মানুষের মধ্যে পরম মানব সত্তাকে সন্ধানের সংগীত তিনি রচনা করেন। নীল আকাশের নীচে সকল জাতি ধর্মের মানুষকে তিনি মনের মধ্যে মনের মানুষকে খোঁজার কথা বলেছেন। ভগবানের কোনো জাতি নেই, মানুষ কেন জাতি নিয়ে গর্ব করে, সাম্প্রদায়িক অশান্তির হলাহল সৃষ্টি করে—সকলেই পরম পিতার সন্তান। মন্দিরে মসজিদে নয়—সহজ ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে পরস্পর হাত ধরে চলতে হবে পরম পুরুষের তীর্থযাত্রায়—এই ছিল লালনের বাণী। রবীন্দ্রনাথ একাধিক গ্রন্থে লালনের গান উদ্ধৃত করে তার মানবিক ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লালনকে উপনিষদের ঋষির পর্যায়ে উন্নীত করেন। বাস্তবিকই আর্য ঋষিদের মতোই লালন তাঁর সংগীতে মানব মিলনের মন্ত্রোদ্গাতা, অখণ্ড মানবতার পূজারী ও জ্যোতির্ময় পুরুষের বার্তাবাহক। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারত-পথিক নামে অভিহিত করেছেন। রামমোহনের চিন্তা ও ভাবনার লক্ষ্য ছিল জাতি বর্ণ নির্বিশেষ ভারতবর্ষকে মহা-মানবের মিলনতীর্থে পরিণত করা। অনুরূপভাবে লালন ফকির পল্লীর অল্প শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে সেই মিলনের বাণীতে বিপুল জাগরণ সৃষ্টি করেন। লালন মহাত্মা, ঋষি—তার থেকেও বেশি—তিনি ভারত পথিক—জনগণ মনের অধিনায়ক।

লালন ছিলেন স্বভাব কবি। জীবনের পরিবেশ থেকেই নানা উদাহরণ নিয়ে গান রচনা করেন। তাঁর ভাষা জনসাধারণের মুখের ভাষা, ছন্দ লৌকিক—উপমা অলংকারও চলতি জগৎ থেকে নেওয়া। সব মিলে লালনের গান সরল ও সহজবোধ্য। তবে ভাব মূলতঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুসারী বলেই বেশির ভাগ গানই প্রতীকধর্মী ও নিগূঢ় ব্যঞ্জনাবাহী। লালন মনের ভাব সংগীতে প্রকাশ করে গঠন পারিপাট্যের দিকে লক্ষ্য রাখতেন না। তার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ লালন সাহিত্যসাধক শিল্পী নন। অধ্যাত্মমার্গের সাধক—উপলব্ধিগত সাধন সত্যকে তিনি গানে তুলে ধরেছেন। কাজেই কাব্য কলার বিশ্লেষণে তাঁর গানে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের ভাষায়—"তা সত্ত্বেও যা হত তা সাধনার দিক্ থেকে উচ্চ কোটির। কবিতা হিসাবে উচ্চাঙ্গের। সঙ্গীত হিসাবে তো অপূর্ব।"

———

আদি যুগ

প্রথম অধ্যায়

১। বাঙালীজাতির উদ্‌ভবের ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। বাংলা ভাষার উদ্‌ভবের পরিচয় দাও।

৩। অপভ্রংশ ভাষা বলতে কি বুঝায়? বাংলা ভাষা কোন্ অপভ্রংশ থেকে জাত—উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বাংলাসাহিত্যের আদিগ্রন্থ কোনটি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক আলোচনা লিখ। বা চর্যাগীতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। চর্যাগীতিতে তৎকালীন বাঙালী সমাজের যে প্রতিফলন ঘটেছে—সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

৩। চর্যাগীতির সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে রসগ্রাহী আলোচনা লিখ।

মধ্য যুগ

প্রথম অধ্যায়

২। তুর্কী বিজয় কখন ঘটে? তুর্কীবিজয়ে বাংলায় সমাজ জীবনে যে রূপান্তর ঘটেছিল —সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কর। অথবা তুর্কীবিজয়ে বাংলার সমাজ জীবনে সমন্বয়ের একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—এ সম্পর্কে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গুরুত্ব নির্ণয় কর (উচ্চ মাধ্যমিক—১৯৮৩)

২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানা কার লেখা? এই কাব্যখানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বাংলাভাষায় এই কাব্যখানার বিশেষ মূল্য আছে কেন? কাব্যখানার অন্য কোনো নাম ছিল কি? (উ. মা. ১৯৮১)

৩। পদাবলী কাকে বলে? বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর রচনা বৈশিষ্ট্য বিচার কর (উ. মা. ১৯৮২)

৪। বাংলা পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয় কেন? (উ. মা. ১৯৮০)

৫। বিদ্যাপতি কোন্ দেশের লোক ছিলেন? তাঁকে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ধরা হয় কেন? তার পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি নিয়ে আলোচনা কর। পরের যুগের কোন্ বাঙালী কবির উপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল? (উ. মা. ১৯৮১)

৬। বিদ্যাপতির পদাবলী কোন্ ভাষায় রচিত? তাঁহার জীবনী ও কবিপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও (উ. মা. ১৯৭৮)

৭। ব্রজবুলি ভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৮। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি—রবীন্দ্রনাথের এরূপ মন্তব্যের তাৎপর্য বিচার কর।

৯। বিদ্যাপতির কবি প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বাংলাদেশে তাঁহার পদাবলীর··সমাদরের কারণ কি ? (উ, মা. ১৯৮৪).

তৃতীয় অধ্যায়

১। বাংলা রামায়ণের আদি কবি কে ? কবির পরিচয় ও কাব্য রচনা সম্পর্কে যে সব উল্লেখ ঐ রামায়ন কাব্যে রয়েছে তা বিবৃত কর। বাঙালী জীবনে ঐ কাব্যের প্রভাব কতখানি নির্ণয় কর। (উ. মা, ১৯৮৩)

২। কৃত্তিবাস কার লেখা কোন্ কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন ? কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্ষেপে লিখ। তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ কি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (উ.মা,১৯৮২)

৩। কৃত্তিবাস কে ছিলেন ? বাংলাদেশে তঁাহার রামায়ণের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় কর। (উ. মা. ১৯৭৮)

৪। কৃত্তিবাসের জীবন ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে আলোচনা কর। (উ.মা.১৯৮৪)

৫। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের ভাব বস্তু বিচার কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। মঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত সে যুগের একটি সামাজিক জীবনের লেখ-চিত্র অঙ্কন কর। ইহার ঐতিহাসিক কারণ কি ?

২। মঙ্গল শব্দটির অর্থ কি ? মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি কি ? মনসামঙ্গল অথবা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যে কোনো একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

১। মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় ? এই কাব্যে চাঁদসদাগরের চরিত্রবৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিবৃত কর। (উ. মা-১৯°৯)

২। মঙ্গলকাব্যের প্রতিটি ধারার হু'জন করে বিখ্যাত কবির নাম লিখ। যে কোনো একটি ধারার কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। ঐ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (উ. মা-১৯৮০)

৩। মঙ্গল কাব্যের অর্থ কি ? মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? মনসামঙ্গল অথবা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যে কোনো একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য-প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (উ. মা-১৯৮২)

৪। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের কবি-প্রতিভার তুলনামূলক বিচার কর।

৭। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের জীবনী ও কাব্যের পরিচয় দাও

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমতের কি প্রভাব অনুভব করা যায়—তাহা আলোচনা কর। (উ. মা. ১৯৭৯)

২। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব নিয়ে আলোচনা কর। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় শ্রীচৈতন্যের প্রভাব কতটা পড়েছিল লিখ। (উ. মা. ১৯৮১)

৩। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যের প্রভাব নির্ণয় কর।

(খ) দুটি চৈতন্যচরিত কাব্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (উ.মা.'৮৩)

৪। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙালী সমাজের কেমন রূপান্তর সাধিত হয়েছিল? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। 'বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাবের ফল হয় সুদূরপ্রসারী'—
আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় বিচার কর। (উ. মা ১৯৭৮)

২। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর দুঃখপূর্ণ ব্যক্তিজীবনের পরিচয় দাও। চরিত্রাঙ্কনে ও করুণ রস সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(উ. মা—১৯৮১)

৩। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিপ্রতিভার রসগ্রাহী আলোচনা লিখ।

৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর আবির্ভাব কাল, জীবন ও কবিত্বশক্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

১। বাংলা ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলির উল্লেখ করে তুমি কোনখানিকে শ্রেষ্ঠ মনে কর তা কারণ সহ লিখ। (উ. মা. ১৯৮০)

২। দুটি প্রধান চৈতন্যচরিত কাব্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (উ.মা'৮৩)

৩। চৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা কে? কাব্যটি সম্পর্কে একটি রসগ্রাহী আলোচনা লিখ।

৪। জয়ানন্দের চৈতন্য-চরিত কাব্যের নাম কি? গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা কর। এইকাব্যের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য কি?

৫। চৈতন্য-জীবনী ও বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য চৈতন্য চরিতামৃত কাব্য—আলোচনা কর।

নবম অধ্যায়

১। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের বিশেষত্ব কি? তাঁহাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলিয়া উল্লেখ করিবার কারণ কি তাহা আলোচনা কর। (উ.মা.'৭৯)

২। চৈতন্য পরবর্তী দুই বিখ্যাত পদকর্তার সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। (উ. মা. ১৯৮৩)

৩। জ্ঞান দাসের পদাবলীর পরিচয় দাও—তাঁকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয় কেন?

৪। বাৎসল্য রসের কবি হিসাবে বলরাম দাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

দশম অধ্যায়

১। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় এই কাব্যের অভিনবত্ব কোথায়?

২। রূপরাম চক্রবর্তীর কবি-জীবনী ও প্রতিভার পরিচয় দাও।

৩। ঘনরাম চক্রবর্তীকে ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় কেন? তাঁর কাব্য বিচার করে এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

একাদশ অধ্যায়

১। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যের নাম কি? কবিজীবনী সহ সেই কাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচার কর।

২। শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কোন্ পর্ব অনুবাদ করেছিলেন? সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। মহাভারতের আদি অনুবাদক হিসাবে কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ধরা যায় কি? যুক্তিসহ তোমার অভিমত দাও।

৪। কাশীরাম দাসের মহাভারতের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিচার কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। আরাকান রাজসভার কবিদের দ্বারা বাংলাসাহিত্যের পালাবদল সুরু হয়েছে—আলোচনা কর।

২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরাকান রাজসভার কবিদের উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা রয়েছে—আলোচনা কর।

৩। দৌলত কাজীর জীবনী ও কাব্যের পরিচয় দাও।

৪। সৈয়দ আলাওলের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ কাব্যাবলীর পরিচয় দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। অন্নদামঙ্গল কাব্যের অনুসরণে ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভার পরিচয় দাও।

২। ভারতচন্দ্রকে যুগ সন্ধির কবি বলা হয়—এই উক্তির তাৎপর্য বিচার কর।

৩। মঙ্গলকাব্য হিসাবে অন্নদামঙ্গলের গুরুত্ব কোথায় বিচার কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। শাক্তপদাবলী রচনার সামাজিক পটভূমি বিচার কর।

২। শাক্তগীতিকার রামপ্রসাদের প্রতিভার পরিচয় দাও।

৩। সাধক কমলাকান্ত চক্রবর্তীর শাক্তপদাবলীর পরিচয় দাও।

৪। বাউল বলতে কাদের বোঝায়? তাঁদের ধর্মমত কি? বাউল ধর্মের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কি কি? বাউল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কি?

৫। লালন ফকিরের জীবনী সহ তাঁর সঙ্গীতের ভাবাদর্শ বিচার কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

টীকা লিখ :—

ছান্দস ভাষা, মাগধী-প্রাকৃত, অপভ্রংশ, বৈধীভক্তি, বড়ু চণ্ডীদাস, বড়াই, মৈথিল কোকিল, অভিনব জয়দেব, ব্রজবুলি, বারমাস্যা, বিজয়গুপ্ত, পদাবলীর চণ্ডীদাস, রজকিনী রামী, বলরাম দাস, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কীর্তন গৌরচন্দ্রিকা, দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, রাগানুগা ভক্তি, হুসেন শাহ, লোরচন্দ্রানী, আগমনী, বিজয়া, মনের মানুষ, লালন ফকির, গুণরাজ খান, ছুটিখান, পরাগলি মহাভারত, খেতুরী মহোৎসব, সন্ধ্যাভাষা, লাউসেন, মাথুর, কেতকাদাস, চাঁদসদাগর, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারি শীল, মহামদ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস।

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা

সহায়ক পাঠ

পাঠ্য সূচী

বাংলা সহায়ক পাঠ ঃ ছোটগল্প

সাধারণ আলোচনা ঃ ছোটগল্পের স্বরূপ ঃ

সাহিত্যের মূলতঃ চারটি শাখা—কবিতা, নাটক, গল্পসাহিত্য ও প্রবন্ধ। এই চারটি শাখার আবার প্রত্যেকটির দুটো বিভাগ। মহাকাব্য ও খণ্ড বা গীতিকবিতা, পঞ্চাঙ্ক নাটক ও একাঙ্কিকা, উপন্যাস ও ছোটগল্প, বৃহত্তর প্রবন্ধগ্রন্থ ও ছোট ছোট প্রবন্ধ।

উপন্যাস ও ছোটগল্প আধুনিক কালের সৃষ্টি। যখন থেকে মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন থেকেই গল্প ও উপন্যাসের সৃষ্টি। এককথায় আধুনিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে জাগ্রত ও ব্যক্তিমর্যাদায় স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত মানুষের বিচিত্র সুখদুঃখ ও অন্তর্জীবনের রহস্য নিয়ে গল্প ও উপন্যাসের উদ্‌ভব।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে মানুষের জীবন কাহিনী নিয়ে গদ্যে রচিত আখ্যান বস্তুই গল্প। গল্প শোনা ও গল্প বলা মানুষের চিরায়ত ধর্ম। গল্প বলার সরস ভঙ্গী আবার গল্প শোনার আগ্রহকে দ্বিগুণিত করে তোলে। মানুষের জন্মকালের সঙ্গেই মানুষের গল্প জন্ম নিয়েছে। যখন লিপির উদ্‌ভব হয়নি, তখনও দেখা যায় গুহাবাসী মানুষেরা সন্ধ্যায় সমবেত হয়ে তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেছে। পরবর্তী কালে এইসব কাহিনী নানা উপকথা ও লোককথায় পরিণত হয়েছে। প্রথমে সেইসব আদিম গল্প কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, পরে লিপিবদ্ধ হয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এই ধরনের লিপিবদ্ধ লোকগল্পের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে ৩২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশর দেশে সংকলিত গল্প কাহিনী। তারপর জাতক, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপ, হিতোপদেশ ও বাইবেলের কাহিনী একে একে সংকলিত হয়। সাধারণভাবে উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু গল্পাকারে রচিত। এই সমস্তের মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের সংযোগে কাহিনী গড়ে উঠেছে।

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার—উল্লিখিত গ্রন্থাদির বিষয়বস্তুর মধ্যে গল্পরস থাকলেও সেগুলি ছোটগল্প পদবাচ্য নয়। কারণ ছোটগল্প বিশেষ এক ধরনের আধুনিক শিল্পকর্ম। উনবিংশ শতাব্দীতেই এর জন্ম। যখন মানুষের ভৌমচেতনা জেগেছে, গোষ্ঠীচেতনার প্রথাবদ্ধ জীবন থেকে মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়েছে, তখনই ছোটগল্পের জন্ম।

ছোটগল্প সম্পর্কে দেশবিদেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে তার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। এক কথায় বলা যেতে পারে ছোটগল্প ছোটও হবে গল্পও হবে। ছোটগল্পের আকৃতি কি ধরনের ছোট হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা যায় না। মোটামুটি বলা যায়, উপন্যাসের মতো ছোটগল্প বৃহদাকৃতি হবে না। উপন্যাসে জীবনকে একটা বৃহত্তর পটভূমিতে সামগ্রিকভাবে তার অখণ্ড স্বরূপকে তুলে ধরা হয়। কিন্তু ছোটগল্পে জীবনের এক

খণ্ড ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে জীবন সম্পর্কে এক গভীর রহস্য ও সত্যের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করা হয় ছোটগল্পে একটি খণ্ড ক্ষুদ্র অংশের দিকটিকে আলোকিত করা হয়। এখানে অবান্তর ঘ না ও অনাবশ্যক চরিত্রের আনাগোনা থাকে না। ছোটগল্প অল্প পরিসরের মধ্যে জীবনের ইঙ্গিতপূর্ণ দিকটিকে তুলে ধরে। সেদিক থেকে ছোটগল্প আধুনিক কালের সাহিত্যের এক পারিভাসিক শব্দ। ছোটগল্প আধুনিক কালের এক শিল্প কর্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের যুগলাঙ্গুরীয় আকারে ছোট হলেও ছোট গল্প নয়, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' আকারে বড় হলেও ছোটগল্পের শিল্পগুণের সমস্ত নিদর্শনে এটি সমৃদ্ধ। ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য --

"ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (**Impression**) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"

এই প্রতীতির সমগ্রতাই লেখকের প্রধান পালনীয় শর্ত। ছোটগল্পের মর্ম ও রূপ সম্বন্ধে এই প্রতীতি ধর্মই প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পে তা ঘটনাগত, মনস্তত্ত্বগত বা চরিত্রগত যাহাই অবলম্বনীয় হোক না কেন এতে একটি বিশেষ সমস্যার নাটকীয় ভাবব্যঞ্জনা প্রদীপ্ত হয়ে উঠে।

সোজা কথায় ছোটগল্পে বিশেষ একটি বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। অনাবশ্যক কাহিনীর স্থান এতে নেই, অহেতুক চরিত্রের প্রবেশাধিকার এতে নেই। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ছোটগল্পে জীবনের ছোট একটি দিককে, তার অন্তর্নিহিত অজানা রহস্যটিকে নাটকীয় ভাবব্যঞ্জনার মধ্যে চকিতে উদ্‌ভাসিত করে তোলা হয়। এখানে অপ্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বর দূষণীয়—মানবচরিত্রের ছোট ছোট কান্নাহাসির মধ্যে অতলান্ত জীবন রহস্যের সত্য উদ্‌ঘাটনই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। গল্পকার ছোটগল্পের মধ্যে জীবনের একটি বিশেষ দিক সুপরিমিত বর্ণনাকৌশলে এমন একটা জায়গায় এসে শেষ করেন যে সেই পরিসমাপ্তির মধ্যে জীবনের অনেক অজানা রহস্যের ইঙ্গিতপূর্ণ দ্যোতনা থেকে যায়। ছোটগল্পের পরিসমাপ্তিতে বক্তব্য শেষ হয়েও তাই শেষ হয় না। পাঠকের চিত্তে আরো অনেক কিছু জানার অনুরণন থেকে যায়। এখানেই ছোটগল্পের শিল্প সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্পের রসসৌন্দর্যের স্বরূপ চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবি লিখেছেন—

"ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল।
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘন ঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

"শেষ হয়ে হইল না শেষ'—এই শেষের মধ্যে অশেষের ভাবব্যঞ্জনাই ছোটগল্পের প্রাণ। ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা, যা নিতান্ত সহজ সরল, বাস্তব জগতে ব্যবহারিক বস্তুগত দিক থেকে যার কোনো মূল্যবত্তাই নেই—সেগুলিই লেখকের শিল্প দৃষ্টিতে অসাধারণ ভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ছোটগল্প বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মতোই এক অপূর্ব শিল্প কর্ম। সমালোচকের ভাষায়, গোষ্পদে যেমন নীলাকাশের ছায়া পড়ে, তেমনি একটুখানি ক্ষুদ্র চিত্রপটের মধ্যেই বিশালব্যাপ্ত মহাজীবনের ইঙ্গিত দান করে ছোটগল্প। ছোটগল্পে, তত্ত্ব, চরিত্র, মনস্তত্ত্ব যাহাই থাক না কেন ভাবের মোহময় সৌরভই পাঠক চিত্তকে আকৃষ্ট ও তৃপ্ত করে বেশি। ছোটগল্পের এই পরিমিত শিল্পসৌন্দর্যের জন্য অনেক বড় বড় লেখকও ছোটগল্প সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বৃহৎ বিচিত্র জীবন লীলার জগৎ সাহিত্যে। মানব জীবনে রহস্য ও বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তাই পৃথিবীর বহু দেশের লেখকের রচনায় বক্তব্যের বৈচিত্র্য প্রতীকের নানামুখীতা ও শিল্পকর্মের অর্থাৎ রচনাশৈলীর বিভিন্নতায় ছোটগল্পের মোটামুটি একটা শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে ছোট-গল্পের গবেষক সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"বর্তমান কালের অজস্র জটিলতার মতই ছোটগল্পও অজস্র ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।" মোটামুটি সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ছোটগল্পকে সাধারণভাবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। আজ পর্যন্ত বিশ্ব সাহিত্যে যত ছোটগল্প রচিত হয়েছে সেগুলির বিষয়বস্তু বিচার করে ঘটনামুখ্য গল্প, চরিত্রমুখ্য গল্প ও তত্ত্ব বা ভাবমুখ্য গল্প—এই তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ের গল্প ঘটনার বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল, দ্বিতীয় প্রকারের গল্প মানব চরিত্রের বিশেষ এক দিককে নিয়ে গড়ে উঠে, তৃতীয় পর্যায়ের গল্প কোনো বিশেষ তত্ত্ব, অনুভূতি বা ভাবপ্রবণতাকে নিয়ে গড়ে উঠে। এই তিনটি মুখ্য ভাগকে আবার নানা উপবিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তবে এরকম শ্রেণীবিভাগ কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। যুগের পরিবর্তনে মানুষের রুচির পরিবর্তনে লেখকের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির ফলে কালে কালে ছোটগল্পের আকৃতি ও প্রকৃতিগত কত রকমের বৈচিত্র্য ঘটবে তা বলতে পারা যায় না। যাহক, বৈচিত্র্যগত দিক থেকে বলা যেতে পারে—দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, রোমান্টিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভৌতিক নানান ধরনের গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পও একান্ত ভাবে আধুনিক কালের সৃষ্টি। সমালোচকদের মতে রবীন্দ্রনাথ থেকেই বাংলা ছোটগল্পের শুরু। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের জনক। কিন্তু আরম্ভেরও আরম্ভ থাকে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা ছোটগল্প রচনার একটি অপরিণত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা ভাষায় অজস্র সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়।

সেইসব সাময়িক পত্রে ছোট ছোট গল্প বিচ্ছিন্নভাবে নানা প্রসঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। ছোটগল্পের সমালোচকরা তাকে 'চূর্ণক' নামে অভিহিত করেছেন। এর পরে স্বতন্ত্র ভাবে বেশ বড় গোছের আখ্যান প্রকাশিত হয়। সমকালীন সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি নিয়ে নকসা জাতীয় কিছু রচনাও প্রকাশিত হয়। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপকথা নামে কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলি আকারে উপন্যাস ঠিক নয়,—অন্যদিকে সেগুলি ঠিক ঠিক ছোটগল্পের মর্যাদাও পায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র ভূতের গল্প লিখতে স্বরু করেন, কিন্তু শেষ করে উঠতে পারেননি।

এস্থলে বলা দরকার রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যথাযথ ছোটগল্প রচিত না হলেও বিচ্ছিন্নভাবে নানা রচনায় ছোটগল্প রচনার একটা পূর্ব প্রস্তুতি চলছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি ছোটগল্প লিখেন। ছোটগল্পের রূপ ও রস তার মধ্যে স্বল্পিক মর্যাদা নিয়ে মূল্যায়িত হলে সংখ্যায় অল্প বলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কয়েকটি ভাল ছোটগল্প রচনা করেন।

যা হোক ছোটগল্পের আদর্শ সৃষ্টিতে এবং বাংলাসাহিত্যে তার প্রবাহটিকে ভবিষ্যত কালের দিকে পরিচালিত করার প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথই ছোটগল্পের পথিকৃত। তিনি বাংলা ছোটগল্পের জনক। হিতবাদী পত্রিকার পৃষ্ঠা পূরণের তাগিদে তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গল্পেই স্বতন্ত্র শিল্প রূপটি আবিষ্কার করেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার বিলাত ভ্রমণের পর জমিদারি দেখা শুনার কাজে কবিকে শিলাইদহ অঞ্চলে পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে আসতে হয়। গ্রাম বাংলার মানুষের দুরবস্থার সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন, বাংলার নরনারীর ছোট ছোট সহজ সরল সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা ও নানা সমস্যাকে তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন। সেই সব জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শিলাইদহের অভিজ্ঞতার পর তিনি জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অজস্র গল্প লিখেছেন। সেই সব গল্পের বিষয়বস্তু বিচিত্র, তার স্বাদও বিচিত্র। জীবনের সহজ সরল রূপায়ন যেমন তাঁর গল্পে আছে, তেমনি আছে সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্বিক ও ভৌতিক গল্প। এত বিচিত্র বিষয়ের অসংখ্য গল্প তিনি লিখেছেন যে কবিতা ও সঙ্গীতের পরেই তাঁর ছোটগল্পের স্থান। সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথ যদি আর কিছু নাও লিখতেন, তবে শুধু গল্পগুলির জন্যও তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মর্যাদা পেতেন। 'রামকানাইয়ের নিবু্দ্ধিতা', 'শুভা', 'অতিথি', 'রাজটীকা', 'নিশীথে', 'নষ্টনীড়', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'মাষ্টার মশাই', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'ল্যাবরেটরী' ও 'তিন সঙ্গী' প্রভৃতি গল্পগুলি বিচিত্রপথগামী রবীন্দ্র প্রতিভার জাজল্য নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনায় সার্থক প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি ভিন্নপথের পথিক। তিনি অনেক ছোটগল্প রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণে জীবনের সহজ সরল স্বাভাবিক দিকটির রূপনির্মাতা তিনি। তবে রবীন্দ্রনাথ যেখানে জীবনের অতল-অসীম রহস্য ও মনস্তাত্ত্বিক জগতের স্বরূপ সন্ধানে প্রয়াসী—প্রভাতকুমার সেখানে জীবনের হাস্যকলবর মুখরিত স্নিগ্ধ রূপটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর গল্পে সমাজ-জীবনের কিংবা ব্যক্তিগত ভাবে নরনারীর কোনো দুঃখ বেদনা ও জটিল মনোজীবনের ঘূর্ণাবর্ত নেই। বাঙালী জীবনের ক্ষুদ্রপরিসরে যে বৈষম্য ও অসঙ্গতি, যে অলীক আশা ও কল্পনা এবং দৈব ঘটনা ও ভুলভ্রান্তি হাস্যরসের সৃষ্টি করে প্রভাতকুমার আশ্চর্যভাবে সেগুলিকে নিয়ে অপূর্বভাবে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। তার গল্পে কোনো কঠিন সমস্যা, হৃদয়গত কোনো গভীর রহস্য ও শোক মৃত্যু বেদনার তীব্রতা নেই। আছে সর্বপ্রকার সমস্যা ভারমুক্ত জীবনের সরল তরল কৌতুক প্রবাহ। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের ছোটগল্প সম্পর্কে যথার্থই সুন্দর মন্তব্য করেছেন—

"আমাদের জীবনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ঢেউ লাগে, যে ছোটখাট সমস্যার স্পর্শে ইহা হিল্লোলিত হয়, আশা ও কল্পনা, উচ্চাভিলাষ ও কর্মশক্তি যে ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা জাগাইয়া তোলে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বৈষম্য হাস্যরসের সৃষ্টি করে—তাহার সমস্ত বুদ্‌বুদ্‌ ও উত্তেজনা ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালায় বেশ স্বচ্ছন্দে ও সুশোভন ভাবে ধরিয়া রাখা যায়। এই ছোটগল্পে আর্টে প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক নিপুণতা বিস্ময়কর। তাহার অগভীর আলোচনা প্রবণতাও ছোট গল্পে উৎকর্ষ লাভের সহায়তা করিয়াছে। জীবনের খণ্ডাংশ নির্বাচনে, তাহার ছোটখাট বৈষম্য ও অসঙ্গতির উদ্‌ঘাটনের দ্বারা তাহার উপর মৃদু হাস্যকিরণ সম্পাতে আলোচনা লঘু কোমল স্পর্শে দ্রুত অথচ অকম্পিত রেখাঙ্কণে সকল প্রকার গভীরতা ও আতিশয্যের সযত্ন পরিহারে, আকস্মিক অথচ অভ্রান্ত যবনিকাপাতের সমাপ্তি কৌশলে এই সমস্ত দিক্‌ দিয়াই তিনি উচ্চাঙ্গের নিপুণতার নিদর্শন দিয়াছেন।"

বাস্তবিকই প্রভাতকুমারের গল্পে রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় অনুভূতি নেই, নেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। প্রভাতকুমার তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে আমাদিগকে যে রাজ্যে নিয়ে যান তাকে বয়স্কদের রূপ কথার রাজ্য বলা চলে। এক কথায় প্রভাতকুমারের গল্প হাস্যরস প্রধান। এই হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে কেবল মাত্র ঘটনার অসঙ্গতির জন্য নয়—চরিত্রের সঙ্গেও সেই হাস্য পরিহাস বিশেষভাবে সম্পর্কান্বিত। তাঁর 'আদরিণী', 'মাস্টার মহাশয়', 'দেবী', ও 'কাশীবাসিনী' গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য গল্প। নির্মল হাস্যরসের প্রকাশে তিনি রাজাধিকার।

প্রভাতকুমারের উত্তর সূরী দুজন হাস্যরসাত্মক গল্পকার হলেন—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও পরশুরাম (রাজশেখর বসু)। উদ্‌ভট আজগুবী কল্পনা, লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনীর মিশ্রণে বিচিত্র কৌতুহলপূর্ণ গল্প লিখেছেন ত্রৈলোক্যনাথ

মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'ডমরুধর' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের রসিক পাঠকের সুপরিচিত। পরশুরাম নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও মার্জিত রুচির সহযোগে বাংলা হাসির গল্পে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী, তাঁর 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'কচিসংসদ' ও 'ভূষণ্ডীর মাঠ' প্রভৃতি গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক মর্যাদায় উন্নীত।

রবীন্দ্র সমকালীন অন্যতম গল্পকার কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মূলতঃ উপন্যাস স্রষ্টা। তবুও যে কয়েকটি গল্প তিনি লিখেছেন তাতে তাঁর প্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষর রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভা তাঁর গল্পগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের নির্যাতিত মানুষের বেদনাকে তিনি অফুরন্ত দরদ ও সহানুভূতি সহকারে তুলে ধরেছেন। বিশেষতঃ নারীর নব মূল্যায়ণে তিনি আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম পথ প্রদর্শক। সমাজের শোষিত নির্যাতিত মানুষের হয়ে তিনি এই সমাজের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন রেখেছেন। তাঁর গল্পের মধ্যে 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে চলে। এই সময় 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার নূতন হাওয়া বইতে থাকে। রোমান্টিক ভাব বিলাসের পরিবর্তে কঠিন বাস্তবের দুঃখ দুর্দ্দশা, নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন কাহিনী ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের জটিলতাই সাহিত্যের উপজীব্য বস্তু হয়ে উঠে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য গল্পকার হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গল্পকারেরা। এরা শ্রমিক কৃষাণ ও হাটে বাটে মানুষের কাহিনী নিয়ে গল্প লিখলেন। গল্পে স্থান পেলো অখ্যাত অজ্ঞাত মূক দরিদ্র অজ্ঞ জেলে, মুটে, কারখানার শ্রমিক, শহরের মেহনতী মানুষ ও গ্রামের বিচিত্র ধরনের মানুষ। অতি সাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবন যাত্রার সঙ্গে তাদের অন্তর্জীবনের ভালো মন্দ, দ্বন্দ্ব নিরাশা ঈর্ষ্যা জটিল জীবন রহস্যের পরিচয় পেলাম আমরা।

বিশেষভাবে বলা দরকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তারাশঙ্করের গল্পে বীরভূমের মানুষের আঞ্চলিক জীবন বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত। কোমলে কঠোরে তাঁর গল্পগুলি অনবদ্য। জমিদার, কৃষক, বেদেবেদিনী ও বিচিত্র বৃত্তিধারী বীরভূমের লোকের জীবন কথায় তাঁর গল্প ও উপন্যাস তাৎপর্য মণ্ডিত। বীরভূম অঞ্চলের মাটির গন্ধ পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। নূতন ও পুরাতন অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু জমিদার সম্প্রদায় নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে কিভাবে তাদের পূর্ব ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দারুণ মনোবেদনায় ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে—তারই নিপুণ রস শিল্প স্রষ্টা তারাশঙ্কর। তাছাড়া যারা মাটির কাছাকাছি থাকে, বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, সাপ খেলায় তাদের আদিম জীবন চেতনার রুক্ষতা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ জীবনের ব্যাখ্যাকার। যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের জীবন পরিচালিত—তার জয় পরাজয় উত্থান পতনের মধ্যে সত্যিকারের

কোনো সত্য বস্তু আছে কিনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তারই বিচার বিশ্লেষণ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিক থেকে তিনি বার্নাড শ-এর মতো জীবনের সমালোচক—Critic of life.

ছোটগল্প রচনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত। বিভূতিভূষণ পল্লী বাংলার একান্ত পরিচিত সরল সাদা মাটা মানুষের জীবনকে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে রেখে প্রকৃতি ও মানুষের অচ্ছেদ্য বন্ধন ও তার রমণীয় দিকটিকে পরিস্ফুট করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বলাইচাঁদ সমাজ সচেতন শিল্পী। আমাদের সমাজের মধ্যে যে সব বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বাস করে—তাদের আবেগ প্রবৃত্তি, লোভ ঈর্ষ্যা নীচতা দীনতা ও মহত্বকে তিনি স্বল্প পরিসরে সুপরিমিত বর্ণনা গুণে শিল্প মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর ছোট গল্পগুলি সংক্ষিপ্ত ও একান্ত নিটোল—স্ফটিকখণ্ডের মতো ভাব ব্যঞ্জনাবাহী।

সাম্প্রতিককালে রমাপদ চৌধুরী, দেবেশ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গল্পকারেরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের নিদর্শন রেখেছেন। এ ছাড়া ছোট বড় অনেক লেখক নিয়মিত গল্প লিখে চলেছেন। বর্তমানে বাংলা ছোটগল্প প্রাচুর্যের দিক্ থেকে নব নব সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে বাংলা ছোটগল্প সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যের মৌলিক শিল্প বৈশিষ্ট্যের দিকটিকে অনন্ত সম্ভাবনায় তাৎপর্য মণ্ডিত করে রেখেছে।

শাস্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহুমুখী ও বিচিত্রপথগামী রবীন্দ্র প্রতিভার তুলনা নেই। সাহিত্যের সমস্ত শাখা তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবিতা, নাটক, সংগীত, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে তাঁর প্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষর দেদীপ্যমান। কবি ও অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়টাই বড়। কিন্তু গল্পকার হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বিচিত্রমুখী রবীন্দ্র প্রতিভার অন্যতম ফসল ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্প সর্বপ্রথম শৈল্পিক মর্যাদা পায়। মানব জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র অংশ আশ্রয় করে তার মধ্যে গভীরতর কোনো রহস্যোদ্ঘাটন রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল বললে অন্যায় হবে না। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ছোটর মধ্যে বড়োকে তুচ্ছের মধ্যে অতলান্ত রহস্যকে আবিষ্কার করলেন ছোটগল্প রচনা করে। তিনিই বাংলা ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টা ও রাজাধিরাজ।

রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটগল্প রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন য়ুরোপের নানা দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৮৯১—১৯১৭ সাল পর্যন্ত এই কালপর্বকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। এই সময় তিনি জমিদারী দেখা শোনার কাজে দীর্ঘকাল শিলাইদহ অঞ্চলে অবস্থান করেন। এই সময় কবির সমস্ত রচনায় অসীম মর্ত্যপ্রীতি ও জীবন রস রসিকতার পরিচয় মিলে। গ্রামবাংলার উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রাঙ্গণে বসবাস করে যেমন সকাল বিকাল সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপ সৌন্দর্যের সুধা আকণ্ঠ পান করেছেন, তেমনি গ্রামের মানুষের সান্নিধ্যে এসে তাদের সুখ দুঃখ বেদনা অভাব অভিযোগের পরিচয়ও জানতে পেরেছেন। জমিদারী দেখাশোনার জন্য কবিকে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। মানবতাবাদী কবি দেখেছেন অশিক্ষায় দারিদ্র্যে রোগে শোকে মুহ্যমান মানুষের অবস্থা। তাদের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে লিখেছেন ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে তাঁর পূর্বে পল্লী বাংলার মানুষের কথা নিয়ে কেউ সাহিত্য রচনা করেন নি। কথাটা একেবারেই সত্য। 'গল্পগুচ্ছে'র সমস্ত গল্পের মধ্যে পল্লী বাংলার বিচিত্র মানুষের সাক্ষাৎ মিলে। আমাদের গ্রাম জীবনের অভ্যন্তরে প্রাণলীলার যে বিচিত্র স্ফূরণ চলছে—তারই পরিচয়বাহী 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলি। শুধু পল্লীবাংলার মানুষের জীবন কাহিনী নিয়েই তিনি গল্প লেখেন নি। ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশিত হলে,— সেই পত্রিকায় তিনি শহর জীবন কেন্দ্রিক অনেক গল্প লিখেন। সেগুলির মধ্যে 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর' ও 'হৈমন্তী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অভিনব বক্তব্যে, নূতন রচনা শৈলীতে গল্পগুলি আধুনিক মননের গুণগত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জীবনের

শেষ দিকেও তিনি নূতন টেকনিকে কিছু গল্প লিখলেন। এ সময়ে তাঁর গল্প সংকলন হল—'তিনসঙ্গী'। শাণিত যুক্তি তর্ক ও তির্যক ভঙ্গীর সংলাপে গল্পগুলি পূর্বের থেকে নূতনত্বের স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে তিনজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার স্মরণীয়—আন্টন চেকভ, মোঁপাসা ও এডগার অ্যালন পো। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এঁদের সমপর্যায় ভুক্ত। পূর্বেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ আর কিছু না লিখেও যদি শুধু ছোট গল্পগুলি লিখতেন, তবুও তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে পরিগণিত হতেন। এখানেই ছোটগল্প রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (১) প্রেম—প্রেমের বিচিত্রলীলা অভিব্যক্ত হয়েছে 'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্তিনী' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে। (২) সামাজিক জীবন সম্পর্কিত—এই ধরনের গল্পে স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি মানুষের হৃদয়বৃত্তি ও পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র উদ্‌ঘাটিত। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'ঠাকুর্দা', 'দেনাপাওনা' ও 'হৈমন্তী' প্রভৃতি গল্প এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। (৩) প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কিত—এই পর্যায়ের গল্পে মানুষের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার সঙ্গে বিশাল প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। (৪) অতিপ্রাকৃত ঘটনা মূলক—এই ধরনের গল্পে মানুষের ভৌতিক বিশ্বাস সংস্কারকে কেন্দ্র করে মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

যাহক, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে রহস্যময় মানব হৃদয়ের অসংখ্য লীলা বৈচিত্র্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বাহিরের ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত যে নিবিড় সত্যের কার্যকারিতা রয়েছে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বাস্তব জীবনের আপাত তুচ্ছ ঘটনার অন্তরালে যে বিশাল ভাব সম্পদ বর্তমান রবীন্দ্রনাথ তার স্বরূপ অভিব্যক্ত করেছেন ছোটগল্পগুলিতে।

শাস্তি : রচনা পরিচয়

'শাস্তি' গল্পটি প্রথম পর্যায়ের রচনা। জীবনের সহজ রূপায়ণ ঘটেছে এতে—যদিও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা গল্পটিকে গুরুত্ব দান করেছে। এটি ১৩০০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়টা কবির ছোটগল্প রচনার যুগ। দ্বিতীয়বার বিলাত থেকে ফিরে এসে কবি এ সময় জমিদারী তদারকের জন্য শিলাইদহ অঞ্চলে অবস্থান করেন। প্রকৃতি ও পল্লীজীবনের নিবিড় সান্নিধ্যে বসবাসের ফলে যে অভিজ্ঞতা কবি লাভ করেন তারই রসনিবিড় পরিচয় রয়েছে এই গল্পে। পল্লীবাংলার দরিদ্র সাধারণ মানুষের দুঃসহ জীবনযাত্রা সম্পর্কে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। দিনমজুরী খেটে কোনোরকমভাবে সাধারণ মানুষের জীবন চলে। বাংলার মেহনতী মানুষের জীবন—'বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার'।

কষ্টের সংসারে খেটেখুটেও যথোচিত ভাবে কারুর ভরণপোষন চলে না। অভাবের জন্যই ক্ষিদের জ্বালায় পুরুষ মানুষের মাথা বিগড়ে যায়। অচিন্ত্যনীয় কাণ্ড করে ফেলে। জীবনে ট্রাজিডি ঘনিয়ে আসে। 'শাস্তি' গল্পে গ্রামের অতিসাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বেদনাপূর্ণ জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

সমালোচকরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে গ্রামবাংলার অতি সাধারণ দরিদ্র নিঃস্ব নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তার পরিচয় মিলবে 'শাস্তি' গল্পে। অতি দীন কৃষক পরিবারের বিশ্বস্ত চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

গল্পের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ—দুই ভাই দুখিরাম ও ছিদাম দা হাতে নিয়ে জমিদারের কাছারি ঘর মেরামতের জন্য সকালবেলা বেগার খাটতে বেরিয়ে গেল। তখন দু জায়ের মধ্যে ঝগড়া চলছে। এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই দুই বধূর কলহে গ্রামের সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই দুই বধূর ঝগড় ঝাটির প্রতিক্রিয়া ঘটত দুই ভায়ের মনে। অবশ্য এতে তারা কোনো অসুবিধা ভোগ করত না

এই নিত্য কলহ কোনো কারণে বন্ধ থাকলে কোনো অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা দেখা দিত। গল্পের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এক অশুভ স্তব্ধতা বিরাজ করছিল।

সেদিন দুপুরবেলা এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় গুমোট করছিল। ভরা বর্ষায় পদ্মার জল দুতীর ছাপিয়ে ধান খেতে প্রবেশ করে ডুবিয়ে দিয়েছে। পল্লীর মানুষ জলিধান পেয়েছে কিছু। কিন্তু দুখিরাম ও ছিদামের জমিজমা নেই। দিনমজুরী খেটে দিন চলে। সেদিন জমিদারের বাড়ীতে বেগার খেটে কিছু তারা পায়নি। দুজনে ক্ষিধায় কাতর হয়ে বাড়ী ফিরল। ছোট জা চন্দরা ঝগড়ায় শেষে শ্রান্ত হয়ে মাটিতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে ছিল। আর বড় জা রাধা গম্ভীর মুখে দাওয়ায় ছিল বসে।

বড় ভাই ক্ষুধার্ত দুখিরাম বাড়ীতে ফিরেই রাধার কাছে ভাত চাইল। এতে সে রেগেমেগে জবাব দিল যে বাড়ীতে চাল নেই, কোথেকে ভাত রান্না করবে। সে কি রোজগার করে চাল জোগাড় করবে।

সারাদিন খাটুনিতে ক্লান্ত, তারপর ক্ষুধায় কাতর দুখিরাম। বউয়ের কাছ থেকে এমন কর্কশ ও অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য শুনে প্রচণ্ড রাগে গর্জন করে স্ত্রীর মাথার উপর দায়ের এক কোপ বসিয়ে দিল। রাধা ছিটকে পড়ে গেল চন্দরার কোলের কাছে এবং তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটল।

চন্দরা ভয়ে চীৎকার করে উঠতেই ছিদাম বউয়ের মুখ চেপে ধরল। দুখিরাম দা ফেলে দিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে নির্বাক বসে পড়ল মাটিতে। রাধার ছোট ছেলের ঘুম ভেঙে গেল,—সে কেঁদে উঠল। বাইরে তখন পুরোপুরি শান্তি বিরাজ করছে। গ্রামের লোকেরা নৌকায় ধান নিয়ে এপারে ফিরে এসেছে।

রামলোচন চক্রবর্তী কাছের ডাকঘরে চিঠি ফেলতে এসেছিল। তাঁর মনে পড়ল কোরষণ প্রজা দুখির কাছে খাজনা বাকী আছে। সে তাগাদা দিতে দুখির বাড়ীতে প্রবেশ করল। ঘর অন্ধকার, প্রদীপ জলেনি। তাঁর গা ছম ছম করল। তিনি শুনতে পেলেন চাপা চাপা কান্নার রব রামলোচন দুখিরাম বাড়ী আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। দুখি নিশ্চল হয়ে বসে ছিল। সে শিশুর মতো কেঁদে উঠল। ছিদাম চক্রবর্তীর কাছে এগিয়ে এলেন। দুই বউয়ের ঝগড়ার ব্যাপার তাঁর আগে থেকেই জানা ছিল। বাড়ীর থমথমে ভাবটা তারই ফলশ্রুতি মনে করলেন। চক্রবর্তী কান্নার কারণ জানতে চাইলে, ছিদাম মিথ্যা জবাব দিল যে চন্দরা ঝগড়া করে রাধার মাথায় দার কোপ বসিয়ে দিয়েছে। রাধা মরে গেছে কিনা জানতে চাইলে ছিদাম চক্রবর্তীর পা জড়িয়ে মৃত্যু সংবাদ জানায়। চক্রবর্তী এই সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে নিজেকে বিপন্ন বোধ করলেন। চন্দরাকে কি করে বাঁচানো যায় তার উপায় জানতে চাইলে চক্রবর্তী বললেন অবিলম্বে থানায় গিয়ে জানানো দরকার দুখি ভাত চেয়ে না পেয়ে এই মর্মান্তিক কাণ্ড করেছে।

এরূপ পরামর্শে ছিদাম বিচলিত হল। তার মতে বউ গেলে বউ মিলতে পারে, কিন্তু দাদা গেলে, দাদা আর মিলবে না। স্ত্রীর ঘাড়ে দোষ চাপাতে গিয়ে সে ন্যায় অন্যায় ভালোমন্দ বিচার করার সুযোগ পেল না। অচিরেই গ্রামে রটে গেল চন্দরা ঝগড়া করে রাধাকে মেরে ফেলেছে। শীঘ্রই পুলিশ বাহিনী এসে হাজির হল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সমস্ত গ্রামের লোক জেনেছে চন্দরা সাংঘাতিক অপরাধ করেছে। সে খুনী। ছিদাম ভাবল তাকে নিজের তৈরী মিথ্যার জালে জড়িয়ে মরতে হবে। সবাই যখন মিথ্যে ব্যাপারটা জেনে গেছে– সেটাই সত্য বলে গৃহীত হবে। আর অন্য কিছু বলা চলবে না। মনে মনে ভাবল আর দশটা মিথ্যা কাহিনী জুড়ে স্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে। ছিদাম চন্দরাকে মিথ্যা অপরাধের দায়িত্ব নিতে বলায় সে বিদ্যুতের মতো জলে উঠে। ছিদাম কোনোরকম তাকে আশ্বস্ত করে।

চন্দরার বয়স সতেরো। নিটোল স্বাস্থ্যবতী মহিলা সে কৌতুকপ্রিয় রমণী। জগৎসংসারের সব বিষয় সম্পর্কেই তার কৌতুক ও কৌতূহল অক্ষুণ্ণ। সে ঘোমটার আড়াল দিয়ে সবকিছুকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু বড় জা রাধা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। সে অগোছালো মুখরা স্বভাবের নারী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ছিদাম রামলোচনের পরামর্শে চন্দরাকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে সে বড় জার বঁটির আঘাত ঠকাতে গিয়ে কেমন করে ঠেলে দেয়। তাতেই রাধার মৃত্যু ঘটে পুলিশ এসে জিজ্ঞাসাবাদ করায় চন্দরা খুনের অপরাধ নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়। কারণ হিসাবে জানায় যে বড় জার প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল। এবং আরো জানায় যে বড় জা তার প্রতি কোনো অত্যাচার করেনি। এই জবাবে সবাই বিস্মিত হয়ে যায়। এমন কি দারোগার জোর জেরার উত্তরেও সে একই কথা বার বার বলে।

চন্দরা ছিল খুবই জেদী মেয়ে। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও নিদারুণ অভিমানে সে মনে মনে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে যে সে এই নবযৌবনে ফাঁসীকে বরণ করে এ জন্মের মতো শেষ বন্ধন স্থাপন করল।

বন্দিনী চন্দরা হত্যাপরাধের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে পল্লীর পথ দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন তাকে দেখে লজ্জা, ঘৃণা বা আতঙ্কে সবাই শিহরিত হচ্ছিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা নিজের অপরাধ নিঃশঙ্কে স্বীকার করে। ছিদাম সাক্ষ্য দিতে এসে স্ত্রী যে নির্দোষ সে কথা জানালেও হাকিম তা বিশ্বাস করেনি। রামলোচনও প্রধান ভদ্র সাক্ষী হিসাবে যা বলে তাতেও চন্দরা যে নির্দোষ তা প্রমাণিত হল না। এখন তিনি চন্দরাকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বহু মিথ্যে গল্প ফাঁদবেন ভাবলেন বটে ; কিন্তু চন্দরা এমনই বেঁকে দাঁড়াল যে তিনি আর সেদিকে এগুলেন না। চন্দরা সেশনে চালান হয়ে গেল।

জগৎসংসার যেমন চলছিল, তেমনই চলতে থাকল। চন্দরা জজসাহেবের কাছে বলল যে সে একই কথা বহুবার বলেছে। জজসাহেব তার অপরাধের শাস্তির পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করতে চাইলে চন্দরা জবাব দেয় সে তা জানে না। জজ ফাঁসীর কথা জানালে চন্দরা আকুলভাবে সেটাই প্রার্থনা করল।

আদালতে ছিদামকে দেখে চন্দরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। জজের জিজ্ঞাসার উত্তরে চন্দরা জানায় ছিদাম তার স্বামী। তিনি জানতে চাইলেন ছিদাম চন্দরাকে ভালবাসে কিনা। ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে চন্দরা জানায় ভারি ভালবাসে, সেও স্বামীকে গভীর ভালবাসে। ছিদাম নিজে খুনের দায় নিতে চাইল। বলে, ভাত চেয়ে না পাওয়ায় এই কাণ্ড ঘটে যায়। দুখিরাম একই কারণ দেখিয়ে খুনের অপরাধ স্বীকার করল। অনেক জেরা করে জজ সাহেব উপলব্ধি করলেন দুই ভাই ঘরের বউকে ফাঁসির অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য নিজেরা খুনী সাজতে চাইছে। এদিকে চন্দরা অটল ও অবিচল। সে বার বার পূর্বোক্ত স্বীকারোক্তি করল। ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল। নিয়মানুযায়ী সিভিল সার্জেন চন্দরাকে ফাঁসীর পূর্বে কাকে দেখতে চায় জিজ্ঞাসা করলে চন্দরা মাকে একবার দেখবার বাসনা জানায়। ছিদাম বউকে ফাঁসীর আগে একবার দেখতে চায়। স্বামী সাক্ষাৎপ্রার্থী শুনে চন্দরা বলে 'মরণ'।

প্রশ্নোত্তর

১। **চন্দরার চরিত্র বিশ্লেষণ কর।**

অথবা

'শাস্তি' গল্পের কেন্দ্রবিন্দু চন্দরা—আলোচনা কর।

অথবা

চন্দরার চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর ঃ গ্রামবাংলার এক দরিদ্রতম কৃষাণ পরিবারের কাহিনীকে কেন্দ্র করে 'শাস্তি' গল্পটির সৃষ্টি। দুই ভাই দুখিরাম ও ছিদাম এবং দুই বধূ রাধা ও চন্দরা—এই চারজন ও এক শিশুপুত্র নিয়ে ছোট্ট পরিবার। দিন মজুর খেটে দুই ভাই কোনরকমে আধপেটা খেয়ে কোনোদিন বা না খেয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। দারিদ্র্যপীড়িত এই সংসারে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে যে সর্বনাশের অভিনয় একদিন সংঘটিত হল—সেটাই এই গল্পের উপজীব্য। এই গল্পে পাঠকের সর্বপ্রকার সহানুভূতি ও আন্তরিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু চন্দরা চরিত্রটি। যদিও এই গল্পে ভয়ানক এক কাণ্ডের সৃষ্টি করেছে দুখিরাম। তবুও ঘটনাচক্রে চন্দরার চরিত্রটি সমস্ত গল্পটিকে ট্রাজিডির পরিণতিতে সাহায্য করেছে। স্বামী কর্তৃক মিথ্যা অপরাধের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেওয়ার আদেশকে নির্বিবাদে স্বীকার করে অভিমানক্ষুব্ধ এই নারী অবিচলিতভাবে যেভাবে কথাবার্তায় সর্বজনের সম্মুখে নিজেকে অপরাধী করে তুলল—তার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ নারীচরিত্রের অন্তরতম প্রদেশটিকে আলোকিত করে তুলেছেন। নারীচরিত্রের প্রকৃতি স্বল্প পরিসরে অতি চমৎকারভাবেই উদ্ঘাটিত হয়েছে।

দুই ভাই দুখিরাম ও ছিদামের চরিত্র যেমন পরস্পরের থেকে আলাদা, দুই জা রাধা ও চন্দরার চরিত্রও তেমনি পৃথক ও বিপরীতধর্মী। চন্দরা সপ্তদশী, সন্তানহীন। ভরা যৌবনের নিখুঁত স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। সংসারের অভাব অনটন সত্ত্বেও সে সদা কৌতুকপ্রিয়। তার গতিভঙ্গি একান্ত সহজ ও অনায়াস—"একখানি নূতন তৈরী নৌকার মতো।" অর্থাৎ জীবনের নূতনত্বের স্বাদে সে সর্বদা সচেতন। সংসারের সমস্ত বিষয়ের প্রতি তার কৌতুক ও কৌতূহলের শেষ নেই। সে সমস্ত কিছুকে একান্ত দ্বিধাহীন ভাবে দেখে। জীবনে যা পেয়েছে—জীবন যা হয়েছে তার প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা। জীবনের প্রতি তার কোনো বিরূপ মনোভাব বা বিতৃষ্ণা নেই। সে জীবনপ্রিয় নারী। পক্ষান্তরে বড় বৌ রাধার কোনো বিষয়েই কৌতূহল নেই। সে ঢিলেঢালা অগোছালো ধরনের মেয়ে। একান্ত মুখরা স্বভাবের নারী।

ছিদামকে চন্দরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সে একান্ত পতিগতপ্রাণা স্ত্রী। সে স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না। স্বামীর সামান্য অবহেলা ও অমনোযোগে তার মন অভিমানে ক্ষুব্ধ ও ভারী হয়ে উঠে। ছিদাম ও চন্দরার দাম্পত্য জীবনে একবার কোনো কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ছিদাম কাজের ওজর দেখিয়ে মাঝে মাঝে দূরে চলে যেত। দু একদিন অন্যত্র কাটিয়ে বাড়ী ফিরত। চন্দরা স্বামীর এই গোপন ছলাকলা বুঝতে পারত। চন্দরা সে সময় উল্টো প্রতিশোধ নিতে চঞ্চল হয়ে উঠত। স্বামী বাড়ী ফিরে এলে কারণে-অকারণে নদীর ঘাটে যেত এবং পড়শীর এক ছেলের প্রশংসা করত স্বামীর সামনে। এ আর কিছুই নয় স্ত্রীকে ফেলে যাওয়ার শোধ তুলা। স্বামীর মনকে ঈর্ষ্যায় এভাবে চন্দরা ভরিয়ে তুলত। ছিদাম রেগেমেগে স্ত্রীকে

নদীর ঘাটে যেতে বারণ করত। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে চন্দরা পুনরায় ঘাটে যেত। স্বামীর নিষেধ মানত না। চন্দরা স্বাধীন, একগুঁয়ে প্রকৃতির রহস্যময়ী নারী। ছিদাম তাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেও জব্দ করতে পারেনি। এই চন্দরার উপর ছিদাম মিথ্যা খুনের দায় চাপিয়ে দিল একদিন।

দুই ভাই দুখিরাম ও ছিদাম জমিদারের কাছারি বাড়ী মেরামত করতে গিয়েছিল। পয়সাকড়ি কিছু মেলেনি। তার পরিবর্তে গালিগালাজ জুটেছে বেশি। সন্ধ্যাবেলা দুই ভাই সারাদিনের বেগার খাটার ক্লান্তি, হতাশা ও ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে বাড়ী ফিরে। ক্ষুধায় কাতর দুখিরাম মুখরা রাধার কাছে ভাত চাইতেই সে ইঙ্গিত-পূর্ণ অশ্লীল বক্তব্য রাখে। এতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দুখিরাম বউয়ের মাথায় দার কোপ লাগিয়ে দেয়। রাধা তার ছোট জা চন্দরার কোলের কাছে ছিটকে পড়ে ও অচিরে মারা যায়। চন্দরার কাপড় রক্তাক্ত হয়ে যায়। সে কি হল বলে চীৎকার করে উঠে। ছিদাম তার মুখ চেপে ধরে। ইত্যবসরে রামলোচন চক্রবর্তী বাকী খাজনার তাগিদে সেখানে উপস্থিত হয়। চারদিক অন্ধকার, প্রদীপ জ্বলেনি। তিনি দুখিরামের নাম ধরে ডাকতেই ছিদাম এগিয়ে আসে। মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। রামলোচন দুখিরামের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ছিদাম জানায় ছোট বউ ঝগড়া করে বড়ো বউয়ের মাথায় দা দিয়ে আঘাত করায় বড় বউ মারা গেছে। এই ভয়ানক মিথ্যা কথার পরিণাম সম্পর্কে ছিদামের কোনো পূর্বধারণা ছিল না। সে চেয়েছিল দাদাকে বাঁচাতে। তার সহজ যুক্তি, বউ গেলে বউ পাওয়া যায়, কিন্তু দাদা গেলে দাদা আর পাওয়া যাবে না। দুই বধূতে ছিল প্রচণ্ড অমিল। দৈনিক ঝগড়া-ঝাঁটি চলত। গ্রামের লোকেরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুই বধূর কলহের প্রতিক্রিয়া কোনো ছিল না দুই ভায়ের মনে। দুই স্ত্রীর নিত্য-নৈমিত্তিক কলহ কখনো দুই ভাইকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

ছিদাম চন্দরাকে অপরাধের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে অনুরোধ করলে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার সতেরো বছরের নারী সত্তা স্বামীর এই অন্যায় প্রস্তাবে একেবারে ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল—তাই বাইরে সে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করল না। তার মুখ থেকে একটি কথাও উচ্চারিত হল না। যে নারীর মন স্বামীর সামান্য অবহেলা ও অমনোযোগে ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে—সেই নারীর উপর স্বামী যদি মিথ্যা খুনের দায় চাপিয়ে দেয় তাহলে পৃথিবীতে আর আপনজন বলতে কেউ থাকে না। অন্য কোনো নারী হলে মিথ্যা অপরাধ কাঁধে তুলে নিতে অস্বীকার করত, প্রতিবাদ করত—বিদ্রোহ করত। এটাই নারী প্রকৃতির স্বাভাবিক রীতি। নারীরা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে চায় না। কিন্তু চন্দরা যে পতিগতপ্রাণা নারী। স্বামীই তার ইহকাল, পরকাল, সুখ দুঃখ ধ্যান ধারণার বস্তু। চন্দরা চঞ্চল হলেও পতিপ্রেমে স্থির অচঞ্চল। স্বামী প্রেমে তার ছিল গভীর নিষ্ঠা। চন্দরা মনে করত, আমার স্বামীর চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন

হাতছাড়া হইতে আটক নাই।" কিন্তু বিধি বাম তার প্রতি। যে চন্দরা স্বামীকে আষ্টেপৃষ্টে ভালবাসা দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল—সেই স্বামীই কিনা মিথ্যা খুনের দায় তার উপর চাপিয়ে দিয়ে ফাঁসি কাঠের দিকে ঠেলে দিল। চন্দরার নারী প্রকৃতি সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

"ছিদাম ও চন্দরার যে দাম্পত্য জীবনটি সমইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন অথচ বিপরীতগামী দুই মনের অবিরত সংঘর্ষে বাহিরে চাপা, কিন্তু অন্তরে সদা প্রধূমিত, এক অঘোষিত যুদ্ধের উত্তপ্ত বাষ্পে উচ্ছ্বসিত ছিল তাহার বর্ণনাটি রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম কলা সংযমের সহিত বিবৃত করিয়া আসন্ন ট্রাজেডির ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। এই অন্তর্গূঢ় দাম্পত্য মনোমালিন্য ও সংশয়ের পটভূমিকায় ছিদামের চন্দরার উপর খুনের দায়িত্ব চাপাইবার প্রস্তাব এক মুহূর্তে তাহার রক্তে বিষ জ্বালা ধরাইয়াছে ও তাহাকে মিথ্যা স্বীকৃতি দ্বারা আত্মহনন সংকল্পে স্থির করিয়াছে।"

বাস্তবিকই স্বামীর প্রস্তাবেই চন্দরার জীবন ট্রাজিডির মহাশূন্যতায় ভরে গিয়েছে। তাঁর জীবন সর্বস্বধন স্বামীই যখন তাকে মিথ্যা খুনের অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিতে বলল—তখন তার বাঁচা মরা দুইই সমান। বরং শীঘ্র মৃত্যু হলেই সে মিথ্যা কলংকের দায় থেকে রেহাই পায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে চন্দরা বড্ড একগুঁয়ে মেয়ে। মৃত্যু তাকে বিন্দুমাত্র কম্পিত করেনি। পুলিশ, দারোগা ও জজ সাহেব সবার কাছে সে মিথ্যা অপরাধ স্বীকার করেছে। শুধু তাই নয় দারুণ অভিমানে দুঃখে সে মনে মনে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেছে যে এই নবযৌবনে ফাঁসিকে বরণ করে নিয়ে এ জন্মের মতো শেষ বন্ধন স্থাপন করল। জজ সাহেব তার অপরাধের গুরুত্ব ও শাস্তির কথা জানালে সে আকুলভাবে মৃত্যুই কামনা করেছে।

যে স্বামী মিথ্যা খুনের দায় স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেয়—সে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর কোনো আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছিদামের প্রতি চন্দরার প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল। আদালতে ছিদামকে দেখে চন্দরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এটা অভিমানের দুঃখেরই প্রকাশ। স্বামীকে ভাল না বাসলে স্বামীর প্রস্তাব সে মেনে নিত না। মৃত্যুর পূর্বে অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশে দেখি চন্দরা মাকে দেখতে চেয়েছে, স্বামীকে দেখতে চায় নি। স্বামী ছিদাম সাক্ষাৎপ্রার্থী জেনে সে ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে উচ্চারণ করেছিল—'মরণ'। এই 'মরণ' শব্দের মধ্যেই চন্দরার সমস্ত প্রেম ভালবাসা নিদারুণ দুঃখ ও অভিমানের বাষ্পে সংহত হয়ে আছে। চন্দরার চরিত্রটি 'শাস্তি' গল্পের কেন্দ্রবিন্দু এবং এই চন্দরার চরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ অপূর্বভাবে এক অভিমানাক্ষুব্ধ গ্রাম্য বধূর মনস্তত্ত্ব তুলে ধরেছেন এবং তারই মধ্য দিয়ে চন্দরা চিরকালের পতিগতপ্রাণা নারী হিসেবে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

২। ছিদামের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

অথবা

'ছিদাম ভাবিল যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে

হইবে।"—ছিদামের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে এই উক্তির তাৎপর্য বিচার কর।

উত্তর ঃ 'শাস্তি' গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র ছিদাম। রুই পরিবারের দুই ভাই দুখিরাম ও ছিদাম। বাড়ীতে দুই বধূ রাধা ও চন্দরাকে নিয়ে তাদের দরিদ্র সংসার। দুখিরাম ও ছিদাম দিনমজুর খেটে নিতান্ত কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালায়। 'শাস্তি' গল্পে চন্দরার চরিত্রই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। কিন্তু দুখিরাম ও ছিদামের চরিত্রও কম আকর্ষণীয় নয়।

সংসারে দুই বধূর মধ্যে নিত্য ঝগড়া চলে। তারা পাড়া মাতিয়ে তুলে। এসবে কান দেবার সময় থাকত না দুভায়ের। দিনমজুরী খেটে যাদের সংসার চলে,—তাদের অন্যদিকে মন দিলে চলে না। তবে সংসারে দুই বধূর মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি দুভাইকে বেশ স্পর্শ করত—কিন্তু তারা তাতে একান্ত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনো অসুবিধার মধ্যে গণ্য করত না। বরং যেদিন ঘরে স্তব্ধতা বিরাজ করত, কোনো শব্দমাত্র হত না, সেদিন আকস্মিক একটা আসন্ন উপদ্রবের আশঙ্কা দেখা দিত।

দুখিরাম বড় ভাই। আয়তনে সে কিছু বৃহৎ। কথা বলে কম। সর্বদা নিস্পৃহ উদাসীন। দুখিরাম নিরীহ প্রকৃতির গ্রাম্য সরল সবল আদিম মানুষ। পৃথিবীর কোনো কিছুর দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখার প্রয়োজন সে বোধ করে না। দুটো খেতে পেলেই হল। অন্যদিকে ছিদাম দুখির চেয়ে চালাক ও বুদ্ধিমান লোক। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিপদে বুদ্ধি স্থির রেখে কথা বলতে পারে না।

একদিন দুই ভাই জমিদারের কাছারি বাড়ীতে দিনমজুরী খাটতে যায়। উপযুক্ত মজুরি বা জলখাবার কিছুই তারা পায়নি। সেদিন ঘনঘোর বর্ষা। ঝড়ে জলে পথ ভেঙে সন্ধ্যায় তারা পরিশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে বাড়ী ফিরে। ছিদাম জানে বাড়ীতে খাবার কিছুই নেই। তাই সে ক্ষুধার জ্বালা চেপে রাখে। বাড়ীতে এসে তারা দেখে ছোট বউ চন্দরা মাটিতে আঁচল পেতে চুপ করে পড়ে আছে। বড়ো বউ রাধা মুখ ভার করে বসে। দুখিরামের ক্ষুধা প্রবল, সহ্য করবার শক্তি নেই। স্ত্রী রাধার কাছে ভাত চাইতেই সে কর্কশস্বরে শ্লেষপূর্ণ উক্তি করে। এতে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি দুখিরাম। হাতের দা খানা দিয়ে রাধার মাথায় কোপ বসিয়ে দেয়। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ও কায়িক শ্রমে ক্লান্ত দুখি স্ত্রীর তর্জন ও কটাক্ষে অসহিষ্ণু হয়ে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করে উঠে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে এই অভাবনীয় কাণ্ড করে বসে। রাধা ছিটকে চন্দরার কাছে গিয়ে পড়ে। রক্তে তার কাপড় ভিজে যায়। রাধা সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করে। স্ত্রীর মৃত্যুতে দুখিরাম অস্ফুট অথচ উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে থাকে। আসলে দুখিরাম কোপন প্রকৃতির রূঢ় মানুষ নয়। সে সরল সবল আদিম প্রকৃতির মানুষ বলেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ আচরণ করেছে। ভয়াবহ কিছু ঘটবে সে সম্পর্কে তার ভাবনা চিন্তাই ছিল না। এই ধরনের মানুষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির প্রাবল্যে এরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এমন সব কাজ করে যার পরিণাম চিন্তা করবার সুযোগ পায় না।

রামলোচন চক্রবর্তী বাকী খাজনার তাগিদে তাদের বাড়ীতে এলে ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। ছিদাম দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে খুনের দায় নিজের স্ত্রীর উপর চাপিয়েছে এই বলে যে দুই বউতে ঝগড়া চলার পর রাধা বঁটি দিয়ে চন্দরাকে মারতে এসেছিল। চন্দরা সেটাকে ঠেকাতে গেলে এই ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যায়। ছিদাম একান্ত ভ্রাতৃভক্ত। তার যুক্তি—বউ গেলে, আবার বউ পাওয়া যাবে, কিন্তু দাদা গেলে আর একটা দাদা পাওয়া যাবে না। অবশ্য স্ত্রীকে মিথ্যা খুনের দায় নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সে অবহিত ছিল না। ছিদামের উপরোক্ত উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিদামের মনোজীবনের গভীর প্রদেশটিকেও উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন। ছিদাম ছিল সবল সুন্দর দেহবিশিষ্ট যুবক।

স্ত্রীর দৈহিক সৌন্দর্য সম্পর্কে সে সচেতন। চন্দরা ছিল বন্ধন অসহিষ্ণু। তাই চন্দরাকে নিজশাসনের শৃংখলে বাঁধতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছে ছিদাম। এই কারণে চন্দরার প্রতি তার প্রেমাকর্ষণও অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। কাজের ওজর দেখিয়ে ছিদাম অন্যত্র গিয়ে দু'একদিন কাটিয়ে আসত। এদিকে চন্দরা স্বামীর নিষেধ না মেনে নদীর ঘাটে যেত। স্বামী ফিরে এলে তার কাছে পড়শীর এক ছেলের প্রশংসা করত।

ছিদামের অবচেতন মনে স্ত্রীর প্রতি যে বিরূপতা জমা হয়েছিল—তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছিদাম স্ত্রীকে মিথ্যা খুনের দায় কাঁধে তুলে নিতে বলে।

ছিদাম দুখিরামের মতো নীরব নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়। সে সক্রিয় ও প্রগ্‌লভ চরিত্র। তার চিন্তা আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেকের দংশন আছে, আছে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

ছিদাম রামলোচনের কাছে স্ত্রীকে বাঁচাবার পরামর্শ চাইলে, রামলোচন দুখিরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে নির্দেশ দেয়। এতে ছিদামের মনের সায় ছিল না। দাদা গেলে, দাদাকে আর পাওয়া যাবে না। স্ত্রী গেলে আর একটা স্ত্রী পাওয়া যাবে। তবুও অবিমৃষ্যকারীর মতো স্ত্রীর কাঁধে মিথ্যা খুনের অপরাধ চাপিয়ে ছিদাম নিজের মনেই নানা যুক্তি খুঁজছে এবং প্রবোধ পেতে চেষ্টা করছে। যে ঘটনা ছিদাম সৃষ্টি করেছে—ঘটনা তার অবিমৃষ্যকারিতার ধারা বা পথ দিয়েই অগ্রসর হবে। স্বখাত সলিলে তাকে ডুবে মরতে হবে।

স্বামীর নির্দেশ মতো অভিমানাক্ষুব্ধ চন্দরা অবিচলিত ভাবে মিথ্যা অপরাধ পুলিশ, দারোগা ও জজসাহেবের কাছে স্বীকার করে। স্ত্রীর অনমনীয় মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় ছিদাম নিজে আদালতে অপরাধের দায় নিজের কাঁধে নিতে চায়। সে বলে—'আমি খুন করিয়াছি'। দুখিরামও অনুরূপ উক্তি করে। জজসাহেব উপলব্ধি করে বাড়ীর বধূকে ফাঁসির অপমান থেকে রক্ষা করার জন্য দুভাইর এই স্বীকারোক্তি।

যাহক, মিথ্যা অপরাধের বোঝা স্ত্রীর কাঁধে চাপিয়ে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে প্রচণ্ড বিবেক দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ছিদাম। মিথ্যা অপরাধের দায় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চন্দরা মৃত্যু শাস্তি পেল। কিন্তু তার থেকে ভয়ংকর শাস্তি নিরন্তর

শয়নে স্বপনে জাগরণে বয়ে চলতে হবে ছিদামকে। সপ্তদশী স্ত্রীকে মিথ্যা অপরাধ স্বীকার করিয়ে ছিদাম পরাস্ত হয়েছে বিবেকের কাছে। পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানল তার স্ত্রী চন্দরা খুনী ভয়ংকরী নারী। কিন্তু এ সমস্তের মূলে ছিদাম। ছিদাম যে কতবড় অপরাধী তা কেউ না জানলেও বিবেক শক্তির কাছ থেকে তার রেহাই নেই। জীবন যুদ্ধে পরাজিত হওয়াটা বড় কথা নয়। মানুষের বড় পরাজয়, বড় পতন যখন সে বিবেকের কাছে অপরাধী হয়। বাকী জীবনটা কাটাতে হবে ছিদামকে অন্তরের বিবেক জ্বালার প্রচণ্ড দাবদাহ নিয়ে। বিবেকশূন্য মানুষের জীবনের ক্ষয়ক্ষতির কোনো তুলনা হয় না। এর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। 'শাস্তি' গল্পে ছিদামের জীবনের এই ট্রাজেডি গল্পটিকে অসামান্য শিল্প মর্যাদা দিয়েছে।

৩। রামলোচন চক্রবর্তীর চরিত্র বিচার কর।

উত্তর : 'শাস্তি' গল্পের প্রধান চরিত্র চারটি—দুখিরাম, ছিদাম ও তাদের পত্নীদ্বয় রাধা ও চন্দরা। গল্প উপন্যাসে প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী এগিয়ে চলে এবং শেষে পরিণতি লাভ করে। ঘটনার অগ্রগতিতে, চরিত্রের বিকাশে ও কাহিনীর পরিণতিতে অনেক অপ্রধান বা পার্শ্ব চরিত্র বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। 'শাস্তি' গল্পে সেরূপ একটি অপ্রধান বা পার্শ্ব চরিত্র রামলোচন চক্রবর্তী।

রামলোচন চক্রবর্তী গ্রামের জমিদার না হলেও সেকালের মধ্যস্বত্বভোগী একজন সম্পন্ন গৃহস্থ মানুষ। তার দু' এক ঘর কোর্ফা প্রজা আছে। দুখিরাম ছিদাম তাঁর কোর্ফা প্রজা। সন্ধ্যাবেলায় রামলোচন তামাক খেতে গিয়ে বাকী খাজনা আদায়ের কথা মনে পড়ায় দুখিরামের বাড়ীতে হাজির হয়। দরিদ্র কোর্ফা প্রজা দুখিরামের অভাব অনটনের সংসার সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন। তবুও ঝড় জলের দুর্দিনে নিতান্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত প্রজার বাড়ীতে খাজনা আদায়ে হাজির হয়েছেন। এতে তার মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামবাংলায় এরূপ খুড়োর অভাব নেই। যারা নিজের স্বার্থ, টাকা ছাড়া অপরের দুঃখ দারিদ্র্য সম্পর্কে উদাসীন বললে চলে। এরা নির্মম নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। তবুও মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ এই মানুষটির মধ্যে সামান্যতম মানবতাবোধটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন। চন্দরার প্রতি রামলোচন স্নেহভাবাপন্ন ছিলেন। তাই দুখিরামের বাড়ীতে এসে যখন তিনি ছিদামের কাছে শুনলেন চন্দরাই রাধার বঁটির মার ঠেকাতে গিয়ে রাধাকে মেরে ফেলেছে, তখন চন্দরাকে বাঁচাবার পরামর্শ দিলেন।

মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে রামলোচন গ্রামের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাই ছিদাম পরামর্শ প্রার্থী হয়। তিনি ছিদামের কথা শুনে ভাবলেন, ছিদাম স্ত্রীকে বাঁচাতে চায়। তাই বললেন, ছিদাম যেন তক্ষুণি থানায় গিয়ে সংবাদ দেয় যে দুখিরাম ভাত খেতে চেয়ে না পেয়ে বড় বৌ রাধার মাথায় দা বসিয়ে দেয়। তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। রামলোচন ছিদামকে আশ্বাস দেয় যে এতেই চন্দরা বেঁচে যাবে। ছিদাম কিন্তু রামলোচনের পরামর্শ মানতে রাজী না হওয়ায় চন্দরাই খুন করেছে থানায় এরূপ বলার পরামর্শ দিয়ে রামলোচন সেখান থেকে প্রস্থান করে। অচিরে

গ্রামে সংবাদ ছড়িয়ে যায় যে চন্দরা রাধাকে খুন করে ফেলেছে। গ্রামে সংবাদ রটানোর ব্যাপারে রামলোচনের যে বড় ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এই সমস্ত লোক এরূপ ধরনের—কোনো কিছু গোপন রাখতে পারে না। অপরকে বাঁচাবার কোনো চিন্তা এদের নেই। পরন্তু এরা ঘটনাকে জটিল করে তুলে। রামলোচন চক্রবর্তী গৌণ চরিত্র হলেও ঘটনার জটিলতা সৃষ্টি ও অগ্রগতিতে তার ভূমিকা বড়। ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি কুরিদের বাড়ী যান এবং মামলার ভদ্রসাক্ষী হিসাবে তিনি গণ্য হন। রামলোচন আদালতে হাকিমের সামনে এমন সাক্ষ্যই দিলেন যে তাতে চন্দরা খুনী সাব্যস্ত হল। ছিদাম যা বলেছিল, তিনি হুবহু সবই বলে গেলেন। ছিদামকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা বেমালুম ভুলে গেলেন। চক্রবর্তীবাবু ধুরন্দর মামলাবাজ লোক—তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারেন না। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের ভূমিকাই তার অবলম্বন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তিনি শেষপর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের সম্মান লাভ করতে সমর্থ হন নি। চন্দরার প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল। তাই চন্দরাকে বাঁচাবার জন্য তিনি অনেকগুলি মিথ্যে গল্প ফেঁদে রেখেছিলেন। কিন্তু চন্দরা যখন নিজেই বেঁকে বসল, দেখলেন চন্দরা নিজেই বাঁচতে চায় না, তখন সেগুলি আর বললেন না। তখন জানা কাহিনীর উপর আরো কিছু স্বকপোল কল্পিত কাহিনী জুড়ে ছিদামের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলে গেলেন। মিথ্যা সাক্ষ্যদানের ভয় রামলোচনের ছিল। কিন্তু তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যই দিলেন, নিজেকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির রূপে প্রতিপন্ন করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ রামলোচন চক্রবর্তীকে মধ্যসত্বভোগী একজন আত্মকেন্দ্রিক ও সরল নিরীহ মানুষ রূপে চিত্রিত করেছেন। এরা সত্যের ভান করে সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী। সুবিধাবাদী মানুষরা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখে নিজেকে ভদ্রবেশী ভালো মানুষ প্রতিপন্ন করতে চায়। ঘটনা প্রতিকূল হলে নিজের প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়—অপরকে দোষী প্রতিপন্ন করে। ধরি হাল না ছুঁই পাণির মতো এদের কারবার জীবনের সঙ্গে।

৪। **'শাস্তি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।**

উত্তর ঃ লেখক কোনো কিছু রচনা করে তার নামকরণে বিশেষ ভাবে চিন্তা করেন। রচনার নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, নামকরণই সমস্ত রচনার অন্তর্নিহিত ভাববস্তুকে ব্যঞ্জনাদ্যোতিত করে তুলে। নামকরণ ব্যাপারটা তাই তুচ্ছ নয়। 'নামকরণ' যাতে শিল্প সম্মত হয়, নিতান্ত সূচীপত্রধর্মী না হয় সেদিকে লেখকের দৃষ্টি থাকে বেশি।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের ও রচনার নামকরণ দেখলেই বোঝা যায় তিনি কত সুন্দর ভাবেই নিজের সৃষ্টবস্তুর নামকরণ করেছেন। এমন কি কোনো কোনো রচনার বারবার নামকরণ পরিবর্তন করেছেন। 'রক্তকরবী' নাটকটির প্রথম নাম ছিল 'যক্ষপুরী', পরে নাম হয় 'নন্দিনী', সবশেষে নাম রাখেন 'রক্তকরবী'।

যাহক, 'শাস্তি'—এই গল্পটির নামকরণ বিশেষ ভাবব্যঞ্জনাবাহী। সাধারণতঃ

গল্পের নামকরণ হয় চরিত্র, ঘটনা বা অন্তর্নিহিত ভাববস্তুকে কেন্দ্র করে। আলোচ্য গল্পের নামকরণ হয়েছে ভাববস্তুকে কেন্দ্র করে।

একটি দরিদ্র হরিজন পরিবারের আকস্মিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'শাস্তি' গল্পটির সৃষ্টি। দুখিরাম ও ছিদামের পত্নীদ্বয় রাধা ও চন্দরার মধ্যে আদৌ মনের মিল ছিল না। নিত্য নৈমিত্তিক কলহ লেগেই থাকত। পাড়া প্রতিবেশীর লোকেরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। দুই স্ত্রীর ঝগড়া দুই ভাইকে স্পর্শ করত না। ছিদাম ছিল দাদা-অন্তপ্রাণ মানুষ। দিনমজুরী খেটে দু'ভাই কোনো রকমে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাত। ছিদামের প্রতি চন্দরার ভক্তি ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম ও গভীর। ছিদাম ছিল সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী যুবা পুরুষ,—সে চঞ্চল প্রগল্‌ভ। পক্ষান্তরে চন্দরা ছিল স্বাধীন চঞ্চল সপ্তদশী যৌবনবতী গ্রাম্য বধূ। চন্দরাকে নিজের শাসনে রাখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ছিদাম। ফলতঃ স্ত্রীর প্রতি তার প্রেমাকর্ষণে ভাঁটা পড়ে। ছিদাম কাজের অজুহাতে অন্যত্র গিয়ে দু-একদিন কাটিয়ে আসত। সেই অবসরে স্বামীর নিষেধ না মেনে চন্দরা নদীর ঘাটে যেত। স্বামী ফিরে এলে তার কাছে পড়শীর এক ছেলের প্রশংসা করে স্বামীর ঈর্ষা জাগিয়ে তুলত।

একদিন দিনমজুরী খেটে দু ভাই কিছুই পায়নি। পরিশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে তারা বাড়ী ফিরে আসে সন্ধ্যায়। চন্দরা মাটিতে আঁচল পাতিয়ে শুয়ে থাকে। বড় বৌ রাধা মুখ ভার করে বসে থাকে। দুখিরাম ভাত খেতে চাইলে রাধা শ্লেষগর্ভ অশ্লীল মন্তব্য করে। এতে ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে দুখিরাম স্ত্রীর মাথায় দার কোপ বসিয়ে দেয়। রাধা মৃত্যু বরণ করে। এমন সময়ে খাজনার তাগাদা দিতে রামলোচন চক্রবর্তী তাদের বাড়ীতে হাজির হয়। ছিদাম জানায় চন্দরা বড় বৌর বঁটির আঘাত ঠেকাতে গিয়ে রাধাকে মেরে ফেলে। রামলোচন পরামর্শ দেয় অবিলম্বে থানায় গিয়ে ছিদাম যেন জানায় যে ভাত চেয়ে না পেয়ে দুখিরাম রাধাকে দার কোপে মেরে ফেলে। ছিদাম এতে রাজী হয় না। সে চন্দরাকে মিথ্যা খুনের অপরাধ তুলে নিতে অনুরোধ করে। অভিমানাক্ষুব্ধ চন্দরা অবিচলিত চিত্তে তা মেনে নেয়। আদালতে রাধা খুনের অপরাধী হিসাবে নিজেকেই প্রতিপন্ন করে। দুখিরাম ও ছিদামের অপরাধের স্বীকারোক্তি হাকিম গ্রাহ্য করেন না। আদালতের রায়ে ফাঁসির হুকুম হয় চন্দরার। চন্দরা দুঃখে ক্ষোভে রাগে অভিমানে স্বামীর প্রতি ফিরে তাকায়নি। যাহক, খুনের শাস্তি স্বরূপ ফাঁসি কাঠে মৃত্যুবরণ করতে হল চন্দরাকে। বাহিরের সংসারে সবাই জানল, খুনের অপরাধে মৃত্যু শাস্তি পেয়েছে চন্দরা। চন্দরাও জেনে গেল মিথ্যা অপরাধের স্বীকারোক্তি করে সে মৃত্যুবরণ করল। 'জগৎ ভরিয়া তার কলংক রহিল।' অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে ভাসুরকে বাঁচাতে গিয়ে সে মিথ্যা খুনের দায়িত্ব মাথায় নিয়েছে—মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে। কিন্তু এর থেকেও বড়ো শাস্তি পেয়েছে ছিদাম। পতিগত প্রাণা সতীসাধ্বী স্ত্রী চন্দরার মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। ছিদামই স্ত্রীকে মিথ্যা অপরাধের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য করেছে। বিবেকের কাছে সে অপরাধী। এক অপরাধী মানুষ নিজের দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে সে নির্দোষ নারীকে

জগৎ সম্মুখে খুনী অপরাধী হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। এই সাংঘাতিক অপরাধের বিচার ও শাস্তির জন্য তাঁকে মানুষের আদালতে হাজির হতে হবে না। কিন্তু বিবেকের আদালতে তার রেহাই নেই। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন প্রতিনিয়ত তাকে বিবেকের দংশনে অন্তরে জর্জরিত হয়ে থাকতে হবে। এ শাস্তি সাংঘাতিক—এখানেই তার জীবনের ট্রাজিডি। ছিদামের অন্তর্জীবনের বিধ্বস্ত ইতিহাসই 'শাস্তি' গল্পের নামকরণের ভাবদ্যোতনাকে অনবদ্য ট্রাজিকচেতনায় শিল্পসৌন্দর্য দান করেছে। ছিদামের এই নৈতিক অপমৃত্যুর জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের যে ঘূর্ণিঝড় তার জীবনে প্রবাহিত হল জীবন অবসানের পূর্বে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে না। এই কঠিন শাস্তির বোঝা তাকে বহন করে চলতে হবে। নিত্য যন্ত্রণাদগ্ধ ছিদামের জীবন আশাহীন আলোহীন আনন্দহীন এক বিরাট ভারবহ বস্তু হিসাবেই ইহজগতে পড়ে রইল। এইখানেই 'শাস্তি' নামকরণের ভাবব্যঞ্জনা শিল্পশ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

৫। 'শাস্তি' গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নিবিড় ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হয়েছে। আলোচনা কর।

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্টা এই যে প্রকৃতি ও মানুষকে তিনি একই ভাববস্তুর নিগূঢ় তাৎপর্যে অন্বিত করে তুলেছেন। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানুষকে অভিন্নার্থক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। মানুষের সুখদুঃখ ও বিচিত্র আশা অনুভূতির সঙ্গে প্রকৃতিও যেন সমান সুরে কথা বলে। ইংরেজ সমালোচকের মতে—"Both the nature and the human being are the same portion of the Universal soul."

যাহক, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের একটি বড় বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা। বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতি অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর গল্পগুলির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীজীবনের সঙ্গে কত নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ বহন করে গল্প সাহিত্য। এ সম্পর্কে রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যতম সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি স্মরণীয়—"...তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার সহিত বিশাল বহিঃপ্রকৃতির একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাবলীরও আশ্চর্যরূপ রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। নিতান্ত অনায়াসে সামান্য দুই একটি রেখাপাতের দ্বারা তিনি মানবমনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সিংহদ্বারটি খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার তুচ্ছ গ্রাম্য কাহিনীও প্রকৃতির সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র খচিত চন্দ্রাতপতলে, তাহার আভাস-ইঙ্গিত-আবাহনবিজড়িত রহস্যময় আকাশ বাতাসের মধ্যে এক অপরূপ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ তিরিশ বছরে গল্প রচনায় হাত দেন। এ সময় তিনি ছিলেন পদ্মাবক্ষে। জমিদারী দেখাশোনার জন্য শিলাইদহ অঞ্চলে তাঁকে দীর্ঘকাল থাকতে হয়। পদ্মার উদার আতিথ্যে নীল অবারিত আকাশের নীচে থেকে দিগন্তবিস্তারী বঙ্গপ্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করেছেন। দেখেছেন ঋতুতে ঋতুতে বঙ্গপ্রকৃতি কত সাজে সজ্জিত

হয়ে উঠে, কত ভাবরসে তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। কবি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন—

"এক সময় আমি মাসের পর মাস পল্লীজীবনের গল্প রচনা করেছি। এর পূর্বে বাংলাসাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়নি।"

কবির এই উক্তি সর্বৈব সত্য। যাহক, ছোটগল্পে প্রকৃতির যে পটভূমি রচিত হয় তার সঙ্গে মানবচরিত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক থাকা চাই। গল্পে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকৃতির কোনো মূল্য নেই। 'শাস্তি' গল্পের কাহিনী, চরিত্র, পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতি আশ্চর্যভাবে গভীর ঐক্যসূত্রে জড়িত।

পল্লীবাংলার এক অখ্যাত ও নিতান্ত দুঃস্থ হরিজন পরিবারকে নিয়ে এই গল্প লিখিত। এই দারিদ্র্যগ্রস্ত পরিবারে বর্ষাকালের এক সন্ধ্যায় আকস্মিক দুর্যোগ নেমে আসে। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই পরিবারের বিপদের সঙ্গে বর্ষাপ্রকৃতির ঘনঘটা নিবিড় সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে।

রুই পরিবারের চারজন মানুষ—দুখিরাম, ছিদাম ও এদের স্ত্রী রাধা ও চন্দরাকে নিয়ে গল্পবস্তু রচিত। দুই জায়ের মধ্যে মনের মিল নেই— নিত্য কলহ ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। দুখিরাম ও ছিদামের এটা গা সওয়া হয়ে গেছে। গ্রামের লোকেরা এতে অভ্যস্ত। একদিন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় জমিদারের কাছারি ঘর তৈরী করে দু ভাই ফিরে আসে। আহার ও টাকাপয়সা জুটেনি। ক্ষুধিত দুখিরাম রাধার কাছে ভাত চেয়েছিল। পরিবর্তে অশ্লীলপূর্ণ বক্তব্য শুনে ক্রোধে দা দিয়ে তাকে হত্যা করে। আর দাদা-অন্তপ্রাণ ছিদাম দুখিরামকে বাঁচাতে গিয়ে স্ত্রীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে—মানব চরিত্রের অন্তর্জীবনের যে অভিব্যক্তি ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির পটভূমিকে অনিবার্যরূপে টেনে এনেছেন।

দুই জা রাধা ও চন্দরা বিপরীত স্বভাবের নারী বলেই নিত্য কলহ বাধে। একথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে সংকেতধর্মী করে তুলেছেন—"আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল—সেদিন বাহিরেও অত্যন্ত গুমোট। দুই প্রহরের সময় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।" দুই জা কলহের পর স্থির গম্ভীর হয়ে যায়। হয়তো পরে ঝড় উঠবে। এক পশলা বৃষ্টির পর গুমোট। বর্ষণের পর আকাশে মেঘ ছিল। সেই মেঘে জল সঞ্চিত ছিল বা বজ্রপাতের সম্ভাবনাও ছিল। তখন বাতাস বইছিল না। আরো পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা আছে। ঘরের চারপাশে আগাছার জঙ্গল। পাটক্ষেত থেকে ভিজে গাছ গাছালির গন্ধ ভেসে আসছিল। গন্ধ বায়ু প্রবাহ শূন্যতায় নিশ্চল মন্থর হয়ে আছে। ডোবায় একটানা ব্যাঙের কলরব। সন্ধ্যার স্তব্ধতাকে ঝিল্লীরব পূর্ণতা দিয়াছে। এ সমস্তই আসন্ন মহাবিপদেরই এক **contrast** ধর্মী সংকেত। পরক্ষণেই কবি লিখেছেন—"অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে।" পদ্মার এই ভয়ঙ্কর ভাব রুই পরিবারের আসন্ন মহাবিপদেরই পূর্ব প্রতিভূ

রুই পরিবারের নিদারুণ দারিদ্র্যের অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে প্রকৃতিকে কবি অল্পবিস্তর টেনে এনেছেন। প্রকৃতির দুলালী পদ্মাতীরের জলিধান গ্রামবাসীরা কিছু কিছু পেয়েছে। কিন্তু দুই ভাই কিছুই পায়নি। পরন্তু বেগার খেটে বাড়ী ফিরেছে শূন্য হাতে অফুরন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়ে। গল্পের নায়িকা চন্দরার সৌন্দর্য ও চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরের আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য স্মরণ করেছেন। সপ্তদশী যৌবনবতী চন্দরা—"একখানি নূতন তৈরী নৌকার মতো"। চন্দরা নূতন নৌকা, সুন্দর নিটোল। কিন্তু তার মাঝি ছিদাম তাকে জীবন নদীতে চালাতে পারঙ্গম নয়।

দুঃখিরামের দার কোপে যখন রাধা মারা গেল—তখন বাইরে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিল। জনসাধারণের জীবনযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শান্তরূপ বর্ণনা করেছেন। একদিকে প্রকৃতির শান্তরূপ, অন্যদিকে প্রকৃতির মধ্যে ভয়ানকতার কল্পনা মানবজীবনের চরিত্রানুযায়ী ভাববস্তুকেই তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। আপাতবিপরীতধর্মী প্রকৃতির এই দুই রূপ আসলে মানবচরিত্রের অনুষঙ্গ হয়েই রুই পরিবারের সর্বনাশের ঘটনাবস্তুকে বর্ণদীপ্ত করে তুলেছে।

আদালতে হাজির ছিদামের মনোভাবটি রবীন্দ্রনাথ নিসর্গশোভার মাত্র দু একটি বর্ণনায় চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করেছেন। আদালতে বিচার ব্যাপারটি ছিদামের কাছে স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিল। কারণ এই রূঢ় বাস্তবের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। নাটকীয়ভাবে যে দুর্ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে গেল—তার জন্য কেহই স্বপ্নেও ভাবেনি। তবুও ঘটে গেল—ঠিক যেন একটি জলজ্যান্ত স্বপ্ন।

চন্দরার ফাঁসীর হুকুম হল মিথ্যা মৃত্যু অপরাধ স্বীকার করার জন্য। চন্দরা সপ্তদশী যুবতী। যৌবনের রঙনেশায় যখন মানুষ মেতে উঠে—তখনই জীবনের আরম্ভে তার জীবন শেষ হয়ে গেল। ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তা ঝরে পড়ল। মানুষের এই বিপর্যয়ে প্রকৃতি উদাসীন। তখন বসন্তকাল। গাছে গাছে পুষ্প সম্ভার। কোকিল ডাকছে। বাহিরে বসন্ত, চন্দরার জীবনেও বসন্ত ঋতু। ভরা যৌবনের বসন্ত ঋতু নিয়ে চন্দরা পৃথিবী থেকে চলে গেল। আর নিদারণ মর্মজ্বালার রোদনভরা বসন্ত নিয়ে পড়ে রইল ছিদাম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনরূপ আইন আদালত নেই।"

মানবজীবনের বিচিত্র ঘটনা, তার সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য উত্থান-পতন ও জয়-পরাজয়ের সঙ্গে প্রকৃতিও কথা বলে। ব্যক্তি সুখ ও ব্যক্তি দুঃখকে কবিরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে উপস্থাপিত করে তাকে বিশ্বব্যাপ্ত করে চিরায়ত জীবনসত্যের মহিমায় উন্নীত করেন। রবীন্দ্রনাথের শাস্তি গল্পে যেভাবে ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলী প্রকৃতির বৃহৎ পরিধিতে অখণ্ড সত্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬—১৯৩৮)

লেখক পরিচিতি ঃ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপরাজেয় কথাশিল্পী। রবীন্দ্র সমকালীন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তিনি এক নূতন ধারার প্রবর্তক। তিনি ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মাতা—ভুবনেশ্বরী দেবী। কৈশোর ও যৌবনে তিনি ভাগলপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। প্রথম জীবনে ব্রহ্মদেশে চাকুরী করতেন। অতঃপর সাহিত্য সাধনাতেই তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহু উপন্যাস গ্রন্থের রচয়িতা। বেশ কিছু উন্নতমানের ছোটগল্পও লিখেন। 'বড়দিদি', 'পণ্ডিত মশাই,' 'চন্দ্রনাথ,' 'শ্রীকান্ত,' 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ,' 'পথের দাবী' ও 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। 'নারীর মূল্য' ও 'স্বদেশ ও সাহিত্য' তাঁর রচিত প্রবন্ধ পুস্তক।

বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব এক বিশেষ সময়ে—যখন বঙ্কিমচন্দ্র অস্তমিত এবং রবীন্দ্রপ্রতিভা মধ্যগগনে। প্রথমে 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র উপলক্ষে 'মন্দির' নামে একটি গল্প লিখে (ছদ্মনামে) বাঙালীর হৃদয় জয় করেন। সেসময় 'ভারতী' নামক সাময়িকপত্র বিশেষ সাহিত্যাদর্শের ধারক ও বাহক ছিল। ফরাসী সাহিত্যের মার্জিত শিল্পরুচি ও রোমান্সপ্রিয়তার একান্ত অনুরাগী ছিলেন 'ভারতী'র লেখক সম্প্রদায়। সেই 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' প্রকাশিত হ'লে পাঠকরা নূতন সাহিত্যরসের আস্বাদনে পরম তৃপ্তি লাভ করল। অতঃপর বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হলে অচিরেই শরৎচন্দ্র জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করেন।

শরৎচন্দ্রকে বলা হয় দরদী কথাশিল্পী। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের যুগে তিনি নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করলেন সাহিত্য জগতে। নিষিদ্ধ সমাজ বিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণে, নারীচরিত্রের নবমূল্যায়নে শরৎচন্দ্র অদ্ভুত সাহসিকতা; অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের অতিসাধারণ নরনারীর চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি নূতনতর জীবন সত্যের বার্তাবাহী। আমাদের পারিবারিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, নরনারীর প্রেম সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নারীর সতীত্ব সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা তাঁর গল্প উপন্যাস-গুলিকে অনন্যসুলভ মৌলিকতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকে তিনি বঙ্কিম রবীন্দ্র থেকে অনেক ভিতরে সাধারণ মানব সম্প্রদায়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে জীবনের অন্তর্নিহিত রহস্য ও মহিমার সন্ধান করেছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রগুলি বাস্তব। তাঁর নিজের মতে চরিত্রগুলি ৯৯% বাস্তব। কাজেই সেদিক্ থেকে শরৎচন্দ্রকে রিয়ালিষ্টিক সাহিত্যিক বলা যেতে

পারে। রিয়ালিষ্টিক হলেও তিনি বাস্তবের হুবহু নকল করেন নি। শুধু চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে তিনি বাংলার পল্লীর মানুষকে দেখেছেন। তাদের ব্যর্থবেদনার জীবনচিত্র অঙ্কিত করেছেন। এদিক থেকে তিনি আদর্শবাদীও বটেন। উপদ্রুত নির্যাতিত নরনারীর ব্যথাহত জীবনের শিল্পী শরৎচন্দ্র। তাঁর নিজের ভাষায়, যারা শুধু দিলে, কিছুই পেল না, সংসারে এত থেকেও যারা বুঝতে পারল না কেন তাদের কোনো কিছুতে অধিকার নেই। তাদের অসীম দুঃখযন্ত্রণাই শরৎচন্দ্রের লেখনীর মুখ খুলে দিয়েছে। শরৎচন্দ্র মানবতার সাধক। তাঁর সাহিত্যে আমরা দেখি অজস্র মানুষ—তারা লাঞ্ছিত উৎপীড়িত অত্যাচারিত নানাভাবে, তারা আমাদের কাছে প্রীতি সহানুভূতি ও সমবেদনা চায়। শরৎচন্দ্র এভাবেই সমাজে লাঞ্ছিত মানুষের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সমাধানের কোনো কথা বলেন নি। তিনি কেবল নির্যাতিত মানুষের জন্য আমাদের সহানুভূতি জাগ্রত করেছেন। তিনি জীবনদ্রষ্টা ও জীবনের রসস্রষ্টা। সমাজ তাপের বাঁধন রসের বর্ষণে কেটে যাবে একদিন—যখন মানুষের মন তৈরী হবে—এটাই ছিল শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায়। এখানেই শরৎসাহিত্যের সার্থকতা। শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের হৃদয় থেকে নূতন রসের ধারা প্রবাহিত করে বাংলাউপন্যাসের ভবিষ্যৎ গতিপথ বহুদূর প্রসারিত করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"তিনি আমাদের পারিবারিক জীবনে অকিঞ্চিৎকর বাহ্য ঘটনার মধ্যে গূঢ় ভাবের লীলা দেখাইয়াছেন ; আমাদের নারী চরিত্রের জড়তা ও নির্জীবতা ঘুচাইয়া তাহার দৃপ্ত তেজস্বিতা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া একসঙ্গে স্বাধীন চিন্তা ও করুণ রসের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। সর্বশেষে তিনি প্রেমবিশ্লেষণের দ্বারা প্রেমের রহস্যময় গতি ও প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।"

"মহেশ" কাহিনী সংক্ষেপ ঃ

ছোট্ট এক গ্রাম নাম কাশীপুর। সে গ্রামের জমিদার তেমন বিত্তশালী নয়। কিন্তু প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ—'তার দাপটে প্রজারা টু শব্দটি করতে পারে না।' সেই জমিদারের ছোটছেলের জন্মতিথির পূজার্চনা সেরে পুরোহিত তর্করত্নমশায় বাড়ী ফিরছিলেন। বৈশাখ শেষ হয় হয়। তবুও আকাশে এতটুকুও মেঘ নেই। সামনের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ অনাবৃষ্টির ফলে রৌদ্রতাপে ফুটিফাটা হয়ে গেছে। দুপুরে আকাশে রৌদ্ররেখা রি রি করতে থাকে। তাকালে নেশা ধরে যায়। এই গ্রামের একটি প্রান্তে পথের ধারে গফুর জোলার খড়ে ছাওয়া জীর্ণ বাড়ী। তর্করত্ন গফুরের বাড়ীর সামনে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গফুরকে গফরা বলে তাচ্ছিল্যভরে ডাকলেন। গফুরের দশ বছরের ছোট মেয়ে আমিনা সাড়া দিয়ে জানাল যে তার পিতা জ্বরে আক্রান্ত। তর্করত্নের নির্মম নির্বন্ধে রোগগ্রস্ত গফুর কাঁপতে কাঁপতে বের হয়ে এল। তর্করত্ন গফুরের ষাঁড়টিকে নির্দেশ করে গফুরকে সতর্ক করে দিলেন যে সে হিন্দু ব্রাহ্মণ

জমিদারের গ্রামে বাস করে। ষাঁড়টিকে দড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছে—অনাহারে শীর্ণ। এসব জমিদার সহ্য করবেন না—পরোক্ষভাবে এসবের ইঙ্গিত দিলেন তর্করত্ন।

গফুর খুবই বিনীতভাবে জানাল যে জরে পড়ার জন্য সে দড়ি ধরে ষাঁড়টিকে ঘাস খাইয়ে আনতে পারেনি। তর্করত্ন উষ্মাভরে জানায় খড় বা ভাতের ফ্যান খেতে দিলে ত হয়। ষাঁড়টিকে না খাইয়ে ফেলে রাখার জন্য তর্করত্ন গফুরকে কসাই বলে তিরস্কার করলেন। গফুর এর উত্তর দিতে না পেরে নির্বাক হয়ে রইল। পরে ধীরে ধীরে সে জানাল যে চলতি বছর কাহন খানেক খড় পেয়েছিল। বকেয়া মেটাতে গিয়ে সব শেষ হয়ে যায়। ফলে তার প্রিয় ষাঁড় মহেশের এই দুর্দশা। গফুর মুসলমান। সাধ করে ষাঁড়ের হিন্দুনাম রাখা হয়েছে মহেশ—এই শুনে তর্করত্ন নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করলেন গফুরকে। গফুর সেদিকে কর্ণপাত না করে নিজের অপরিসীম দুঃখের কাহিনী বলে চলল। প্রসঙ্গত জমিদারের আচরণের প্রতি অভিযোগ আনলেন। এতে তর্করত্ন জোরালো প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন—"তোরা ত রাম রাজত্বে বাস করিস, ছোটলোক কিনা, তাঁর নিন্দে করে মরিস।" গফুর লজ্জিত ভাবে তার দুঃখময় জীবনের দারুণ সমস্যার কথা পেড়ে তর্করত্নের কাছে দু কাহন খড় চাইলেন। তার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই তর্করত্ন স্পর্শদোষের আশঙ্কায় একটু দূরে সরে গেলেন—'অ্যাঁ করছিস কি ছুঁয়ে ফেলবি নাকি।' গফুর জানায় যে কোনো ভয় নেই, সে তাঁকে ছুঁয়ে ফেলবে না। মহেশের জন্যই সে কাকুতি মিনতি করছে। এতেও তর্করত্নের মন নরম হল না। তিনি বাড়ী যাবার জন্য পা বাড়াতেই মহেশ শিং গুঁতিয়ে এলো। তর্করত্ন শিঙের গুঁতোর আশঙ্কায় পিছিয়ে এলেন। বললেন—'যে শিঙ্ দেখছি কোনদিন কাকে খুন করবে।' গফুর বলে—'গন্ধ পেয়েছে দুমুঠো খেতে চায়।' অর্থাৎ তর্করত্নের পুঁটলিতে চালকলা বাঁধা ছিল। তর্করত্ন বিদ্রূপ করলেন—'খড় জুটে না, চালকলা চাই।' তিনি বাড়ী চলে গেলেন।

তর্করত্ন চলে যাবার পর গফুর স্নেহভরে মহেশের দিকে তাকিয়ে তর্করত্ন শ্রেণীয় লোকদের লক্ষ্য করে অভিযোগের সুরে বলল যে ওদের অনেক আছে, তবুও এক-মুঠো দেয় না। মহেশের গলায় আদরে হাত বুলাতে বুলাতে গফুর বলে যে খেতে দিতে না পারলেও মহেশের প্রতি তার স্নেহ ভালবাসার একটুও অভাব ঘটেনি। গফুর তার দারিদ্র্য ও অসহায়তার কথা বলে চলে। ভাঙা ঘর থেকে সামান্য বিচালি টেনে মহেশকে খেতে দেয়। তার মেয়ে ভাত রেঁধে বেরিয়ে এসে তা দেখতে পায়। বাবাকে জানায় ঘর মেরামত হয় নি—খড় টেনে গরুকে খেতে দিলে সামনের বর্ষায় ঘরখানি ভেঙে পড়বে। গফুর ব্যাপারটাকে চাপা দিতে গিয়ে বলে যে পুরানো খড়, আপনি ঝড়ে পড়ছিল। ভাতের ফেন চাইতে আমিনা জানায় ফেন পড়েনি। গফুর বলে তার জ্বর, ভাত খাবে না। আমিনা ভাত তুলে রাখতে চাইলে, গফুর সন্ধ্যায় দুটো ভাত রেঁধে দিতে বলে। অসুখ শরীরে ঠাণ্ডা ভাত খাওয়া উচিত নয়।

আমিনা এতে সম্মতি জানায়। আসলে গফুর নিজে না খেয়ে মহেশকে খেতে দিতে চেয়েছিল। আমিনা সেটা বুঝতে পারে। সে জানে তার পিতা মহেশকে পুত্রের মতো স্নেহ করে। একটা অবলা জীবকে নিয়ে গফুর ও আমিনার মধ্যে এই যে ছলনার অভিনয় হয়ে গেল—তা অন্তর্যামী লক্ষ্য করলেন।

২

পাঁচসাত দিন মহেশকে না পাওয়ায় গফুর চিন্তিত হয়ে দাওয়ার উপর বসে ছিল। আমিনা জানায় গ্রামের ঘোষদের বাগান নষ্ট করার অভিযোগে মহেশকে দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে দেওয়া হয়েছে। মহেশকে ছেড়ে দিয়ে গফুর এরূপ কাণ্ড ঘটবে ভাবতে পারে নি। তাছাড়া মাণিক ঘোষের গো-ব্রাহ্মণে দারুণ ভক্তি। তিনি এমন কর্ম করবেন, কল্পনা করা যায় না। সে সময় মেয়ের সামনে গফুর মহেশকে ছাড়িয়ে আনবার উৎসাহ দেখাল না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সে দোকানী বংশীর কাছে তার একমাত্র পেতলের থালাটি বন্ধক দিয়ে একটি টাকা ধার এনে মহেশকে ছাড়িয়ে আনল। সাময়িক উত্তেজনা ও বিরক্তিতে গফুর ইতিমধ্যে মহেশকে বিক্রী করে দিবে বলে এক ক্রেতার কাছ থেকে দশ টাকা বায়না এনেছিল। পরদিন মহেশকে দড়িতে বাঁধা অবস্থায় দেখা গেল। ক্রেতা এসে দড়ি খুলে মহেশকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই গফুর তার বায়না টাকা ফেরৎ দিল। সে ভাবল গফুর বেশী দাম চাইবে। তাই তাচ্ছিল্য ভাবে বলে, চামড়ার যা দাম মাংসে তা নেই। এর চেয়ে বেশী দাম কোনো ক্রেতা দিবে না। গফুরের আপত্তি দেখে পাছে কোনো হাঙ্গামা হয় ক্রেতার দল সেখান থেকে বিদায় নিল। লোকগুলি চলে যাওয়ার পর জমিদারের সদর দপ্তর থেকে গফুরের ডাক এল। সদরে অনেক লোকের ভীড়। কসাইকে গরু বিক্রীর ব্যাপার নিয়ে শিবু গফুরের কঠিন শাস্তি বিধানের কথা পাড়ে গফুর নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। গফুর সে যাত্রায় নিষ্কৃতি পেল। ফিরে এসে গফুর প্রতিবেশীদের বাড়ী থেকে ফ্যান চেয়ে মহেশকে খেতে দিল। মহেশের গায়ে মাথায় শিঙে হাত বুলাতে বুলাতে অস্ফুট স্বরে অনেক কথা বলে।

৩

বৈশাখ শেষ হয়ে জ্যৈষ্ঠ এসে গেছে। বৃষ্টি নেই। প্রকৃতি রুদ্রাণী মূর্তি ধারণ করেছে। সব যেন জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে গফুর একদিন দুপুর-বেলা কাজের খোঁজে বেরিয়ে যায়। কাজ মেলেনি। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে বাড়ী ফিরে মেয়ের কাছে ভাত চায়। মেয়ে জানায় বাড়ীতে চাল নেই, ভাত হয়নি। সকালে সে কথা আমিনা জানায় নি কেন এই প্রশ্নের জবাবে মেয়ে জানায় যে গত রাত্রিতেই সে চালের কথা বলেছে। এই জবাবে ক্রুদ্ধ হয়ে গফুর মেয়েকে খোঁটা দেয় এবং বলে যে এরপর সে চাল কুলুপ দিয়ে বন্ধ করে রাখবে। জল চাইতে গফুর জলও পেল না। তখন মেয়ের গালে চড় কসিয়ে দিল। আমিনা জল আনতে বেরিয়ে যেতেই এই মা মরা নির্দোষ মেয়েটির জন্য গফুরের হৃদয় মমতায় ভরে এল। এমন সময় যমদূতের মতো এলো জমিদারের পেয়াদা। গফুরের তলব পড়েছে—

তৎক্ষণাৎ যেতে হবে। একটু পরে যাব শুনে পেয়াদার রাগ বেড়ে যায়। সে বলে, জমিদার বলেছে তাকে জুতো পেটা করে নিয়ে যেতে। গফুরের ব্যক্তিত্ব ক্ষণকালের জন্য সজাগ হয়ে উঠে। সে জানায় মহারানীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। সে দস্তুর মতো খাজনা দিয়ে বসবাস করে। পূর্বেই গফুর প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হয়েছে। কারণ মহেশ জমিদারবাবুর ফুলগাছ খেয়ে ফেলেছে। ক্ষুদ্র প্রজার স্পর্ধা জমিদারের অসহ্য। এমন অবস্থায় গফুর শুনল আমিনার আর্ত চীৎকার। সে দেখল ভাঙা কলসীর জল মহেশ মাটি থেকে শুষে খাচ্ছে। গফুর মুহূর্তে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মহেশের মাথায় লাঙ্গলের আঘাত করে। মহেশ মারা যায়। মহেশের মৃত্যুতে আমিনা কেঁদে ফেলে। বাবাকে তিরস্কার করে।

৪

ঘণ্টা দুই পরে মুচিরা সেখানে এসে হাজির। তাদের হাতে ধারালো ছুরি দেখে গফুর শিউরে উঠল। কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। পাড়ার লোকেরা জানাল প্রায়শ্চিত্তের খরচ জোগাতে গফুরকে ভিটেমাটি বেচে ফেলতে হবে।

গভীর রাতে গফুর মেয়েকে ঘুম থেকে তুলল। জানাল কাশীপুর ছেড়ে চলে যাবে। ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করবে। আমিনা অবাক হয়ে গেল এই প্রস্তাব শুনে। কতবার সেই চটকলে কাজ করার জন্য ডাক এসেছে, গফুর যায় নি, সেখানে মেয়েদের ইজ্জত থাকে না। অনেক দুঃখ আগে পেয়েছে গফুর, তবু এমন সিদ্ধান্ত নেয় নি। গফুর অবিলম্বে বেরিয়ে পড়তে বলে—রাতের অন্ধকারে তারা চলে যাবে। আমিনা জলের ঘটি ও পিতলের থালা সঙ্গে নিতে চায়। গফুর বাধা দিয়ে বলে সে সবের প্রয়োজন নেই। সেগুলি দিয়ে মহেশের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

অন্ধকার রাতে গফুর মেয়ের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে পথে পা বাড়াল। সে গ্রামে তার আপন জন বলতে কেউ ছিল না। নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে মুখ তুলে গফুর দীন-দুনিয়ার মালিক ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাল। ঈশ্বর যত খুশী গফুরকে শাস্তি দিন—তা সে মাথা পেতে নেবে। কিন্তু তার মহেশ এক মুঠো ঘাস ও তৃষ্ণার জল না পেয়ে মরেছে। এর জন্য দায়ী বর্ণহিন্দুর দল—তাদের অন্যায় যেন ঈশ্বর মার্জনা না করেন।

'মহেশ' গল্পের রসগ্রাহী আলোচনা ঃ

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' একটি বিখ্যাত ছোটগল্প। এর মধ্যে একটি মূক পশুকে কেন্দ্র করে দরিদ্র মানুষের অসহায়তা, গ্রামের ধনিক ও ক্ষমতাশালী মানুষের শোষণ অত্যাচার অতি সুন্দরভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, গ্রামের জমিদার শিবচরণ-বাবু, হিন্দুর সমাজবিধি ও শাস্ত্র শাসনের প্রতিভূ ক্রূর তর্করত্ন, গরীব মুসলমান চাষী গফুর জোলা ও তার গৃহপালিত আদুরে ষাঁড় মহেশকে নিয়ে গল্পটি রচিত। শরৎচন্দ্র অসামান্য প্রতিভাবলে একটি অবলা জীব মহেশকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দান করেছেন। নিতান্ত দরিদ্র গফুর দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না। মহেশকে

ঘাস, খড়কুঁড়া খাওয়াবার সামর্থ্যও তার নেই। এই মহেশের জন্যই তর্করত্ন ও শিবচরণ বাবুর কাছ থেকে তিরস্কার, লাঞ্ছনা ও প্রহার পেয়েছে গফুর। অভাবের তাড়নায় আর উপর্যুপরি অত্যাচার ও নিষ্পেষণের ফলে গফুর বিস্মৃতির বলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মহেশকে হত্যা করে। গফুর জানত এই গোহত্যার পর জমিদারের কাছ থেকে সাংঘাতিক দণ্ড আসবে—প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভিটেমাটি বেচতে হবে। অবশ্য এই ভয়ে সে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় নি। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মহেশকে হত্যা করায় তার অন্তর্জীবনে হতাশা ও গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলে। সেই জন্যই শোকে দুঃখে অনুশোচনায় হতভাগ্য চাষী মেয়ের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল চটকলে কাজ করতে। মহেশই ছিল তার প্রাণ। সেই মহেশ যখন চলে গেল—তখন সেই গ্রামে তার থাকা না থাকা দুটোই সমান। চটকলে কাজ করলে মেয়েদের মানসম্মান ইজ্জৎ থাকে না। কিন্তু নিরুপায় গফুরের সামনে বাঁচবার অন্য কোনো দ্বিতীয় পথ ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে অসম্মানের জীবনকে বরণ করে নিতে সে বাধ্য হল। যাবার বেলা গফুর অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানিয়ে যায়। শরৎচন্দ্রের লেখনীতে মূল পশুকেন্দ্রিক এই গল্পটি অপূর্ব শিল্পশ্রী মণ্ডিত হয়েছে। লেখনীর কয়েকটি আঁচড়ে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গ্রাম-বাংলার অবস্থা, হিন্দুজমিদারের হৃদয়হীনতা, তর্করত্নের ভণ্ডামি— এককথায় হিন্দু-সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আর গফুরের জীবনের যে মর্মান্তিক পরিণতি তা অফুরন্ত সমবেদনায় পাঠকের চিত্তকে করুণরসে প্লাবিত করে তুলে। গল্পটি সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণীয়:

"হিন্দুর গোজাতি-বাৎসল্য ও মুসলমানের গোখাদকবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের যে বদ্ধমূল ধারণা আছে শরৎচন্দ্র তাহারই বিরুদ্ধে প্রচারের আতিশয্যহীন, কলাবোধ-সম্মত একটি অতি সূক্ষ্ম প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তর্করত্নের শাস্ত্রবিধি সমর্থিত গোপ্রশস্তি যে নিছক ভণ্ডামি ও গফুরের অযত্ন যে নিরুপায়ের গভীর বেদনাময় অক্ষমতার ফল তাহা বুঝিতে আমাদের এক মুহূর্তও দেরী হয় না। গফুরের নিজের সাংসারিক জীবন যে মহেশের অপেক্ষা কিছুমাত্র সফলতর নয় তাহার করুণ ইঙ্গিতও গল্পের স্বল্প পরিসরে ঝলসিয়া উঠিয়াছে। অভাবের তাড়নায় সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগে উদ্যত মুসলমান কৃষকের দীর্ঘশ্বাসের সহিত পাঠকেরও ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া লেখকের করুণরস-সৃষ্টি কৌশলের প্রতি অভিনন্দন জানায়।"

প্রশ্নোত্তর

১। 'মহেশ' গল্পে নিরন্ন ভাগচাষীর উপর জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর।

অথবা,

'মহেশ' গল্পে তৎকালীন সমাজজীবনের কি চিত্র ফুটে উঠেছে।— আলোচনা কর।

অথবা,

'মহেশ' গল্পে গ্রামবাংলার কৃষকের উপর জমিদারী নির্যাতনের যে আলেখ্য অংকিত হয়েছে—সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ শরৎচন্দ্র অপরাজেয় কথাশিল্পী। মানুষের প্রতি অফুরন্ত দরদ ও সহানুভূতি তাঁর রচনার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে তিনি সমাজ-সচেতন শিল্পী। তাঁর গল্পউপন্যাসের সব চরিত্রই বাস্তব সংসার থেকে গৃহীত। শরৎচন্দ্রের মতে তাঁর স্বষ্ট সব চরিত্রগুলি ৯৯% রিয়্যাল। যাহক, শরৎসাহিত্য নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতার জীবনবেদ। তিনি লিখেছেন—

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলেনা কিছুই—যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত—মানুষ যাদের চোখের জলের কোনো হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠাল আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।"

উদ্ধৃত অংশ থেকে স্পষ্টই জানা যাচ্ছে নির্যাতিত মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের কি অসীম দরদ ও সহানুভূতি হৃদয়ে পরিপূর্ণ ছিল। শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ রচনায় নিপীড়িত অসহায় মানুষের জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

'মহেশ' গল্পে দেখি গফুর একজন ভূমিহীন নিরন্ন চাষী। কাশীপুর গ্রামের একপ্রান্তে তার বাস। মুসলমান বলেই হিন্দুরা তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। সে অন্ত্যজ প্রান্তবাসী। আপনজন বলতে গ্রামে তার কেউ নেই। তার বাড়ী পথের ধারে। বাড়ী জরাজীর্ণ। ঘরের প্রাচীর ভেঙে গিয়ে পথের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। বাড়ীতে থাকে তার ছোট্ট মেয়ে আমিনা। আর আছে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় 'মহেশ' নামে এক ষাঁড়।

ছোট্ট কাশীপুর গ্রামের জমিদার শিবচরণবাবু তেমন বিত্তশালী নয়। শরৎচন্দ্র লিখেছেন—গ্রাম ছোট, জমিদার আরো ছোট। কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড প্রতাপ। সে ক্ষমতা মদমত্ত অত্যাচারী জীব। তাঁর দাপটে প্রজারা টু শব্দ করতে পারে না। শিবচরণ বাবু গ্রাম্যসমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তর্করত্ন ন্যায়রত্ন মহাশয় জমিদারের পুরোহিত —হিন্দুধর্মের ও শাস্ত্রবিধির পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। প্রকৃতপক্ষে সে ধর্মের ধ্বজাধারী তোষামুদে ভণ্ড ব্রাহ্মণ। অত্যাচারী জমিদারেরই ক্ষুদ্রসংস্করণ।

তর্করত্ন মহাশয় জমিদারের ছোটছেলের জন্মতিথির পূজাপদ্ধতি শান্তিস্বস্ত্যয়ন সেরে দুপুরে গফুরের বাড়ী হয়ে ফিরছিল। তিনি গফুরকে সতর্ক করে দিলেন—হিন্দুর গ্রামে গোজাতিকে সে অনাহারে রেখেছে। সকালে দেখে গেছে যেখানে ষাঁড়টি বাঁধা ছিল – দুপুরেও সেখানে রয়েছে। গোহত্যা হলে জমিদার তাকে জ্যান্ত কবর দেবে। তর্করত্ন মহাশয় ভেবে দেখলেন না ষাঁড়টিকে খড় জোগাবার জন্য সামর্থ্য গফুরের আছে কিনা।

তর্করত্নের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে গফুরের মুখ দিয়ে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর জমিদারের

অত্যাচারের বিষয়টি ধরা পড়েছে। তর্করত্ন অভিযোগ করে চাষের খড় গরুটার জন্য ফেলে রাখতে হয়। কিন্তু গফুর সবই বেচে খেয়ে ফেলেছে। আসলে কিন্তু ব্যাপার তা নয়। পর পর কয়েক সন অজন্মা। চলতি বছর মাত্র এক কাহন খড় গফুর ভাগে পেয়েছিল। গতবছরের বকেয়া আদায় করে জমিদার সবই ধরে রাখলেন। গফুর গরুটার জন্য পনদশেক খড় চেয়ে কেঁদে পায়ে পড়ল—কিন্তু জমিদারের দয়া হল না। বেবাক খড় গাদা হয়ে গেল সরকারে। 'মহেশ' এক মুঠো খড়ও পেল না। এতে প্রভুর নিন্দা দেখে তর্করত্ন গফুরকে খুব তিরস্কার করলেন। তর্করত্নের কাছে দু'কাহন খড় ধার চয়েও গফুর নিষ্ফল হল।

পরপর দুবছর অজন্মা। গফুর ভাগচাষী। পেটের দায়ে দিনমজুরী খাটা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অসুস্থ শরীর নিয়ে সে খাটতে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ আর অসহ্য ক্ষুধা নিয়ে সে নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসে। আমিনার কাছে ভাত চেয়ে পেল না। বাড়ীতে চাল নেই ভাত হবে কি করে। মেয়েকে তিরস্কার করল। এমন সময় জমিদারের পেয়াদা এসে হাজির। গফুরের খাওয়া হয় নি। পরে যাবে বলতেই পেয়াদা অশ্লীলভাবে গালিগালাজ করল—জমিদার তাকে জুতো পেটা করে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে। তার অপরাধ মহেশ জমিদারের ফুল-বাগান নষ্ট করেছে। অবলাজীবের বিরুদ্ধে অভিযোগের শাস্তি স্বরূপ গফুর নির্মমভাবে প্রহৃত হল—"যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে "

মহেশকে নিয়েই গফুরের যত সমস্যা ও নির্যাতন ভোগ। জনমজুরী খাটতে গিয়ে সে ফিরে আসে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে। ভাত না পেয়ে জল চায়। বাড়ীতে জল না থাকায় মেয়েকে চপেটাঘাত করে। মেয়ে জল আনতে বেরিয়ে যায়। জল নিয়ে ফিরলে মহেশ আমিনার দিকে এগিয়ে যায়। আমিনা আর্তচীৎকার করে মাটিতে পড়ে যায়। কলসী ভেঙে জল গড়িয়ে পড়ে। সেই জল মাটি থেকে শুষে খেতে থাকে মহেশ। এতেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মহেশকে গফুর হতাশায় কাণ্ডজ্ঞান-হীন হয়ে লাঙ্গলের ফলায় আঘাত করে। মহেশ প্রাণ হারায়।

গফুর জানে এর পরিণাম ভয়াবহ। গোহত্যার সাংঘাতিক দণ্ড দেবে জমিদার মহাশয়। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করে প্রায়শ্চিত্ত করতে গফুরের ভিটেবাড়ী চলে যাবে। জমিদারের শোষণ, অত্যাচার ও দৈহিক নির্যাতনের জন্য গরীব ভাগচাষী গফুর প্রিয় মহেশকে হত্যা করল। শুধু এই নয়, রাত্রের অন্ধকারে সাতপুরুষের ভিটেমাটী ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল চটকলে কাজ করতে। মহেশের এই মৃত্যুর জন্য আসলে দায়ী জমিদার মহাশয়। এবং গফুরের ট্রাজিডির জন্যও সে সমান ভাবে দায়ী। জমিদার গোব্রাহ্মণের প্রতিপালক—ন্যায়-পরায়ণ ও প্রজাবৎসল হবে—এটাই কাম্য। কিন্তু এরা গোচর ভূমিটুকুও জমাবিলি করে দেয়। এদের অনেক থাকা সত্বেও নিরন্ন প্রজার প্রতি সামান্যতম করুণাও বর্ষণ করে না। দরিদ্র কৃষকের রক্তমোক্ষন করেই এরা ফুলে উঠে। নির্মম নিষ্ঠুর

অত্যাচারী হয়েও সমাজে এরা ভদ্র গণ্যমান্য রূপে সম্মানিত হয়। শরৎচন্দ্র এই ভদ্রবেশী বর্বরতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। নির্যাতিত কৃষকের জীবন কাহিনী তুলে ধরে পাঠকের সহানুভূতি জাগ্রত করেছেন।

২। তর্করত্ন মহাশয়ের চরিত্র বিচার কর।

উত্তর ঃ 'মহেশ' গল্পে তর্করত্ন মহাশয় এক অমানবিক হৃদয়হীন নিষ্ঠুর চরিত্র। তিনি জমিদার শিবচরণবাবুর পুরোহিত—হিন্দুর শাস্ত্রবিধি ও সামাজিক আচার আচরণের প্রতিভূ। এই ধরনের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা শুদ্ধাচারী ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবেই সমাজে সম্মানিত হয়ে থাকেন। সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ছায়াতলেই এরা পরিপুষ্ট। শরৎচন্দ্র এই ধরনের মানুষের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। গায়ে ধর্মের নামাবলী থাকলেও এরা কত ভণ্ড, পাষণ্ড ও তোষামুদে জীব—তর্করত্নের চরিত্রে সেটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তর্করত্ন শুদ্ধশীল যাজক ব্রাহ্মণ। দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার শিবচরণবাবুর ছোট ছেলের জন্মতিথি সেরে চাল কলা বেঁধে বৈশাখের খর রৌদ্রে বাড়ী ফিরছিলেন। গফুরের বাড়ীর সামনে এসে—গফুরকে 'গফরা' বলে হাঁক ছাড়লেন। ব্রাহ্মণ হয়েও মানুষের প্রতি তর্করত্নের এই তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক। মানুষকে এরা মানুষ বলে গণ্য করে না। মানুষের সাধের নামকে বিকৃত করে ব্যঙ্গ করেন। এটা এক ধরনের ব্যভিচার। জরতপ্ত শরীর নিয়ে গফুর বেরিয়ে এলে তর্করত্ন তাকে মহেশের ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। সকাল থেকে গরুটি ঠায় বাঁধা। এক মুঠো বিচুলি পায় নি। অনাহারে হাড় জির জির করছে গরুটির। গফুর ব্রাহ্মণ জমিদারের গ্রামে বাস করে। গোহত্যা হলে জমিদার তাকে জ্যান্ত কবর দেবে। কিন্তু তর্করত্ন মশাই খুঁটিয়ে দেখলেন না, গরুটিকে খড় দেওয়ার সামর্থ্য গফুরের আছে কিনা। যে মহেশকে গফুর ছেলের মতো ভালবাসে—তাকে না খেতে দেওয়া ভাবাই যায় না। শোচনীয় দারিদ্র্যে সে পর্যুদস্ত। খড় কেনার সামর্থ্য নেই। মহেশের জন্য চিন্তা ভাবনায় তার শরীর কৃশ। গফুর তর্করত্নকে বিনীতভাবে তার অক্ষমতার কথা জানালে তিনি ষাঁড়টিকে ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিলেন। গফুর জানাল গোচরভূমি জমা হয়ে গেছে—মহেশকে ছেড়ে দিলে যার তার বাগানে ঢুকবে। তর্করত্ন গফুরকে বিচালি ও ফ্যান মিশিয়ে মহেশকে খেতে দিতে বললেন। কিন্তু বিচালি ও ফ্যান থাকলে ত কথা। খড় নেই জেনে তর্করত্ন গফুরকে তিরস্কার করলেন, ভাগের চাষের সব খড় বেচে খেয়েছে, গরুটার জন্য ফেলে রাখতে হয়। তর্করত্ন গফুরকে 'কসাই' ইত্যাদি যা মুখে আসে তাই বলে গেলেন।

গফুর পরপর দুসন অজন্মার কথা জানাল। চলতি বছর ভাগে যা খড় পেয়েছিল জমিদারবাবু তার বকেয়া আদায় করে নিলেন সব রেখে। অনেক কাকুতি মিনতি করেও গফুর সামান্য খড় পেল না। জমিদারের দয়া হল না গফুরের প্রতি।

এ সব বৃত্তান্ত শুনে তর্করত্ন চটে গেলেন। জমিদারের নিন্দা তিনি শুনতে পারেন না। ধার করে শোধ দেবে না—এরা সব ছোটলোক—রাম রাজত্বে বাস

করে বলে এই স্পর্ধা। গফুর এতে লজ্জিত হল। তর্করত্নের কাছে দু কাহন খড় ধার চাইলেন। তিনি রাজী হলেন না। ধার করে গফুর শোধ দেবে কি করে। গফুর একটু এগিয়ে আসতেই তর্করত্ন সরে দাঁড়ালেন—গফুর ছুঁয়ে ফেলবে নাকি। মুসলমানের সংস্পর্শ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণকে এড়িয়ে চলতে হবে। গফুর জবাব দেয়—'ভয় নেই ছুঁয়ে ফেলব না'।

চাল কলার গন্ধ পেয়ে ক্ষুধার্ত মহেশ এগিয়ে এলে তর্করত্ন ভীত ও বিরক্ত হলেন। গফুর বলে—'গন্ধ পেয়েছে দু মুঠো খেতে চায়'। গফুর 'মহেশ'কে এক মুঠো ভিজে চাল খেতে দেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি জানায়। এতে আরো জ্বলে উঠে তর্করত্ন। মুসলমানের গৃহে পালিত ষাঁড়ের নাম 'মহেশ' রাখায় তর্করত্ন বিদ্রূপ করেন—'আবার সাধ করে নাম রাখা হয়েছে মহেশ, হেসে বাঁচিনে।' তর্করত্ন চলে গেলেন।

এই জাতীয় তর্করত্ন, শিরোমণি, বাচস্পতি উপাধিধারী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নির্মম আচরণ ও ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। এরা ব্রাহ্মণ বটে কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের ত্যাগ তিতিক্ষা দয়া মায়া মানবিকতার লেশমাত্রও এদের চরিত্রে নেই। এরা বড় বড় শাস্ত্রবাক্য, সমাজহিত ও লোক কল্যাণের বাণী আউড়ায়। কিন্তু আসলে এরা মানব সমাজের কলঙ্ক—নিতান্ত স্বার্থপর নিষ্ঠুর তোষামুদে জীব। লোভ, নীচতা, ভদ্রতার উত্তরীয় গায়ে ঢেকে রাখলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষ জন্তু।

৩। 'মহেশ' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

অথবা,

'মহেশ' গল্পে মূক অবোলা জীবও মানবধর্মের সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে—আলোচনা কর।

অথবা;

'মহেশ' গল্পে পশু চরিত্র চিত্রণে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব বিচার কর।

উত্তর ঃ শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পগুলির মধ্যে 'মহেশ' গল্পটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই গল্পে এক মূক অবোলা ষাঁড় 'মহেশ'কে কেন্দ্র করে এক দরিদ্র মুসলমান ভাগ চাষী গফুরের মর্মান্তিক জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে। লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, গল্পটিতে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে 'মহেশ'। গফুরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ষাঁড় 'মহেশ'কে কেন্দ্র করেই সমস্ত ঘটনার উদ্ভব ঘটেছে এবং মহেশের জন্যই গফুরের জীবনে মর্মান্তিক ট্রাজিডি ঘনিয়ে এসেছে। সেদিক থেকে 'মহেশ' এই নামকরণ সার্থক।

যে কোনো গল্পের নামকরণ হয় প্রধান চরিত্র বা ঘটনা বস্তুর সারমর্ম কিংবা ঘটনার উৎস কেন্দ্র করে অবলম্বন। 'মহেশ' গল্পে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু 'মহেশ'। তাই নামকরণ ও তাৎপর্যদ্যোতক ও শিল্প-সৌন্দর্যমণ্ডিত।

দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অসীম দরদ ও ব্যাপক সহানুভূতি ছিল নির্যাতিত নিপীড়ত মানুষের প্রতি। কিন্তু শুধু মানুষ নয়, মূক পশুর প্রতিও তাঁর কত গভীর হৃদয়ানুভূতি উৎসারিত হয়েছিল তার নিদর্শন মিলে আলোচ্য গল্পে। এক অবোলা

জীব 'মহেশ' নামক ষাঁড়ের ক্ষুধাতৃষ্ণা ও নীরব বেদনাকে তিনি বাঙ্ময় করে তুলেছেন এই গল্পে।

মহেশকে আমরা গল্পের আরম্ভে তার প্রভু গফুরের ভগ্ন কুটিরের প্রান্তে এক বাবলা গাছের নীচে বাঁধা অবস্থায় দেখি। নিতান্ত দরিদ্র গফুর মহেশকে খাদ্য যোগাতে পারে নি গোখাদ্য—খড়, কুঁড়া ও মাঠের ঘাস। জমিদার শাসিত সমাজে গফুর সেটুকুও সংগ্রহ করতে অপারগ তার দারিদ্র্যের জন্য। এর ফলেই অনাহারক্লিষ্ট মহেশের মৃতকল্প অবস্থা—অস্থিচর্মসার, ক্ষুধাকাতর, কোটরাগত চোখ।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির জন্য মাঠে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। জলাশয়গুলি শুকিয়ে গেছে। পর পর তুসন অজন্মা। চলতি বছরে ভাগ চাষ করে ভাগে যা খড় পেয়েছিল জমিদার বকেয়া আদায়ের হিসাবে সব রেখে দিয়েছে। মহেশের খাবারের জন্য খড় নেই—গফুর ঘর ছাইতে পারে নি।

জমিদারের পুরোহিত তর্করত্ন মশাই মহেশকে অভুক্ত রাখার জন্য গফুরকে তিরস্কার করেন—মহেশের জন্য তাঁর দরদ উছলে উঠে। অথচ মহেশকে খাওয়াবার জন্য দু কাহন খড় চাইলে তিনি দেন না। দরিদ্র গফুর শোধ দেবে কি করে। তারপর নানাভাবে ভর্ৎসনা করেন তিনি। মহেশ চোখের সামনে সব কিছু প্রত্যক্ষ করে। সে উপলব্ধি করে গফুরের দৈন্য, তার উপর অত্যাচার।

তর্করত্নের গামছায় ভিজে চাল আর কলা বাঁধা ছিল। মহেশ তা বুঝতে পারে। এক মুঠো পেলে ক্ষুধার জালা থেকে কিছুটা রেহাই পাবে। এই ভেবে মহেশ তর্করত্নের দিকে একটু এগিয়ে যায়। গফুর জানায়—'গন্ধ পেয়েছে এক মুঠো খেতে চায়'। তর্করত্ন বিদ্রূপ করে সেখান থেকে চলে যায়। তারপর গফুর মহেশের গলা জড়িয়ে আদর করে। বলে—ওদের অনেক আছে দু মুঠো দিল না, না দিগগে। গফুর মহেশকে খেতে দিতে পারে নি বটে, কিন্তু তার প্রতি তার স্নেহ মমতার অভাব নেই। প্রত্যুত্তরে মহেশ প্রভুর আদরটুকু নীরবে উপভোগ করে। মহেশ কেবলমাত্র গফুরের প্রতিপালিত একটি তুচ্ছ পশু নয়—সে গফুরের পরিবারেরই একজন লোক—তাঁর নিজের সন্তানের মতো। তাই মহেশের জন্য গফুরের দুঃখ ও চিন্তার অবধি নেই। গফুর বলে—

"মহেশ তুই আমাদের ছেলে, তুই আমাদের আটসন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস,—তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নি,—কিন্তু তুইতো জানিস, আমি তোকে কত ভালবাসি।"

মহেশ জানে গফুর তাকে প্রাণ ভরে ভালবাসে। এই ভালবাসার টানেই গফুর জীর্ণ চাল থেকে খড় টেনে মহেশকে খেতে দেয়। মেয়ে আমিনা আপত্তি করলে, গফুর জানায়—পুরানো খড় আপনি খসে পড়েছিল। ক্ষুধা নেই বলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের খাবারটুকু মহেশকে খেতে দেয়।

ঈশ্বর পশুদের জন্য খাদ্যাভাব রাখেন নি। কিন্তু অর্থলোভী জমিদার গ্রামের গোচরভূমি বিলি-বন্দোবস্ত করে ন্যায্য খাদ্য থেকে পশুকে বঞ্চিত করে। বৈশাখে

মাঠে এক মুঠো ঘাস নেই। জলাশয় শুষ্ক। মহেশকে কোত্থেকে গফুর খাবার দেবে। এ সমস্ত মহেশ বুঝতে পারে। সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা বেশিক্ষণ সহ্য করা তার সাধ্যাতীত। মরিয়া হয়ে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। জমিদারের ফুল বাগানের গাছগুলি খেয়ে উদর পূর্তি করে। বাগান তছনছ করে দেয়। মহেশ বুঝতে পারে জমিদারের অন্যায় জুলুমবাজী। তাই যেন প্রতিশোধ কামনায় জমিদারের বাগান নষ্ট করে। কিন্তু এর প্রতিফল পেতে হয় গফুরকে। জমিদারের পেয়াদা এসে তাকে নিয়ে যায়। প্রহারে নিদারুণ ভাবে জর্জরিত হয়ে সে ফিরে আসে।

ঘরে ভাত নেই, তৃষ্ণার জলও নেই। গফুর মেয়েকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিরস্কার করে। আমিনা জল আনতে যায়। জল নিয়ে ফিরলে তৃষ্ণার্ত মহেশ জল পানের জন্য এগিয়ে আসতে আমিনা আর্ত-চীৎকারে কলসী ফেলে দেয়। তা মুহূর্তে ভেঙে ছিটকে পড়ে। মহেশ সেই জল মাটি থেকে শুষে খেতে থাকে। মেয়ের চীৎকার শুনে ক্ষুধার্ত গফুর ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠে লাঙলের ফলা দিয়ে মহেশকে আঘাত করে। মহেশ প্রাণ হারায়। মহেশের দুচোখে জল গড়িয়ে পড়ে—রক্তে মাটি ভিজে যায়।

দারিদ্র্যের জ্বালা সত্ত্বেও পুত্রপ্রতিম মহেশকে গফুর বিক্রী করতে চায় নি। ক্রেতাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই গফুরই মহেশের মৃত্যু ঘটাল। গফুর জানে মহেশের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ সে নিজে। কিন্তু মহেশকে তিলে তিলে শুকিয়ে মেরেছে জমিদার শিবচরণবাবু। তাই গ্রাম ছেড়ে মেয়ের হাত ধরে রাতের অন্ধকারে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে বেড়িয়ে পড়ে। যাবার সময় ভগবানের আদালতে নালিশ জানিয়ে যায়।—

"যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"

'মহেশ'কে হত্যা করেই গফুর স্বেচ্ছায় সাত-পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে চলে যায়। 'মহেশে'র প্রতি অগাধ প্রীতির জন্যই তার জীবনে মর্মান্তিক পরিণতি ঘনিয়ে আসে। মহেশের জন্যই বারে বারে তাকে তর্করত্ন ও জমিদারের কাছ থেকে লাঞ্ছনা, অপমান ও প্রহার সহ্য করতে হয়। কাজেই এই গল্পের সমস্ত ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ কারণ মহেশ। তাই গল্পের 'মহেশ' নামকরণ সার্থক ও সুন্দর। আর মানবিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্যে—শরৎচন্দ্র এই মূক পশুকে যে ভাবে বাঙ্ময় করে তুলেছেন—তাতে তাঁর মনুষ্যত্বের জীব জন্তুর প্রতি সমবেদনার চূড়ান্ত নিদর্শন মিলে। শরৎচন্দ্র তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি উজাড় করে দিয়ে এই মূক পশুকে বিচিত্র অনুভূতির বর্ণ বৈচিত্র্যে মানব চরিত্রের সমধর্মী করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যে এরূপ পশু চরিত্রের আলেখ্য দ্বিতীয় আর নেই। কেবল তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়ে'র সঙ্গে কিছুটা তুলনা চলে।

৪। 'মহেশ' গল্পে গ্রামের জমিদার শিবচরণবাবুর কি পরিচয় পাওয়া যায়—আলোচনা কর।

উত্তর ঃ 'মহেশ' গল্পে এক গৃহপালিত ষাঁড়কে নিয়ে গ্রামের দরিদ্র ভাগচাষী গফুর জোলার উপর সেই গ্রামের জমিদার শিবচরণবাবুর নির্মম অত্যাচারের চিত্র উদ্‌ঘাটিত।

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট। তবু তার দাপটে প্রজারা টুঁ শব্দটি করতে পারে না। এমনি প্রতাপ।

জমিদার শিবচরণবাবুর চরিত্রটি গফুরের মতো সক্রিয় ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের অখণ্ড রূপ নিয়ে আমাদের সামনে ধরা পড়েনি। তিনি গল্পের নেপথ্যবর্তী। প্রত্যক্ষতঃ তাঁকে আমরা দেখি না। কিন্তু তার দোর্দণ্ড প্রতাপের আঘাতে বার বার জর্জরিত হয়েছে গফুর। এবং সর্বশেষে এই জমিদারেরই পৈশাচিক অত্যাচারের ফলে গফুর তার প্রাণপ্রিয় ষাঁড় মহেশকে হত্যা করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। শিবচরণবাবুর প্রবল প্রতাপের পরিচয় গল্পের আদ্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

শিবচরণবাবু প্রজা পীড়নে নিপুণ এক মধ্যসত্বভোগী। প্রজাপীড়নে প্রশাসনের প্রশ্রয় এরা চিরদিন পেয়েছে।

এই জমিদারের মুখপাত্র হলেন ব্রাহ্মণ যাজক তর্করত্ন, পেয়াদা প্রমুখ ব্যক্তিরা। এরা তোষামুদে প্রভুর আজ্ঞাবাহী স্তাবক শ্রেণীর মানুষ। জমিদারের অন্যায়টুকু দেখেও এরা দেখে না। সর্বদা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তর্করত্ন গফুরের ষাঁড়টিকে অভুক্ত অবস্থায় দুপুর পর্যন্ত এক জায়গায় বাঁধা অবস্থায় দেখে তাকে এই গোজাতির প্রতি অবহেলার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়ে দিয়েছে—"এ হিন্দুর গা, ব্রাহ্মণ জমিদার, গো হত্যা হলে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে।"

শিবচরণবাবু প্রজাহিতৈষী জমিদার—গো প্রতিপালক। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ—প্রকারান্তরে তর্করত্ন সেটাই প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। এই শিবচরণবাবুর প্রজা বাৎসল্যের পরিচয় এই—তিনি গ্রামের গোচরভূমিটুকু অর্থের লোভে বিলি করে দিয়েছেন। মাঠে দারুণ গ্রীষ্মে সামান্য তৃণও নেই। কার্যতঃ শিবচরণবাবুই গো জাতির কবরে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অন্নহীন মানুষ ও পশুকে দু মুঠো অন্ন দিতে তার হাত সরে না, অথচ কেড়ে নিতে পারেন তাদের মুখের গ্রাস। তর্করত্নের কাছে তিনি প্রজা দরদী গো জাতি প্রতিপালক ন্যায়পরায়ণ ধর্মনিষ্ঠ জমিদার।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় থেকে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে মধ্যসত্বভোগী এক ক্ষুদে জমিদার শ্রেণীর উদ্‌ভব ঘটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সুকৌশলে এক নূতন সামন্ততন্ত্রের প্রবর্তন করে। শিবচরণবাবু তাদেরই প্রতিনিধি। পূর্বেকার জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে প্রজাহিতৈষী ছিলেন। নানা উৎসব অনুষ্ঠানে প্রজারা তাদের বাড়ীতে সমবেত হত। দ্বার খোলা থাকত প্রজাদের জন্য। অন্নহীন বস্ত্রহীনরা অন্নবস্ত্র পেত। কিন্তু দেখা

যায় শিবচরণবাবুর ছেলের জন্মতিথি উপলক্ষে অভিজাতদের আমন্ত্রণ। গফুরের মতো দরিদ্র প্রজাদের—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।'

তর্করত্নের ভাষায় শিবচরণবাবু ব্রাহ্মণ জমিদার—গোহত্যা হলে তিনি দণ্ডদাতা। কিন্তু গ্রামে যখন গরুর খাদ্য নেই—দরিদ্র কৃষকের পক্ষে গরুর খাদ্য যোগানো অসম্ভব,—তখন জমিদারের উচিত অনাহার থেকে গরুকে বাঁচানো। এ ব্যাপারে অর্থাৎ গোহত্যা নিবারণে পালকেরই দায় দায়িত্ব বেশি। শুধু এই নয়, শিবচরণবাবু এমনই নির্দয় নিষ্ঠুর যে পর পর দুসন অজন্মা সত্ত্বেও চলতি বছরে গফুরের প্রাপ্য খড়টুকু তিনি বকেয়া আদায় করে সব রেখে দিয়েছেন। গফুর খড়গুলি দিতে কাকুতি মিনতি করলেও তাঁর হৃদয় গলে নি। শিবচরণ অর্থলোভী পিশাচ—অজন্মা জনিত দেশের সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রজাদের দুঃখ কষ্টের দিকে তাকাবার তার সময় নেই। প্রজারা মরুক, বাঁচুক তাতে তাঁর কি আসে যায়। হাতে যখন পেয়েছেন তখন বকেয়া খাজনা বাবদ খড় সব আত্মসাৎ করলেন।

'মহেশ' না খেতে পেয়ে মরিয়া হয়ে দড়ি ছিঁড়ে জমিদারের ফুল বাগানে ঢুকে বাগান তছনছ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের পেয়াদা তলব নিয়ে আসে। অভুক্ত গফুর পরে যাবে জানালে, পেয়াদা বলে—জমিদার তাকে জুতো পেটা করে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছে। দুর্বলের প্রতি সবলের এই ন্যায়পরায়ণতার নমুনা। মহেশের অপরাধের জন্য গফুরকে সাংঘাতিক ভাবে প্রহৃত হতে হয়—তার চোখ মুখ ফুলে উঠে। দেশে যখন অন্নের হাহাকার—গরু মানুষ অনাহারে ক্লিষ্টগত প্রাণ, তখন কেউ রোমান্সের বাসর ঘরে ঘুমায় না। দেশে যখন সবাই মরছে—তখন কেউ বাঁশী বাজায় না। অথচ শিবচরণবাবু ফুলবাগানের সৌন্দর্য উপভোগে ব্যস্ত।

হিন্দুধর্মের ধ্বজাবাহী শিবচরণবাবু যদি প্রকৃতই হিন্দুর আদর্শ মেনে চলতেন, তবে গফুরের হাতে মহেশ প্রাণ হারাত না। দরিদ্রের জন্য, গরুর জন্য তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ অন্ন বিলিয়ে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে শিবচরণবাবুই কসাই—তিনি নরখাদক, গোখাদক। 'মহেশে'র মৃত্যুর পরোক্ষ ও প্রকৃত কারণ শিবচরণবাবু। তিনিই আবার গোহত্যার জন্য গফুরকে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেন। তর্করত্ন বলেছেন—শিবচরণের রাজত্ব রামরাজত্ব। এই হচ্ছে রামরাজত্বের পরিচয়।

আসলে শিবচরণ মায়ামমতাহীন এক অর্থলোভী, স্বার্থপর ও প্রজাপীড়ক জমিদার। গ্রামের গোচরভূমি অর্থের লোভে বিলি বন্দোবস্ত করে দিয়ে বাবু উদ্যানবিলাসে মেতে উঠেন। তার কাছে গফুর লাঞ্ছিত প্রহৃত হয়েছিল বলেই বিস্মৃতির বশে মহেশকে হত্যা করে। সুতরাং শিবচরণবাবু শুধু অর্থলোভী, বিলাসী ও প্রজাপীড়ক নন—তিনি গোহন্তারক। গফুর গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার সময় যথার্থই বলেছে—"যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"

শিবচরণ পূর্বেকার গ্রামবাংলার প্রজাপীড়ক জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি। এরা মানব সভ্যতার ক্যান্সার। শরৎচন্দ্র অতি বিশ্বস্তভাবে এই জমিদারকে সামনে না এনেও সুন্দরভাবেই তাঁর অত্যাচারের দিকগুলি বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন। এর ফলেই শিবচরণের প্রতি পাঠকের ঘৃণা বর্ষিত হয়।

বিরিঞ্চি বাবা

পরশুরাম (রাজশেখর বসু)
(১৮৮০—১৯৬০)

লেখক পরিচিতি :

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের এক স্বনামধন্য সাহিত্যিক পরশুরাম। লেখকের আসল নাম রাজশেখর বসু। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ রাজশেখর বসুর জন্ম। বসু পরিবারের লোকেরা অল্পবিস্তর সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজশেখর বসু সেই গুণের অধিকারী হন।

জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় রাজশেখর বসুর পিতাকে নানা জায়গায় চাকুরী করতে হয়। ফলে পিতার সঙ্গেই লেখককে বেশ কিছুকাল বাইরে কাটাতে হয়। পিতা বিহারে থাকাকালীন রাজশেখর বসু দ্বারভাঙ্গা স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করেন। পাটনা কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করে ১৮৯৭ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি বি. এস. সি পাশ করেন। এম. এস. সি পরীক্ষায় তিনি রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি আইন পরীক্ষাও পাশ করেন। মাত্র তিন দিন হাইকোর্টে গিয়ে সেদিকে আর পা বাড়ান নি।

রাজশেখর আচার্য জগদীশ বসুর কাছে পড়াশুনা করেন। এই প্রতিভাধর ব্যক্তিটির প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলে রাজশেখর বেঙ্গল কেমিকেলের রাসায়নিক পদে নিযুক্ত হন। অচিরে তাঁকে ম্যানেজারের পদে উন্নীত করা হয়। রাজশেখর কেবলমাত্র একনিষ্ঠ রাসায়নিক ছিলেন না। তাঁর মধ্যে উচ্চস্তরের সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল। তা প্রমাণিত হল 'গড্ডলিকা' গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। বইটি লিখে রাজশেখর রবীন্দ্রপ্রশংসায় অভিনন্দিত হন। এতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আশঙ্কা করেন যে রাজশেখর হাতছাড়া হবে যাবে। তিনি রসায়নাগার ছেড়ে সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করবেন। আর রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, জন্মসাহিত্যিক রাজশেখর নিজ বাসভূমি ছেড়ে ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করেছেন। এতে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশে বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু রাজশেখর প্রমাণ করলেন তিনি সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক।

পরশুরামের সাহিত্যিক প্রতিভা :

সাহিত্যিক হিসাবে রাজশেখরের প্রধান পরিচয় তিনি সরস হাস্যরসাত্মক গল্পের স্রষ্টা। সেক্ষেত্রে তিনি রাজাধিরাজ। কিন্তু কেবলমাত্র সৃজনমূলক রচনাতেই রাজশেখরের প্রতিভা নিয়োজিত হয় নি। অনুবাদ কর্মে ও চিন্তাভাবনার বিচিত্র দিকে তাঁর মৌলিক মননশীলতার পরিচয় মিলে। রামায়ণ-মহাভারত-মেঘদূতের সটীক অনুবাদে, বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা'র সৃষ্টিতে, বানান ও পরিভাষা তৈরীর কাজে,

বাংলাছন্দের প্রকৃতি নির্ধারণে ও বিবিধ বিষয়ের সমালোচনায় রাজশেখরের বিদগ্ধ মননশীল প্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষর রয়েছে।

পরশুরাম কর্মজীবনে বহুবিচিত্র লোকের সান্নিধ্যে আসেন। ফলে তাঁর গল্পগুলির মধ্যে বাস্তবচরিত্রগুলি উজ্জল হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে চরিত্রগুলি সমস্ত খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মূর্ত। পরশুরামের গল্পের সংলাপ সরল ও অনলংকৃত। সেই ভাষা এমনই সাবলীল ও শক্তিশালী যে চরিত্রগুলির অসঙ্গতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি তাতে খুব জীবন্ত হয়ে উঠে। পরশুরামের সংলাপ তাঁর গল্পের কাহিনীর মতোই হাস্যরসোচ্ছল ও পরম উপভোগ্য।

পরশুরামের গল্পগুলির মধ্যে নাটকীয় উপাদান প্রচুর। তিনি কেবল চরিত্রকে বর্ণনা করেন না। কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হাস্যরসাত্মক সংলাপের মাধ্যমে অসঙ্গত বিষয়কে পরম আস্বাদ্য করে তুলেন।

রাজশেখরের গল্পগুলি জীবনরসে পরিপূর্ণ। তাঁর হাস্যরসে বুদ্ধির খেলা নেই। জীবনের স্বভাবধর্মের মধ্য থেকেই হাস্যরসের ধারা স্বতোৎসারিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে চরিত্রগুলি নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাসির কলধ্বনি তুলেছে। রাজশেখর হাস্যরসিকের দৃষ্টি নিয়ে জীবনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ত্রুটিবিচ্যুতির দিকগুলিকে নিয়ে হাস্যরসের ফোয়ারা বইয়ে দিয়েছেন। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি যে পরিবেশের মধ্যে চলাফেরা করে—সেই সব পরিস্থিতির প্রভাবই অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এইখানে রাজশেখর বাংলাসাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন।

রাজশেখরের গল্পগুলি একটু মনোযোগ সহকারে পড়লে দেখা যাবে—আধুনিক জীবনের জটিলতার বিভিন্ন দিকই তাঁর গল্পে শিল্পসিদ্ধিলাভ করেছে। আধুনিক জীবন একদিকে যেমন দুঃখভারে মন্থর, অন্যদিকে তেমনি কৌতুককর অসামঞ্জস্যের বস্তুতে পরিণত। পরশুরাম বাঙালী জীবনের অসামঞ্জস্য ও বিপর্যয়ের দিকটিকে গ্রহণ করে হাসির প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। সংস্কারকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি জীবনকে দেখেন নি। শিল্পীর মন দিয়ে তিনি জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে গল্পের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি মানবজীবন নাট্যের এক বিশেষ দ্রষ্টা ও রূপকার।

বিরিঞ্চি বাবা ঃ রসগ্রাহী আলোচনা ঃ

আলোচ্য গল্পটি 'কজ্জলী' গল্পগ্রন্থের (১৩৩৫) প্রথম গল্প। পরশুরামের গল্প যেমন হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার, তেমনি তাঁর গল্পের নামকরণও হাস্যরস-উদ্রেককারী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'কচি-সংসদ', 'ভূষণ্ডীর মাঠ', 'চিকিৎসা সংকট', 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ও 'উলটপুরাণ' প্রভৃতি নামগুলি শুনামাত্রই পাঠকের চিত্তকে হাস্যরসের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পটিও বেশ হাস্যরসে পরিপূর্ণ। এখানে ধর্মের নামে লোভ ও ভণ্ডামিকে হাস্যরসের খোরাকে পরিণত করা হয়েছে।

যতই আমরা শিক্ষিত হই না কেন ধর্ম সম্পর্কে আমাদের মনে দারুণ দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন। গুরুর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। কোনো অদ্ভুতকর্মা অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ধর্মগুরুর সংবাদ পেলেই আমরা তাঁর কাছে হাজির হই। গুরুর কাছে প্রার্থনা করি ধনসম্পদ।

আলোচ্য গল্পে রাজশেখর একটি পুরাতন বিষয়কে অবলম্বন করে আশ্চর্যভাবে অভিনবত্ব দান করেছেন। লেখকের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সংস্পর্শে গল্পটি সরস ও সজীবতায় আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। 'বিরিঞ্চি বাবা'র পরিকল্পনা বিশেষ মৌলিকতার দাবী করতে পারে না বিষবস্তুর দিক থেকে। কারণ ধর্ম সম্পর্কিত দুর্বলতা ও বিচারহীন অন্ধগুরুবাদ বাঙালী চরিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এবং বহুপূর্ব থেকেই বিষয়টি সাহিত্যের অঙ্গীভূত। লক্ষ্যিতব্য বিষয় এই যে রাজশেখরের হাতে প্রয়োগ নৈপুণ্যে তা কৌতুককর অভিনবত্ব শিল্পমূল্য লাভ করেছে।

বিরিঞ্চি বাবা সাধারণ গুরু নন। তিনি বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। তিনি কালের আবর্তনকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারদর্শী। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকত্ববাদকে তিনি বিজ্ঞানরাজ্য থেকে সরিয়ে এনে ধনসম্পদ উপার্জনে প্রয়োগ করেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর তাঁর গতিবিধি। পূর্বজন্মের অদ্ভুত সব প্রসঙ্গ তুলে তিনি ভক্তগণকে চমৎকৃত করে দেন। যিশুখ্রীষ্ট তাঁর কাছে সেদিনকার ছেলে মানুষ। তিনি জগৎ শেঠের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ছিলেন, তুলসীদাসকে প্রবৃত্তি মার্গে দীক্ষা দিয়েছেন, চন্দ্রসূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন তিনি। তিনি অনাদি পুরুষ, সর্বোপরি তিনি মানুষের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারেন। এর জন্যই ভক্তবর্গ তাঁর কাছে সর্বদা ভীড় করে। সত্যব্রত, গণেশ মামা, মেসের মেম্বররা, মি. সেন, বহিরুদ্দি, কেবলানন্দ—সবাই মিলে বিরিঞ্চি বাবার পরিবেশটি বেশ জমিয়ে তুলেছেন। কিন্তু বিরিঞ্চি বাবার সমস্তই যে ফাঁকি, ভণ্ডামি ও প্রতারণায় পরিপূর্ণ তা বুঁটি সত্যব্রতর প্রণয় ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রের ফলে ধরা পড়েছে। গল্পের সমাপ্তি প্রণয় কাহিনীর প্রসন্নতায় সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠেছে। বিরিঞ্চি বাবা গল্পে পরশুরাম আমাদের সামাজিক জীবনের ভণ্ডামি, অসাধুতা, কাপট্য, অন্ধসংস্কার বিশ্বাস, মূর্খতা ও অর্থগৃধ্নুতার উপর হাস্যরসের নির্মল ধারা প্রবাহিত করে দিয়েছেন।

কাহিনী সংক্ষেপ ঃ

চৌদ্দ নম্বর হাবসী বাগান লেনের একটি ছোট্ট মেস বাড়ী। বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাঁচছয়জন মেম্বর। ম্যানেজার নিবারণবাবু। মেস বাড়ীতে একটি আলাদা বৈঠকখানা আছে। সেখানে গান বাজনা চলে, নানা মাসিক পত্রিকা পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। পূজোর বন্ধে সবাই বাড়ী চলে গেছে। আছে কেবল নিবারণ আর পরমার্থ। তাদের শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা কলকাতায় আসবে বেড়াতে।

নিবারণ অধ্যাপক, পরমার্থ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দালাল। সন্ধ্যা বেলায় পাশের বাড়ীর নিতাইবাবু প্রতিদিনের মতো আড্ডায় এসেছেন। নিতাইবাবু সংসারের জালায় তিক্তবিরক্ত। সংসারের প্রতি তার অনুরাগ নেই। তিনি একজন সাধু সন্ন্যাসীকে গুরু ধরে সংসার ত্যাগ করতে ইচ্ছুক। পরমার্থ মিরচাই বাবার কথা বলে। এই বাবাজী শুধু লঙ্কা খেয়ে থাকেন আর লঙ্কার প্রেসক্রিপসন দিয়ে হাজার হাজার লোকের অসুখ সারিয়ে দিয়েছেন।

নিতাইবাবু বিভিন্ন সাধন মার্গের কথা বলে শেষে কালমার্গের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। এর স্বরূপ সম্পর্কে নিবারণ জানতে চাইলে তিনি একটি ছোট গল্প বললেন। হরিহর ছত্রের মেলায় একটি লোক খাঁচায় করে কাক এনে দু'আনা করে এক একটি বিক্রী করছে, আর বলছে এদের মুক্তি দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে। এমন সময় এসে পড়ে সাহেবী পোষাক পরিহিত সত্যব্রত। বেকার হয়েও সে অফিসের খাটুনির দোহাই দেয়। পিসিমার উপর তিক্তবিরক্ত। জানায় এখন সে আরশুলা নিয়ে বিব্রত। তাকে তিনটন আরশুলা বিদেশে রপ্তানী করতে হবে। এ সবই সত্যের মিথ্যাভাষণ বলে নিতাই তাকে তিরস্কার করে।

তারপর কথায় কথায় এল ভাল সন্ন্যাসী সন্ধান প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারে সত্য রসিকতা করায় পরমার্থ ভীষণ চটে যায়। নিতাইবাবু একজন অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন সাধু চান। পরামার্থ পরামর্শ দেয় দমদমে গুরুপদবাবুর বাগান বাড়ীতে বিরিঞ্চি বাবার কাছে যেতে। স্ত্রী বিয়োগের পর গুরুপদবাবু গুরুর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছেন। তিনি এখন অন্য জগতের লোক। বিষয় আশয় পুত্রকন্যার প্রতি কোনো আসক্তি নেই। নিবারণ গুরুপদবাবুর কন্যার খবর জানতে চাইলে সত্য সংবাদ দেয় সে এখন ননীদার শালী, নাম বুঁচকি।

পরমার্থ জানায় বিরিঞ্চি বাবা কালস্তম্ভন জানেন। তিনি এক ত্রিকালজ্ঞ সাধু। প্রকৃত ভক্তকে কৃপা করেন। এই কথা শুনে নিতাইবাবু সেই মুহূর্তে তার শরণ নিতে দারুণ আগ্রহী হল। ঠিক হল পরদিন বিকেলে সবাই মিলে বাবাজীর কাছে যাবে। বাবাজীর কাছে কেউ কিছু বৈষয়িক প্রার্থনা করবে না।

ন্যালা-খ্যাপা ননী প্রফেসর আখ্যা পেলেও প্রফেসরী সে কোনদিন করেনি। বাড়ীতে নানা রকম বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করে। স্ত্রী নিরূপমা একাজে তাকে দস্তুর মতো সাহায্য করে। নিরূপমা নিবারণের প্রশ্নের উত্তরে গুরুপদবাবুর গুরু নিয়ে মাতামাতির কথা জানায়। সত্য এ বিষয়ে ননীদাকে অনুযোগ করে। সত্যের অভিপ্রায় বাবাজীকে উত্তম মধ্যম ধোলাই দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। নিরূপমা এতে সম্মতি দিতে ইচ্ছুক নয়। তা সত্ত্বেও নিরূপমা বিরিঞ্চি বাবার সব ভোজবাজী বা ভণ্ডামী সম্পর্কে তাদের অবহিত করায়। সব শুনে, সত্য, নিবারণ ও ননীদা একটা কর্মপন্থা ঠিক করে বিরিঞ্চি বাবাকে জব্দ করার জন্য। অতঃপর তারা সদলে বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হয়।

বিকেল পাঁচটায় দমদমের বাগান বাড়ীতে বিরিঞ্চি বাবার আসর। ভক্তরা একটা বড় ঘরে শতরঞ্চির উপর বসেছে, বাবাজী তক্তাপোষে আসীন।

পরামার্থ ও নিতাইবাবুকে ঘরে বসিয়ে সত্য ও নিবারণ বাগানবাড়ী ঘুরে ফিরে দেখে নেয়। সেখানকার দারোয়ান প্রভৃতিকে কিছু কিছু ঘুষ দিয়ে আগেভাগে হাত করে নেয়। দেখল সবারই রাগ বিরিঞ্চি বাবার উপর। মৌলবী, ফেকু সবাই বিরিঞ্চি বাবার উপর বিরক্তি ও বিরূপতার কথা প্রকাশ করে। সত্য ও নিবারণ নিজেদের কাজ হাসিল করার সুযোগ গ্রহণ করল। বিরিঞ্চি বাবা প্রকৃত সাধু নন, এক মস্তবড় ভণ্ড—এটা তারা ধরে ফেলে। সত্য গণেশ মামাকেও হাত করল তার ছোট জামাইয়ের চাকরী ঠিক করে দিবে কথা দিয়ে। মামাবাবুর কাছে তারা ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেবদর্শন করার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রার্থী। মামাবাবু প্রথমে রাজী হননি, কারণ যতদিন গুরুপদবাবু সংসার থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, ততদিন তার লাভ। শেষ পর্যন্ত সত্য ও নিবারণের বুদ্ধি কৌশলে তিনি সম্মত হতে বাধ্য হলেন।

বিরিঞ্চি বাবা সভা আলোকিত করে বসে আছেন। তাঁর চেহারাটি হৃষ্টপুষ্ট—স্বামীগিরির উপযুক্ত। পরণে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। বয়স পাঁচহাজার নয় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। তাঁর ডানদিকে রয়েছেন ছোট মহারাজ কেবলানন্দ। বেদীর নীচে বাঁদিকে গুরুপদবাবু। মহিলারা পাশের ঘরে। প্রথম সারিতে বসে রয়েছে গুরুপদ-বাবুর কন্যা বুঁচকী। সত্য ও নিবারণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে আসন গ্রহণ করল। সত্য ও নিবারণ বাবাজীর অচেনা নয়। অতীত ইতিহাসের ধূসর জগতে পূর্বেই এদের সঙ্গে বাবাজীর সাক্ষাৎ হয়েছে। নেপালে, মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের মাতৃশ্রাদ্ধে। শেষে তিনি নিবারণকে ধূর্জটীমন্ত্র দিলেন।

বাবাজীর ভক্তদের মধ্যে সৌখীন মুৎসুদ্দী গোবর্ধন মল্লিক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের মধ্যে কোনটি শ্রেয় জানতে চাইলেন। বাবাজী বললেন, তিনি প্রথমে তুলসীদাসের কাছ থেকে এরূপ প্রশ্ন শোনেন। ফলে তিনি তুলসীদাসকে প্রবৃত্তির পথ দেখিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম থেকে মানসিংহে রূপান্তরিত করেন। এ কথা শুনে ব্যারিস্টার ও. কে. সেন বিস্মিত মন্তব্য রাখেন—'ওআণ্ডরফুল'।

নিতাইবাবু ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন। তিনি ১৯১৪ সালের যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা জানতে চাইলেন। সত্য হাসি সামলাতে পারে না। বিরিঞ্চি বাবা নিতাই-বাবুর পেশার কথা জিজ্ঞেস করলেন। উত্তর শুনে তিনি বললেন, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি ব্যাপারটা কঠিন সাধনা সাপেক্ষ। তিনি নিতাইবাবুকে সূর্যমন্ত্র দিলেন। বিরিঞ্চি বাবার কাছে যীশু সেদিনকার শিশু। সত্য হাসি সামলাবার চেষ্টা করছে। আর নিবারণ বলছে—বিরিঞ্চি বাবা মনু পরাশরের ইয়ার বন্ধু ছিলেন। এই উক্তির পর বাবাজী দারুণ দম্ভোক্তি করলেন। মনু যখন মানুষ সৃষ্টি করে চারদিকে জল দেখে বিব্রত হন, তখন বিরিঞ্চি বাবা সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিয়ে জল শুকিয়ে দিয়ে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে মনুকে সমস্যা থেকে মুক্ত করেন। সূর্য চন্দ্রকে

নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন বিরিঞ্চি বাবা। সন্ধ্যা সাতটা বাজলে দৈনিক নিয়ম অনুযায়ী বাবাজী তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। নিতাইবাবু বিরিঞ্চি বাবার উপর খুবই বিরক্ত। পরমার্থের সঙ্গে তিনি মিরচাই বাবার কাছে যাওয়ার পরামর্শ করলেন।

এদিকে সত্য বুঁচকীর কাছে চা পানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। বুঁচকী এতে রাজী হয়। কিন্তু সত্য গুরুপদবাবুর কাছে চেঁচিয়ে মেচিয়ে যাতা কাণ্ড করেছে বলে বুঁচকী খুব ক্ষুব্ধ। সত্য বুঁচকীর বাবার কাছে ক্ষমা চাইবে শুনে বুঁচকী খুশী হয়।

রাত নয়টায় মহাযজ্ঞ স্বরু হল। সেখানে অন্তরঙ্গ সব পার্ষদরা উপস্থিত। হোমকুণ্ড থেকে সহসা নীলচে শিখা দেখা গেল। আর তাতে সবাই দেখলেন মহাদেবের মূর্তি ইত্যবসরে সত্যের সংকেত মাত্র বাইরে আগুন লাগার কোলাহল স্বরু। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে আকুল আহ্বান। সত্য ইতিমধ্যে মহাদেবকে সজোরে জাপ্টে ধরেছে। ধরা পড়ল মহাদেব স্বয়ং কেবলরাম। বেচারী বেশ জব্দ। বিরিঞ্চি বাবার সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে যে মিথ্যা বুজরুকী তা ফাঁস হয়ে পড়ল এবার। সত্য নিজে গুরুপদবাবু ও ভাবী বধূ বুঁচকীকে উদ্ধার করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে আগুন কোথাও লাগেনি, এটা ছিল বিরিঞ্চি রহস্য উদ্‌ঘাটনের সত্য কর্তৃক পূর্ব পরিকল্পিত কৌশল।

বিরিঞ্চি বাবা শুধু দাম্ভিক ভণ্ড ও প্রতারক নয়—একজন নির্লজ্জ মানুষ। তিনি গুরুপদবাবুকে তিরস্কার করলেন নাস্তিক বলে। এই নাস্তিক মানুষটার জন্যই হোমানল থেকে দেবতা বেরুল না, বেরিয়ে এল মানুষ।

গোবর্ধনবাবু বিরিঞ্চির উপর বিরক্ত হয়ে হিন্দী-বাংলায় গালিগালাজ করলেন। গুরুপদবাবু আর কোনো ঝঞ্ঝাট না বাঁধিয়ে বিরিঞ্চি বাবার দলবলকে চুপচাপ চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। গুরুপদবাবু সত্য ও নিবারণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ভণ্ড বাবাজীর রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

অতঃপর আহারাদি সমাপ্ত হল। সত্য নিবারণের কাছে মনের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করল—সে বুঁচকীকে বিয়ে করবে। একথা শুনে বুঁচকী বলেছে 'যাঃ'। এতে সত্যের মন ভেঙে যায়। কিন্তু বুঁচকীর কথার অন্তর্নিহিত সত্য নিবারণ বুঝিয়ে দিয়েছে সত্যকে। 'যাঃ'—মানে 'হ্যাঁ'। তারপর মধুরে মধুরে সমাপ্তি।

প্রশ্নোত্তর

১। বিরিঞ্চি বাবার চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

অথবা,

'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

অথবা,

বিরিঞ্চি বাবা চরিত্রটি পরশুরামের এক অপূর্ব সৃষ্টি—আলোচনা কর।

উত্তর ঃ হাস্যরস সৃষ্টিতে পরশুরাম বাংলা সাহিত্যে উচ্চ স্থানের অধিকারী। তিনি আমাদের চারিপার্শ্বের জীবনযাত্রার মধ্যে যে ত্রুটিবিচ্যুতি, অসঙ্গতি ও ভণ্ডামি

বিদ্যমান—সেগুলিকে নিয়ে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে হাস্যরসাশ্রিত করে শিল্পমর্যাদা দান করেছেন। রাজশেখরের গল্পের আখ্যানভাগের মধ্যেই কেবলমাত্র হাস্যরস সীমাবদ্ধ নয়—তার সৃষ্ট চরিত্রগুলির অনেকেই বেশভূষা, আচার আচরণের মাধ্যমে অফুরন্ত হাস্যরস সৃষ্টি করে। আলোচ্য গল্পের বিরিঞ্চি বাবা চরিত্রটি সেই ধরনের। মূলতঃ এই বাবাজীকে কেন্দ্র করেই গল্পটির কাহিনী অগ্রসর হয়েছে এবং রসপরিণতিতে এই বাবাজীর সাধুতার ছদ্মবেশটি অনাবৃত হয়ে ভিতর থেকে লোভী ভণ্ড মানুষটির নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এই বিশেষ ধরনের চরিত্রকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্রের আমদানী এবং নানা টুকরো কাহিনীর সৃষ্টি। তাই প্রধান চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পের নামকরণ খুবই সার্থক। কিভাবে বাক্‌চাতুরীর সাহায্যে আধ্যাত্মিকতা তথা অলৌকিক শক্তিসামর্থ্যের মোহজাল বিস্তার করে কতিপয় ভক্ত-শিষ্যকে তিনি অনুগত রেখে নিজের লোভ ও স্বার্থ চরিতার্থতার কাজে নিমগ্ন ছিলেন এবং কিভাবে দুজন ব্যক্তির বুদ্ধি কৌশলে তার ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে গেল—তা গল্পের মধ্যে সুন্দর ভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছে।

বিরিঞ্চি বাবা বেশ হৃষ্টপুষ্ট—দেহকান্তি উজ্জ্বল। পরণে গৈরিক বস্ত্র। বহু শিষ্য-শিষ্যা পরিবৃত বাবাজীর চরিত্রটি বেশ চিত্তাকর্ষক, তিনি গুরুপদবাবুর দমদমের বাগান বাড়ীতে সভা অলঙ্কৃত করে বসে আছেন। তিনি সভাগৃহে একটি তক্তাপোষের উপর বাঘছাপ মারা কম্বলের উপর বসে আছেন। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন—

"তাঁহার চেহারাটি বেশ লম্বা চওড়া, গৌরবর্ণ মুখ। সুপুষ্ট গালের আড়াল হইতে দুইটি উজ্জ্বল চোখ উঁকি মারিতেছে। দুপয়সা দামের শিঙাড়ার মতো সুবৃহৎ নাক, মৃদুহাস্য মণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে খাঁজে খাঁজে চিবুকের স্তর নামিয়াছে।" স্বামীগিরির উপযুক্ত মূর্তি।

বিরিঞ্চি বাবা বিপত্নীক ও সংসারে বীতরাগ গুরুপদবাবুর বাগান বাড়ীটি ধর্মের ভণ্ডামির দ্বারা সুকৌশলে অধিকার করে নিয়েছেন। তিনি শিষ্যদের কাছে কালস্তম্ভন বিদ্যা জাহির করেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। মহাকাল তাঁর নিয়ন্ত্রণে। সূর্য চন্দ্রকে তিনি নিজের বশে আনেন। তাঁর অভিভাষণের আতিশয্য যে তাঁকে হাস্যকর করে তুলবে সে দিকে বিরিঞ্চি বাবার লক্ষ্য নেই। অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির গালগল্প পেড়ে তিনি শিষ্যদের প্রতারিত করেন। ভক্তদের কিভাবে প্রতারিত করতে হয় তা বিরিঞ্চি বাবা ভালো করেই জানেন। ভণ্ডামীর মধ্যে গাম্ভীর্য রেখে মিথ্যা কথাকে এমন অবলীলা ক্রমে সুসজ্জিত করে বলে চলেন যে তাতে শিষ্য-শিষ্যারা বিস্ময়বিমুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁর বক্তব্যের একটি দৃষ্টান্ত এই—মনু মানুষ সৃষ্টি করে দেখলেন পৃথিবীর চারদিকে অথৈ জল। কোথায় বসবাস করবে মানুষ। তখন তিনি দারুণ সংকটে পড়লেন। এমন সময় বিরিঞ্চি বাবা উপায় করে দিলেন—

"বিবু ভয় কি? আমি আছি, সূর্যবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে। সূর্যের তেজ

বাড়িয়ে দিলুম, চোঁ করে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরে উঠল।" এই প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, সূর্য চন্দ্র চালাবার ভার তার উপর।

বিরিঞ্চি বাবার ভক্ত ঠকাবার ভণ্ডামি আর বেশিদিন চলল না। হাবসী বাগানের মেসবাড়ীর মেম্বর নিবারণ আর সত্য শেষ পর্যন্ত বিরিঞ্চির সব ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দেয়। বিরিঞ্চি বাবা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে শুধু কথার ফুলঝুরী ছড়াত না। ভক্তদের হৃদয়ে এ সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্য যজ্ঞের সাহায্যে মহাদেব, গণেশ, কার্তিক প্রভৃতি নানা দেবতার মূর্তি তাদের দেখাতেন। আসলে তিনি তার সহযোগী ছোট বাবাজী কেবলানন্দকে সাজিয়ে গুজিয়ে সুকৌশলে এই সব কাণ্ড করতেন। সত্য ও নিবারণদের সামনে মহাদেব মূর্তি দেখাতে গিয়ে সদলবলে ধরা পড়লেন।

বিরিঞ্চি বাবা সাংঘাতিক ভণ্ড, ধরা পড়েও তিনি ধরা দিতে চান না। প্রধান শিষ্য ও আশ্রয়দাতা গুরুপদবাবুকে তিনি নাস্তিক বলে তিরস্কার করলেন। নাস্তিকের সামনে ভগবান আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন না। তাই মহাদেবের বদলে বেরিয়ে এলো কেবলরাম। গুরুপদবাবুর মন্দ ভাগ্যই বটে। বিরিঞ্চি বাবা বললেন—"তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দেখা দিলেন না, শেষটায় মানুষের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করলেন।"

বিরিঞ্চি বাবার পূর্বাপর বোধশক্তি নেই। তার উক্তি যে তাঁর ভণ্ডামী, আত্মম্ভরিতা ও প্রতারণা বৃত্তিকেই সুস্পষ্ট করে তুলবে—এ জ্ঞান তাঁর নেই। যিনি জগৎশেঠের মাতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তুলসীদাসকে প্রবৃত্তি মার্গে দীক্ষা দিয়ে মানসিংহে রূপান্তরিত করেছেন, সূর্য চন্দ্রের ও মহাকালের নিয়ন্ত্রক যিনি—তিনি ভক্ত নাস্তিক বলেই মহাদেবকে আনতে পারলেন না—তাঁর এই উক্তি তাঁর ভণ্ডামিকে আরো স্পষ্টোজ্জ্বল করে তুলেছে। বিরিঞ্চি বাবার উক্তির যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে সত্যব্রত এই বলে—'বিদ্রূপ বলে বিদ্রূপ। মহাদেব পচে গিয়ে বেরুল ক্যাবলা। বিরিঞ্চি বাবা হয়ে গেলেন জোচ্চোর।'

বিরিঞ্চি বাবার চরিত্রে রাজশেখর দম্ভ, মিথ্যাচারণ, কূটকৌশল, চাতুরী ও ছলনা প্রভৃতি দুর্গুণকে অতিশয়িত করে চরিত্রটিকে হাস্যকৌতুকের রসসম্পদে পরিণত করেছেন। অসংগত চরিত্রগুলির উপর রাজশেখরের ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন থাকলেও—কোথাও তিনি হিতবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। চরিত্রগুলির যথাযথ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতির শাস্তিবিধান করা লেখকের ধর্ম নয়। তাই গুরুপদবাবুর মাধ্যমে তিনি বিরিঞ্চি বাবাকে সসম্মানে দমদমের বাগান বাড়ী থেকে বিদায় করে দিয়েছেন। ভণ্ডামীর জন্য তার উপর কোনো অত্যাচার হয়নি।

২। 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পে যে সব চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ পরশুরামের একটি বিখ্যাত হাস্যরসাত্মক গল্প 'বিরিঞ্চি বাবা'। এই গল্পের প্রধান চরিত্র বিরিঞ্চি বাবাজী। সে এক ভয়ঙ্কর কূটকৌশলী, ভণ্ড, দাম্ভিক ও

প্রতারক চরিত্র। ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে, অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বলে বাবাজী অপরের সম্পদ করায়ত্ত করতে সিদ্ধহস্ত। এই চরিত্রকে কেন্দ্র করে আমরা দেখি গল্পে আরো অনেক ধরনের চরিত্র ভীড় করে এসেছে। বিভিন্ন চরিত্রের সমবায়ে বিরিঞ্চি বাবা চরিত্রটি আপন স্বরূপে অখণ্ড ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

আলোচ্য গল্পে প্রায় বারোটি বিচিত্র প্রকৃতির চরিত্র পরশুরাম পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। চরিত্রগুলি আমাদের একান্ত জানাশোনা রূপেই প্রতীয়মান। এক কথায় 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পটিকে একটি চরিত্র চিত্রশালা বলা যেতে পারে। বিরিঞ্চি বাবা ছাড়া এখানে রয়েছে নিবারণ, পরমার্থ, নিতাইবাবু, সত্যব্রত, প্রফেসর-ননী, গুরুপদবাবু, গণেশ মামা, গোবর্ধন মল্লিক, মিঃ ও. কে. সেন, কেবলরাম, পাঁড়েজী ও বুঁচী প্রভৃতি চরিত্র। প্রত্যেকটি চরিত্র স্ব স্ব ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

নিবারণ কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। আবার মেস বাড়ীর ম্যানেজার সে। সাধু ও সাধন মার্গে তাঁর আস্থা নেই। তিনি সংসারে বীতরাগ নিতাইবাবুকে সাধুসন্তদের সম্পর্কে আলোকিক সব কাহিনী বলে মজা লুটেন। প্রফেসর ননী তার সহযোগী। ননীর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে নিয়েও তিনি ব্যঙ্গ করেন। ননীর স্ত্রী নিরূপমাকে সে ব্যঙ্গ করে বলে—'ননীর বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না।'

নিবারণ বুদ্ধিমান লোক। বিরিঞ্চি বাবার ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য তিনি দমদমার বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হন। বিরিঞ্চি বাবার পা ছুঁয়ে তিনি বকধার্মিকতার চূড়ান্ত পরিচয় দিলেন। বাবাজী তাকে পরম ভক্ত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি মনে করে তাকে জগৎ শেঠের খাঁজাঞ্চী ও পূর্বপরিচিত বলে উল্লেখ করেন। এতে নিবারণের কাজ অনেকটা সহজ হয়। বাবাজীর আতিশয্যপূর্ণ বাগাড়ম্বরে সত্যের হাসি পেলে নিবারণ তাকে বুদ্ধি-কৌশলে সামাল দেয়। সত্যব্রতর প্রণয় ব্যাপারে সে সহযোগিতা করে। নিবারণই শেষ পর্যন্ত হোমঘরে গিয়ে বিরিঞ্চি বাবার সব ফন্দিফিকির প্রকাশ করে দেয়।

পরমার্থ নিবারণের ঠিক বিপরীত। সে ইনসিওরেন্স-এর দালাল। আবার হঠযোগ ও থিওসফির চর্চা করে। বিভিন্ন সাধুসন্তদের অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সে অবহিত। বিরঞ্চি বাবার আড্ডায় তাকে আমরা পরম আস্থাবান ধৈর্যশীল শ্রোতা হিসাবে প্রত্যক্ষ করি। সুখের বিষয় বাবাজীর ভণ্ডামি ফাঁস হবার আগেই ট্রেন ধরার জন্য সে চলে যায়।

নিতাইবাবু মেস বাড়ীর একজন সদস্য। নিয়মিত আড্ডায় যোগ দিতেন। তিনি আর পাঁচজনের মতো বিষয়কামী সংসারী মানুষ। তিনি পরমার্থ চান না—চান ঐহিক শ্রীবৃদ্ধি। বিরিঞ্চি বাবার কাছে লোহার ব্যবসায় সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। কিন্তু বাবাজী এ ব্যাপারে তাকে নিরস্ত করেন এই বলে যে পার্থিব ধন সম্পদ লাভ কঠিন সাধন সাপেক্ষ। বাবাজী তাঁকে সূর্যমন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাই ব্যর্থমনোরথ হয়ে তিনিও স্টেশনে চলে যান।

প্রফেসর ননী কোনো কালে অধ্যাপক ছিলেন না। তবু লোকে তাকে এই নামে

ডাকত। সে কৃতবিদ্য ব্যক্তি—বহু বিষয়ে পাশ করেছে। বাতিকগ্রস্ত মানুষ। বিজ্ঞান গবেষণার নামে উদ্ভট বিষয় নিয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সে বিশ্বের খাদ্যাভাব দূর করবে বলে বিরাট ডেকচিতে গাছ সিদ্ধ করে। দেখতে চায় ঘাস থেকে সুখাদ্য তৈরী হয় কিনা। স্ত্রী নিরুপমা তার গবেষণায় সহযোগিনী। ননী নির্লোভ। গুরুপদবাবু তাঁর শ্বশুর। সব জেনেশুনে ননী শ্বশুর মহাশয়কে সন্ন্যাসীর কবল থেকে মুক্ত করতে চান না। পাছে লোকে ভাবে বিষয়সম্পত্তির লোভে সে এসব করছে। সত্যব্রত বলেছে ননীদা—'হ্যালা খ্যাপা' লোক। এটাই ননীর আসল পরিচয়।

সত্যব্রত অত্যন্ত আমুদে প্রকৃতির মানুষ—বিলাতী পোষাকে অভ্যস্ত তরুণ যুবা। সত্যব্রত ব্রাহ্মণ। পিসিমার কথায় ধর্মসভায় তাকে যেতে হয়—তবে ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহ ও আস্থা নেই বললে চলে। বৈষয়িক বিষয়ে আগ্রহ বেশী। ক্ষেত্র বিশেষে সত্যব্রত মিথ্যা কথা বলাকে অন্যায় মনে করে না। নিবারণের অভিযানে সত্য তার প্রধান কৌশলী সহযোগী ছিল। গুরুপদবাবুকে গুরুর রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির ব্যাপারে সত্যের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এর পুরস্কার স্বরূপ সে বুঁচকীর প্রণয় লাভে সমর্থ হয়েছে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। বিরিঞ্চি বাবার উদ্ভট কথায় সে অদ্ভুত কল্পনার আশ্রয় নিয়ে হাস্যসংবরণ করেছে। সত্যব্রত চরিত্রটি রাজশেখরের হাস্যরস-সৃষ্টির মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দেয়।

গুরুপদবাবু বিপত্নীক ব্যক্তি, ননীর শ্বশুর। সংসারের প্রতি আর অনুরাগ নেই। একদা আইন ব্যবসা করে ধনী হন। বর্তমানে পত্নীবিয়োগের দুঃখে বিরিঞ্চি বাবার কাছে উৎসর্গ করেছেন নিজেকে। নিজের বাগান বাড়ীটি ছেড়ে দিয়েছেন গুরু সাধনার জন্য। গুরুজীর সশিষ্য আড্ডা সেখানে। এই গুরুজীর প্রতি গুরুপদবাবুর অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবারণ ও সত্যদের প্রচেষ্টায় যখন গুরুজীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল তখন তিনি যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। গুরুপদবাবু গম্ভীর ও রাশভারী মানুষ। গুরুজীর অপকর্ম জেনেও তাকে সামান্যতম কটূক্তি করলেন না। সসম্মানে চলে যেতে বললেন।

গণেশ মামা আর এক ধুরন্ধর ব্যক্তি। তিনি নিজের স্বার্থ ও সিদ্ধি ছাড়া আর কিছু বুঝেন না। বিরিঞ্চি বাবার হোমঘরের দরজা তিনি আগলে থাকেন। এই ধূর্ত ব্যক্তিটির বুদ্ধিশুদ্ধি কম। নির্বোধ বললে চলে। সত্যব্রত গণেশ মামার বেকার জামাতাকে চাকরী দেবার লোভ দেখিয়ে নিজের কাজ হাসিল করেছে। গণেশ মামা বিবেকবর্জিত এক স্বার্থপর ব্যক্তি। চরিত্রটি যথেষ্ট হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে।

গোবর্ধন মল্লিক বৃদ্ধ হলেও যথেষ্ট বিলাসী ও ইন্দ্রিয়ভোগী। সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। ঘরে তৃতীয়পক্ষের বউ। বিরিঞ্চি বাবার বিশিষ্ট ভক্ত তিনি। তার জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের মধ্যে কোনটি শ্রেয়। বিরিঞ্চি বাবা শিষ্যের স্বভাবচরিত্র জেনে যোগ্য উত্তর দেন ভোগের মাধ্যমে নিবৃত্তিই শ্রেয়। গোবর্ধন নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করেন। অথচ মহাদেববেশী কেবলানন্দের কাছে তিনি

ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি কামনা করেন। জানেন না মহাদেব ত্যাগের প্রতীক। কেবলানন্দের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হলে রেগেমেগে গোবর্ধন বলে—"গোবর্ধন মল্লিক বড় বড় ইংরেজ চরিয়ে খায়, তাকে তুমি ঠকাবে।" এই চরিত্রটিও স্বভাবগুণে অফুরন্ত হাস্যরস সৃষ্টি করেছে।

এ. কে. সেন একজন ব্যারিস্টার। বিরিঞ্চি বাবার তিনি বিশেষ ভক্ত। ব্যারিস্টার আবার কয়লার ব্যবসায়ী মি. সেন। ফলে তার চরিত্র অসঙ্গতিতে ভরা। বিরিঞ্চি বাবা যীশুকে সেদিনকার ছেলে বলে মন্তব্য করলে মি. সেন বিস্ময়ে বলেন—"মাই গড"। মি. সেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বটে, কিন্তু তার মনে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বদ্ধমূল।

কেবলানন্দ বিরিঞ্চি বাবার চেলা। সে ছোট মহারাজের খ্যাতি প্রতিষ্ঠায় মত্ত। হোমঘরের পুরোপুরি দায়িত্ব তার উপর। ভক্তদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতার ভূমিকায় তিনি হোমশিখা থেকে আবির্ভূত হন। কেবলানন্দ কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে নি। আগুনের ভয়ে হোমঘর থেকে পালাতে গিয়ে সত্যব্রতর কাছে ধরা পড়ে। আত্মরক্ষার জন্য সে সত্যব্রতর হাতে কামড়ে দেয়। ছোট বাবাজীর সম্মান তার আর থাকল না। কেবলানন্দ হয়ে গেলেন সম্পূর্ণ ক্যাবলা।

ফেকুপাঁড়ে ও বছিরুদ্দি হল ভীরু ও হাবড়া ভাবের চরিত্র। বুঁচীর তেমন কোনো ভূমিকা নেই। সে ব্রীড়াবনতা বাঙালী ভদ্র ও বর্ধিষ্ণু ঘরের কন্যা। পিতার গুরুজীর কাছে সত্যব্রত হৈচৈ করলে সে ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু সত্যব্রতকে দেখে সে 'নব অনুরাগিনী রাধা'। সত্যব্রতর সঙ্গে তার অনুরাগ প্রণয় মধুরেনসমাপয়েৎ হয়েছে।

নিরুপমা স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী। স্বামীর খেয়াল ও উদ্ভট গবেষণায় সে সুখী। স্বামীর গবেষণা কর্মে নিরুপমা পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করেছে।

'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পে প্রধান চরিত্র বাবাজী ছাড়া অন্যান্য সব চরিত্রগুলি অল্পবিস্তর কৌতুকরস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। মূল চরিত্রের পরিপূরক হিসাবে সকলেই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আর সকলেই মূল চরিত্রের কৌতুককর অসঙ্গতিকে নিজ নিজ অসঙ্গতি ও ত্রুটিবিচ্যুতির কৌতুকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। নিজ নিজ কৌতুকের তরঙ্গ তুলে সবাই শোভাযাত্রা করেছে কৌতুকের তুঙ্গ দেশে।

৩। 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পের হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা

"রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের মধ্যে স্বতোৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে"—'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প অবলম্বনে এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

অথবা,

'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পে হাস্যরস সৃষ্টিতে পরশুরামের কৃতিত্ব বিচার কর।

উত্তর : বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরশুরামের স্থান সর্বোচ্চে।

তিনি শুভ্র নির্মল অনাবিল হাস্যরসের স্রষ্টা। তাই পরশুরামের আসল পরিচয় রসশেখর রাজশেখর।

মানুষের আচার আচরণে কামনা-বাসনার মধ্যে ত্রুটি, দুর্বলতা ও অসঙ্গতির অন্ত নেই। সেই অসঙ্গতি থেকেই সাহিত্যিকরা হাস্যরস সৃষ্টি করেন। অনেকে মানুষের অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলেন। আবার অনেক সাহিত্যিকের জীবনের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি থাকে। জীবনের উপর তারা কোনো প্রকার আঘাত না করে চলমান জীবনের খুঁটিনাটি বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেন। তাদের আচার আচরণ, বেশভূষা, কথাবার্তা ও কাজকর্ম যে কতখানি কৌতুককর লেখকের শিল্প দৃষ্টিতে তা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এখানে লেখক জীবনের স্বরূপকেই শিল্পশ্রী মণ্ডিত করে তুলেন। জীবনের প্রতি তাঁর কোনো স্বকীয় বিচার প্রবণতা থাকে না। তিনি জীবনের ব্যাখ্যাকার মাত্র। ডাক্তারীর প্রেসক্রিপসন করা তাঁর কাজ নয়। পরশুরামের গল্পগুলিতে জীবনের অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির দিকগুলি হাস্যরসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পরশুরাম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগত সংলাপ, উদ্‌ভট পরিবেশ ও সংস্থানগত অসঙ্গতি সৃষ্টি করে অনাবিল হাস্যরসের ধারা বইয়ে দিয়েছেন। তিনি বাস্তববাদীর দৃষ্টি নিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা ও কর্মপ্রবাহকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আধুনিক সভ্যতার জটিলতার মধ্যে মানুষের মনঃপ্রকৃতিকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপলব্ধি করেছেন। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজশেখর চরিত্রগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে বর্ণদীপ্ত করার জন্য আপাত উদ্ভট পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রগুলিকেও তিনি যথাসম্ভব স্বভাবধর্ম অনুযায়ী নামে চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে অফুরন্ত হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে এবং চরিত্রগুলি মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে। এখানেই শিল্পী হিসাবে রাজশেখরের কৃতিত্ব। রসশেখর রাজশেখরের হাস্যরস জীবনধর্মের মধ্য থেকেই স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণীয়—

"রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের মধ্যে একটা স্বতঃউৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার রসিকতার প্রবাহ বুদ্ধির বক্রক্রীড়ায় ঘোলাটে হয় নাই, সূর্য করোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজসাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে।"

বাস্তবিকই জীবনে অসঙ্গতি, ভণ্ডামি, লোভলালসা ও নানাপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি আছে বলে পরশুরাম তার প্রতি জালাধরা কটাক্ষ বা তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত করেন নি। তিনি অপূর্ব হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রের স্বরূপ বা সেইসব ভণ্ডামীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিরিঞ্চি বাবা। তিনি দাম্ভিক, ভণ্ড, প্রতারক ও নির্লজ্জ এক ব্যক্তি। তাছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলিও বিচিত্র অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। তাদের উক্তি ও আচরণ আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গত ও বিশ্বাস্য। তাদের অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপই হাস্যরসাত্মক কাহিনী সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

নিতাইবাবু সংসারের প্রতি বীতরাগ। আসলে এটা তাঁর ছদ্মবেশ। তিনি ভয়ানকভাবে সংসার অনুরাগী। ব্যবসায়ে লক্ষপতি হতে চান। পরমার্থ নিতাইবাবুকে তার জন্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 'বিরিঞ্চি বাবার সন্ধান দিয়েছে। মেসবাড়ীর আড্ডায় নানাজনের কথাবার্তায় ও বিভিন্ন প্রসঙ্গের উল্লেখে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। নিতাইবাবু বয়স্ক সদস্য বলে মেসের ছেলেরা একটু সমীহ করে, 'অর্থাৎ পিছন ফিরিয়া সিগারেট খায়।'

নিতাইবাবু আপিসে গিয়ে দুদণ্ড ঘুমাতে পারে না। এর উত্তরে পরমার্থ বলে যে আপিসে ঘুমাবার বেশ ভালো ব্যবস্থা আছে। নিতাই বলে যে উপরওয়ালার কড়া নজর থাকে। এক কর্মচারী চেয়ারে বসে লেজার খুলে রেখে ঘুমুতে পারতেন। মেকেঞ্জি সাহেব এসে পড়লে তিনি পায়ের শব্দ পেয়ে বিড়বিড় করে বললেন—'তিনে কত্তি তিন'। অর্থাৎ তিনি যেন হিসাব করছেন। চতুর অথচ রসিক সাহেব পরামর্শ দিলেন—"**Have a cup of tea Babu**". এসব কাহিনীই হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

পরমার্থ নিতাইবাবুর কাছে মিরচাই বাবার কথা বলেছে। তিনি শুধু লংকা খেয়ে থাকেন আর লঙ্কার প্রেসক্রিপসন দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যারাম সারিয়েছেন। পরমার্থ বিভিন্ন সাধন মার্গের কথা বলে। সবশেষে বলে কালমার্গের কথা। কালমার্গ ব্যাপারটা হল খাঁচায় করে কাক এনে দুআনা করে এক একটি বিক্রী ও এদের মুক্তি দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়। এ সমস্ত কাহিনী অপরিসীম হাসির উদ্রেক করে।

সবশেষের কাহিনীর নায়ক বিরিঞ্চি বাবা। যে সে বাবা নয়। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন—ত্রিকালজ্ঞ সাধু। বিরিঞ্চি বাবা গুরুপদবাবুর দমদমার বাগান বাড়ীতে আস্তানা গেড়েছেন। বিপত্নীক গুরুপদবাবু তার প্রধান ভক্ত। তিনি শিষ্যদের বশীভূত করার সব কৌশল জানেন। তিনি কোনো কোনো শিষ্যকে প্রাচীনকালের পটভূমিতে স্থাপন করেন। জগৎশেঠের মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি সম্মানিত অতিথির ভূমিকা নেন। তুলসীদাসকে তিনি নিবৃত্তি মার্গ থেকে প্রবৃত্তি মার্গে দীক্ষা দিয়ে মানসিংহে রূপান্তরিত করেছেন। যিশুখ্রীষ্টকে বলেন সেদিনের ছোকরা। বিরিঞ্চি বাবা মহাধড়িবাজ, তিনি মিথ্যা ভাষণের মহাসম্রাট। বাককৌশলে তিনি শিষ্যদের বিমুগ্ধ করে রাখেন। বিরিঞ্চি বাবা বলেন, বৈবস্বত মনু মানুষ সৃষ্টি করে মহা সংকটে পড়েন। চারদিকে জল থৈ থৈ করছে। ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কি। বিরিঞ্চি বাবা মনুকে অভয় দিলেন। সূর্যবিজ্ঞান তার হাতের মুঠোর মধ্যে। বিরিঞ্চি বাবা সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিলেন—এক নিমেষে চোঁ চোঁ করে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরে উঠল। এইসব উক্তি বাবাজীর ভণ্ডামী ও অন্তসারশূন্যতাকে যেমনি সুস্পষ্ট করেছে—তেমনি হাস্যরসের ধারা প্রবাহিত হয়ে গেছে।

প্রফেসর ননী খেয়ালী গবেষণায় রত। পৃথিবীর অন্ন কষ্ট তিনি ঘোচাবেন। তাই বড় ডেকচিতে ঘাস সিদ্ধ হয়। গবেষণায় দেখতে চান ঘাস থেকে সুখাদ্য তৈরী হয় কিনা। ঘাস সিদ্ধ হচ্ছে দেখে সত্যব্রত ননীর স্ত্রী নিরূপমাকে বলে—'সেদ্ধ হচ্ছে, কেন? ননীর বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না।'

হাস্যরস সৃষ্টিতে ছোট বাবাজী কেবলরামও কম দায়ী নন। বিরিঞ্চি বাবার ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল নিবারণ ও সত্য। রাত নটায় হোম সুরু। হোমানল থেকে মহাদেববেশী কেবলরাম বের হয়ে এলে বাহিরে আগুন লাগার চীৎকার হল। কেবলরাম ধরা পড়ল সত্যের হাতে। তখন কেবলরাম পৌরাণিক সংলাপ ছেড়ে সাদা বাংলায় বলেছে—'আঃ ছাড় ছাড়, মাইরি এখন ইয়ার্কি ভাল লাগে না—চাদ্দিকে আগুন—ছেড়ে দাও বলছি।'

পূর্বেই বলা হয়েছে বিরিঞ্চি বাবা গল্পে বিভিন্ন প্রকৃতির বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তাদের বেশভূষা, উক্তি ও আচরণ, কার্যকলাপ ও ঘটনা সংস্থানের মধ্যে বিপুল হাস্যরসের ফোয়ারা বইয়ে দিয়েছেন রাজশেখর। রাজশেখরের মধ্যে সংস্কারকের মনোবৃত্তি নেই, জীবনের অসঙ্গতিকে সংশোধন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তিনি বিচারক নন, জীবনের রূপস্রষ্টা হাস্যরসিক শিল্পী। রাজশেখরের হাস্যরসের মধ্যে প্রতিবাদের প্রকট জালা নেই। তাঁর হাসির রস অম্লমধুর নয়—পুরোপুরি মধুর। শুধু বিরিঞ্চি-বাবা নয় তার সব গল্পই মধুরেন সমাপয়েৎ।

পাশ ফেল

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯০৮—১৯৫৬)

জীবনী (লেখক পরিচিতি)ঃ

কল্লোলোত্তর বাংলা কথা সাহিত্যে মানিক একটি প্রিয় নাম—বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। মানিকের জন্ম সাঁওতাল পরগণার মুখ্য শহর ডুমকায়। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার মালপছিয়া নামে একটি গ্রামে। কাছেই গাঁওদিয়া গ্রামের মেয়ে নীরদা দেবীর সঙ্গে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। পিতা-মাতার আট পুত্র এবং ছয় কন্যার মধ্যে মানিক পঞ্চম।

মানিকের জন্ম সন সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস এবং গোপাল হালদার-এর সঙ্গে ড. সরোজমোহন মিত্র একমত নন। প্রথমোক্ত সাহিত্যিক ও সুধী ব্যক্তিদের মতে ১৯১০ সালে মানিকের জন্ম। কিন্তু ড. মিত্র মনে করেন ১৯০৮ সালের ১৯শে মে।

শৈশব থেকেই মানিক ছিলেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। হাসি-খুশী-চঞ্চল, নির্ভীক এক প্রাণবন্ত শিশু।

মানিকের বড় দাদা সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে কলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউটে মানিকের লেখা পড়া আরম্ভ হয়। মানিক খুবই মেধাবী এবং নানা বিষয়ে আগ্রহী ছাত্র ছিলেন। পরে

যখন টাঙ্গাইল স্কুলে ভর্তি হন তখন মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যেতেন। তিনি চলে যেতেন জেলে, মাঝি, গাড়োয়ান প্রভৃতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের নিকট সান্নিধ্যের লোভে তাদের নৌকায় বা ঘোড়ার গাড়িতে, কখনো বাড়িতে। এর কারণ আর কিছুই নয় সেকালীন 'কল্লোল-কালিকলমে'র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গল্প-উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবন রূপায়ণ দেখে তিনিও অনুরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে আগ্রহী হন।

টাঙ্গাইলেই ১৯২২ সালে মানিকের জননী নীরদা দেবীর মৃত্যু হয়। এরপর অবস্থা বিপর্যয়ে মানিককে চলে যেতে হয় প্রথমে কাঁথি এবং শেষে মেদিনীপুর সদরে। সেখানকার জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে মানিক ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক দুই গণিত বিষয়েই লেটারসহ উত্তীর্ণ হন। বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ন মিশনারী কলেজে আই-এস-সিতে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন মানিক। বাঁকুড়ার কলেজ-হস্টেল জীবনে মানিক নাকি শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়েছিলেন। প্রচুর সিগারেট এবং কিছুটা মদ্যাসক্তিও তাঁর হয়েছিল। কিন্তু বি. এস-সি পড়াকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজের জীবনে তাঁর আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। তিনি লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

এই গল্প উপন্যাস লেখার জন্যে দাদা তাঁকে ভর্ৎসনা করলে মানিক স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে দরকার হলে তিনি কলেজে পড়া ছেড়ে দেবেন, তবু লেখা ছাড়বেন না।

বঙ্গশ্রী নামে একটি পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদে মানিক কিছুদিন চাকুরী করেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় অল্পদিন পরেই তা ছেড়ে দেন। মানিক মৃগী রোগে ভুগছিলেন। বিবাহ করলে রোগ সারবে চিকিৎসকের এই নির্দেশে তিনি ১৯৩৭ সালে কমলাদেবীকে বিবাহ করেন। ছোট ভাই সুবোধের সহযোগিতায় তিনি প্রকাশন ও মুদ্রণ সংস্থা গড়ে তোলেন।

১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন মানিক। তাঁর পরবর্তী সাহিত্য রচনায় মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এবং এজন্য অবশ্য লেখক হিসেবে মানিককে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। বহু প্রকাশকই তাঁর লেখা ছাপতে রাজী হন নি।

১৯৫৫ সাল থেকে খুবই অসুস্থ ছিলেন মানিক। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ২রা ডিসেম্বর রাত দশটায় তিনি নীলরতন সরকার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাহিত্যিক মানিক :

রবীন্দ্রোত্তর এবং কল্লোলকালীন কথা সাহিত্যে সদ্যসমাগত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে মননিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় :

'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ করিয়া উপন্যাস রচনা করিয়া

প্রখ্যাত হইয়াছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, জননী, শহরতলী, চতুষ্কোণ প্রভৃতি উপন্যাসে ও অতসী মামী, সরীসৃপ, ভেজাল প্রভৃতি ছোট গল্প গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা মানিকবাবু ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়া লইয়াছেন।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল্লোলেরই কুলবর্ধন বলে বর্ণনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'belated kallolian.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মূল্যবোধের বিপর্যয়, মার্কসীয় রাষ্ট্র ও অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন, নাগরিক চেতনা এবং অনিকেত মনোভাব প্রভৃতি যে কয়টি বিশিষ্ট লক্ষণ কথা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে মূলত কল্লোল-কালিকলম এবং প্রগতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় কম-বেশি উদাহৃত হতে দেখা যায়। অবশ্য তাঁর সাহিত্যিক রূপে আবির্ভাব ঘটেছে কল্লোল কালিকলম-প্রগতি প্রকাশনা বন্ধ হবার পর। কল্লোলের প্রথম উচ্ছ্বাস তখন ঝিমিয়ে পড়েছে অনেকখানি। আবেগের অতিরেক মননের গভীরতা ও সুস্থির শিল্পচেতনায় ঝুঁকেছে। কল্লোলের সঙ্গে কল্লোলোত্তর এইসব বৈশিষ্ট্যই মানিকের লেখায় দিয়েছে উল্লেখ্য স্বাতন্ত্র্য। স্বনামধন্য অধ্যাপক ও সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মানিক সম্পর্কে বলেছেন—'...বাংলা কথা সাহিত্যে তিনি স্বয়ংসিদ্ধ।' এবং তাঁর এই মন্তব্য যথাযোগ্য মনে হয় এদিক থেকে যে মানিকের রচনায় এমন একটা সুপরিকল্পিত গঠনভঙ্গি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা রয়েছে যা অন্যত্র দুর্লভ এক অনন্য সম্পদ।

নিরাসক্ত মনোভাব ও বিজ্ঞানবোধের বিশিষ্টতা মানিক প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সাম্যবাদকে লেখক শেষ পর্যন্ত তাঁর চিন্তা ও জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। ছোট বকুলপুরের যাত্রী, হারাণের নাতজামাই প্রভৃতি গল্পের মধ্যে একথার সার্থক সমর্থন খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া এই গল্পগুলি এবং অন্যান্য বহু গল্প মনন নিষ্ঠায়, দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে, চরিত্রবিশ্লেষণে, সুপরিকল্পিত গঠন সুষমায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট গল্পকার রূপেও চিহ্নিত করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

উপন্যাস

১৯৩৫ ১. জননী
২. দিবারাত্রির কাব্য

১৯৩৬ ১. পুতুলনাচের ইতিহাস
২. পদ্মানদীর মাঝি
৩. জীবনের জটিলতা

গল্প সংগ্রহ

১. অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প

	উপন্যাস	গল্প সংগ্রহ
১৯৩৭		১. প্রাগৈতিহাসিক
১৯৩৮	১. অমৃতস্য পুত্রাঃ	১. মিহি ও মোটা কাহিনী
১৯৩৯		১. সরীসৃপ
১৯৪০	১. শহরতলী (১ম পর্ব)	
১৯৪১	১. শহরতলী (২য় পর্ব)	
	২. অহিংসা	
১৯৪৩	১. প্রতিবিম্ব	১. বৌ
		২. সমুদ্রের স্বাদ
১৯৪৪		১. ভেজাল
১৯৪৬	১. শহর বাসের ইতিহাস	১. আজকাল পরশুর গল্প
	২. চিন্তামণি	২. অবস্থিতি
১৯৪৭	১. আদায়ের ইতিহাস	১. খতিয়ান
১৯৪৮	১. চতুষ্কোণ	১. ছোটবড়
		২. মাটির মাশুল
১৯৪৯		১. ছোট বকুলপুরের যাত্রী
১৯৫০	১. জীয়ন্ত	১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
১৯৫১	১. পেশা	
	২. স্বাধীনতার স্বাদ	
	৩. সোনার চেয়ে দামী	
	৪. ছন্দ পতন	
১৯৫২	১. ইতিকথার পরের কথা	
	২. পাশাপাশি	
	৩. সার্বজনীন	
	৪. আরোগ্য	
১৯৫৩	১. তেইশ বছর আগে পরে	১. ফেরিওয়ালা
	২. নাগপাশ	
	৩. চালচলন	
১৯৫৪	১. হরফ	
	২. শুভাশুভ	
১৯৫৫	১. পরাধীন প্রেম	
১৯৫৬	১. হলুদ নদী সবুজ বন	১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প
	২. মাশুল	
	৩. প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান	

উপন্যাস

১৯৫৭ ১. মাটি ঘেঁষা মানুষ

১৯৬০ ১. শান্তিলতা

২. মাঝির ছেলে

পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা এবং অন্যান্য ভাবে প্রকাশিত গ্রন্থাদি :

অসমাপ্ত রচনা

১. মাটির কাছে কিশোর কবি
২. মশাল
৩. বিষ
৪. অন্য একটি রচনা

প্রবন্ধ সংগ্রহ ও বিবিধ

১. লেখকের কথা
২. অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরী ও চিঠিপত্র)
৩. ভিটেমাটি (নাটক)
৪. ইংরাজী, চেক, রুশ ও চীনা ভাষায় অনূদিত পদ্মানদীর মাঝি।

কিশোর সাহিত্য :

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, ২. কিশোর বিচিত্রা, ৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ৯টি গল্প।

'পাশ ফেল' গল্পের কাহিনী সংক্ষেপ :

দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রকাশ একটি ছেলে আই. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরে বিষ খায় আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে।

দুই বন্ধু নীরেন আর বিমল। তারা একই সঙ্গে পরীক্ষার ফল জানতে যায়। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দুজনেই দিয়েছিল এক স্কুল থেকে। কিন্তু এক কলেজে সীট না পেয়ে দুজনে ভিন্ন কলেজ থেকে দিয়েছে আই. এ. পরীক্ষা। তারা অবশ্য থাকে এক পাড়াতেই। ম্যাট্রিকে নীরেনের ফল ভালই হয়েছিল, বিমলেরটা সেরকম হয় নি।

এবারের (অর্থাৎ আই. এর) পাশের হার ছাত্রদের করে তুলেছে আতঙ্কিত। অভিভাবকদেরও একটা বড় অংশ সন্তানদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছেন। প্রাণেশ তাঁর ছেলে নীরেনের ফল জানার ব্যাপারে আগের মতো উৎসাহী নন। অথচ তাঁর উৎকণ্ঠা স্বাভাবিকই ছিল। কেননা নীরেনকে কলেজে পড়াতে গিয়ে গোটা পরিবারকে কত কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মায়ের গয়না খোয়াতে হয়েছে।

বিমলের মতে পাশের হারের স্বল্পতাই সবাইকে নিরুৎসাহ করেছে বেশি। ওর নিজের বাড়ীর সবাই তো ধরেই নিয়েছে বিমল এবার পাশ করতে পারবে না।

ফল প্রকাশের পর দেখা গেল বিমল ফেল করেছে এবং পাশের হারের এ অবস্থায়ও নীরেন পাশ করেছে বেশ ভালো ভাবেই। বিমলের মুখ ম্লান হয়ে যায়। তবে

ফেল করা ছাত্রদের সংখ্যাই যে বেশি এই যা একটু সান্ত্বনা। এর ফলে অবশ্য পাশ করা ছেলেদেরও যেন পাশ করার আনন্দটা জমছে না এবার। নীরেনও পাশ করে পারিপার্শ্বিকতার জন্যে খুশি প্রকাশ করতে পারে না। তার বন্ধু বিমল যে পাশ করতে পারে নি!

এদিকে বিমল বেশ বুঝতে পারে তার ছাত্রজীবনের এখানেই ইতি। বন্ধু নীরেন আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে পরামর্শ দিলে সেকথায় আমলই দেয় না বিমল। বরং জানায় একবার পরীক্ষা দিতে গিয়েই সে তাদের সংসারে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তার ছোট বোনকে অকালে মরতে হয়েছে। পাশ করতে পারলে হয়ত সে পড়ত। কোনো দিকে সে তাকাত না। তার বাবা হয়ত কষ্ট করেও তাকে আরেকটা বছর পড়াশুনো চালিয়ে যেতে বলবেন। কিন্তু সে মোটেই এব্যাপারে রাজী নয়। তার কাছে এ হল জুয়াখেলায় জেতার অসম্ভাব্য সুযোগ।

নীরেন চুপ করে থাকে। নিজেকে পাশ করার দরুণ অনেকখানি অপরাধী মনে হয়।

বিমলদের বাড়ি ফেরার পথে পড়ে আগে। সে একরম জোর করেই নীরেনকে তার পাশের খবরটা জানিয়ে যাবার জন্য বাড়ি টেনে নিয়ে যায়। বিমলের বাড়ির চারদিকেই দারিদ্র্য প্রকট। তার বাবা জরাক্রান্ত। নীরেন দেখল বিমলের ফেলের সংবাদে বাড়ির কেউ এতটুকু অবাক হয় না। এমন কি তেমন দুঃখিতও হয় না। যেন এ ঘটনা কিছু অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিমলের চেয়ে কিছু বড় দিদি তো মন্তব্য করেই বসল, আজকাল ফেল করাটা যেমন দোষের নয়, তেমনি লজ্জারও নয়। অন্য ঘরের জনৈকা ভাড়াটে গৃহিনী একথায় সমর্থন জানিয়ে তাঁর ভাই ও ভাগ্নের যুগ্ম ফেলের কথা ঘোষণা করেন।

দেখা গেল সকলেই একরোখা অভিমানী বিমলকে সান্ত্বনা দেবার উৎসাহে এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিচারে নীরেনের পাশ করার গুরুত্বটাও অনেকখানি লঘু করে দিতে চায় যেন। আর পাশ করে সে নিজেকেও মনে করে অপরাধী। এ বাজারে একজনেরও পাশ করাটা যেন বেমানান।

বিমলের বাবা ভূপেন নীরেনের বাবা প্রণেশের বন্ধু। পাশ করা নীরেনের দিকে যেন দেখতেই পান নি এমন ভান করে বিমলের ফেল করাকে তিনি সমর্থন জানান গম্ভীর কণ্ঠে—ফেল করেছিস তো? বেশ করেছিস্।

সেখানে বিরূপ পরিবেশে আর না দাঁড়িয়ে নীরেন বাড়ি ফিরে খুশি হয়। তার পাশের খবরে বাবার সহকর্মী বন্ধু সুজনবাবু আনন্দ প্রকাশ করেন।

কিন্তু নীরেন তার বাবা প্রাণেশের মধ্যে কোনো আনন্দোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে না। বিমলের অকৃতকার্যতার খবরে প্রাণেশের মন্তব্য—পাশ করেই বা সে কী করত।—শুনে নীরেন অবাক হয়ে যায়। বাবার কাছে যোগ্য অভিনন্দন নীরেন পায় না বটে; কিন্তু বাড়ির ভিতরে গিয়ে সে খুশি হয়। ছোট ভাই বোনেরা তার পাশের খবরে হৈ হৈ শুরু করে দেয়। তার ছোট বোন রেখার উল্লাস ধ্বনির জোর ওপর তলায়

ভাড়াটে দীনেশবাবুর মেয়ে বকুলকে একতলায় নামিয়ে নিয়ে আসে। বকুল এবার দেবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। সেও নীরেনের গরবে গরবিনী হতে চায়।

নীরেনের মা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। অবশ্য তাঁর স্মিত মুখখানা এবং সগর্ব দৃষ্টিপাত নীরেনের প্রাণ খুশিতে ভরে দিয়েছিল। কিন্তু মা জানালেন এবার নীরেনের পালা গয়না পরিশোধের। আনন্দের মুহূর্তে মায়ের এরকম অর্থনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপনে নীরেন বিষণ্ন হল।

এদিকে প্রাণেশের মনেও পুত্রের কৃতকার্যতায় কোনো খুশির রেখাপাত লক্ষ্য করা গেল না। তিনি এমনভাবে শুয়ে পড়লেন যেন ছেলের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর কোন কথা বলারই প্রয়োজন বা উৎসাহ নেই এতটুকু। অথচ নীরেন বাবার অফিস না যাওয়া তাঁর খবর জানার উৎকণ্ঠায় একথা ভেবে রেখেছিল। এখন শুনল সেখানে ধর্মঘট চলছে।

তবু নীরেন আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করল আরেকটু আনুকূল্য পেলে সে আরও ভালো ফল করতে পারত পরীক্ষায়। এ কথার জবাবে তার বাবা মা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাত্র।

পাড়ার লোকে প্রশংসা করে নীরেনের। আর সে প্রশংসা পায় বকুলের কাছ থেকে। বকুলকে সে জানায় বি. এ. পড়ার সময় সে আরও মনোযোগী হয়ে ভালো ফল করার জন্যে চেষ্টা করবে। বকুলও তাকে উৎসাহ দেয়।

কিন্তু পাশের খবর প্রকাশের মাত্র তিনদিন পরেই নীরেনের প্রত্যাশা ও কল্পনার প্রাসাদ ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যায়। প্রাণেশ জানালেন নীরেনকে এবার থেকে চাকরীর চেষ্টা দেখতে হবে। বিমলও তা-ই করছে।

আর্তনাদের মতো নীরেনের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে—'আর পড়াবে না আমায়?'

প্রাণেশ তাঁর অসামর্থ্যের কথা জানালেন।

নীরেনের কাছে জগৎ যেন অন্ধকার হয়ে আসে, ভবিষ্যৎ অর্থহীন হয়ে যায়। সব শুনে বকুলও হতাশায়-উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ে। বলে, তাহলে কী হবে?

তার সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই যেন নিরুপায় নীরেন বিষ খায়।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নীরেনের বিষপানে আত্মহত্যার খবরই প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে যে আই-এ পরীক্ষায় ভাল ভাবে পাশ করেছিল এ খবরটাই ছিল অপ্রকাশিত।

আদর্শ প্রশ্নোত্তর

১। 'গল্পটির নাম লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পাশ ফেল' রেখেছেন।'—এই নামকরণ তোমার মতে কতখানি সার্থক হয়েছে আলোচনা করে দেখাও।

উত্তর ঃ স্বনামধন্য নাট্যকার শেক্সপীয়ার তাঁর রোমিও ও জুলিয়েট নাটকের এক জায়গায় বলেছেন—What's in a name? অর্থাৎ নামে কিবা আসে যায়?

ব্যক্তি নামের ক্ষেত্রে হয়ত যে কোনো নামকরণ চলতে পারে। যেমন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে—গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক-এর বেলায় রচনার শীর্ষনাম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই এ বিষয়টি যোগ্য আলোচনার দাবী রাখে।

গল্প লেখকেরা গল্পের নামকরণকালে কোনো সময় কেন্দ্রীয় বা মূল চরিত্র নামকে স্মরণ করেন কখনো বা গ্রহণ করেন অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। কোনো লেখক গল্প বর্ণিত মূল ঘটনাকেই আশ্রয় করেন নামকরণ কালে। আমাদের দেশে বাংলা সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের প্রধান পুরুষ ঋষি বঙ্কিম তাঁর গল্প-উপন্যাসের নামকরণ করেছেন নায়ক নায়িকার নামে। ইন্দিরা, রাধারাণী প্রভৃতি গল্পের এবং কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, দুর্গেশ নন্দিনী প্রভৃতি উপন্যাসের নাম বঙ্কিমচন্দ্র রেখেছেন কাহিনীর নায়িকার নাম অনুসারে। আবার নায়ক চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে রাজসিংহ, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কিছু গল্প উপন্যাসের নামকরণে এই রীতি অনুসরণ করেছেন। যেমন কাবুলিওয়ালা গল্পে এবং গোরা উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের দেবদাস, চন্দ্রনাথ, পরেশ—নায়ক নাম চিহ্নিত।

গল্পকাররা অনেক সময় অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুযায়ী নামকরণ করে তৃপ্ত হন। বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়, শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ এরকম তাৎপর্য বা প্রতীকধর্মী নামকরণ।

আমাদের আলোচ্য 'পাশ ফেল' গল্পটির নামকরণে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই শেষোক্ত প্রতীকধর্মী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্যা-সংকট জর্জর মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও মূল্যবোধের রূপ ও স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন। পাশ ও ফেল দুটি অবস্থার কথা এখানে লেখকের খাম-খেয়াল প্রসূত কোনো ব্যাপার নয়। এদুটি ইংরেজী কথা। আমাদের সমাজ জীবনে অর্থ নৈতিক ও নৈতিক মূল্যমানে খুবই গুরুত্ব পেয়ে আসছে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা কাল থেকে। 'পাশ' বা পরীক্ষায় কৃতকার্যতা যে জীবনে সাফল্য ও সম্পদের সম্ভাবনা নিয়ে আসে 'ফেল' বা অকৃতকার্যতা অসাফল্য ও হতাশার অশনি সংকেতবহ।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানার্জনের পরিমাপ পাশে বা ফেলেই যেন নির্ধারিত হয়। এখানে আমরা দেখি গল্পের চরিত্ররা পাশের হারের দীনতায় যতটা না সমালোচনা বা প্রতিবাদ মুখর তার চেয়েও বেশি নিরুৎসাহ। যেন এটাই স্বাভাবিক। পাশ করার সার্থকতাও চারদিকব্যাপী ব্যর্থতার মরুবালিতে নিমেষে বিলীন হয়ে যায়।

গল্পের ঘটনা ও কাহিনী গ্রন্থনার নৈপুণ্যে, চরিত্রের অন্তর্জীবন ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কুশলতায় মানিক প্রবেশ করেছেন সমাজ ও ব্যক্তি জীবন সত্য ও সত্তার গভীরে। এ সমাজে সার্থকতা ও ব্যর্থতা অর্থনীতির নিষ্ঠুর কঠোর মাপকাঠির মূল্যায়ণে অনেক সময় হারিয়ে ফেলে তার সঠিক তাৎপর্য ও নির্দিষ্ট মাত্রা। অর্থকরী মূল্য নেই এমন

হার্দ্য সম্পদও এখানে অনর্থক মনে হয় অনেকের কাছে। 'পাশ ফেল' গল্পটি এই সামাজিক অবস্থার এক স্মরণীয় সাক্ষ্য হয়ে আছে যেন।

নীরেন ও বিমল দুই বন্ধু। এক পাড়ারই বাসিন্দা। দুজনেই দিয়েছিল আই-এ পরীক্ষা। ফল প্রকাশে দেখা গেল নীরেন পাশ করেছে বেশ ভালো ভাবেই; কিন্তু বিমল করেছে ফেল। বিমল কৃতকার্যতার লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে উৎসাহ বোধ করে না। সে চাকুরীর চেষ্টা দেখে। তার ফেলের ঘটনা তার পরিবারের লোকেরা অনায়াসে মেনে নিয়েছে।

এদিকে নীরেন ভালোভাবে পাশ করেও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তার বাবা প্রাণেশের নিষ্প্রাণ নিরুৎসাহ অক্ষমতায়। তার ভবিষ্যতের সব উজ্জ্বল স্বপ্ন ও সম্ভাবনা কোথায় হারিয়ে যায়। সব জেনে তার গুণগ্রাহিনী বকুলও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

নীরেন আশা ভঙ্গের নিদারুণ দুঃখ ও জ্বালায় বেছে নেয় আত্মহননের পথ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সে পাশ করে বটে। কিন্তু ফেল করে জীবনের পরীক্ষায়।

লেখক এখানে দুই সহপাঠী বন্ধুর জীবনের ঘনিষ্ঠ রূপ চিত্রণের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে পাশ ও ফেলের অবস্থা ও তার গুরুত্ব কতখানি তাই দেখাতে চেয়েছেন। এই পোড়া সমাজে পাশ বা ফেল গুরুত্ব বা মাত্রায় তারতম্য করবার মতো বস্তু যেন নয়। পাশের শংসাপত্র যেন জীবিকার ছাড়পত্র মাত্র। তাও বুঝি নয়। এ উপলব্ধি বিমলের হয়েছিল ফেলের খবরের গোড়াতেই। নীরেন এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হবার আগেই অকালে বরণ করল এক দুর্ভাগ্যজনক করুণ মৃত্যু। নামকরণটি শুধু সার্থক নয় সুন্দরও।

২। 'পাশ ফেল' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ সচেতন দৃষ্টি-ভঙ্গির যে পরিচয় ফুটে উঠেছে—সে সম্পর্কে রসগ্রাহী আলোচনা লিখ।

উত্তর ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসীয় চিন্তাধারায় দীক্ষিত বাস্তববাদী সাহিত্যিক। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মন নিয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের দুঃসহ জীবনযাত্রার পশ্চাতে কি কারণ নিহিত আছে তা তিনি উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন। তাঁর বহু গল্প উপন্যাসের মধ্যে তথাকথিত ভদ্র বাঙালী সমাজের অন্তরালবর্তী আদর্শহীনতার চিত্রটি উজ্জ্বল বর্ণে সুপরিস্ফুট। তিনি দেখিয়েছেন উচ্চ আদর্শের ধ্বজাবাহী আমাদের সমাজ প্রকৃতপক্ষে এক সুবিস্তৃত অন্যায়, ভণ্ডামী ও নির্লজ্জ স্বার্থপরতার শোষণ যন্ত্র। আর্থিক শোষণে ও নিদারুণ দারিদ্র্যে ছিন্নমূল বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই। অর্থের অভাবেই তাদের জীবন সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পায় না। রোগে শোকে অশিক্ষায় দারিদ্র্যে তাদের জীবন শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে তারা চিরবঞ্চিত থাকে।

আলোচ্য গল্পটি দুই মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই সন্তানের পরীক্ষায় পাশ ফেলকে কেন্দ্র

করে রচিত। দুই বন্ধু নীরেন ও বিমল আই-এ পরীক্ষা দেয়। নীরেন পাশ করে, বিমল ফেল করে। এই পাশ ফেল তাদের জীবনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এদের পিতামাতা অভাবের সংসারে বাড়ীর সবাইকে বঞ্চিত করে ঋণ করে তাদের পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ করেছে। ছেলেকে পড়িয়ে মানুষ করার জন্য পিতামাতার চেষ্টার অন্ত নেই। অভাব দৈন্যগ্রস্ত সংসারে পুত্রই ভবিষ্যতের আলোর ভরসা। ছেলে পাশ করে বড় ডিগ্রী পেলে চাকরী জুটবে। সংসারে দুটো পয়সা আসবে—এই আশায় বিমলের বাবা ভূপেন বড় মেয়ের বিয়ে বন্ধ রেখেছে। পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ পড়াশুনার খরচ যোগাতে গিয়ে তার ছোট মেয়েটি চিকিৎসাভাবে মারা গেছে। বিমল পরীক্ষার ফলাফল জেনে বাড়ীতে এলে তার বড় বোন দারুণ আগ্রহে স্নান না সেরে ছুটে আসে। তার ছেঁড়া শাড়ীটা ভেজা, ভেজা সেমিজটা শত জীর্ণ।

ছেলের পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে কত পিতাকে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে কাল কাটাতে হয়েছে তার হিসাব নেই। বয়স্ক কন্যাকে ঠিক সময় পাত্রস্থ করতে না পারায় কত পিতাকে সমাজের বিদ্রূপ নিরবে সহ্য করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সব কিছু আঘাতই এরা নির্বাক চিত্তে সহ্য করেছে। পুত্রের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে। পুত্রের পাশ করার উপরেই সংসারের একটা সুরাহা হবে—এই আশায় উন্মুখ হয়ে এরা দিন গনেছে। পুত্র ফেল করলে তাদের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

বিমলের অকৃতকার্যতার সংবাদ পেয়ে পিতা ভূপেনের হৃদয় ভেঙে একাকার হয়ে গেছে। তাঁর মুখ থেকে বিপুল ব্যথাহত কেবল একটি কথা উচ্চারিত হয়েছে—'ফেল করেছিস, বেশ করেছিস'। ফেল করার জন্য বিমল আদৌ দায়ী নয়। ধার ধোর করে পিতা সাধ্যমত খরচ জুগিয়েছে বটে। কিন্তু ঠিক মত পড়াশুনা করতে গেলে যে পরিমাণ অর্থ ও অবসর দরকার—দারিদ্র্যের সংসারে বিমলের ভাগ্যে তা মেলে নি। পরীক্ষায় পাশ ফেল যে একটা জুয়াখেলা তা বিমল জানে। বড়লোকেরা অর্থের বলেই পরীক্ষার সমুদ্র পাড়ি দেয়—আর নিঃস্ব দরিদ্র সন্তানেরা সেখানে জল ডুবিতে হারিয়ে যায়। ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাসকে মেনে নেওয়া ছাড়া বিমলের গত্যন্তর নেই। বিমলের কাছে পড়াশুনা একটা তামাসা। এর মধ্যে সে আর থাকবে না। বাড়ীর সকলের প্রতি অবিচার করে তার পড়াশুনা রসিকতারই নামান্তর। নীরেন বন্ধুর প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল। পরীক্ষায় পাশ করায় সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। 'মানুষের জীবন নিয়ে ভাগ্যের খেলার জুয়া আর জুয়োচুরিতে সে জিতে গেল'। এইসব উক্তির মধ্যে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি ঘটেছে। আমাদের রাষ্ট্র জীবন ও সমাজ জীবনকে তিনি মৃদু অথচ সুতীক্ষ্ণ ধারালো ভাষায় আক্রমণ করেছেন। সমাজের ধনী ও দরিদ্র সব পরিবারের সন্তান সন্ততির শিক্ষা লাভের সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার। কিন্তু পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় উচ্চ অভিজাত শ্রেণীরা নিজেদের স্বার্থ কায়েম করার জন্য দরিদ্র সমাজের কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করে না। শোষণ অত্যাচার

থেকে আর্ত মানবতার মুক্তির জন্য তিনি নিরুপায় জীবনের ব্যর্থতা ও বেদনার মধ্যে বিপ্লব বিদ্রোহের বাণীকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন।

নীরেনের বাবা স্ত্রীর গহনা বিক্রী করেছেন তার শিক্ষার জন্য। পুত্র পাশ করেছে। তিনি আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখাবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অফিসে ধর্মঘট চলায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত। তাছাড়া পাশ করে সহজে চাকরী বাকরী মিলে না। এর জন্য পুত্রের কৃতকার্যতায় তিনি উৎসাহ দেখান নি। বাজারে চাকরীর সংখ্যা কম, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যখন দিন দিন বাড়ছে– তখন পাশ ফেল দুটোই সমান। বিমল ফেল করেছে শুনে তাঁর উক্তি—'আর পাশ করেই বা করবে কি ?' —এই উক্তির মধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক শূন্যতা ও জীবনের অপচয়ের কথা সুস্পষ্ট।

ধর্মঘটের জন্য তাঁর মাহিনা পেতে দেরী হবে—হয়তো চাকরীর গোলমাল হতে পারে। তাই জীবিকা নির্বাহের চিন্তাই বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনতর দোদুল্যমান অবস্থায় কোনো পিতা পুনরায় তার পুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না। যতটুকু পড়াশুনা হয়েছে—সেটাই যথেষ্ট। ছেলে সংসারের ভার নিক—আয় উপার্জন করুক—এই নির্দেশ পিতার কাছে শুনে নীরেনের মাথায় বজ্রপাত ঘটে। তাঁর ভবিষ্যতের সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। পাশের বাড়ীর বকুল সব শুনে হা হুতাশ করে– 'সর্বনাশ, তবে কি হবে !' বকুলের এই প্রশ্নের জবাব দিতেই নীরেন বিষ পান করে। নীরেন জানতো অল্প পড়াশুনায় কোনো চাকরী জুটবে না। আর উচ্চ শিক্ষা লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। গোটা জীবনটাই তাকে নিষ্ফল নিরর্থক হয়ে থাকতে হবে। তাই সে বিষ পান করে এই নিষ্ঠুর সমাজ থেকে মুক্তিলাভ করেছে।

নীরেনের বিষ পানের সংবাদ কাগজে বেরোয়। কিন্তু সে যে পাশ করেছিল— সেটা অনুল্লেখিত থেকে যায়। এই বক্তব্যের মাধ্যমে মানিকবাবু সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে কড়া চাবুক লাগিয়েছেন।

যাহক, দেখা যাচ্ছে দুই উদ্বাস্তু পরিবারের দুই সন্তানের পাশ ফেলকে কেন্দ্র করে গল্পটির সৃষ্টি। ভাড়াটে বাড়ীতে কোনোরকম করে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবে এরা জীবন কাটায়। নিতান্ত ভাঙাচোরা ভাড়াটে জীবনের সামগ্রিক পরিচয়টি লেখক এই গল্পের স্বল্প পরিসরে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সবচেয়ে লক্ষিতব্য বিষয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি। পরীক্ষায় পাশ ফেলের মধ্যে যে দুই তরুণের জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো—যারা ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হতে পারত,—তার জন্য দায়ী আমাদের সমাজ ব্যবস্থা—যার পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি।

৩। ছোট গল্প হিসাবে পাশ ফেল গল্পের রসগ্রাহী সমালোচনা লিখ।

উত্তর ঃ ছোটগল্প মানব জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখ, আশা আনন্দ ও দুঃখ যন্ত্রণার ভগ্নাংশ গুলি নিয়ে রচিত হয়। গল্পের স্বল্প পরিসরে জীবনের একটি ছোট্ট দিক্‌কে এমনভাবে পরিণতি দান করেন—যার মধ্যে নাটকীয় ভাবব্যঞ্জনার সাহায্যে

ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহত্তর অজানা জীবনের অনন্ত রহস্য আভাসিত হয়ে উঠে। ছোটগল্পে মূলতঃ একটি প্রধান চরিত্রের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। অন্যান্য চরিত্রগুলি সেই প্রধান চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার পরিপূরক হিসাবেই স্থান লাভ করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পটি একটি নক্সা জাতীয় রচনা। কারণ এর মধ্যে অনেক টুকরো কাহিনীর সন্নিবেশ ঘটেছে—যদিও একটি মূল কেন্দ্রগত বিষয় সবগুলিকে ঐক্য সূত্রে বেঁধে রেখেছে। তাই এই রচনায় ঘটনার একমুখীনতা, কাহিনীর দ্রুতগতি নাটকীয় পরিণতি প্রাপ্তির মধ্যে চমৎকার শিল্প সৌন্দর্য লাভ করেছে। বিভিন্ন উপাদান এতে থাকায় গল্পটি অন্তিম ফলাফলের জন্য পাঠকের চিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে রাখে।

গল্পটির বিষয়বস্তু দুই তরুণের পরীক্ষায় পাশ ফেল ও তজ্জনিত তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া। এই ঘটনাটি কেবল ব্যক্তি কেন্দ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। এই পাশ ফেলকে কেন্দ্র করে দুই ছাত্রের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার নিবিড় যোগ-সূত্র ও তার প্রভাবের পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।

দুই বন্ধু বিমল ও নীরেন আই-এ পরীক্ষা দেয়। বিমল ফেল করে, নীরেন পাশ করে। এদের পিতামাতা পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে গহনাপত্র বিক্রী করেছেন, ঋণ করেছেন। আর সেহেতু সংসারে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। বিমলের বোন চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে, বড় বোনের বিবাহ হয়নি, তার পরনের কাপড়চোপড় শত জীর্ণ—পিতা রোগগ্রস্ত। অন্যদিকে নীরেন পাশ করায় ভাইবোনেরা অভ্যর্থনা জানায়।

উক্ত দুই তরুণের প্রতিক্রিয়াই গল্পের উপজীব্য। বিমল জানে লেখাপড়া মানে সংসারের প্রতি বিরাট অবিচার, সকলকে বঞ্চিত করে, ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে তার রুগ্ন পিতা খরচা বহন করেছে। ফেল করায় পিতামাতা দারুণ আঘাত পেয়েছে। পরীক্ষা ব্যাপারটি বিমলের বিচারে একটা তামাসা—দরিদ্র সংসারকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। হতাশা ও ক্ষোভ বিমলের জীবনকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করলেও —সে জীবন সম্পর্কে নেতিবাদী নয়। আর পড়াশুনা করবে না—অন্য ব্যবস্থা নেবে।

পক্ষান্তরে নীরেনের সমস্যা জটিল হয়ে উঠল পাশ করার ফলে। পিতার অফিসে ধর্মঘট। পুত্রের সাফল্যে তিনি তেমন কোনো উৎসাহ দেখান নি। চাকরীর চিন্তায় খুবই চিন্তিত। ছেলে এবার সংসারের ভার নিক—চাকরী বাকরী করে দুপয়সা ঘরে আনুক—এই সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন। এতে নীরেনের মাথায় বাজ পড়ল। পাশের বাড়ীর বকুলও নীরেনের ব্যাপারে হাহুতাশ করে। নীরেন মনে করে আর পড়াশুনা না করলে তার জীবন ব্যর্থ ও নিরর্থক হয়ে পড়ে থাকবে। তাই সে আর দুঃখকষ্টের সংসারে বেঁচে থাকতে চায় নি। আত্মহত্যা করে।

আলোচ্য গল্পে লেখক চরিত্রগুলির মানসিকতা ও জটিল দ্বন্দ্বসংঘাতের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন—আর তারই মধ্যে তাঁর সমাজ অভিজ্ঞতার নিদর্শন সুপরিস্ফুট।

বিমল ও নীরেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নীরেনের পিতার মানসিক যন্ত্রণা গল্পটিকে বর্ণদীপ্ত করেছে।

আলোচ্য গল্পের ঘটনার অন্তরালে লেখক আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সমাজ ব্যবস্থায় দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততির পড়াশোনার সুযোগ নেই। দারিদ্র্যের ভার নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী যারা নিতান্ত ইতর জীবন যাপন করছে তার জন্য দায়ী পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা—যা বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজের শিক্ষাদীক্ষা, আভিজাত্য সবই অন্তঃসারশূন্য। প্রচলিত রীতিনীতি, সংস্কার ও জীবনের যে মূল্যবোধ তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো সত্য নেই। সমাজের মূল্যবত্তায় দরিদ্র মানুষেরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে দেয়—পতিত হয় দুরবস্থার গভীর পঙ্কে—অকাল মৃত্যু ঘটে তরুণদের। এই ছোটগল্পের নায়ক নীরেনের বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্য দিয়ে মানিকবাবু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ভালোমন্দ বিচার বিশ্লেষণের প্রতি পাঠক সমাজের চিন্তাকে জাগ্রত করেছেন। এই গল্পটিকে বলা যেতে পারে—**'Art for life's sake'.**

পূর্বেই বলা হয়েছে গল্পটি নক্সাধর্মী বর্ণনাত্মক রচনা। এর মধ্যে চরিত্রানুগ সংলাপ সৃষ্টি করে লেখক ছোটখাট চরিত্রগুলিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। গল্পের ভাষা প্রাঞ্জল, সাবলীল ও গতিশীল। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের জৌলুসহীন জীবন-যাত্রার পরিচয়টি আটপৌরে ভাষায় আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। তা সত্ত্বেও 'পাশফেল' গল্পটিকে উচ্চাঙ্গের শিল্প বলা যাবে না। কারণ ছোটগল্পের যে ইঙ্গিত-ধর্মিতা ও চরিত্রের অন্তর্ভেদীত্ব থাকে—তা এখানে অনুপস্থিত। মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবনের যে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়—তেমন কোনো পরিচয় এতে নেই। যেটুকু অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, তা সমাজজীবন সম্পর্কিত। সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে পথ হল পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া—সেই পথে চলতে গিয়েই দুই তরুণ হারিয়ে গেল। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কের মধ্যে প্রকৃত কোনো সত্য ও মূল্যবত্তা নিহিত আছে কিনা আলোচ্য গল্পে সেই জিজ্ঞাসাই মোটামুটি সাহিত্যিক গুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

৪। **বিমলের চরিত্র বিচার কর।**

উত্তর ঃ খুবই দারিদ্র্যগ্রস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান বিমল। তাদের নিজস্ব কোনো বাড়ী নেই, ভাড়াটে বাড়ীতে বসবাস করে। বাড়ীতে কেউ চাকরী-বাকরী করে না। কোনো রকমে নিতান্ত কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলে। তবুও এই নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে বিমলের রুগ্ন পিতা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পুত্রের পড়া-শোনার ব্যয় নির্বাহ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

বিমল তরুণ—সংবেদনশীল। বাড়ীর শোচনীয় দুর্দশা সম্বন্ধে সে সচেতন। পড়া-শোনার খরচ যোগাতে গিয়ে তাঁর পিতা ছোট বোনের অসুখের যথাযথ চিকিৎসা করতে পারে নি। চিকিৎসার অভাবে সে মারা গেছে। বড় বোনের বিয়ে হয় নি।

শতছিদ্র পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে সে কাল কাটায়। বয়স্কা কন্যার বিয়ে দিতে না পারায় সমাজ থেকে সমালোচনা সহ্য করতে হয় বিমলের পিতাকে। সবই তিনি সহ্য করেছেন পুত্রের দিকে তাকিয়ে। পুত্র পাশ করবে, চাকরী জুটবে, দুপয়সা ঘরে আসবে।

বিমল অনুভূতিশীল বিবেকবান যুবক। পরিবারের বহুলোককে বঞ্চিত করে, তাদের রক্ত শুষে সে পড়াশুনা করছে। এর জন্য তার মানসিক যন্ত্রণার অবধি নেই। বিমল নিজেকে অপরাধী মনে করে। তবুও পিতামাতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। পড়াশুনায় সে অবহেলা করেনি। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন খুব কঠিন হওয়ার জন্য পাশের হার খুব কম। তাছাড়া আর্থিক অনটনের জন্য সে ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারে নি। বাড়ীর সবারই আশঙ্কা ছিল, সে ফেল করবে। হলও তাই। বিমল এতে প্রথমে আঘাত পেলেও মুষড়ে পড়েনি। দুবছর বিমল বাড়ীর লোকদের বহুকষ্টে ভুগিয়েছে। আর তাদের দুঃখ বাড়াবে না। বিমল কর্তব্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়। সে বলে, পরীক্ষার তামাসার মধ্যে সে আর থাকবে না।

বিমল আত্মসচেতন ও অভিমানী। ফেল করায় বাড়ীর সকলে চিন্তিত হয়, বিমল দুঃখে অভিমানে হয়তো অঘটন কিছু করে ফেলতে পারে। কিন্তু জীবনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে। আঘাত জালা যন্ত্রণা তাকে বিনষ্ট করলেও তার বুদ্ধিনাশ ঘটে নি। সে জীবন সম্পর্কে আশাবাদী—**'Life is greater than Examination.'** জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে হতোদ্যম হয়ে পিছিয়ে আসা কাপুরুষের ধর্ম। মানুষকে কঠোর জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। তাই ফেলের ধাক্কাকে সে সামলে নিয়েছে। বিমল জানে, দৃঢ়চিত্তে অন্ধ অজস্র তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হবে। পিতামাতা ঋণের বোঝা মাথায় চাপিয়ে তার পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ করেছে—সেই পিতামাতার সংসারের জন্য তার বড় কর্তব্য আছে। তাকে এবার নূতন করে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। বিমল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক সহৃদয়, অনুভূতিশীল বিবেকবান যুবক—সে কর্তব্যনিষ্ঠ ও জীবন সংগ্রামী। পতনের পর নূতন করে পথ হাঁটা জীবনের ধর্ম। অন্ধকারের পথ দিয়েই আলোর সন্ধানে নূতন করে তাকে যাত্রা করতে হবে—বিমলের মানসিকতার মধ্যে তারই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন।

৫। নীরেনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিচার কর।

অথবা,

মনোবিকলনের একটি নিদর্শন নীরেন চরিত্র—এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

অথবা,

নীরেনের চরিত্রটি ট্রাজিক বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে কিনা আলোচনা কর।

উত্তর ঃ নীরেন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দরিদ্র সন্তান। পিতা স্ত্রীর গহনা বিক্রী

করে তার পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ করেছে। নীরেন মেধাবী ছাত্র। আই-এ পরীক্ষায় পাশ করে। নীরেন বলে, বাড়ীতে আর একটু সাহায্য পেলে সে stand করতে পারত। নীরেন বন্ধুবৎসল ও সমব্যথী। তার বন্ধু বিমল ফেল করায় সে ব্যথাহত হয়। মন খুলে আনন্দ করতে পারে না। বিমলকে সান্ত্বনা দেয়। শুধু বিমল নয়, অকৃতকার্য ছাত্রদের জন্য তার অসীম দরদ। নীরেন ভাবে জীবনের জুয়া আর জুয়োচুরিতে সে জিতে গেল।

বাড়ীতে ভাইবোনেরা ও মা তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে। কিন্তু পিতার কাছ থেকে তা পায় না। পিতা তার অফিসে ধর্মঘটের জন্য নীরেনের ব্যাপারে নিরুত্তেজ ও উদাসীন থাকে। চাকরীর গোলমাল হতে পারে—তাই তিনি চিন্তাক্লিষ্ট। পিতার ঔদাসীন্য ও অনীহায় বিমলের চিত্তে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পিতা প্রাণেশ বাবু বাড়ীর দুরবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ছেলেকে সংসারের দায়িত্ব নিতে বলেন। বি. এ. পড়াবার ক্ষমতা নেই—সে কথা তিনি জানান।

নীরেন বাড়ীর অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিল। সে জানে কত দুঃখে মায়ের গহনাপত্র বিক্রী করে ভাই বোনদের বঞ্চিত করে পিতা তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। পরীক্ষায় পাশ করেছে—নিশ্চয়ই পিতা এবার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বি. এ. পাশ না করলে জীবনের কোনো মূল্য নেই, চাকরীও জুটবে না। সরলচিত্ত একান্ত অনুভূতিশীল যুবক নীরেনের চিত্তে এই আশা বদ্ধমূল ছিল যে সে বি. এ. পড়ার সুযোগ পাবে। সে ভাবতে পারেনি পাশ করেও তার শিক্ষাজীবনে পূর্ণচ্ছেদ ঘটবে। এরূপ প্রচণ্ড আঘাতের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এ যেন বিনামেঘে বজ্রপাত। দারুণ দ্বন্দ্বে তার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়। অন্তরের জালা জুড়াবার জন্য সে আত্মীয় স্বজনের বাড়ী ঘুরে ঘুরে কাটাল কিছুদিন। তারপর এলো প্রতিবেশী বকুলের বাড়ী।

পিতামাতার আশ্রয়চ্যুত হয়ে নীরেন বকুলকেই সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল মনে করে। বকুল সব শুনে নীরেনকে আরো হতাশার মধ্যে ফেলে দেয় এই বলে—'সর্বনাশ, তবে কি হবে'। নীরেন অনুভূতিশীল। সে বুঝতে পারে—বি. এ. পড়তে না পারাটা জীবনের সর্বনাশের সামিল। তার চিত্তের দ্বন্দ্ব আরো জটিল ও প্রবল হয়ে উঠে। নিরর্থক সর্বনাশের জীবন নিয়ে সে কি করবে। ব্যর্থতার জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। জীবন সম্পর্কে এই শূন্যতাবোধ ট্রাজিক চেতনার নামান্তর। নীরেন বকুলের কথায় সর্বত্র নিঃসীম শূন্যতা ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করে। বিরাট শূন্যতা ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো তাকে গ্রাস করতে উদ্যত। কোথাও পরিত্রাণ নেই। একমাত্র রক্ষা মৃত্যুবরণ। এই ট্রাজিক বেদনাই নীরেনকে আত্মহননের দিকে নিয়ে যায় অচিরে। সে বিষপান করে নির্মম নিষ্ঠুর সংসার থেকে বিদায় নেয়।

নীরেনের চরিত্রটি মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে জটিল ও ব্যাপক। অবশ্য তার অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ তেমন ঘটেনি। সহৃদয় পাঠক একটু গভীর ভাবে মনোনিবেশ করলেই বুঝতে পারে তার অন্তরে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব প্রবাহিত হয়ে চলছিল।

দু-একটি ঘটনার মধ্যে নীরেনের দারুণ অন্তর্জীবনের বিপর্যয় ও দিশেহারা অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। পড়াশুনা বন্ধ হবে জেনে সে আর স্থির থাকতে পারে নি। শরবিদ্ধ পক্ষী শাবকের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে বন্ধুদের বাড়ী ঘুরে কাটিয়েছে। সবশেষে এসেছে বকুলের কাছে। হয়তো বকুলের গন্ধে তার অন্তরজালা প্রশমিত হবে। বকুলের হতাশাব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে জীবন সম্পর্কে তার মূল্যহীনতা ও ক্ষয়-ক্ষতির চেতনা প্রবল হয়ে উঠে। বি. এ. পড়তে না পারা তার জীবনের বিরাট ক্ষতি—জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের বিনষ্টি। জীবনের আশাভঙ্গ জনিত এই যে নিঃসীম শূন্যতা ও হাহাকার বোধ এই খানেই ট্রাজিডির স্থর নিহিত। এই ট্রাজিডিকে রসঘন করে তুলেছে নীরেনের প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেদিক থেকে নীরেন চরিত্রটি মনোবিকলন জনিত এক স্থন্দর ট্রাজিক চরিত্র। নীরেন মৃত্যুবরণ করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় না। জীবন সম্পর্কে এই যে সর্বব্যাপী এক নেতিবাচক চেতনা—এটাই ট্রাজিডির বিশিষ্ট লক্ষণ।

মনোবিকলন বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যৌনবিষয়ক জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের জীবন কাহিনী। কিন্তু ভিন্নপ্রকৃতির ঘটনা যে মনোবিকলনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হতে পারে—তার সার্থক নিদর্শন 'পাশ ফেল' গল্পটি।

নীরেন অনুভূতিশীল হলেও কোমল প্রকৃতির যুবক। সমস্ত আঘাত সংঘাত ও বিপর্যয়ের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তিসামর্থ্য তার ছিল না। মানসিক দৃঢ়তার অভাবই তার চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা। এই দুর্বলতার জন্যই তার জীবনে ট্রাজিডি ঘনিয়ে এসেছে। যাহক, নানা বিপরীতমুখী ঘটনার টানাপোড়নে অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতায় এই চরিত্রটি ট্রাজিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যধর্মী ও বিশেষ আকর্ষণীয়।

৫। বিমল ও নীরেন—এই দুটি চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা লিখ।

উত্তর ঃ 'পাশ ফেল' গল্পে পরীক্ষায় পাশ ফেলকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিমনের সংকট ও তার সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্কান্বিত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপটি স্থন্দর ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিমল ও নীরেন একই পাড়ার বাসিন্দা। দুজনে একই স্কুলে পড়াশুনা করে ম্যাট্রিক পাশ করে। তারপর আলাদা আলাদা কলেজে আই. এ. পড়ে। আই. এ. পরীক্ষায় বিমল ফেল করে, নীরেন পাশ করে।

দুজনেই নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ঘরের অবস্থা সম্পর্কে দুজনেই সচেতন। এদের পিতামাতা বাড়ীর গহনা বিক্রী করে ঋণের বোঝা মাথায় চাপিয়ে পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ করেছে। দুজনেই অনুভূতিশীল—এরা উপলব্ধি করে বাড়ীর সবাইকে বঞ্চিত করে পড়াশুনা এক ধরনের অপরাধ। তবুও ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্য আশায় বুক বেঁধে পড়াশুনা করেছে।

বিমল ফেল করার অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। বাড়ীতে রুগ্ন পিতা, চিকিৎসার অভাবে ছোট বোন মারা গেছে, বড় বোনের বিয়ে হয়নি—তার পরিধেয় বস্ত্র শতজীর্ণ। এরূপ অবস্থার মধ্যেও ঋণ করে তার পিতা খরচা বহন করেছে। ফেল

করায় বিমল ভাবে, সেখানেই তার পড়াশুনার ইতি। পরীক্ষা তার কাছে:একটা তামাসা মাত্র। সে আর তামাসার মধ্যে থাকবে না। বিমলের পিতামাতা জানে যে বিমল অভিমানী ও একগুঁয়ে ছেলে। পাছে কিছু অঘটন করে বসে তাই তারা বিমলের অকৃতকার্যকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে। কত ছেলেই না পাশ করেছে। বিমল সামান্য দ্বন্দ্বে বিচলিত হয়েছিল—তা সামলে সে পরীক্ষার ফেলকে সহজ ভাবে গ্রহণ করে। সে সংসারের জন্য চেষ্টা করবে। আর পড়াশুনার দিকে এগুবে না। বিমল কর্তব্যনিষ্ঠ। সে এবার চাকুরীর চেষ্টা করবে। ফেল মানেই জীবন ব্যর্থ নয়। পরীক্ষায় পাশ ফেল থেকে জীবন অনেক বড়। সাময়িক আঘাত পেলেও জীবন সম্পর্কে সে হতাশাবাদী নয়। বিমল জীবনের ও সমাজের বিচারক ও জীবন পথের পথিক। দ্বিতীয় বার পড়াশুনা করে সে আর বাড়ীর দারিদ্র্যকে দ্বিগুণিত করবে না। দারিদ্র্যমোচনের চেষ্টায় কঠিন সংগ্রামে তাকে অবতীর্ণ হতে হবে।

পক্ষান্তরে নীরেন বন্ধুবৎসল, সমব্যথী ও দারুণ অনুভূতিশীল। বহু ছাত্র ফেল করায় সমবেদনায় তার মন ভরে যায়। বন্ধু ফেল করায় সে ব্যথিত হয়। তাসত্ত্বেও, পাশ করায় সে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখে। এবার বি. এ. পড়বে—জীবনে উন্নতি করবে, সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। বাড়ীতে এসে দেখল পাশের সংবাদে ভাইবোনেরা খুবই খুশী ও আনন্দে মশগুল হলেও পিতার কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা নেই। জানতে পারে পিতার অফিসে ধর্মঘট, চাকরীর গোলমাল হতে পারে—তাই তিনি বিমর্ষ চিন্তিত। ছেলেকে আর পড়াতে পারবেন না। এবার ছেলে সংসারের ভার নিক—চাকরী বাকরী করে সংসারের জন্য উপার্জন করুক। এ সংবাদে নীরেনের মাথায় বজ্রপাত হয়। তার আত্মিক সংকট জটিল হয়ে উঠে। আশাভঙ্গে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয় সে। বি. এ. পাশ না করলে চাকরী জুটবে না—জীবন একটা অর্থহীন বোঝা হয়ে পড়ে থাকবে। মনের ভার লাঘবের জন্য সে কিছুদিন বন্ধুদের বাড়ী ঘুরে কাটায়। তারপর আসে প্রতিবেশিনী বকুলের কাছে। বকুল এবার ম্যাট্রিক দেবে। সে নীরেনের পাশের সংবাদে খুবই খুশী হয়েছিল।

বকুল নীরেনের সব সংবাদ শুনে হাহাকার করে উঠে—'সর্বনাশ, তবে কি হবে।' এই হতাশাব্যঞ্জক উক্তি নীরেনকে আরো নিরাশায় দিশেহারা করে তুলে। সমস্ত পৃথিবী তার কাছে মরুময় হয়ে যায়। শূন্য নিরর্থক জীবনের গ্লানি থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে বিষপানে আত্মহত্যা করে।

বিমল ও নীরেন দুজনেই তরুণ ছাত্র। সংসারের নিদারুণ আর্থিক অভাবের মধ্যেও তারা ভবিষ্যতের জন্য আন্তরিকভাবে পড়াশুনা করেছিল। দারিদ্র্যগ্রস্ত সংসারের প্রভাব তাদের জীবনে সমানভাবে পড়েছে। বিমল দৃঢ়চরিত্রের যুবক ও আশাবাদী বলেই আঘাতের ধাক্কা সামলে নিয়ে সে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু নীরেন দারুণ অনুভূতিশীল ও কোমল প্রকৃতির যুবক বলেই সে আঘাতের ধাক্কা সামলাতে পারে নি। পড়াশুনার সুযোগ না

পাওয়ায় জীবনটা তার কাছে নিরর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এক বিপুল ট্রাজিক অনুভূতি তাকে এমনভাবে ঘূর্ণিত বিঘূর্ণিত করেছে যে সে কোনো কূলকিনারা না পেয়ে আত্মহননে পৃথিবী থেকে সরে গেছে।

৬। 'পাশ ফেল' গল্পে অপ্রধান চরিত্রগুলির ভূমিকা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা লিখ।

উত্তর ঃ ছোটগল্পে একটি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সেই চরিত্রকে কেন্দ্র করেই আখ্যান ভাগের সৃষ্টি হয় এবং তা নানা ঘটনা পরম্পরায় বিশেষ পরিণতি লাভ করে এক নিগূঢ় তাৎপর্যকে ব্যঞ্জিত করে তুলে। আর সেই প্রধান চরিত্রের বিবর্তনে ও পরিণতিতে অন্যান্য চরিত্রগুলি অল্পবিস্তর সাহায্য করে।

'পাশ ফেল' গল্পে দেখা যায় বিমল ও নীরেন এই দুই তরুণ ছাত্রের পাশফেলকে কেন্দ্র করে তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও তার পরিণতিই গল্পের উপজীব্য। কিন্তু এই দুটি প্রধান চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতিতে অপ্রধান চরিত্রগুলি কম দায়ী নয়। যেসব চরিত্রগুলি বিশেষভাবে উক্ত দুটি প্রধান চরিত্রের বিবর্তনে ও পরিণতিতে সাহায্য করেছে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

প্রাণেশবাবু নীরেনের পিতা। তিনি ক্ষয়িষ্ণু নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। অফিসে একটা চাকরী করলেও বেশ আর্থিক অভাবগ্রস্ত। তিনি জানেন, দুঃখময় জীবনে একমাত্র পুত্রই ভবিষ্যতের আশাভরসা। পুত্রকে পড়িয়ে পরীক্ষায় পাশ করালে সে চাকরী বাকরী পাবে। সংসারে দু পয়সা উপার্জন করবে। অভাব মোচন হবে। তাই স্ত্রীর গহনাগাটি বিক্রী করে টাকা ধার করে পুত্রের পড়াশোনার খরচা বহন করেছেন। পুত্র পাশ করেছে এতে পিতার আনন্দ হবে ব্যাপকতর। কিন্তু পুত্রের পাশের সংবাদে তিনি নিরুত্তেজ, উদাসীন। কারণ পুত্রের পাশে আনন্দ প্রকাশের মানসিকতা তার নেই। অফিসে ধর্মঘট, বেতন কবে পাওয়া যাবে ঠিক নেই। তাই সংসার নির্বাহের চিন্তাই তাকে বিমর্ষ ও একান্ত চিন্তামগ্ন করে রেখেছে। অন্যসব কিছু এখন নিরর্থক। সংসারের দায় মহাদায়। ছেলে এবার সংসারের ভার নিক, চাকরী করুক। এই সংবাদে নীরেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে বন্ধুদের বাড়ী ঘুরে ফিরে বকুলের কাছে এসে হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনে। বি. এ. না পড়তে পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। মূলতঃ নীরেনের প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে ও তার আত্মহত্যার ব্যাপারে প্রত্যক্ষত প্রাণেশবাবুই দায়ী।

নীরেনের মা পুত্রের সাফল্যে তেমন আনন্দ উৎসাহ দেখান নি। তিনি স্বামীর অফিসের ধর্মঘটের সংবাদে চিন্তিত ছিলেন। তিনি পুত্রের পড়াশুনার জন্য গহনা বিক্রী করতে দিয়েছেন। পাশের সংবাদে তার আনন্দ ফেটে পড়বেই। কিন্তু স্বামীর অফিসের ধর্মঘটের ব্যাপারে সংসারের ভাবনায় তার চিত্ত ভারগ্রস্ত ছিল। পুত্রের প্রতি তার স্নেহের অভাব নেই। যতটুকু সম্ভব বিপর্যস্ত মন নিয়ে পুত্রকে অভিনন্দিত করেছেন—'আমার গহনা নিয়েছিস, পাশ করে শোধ দিবিনে।' এই উক্তির মধ্যে নারীর স্বাভাবিক ও আদিম অলংকারপ্রীতি ও স্নেহপ্রীতি প্রকাশ

পেয়েছে। এই উক্তি মায়ের দিক থেকে একান্ত স্বাভাবিক হলেও নীরেন আহত হয়েছে এবং তার আত্মিক সংকটকে সক্রিয় করে তুলেছে।

বিমলের মা এক দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আদর্শ গৃহিনী। তিনি পতিভক্তি পরায়ণা ও স্নেহময়ী জননী। রুগ্ন স্বামীর পথ্য করতে করতে বেরিয়ে এসেছেন পুত্রের পরীক্ষার খবর জানতে। ছেলে ফেল করেছে জেনে তিনি স্বামীকে সতর্ক করে দিয়েছেন —তার অসাফল্যের জন্য অভিমানী বিমলকে ক্রোধ, ক্ষোভ বা ব্যঙ্গাত্মক অপ্রিয় কিছু যেন না বলা হয়। এতে অঘটন কিছু সে করে ফেলতে পারে। পুত্রকে তিনি খুবই স্বাভাবিক কোমল স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—'না পারলে উপায় কি?' মাতার এই স্নেহসিক্ত উক্তি বিমলকে জীবন সম্পর্কে আশাবাদী ও শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে। বিমলের মা চিরকল্যাণময়ী মাতৃত্বের স্নেহ বৃত্তির মহিমায় উদ্ভাসিত। বিমল মায়ের কাছ থেকেই কঠিন জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রেরণা পেয়েছে।

বকুল নীরেনের প্রতিবেশিনী। সে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। নীরেনকে সে স্নেহ করে। নীরেনের সঙ্গে তার প্রেম সম্পর্ক ছিল কিনা গল্পের মধ্যে সেটা স্পষ্ট নয়। তবে দুজনের মধ্যে আলাপ পরিচয় ও বেশ আন্তরিকতা জমে উঠেছিল। নীরেনের ছোট বোন রেখা দাদার পাশের সংবাদে চেঁচিয়ে উঠলে উপরতলার মেয়ে বকুল ছুটে আসে। সে নীরেনকে অভিনন্দন জানায়। নীরেনের পাশের সংবাদে সে গরবিনী হতে চায়। নীরেনের পিতা নীরেনকে আর পড়াতে না চাইলে— নীরেনের আত্মিক সংকট প্রবল ও জটিলতর হয়ে উঠে। বি. এ. পড়ার সুযোগ না পাওয়ায় নীরেনের কাছে জীবনটা শূন্য নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। অন্তরে তুমুল আন্দোলন চলতে থাকে। কয়েকদিন আত্মীয়দের বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। তাতেও অন্তরের জালা প্রশমিত হয় নি। শেষকালে আসে এই বকুলের কাছে। নীরেন ভেবেছিল বকুল হয়তো কোনো আশার সন্ধান দেবে। কিন্তু সব শুনে বকুল বলে—'সর্বনাশ, তবে কি হবে?'

এই হতাশাব্যঞ্জক উক্তি নীরেনকে চরম নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলে। বকুলের প্রশ্নের উত্তর দিতেই নীরেন আত্মহত্যা করে। 'তবে কি হবে?' কি আর হবে—কোথাও যখন আশার আলোই নেই—তখন সর্বনাশই হবে। আত্মহত্যা ছাড়া জীবনের এই নিদারুণ ক্ষতি থেকে মুক্তিলাভের আর কোনো পথ নেই। নীরেনের ট্রাজিক জীবনের পরিসমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছে বকুল।

কয়েকটি বিশিষ্ট প্রশ্ন

শাস্তি

১। ছোটগল্প হিসাবে 'শাস্তি'র রসগ্রাহী আলোচনা লিখ।

২। 'শাস্তি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

৩। 'শাস্তি' গল্পে প্রকৃতির বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর।

৪। ছিদাম ও দুখিরামের চরিত্র বিচার কর।

৫। 'চন্দরা' চরিত্রালেখ্য অঙ্কন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নারী প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় রহস্য উন্মোচন করেছেন—আলোচনা কর।

৬। রামলোচন চক্রবর্তীর চরিত্র বিচার কর।

৭। রাধা ও চন্দরার চরিত্র বিচার কর।

৮। 'শাস্তি' গল্পে দরিদ্র চাষী পরিবারের যে সংকটের পরিচয় আমরা পাই—তার জন্য সমাজ ব্যবস্থা দায়ী কিনা বিচার কর।

মহেশ

১। 'মহেশ' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২। ভাগচাষী গফুরের চরিত্র বিচার কর।

৩। জমিদার শিবচরণবাবুর অত্যাচারের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন কর।

৪। তর্করত্ন মহাশয়ের চরিত্র বিচার কর।

৫। মূক অবোলা জীব মহেশের কি পরিচয় পাওয়া যায়—আলোচনা কর।

৬। 'মহেশ', গল্পে তৎকালীন সমাজ জীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

৭। 'তার কসুর তুমি যেন মাপ করো না'—এই উক্তি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে? এর তাৎপর্য বিচার কর।

৮। শিল্পীদের হাতে মূক পশুও মানবিক অনুভূতিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে—'মহেশ' গল্প অবলম্বনে এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

৯। আমিনার চরিত্র বিচার কর।

১০। 'মহেশের' প্রকৃত হত্যাকারী কে? আলোচনা কর।

বিরিঞ্চি বাবা

১। 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২। 'বিরিঞ্চি বাবা'র চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৩। ছোটগল্প হিসাবে 'বিরিঞ্চি বাবা'র রসগ্রাহী আলোচনা লিখ।

৪। 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পে পরশুরামের হাস্যরস সৃষ্টির কৃতিত্ব বিচার কর।

৫। 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্পটি একটি চরিত্র চিত্রশালা—আলোচনা কর।

পাশ ফেল

১। 'পাশ ফেল' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২। নীরেনের চরিত্রটি ট্রাজিক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে কি? আলোচনা কর।

৩। ছোটগল্প হিসাবে 'পাশ ফেল' সার্থক কিনা বিচার কর।

৪। বিমল ও নীরেনের চরিত্রের তুলনা মূলক বিচার কর।

৫। বিমল ফেল করেও আত্মহত্যা করেনি—আর নীরেন পাশ করেও আত্মহত্যা করল—এর কারণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। 'পাশ ফেল' গল্পে লেখকের সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দাও।

৭। বিমল ও নীরেনের মা দুজনেই মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিনী—আলোচনা কর।

৮। ভূপেন ও প্রাণেশের চরিত্র বিচার কর।

৯। বকুলের চরিত্র বিচার কর।

বিষয়মুখী সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

শাস্তি

১। 'একখানি নূতন তৈরী নৌকার মতো',—'ঘোমটার আড়াল দিয়া যাহা কিছু দ্রষ্টব্য তাহাই দেখিয়া লয় দ্বিধাহীন ভাবে'—কাহার সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে? তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কি স্বরূপ ফুটে উঠেছে এই উক্তির মধ্যে?

২। 'তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোনদিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই'—এই উক্তি কার? কাহার সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে? এই উক্তির মধ্যে বক্তা ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কি পরিচয় ফুটে উঠেছে?

৩। 'অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই'—কি কোন্দল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে—এই কোন্দলের প্রকৃত কোনো কারণ ছিল কি? দুই স্বামীকে সেই কোন্দল বেশি স্পর্শ করত কেন?

৪। 'সে তখন ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করিয়া উঠিল'—কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে? তার গর্জন করে উঠার কারণ কি? তারপর সে কি কাণ্ড করে বসল,—এবং সেই কার্যকারণগত কোনো যুক্তি দেখতে পাও কি?

৫। 'সমস্ত গ্রামের তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন'—কাহার সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী বলার তাৎপর্য কি?

৬। 'এই কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে'—এই উক্তির বক্তা কে? কার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে? এরূপ বলার কারণ কি? বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় ফুটে উঠেছে এই অংশে?

৭। 'ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে'—কোন পথের কথা বলা হয়েছে? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৮। 'সেদিন…বাহিরেও অত্যন্ত গুমট'—কোন দিনের কথা বলা হয়েছে? বাহিরের গুমটের অন্য কোনো সংকেত অর্থ আছে কি?

মহেশ

১। 'ওরে ও গফরা বাড়ী আছিস, বলি ওটা হচ্ছে কি শুনি?'—এই উক্তি কার? গফরা কে? কোন ঘটনাকে লক্ষ্য করে এই উক্তি? সেই ঘটনার জন্য প্রকৃত দায়ী কে?

২। 'তোরা সব রাম রাজত্বে বাস করিস কিনা তাই তার নিন্দে করে মরিস'—রাম রাজত্ব কি জিনিস? কার রাম রাজত্ব সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে? সত্যিই কি তিনি এরূপ প্রশংসার অধিকারী?

৩। 'পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল—তাহা এই দুইটি প্রাণী ছাড়া অন্তরীক্ষেও বুঝি আর একজন লক্ষ্য করিলেন'—কিসের ছলনার কথা বলা হয়েছে? অন্তরীক্ষের কোন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। এটার তাৎপর্য্য কি?

৪। 'কি করলে বাবা, আমার মহেশ যে মরে গেল'—কার প্রতি এই উক্তি করা হয়েছে? বক্তা কে? মহেশ কে? কি করার জন্য মহেশ মারা গেল? মহেশের মৃত্যুর জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে?

৫। …"কিন্তু তুই তো জানিস, তোকে আমি কত ভালবাসি"—এই উক্তির বক্তা কে? কার সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে? এই উক্তির মধ্যে বক্তার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে—সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। "যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"—এই উক্তি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে? এই উক্তির মধ্যে বক্তার মনোভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

বিরিঞ্চি বাবা

১। 'তিন কত্তি তিন'—'হ্যাভ এ কাপ অফ টি বাবু'—এই দুটো উক্তি কোন কোন ব্যক্তির? এই দুই উক্তির মধ্যে দুই বক্তার চরিত্রগত কি কি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

২। 'বিবু ভয় কি? আমি আছি, সূর্যবিজ্ঞান আমার হাতের মুঠোর মধ্যে'—এই উক্তি কার? বক্তার চরিত্রের গুণগত কি বৈশিষ্ট্য এই উক্তির মধ্যে পরিস্ফুট আলোচনা কর।

৩। 'ননীর বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না'—এই উক্তি কার? ননী কে? ঘাস সম্পর্কিত ব্যাপারটি কি?

৪। 'গোবর্ধন মল্লিক বড় বড় ইংরেজ চরিয়ে খায়—তাকে তুমি ঠকাবে?"—গোবর্ধন মল্লিক কে? কি ভাবে তাকে কে ঠকাতে চেয়েছিল?

৫। 'অ্যাঃ ছাড় ছাড় গালে, মাইরি এখন ইয়ারকি ভালো লাগে না—চাদ্দিকে আগুন ছেড়ে দাও বলছি।'—এই উক্তির বক্তা কে? কাকে উদ্দেশ্য করে এটি বলা হয়েছে? আগুন লাগা ইত্যাদি ঘটনাটি কি? এই উক্তির মধ্যে বক্তার কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৬। 'দূর গাধা যাঃ মানেই হ্যাঁ'—এই উক্তির বক্তা কে? কাকে উদ্দেশ্য করে এটি কথিত? যাঃ হ্যাঁ—এর তাৎপর্য কি?

৭। 'তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না। শেষটায় মানুষের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করলেন'—এই উক্তি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি? এর মধ্যে বক্তার চরিত্রের কি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

৮। ওসব কথা শুনে ব্যারিস্টার ও. কে. সেন বিস্ময়ে মন্তব্য করলেন—'ওআণ্ডার-ফুল'—কি সব মন্তব্য শুনে ব্যারিস্টার মন্তব্য করেন? এই উক্তির মধ্যে তার চরিত্রের কি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

পাশ ফেল

১। 'এ তামাসার মধ্যে আমি আর নেই'—এই উক্তি কার? তামাসা কাকে বলা হয়েছে? বিষয়টি কি সত্যিই তামাসার পর্যায়ে পড়ে?

২। 'আমার গহনা ধার নিয়েছিস পাশ করে শোধ দিবি না?'—এই উক্তি কার? গহনা ধার নেওয়া ব্যাপারটি কি? এই উক্তির মধ্যে বক্তার চরিত্রগত কি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

৩। 'আদ্দেক সাবান মাখা ছেঁড়া ভেজা শাড়ীটা তাড়াতাড়ি শতজীর্ণ ভেজা সেমিজটার উপরে জড়িয়ে কলতলা থেকে ....' কে উঠে এসেছিল? সামান্য ঘটনার মধ্যে তার চরিত্রের কি পরিচয় ফুটে উঠেছে?

৪। 'মানুষের জীবন নিয়ে ভাগ্যের খেলা, জুয়ো আর জুয়োচুরিতে সে জিতে গেল'—এই মনোভাব কার হয়েছিল? জুয়ো আর জুয়োচুরির জিনিসটি কি? কি কারণে এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে?

৫। 'সর্বনাশ, তবে কি হবে?'—এই উক্তি কার? এই উক্তির মধ্যে তার কি মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে?

॥ সমাপ্ত ॥